তাফসীর
ইব্‌নে
কাসীর
চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড
মূলঃ
হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইবনে কাসীর

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড

সূরাঃ আলে-ইমরান, নিসা ও মায়িদাহ্

মূলঃ
হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

৪-৭ খন্ড

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
www.drmujib.com

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান, ১৪০৬ হিজরী
মে, ১৯৮৬ ইংরেজী

নবম সংস্করণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩০ হিজরী
মে ২০০৯ ঈসায়ী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মোঃ ওবাইদুর রহমান
বিনোদপুর বাজার
রাজশাহী

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাষ্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। –আমীন!

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট ও সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং প্রাণ প্রিয় দ্বীনদার ভই-বোনদের অনুরোধে আমরা আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরানা জানাই।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সাহায্য করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দূ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক

প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন জনাব নূরুল আলম ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। এই কমিটি কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে তাফসীর প্রকাশনার কাজটি হাতে নেয়। এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র

রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীব করেন। সুম্মা আমীন!

এই খণ্ডগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। প্রথম সংস্করণে সব খণ্ডগুলো হয়েছে পারা ভিত্তিক কিন্তু এবার হলো সূরা ভিত্তিক। কারণ প্রতি পারায় সমাপ্তির সাথে সাথে খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলে সূরার একটা চলমান বিষয়বস্তু হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে করে পাঠকের মনের কোণে একটা অস্ফুট অতৃপ্তি ও অব্যক্ত অস্বস্তি বিরাজ করে। এই অতৃপ্তির নিরসন কল্পেই সূরা ভিত্তিক প্রকাশনার অবতারণা। তাই চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডগুলিকে পুনঃর্বিন্যাস করে সূরা আলে ইমরান, নিসা ও মায়িদাহ এক খণ্ডে প্রকাশ করা হল।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা সকল যুগেই দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্ততি আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

বিনয়াবনত
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

বর্তমানে
তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ,
রিচমিণ্ড হিল, নিউইয়র্ক-১১৪১৮
যুক্তরাষ্ট্র

সূচীপত্রঃ

সূরাঃ আলে ইমরান মাদানী سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াতঃ ২০০, রুকু'ঃ ২০) (اٰيَاتُهَا: ٢٠٠، رُكُوْعَاتُهَا: ٢٠)

এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর প্রাথমিক তিরাশিটি আয়াত নাজরানের খ্রীষ্টানদের দূত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যে দূত হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ 'মুবাহালা'র আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই আসছে। এ সূরার ফযীলত সম্বন্ধে যে হাদীসসমূহ এসেছে ঐগুলো সূরা-ই-বাকারার তাফসীরের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

١- الٓمّٓ ۙ

১। আলিফ, লাম, মীম।

٢- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۙ

২। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সদা বিরাজমান।

٣- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ

৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। এবং তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন-

٤- مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۙ

৪। ইতোপূর্বে মানবমন্ডলীর জন্য সৎপথ প্রদর্শনের জন্য। আর তিনিই ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রতিশোধগ্রহণকারী।

পূর্বেই আয়াতুল কুরসীর তাফসীরের বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, ইস্‌ম-ই-আযম এ আয়াতের মধ্যে ও আয়াতুল কুরসীর মধ্যে রয়েছে। الٓمّٓ -এর তাফসীর সূরা-ই-বাকারার প্রারম্ভে লিখা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ -এর তাফসীরও আয়াতুল কুরসীর তাফসীরে লিখা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর সত্যের সঙ্গে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। বরং নিশ্চয়ই ওটা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে এসেছে, যা তিনি স্বীয় জ্ঞানের সাথে অবতীর্ণ করেছেন। ফেরেশতাগণ এর উপর সাক্ষী রয়েছেন এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কুরআন মাজীদ তার পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ কিতাবগুলো, এ কুরআন কারীমের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ। কেননা, ঐগুলোর মধ্যে নবী (সঃ)-এর আগমন এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার যে সংবাদ ছিল তা সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনিই হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর উপর তাওরাত এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। এ দু'টোও সে যুগীয় লোকদের জন্যে পথ-প্রদর্শক ছিল।

তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যা সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী। ওর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীলগুলো প্রত্যেকের জন্যে যথেষ্ট হয়ে থাকে। হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) এবং হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রঃ) বর্ণনা করেন যে, এখানে ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন। যদিও এটা مَصْدَرٌ, কিন্তু এর পূর্বে কুরআনের বর্ণনা হয়েছে বলে এখানে فُرْقَانٌ বলেছেন। হযরত আবূ সালিহ (রঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে 'তাওরাত', কিন্তু এটা দুর্বল। কেননা, তাওরাতের বর্ণনা এর পূর্বে হয়েছে। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসকারী এবং বাতিলপন্থীদের কঠিন শাস্তি হবে। আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। যারা মহা সম্মানিত নবী ও রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ণভাবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

٥- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝

৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই।

٦- هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬। তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন। তিনি ব্যতীত ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রামশালী, বিজ্ঞানময়।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই তাঁর নিকট লুক্কায়িত নেই, বরং সব কিছুরই তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন–'আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের জরায়ুর মধ্যে আকৃতি বিশিষ্ট করেছেন। তিনি যেভাবেই আকৃতি গঠনের ইচ্ছে করেছেন তাই করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। একমাত্র তিনিই যখন তোমাদের আকৃতি গঠন করতঃ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা একমাত্র তাঁর ইবাদত ছাড়া অন্যের ইবাদত করবে কেন? তিনি অবিনষ্ট সম্মান ও ধ্বংসহীন জ্ঞানের অধিকারী।' এতে ইঙ্গিত রয়েছে এমন কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, হযরত ঈসাও (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তাঁরই পদপ্রান্তে মস্তক অবনতকারী। সমস্ত মানুষের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ। তাঁর আকৃতিও আল্লাহ তা'আলা তাঁর মায়ের জরায়ুর মধ্যে গঠন করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে আল্লাহ হয়ে গেলেন, যেমন অভিশপ্ত খ্রীষ্টানেরা মনে করে নিয়েছে? অথচ তিনিইতো তোমাদেরকে তোমাদের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে থাকেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ

অর্থাৎ 'তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে তিন তিনটি অন্ধকারের মধ্যে এক সৃষ্টির পর অন্য সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকেন।' (৩৯ঃ ৬)

৭- هُوَ الَّذِىٓ اَنۡزَلَ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰيٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَيۡغٌ فَيَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَابۡتِغَآءَ تَاۡوِيۡلِهٖ ۚ وَمَا يَعۡلَمُ تَاۡوِيۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَالرّٰسِخُوۡنَ فِى الۡعِلۡمِ يَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ○

৭। তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে– ওগুলো গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি উৎপাদন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ ব্যতীত ওর অর্থ কেউই অবগত নয়; আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে– আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না।

৮- رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ ○

৮। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পথ-প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী।

৯- رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوۡمٍ لَّا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخۡلِفُ الۡمِيۡعَادَ ○ ع

৯। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী–ঐ দিন যাতে একটুও সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নন।

এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে যেগুলোর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সরল ও সহজ। প্রত্যেকেই ওগুলোর ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারে। আবার কতগুলো আয়াত এরূপও রয়েছে যেগুলোর ভাবার্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয় না। এখন যারা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলোকে প্রথম প্রকারের আয়াত সমূহের দিকে ফিরিয়ে থাকে, অর্থাৎ যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের স্পষ্টতা যে আয়াতের মধ্যে প্রাপ্ত হয় তাই গ্রহণ করে থাকে, তারাই সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যারা স্পষ্ট আয়াতগুলোকে ছেড়ে এমন আয়াতগুলোকে দলীলরূপে গ্রহণ করে থাকে, যেগুলো তাদের জ্ঞানের উর্ধে এবং ওগুলোর মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়ে, তারা ওরাই যারা মুখের ভরে পতিত হয়েছে। أُمُّ الْكِتٰبِ অর্থাৎ মূল ও ভিত্তি। ঐগুলো আল্লাহর কিতাবের পরিষ্কার ও স্পষ্ট আয়াতসমূহ।

‘তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ো না, বরং স্পষ্ট আয়াতসমূহের প্রতিই আমল কর,ঐগুলোকেই মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ কর।’ ‘কতগুলো আয়াত এমনও রয়েছে যে, ঐগুলোর একটি অর্থ তো স্পষ্ট আয়াত সমূহের মতই কিন্তু ঐ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ অস্পষ্ট আয়াত সমূহের পিছনে পড়ো না।’ পূর্ববর্তী মনীষীগণ হতে مُحْكَمٌ ও مُتَشَابِه শব্দদ্বয়ের বহু অর্থ নকল করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مُحْكَمَاتٌ হচ্ছে রহিতকারী আয়াতগুলো, যেগুলোর মধ্যে হালাল, হারাম, আদেশ, নিষেধ এবং আমল সমূহের বর্ণনা থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا (৬ঃ ১৫১) এবং এর পরবর্তী হুকুমের আয়াতগুলো হচ্ছে মুহকামাত এবং وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّاۤ اِيَّاهُ (১৭ঃ ২৩) ও এর পরবর্তী তিনটি আয়াত মুহকামাত। হযরত আবূ ফাকতাহ (রঃ) বলেন যে, এগুলো সূরাসমূহের সূচনা। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার (রঃ) বলেন যে, এগুলো হচ্ছে ফরযসমূহ, নির্দেশাবলী, বাধা-নিষেধ এবং হালাল ও হারামের আয়াতসমূহ। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন, ‘এ আয়াতগুলোকে কিতাবের মূল বলার কারণ এই যে, এগুলো সমগ্র কিতাবের মধ্যে রয়েছে।’ হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, সমস্ত মাযহাবের লোক এগুলোকে স্বীকার করে বলে এগুলোকে কিতাবের মূল বলা হয়। مُتَشٰبِهٰتٌ ঐ আয়াতগুলোকে বলা হয় যেগুলো রহিত হয়ে গেছে। যেগুলোর পূর্বের ও পরের, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে দৃষ্টান্তসমূহ এবং যেগুলো দ্বারা শপথ করা হয়েছে।

ঐগুলোর উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। আমল করার জন্যে ঐগুলো আহকাম নয়। হযরত ইবনে আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই। হযরত মুকাতিল (রঃ) বলেন যে, ঐগুলো হচ্ছে সূরাসমূহের প্রথমে লিখিত حُرُوْفُ مُقَطَّعَاتٌ। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, مُتَشَابِهَاتٌ আয়াতগুলো একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে (كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ) (৩৯ঃ ২৩) এবং এটাও উল্লিখিত হয়েছে যে, এটা এমন এক বাক্য যা একই রচনা রীতির অধীনস্থ হয়। আর مَثَانِي ওকেই বলা হয় যেখানে দু'টি বিপরীতমুখী জিনিসের উল্লেখ থাকে। যেমন জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষণ বর্ণনা এবং পাপ-পুণ্যের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি। এ আয়াতে مُتَشَابِه শব্দটি مُحْكَمٌ শব্দের বিপরীত শব্দরূপে এসেছে। এ জন্যেই আমরা যে ভাবার্থ বর্ণনা করেছি ওটাই সঠিক। এটাই হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াসারেরও (রঃ) উক্তি। তিনি বলেন যে, এগুলো হচ্ছে প্রভুর দলীল স্বরূপ। ঐগুলোর মধ্যে বান্দাদের রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিবাদ ও বাতিলের মীমাংসা রয়েছে। ঐগুলোর প্রকৃত ভাবার্থ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। مُتَشَابِهَاتٌ আয়াতগুলোর সত্যতার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। ঐ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। ঐ আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন, যেমন পরীক্ষা করে থাকেন হালাল ও হারাম দ্বারা। আয়াতগুলোকে সত্য হতে ফিরিয়ে দিয়ে অসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, অর্থাৎ যারা সত্য পথ ছেড়ে দিয়ে ভ্রান্তির পথে গমন করে তারাই এ অস্পষ্ট আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্বীয় জঘন্য উদ্দেশ্যাবলী পুরো করতে চায় এবং শাব্দিক অনৈক্য হতে অবৈধ উপকার গ্রহণ করতঃ নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। স্পষ্ট আয়াত সমূহ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পুরো হয় না। কেননা, ঐগুলোর শব্দসমূহ সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং একেবারে খোলাখুলি। তারা ঐগুলো সরাতেও পারে না এবং ওগুলোর মধ্যে নিজেদের অনুকূলে কোন দলীলও প্রাপ্ত হয় না। এ জন্যেই ঘোষণা হচ্ছে যে, এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অশান্তি উৎপাদন, যেন তারা স্বীয় অধীনস্থ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে । তারা নিজেদের বিদআতের দলীল কুরআন পাক থেকেই নিতে চায়, অথচ কুরআন মাজীদতো বিদআতকে খণ্ডন করে থাকে। যেমন খ্রীষ্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের رُوْحُ اللّٰهِ শব্দকে দলীল

রূপে গ্রহণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ অস্পষ্ট আয়াতটিকে গ্রহণ করতঃ নিম্নলিখিত স্পষ্ট আয়াতগুলোকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেনঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

অর্থাৎ 'সে ঈসা (আঃ) একজন দাস ছাড়া কিছুই নয়, তাকে আমি পুরস্কৃত করেছি।' (৪৩ঃ ৫৯) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসা (আঃ) এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এর মতই, তাকে (আদম আঃ) তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বলেছেন– 'হও' তেমনই হয়ে গেছে।' (৩ঃ ৫৯) এ প্রকারের আরও বহু স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। কিন্তু এসবকে ছেড়ে দিয়ে অভিশপ্ত খ্রীষ্টানেরা অস্পষ্ট আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের পুত্র হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ার তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থ পরিবর্তন করা এবং ঐগুলোকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ 'যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলো নিয়ে ঝগড়া করে তখন তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর। এ আয়াতে ঐগুলোকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।' এ হাদীসটি বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ বুখারী শরীফেও এ হাদীসটি 'কিতাবুল কাদরে'র মধ্যে এ আয়াতেরই তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, এগুলো খারেজী ছিল। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসটিকে 'মাওকুফ' মনে করা হলেও এর বিষয়বস্তু বিশুদ্ধ। কেননা, প্রথম বিদআত তারাই ছড়িয়েছিল। এ দলটি শুধুমাত্র ইহলৌকিক দুঃখের কারণে মুসলমানগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হুনাইন যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য বন্টন করেন তখন ঐ লোকগুলো ঐ বন্টনকে অন্যায় মনে করেছিল। তাদের মধ্য হতে যুল খুয়াইসির নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এসে পরিষ্কারভাবে বলেই দেয়ঃ 'ন্যায়নীতি অবলম্বন করুন। এ বন্টনে আপনি সুবিচার প্রদর্শন করেননি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তো আমাকে বিশ্বস্ত রূপে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমিই যদি সুবিচার না করি তবে তো তুমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সে ফিরে গেলে হযরত উমার (রাঃ) আবেদন করেনঃ 'হে

আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তাকে হত্যা করে ফেলি, আপনি আমাকে এ অনুমতি প্রদান করুন।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ছেড়ে দাও, তার বংশ হতে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যে, তোমরা তোমাদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় এবং তোমাদের কুরআন পাঠকে তাদের কুরআন পাঠের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার হতে বেরিয়ে যায়। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্যে বড় পুণ্য রয়েছে'। হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে তাদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাদেরকে নাহরাওয়ানে হত্যা করেন। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদী দলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের মধ্যে তারা নতুন বিদআত চালু করে এবং আল্লাহর পথ হতে বহু দূরে সরে পড়ে। তাদের পরে কাদরিয়্যাহ দলের আবির্ভাব হয়। তার পরে বের হয় মুতাযিলা সম্প্রদায়। তার পরে জাহমিয়্যাহ ইত্যাদি দলের উদ্ভব হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। তিনি বলেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে অতিসত্বরই তেহাত্তরটি দলের আবির্ভাব ঘটবে। একটি দল ছাড়া সবই জাহান্নামী হবে।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, ঐটি কোন্ দল? তিনি বলেনঃ 'তারা ওরাই যারা এমন জিনিসের উপর রয়েছে যার উপর আমি রয়েছি এবং আমার সাহাবীগণ (রাঃ) রয়েছে।' (মুসতাদরিক-ই-হাকিম) আবূ ই'য়ালার হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন মাজীদ তো পাঠ করবে, কিন্তু ওটা এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলবে যেমন কেউ খেজুরের আঁটি ছুঁড়ে ফেলে। ওর ভুল অর্থ বর্ণনা করবে'।

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন'। اَللّٰهُ শব্দের উপর বিরতি আছে কি নেই, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'চার প্রকারের তাফসীর রয়েছে। (১) প্রথম হচ্ছে ঐ তাফসীর যা সবাই বুঝতে পারে। (২) দ্বিতীয় ঐ তাফসীর যা আরববাসী নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে। (৩) তৃতীয় ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র বড় বড় পণ্ডিতগণই বুঝে থাকেন। (৪) চতুর্থ ঐ তাফসীর যা শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন, অন্য কেউ জানে না। এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখেরও এটাই উক্তি। মু'জাম-ই-কাবীর গ্রন্থে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের উপর আমার শুধু তিনটি জিনিসের ভয় রয়েছে। (১) প্রথম ভয় মালের আধিক্যে। কেননা, এরই কারণে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হবে এবং পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। (২) দ্বিতীয় ভয় এই যে, তারা আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যার পিছনে লেগে পড়বে, অথচ ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। আর যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে ওর উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। (৩) তৃতীয় ভয় এই যে, তারা বিদ্যা অর্জন করে তা নষ্ট করে দেবে এবং কোনই গ্রাহ্য করবে না।' এ হাদীসটি সম্পূর্ণ গারীব। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কুরআন কারীম এ জন্যে অবতীর্ণ হয়নি যে, একটি আয়াত অন্য আয়াতের বিপরীত হবে। যা তোমরা বুঝতে পার তার উপর আমল কর এবং যা অস্পষ্ট তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এবং হযরত মালিক ইবনে আনাস (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকেরাও এর প্রকৃত অর্থ অবগত হন না। তবে তাঁরা ওর উপর বিশ্বাস রাখেন। হযরত ইবেন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এর জটিল ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা ঐ কথাই বলেন যে, ওগুলোর উপর তাঁদের ঈমান রয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'বও (রাঃ) একথাই বলেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। এ উক্তিগুলো হচ্ছে ঐ দলের যাঁরা (اِلَّا اللّٰهُ) শব্দের উপর বিরতি আনয়ন করতঃ পরবর্তী বাক্যকে এর থেকে পৃথক করে থাকেন। অন্য একটি দল (اِلَّا اللّٰهُ) শব্দের উপর বিরতি না এনে (فِى الْعِلْمِ) শব্দের উপর বিরতি এনে থাকেন (ওয়াক্ফ্ করে থাকেন)।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রের মূলনীতির উপর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী ব্যক্তিগণও একথাই বলেন। তাঁদের বড় দলীল এই যে, যে কথা বোধগম্য নয় তা বলা ঠিক নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেনঃ 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি একজন।' হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণও অস্পষ্ট আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা জানেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেনঃ 'প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং ভাবার্থ একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন এবং যাঁরা জ্ঞানে পরিপক্ক তাঁরা বলেনঃ 'আমরা ঐগুলোর উপর ঈমান এনেছি'। অতঃপর তাঁরা স্পষ্ট আয়াতের দ্বারা অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফলে কারও মুখ খোলার প্রশ্নই উঠে না। অথচ

কুরআন কারীমের বিষয়বস্তুও যথার্থ হয়ে যায়, দলীল চালু হয়, অন্যায় পরিত্যক্ত হয় এবং কুফর বিদূরতি হয়।' হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জন্যে প্রার্থনা করেছিলেনঃ 'হে আল্লাহ! তাকে আপনি ধর্মের বোধ এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।' কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, تَاْوِيْلُ শব্দটি কুরআন মাজীদের মধ্যে দু'টি অর্থে এসেছে। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা। যেমন কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছেঃ يَاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ অর্থাৎ 'হে পিতঃ! এটাই আমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা'। (১২ঃ ১০০) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ অর্থাৎ 'তারা শুধু ওর যথার্থতারই অপেক্ষা করছে, যেদিন ওর যথার্থতা এসে যাবে'। (৭ঃ ৫৩) সুতরাং এ দু' জায়গায় تَاْوِيْل শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূলতত্ত্ব বা যথার্থতা। যদি এ পবিত্র আয়াতের تَاْوِيْل শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তবে اِلَّا اللّٰهُ শব্দের উপর ওয়াক্‌ফ করা জরুরী। কেননা, কোন কার্যের মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। رَاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ উদ্দেশ্য হবে এবং يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا বিধেয় হবে আর এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হবে। تَاْوِيْل শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং একটি জিনিস দ্বারা অন্য জিনিসের ব্যাখ্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে- نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ অর্থাৎ, 'আমাদেরকে ওর تَاْوِيْل বা ব্যাখ্যা বলুন।' (১২ঃ ৩৬) যদি উপরোক্ত আয়াতে تَاْوِيْل শব্দের এ অর্থ নেয়া হয় তবে فِى الْعِلْمِ শব্দের উপর ওয়াক্‌ফ করা উচিত। কেননা, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন ও বুঝেন। আর সম্বোধনও তাঁদেরকেই করা হয়েছে, যদিও মূলতত্ত্বের জ্ঞান তাঁদের নেই। এরূপ হলে اٰمَنَّا بِهٖ শব্দটি حَال হবে। আবার مَعْطُوْف عَلَيْهِ ছাড়াই مَعْطُوْف হতে পারে, যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ হতে يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا (৫৯ঃ ৮-১০) পর্যন্ত। অন্য স্থানে রয়েছেঃ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (৮৯ঃ ২২) অর্থাৎ وَجَاءَ الْمَلٰئِكَةُ صُفُوْفًا صُفُوْفًا এ রকম ছিল। জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ সংবাদ প্রদান-'আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি' এর অর্থ এই যে, তাঁরা অস্পষ্ট আয়াত সমূহের উপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, এ সবগুলোই অর্থাৎ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সবগুলোই সত্য এবং একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে,সমস্ত আয়াতই আল্লাহ

তা'আলার নিকট হতে এসেছে। ঐগুলোর মধ্যে বৈপরীত্ব কিছুই নেই। যেমন এক জায়গায় রয়েছেঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ 'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো তবে অবশ্যই তারা এর মধ্যে বহু মতভেদ পেতো।' (৪ঃ ৮২) এ জন্যেই এখানেও বলেছেন– 'এটা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই অনুধাবন করে থাকে, যারা এ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে, যাদের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যারা স্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী কে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'যার শপথ সত্য, যে স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট, যার কথা সত্য, যার অন্তর পরিশুদ্ধ, যার পেট হারাম থেকে রক্ষিত এবং যার লজ্জাস্থান ব্যভিচার হতে মুক্ত সেই পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতক লোককে দেখেন যে, তারা কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি তাদেরকে বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের আয়াত সমূহকে পরস্পর বিরোধী বলতো। অথচ তাঁর কিতাবের প্রতিটি আয়াত অন্য আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। তোমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করে একটিকে অন্যটির বিপরীত বলো না। যা জান তা বল এবং যা জান না তা জ্ঞানীদের উপর সমর্পণ কর'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কুরআন সাত অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের ব্যাপারে ঝগড়া করা কুফর। (এ কথা তিনবার বলেন) যা জান তার উপর আমল কর এবং যা জান না তা জ্ঞানীদের উপর সমর্পণ কর।' (আবু ইয়া'লা) হযরত নাফে' ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) বলেন, 'জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরাই যাঁরা বিনয়ী, যাঁরা নম্রতা প্রকাশ করেন, প্রভুর সন্তুষ্টি কামনা করেন, বড়দেরকে বশীভূত করেন না এবং ছোটদেরকে ঘৃণা করেন না'।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু! সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে ওসব লোকের অন্তরের ন্যায় করবেন না যারা অস্পষ্ট আয়াত সমূহের পিছনে পড়ে বিপথগামী

হয়ে থাকে। বরং আমাদেরকে সরল-সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, দৃঢ় ধর্মের উপর কায়েম রাখুন, আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, আমাদের অন্তর ঠিক রাখুন, আমাদের বিক্ষিপ্ততা দূর করুন এবং আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রার্থনা করতেনঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থাৎ 'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।' অতঃপর তিনি (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا)-এ আয়াতটি পাঠ করতেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! হে অন্তর সমূহের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার ধর্মের উপর স্থির রাখুন।' হযরত আসমা (রাঃ) একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'অন্তরের কি পরিবর্তন হয়ে থাকে'? তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার অঙ্গুলি সমূহের দুই অঙ্গুলির মধ্যে রয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে ঠিক রাখেন এবং ইচ্ছে করলে বক্র করে দেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের অন্তরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আল্লাহ তা'আলা যেন তা বক্র না করেন এবং তিনি যেন আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি প্রচুর প্রদানকারী।' অন্য বর্ণনায় এও রয়েছে, আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নিজের জন্যে করতে থাকবো। তিনি বলেনঃ 'এই প্রার্থনা করঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ -

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, হে নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রভু! আমার পাপ মার্জনা করুন, আমার অন্তরের ক্রোধ, দুঃখ কাঠিন্য দূর করুন এবং আমাকে পথভ্রষ্টকারী ফিতনা হতে বাঁচিয়ে নিন।' হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ -এ প্রার্থনাটি শুনে হযরত আসমা (রাঃ)-এর মত তিনিও প্রশ্ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ উত্তরই দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করে শুনান। এ হাদীসটি গারীব। কিন্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত হয়েছে, তবে কুরআন কারীমের এ

আয়াতটি পাঠ করার উল্লেখ নেই। সুনান-ই-নাসাঈ ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাত্রে জাগরিত হতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আটি পড়তেনঃ

"لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْاَلُكَ رَحْمَةً ـ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ"

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট আমার পাপের ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার নিকট করুণা যাচ্ঞা করছি। হে আল্লাহ! আমার বিদ্যা বাড়িয়ে দিন এবং সুপথ প্রদর্শনের পর আমার অন্তরকে বক্র করবেন না ও আপনার নিকট হতে আমাকে রহমত দান করুন, আপনি সুপ্রচুর দানকারী'। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) মাগরিবের নামায পড়ান। প্রথম দু'রাক'আতে আলহামদু শরীফের পর তিনি মুফাসসালের ছোট দু'টি সূরা পাঠ করেন এবং তৃতীয় রাক'আতে আলহামদু শরীফের পর এ আয়াতটি পাঠ করেন। হযরত আবূ আবদুল্লাহ (রঃ) বলেন, 'আমি সে সময় তাঁর নিকটেই চলে গিয়েছিলাম, এমন কি আমার কাপড় তাঁর কাপড়ের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং আমি স্বয়ং তাঁকে এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি। (মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাক) হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এ হাদীসটি শুনার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে (قُلْ هُوَ اللّٰهُ) পাঠ করতেন। কিন্তু এ হাদীসটি শ্রবণের পর তিনিও এ রাক'আতে এ আয়াতটি পড়তে আরম্ভ করেন এবং কখনও পরিত্যাগ করেননি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে সমবেতকারী এবং তাদের মধ্যে হুকুম ও ফায়সালাকারী। আপনিই সকলকে তাদের ভাল-মন্দ কার্যের বিনিময় প্রদানকারী। ঐদিনের আগমনে এবং আপনার অঙ্গীকারের সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'

১০। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর

١٠- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ

اللّٰهِ شَيْـئًا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمْ وَقُـوْدُ النَّارِ ۙ

নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবে না এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

١١- كَـدَاْبِ اٰلِ فِـرْعَـوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَـــبْلِهِمْ ۭ كَـــذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَــاَخَـذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

১১। ফিরআউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের প্রকৃতির ন্যায় তারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি অসত্যারোপ করেছে, এই হেতু আল্লাহ তাদের অপরাধের জন্যে তাদেরকে ধৃত করেছেন এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অস্বীকারকারীরা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ হবে। সেদিন ঐ অত্যাচারীদের ওযর কৈফিয়ত কোন কাজে আসবে না। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে জঘন্য বাসস্থান রয়েছে। সেদিন তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই উপকার করতে পারবে না, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। যেমন অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 'তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির উপর বিস্ময়বোধ করো না, আল্লাহ ওর কারণে তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতে চান, কুফরীর অবস্থাতেই তাদের প্রাণ বহির্গত হবে।'

অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'তাদের শহরে ঘুরাফেরা যেন তোমাদের প্রতারিত না করে, এ পুঁজি অল্পদিনের, অতঃপর তাদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা জঘন্যতম স্থান।' অনুরূপ এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কথা অস্বীকারকারী, তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অমান্যকারী, তাঁর কিতাবের বিরোধী, অহীর অবাধ্য তারা যেন তাদের মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা কোন মঙ্গলের আশা না করে। তারা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ, তাদের দ্বারা জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে।' যেমন অন্য জায়াগায় রয়েছেঃ 'তোমরা ও তোমাদের উপাস্যেরা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ।' মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মা হযরত উম্মে ফযল (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক রাত্রে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে

বলেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! আমি কি আল্লাহর কথা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে জনগণ! আমি কি প্রচারকার্য চালিয়েছি? হে লোক সকল! আমি কি একত্ব ও রিসালাত তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি'? হযরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর দ্বীন আমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।'

অতঃপর সকাল হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জেনে রেখো! আল্লাহর শপথ! ইসলাম জয়যুক্ত হবে এবং বহুদূর ছড়িয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত কাফিরেরা তাদের জায়গায় আত্মগোপন করবে। মুসলমানেরা ইসলামকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেবে ও তার কার্য চালিয়ে যাবে। জেনে রেখো যে, এমন যুগও আসবে যখন মানুষ কুরআন মাজীদ শিক্ষা করবে ও পাঠ করবে। অতঃপর (অহংকার ও আমিত্ব প্রকাশ করতঃ) বলবেঃ 'আমরা কুরআন কারীমের পাঠক, আমরা বিদ্বান। কে আমাদের চেয়ে বেড়ে যাবে?' তাদের জন্য কোন মঙ্গল রয়েছে কি"? জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহ রাসূল (সঃ)! ঐগুলো কে?' তিনি বলেনঃ 'তোমাদের মুসলমানদের মধ্য হতেই হবে কিন্তু মনে রাখবে যে, তারা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ।'

ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থেও এ হাদীসটি রয়েছে। ওতে এও রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আপনি অত্যন্ত আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রচার কার্য চালিয়েছেন এবং আপনি যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন। আপনি বিশেষভাবে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন'।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যেমন অবস্থা ফিরআউন সম্প্রদায়ের ছিল, যেমন তাদের কৃতকর্ম ছিল।' دَأْبٌ শব্দটির هَمْزَةْ অক্ষরটি জযমের সঙ্গেও এসেছে এবং যবরের সঙ্গেও এসেছে। যেমন নাহরুন ও নাহার শব্দটি। دَأْبٌ শব্দটি জাঁকজমক, অভ্যাস, অবস্থা এবং পন্থা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। ইমরুল কায়েসের কবিতায়ও এ শব্দটি এরূপ অর্থে এসেছে। পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর নিকট কাফিরদের মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না, যেমন ফিরআউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের ধন-মাল ও সন্তানাদি তাদের কোন কাজে আসেনি। আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং তাঁর শাস্তি বড়ই বেদনাদায়ক। কেউ কোন ক্ষমতার বলে ঐ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারে না এবং তা সরিয়ে দিতেও পারে না। আল্লাহ পাক যা চান তাই করে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর বশীভূত। তিনি ব্যতীত কেউ মা'বূদ নেই।

১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, তুমি তাদেরকে বল- অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমরা জাহান্নামের দিকে একত্রিত হবে এবং ওটা নিকৃষ্টতর স্থান।

١٢- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৩। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে দুটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল, তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তদীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।

١٣- قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ۖ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দাও যে, তারা পৃথিবীতেও পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং কিয়ামতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, আর ওটা হচ্ছে জঘন্যতম স্থান। 'সীরাত-ই-ইবনে ইসহাক' গ্রন্থে রয়েছে, হযরত আমর ইবনে কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বানূ কাইনুকার বাজারে ইয়াহূদীদেরকে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'হে ইয়াহূদীর দল! কুরাইশদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়ার ন্যায় তোমরাও লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর।' এ কথা শুনে ঐ উদ্ধত ও অবাধ্য দলটি উত্তর দেয়ঃ 'যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কয়েকজন কুরাইশকে পরাজিত করেই

বুঝি আপনি অহংকারে ফেটে পড়েছেন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে! এখনও আমাদের সাথে আপনার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়– 'মক্কা বিজয়ই এটা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্য, উত্তম ও পছন্দনীয় দ্বীনকে ও ঐ দ্বীনধারীদেরকে সম্মান দানকারী। তিনি তাঁর রাসূলের ও তাঁর অনুসারীদের স্বয়ং সাহায্যকারী'।

দু'টি দল যুদ্ধে পরস্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল। এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। সেদিন মুশরিকদের উপর এমন প্রভাব পড়ে (মুসলমানদের) এবং মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলমানেরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা বহু কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুশরিকরা উমায়ের ইবনে সাদকে গোয়েন্দাগিরির জন্যে প্রেরণ করেছিল। সে এসে সংবাদ দেয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা কিছু কম বেশী তিনশ জন। আসলেও তাই ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ দশ এবং আর কয়েকজন বেশী। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট ও নির্বাচিত এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। একটি অর্থ তো এই। দ্বিতীয় ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাফিরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ ছিল, এটা মুসলমানেরা জানতো এবং প্রত্যক্ষও করছিল। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতঃ কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বদরী সাহাবীরা (রাঃ) ছিলেন তিনশ তেরোজন এবং মুশরিকরা ছিল দু'শ ষোল জন। কিন্তু ইতিহাসের পুস্তকগুলোতে মুশরিকদের ন'শ হতে এক হাজার বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে সম্ভবতঃ হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআন শরীফের শব্দ দ্বারাই দলীল গ্রহণ করে থাকবেন। বানূ হাজ্জাজ গোত্রের একটি কৃষ্ণ বর্ণের ক্রীতদাস যে ধৃত হয়ে এসেছিল, তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করলে সে বলেঃ 'অনেক।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ 'তারা দৈনিক কতটি উট যবেহ্ করছে?' সে বলেঃ 'একদিন নয়টি এবং আর একদিন দশটি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তাহলে মুশরিকদের সংখ্যা নয়শ এবং এক হাজারের মধ্যবর্তী।' সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকরা মুসলমানদের তিনগুণ ছিল। কিন্তু এটা স্মরণ রাখবার বিষয় যে, আরববাসী বলে থাকে, 'আমার নিকট এক হাজার তো রয়েছে কিন্তু আমার আরও এর দ্বিগুণ প্রয়োজন এবং তার তিন হাজারের উদ্দেশ্য

হয়ে থাকে। তাহলে কোন অসুবিধা থাকলো না কিন্তু প্রশ্ন আরও একটি রয়েছে, তা এই যে, কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا-

অর্থাৎ 'যখন তোমরা মুখোমুখী হয়ে গেলে তখন আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের চোখে কম দেখালেন যেন আল্লাহ যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হয়ে যায়।' (৮ঃ ৪৪) সুতরাং এ পবিত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অল্প পরিলক্ষিত হয়। আর উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, বেশী এমন কি দ্বিগুণ পরিলক্ষিত হয়। তাহলে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, ঐ আয়াতে অবস্থা ছিল এক রকম এবং এ আয়াতে অবস্থা ছিল অন্য রকম। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 'বদরের দিন মুশরিকদের সংখ্যা আমাদের চোখে মোটেই বেশী দেখায়নি। আমরা আবার গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেও বুঝতে পারি যে, তাদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা বেশী নয়।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'মুশরিকদের সংখ্যা আমাদের নিকট এত অল্প মনে হলো যে, আমি আমার পার্শ্ববর্তী একজনকে বললাম–এরা সত্তরজন হবে। ঐ লোকটি তখন বললোঃ 'না না,একশজন হবে।' তাদের একজন লোক ধৃত হলে আমরা তাকে মুশরিকদের সংখ্যা জিজ্ঞেস করি। সে বলেঃ 'এক হাজার।' অতঃপর যখন উভয় পক্ষ সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় তখন মুসলমাদের মনে হয় যে, মুশরিকরা তাদের দ্বিগুণ হবে। এটা এ জন্যই যে, যেন তারা নিজেদের দুর্বলতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, সমস্ত মনোযোগ তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তাঁরই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। অনুরূপভাবে মুশরিকদের নিকটও মুসলমানদের সংখ্যা তাদের দ্বিগুণ অনুভূত হয়, যেন তাদের অন্তরে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তখন প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় অন্য দলের সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয় যেন উভয় দলই উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন। যেন কুফর ও ঔদ্ধত্যের উপর ঈমানের বিজয় লাভ ঘটে এবং যেন মুসলমানেরা সম্মানিত হয় এবং কাফিরেরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ বদরের দিন তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা সে সময় দুর্বল ছিলে।' (৩ঃ ১২৩) এ জন্যেই এখানেও বলেছেন– 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তদীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করে থাকেন।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।' অর্থাৎ যারা স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে উঠেপড়ে লেগে যাবে এবং বুঝে নেবে যে, আল্লাহ পাক তাঁর মনোনীত বান্দাদেরকে এ ইহলৌকিক জগতেও সাহায্য করবেন এবং কিয়ামতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

١٤- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

১৪। মানব মণ্ডলীকে রমণীগণের, সন্তান-সন্ততির, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভাণ্ডারের, সুশিক্ষিত অশ্বের ও পালিত পশুর এবং শস্য ক্ষেত্রের প্রেমাকর্ষণী দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকটেই শ্রেষ্ঠতম অবস্থান।

١٥- قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○ج

১৫। তুমি বল– আমি কি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও উত্তম বিষয়ের সংবাদ দেব? যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাত রয়েছে– যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং তথায় শুদ্ধা সহধর্মিণীগণও আল্লাহর প্রসন্নতা রয়েছে; এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, পার্থিব জীবনকে বিভিন্ন প্রকারের উপভোগ্য (বস্তু) দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এ সমুদয় জিনিসের মধ্যে সর্বপ্রথম নারীদের কথা বর্ণনা করেছেন, কেননা তাদের অনিষ্ট সবচেয়ে বড়। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি আমার পরে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও ফিৎনা ছেড়ে গেলাম না। হ্যাঁ, তবে যখন বিবাহ দ্বারা কোন লোকের উদ্দেশ্য হবে ব্যভিচার হতে রক্ষা পাওয়া ও সন্তানাদির আধিক্য তখন নিঃসন্দেহে ওটা উত্তম কাজ হবে।' শরীয়ত বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে এবং বিয়ে করা এমনকি বহু বিয়ে করার ফযীলতের অনেক হাদীসও এসেছে এবং এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে অধিক স্ত্রীর অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'দুনিয়া একটি উপকারের বস্তু এবং ওর সর্বোত্তম উপকারী জিনিস হচ্ছে সতী সাধ্বী পত্নী। স্বামী যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যদি নির্দেশ দেয় তবে পালন করে। আর যদি সে স্ত্রী হতে অনুপস্থিত থাকে তবে সে নিজের জীবনের ও স্বামীর ধন-মালের রক্ষণাবেক্ষণ করে।' অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী হচ্ছে নামায।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল নারীগণ, তবে তিনি ঘোড়াও খুব পছন্দ করতেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর খুব চাহিদার জিনিস ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। হ্যাঁ, তবে শুধুমাত্র নারীরা ছিল। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদেরকে ভালবাসার মধ্যে মঙ্গলও রয়েছে এবং অমঙ্গলও রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যদের উপর অহংকার প্রকাশ করার জন্যে যদি অধিক সন্তান লাভ কামনা করে তবে তা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে একত্ববাদী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ভালবাসা স্থাপনকারিণী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা বিয়ে কর, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে অন্যান্য উম্মতবর্গের উপর গর্ববোধ করবো।' মাল-ধনের ব্যাপারেও একই কথা। যদি ওর প্রতি ভালবাসার উদ্দেশ্য হয় দুর্বলদের ঘৃণা করা ও দরিদ্রের উপর অহংকার প্রকাশ করা, তবে তা অতি জঘন্য। আর যদি মালের চাহিদার উদ্দেশ্য হয় নিকটের ও দূরের আত্মীয়দের উপর খরচ করা, সৎকার্যাবলী সম্পাদন করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা তবে তা শরীয়ত সম্মত ও খুবই উত্তম। قِنْطَارٌ -এর পরিমাণের

ব্যাপারে তাফসীর কারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মোটকথা এই যে, অত্যধিক মালকে قِنْطَارٌ বলা হয়। যেমন হযরত যহ্হাকের উক্তি রয়েছে। আরও বহু উক্তি রয়েছে, যেমন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা, বারো হাজার, চল্লিশ হাজার, ষাট হাজার, সত্তর হাজার, আশি হাজার ইত্যাদি। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বারো হাজার আওকিয়া'য় এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক আওকিয়া' পৃথিবী ও আকাশ হতে উত্তম।' হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে এ রকমই একটি মাওকুফ হাদীসও বর্ণিত আছে এবং এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। হযরত ইবনে জারীর (রঃ), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) এবং হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাতিম (রঃ)-এর গ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) এবং হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বারো আওকিয়া'য় এক কিনতার হয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে,রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বারোশ আওকিয়া'য় এক কিনতার হয়।' কিন্তু এ হাদীসটি 'মুনকার'। সম্ভবতঃ এটা হযরত উবাই ইবনে কা'বের উক্তি। যেমন অন্যান্য সাহাবীরও (রাঃ) এই উক্তি রয়েছে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি একশ আয়াত পাঠ করবে তার নাম উদাসীনদের মধ্যে লেখা হবে না এবং যে ব্যক্তি এক হাজার পর্যন্ত পাঠ করবে তাকে এক কিনতার পুণ্য দেয়া হবে। আর কিনতার হচ্ছে বড় পাহাড়ের সমান।' 'মুসতাদরিক-ই-হাকিম' গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ শব্দটির ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'দু'হাজার আওকিয়া।' ইমাম হাকিম (রঃ) হাদীসটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর সঠিক বলেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হাদীসটি আনেননি। তাবরানী প্রভৃতি মনীষীর হাদীস গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে যে, কিনতার হচ্ছে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা। হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে 'মাওকুফ' বা 'মুরসাল' রূপে বর্ণিত আছে যে, কিনতার হচ্ছে বারোশ স্বর্ণমুদ্রা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, কোন কোন আরববাসী কিনতারকে বারোশ বলে থাকেন আবার কেউ কেউ বারো হাজার বলেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, বলদের গাত্র-চর্ম পূর্ণ হয়ে যায় এই পরিমাণ স্বর্ণকে কিনতার বলা হয়। এটা মারফূ' রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাওকুফ হওয়াই অধিকতর সঠিক।

অশ্বের প্রতি প্রেম তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐসব লোক যারা অশ্বের উপর আরোহণ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে তা লালন-পালন করে। তাদের জন্য এ ঘোড়া পুণ্য ও সওয়াবের কারণ। দ্বিতীয় হচ্ছে তারাই যারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে অশ্ব পালন করে থাকে। এদের জন্য শাস্তি রয়েছে। তৃতীয় হচ্ছে ওরাই যারা ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা পাওয়া এবং ওর বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে অশ্ব পালন করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য বিস্মরণ হয় না। এদের জন্যে পুণ্য বা শাস্তি কোনটাই নেই। এ বিষয়ের হাদীস وَاَعِدُّوْا لَهُمْ (৮ঃ৬০) -এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

مُسَوَّمَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত এবং কপালে ও চার পায়ে সাদা চিহ্নযুক্ত ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক আরবী অশ্ব ফজরের সময় আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে দু'টি প্রার্থনা করে থাকে। সে বলেঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যার অধিকারে রেখেছেন তার অন্তরে আমার ভালবাসা তার মাল ও পরিবার অপেক্ষা বেশী করে দিন।' اَنْعَامٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে উট, ছাগল ও গরু। حَرْثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ভূমি যা ফসলের বীজ বপন বা বৃক্ষরোপণের জন্যে তৈরী করা হয়। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মানুষের উত্তম মাল হচ্ছে অধিক বংশ বিশিষ্ট ঘোড়া এবং অধিক ফলবান বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।'

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ 'এগুলো পার্থিব জীবনের লোভনীয় সম্পদ।' অর্থাৎ এগুলো ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, এগুলো সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উত্তম বিনিময় প্রাপ্তির জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, যখন زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাদের জন্যে এটাকে সুশোভিত করেছেন তাহলে এখন'? তখন পরবর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এখানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়ঃ (হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি। এ পার্থিব জিনিসগুলো তো একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের কথা বলছি সেগুলো অস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী। জেনে রেখো যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে তাদের প্রভুর নিকট এমন সুখময় জান্নাত রয়েছে যার ধারে ধারে ও যার বৃক্ষাদির মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতস্বিনী সমূহ বয়ে যাচ্ছে। কোন স্থানে

রয়েছে মধুর নদী, কোন জায়গায় রয়েছে দুধের নদী, কোথাও বা রয়েছে সুরার স্রোতস্বিনী এবং কোন স্থলে রয়েছে স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণ। আরও এমন এমন সুখ-সম্পদ রয়েছে যা না শ্রবণ করেছে কোন কর্ণ, না দর্শন করেছে কোন চক্ষু, না ধারণা করেছে কোন অন্তর। এরূপ সুখময় ও আরামদায়ক স্থানে মুত্তাকী লোকেরা চিরকাল অবস্থান করবে। তথা হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হবে না, তাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতরাজী কমে যাবে না এবং ধ্বংসও হবে না। অতঃপর তথায় এমন সহধর্মিণী পাওয়া যাবে যারা ময়লা মালিন্য, অপবিত্রতা, ঋতু-রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বিরাজ করবে। সর্বোপরি খুশীর কারণ এই যে, মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এর পরেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন ভয় থাকবে না। এজন্যেই সূরা-ই-বারাআতের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে- وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ 'এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই খুব বড় জিনিস'। (২ঃ ৭২) অর্থাৎ নিয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ। সমস্ত বান্দাই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কে তাঁর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় তা তিনিই ভাল জানেন।

১৬। যারা বলে- হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিন।

১৬- اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِۚ

১৭। যারা সহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, সেবানুগত, দানশীল এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৭- اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সংযমী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার উপর, আপনার কিতাবের উপর ও রাসূল (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং এ ঈমানের উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করুন এবং

আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন।' এ সংযমী লোকেরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করতঃ তাঁর সমস্ত আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে এবং অবৈধ জিনিস হতে দূরে থাকে। তারা প্রতিটি কাজে-কর্মে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। তারা ঈমানের দাবীতেও সত্যবাদী।

জীবনের উপর কঠিন ও কষ্টকর হলেও তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। তারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। তারা নিজেদের ধন-মাল আল্লাহর পথে তাঁর নির্দেশ মত ব্যয় করে থাকে। তাঁরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, মানুষকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং তাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে। তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করে এবং ভোর রাত্রে উঠে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ সময় ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব অত্যধিক। এও বলা হয়েছে যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে যে সময় বলেছিলেনঃ

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ

অর্থাৎ 'অতিসত্বরই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।'(১২ঃ ৯৮) ওটার ভাবার্থ ঊষাকালই বটে। অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে বলেনঃ 'প্রাতঃকালে তোমাদের জন্যে আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো।' সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রে এক তৃতীয়াংশ রাত্র অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ 'কোন যাচ্ঞাকারী আছে কি যাকে আমি দান করবো? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবূল করবো? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করবো'?

হাফেজ আবুল হাসান দারেকুতনী (রঃ) এ বিষয়ের উপর একটি পৃথক পুস্তক রচনা করেছেন এবং উক্ত পুস্তকের মধ্যে এ হাদীসটির সমস্ত সনদ এবং ওর প্রত্যেকটি শব্দ এনেছেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বেতেরের নামায পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বেতের পড়ার সর্বশেষ সময় ছিল ঊষার উদয় পর্যন্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং স্বীয় গোলাম হযরত নাফে'কে

জিজ্ঞেস করতেনঃ 'সকাল হয়েছে কি'? যখন বলতো, 'হ্যাঁ, হয়েছে', তখন তিনি সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকতেন। হযরত হাতিব (রঃ) বলেনঃ ঊষার সময় আমি শুনতে পাই কে যেন মসজিদের কোন এক প্রান্তে বলছেঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা পালন করেছি। এটা উষাকাল, আমাকে ক্ষমা করুন।' আমি দেখি যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেনঃ 'আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, আমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়লে যেন ঊষার শেষ সময়ে সত্তরবার আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

١٨- شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৮। আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কেউ মা'বূদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, জ্ঞানবান- গণ ও সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারীগণও সাক্ষ্য দেন যে, এই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত আর কোনই মা'বূদ নেই।

١٩- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯। নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর বিদ্রোহ ব্যতীত বিরোধ করে না; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

٢٠- فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۚ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝ ع

২০। অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তবে তুমি বল- আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছি এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল- তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো? অনন্তর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায়, তবে তোমার উপর প্রচার মাত্র; এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী সাক্ষী এবং তাঁরই কথা সবচেয়ে সত্য। তিনি বলেন যে, সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দাস এবং একমাত্র তাঁরই সৃষ্ট। সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। মা'বূদ ও আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে তিনি একাই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। যেমনঃ কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছেঃ 'কিন্তু আল্লাহ সজ্ঞানে তোমার প্রতি অবতীর্ণকৃত কিতাবের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করছেন এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।' অতঃপর আল্লাহ পাক স্বীয় সাক্ষ্যের সাথে ফেরেশতাদের ও আলেমদের সাক্ষ্যকেও মিলিয়ে নিচ্ছেন। এখান হতে আলেমদের বড় মর্যাদা সাব্যস্ত হচ্ছে। قَائِمًا শব্দটি এখানে حَال হয়েছে বলে তার উপর نَصَب দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সদা ও সর্বাবস্থায় এ রকমই। অতঃপর আরও বেশী গুরুত্ব দেয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রকৃত মা'বূদ একমাত্র তিনিই। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং কথা ও কাজে বিজ্ঞানময়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফায় এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং اَلْحَكِيْمُ পর্যন্ত পড়ে বলেন وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ يَا رَبِّ

অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! আমিও ওর উপর সাক্ষীগণের মধ্যে একজন।' মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নরূপ পাঠ করেনঃ وَاَنَا اَشْهَدُ يَا رَبِّ অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি'। তাবরানীর হাদীসে রয়েছে, হযরত গালিব কার্তান (রঃ) বলেন, 'আমি ব্যবসা উপলক্ষে কুফায় গমন করতঃ হযরত আমাশ (রঃ)-এর নিকট অবস্থান করি। রাত্রে হযরত আমাশ (রঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে যান। পড়তে পড়তে যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন এবং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ পাঠ করেন তখন বলেনঃ

وَاَنَا اَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللّٰهُ بِهٖ وَاَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِيْ عِنْدَ اللّٰهِ وَدِيْعَةٌ -

অর্থাৎ "আমিও ওর সাক্ষ্য দিচ্ছি যার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন এবং এ সাক্ষ্য আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা আমার আমানত।" অতঃপর তিনি কয়েকবার اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ পাঠ করেন। আমি মনে মনে ধারণা করি যে, সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে কোন হাদীস রয়েছে। অতি প্রত্যুষেই আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করিঃ হে আবূ মুহাম্মদ! আপনার বার বার এ আয়াতটি পড়ার কারণ কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ "আপনার কি এ আয়াতের ফযীলত জানা নেই?" আমি বলিঃ জনাব আমি তো এক মাস ধরে আপনার এখানে অবস্থান করছি, কিন্তু আপনি তো কোন হাদীসই বর্ণনা করেননি। তিনি বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমি তো এক বছর পর্যন্ত বর্ণনা করবো না।" তখন আমি এ হাদীসটি শুনবার জন্যে এক বছর কাল তথায় অবস্থান করি এবং তাঁর দরজায় পড়ে থাকি। এক বছর পূর্ণ হলে আমি তাঁকে বলি, হে আবূ মুহাম্মদ (রঃ)! এক বছর তো পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি বলেনঃ "আচ্ছা শুনুন! আবূ অয়েল (রঃ) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রঃ)-এর নিকট শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এর পাঠককে কিয়ামতের দিন আনয়ন করা হবে এবং মহা সম্মানিত আল্লাহ বলবেন 'এ বান্দা আমার নিকট অঙ্গীকার নিয়েছে এবং আমি সবচেয়ে উত্তম অঙ্গীকার পূর্ণকারী, আমার এ বান্দাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও"।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তিনি শুধুমাত্র ইসলামকেই গ্রহণ করে থাকেন।' সর্বযুগীয় নবীদের (আঃ) অহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম। সর্বশেষ এবং সমস্ত নবী (আঃ)-এর সমাপ্তকারী হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ

মুস্তফা (সঃ)। তাঁর নবুওয়াতের পর সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে কেউ তাঁর শরীয়ত ছাড়া অন্য কিছুর উপর আমল করবে সে মহান আল্লাহর নিকট ধার্মিক বলে গণ্য হবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করবে তা কখনও গ্রহণীয় হবে না।'(৩ঃ ৮৫) অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও ধর্মকে ইসলামের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পঠনে شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ ও اِنَّ الْاِسْلَامَ রয়েছে। তাহলে অর্থ দাঁড়াবেঃ 'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন ও তাঁর ফেরেশ্তামণ্ডলী এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম শুধুমাত্র ইসলাম'। জমহূরের পঠনে 'ইন্না' রয়েছে এবং অর্থ হিসেবে দু'টোই ঠিক আছে। কিন্তু জমহূরের উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে- 'পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা মহান আল্লাহর নবীদের (আঃ) আগমনের পর ও তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর মতভেদ করেছিল এবং এরই কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল। একজন এক কথা বললে তা সত্য হলেও অন্যজন তার বিরোধিতা করতো।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যারা ঐগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতঃ অমান্য করে, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই তাদের হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-হে নবী (সঃ)! তারা যদি তোমার সাথে আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তাদেরকে বলে দাও-'আমি তো নির্ভেজালভাবে সেই আল্লাহরই ইবাদত করবো যাঁর কোন অংশীদার নেই, যিনি অতুলনীয়, যাঁর না আছে কোন সন্তান এবং না রয়েছে কোন পত্নী। আর যারা আমার অনুসারী, যারা আমার ধর্মের উপর রয়েছে তাদেরও এই একই কথা।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে-

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

অর্থাৎ 'তুমি বল- এটাই আমার পথ। আমি খুব চিন্তা-গবেষণা করেই তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি, আমিও এবং আমার অনুসারীগণও।' (১২ঃ ১০৮)

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে– 'হে নবী (সঃ)! কিতাবধারী ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে এবং নিরক্ষর মুশরিকদেরকে বলে দাও–তোমাদের সবারই সুপথ প্রাপ্তি ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। যদি তারা অমান্য করে তবে কোন কথা নেই। তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা এবং তুমি তোমার এই কর্তব্য পালন করেছো। আল্লাহ তাদেরকে দেখে নেবেন। তাদের সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই। তিনি যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। স্বীয় নৈপুণ্য তাঁরই ভাল জানা আছে। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে ভ্রান্তপথের পথিক তা তিনিই ভাল জানেন। তাঁর কার্যের হিসাব গ্রহণকারী কেউ নেই।' এ আয়াতে এবং এরই মত বহু আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত সৃষ্টজীবের নিকট রাসূল হয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর ধর্মের নির্দেশাবলী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিতাব ও সুন্নাহর মধ্যে এ বিষয়ের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কুরআন পাকের মধ্যে এক জায়গায় রয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই জন্যে আল্লাহর রাসূল।" (৭ঃ ১৫৮) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا۔

অর্থাৎ "সেই আল্লাহ কল্যাণময় যিনি স্বীয় বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে সারা দুনিয়াবাসীর জন্যে ভয় প্রদর্শক হয়ে যায়"। (২৫ঃ ১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনা ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত বাদশাহর নিকট এবং অন্যান্য লোকদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঐ পত্রগুলোর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন। তারা আরবই হোক বা আজমীই হোক, কিতাবধারীই হোক বা অন্য কোন ধর্মের লোক হোক না কেন। এভাবে তিনি প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর শপথ! এ উম্মতের মধ্যে ইয়াহূদই হোক বা খ্রীষ্টানই হোক যারই কানে আমার নবুওয়াতের সংবাদ পৌঁছবে এবং আমার আনীত জিনিসের উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করবে না, আর ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।" সহীহ

মুসলিম শরীফেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের উক্তিও রয়েছেঃ "আমি প্রত্যেক লাল ও কৃষ্ণের নিকট নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।" অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেকে নবী (আঃ)-কে শুধুমাত্র তাঁর গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের নিকট নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।"

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াহূদীর ছেলে, যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অযুর পানি রাখতো এবং তাঁর জুতা এনে দিতো, সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছেলেটিকে বলেনঃ "হে অমুক! তুমি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ পাঠ কর।" সে তখন তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং পিতাকে নীরব থাকতে দেখে সেও নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বার এ কথাই বলেন। সে পুনরায় তার পিতার দিকে তাকায়। তার পিতা বলেঃ "আবুল কাসিম (সঃ)-এর কথা মেনে নাও।" ছেলেটি তখন বলেঃ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বেরিয়ে যাবার সময় বলেনঃ "সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার কারণে তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করলেন।" এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ বুখারীর মধ্যে এনেছেন। এগুলো ছাড়াও আরও বহু বিশুদ্ধ হাদীস এবং কুরআন কারীমের বহু আয়াত এ সম্বন্ধে রয়েছে।

২১। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে ও অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং যারা মানব মণ্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী তাদেরকে হত্যা করে; অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।

২১- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২২। এদেরই কৃতকর্মসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হবে এবং তাদের জন্যে কেউ সাহায্যকারী নেই।

২২- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

এখানে কিতাবধারীদের জঘন্য কাজের নিন্দে করা হচ্ছে। তারা পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতো এবং মহান আল্লাহ স্বীয় নবীদের (আঃ) মাধ্যমে যেসব কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। শুধু তাই নয়, বরং তারা নবীদেরকে হত্যা করে ফেলতো। তাদের অবাধ্যতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, যেসব লোক তাদেরকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করতো তাদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করতো। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সত্যকে অস্বীকার করা ও ন্যায় পন্থীদেরকে লাঞ্ছিত করাই হচ্ছে অহংকারের শেষ সীমা।"

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহ রাসূল! কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তির সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে'? তিনি বলেনঃ 'সেই ব্যক্তির যে কোন নবী (আঃ)-কে হত্যা করে কিংবা এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে যে ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ 'হে আবূ উবাইদাহ (রাঃ)! বানী ইসরাঈল দিনের প্রথমভাগে এক ঘন্টার মধ্যে তেতাল্লিশজন নবী (আঃ)-কে হত্যা করে। অতঃপর একশ সত্তর জন ঈমানদার বানী ইসরাঈলকে হত্যা করে যারা এ কাজে বাধা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতো ও মন্দ কাজে নিষেধ করতো। তাদের সকলকে তারা দিনের শেষ ভাগে হত্যা করে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওদের কথাই বর্ণনা করেছেন।' হযরত ইবনে জারীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাঈল তিনশ নবী (আঃ)-কে দিনের প্রথম অংশে হত্যা করে। অতঃপর দিনের শেষাংশে তারা বাজারে তাদের শাক সব্জী বিক্রীর কাজে লেগে যায়। সুতরাং তাদের এ অবাধ্যতা, অহংকার এবং দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন এবং পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। এদের সমস্ত কৃতকর্ম ইহকালেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না'।

٢٣- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ○

২৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তাদেরকে গ্রন্থের দিকে আহবান করা হচ্ছে– যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; অতঃপর তাদের একদল প্রতিগমন করলো এবং তারা প্রতিগমনকারী।

٢٤- ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

২৪। এটা এ জন্যে যে তারা বলে– নির্দিষ্ট সংখ্যক দিবস ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না; এবং তারা যা স্থির করেছে, তাদের ধর্ম বিষয়ে ওটা তাদেরকে প্রতারিত করেছে।

٢٥- فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

২৫। অনন্তর যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করবো– যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তাদের কি দশা হবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা সম্যকরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা তাদের এ দাবীতেও মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা, ঐ কিতাবগুলোর নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নবী (সঃ)-এর-আনুগত্যের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যের এ বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের সাহস

যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলেঃ 'আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র জাহান্নামে অবস্থান করবো।' অর্থাৎ মাত্র সাত দিন। দুনিয়ার হিসেবে প্রতি হাজার বছর পরে একদিন। এর পুরো তাফসীর সূরা-ই-বাকারায় হয়ে গেছে। এ বাজে ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। অথচ এটা স্বয়ং তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, না তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেনঃ 'কিয়ামতের দিন তাদের কি অবস্থা হবে? তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে, নবীদেরকে ও হক পন্থী আলেমদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব দিতে হবে এবং এক একটি পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। ঐদিনের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ঐদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবে না'।

২৬। তুমি বল– হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছে রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছে সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে লাঞ্ছিত করেন; আপনরাই হস্তে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়োপরি ক্ষমতবান।

٢٦- قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

২৭। আপনি রজনীকে দিবসে পরিবর্তিত করেন এবং দিবাকে নিশায় পরিণত করেন, এবং মৃত হতে জীবিতকে নির্গত

٢٧- تُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○	**করেন এবং জীবিত হতে মৃতকে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।**

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি তোমার প্রভুর সম্মানার্থে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ও সমস্ত কাজ তাঁর নিকট সমর্পণের উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র সত্তার উপর নির্ভর করতঃ উপরোক্ত শব্দগুলো দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর।' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি সাম্রাজ্যের অধিপতি। সমস্ত সাম্রাজ্য আপনারই অধিকারে রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছে সাম্রাজ্য প্রদান করে থাকেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছে রাজ্য কেড়ে নেন। আপনিই প্রদানকারী। আপনি যা চান না তা হতে পারে না। এ আয়াতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে এবং ঐ নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতকে দান করা হয়েছে। তা এই যে, বানী ইসরাঈল হতে নবুওয়াত ছিনিয়ে নিয়ে মক্কার নিরক্ষর, কুরায়েশী আরবী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে প্রদান করা হয়েছে। আর তাঁকে সাধারণভাবে নবীদের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সমস্ত মানব ও দানবের রাসূল করে পাঠান হয়েছে। পূর্বের সমস্ত নবীর গুণাবলী তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে এবং তাঁকে ঐসব ফযীলত দান করা হয়েছে যা হতে অন্যান্য নবীগণ (আঃ) বঞ্চিত ছিলেন। ঐ ফযীলত আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সম্বন্ধেই হোক বা ঐ মহান প্রভুর শরীয়তের ব্যাপারেই হোক অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ সম্পর্কেই হোক, আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর পরকালের সমস্ত রহস্য খুলে দিয়েছেন, তাঁর উম্মতকে পূর্ব হতে পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর দ্বীন ও শরীয়তকে সমস্ত দ্বীন ও সমস্ত মাযহাবের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক, আজ হতে কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন দিবস-রজনীর আবর্তন চালু থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর যেন স্বীয় করুণা সদাসর্বদার জন্যে বর্ষণ করতে থাকেন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–হে নবী (সঃ)! তুমি বল–"হে আল্লাহ! আপনিই স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে আবর্তন বিবর্তন এনে থাকেন। আপনি যা চান তাই করে থাকেন"। যারা বলেছিলঃ "দু'টি গ্রামের কোন একজন বড়লোকের উপর

কেন আল্লাহ তা'আলা এ কুরআন অবতীর্ণ করেননি"। তাদের এ কথা খণ্ডন করতঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

অর্থাৎ 'তারাই কি তোমার প্রভুর করুণা বন্টন করছে?'(৪৩ঃ ৩২) অর্থাৎ 'আমি যখন তাদের আহার্যেরও মালিক, যাকে চাই কম দেই এবং যাকে চাই বেশী দেই, তখন এরা আমার উপর হুকুম চালাবার কে যে, আমি অমুককে কেন নবী করলাম? নবুওয়াতও আমারই অধিকারের জিনিস। নবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কোন্ ব্যক্তি তা আমিই জানি।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

অর্থাৎ 'যেখানেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন।' (৬ ঃ ১২৪) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ 'তুমি লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তাদের পরস্পরের মধ্যে এককে অপরের উপর উৎকৃষ্টতা দান করেছি।' (১৭ঃ ২১)

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'আপনিই রাত্রির অতিরিক্ত অংশ দিনের কমতির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দিন-রাত্র সমান করে থাকেন। আবার এদিকের অংশ ওদিকে দিয়ে ঐ দু'টোকেই ছোট বড় করেন এবং পুনরায় সমান সমান করে থাকেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপর এবং সূর্য ও চন্দ্রের উপর পূর্ণ আধিপত্য আপনারই রয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীষ্মকে শীতের সাথে পরিবর্তন করারও পূর্ণ ক্ষমতা আপনারই আছে। বসন্তকাল ও শরৎকালের উপর আপনিই ক্ষমতাবান। আপনিই জীবিত হতে মৃতকে এবং মৃত হতে জীবিতকে বের করে থাকেন। ক্ষেত্র শস্য হতে এবং শস্য ক্ষেত্র হতে বের করারও ক্ষমতা আপনারই। খেজুর গাছ আঁটি হতে এবং আঁটি খেজুর হতে আপনিই সৃষ্টি করে থাকেন। মুমিনকে কাফিরের ঔরষে এবং কাফিরকে মুমিনের ঔরষে আপনিই জন্মদান করে থাকেন এবং মুরগী ডিম হতে এবং ডিম মুরগী হতে সৃষ্টি করাও আপনারই কাজ। এ রকমই সমস্ত জিনিসই আপনার অধিকারে রয়েছে। আপনি যাকে ইচ্ছে করেন এত ধন-সম্পদ প্রদান করেন যা গণনা করে ও পরিমাপ করে শেষ করা যায় না। আবার যাকে ইচ্ছে করেন ক্ষুধা নিবারণের আহার্য পর্যন্ত প্রদান করেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনার এ সমস্ত কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ এবং

সবকিছুই আপনারই ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে'। তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ -এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার 'ইসম-ই-আযম' রয়েছে। এ নামের মাধ্যমে তাঁর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি তা কবূল করে থাকেন।

২৮। মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে; এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট কিছুই নয়; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

٢٨- لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন না করে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও ভালবাসা থাকা উচিত। অতঃপর তিনি সতর্ক করে বলছেন যে, এরূপ যে ব্যক্তি করবে অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের সাথে মিত্রতা করবে তার প্রতি তিনি রাগান্বিত হয়ে যাবেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ

অর্থা 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না'। (৬০ঃ ১) অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'হে মুমিনগণ! এই ইয়াহূদী এবং খ্রীষ্টানেরা পরস্পর বন্ধু, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ করে বলেনঃ 'অবিশ্বাসকারীরা পরস্পর বন্ধু, তোমরা যদি এরূপ না কর তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে এবং ভীষণ হাঙ্গামা সংঘটিত হবে।'

অতঃপর আল্লাহ পাক ঐ লোকদেরকে অনুমতি দেন যারা কোন শহরে কোন সময় অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে মৌখিক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে কিন্তু তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখে না। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'কোন কোন গোত্রের সাথে আমরা প্রশস্ত বদনে মিলিত হই, কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'শুধু মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে হবে কিন্তু কাজে-কর্মে এরূপ অবস্থাতেও কখনও তাদের সহযোগিতা করতে হবে না'। এ উক্তিটিই অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী হতেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলার নিম্নের ঘোষণাটিতেও এ উক্তিরই সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ -

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে কিন্তু যার প্রতি জবরদস্তি করা হয়েছে এবং তার অন্তর ঈমানের সাথে শান্তি প্রাপ্ত (অসমাপ্ত আয়াত)।' (১৬ঃ ১০৬)

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ 'কিয়ামত পর্যন্তই এ নির্দেশ।' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্বের ভয়প্রদর্শন করছেন।' অর্থাৎ তিনি ঐ লোকদেরকে স্বীয় শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতঃ তাঁর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।' প্রত্যেকেই তাঁর কাছে স্বীয় কার্যের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। 'মুসনাদ ইবনে আবি হাতিম' গ্রন্থে রয়েছে, হযরত মাইমুন ইবনে মাহরান বলেন, হযরত মু'আয (রাঃ) দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বলেনঃ 'হে বানী আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূতরূপে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। জেনে রেখো যে, আল্লাহর নিকট সকলকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর অবস্থান স্থল হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।'

২৯। তুমি বল- তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং

٢٩- قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

٣٠- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

৩০। যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকর্ম হতে যা করেছে ও দুষ্কর্ম হতে যা করেছে তা মওজুদ পাবে; তখন সে ইচ্ছে করবে যে, যদি তার মধ্যেও ঐ দুষ্কর্মের মধ্যে সুদূর ব্যবধান হতো এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথাই ভালই জানেন। কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রমত কথাও তাঁর নিকট লুক্কায়িত থাকে না। তাঁর জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহূর্তে বেষ্টন করে রয়েছে। পৃথিবী প্রান্তে, পর্বতে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, ছিদ্রে মোটকথা যেখানে যা কিছু আছে সবই তাঁর গোচরে রয়েছে। সব কিছুর উপরেই তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। তিনি যেভাবেই চান রাখেন, যাকে ইচ্ছে করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ও এতবড় ক্ষমতাবান হতে সকলেরই সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, সদা-সর্বদা তাঁর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকা এবং অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা উচিত। তিনি সবজান্তাও বটে এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারীও বটে। সম্ভবতঃ তিনি কাউকে ঢিল দিয়ে রাখবেন, কিন্তু যখন ধরবেন তখন এমন কঠিনভাবে ধরবেন যে, পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবে না। এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের হিসেব সামনে রেখে দেয়া হবে। পুণ্যের কাজ দেখে আনন্দ লাভ হবে এবং মন্দ কাজ দেখে দাঁত কামড়াতে থাকবে ও হা-হুতাশ করবে। সেদিন তারা ইচ্ছে পোষণ করবে যে, যদি তার মধ্যে ও ঐ

মন্দ কার্যের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান থাকতো তবে কতই না চমৎকার হতো! কুরআন কারীমের আর এক স্থানে ঘোষিত হয়েছেঃ

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاخَّرَ

অর্থাৎ 'সেদিন মানুষকে তার পূর্বের ও পরের কৃৎকর্মের সংবাদ দেয়া হবে।' (৭৫ঃ ১৩) দুনিয়ায় যে শয়তান তার সঙ্গে থাকতো এবং তাকে অন্যায় কার্যে উত্তেজিত করতো সেদিন তার উপরও সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং বলবেঃ

يٰلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ

অর্থাৎ 'হে শয়তান, যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো তবে কতই না ভাল হতো! তুমি মন্দ সাথী।' (৪৩ঃ ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্ব হতে অর্থাৎ স্বীয় শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন।' অতঃপর তিনি স্বীয় সৎ বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দয়া ও স্নেহ হতেও নিরাশ না হয়। কেননা, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল। ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ 'এটাও তাঁর সরাসরি দয়া ও ভালবাসা যে, তিনি স্বীয় অস্তিত্ব হতে বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন।' এও ভাবার্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং বান্দাদেরও উচিত যে, তারা যেন সরল-সঠিক পথ হতে সরে না পড়ে, পবিত্র ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে না নেয়।

৩১। তুমি বল– যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

٣١- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩২। তুমি বল– তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর; কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না।

٣٢- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

এ পবিত্র আয়াতটি মীমাংসা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু তার আমল ও বিশ্বাস যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশের অনুরূপ না হয় এবং সে তাঁর সুন্নাতের অনুসারী না হয়, তবে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন এমন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা অগ্রাহ্য।' এ জন্যেই এখানেও ইরশাদ হচ্ছে-'যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে ভালবাসা রাখার দাবীতে সত্যবাদী হও তবে আমার সুন্নাতের উপর আমল কর। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের চাহিদা অপেক্ষা বেশী দান করবেন অর্থাৎ স্বয়ং তিনিই তোমাদেরকে চাইবেন'। যেমন বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেনঃ 'তোমার চাওয়া কোন জিনিসই নয়, মজা ও স্বাদ তো ওর মধ্যেই রয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে চাইতে থাকেন।' মোটকথা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা রাখার পরিচয় এই যে, প্রতিটি কাজে সুন্নাতের প্রতি আনুগত্যই হবে একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'দ্বীন হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে ভালবাসা ও তাঁরই জন্যে শত্রুতার নাম।' অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু সনদ হিসেবে হাদীসটি 'মুনকার'। অতঃপর বলা হচ্ছে-'হাদীসের উপর চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেবেন।' এরপর সর্বসাধারণের উপর নির্দেশ হচ্ছে যে, তারা যেন সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করে। যারা এরপর থেকে ফিরে যাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য হতে সরে পড়বে তারা কাফির এবং আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। যদিও তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে ভালবাসার দাবী করে কিন্তু যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যবাদী, নিরক্ষর, রাসূলগণের (আঃ) সমাপ্তি আনয়নকারী এবং দানব ও মানবের নবী (সঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ না করবে সেই পর্যন্ত তারা তাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এমনই রাসূল যে, যদি আজ নবীগণ (আঃ) এমনকি স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলগণও (আঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁদেরও এ রাসূল (সঃ)-কে ও তাঁর শরীয়তকে মান্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। এর বিস্তারিত বিবরণ (وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ) (৩ঃ ৮১) -এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৩৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে ও নূহকে এবং ইবরাহীমের সন্তানগণকে ও ইমরানের সন্তানগণকে বিশ্ব জগতের উপর মনোনীত করেছেন।

٣٣- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

৩৪। তারা একে অপরের সন্তান এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

٣٤- ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

অর্থাৎ এ মহামানবগণকে আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন। হযরত আদম (আঃ)-কে তিনি স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ প্রবেশ করিয়েছেন, তাঁকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিয়েছেন, তাঁকে জান্নাতে বাস করিয়েছেন এবং স্বীয় নৈপুণ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন। যখন সারা জগত প্রতিমা পূজায় ছেয়ে যায় তখন হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রথম রাসূল রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তাঁর গোত্র তাঁর অবাধ্য হয়ে যায় এবং তাঁর হিদায়াতের উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন তিনি রাতদিন প্রকাশ্য ও গোপনে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তারা কোনমতেই তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসারীগণ ছাড়া অন্য সকলকে স্বীয় পানির শাস্তি অর্থাৎ বিখ্যাত 'নূহের তুফানে' ডুবিয়ে দেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশকে আল্লাহ তা'আলা মনোনয়ন দান করেন। তাঁর বংশেই মানব জাতির নেতা এবং নবীদের (আঃ) সমাপ্তকারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইমরান (আঃ)-এর বংশকেও তিনি মনোনীত করেন। ইমরান হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর পিতার নাম। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে তাঁর বংশলতা নিম্নরূপঃ ইমরান ইবনে হাশিম ইবনে মীশা ইবনে হিযকিয়া ইবনে ইবরাহীম ইবনে গারইয়া ইবনে নাওশ ইবনে আযর ইবনে বাহওয়া ইবনে মুকাসিত ইবনে আয়শা ইবনে আইয়াম ইবনে সুলায়মান (আঃ) ইবনে দাউদ (আঃ)। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সূরা-ই-আনআমের তাফসীরে আসবে।

٣٥- اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৫। যখন ইমরান পত্নী নিবেদন করলো, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

٣٦- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৩৬। অনন্তর যখন সে তা প্রসব করলো তখন বললো-হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি; এবং সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন এবং ঐ পুত্র এ কন্যার সমকক্ষ নয়; আর আমি কন্যার নাম রাখলাম, 'মারইয়াম' এবং আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম।

হযরত ইমরানের যে পত্নী হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর মা ছিলেন তাঁর নাম ছিল হিন্না বিনতে ফাকুয। হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেনঃ 'তাঁর ছেলে মেয়ে হতো না। একদা তিনি একটি পাখীকে দেখেন যে, সে তার বাচ্চাগুলোকে আদর করছে। এতে তাঁর অন্তরে সন্তানের বাসনা জেগে উঠে। ঐ সময়েই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আন্তরিকতার সাথে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ পাকও তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন; ঐ রাত্রেই তিনি গর্ভবতী হন।'

গর্ভ ধারণের পূর্ণ বিশ্বাস হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন (নযর মানেন) যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সন্তান দান করলে তিনি তাঁকে

বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে আযাদ করে দেবেন। অতঃপর পুনরায় তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার এই নিষ্কলুষ নযর কবূল করুন। আপনি আমার প্রার্থনা শুনতে রয়েছেন এবং আমার নিয়তের কথাও আপনি খুব অবগত আছেন'। তখন পুত্র সন্তান হবে কি কন্যা সন্তান হবে তাতো আর জানা ছিল না। কাজেই সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা যায়, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবা কার্য পরিচালনার যোগ্যতা কন্যা সন্তানের থাকতে পারে না। ওর জন্যে তো পুত্র সন্তানের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীয় দুর্বলতার কথা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রকাশ করতঃ বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমি তো তাকে আপনার নামে আযাদ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ যে কন্যা হয়ে গেল'। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ এরূপও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ এ উক্তিটিও হযরত হিন্নারই ছিল। তাহলে অর্থ হবে 'আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব করেছি তা আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন।' আবার 'অযাআত'ও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে সে যে কি সন্তান প্রসব করেছে তা আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন।' হযরত হিন্না বলেনঃ 'নর ও নারী সমান নয়। আমি তার নাম মারইয়াম রাখলাম।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জন্মের দিনও শিশুর নাম রাখা বৈধ। কেননা, পূর্ববর্তীদের শরীয়তও আমাদের শরীয়ত। আর এখানে এটা বর্ণনা করা হয়েছে এবং খণ্ডন করা হয়নি। বরং ওটাকে ঠিকই রাখা হয়েছে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আজ রাত্রে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার নাম আমি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নামানুসারে ইবরাহীম রেখেছি'। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ)-এর একটি ভাই জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বহস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন এবং তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। এ হাদীসটিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! রাত্রে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তার নাম কি রাখবো'? তিনি বলেনঃ "আবদুর রাহমান রাখ"—সহীহ বুখারী। আর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আবূ উসায়েদ (রাঃ)-এর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাকে নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন, যেন

তিনি স্বীয় পবিত্র হস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন। তিনি অন্য দিকে মনোযোগ দেন এবং শিশুটির কথা বিস্মরণ হন। হযরত উসায়েদ (রাঃ) শিশুটিকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবকাশ প্রাপ্ত হয়ে শিশুটির কথা খেয়াল করেন এবং তাকে দেখতে না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতঃ অবস্থা জানতে পেরে বলেনঃ "তার নাম রাখ মুনযির (অর্থাৎ ভয় প্রদর্শক)।" মুসনাদ-ই-আহ্মাদ ও সুনানের মধ্যে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যাকে ইমাম তিরমিযী বিশুদ্ধ বলেছেন, তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক শিশু স্বীয় 'আকীকায় বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে আকীকাহ দিতে হবে অর্থাৎ জন্তু যবেহ করতে হবে, শিশুর নাম রাখতে হবে এবং মস্তক মুণ্ডন করতে হবে।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রক্তপাত করতে হবে। এ বর্ণনাটিই বেশী সঠিক রূপে প্রমাণিত। কিন্তু যুবাইর ইবনে বাকারের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাঃ)-এর 'আকীকাহ' করেছিলেন এবং নাম রেখেছিলেন ইবরাহীম (রাঃ)। এ হাদীসটি সনদ দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং এর বিপরীত বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, ঐদিনে ঐ নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর মাতাও স্বীয় শিশু কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনাটি কবূল করেন। 'মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাকের' মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'শয়তান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত করে, ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে। কিন্তু হযরত মারইয়াম (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।' এ হাদীসটি বর্ণনা করে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'তোমরা ইচ্ছে করলে إِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ-এ আয়াতটি পড়ে নাও।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। এটা আরও বহু কিতাবে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। কোন একটিতে রয়েছে যে, এক ঘা বা দু' ঘা দেয়। একটি হাদীসে শুধুমাত্র হযরত ঈসারই (আঃ) উল্লেখ আছে যে, শয়তান তাঁকেও ঘা দিতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁকে লাগেনি, পর্দায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

৩৭। অনন্তর তাঁর প্রভু তাঁকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে উত্তম ধরনে বর্ধিত	٣٧- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًاۙ وَّكَفَّلَهَا

زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا
رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

করলেন এবং যাকারিয়াকে তার ভারার্পণ করলেন; যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতো, তখন তার নিকট খাদ্যসম্ভার প্রাপ্ত হতো; সে বলতো, হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলতো, এটা আল্লাহ্র নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হযরত হিন্নার 'নযর' তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে বর্ধিত করেন। তাঁকে তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সৌন্দর্যই দান করেন এবং সৎ বান্দাদের মধ্যে তাঁর লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন যেন তিনি চরিত্রবান লোকদের সংস্পর্শে থেকে তাঁদের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে তিনি হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেনঃ হযরত মারইয়াম (আঃ) পিতৃহীনা হয়েছিলেন বলে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য মনীষীগণ বলেন যে, সে সময় দেশে দুর্ভিক্ষ পড়েছিল বলে হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো দু'টি কারণই ছিল। হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) প্রভৃতি মনীষীর বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, হযরত যাকারিয়া (আঃ) হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর খালু ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন। যেমন মিরাজ সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যাঁরা পরস্পর খালোতো ভাই ছিলেন। হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। কেননা, আরবের পরিভাষায় মায়ের খালার ছেলেকেও খালাতো ভাই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) স্বীয় খালার নিকট লালিতা-পালিতা হন। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হামযা (রাঃ) -এর পিতৃহীনা কন্যা

উমরা (রাঃ)-কে তাঁর খালা হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব (রাঃ)-এর স্ত্রীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ 'খালা হচ্ছেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত।'

এখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা বর্ণনা করছেন যে, হযরত যাকারিয়া (আঃ) যখনই হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন তখনই তাঁর নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। যেমন শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হযরত আবূশ শা'শা' (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), হযরত যহহাক (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রঃ), হযরত আতিয়া আওফী (রঃ) এবং হযরত সুদ্দী (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে একথাই বলেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এখানে রিয্ক -এর ভাবার্থ হচ্ছে জ্ঞান ও ঐ পুস্তিকা যার মধ্যে জ্ঞানপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ থাকতো। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিকতর সঠিক। এ আয়াত আল্লাহর অলীদের 'কারামতের' দলীল। এটা সাব্যস্ত করণে বহু হাদীসও এসেছে।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) একদিন জিজ্ঞেস করেনঃ "হে মারইয়াম! তোমার নিকট এ আহার্যগুলো কোথা হতে আসে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ 'এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসে থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।' মুসনাদ-ই-হাফিয আবূ ইয়ালা'র মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কয়েকদিন কিছু না খেয়েই কেটে যায়। ক্ষুধায় তাঁর কষ্ট হতে থাকে। তিনি তাঁর সমস্ত সহধর্মিণীর বাড়ীতে গমন করেন। কিন্তু সব জায়গা থেকেই তাঁকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। অবশেষে তিনি হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং বলেনঃ 'হে কন্যা আমার! তোমার নিকট আমার খাওয়ার মত কিছু আছে কি? আমি ক্ষুধার্ত।' তিনি বলেনঃ 'আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান হোন, আল্লাহ্র শপথ! আমার নিকট কিছুই নেই।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিকট থেকে বের হয়েছেন এমন সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর দাসী তাঁর নিকট দু'টি রুটি ও এক টুকরা গোশ্ত পাঠিয়ে দেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) ঐগুলো একটি বাসনে রেখে বলেনঃ 'আমি, আমার স্বামী ও সন্তানাদি সবাই ক্ষুধার্ত রয়েছি। কিন্তু আমরা সবাই ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই কাটিয়ে দেবো এবং আল্লাহর শপথ! আজ এগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কেই দিয়ে দেবো'। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ডেকে আনার জন্যে হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে তাঁর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। তিনি পথেই ছিলেন, সুতরাং ফিরে আসলেন।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলেনঃ 'আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন, আল্লাহ পাক কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন যা আমি আপনার জন্যে লুকিয়ে রেখেছি'। তিনি বলেনঃ 'হে আমার প্রিয় মেয়ে। নিয়ে এসো'। হযরত ফাতিমা (রাঃ) পাত্র খুলেই দেখেন যে, তা রুটি ও গোশ্তে পরিপূর্ণ রয়েছে। এ দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিতা হয়ে পড়েন। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি বুঝে নেন যে, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এতে বরকত দান করা হয়েছে। অতএব তিনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করতঃ ঐগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এনে হাযির করেন। তিনিও ঐগুলো দেখে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আমার প্রিয় মেয়ে! এগুলো কোথা হতে এলো'? তিনি বলেনঃ 'হে পিতঃ! এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসেছে। তিনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহ তা'আলার সমুদয় প্রশংসা যে, তিনি তোমাকে বানী ইসরাঈলের সমস্ত নারীর নেত্রীর মত করেছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কোন কিছু দান করতেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো তখন তিনি একথাই বলতেনঃ 'এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসেছে। তিনি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে নেন এবং তিনি, হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত সহধর্মিণী (রাঃ) ও আহলে বায়েত (রাঃ) পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করেন। তবুও আরও ততোটা বেঁচে গেলো যতটা পূর্বে ছিল। সেগুলো আশে-পাশের প্রতিবেশীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হলো। এই ছিলো আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে চরম বরকত ও দান।

৩৮। ঐ স্থানে যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিল; সে বলেছিল- হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন; নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

٣٨- هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ ۝

٣٩- فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৩৯। অতঃপর যখন সে 'মেহরাবের' মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন– তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবে। এবং সৎকর্মশালীগণের মধ্যে নবী হবে।

٤٠- قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

৪০। সে বলেছিল–হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার পুত্র হবে? এবং নিশ্চয়ই আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে ও আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি বললেন, এরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করে থাকেন।

٤١- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ○ ع

৪১। সে বলেছিল– হে আমার প্রভু! আমার জন্যে কোন নিদর্শন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না; আর স্বীয় প্রভুকে বিশেষভাবে স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) দেখেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আঃ)-কে অসময়ের ফল দান করছেন। শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফল তাঁর নিকট বিদ্যমান থাকছে। সুতরাং তিনিও স্বীয় বার্ধক্য ও স্বীয় সহধর্মিণীর বন্ধ্যাত্ব জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট অসময়ে ফল অর্থাৎ সুসন্তান লাভের প্রার্থনা জানাতে থাকেন। আর যেহেতু এটা বাহ্যতঃ অসম্ভব জিনিস ছিল, তাই তিনি অতি সন্তর্পণে এ প্রার্থনা জানান। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'নেদায়ান খাফীয়া' অর্থাৎ 'গোপন প্রার্থনা।' তিনি তাঁর ইবাদতখানাতেই ছিলেন, এমন সময় ফেরেশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলেনঃ 'আপনার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার নাম ইয়াহইয়া রাখতে হবে।' সাথে সাথে তাঁরা একথাও বলে দেনঃ 'এ সুসংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে।' ইয়াহইয়া নাম রাখার কারণ এই যে, তাঁর জীবন হবে ঈমানের সাথে। তিনি আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর সত্যতা প্রকাশ করবেন। হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের প্রথম স্বীকারকারীও হচ্ছেন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)'। হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি এই যে, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ঠিক হযরত ঈসা (আঃ)-এর পথের উপর ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মা প্রায়ই হযরত মারইয়াম (আঃ)-কে বলতেনঃ 'আমি আমার গর্ভের জিনিসকে দেখতে পাচ্ছি যে, সে তোমার গর্ভের জিনিসকে সিজদা করছে।' এটা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সত্যতা প্রকাশ তাঁর দুনিয়ায় আগমনের পূর্বেই। সর্বপ্রথম তিনিই হযরত ঈসা (আঃ) -এর সত্যতা অবগত হয়েছিলেন। তিনি বয়সে হযরত ঈসা (আঃ) অপেক্ষা বড় ছিলেন। سَيِّد শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশীল, বিদ্যা ও ইবাদতে অগ্রবর্তী, মুত্তাকী, ধর্ম শাস্ত্রবিদ, চরিত্রে ও ধর্মে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ক্রোধকে দমনকারী এবং ভদ্র। حَصُوْر শব্দের অর্থ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকদের নিকট আসতে পারে না, যার সন্তানাদি হয় না এবং যার মধ্যে কোন কামভাব থাকে না। এ অর্থের একটি মারফূ' হাদীসও মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ শব্দটি পাঠ করতঃ ভূমি হতে কিছু উঠিয়ে নিয়ে বলেন, 'তাঁর অঙ্গ ছিল এরূপ।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, 'সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে শুধুমাত্র ইয়াহইয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে নিষ্পাপরূপে সাক্ষাত করবেন। অতঃপর তিনি মাটি হতে কিছু উঠিয়ে নিয়ে বলেন, 'যার অঙ্গ এরূপ

হয় তাকে حَصُوْر বলে।' হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (রঃ) অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করেন। উপরে বর্ণিত মারফূ' বর্ণনা অপেক্ষা এ মাওকুফ বর্ণনাটি সনদ হিসেবে অধিকতর সঠিক। মারফূ' বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাপড়ের ঝালরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এরূপ ছিল।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি মাটি হতে একটা খড়কুটা উঠিয়ে নিয়ে ওর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'তাঁর অঙ্গ ছিল এই খড়কুটার মত।'

এরপর হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কে দ্বিতীয় শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর পুত্র নবী হবেন। এ সুসংবাদ পূর্বের সুসংবাদ হতেও অগ্রগণ্য। এ সুসংবাদ প্রাপ্তির পর হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর ধারণা হয় যে, এর বাহ্যিক কারণগুলো তো অসম্ভব, তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন, 'হে আমার প্রভু! আমি তো বার্ধক্যে পদার্পণ করেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, কাজেই আমার সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব'? ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'আল্লাহর নির্দেশই সব চেয়ে বড় । তাঁর নিকট কোনকিছু অসম্ভবও নয় এবং কঠিনও নয়। তিনি কোন কাজে অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই ইচ্ছে করেন সৃষ্টি করে থাকেন।' তখন হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন যাচ্ঞা করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়ঃ 'নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না। তুমি সুস্থ সবল থাকবে বটে কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হবে না। শুধুমাত্র ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ চালাতে হবে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে– ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا অর্থাৎ 'সুস্থতার সাথে তিন রাত'। (১৯ঃ ১০) এরপর বলা হচ্ছে– 'এ অবস্থায় খুব বেশী আল্লাহ তা'আলার যিকি্র করা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করা তোমার উচিত। সকাল-সন্ধ্যায় ঐ কাজেই লেগে থাকবে।' এর দ্বিতীয় অংশ এবং পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-মারইয়ামের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪২। এবং যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, ও মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন।

٤٢- وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ○

٤٣- يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪৩। হে মারইয়াম! তোমার প্রভুর ইবাদত কর এবং সিজদা কর ও রুকূ'কারীগণের সাথে রুকূ' কর।

٤٤- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪৪। এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি; এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে, তখন তুমি তাদের নিকটে ছিলে না; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ফেরেশতাগণ হযরত মারইয়াম (আঃ)-কে তাঁর অত্যাধিক ইবাদত, দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব, ভদ্রতা এবং শয়তানী কুধারণা হতে দূরে থাকার কারণে স্বীয় নৈকট্য লাভের যে মর্যদা দান করেছেন এবং সারা জগতের নারীদের উপর যে মনোনীত করেছেন তারই সুসংবাদ দিচ্ছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যতগুলো নারী উষ্ট্রে আরোহণ করেছে তাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে কুরাইশদের ঐ স্ত্রীলোকগুলো যারা নিজেদের শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রদর্শন করে এবং স্বামীদের দ্রব্যাদির পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান (আঃ) কখনও উষ্ট্রে আরোহণ করেননি।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'স্ত্রীলোকদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)।' জামেউত তিরমিযীর বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সারা জগতের নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান (আঃ), খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ) বিনতে মুহাম্মাদ (সঃ) এবং

ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ) তোমার জন্য যথেষ্ট।' অন্য হাদীসে রয়েছে যে, এ চারজন নারী সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে উত্তম। আর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'পুরুষদের মধ্যে বহু পূর্ণাঙ্গ পুরুষ রয়েছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তা নারী মাত্র তিনজন। তাঁরা হচ্ছেন– হযরত ইমরানের কন্যা হযরত মারইয়াম (আঃ), ফিরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (আঃ) এবং খুয়াইলিদের কন্যা হযরত খাদীজা (রাঃ)। আর হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ফযীলত নারীদের উপর এরূপ যেরূপ সারীদের (গোশতের ঝোলে ভিজান রুটির) ফযীলত সমস্ত আহার্যের উপর।' এ হাদীসটি সুনান-ই-আবূ দাউদ ছাড়া অন্যান্য সব হাদীসেই রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফের এ হাদীসে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। আমি এ হাদীসের সমস্ত সনদ এবং প্রত্যেক সনদের শব্দগুলো স্বীয় 'কিতাবুল বিদায়াহ্ ওয়ান্নিহায়াহ'-এর মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনায় জমা করেছি।

ফেরেশতাগণ বলেন, 'হে মারইয়াম! আপনি আপনার সময় বিনয় প্রকাশ এবং রুকূ' ও সিজদায় কাটিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় ক্ষমতার এক বিরাট নিদর্শন বানাতে চান। সুতরাং মহান আল্লাহর দিকে আপনার পূর্ণ মনঃসংযোগ করা উচিত। قُنُوْتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ -

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তাঁরই অধিকারে রয়েছে এবং প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত।' (৩০ঃ ২৬) মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই قُنُوْتٌ শব্দটি রয়েছে তারই ভাবার্থ হচ্ছে আনুগত্য স্বীকার।' ইবনে জারীরও (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু ওর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, 'হযরত মারইয়াম (আঃ) নামাযে এত অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর জানুদ্বয় ফোলে যেতো। قُنُوْتٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নামাযে এভাবেই লম্বা লম্বা রুকূ' করা।' হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'তোমার প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাক এবং যারা রুকূ' ও সিজদা করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।' হযরত আওযায়ী (রঃ) বলেন, 'হযরত মারইয়াম (আঃ) স্বীয় ইবাদত কক্ষে এত বেশী পরিমাণে ও এত বিনয়ের সাথে সুদীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়তেন যে, তাঁর পদদ্বয়ে হলদে পানি নেতে আসতো।'

এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! এসব ঘটনা তুমি জানতে না। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম। আমি তোমাকে না জানালে তুমি জনগণের নিকট এসব ঘটনা কি করে পৌঁছাতে? কারণ, যখন এসব ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তুমি তো তথায় উপস্থিত ছিলে না। কিন্তু আমি ঐগুলো তোমাকে এমনভাবে জানিয়ে দিলাম যে, যেন তুমি স্বয়ং তথায় ছিলে'। যখন হযরত মারইয়ামের লালন-পালনের ব্যাপার নিয়ে একে অপরের উপর অগ্রাধিকার লাভের চেষ্টা করছিল, সবাই ঐ পুণ্য লাভের আকাংখী ছিল, সে সময় তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মসজিদে উপস্থিত হন। সে সময় তথাকার সেবক ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই হযরত হারূনের (আঃ) বংশের লোকগণ। হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর মা তাঁদেরকে বলেনঃ 'আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমার এ কন্যাকে আল্লাহ তা'আলার নামে আযাদ করে দিয়েছি। সুতরাং আপনারা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন। এটা তো স্পষ্ট যে, সে একটি মেয়ে এবং ঋতুবর্তী মেয়েদের মসজিদে প্রবেশ যে নিষিদ্ধ এটাও কারও অজানা নেই। সুতরাং এর যা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা আপনারাই করুন। আমি কিন্তু একে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।' হযরত ইমরান (আঃ) তথাকার নামাযের ইমাম ও কুরবানীর পরিচালক ছিলেন। আর হযরত মারইয়াম (আঃ) ছিলেন তাঁরই কন্যা। কাজেই সবাই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্যে আগ্রহী ছিলেন। এ দিকে হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর অগ্রাধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন— 'এর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, আমি তার খালু। সুতরাং মেয়েটিকে আমারই পাওয়া উচিত'। কিন্তু অন্যেরা তাতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করা হয় এবং তাতে তাঁরা ঐসব লেখনী নিক্ষেপ করেন যেগুলো দিয়ে তাওরাত লিখতেন। এতে হযরত যাকারিয়ারই (আঃ) নাম উঠে। কাজেই তিনি ঐ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। অন্য বিস্তারিত বর্ণনায় এও রয়েছে যে, তাঁরা জর্দান নদীতে গিয়ে তাঁদের কলমগুলো পানিতে নিক্ষেপ করেন। কথা হয় যে, স্রোতের মুখে যাদের কলম চলতে থাকবে তারা নয় বরং যার কলম স্থির থাকবে সেই তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। অতঃপর তাঁরা কলমগুলো পানিতে নিক্ষেপ করলে সবারই কলম চলতে থাকে, শুধুমাত্র হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর কলম স্থির থাকে। বরং ওটা স্রোতের বিপরীত দিকে চলতে থাকে। কাজেই একে তো গুটিকায় তাঁর নাম উঠেছিল, দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তাছাড়া তিনি সবারই নেতা,

ইমাম, আলেম এবং সর্বোপরি নবী ছিলেন। অতএব তাঁরই উপরে হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

٤٥- اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৪৫। যখন ফেরেশতারা বলেছিল– হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ– সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্গত।

٤٦- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৪৬। আর সে দোলনা হতে ও পরিণত বয়সে লোকের সাথে কথা বলবে এবং সে পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٤٧- قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৭। সে বলেছিল–হে আমার প্রভু! কিরূপে আমার পুত্র হবে? কোন মানুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি; তিনি বললেন– এরূপে আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, সৃষ্টি করে থাকেন, যখন তিনি কোন কার্যের মনস্থ করেন, তখন তিনি ওকে 'হও' বলেন, ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।

ফেরেশতাগণ হযরত্ মারইয়াম (আঃ)-কে এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর একটি বড় খ্যাতিসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার كُنْ অর্থাৎ 'হও' শব্দ দ্বারা সৃষ্ট হবেন এবং مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ (৩ঃ ৩৯)-এর তাফসীর এটাই, যেমন জমহূর বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে।

তাঁর নাম হবে মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ্ (আঃ)। প্রত্যেক মুমিন তাঁকে এ নামেই চিনবে। তাঁর নাম মাসীহ্ হওয়ার কারণ এই যে, তিনি খুব বেশী পৃথিবীতে ভ্রমণ করবেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করার কারণ এই যে, তাঁর কোন পিতা ছিল না। ইহকালে ও পরকালে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মহা সম্মানিত ও তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার শরীয়ত ও কিতাব অবতীর্ণ হবে। দুনিয়ায় তাঁর উপর বড় বড় অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং পরকালেও তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ নবীদের মত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করবেন এবং সেই সুপারিশও গৃহীত হবে।

'তিনি স্বীয় দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে লোকদের সাথে কথা বলবেন।' অর্থাৎ তিনি শৈশবকালেই লোকদেরকে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করবেন যা তাঁর একটি অলৌকিক ঘটনারূপে গণ্য হবে। আর পরিণত বয়সেও যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করবেন তখন তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদনকারী হবেন। একটি হাদীসে রয়েছে যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন শুধুমাত্র হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত জুরায়েজের সঙ্গী। অন্য একটি হাদীসে অন্য একটি শিশুর কথা বলাও বর্ণিত আছে। তাহলে মাত্র এ তিনজন মানব শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন। হযরত মারইয়াম (আঃ) এ সুসংবাদ শুনে স্বীয় প্রার্থনার মধ্যেই বলেন, 'হে আমার প্রভু! আমার সন্তান কিরূপে হতে পারে? আমি তো বিয়ে করিনি এবং আমার বিয়ে করার ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া আমি দুশ্চরিত্রা মেয়েও নই'। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেশতাগণ উত্তর দেন যে, আল্লাহ পাকের নির্দেশই খুব বড় জিনিস। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই চান সৃষ্টি করে থাকেন। এ সূক্ষ্মতার বিষয় চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে يَفْعَلُ শব্দ ছিল, আর এখানে يَخْلُقُ শব্দ রয়েছে, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেন বাতিলপন্থীদের কোন সন্দেহ করার সুযোগ না থাকে এবং পরিষ্কার ভাষায় বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট। অতঃপর ওর উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করতঃ বলেন, 'তিনি যে কোন কাজ যখনই করার ইচ্ছে করেন তখন শুধুমাত্র বলেন, 'হও' আর তেমনই হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশের পর কার্য সংঘটিত হতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না'। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে–

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

অর্থাৎ 'আমার একবার নির্দেশমাত্রই অবিলম্বে চোখের পলকে ঐ কাজ হয়ে যায়, আমার দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন হয় না।' (৫৪: ৫০)

৪৮। তিনি তাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দেবেন।

٤٨- وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ

৪৯। আর তাকে ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্যে রাসূল করবেন; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে নির্দশনসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে মাটি হতে পক্ষীর আকার গঠন করবো, তৎপরে ওর মধ্য ফুৎকার দেব, অনন্তর আল্লাহর আদেশে ওটা পক্ষী হয়ে যাবে এবং জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যা ভক্ষণ কর ও তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখ— তদ্বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছি; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

٤٩- وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ۙ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

৫০। আর আমার পূর্বে তাওরাত হতে যা আছে এটা তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং তোমাদের জন্যে যা অবৈধ

٥٠- وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ

بَعْضَ الَّذِىْ حُـــرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِـــئْـــتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

হয়েছে– তার কতিপয় তোমাদের জন্যে বৈধ করবো ও আমি তোমাদের প্রভুর নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন এনেছি; অতএব আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও।

৫১- اِنَّ اللّٰـــهَ رَبِّــىْ وَرَبُّـــكُـمْ فَـــاعْـــبُـــدُوْهُ هٰذَا صِـــرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৫১। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু; অতএব তাঁর ইবাদত কর– এটাই সরল পথ।

ফেরেশতারা হযরত মারইয়াম (আঃ)-কে বলেনঃ 'আপনার ছেলেকে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন'। حِكْمَةٌ শব্দের তাফসীর সূরা-ই-বাকারায় হয়ে গেছে। আর আল্লাহ পাক তাঁকে তাওরাত শিক্ষা দেবেন যা হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁকে ইঞ্জীল শিক্ষা দেবেন যা তাঁর নিজের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ দু'টো কিতাব হযরত ঈসা (আঃ)-এর মুখস্থ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বানী ইসরাঈলের নিকট নবী করে পাঠাবেন, যেন তিনি তাদেরকে স্বীয় অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি গঠন করেন। অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দেন, আর তেমনই ওটা বাস্তব পাখী হয়ে তাদের সামনে উড়তে থাকে। এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমেই হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। বরং এটা তাঁর জন্যে একটা মু'জিযা ছিল। اَكْمَهُ ঐ অন্ধকে বলা হয় যে দিনে দেখতে পায় কিন্তু রাত্রে দেখতে পায় না। কেউ কেউ বলেন যে, اَكْمَهُ টেরা চক্ষু বিশিষ্ট লোককে বলা হয়। কারো কারো উক্তি এও রয়েছে যে, اَكْمَهُ ঐ অন্ধকে বলা হয় যে মায়ের গর্ভ হতেই অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এখানে এ অনুবাদই যথোপযুক্ত হবে। কেননা, এর দ্বারাই অলৌকিকতার পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং বিরুদ্ধবাদীকে অসমর্থ করার জন্যে এটাই উত্তম পন্থা। اَبْرَصُ শ্বেত কুষ্ঠকে বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত ঈসা (আঃ) এ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকেও নিরাময় করে দিতেন। আল্লাহ পাকের হুকুমে তিনি মৃতকেও জীবিত করতেন। অধিকাংশ আলেমের

উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগের নবীকে যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ মু'জিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদুর খুব প্রচলন ছিল এবং যাদুকরদেরকে অত্যন্ত সম্মান করা হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এমন মু'জিযা দান করেন যে, যাদুকরগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা কখনও যাদু হতে পারে না, বরং এটা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর একটা বড় দান। অতএব তারা অবনত মস্তকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবশেষে তারা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগটা ছিল চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের যুগ। তথায় তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে এমন মু'জিযা দান করেন যার সামনে ঐ বড় বড় চিকিৎসকগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জন্মান্ধকে চক্ষু দান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ দেয়া এবং সমাধিস্থ ব্যক্তিকে জীবিত করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির রয়েছে? একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মু'জিযা রূপে তাঁর দ্বারা এ সমুদয় কার্য সাধিত হয়। অনুরূপভাবে যে যুগে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে সেটা ছিল সাহিত্য, কবিতা ও বাকপটুতার যুগ। এসব বিষয়ে খ্যাতনামা কবিগণ এমন পূর্ণতা অর্জন করেছিল যে, সারা দুনিয়া তাদের সামনে মাথা হেঁট করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এমন এক গ্রন্থ দান করলেন যার ঔজ্জ্বল্যের সামনে তাদের সমস্ত দীপ্তি ম্লান হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, এটা মানুষের কথা নয়। সারা বিশ্বের সামনে জোরে শোরে বারবার ঘোষণা করা হয়–এরূপ কথা বলতে পারে এমন কেউ আছে কি? একা একা নয় বরং তোমরা সবাই মিলিত হয়ে যাও, শুধু মানব নয় বরং দানবদেরকেও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, অতঃপর পুরো কুরআনের সমান নয়, শুধুমাত্র ওর মত দশটি সূরা আনয়ন কর। আচ্ছা এও যদি সম্ভব না হয় তবে ওর মত একটি সূরাই নিয়ে এসো। কিন্তু তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে, সাহস হারিয়ে যায়, কণ্ঠরোধ হয়ে যায়, বাকশক্তি লোপ পায় এবং আজ পর্যন্ত সারা বিশ্ব এ কাজে অসমর্থই রয়েছে, আর কিয়ামত পর্যন্ত অসমর্থ থেকেও যাবে। কোথায় আল্লাহ পাকের কালাম এবং কোথায় মানব ও দানবের কথা? সুতরাং এ যুগ হিসেবে এ মু'জিযা ক্রিয়াশীল হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতেই হয়। তারা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর আরও মু'জিয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তিনি বলেছিলেন এবং করেও দেখিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ বাড়ীতে যা কিছু খেয়ে এসেছে এবং আগামীকালের জন্যে সে যা কিছু জমা করে রেখেছে, আল্লাহর হুকুমে আমি তা বলে দিতে পারবো। এতে আমার সত্যবাদীতার দলীল রয়েছে, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা চরম সত্য। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানই না থাকে তবে আর কি হবে? আমি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে স্বীকার করছি এবং দুনিয়ায় ওর সত্যতার কথা ঘোষণা করছি। আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলো জিনিস বৈধ করতে এসেছি যেগুলো আমার পূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাওরাতের কতগুলো বিধান রহিত করেছেন। কয়েকজন তাফসীরকারের ধারণা এর বিপরীত হলেও এটাই সঠিক কথা। কোন কোন মনীষী বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাওরাতের কোন বিধান রহিত করেননি। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে, কতগুলো বৈধ জিনিসে যে মতভেদ ছিল এবং তা বৃদ্ধি পেতে পেতে অবৈধতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, হযরত ঈসা (আঃ) ঐগুলোর যথার্থতা বর্ণনা করতঃ ঐগুলোর বৈধতার উপর শীল (মোহর) মেরে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ

অর্থাৎ 'তোমরা যে ব্যাপারে পরস্পর মতভেদ করছো আমি তোমাদের জন্যে তার মীমাংসা করে দেবো।'(৪৩ঃ ৬৩)

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'আমার নিকট আমার সত্যবাদিতার উপর আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, আমার কথা মান্য কর এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। আর এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ।'

৫২– فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ

৫২। অনন্তর যখন ঈসা তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ করলো তখন সে বললো– আল্লাহর উদ্দেশ্যে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ বললো, আমরাই

اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

৫৩- رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৫৩। হে আমাদের প্রভু! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন–আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি; অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন।

৫৪- وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

৫৪। আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহ কৌশল করলেন এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা (আঃ) তাদের একগুঁয়েমী ও বিবাদ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা হঠকারিতা হতে ফিরে আসবে না তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহর উপর আমার আনুগত্য স্বীকারকারী কেউ আছে কি?’ আবার ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, ‘এমন কেউ আছে কি যে আল্লাহর সাথে আমার সাহায্যকারী হতে পারে?’ কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী যুক্তিযুক্ত। বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার দিকে মানুষকে আহ্বানের কাজে কেউ আমার হাত শক্তকারী আছে কি?’ যেমন আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করার পূর্বে হজ্বের মৌসুমে বলেছিলেন, ‘কুরাইশরা তো আমাকে আল্লাহর কালাম প্রচারের কার্যে বাধা দিচ্ছে, এমতাবস্থায় এ কার্যের জন্যে আমাকে জায়গা দিতে পারে এমন কেউ আছে কি?’ মদীনাবাসী আনসারগণ এ সেবার কার্যে এগিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জায়গা দান করেন। তাঁরা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যও করেন এবং যখন তিনি তাঁদের নিকট গমন করেন তখন তাঁরা পুরোপুরি তাঁর সহযোগিতা করেন এবং তাঁর প্রতি তুলনাবিহীন সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। দুনিয়ার সাথে মোকাবিলায় তাঁরা নিজেদের বক্ষকে নবী (সঃ)-এর জন্য ঢাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হিফাযতে, মঙ্গল কামনায় ও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কাজে তাঁদের আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের

প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ আহ্বানেও কতক বানী ইসরাঈল সাড়া দেয়, তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁকে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। আর তারা ঐ আলোকের অনুসরণ করে যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন, অর্থাৎ ইঞ্জীল। এ লোকগুলো ধোপা ছিল এবং তাদের সাদা কাপড়ের কারণেই তাদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হতো। কেউ কেউ বলেন যে, তারা শিকারী ছিল। তবে সঠিক কথা এই যে, সাহায্যকারীকে 'হাওয়ারী' বলা হয়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ 'আমার জন্যে স্বীয় বক্ষকে ঢাল করতে পারে এরূপ কেউ আছে কি?' এ শব্দ শুনামাত্রই হযরত যুবায়ের (রাঃ) প্রস্তুত হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয় বার একথাই বলেন, এবারেও হযরত যুবায়ের (রাঃ) অগ্রসর হন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক নবীরই 'হাওয়ারী' (সাহায্যকারী) থাকে এবং আমার 'হাওয়ারী' হচ্ছে হযরত যুবায়ের (রাঃ)'।

এ লোকগুলো তাদের প্রার্থনায় বলে, 'হে আমাদের প্রভু! সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতের মধ্যে নাম লিখে নেয়া। এ তাফসীরের বর্ণনা সনদ হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট। অতঃপর বানী ইসরাঈলের ঐ অপবিত্র দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রাণের শত্রু ছিল। তারা তাঁকে হত্যা করার ও শূলে চড়াবার ইচ্ছে করেছিল। সেই যুগের বাদশাহর কাছে তারা তাঁর দুর্নাম করতো। তারা বাদশাহকে বলতো, 'এ লোকটি জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছে, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করছে।' বরং তারা তাঁকে দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, প্রতারক প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল এমনকি তাঁকে ব্যভিচারিণীর পুত্র বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। অবশেষে বাদশাহও তাঁর জীবনের শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বলে, 'তাকে ধরে এনে ভীষণ শাস্তি প্রদান করতঃ ফাঁসি দিয়ে দাও।'

অতঃপর তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সৈন্যগণ তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সে বাড়ী পরিবেষ্টন করে তার ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের হাত হতে বাঁচিয়ে নেন এবং তাঁকে ঐ ঘরের ছিদ্র দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন। আর তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি লোককে তথায় নিক্ষেপ করেন, যে সে ঘরেই অবস্থান করছিল। ঐ লোকগুলো রাত্রির অন্ধকারে তাকেই হযরত ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে তারা কঠিন শাস্তি দেয়

এবং তার মস্তকোপরি কাঁটার টুপি রেখে দিয়ে শূলে চড়িয়ে দেয়। এটাই ছিল তাদের সাথে মহান আল্লাহর কৌশল যে, তাদের ধারণায় তারা আল্লাহ তা'আলার নবী (আঃ)-কে ফাঁসি দিয়েছে, অথচ আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ দুষ্কার্যের ফল তারা এই প্রাপ্ত হয়েছিল যে, চিরদিনের মত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা মিথ্যা ও অন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়াতেও তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। ওরই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা ষড়যন্ত্র করলে হবে কি? আল্লাহ তা'আলার কৌশলের কাছে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাবে। তিনিই সবচেয়ে বড় কৌশলী।

---

৫৫ - إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰىٓ إِنِّىْ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

৫৫। যখন আল্লাহ বললেন– হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করবো ও তোমাকে উত্তোলন করবো এবং অবিশ্বাসকারীগণ হতে তোমাকে পবিত্র করবো, আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিবস পর্যন্ত সমুন্নত করবো; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করবো।

৫৬ - فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৫৬। অনন্তর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, বস্তুতঃ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো, এবং তাদের জন্যে কেউ সাহায্যকারী নেই।

৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকার্যাবলী সম্পাদন করেছে ফলতঃ তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আল্লাহ অত্যাচারীগণকে ভালবাসেন না।

٥٧- وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫৮। আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি করছি।

٥٨- ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

হযরত কাতাদাহ (রঃ) প্রভৃতি ব্যাখ্যা দানকারীগণের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নেবো, অতঃপর তোমাকে মৃত্যুদান করবো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'আমি তোমাকে মত্যুদানকারী'। হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উঠাবার সময় দিনের প্রথমভাগে তিন ঘন্টা পর্যন্ত মৃত্যু দান করেছিলেন। হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, খ্রীষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাত ঘন্টা পর্যন্ত মৃত্যুর অবস্থায় রেখেছিলেন। পরে তাঁকে জীবিত করে উঠিয়ে নেন। হযরত অহাব (রঃ) বলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তিনি মৃত ছিলেন। পরে আল্লাহ পাক তাঁকে জীবন দান করে উঠিয়ে নেন।

হযরত মাতরুল ওয়ারাক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উত্তোলনকারী।' এখানে وَفَاتٌ শব্দের ভাবার্থ মৃত্যু নয়।' অনুরূপভাবে ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে تَوَفِّيْ শব্দের অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে وَفَاتٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নিদ্রা। যেমন কুরআন হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

هُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ

অর্থাৎ 'তিনি সেই আল্লাহ যিনি রাত্রে তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়ে থাকেন'। (৬ঃ৬০) আর এক স্থানে রয়েছেঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ

অর্থাৎ 'আল্লাহ প্রাণকে তার মৃত্যুর সময় উঠিয়ে নেন এবং যে প্রাণ মরে যায় না তাকে তার নিদ্রার সময় (উঠিয়ে নেন)।' (৩৯ঃ ৪২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে বলতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا

অর্থাৎ 'সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় জীবিত করলেন'। আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেনঃ 'তাদের অবিশ্বাসের কারণে এবং হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর উপর বড় অপবাদ দেয়ার ফলে এবং এই কারণে যে, তারা বলে– আমরা মারইয়াম নন্দন ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলীও দেয়নি বরং তাদের জন্যে তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা নিশ্চিতরূপে তাকে হত্যা করেনি' এ পর্যন্ত। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং সে কিয়ামতের দিন তাদের উপর সাক্ষী হবে। مَوْتِهٖ শব্দের ' ه ' সর্বনামটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন কিতাবী সবাই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই আসছে। সে সময় সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে। কেননা, না তিনি জিজিয়া কর গ্রহণ করবেন, না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু সমর্থন করবেন। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ-এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঘুম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সে অবস্থাতেই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিয়ে কাফিরদের হাত হতে পবিত্র করবো এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করবো।' বাস্তবে হয়েছিলও তাই। যখন আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেন তখন তাঁর পরে তাঁর সঙ্গী সাথীদের কয়েকটি দল হয়ে যায়। একটি দল হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলে স্বীকার করে, আর তারা একথাও স্বীকার করে যে,

তিনি মহান আল্লাহর এক দাসীর পুত্র। তাদের মধ্যে আর একটি দল সীমা অতিক্রম করে বসে এবং তারা বলে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ) অন্য একটি দল স্বয়ং তাঁকেই আল্লাহ বলে। আবার একদল তিন আল্লাহর মধ্যে তাঁকে এক আল্লাহ বলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা খণ্ডনও করেছেন। তিনশ বছর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকে। তারপর গ্রীক রাজাদের মধ্যে কুসতুনতান নামক একজন রাজা, যে একজন দার্শনিক ছিল, বলা হয় যে, শুধুমাত্র হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বীনকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই এক কৌশল অবলম্বন করতঃ কপটতার আশ্রয় নিয়ে এ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। মোটকথা সে সময় ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সে ওর ভেতর হ্রাস বৃদ্ধিও আনয়ন করেছিল। সে বহু আইন কানুন আবিষ্কার করেছিল। 'আমান-ই-কুবরা'ও তারই আবিষ্কার, যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম বিশ্বাস ভঙ্গতা। সে তার যুগে শূকরকে বৈধ করে নিয়েছিল। তারই আদেশে খ্রীষ্টানগণ পূর্বমুখী হয়ে নামায পড়তে থাকে। সে-ই গীর্জা, উপাসনালয় প্রভৃতির মধ্যে ছবি বানিয়ে নেয় এবং নিজের এক পাপের কারণে রোযার মধ্যে দশটি রোযা বেশী করে। মোটকথা তার যুগে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম ঈসায়ী ধর্মরূপে অবশিষ্ট ছিল না বরং ওটা 'দ্বীন-ই-কুসতুনতীনে' পরিণত হয়েছিল। সে বাহ্যিক যথেষ্ট জাঁকজমক এনেছিল, যেমন সে বারো হাজারেরও বেশী উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল এবং নিজের নামে একটি শহর বসিয়েছিল। মালেকিয়্যাহ দলটি তার সমস্ত কথা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এসব জঘন্য কার্য সত্ত্বেও তারা ইয়াহূদীদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই কাফির হলেও তুলানামূলকভাবে ঐ খ্রীষ্টানরাই সত্য ও ন্যায়ের বেশী নিকটবর্তী ছিল। তাদের সবারই উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তাঁর মনোনীত রাসূল করে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন জনগণ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের ঈমান ছিল আল্লাহর সত্তার উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নবীগণের (আঃ) সত্যানুসারী এরাই ছিল অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী (সঃ)। কেননা, এরা নিরক্ষর, আরবী, সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল যিনি ছিলেন বানী আদমের নেতা। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শিক্ষা ছিল সমস্ত সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নবীর সত্যানুসারীদেরকে 'আমার উম্মত' বলার দাবীদার ছিলেন তিনিই।

কারণ, যারা নিজেদেরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করতো তারা ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছিল। তা ছাড়া শেষ নবী (সঃ)-এর ধর্মও ছিল পূর্বের সমস্ত শরীয়তকে রহিতকারী। এ ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষিত থাকবে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশও পরিবর্তিত হবে না। এ জন্যই এ আয়াতের অঙ্গীকার অনুসারে মহান আল্লাহ এ উম্মতকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং এরা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এ 'উম্মতে মুহাম্মদী'ই বহু দেশ পদদলিত করে, বড় বড় অত্যাচারী ও শক্তিশালী কাফিরদের মস্তক ছিন্ন করে। অর্থ-সম্পদ তাদের পদতলে গড়িয়ে পড়ে। বিজয় ও গানিমত তাদের পদ-চুম্বন করে। বহু যুগের পুরাতন সাম্রাজ্যের সিংহাসনগুলো এরা পরিবর্তন করে দেয়। পারস্য সম্রাট কিসরার জাঁকজমক পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং তার সুন্দর সুন্দর উপাসনাগারগুলো এদের হাতে বিদ্ধস্ত হয়ে যায়। রোমান সম্রাট কায়সারের মুকুট ও সিংহাসন এ মুসলিমবাহিনীর আক্রমণে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে। এরাই ঐ খ্রীষ্টানদেরকে মাসীহ পূজার স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দেয়। তাদের ধন-ভাণ্ডার মুসলমানেরা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সত্য নবী (সঃ)-এর ধর্মের প্রসার কার্যে প্রাণ খুলে খরচ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অঙ্গীকার মানুষ উদীয়মান সূর্য ও পূর্ণিমার চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুর্নামকারীরা এবং তাঁর নামে শয়তানের পূজারীরা বাধ্য হয়ে সিরিয়ার শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং কোলাহলময় শহরগুলো এক আল্লাহর বন্দেগীকারীদের হাতে সমর্পণ করতঃ অসহায় অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে রোমক সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরে তথা হতে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে বের করে দেয়া হয় এবং অবশেষে তারা স্বীয় বাদশাহর বিশেষ শহর কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে। অতঃপর সেখান হতেও তাদেরকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ইনশাআল্লাহ মুসলমানেরা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর বিজয়ীই থাকবে। সমস্ত সত্যবাদীর নেতা যাঁর সত্যবাদিতার উপর মহান আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সংবাদ দিয়েই দিয়েছেন যা চিরদিন অটল থাকবে, তিনি বলেন যে, তাঁর উম্মত কনস্টান্টিনোপল জয় করবে এবং তথাকার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাদের অধিকারে এসে যাবে। রোমকদের সঙ্গেও তাদের এমন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে যার তুলনা দুনিয়ায় নেই। আমি এগুলো একটি পৃথক পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছি।

আল্লাহ তা'আলার পরবর্তী উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যেসব ইয়াহূদী হযরত ঈসা (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছিল এবং যেসব খ্রীষ্টান তাঁর সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলেছিল, দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয়েছে এবং তাদের ধন-মাল ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তাদের উপর পার্থিব শাস্তি নেমে এসেছে। আর পরকালে তাদের জন্যে যেসব শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও তাদের চিন্তা করা উচিত। যেখানে তাদেরকে না কেউ রক্ষা করতে পারবে, না কেউ কোন সাহায্য করতে পারবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। দুনিয়াতেও তাদেরকে বিজয়, সাহায্য ও সম্মান দান করবেন এবং পরকালেও তারা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর জন্মের প্রাথমিক অবস্থার প্রকৃত রহস্য এটাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফুয হতে অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই। যেমন সূরা-ই-মারইয়ামে বলেছেনঃ 'এটাই ঈসা ইবনে মারইয়াম, এটাই প্রকৃত রহস্য যে ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করছিলে, তাঁর (আল্লাহর) সন্তান হওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। তিনি এটা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছে করেন তখন শুধু বলেন, 'হও' আর তেমনই হয়ে যায়'।

এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

৫৯। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন, তৎপর বললেন, হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল।

٥٩- إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ○

৬০। এ বাস্তব ঘটনা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

٦٠- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ○

٦١- فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَٰذِبِينَ ۝

৬১। অনন্তর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে– তার পরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বল– এসো আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি– তৎপরে প্রার্থনা করি যে, অসত্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।

٦٢- إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৬২। নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ ব্যতীত মা'বূদ নেই, নিশ্চয়ই সেই আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

٦٣- فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝ ع

৬৩। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ দুষ্কার্যকারীদের ব্যাপারে পরিজ্ঞাত আছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন– 'হযরত ঈসা (আঃ)-কে আমি বিনা বাপে সৃষ্টি করেছি বলেই তোমরা খুব বিস্ময়বোধ করছো? তার পূর্বে তো আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি, অথচ তার বাপও ছিল না, মাও ছিল না। বরং তাঁকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম– 'হে আদম! তুমি 'হও', আর তেমনি সে হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাপ-মায়ে সৃষ্টি করতে পেরেছি তখন শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন কাজ? সুতরাং শুধু বাপ না হওয়ার কারণে যদি হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখতে পারে, তবে তো হযরত আদম আদম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র

হওয়ার আরও বেশী দাবীদার। (নাউজুবিল্লাহে) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার কর না। কাজেই হযরত ঈসা (আঃ)-কে এ মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উত্তম। কেননা, পুত্রত্বের দাবীর অসারতা ওখানের চাইতে এখানেই বেশী স্পষ্ট। কারণ এখানে তো মা আছে কিন্তু ওখানে মা ও বাপ কেউ ছিল না। এগুলো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদম (আঃ)-কে নারী পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হযরত হাওয়া (আঃ)-কে শুধু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন'। যেমন 'সূরা-ই-মারইয়ামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ 'আমি তাকে (ঈসা আঃ-কে) মানুষের জন্যে আমার ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়েছি।' (১৯ঃ ২১) আর এখানে বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা এটাই। এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থানই নেই। কেননা, সত্যের পরে পথভ্রষ্টতারই স্থান। সুতরাং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্দেহ পোষণ করা মোটেই উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 'এরূপ স্পষ্ট বর্ণনার পরেও যদি কোন লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি তাদেরকে 'মুবাহালার' (পরস্পর বদ দু'আ করার) জন্যে আহবান করতঃ বল– 'এসো আমরা উভয় দল আমাদের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে মুবাহালার জন্যে বেরিয়ে যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ষণ করুন'।

'মুবাহালা'য় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণ। ঐলোকগণ এখানে এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার এবং তাঁর পুত্র। (নাউজুবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন ও তাদের কথার উত্তরে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে ইসহাক স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব 'সীরাতে' লিখেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও নিজ নিজ পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খ্রীষ্টানগণ প্রতিনিধি হিসেবে ষাটজন লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করে, যাদের মধ্যে চৌদ্দজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলঃ (১) আকিব, যার

নাম ছিল আবদুল মাসীহ, (২) সায়্যেদ, যার নাম ছিল আইহাম, (৩) আবূ হারিসা ইবনে আলকামা, যে ছিল বাকর ইবনে অয়েলের ভাই, (৪) ওয়ারিস ইবনে হারিস, (৫) যায়েদ, (৬) কায়েস, (৭) ইয়াযীদ, (৮) ও (৯) তার দু'টি পুত্র (১০) খুয়াইলিদ, (১১) আমর, (১২) খালিদ, (১৩) আবদুল্লাহ এবং (১৪) মুহসীন।

এ চৌদ্দজন ছিল তাদের নেতা এবং এদের মধ্যে আবার তিনজন বড় নেতা ছিল। তারা হচ্ছেঃ (১) আকিব, এ লোকটি ছিল কওমের আমীর এবং তাকে জ্ঞানী ও পরামর্শদাতা হিসেবে গণ্য করা হতো, আর তার অভিমতের উপরেই জনগণ নিশ্চিন্ত থাকতো। (২) সায়্যেদ, এ লোকটি ছিল তাদের একজন বড় পাদরী ও উঁচু দরের শিক্ষক। সে বানূ বাকর ইবনে ওয়েলের আরব গোত্রভুক্ত ছিল। কিন্তু সে খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। রোমকদের নিকট তার খুব সম্মান ছিল। তারা তার জন্যে বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করেছিল। তার ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে তারা অত্যন্ত খাতির সম্মান করতো। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিল। কারণ, সে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে তাঁর বিশেষণ সম্বন্ধে পড়েছিল। অন্তরে সে তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করতো। কিন্তু খ্রীষ্টানদের নিকট তাঁর যে খাতির-সম্মান ছিল তা লোপ পেয়ে যাওয়ার ভয়ে সে সুপথের দিকে আসতো না এবং (৩) হারিসা ইবনে আলকামা। মোটকথা এ প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয় এবং সে সময় তিনি আসরের নামায সমাধা করে মসজিদে বসেছিলেন। এ লোকগুলো মূল্যবান পোষাক পরিহিত ছিল এবং তাদের গায়ে ছিল সুন্দর ও নরম চাদরসমূহ। তাদেরকে দেখে বানূ হারিস ইবনে কা'বের বংশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, ওদের পরে ঐরকম জাঁকজমকপূর্ণ আর কোন প্রতিনিধি কখনও আসেনি। তাদের নামাযের সময় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুমতিক্রমে তারা মসজিদে নববীতেই পূর্ব দিকে মুখ করে তাদের নিয়মানুযায়ী নামায আদায় করে নেয়। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাদের আলোচনা শুরু হয়।

মুখপাত্র হিসেবে নিম্নের তিনজনই কথা বলছিলঃ (১) হারেসা ইবনে আলকামা, (২) আকিব অর্থাৎ আবদুল মাসীহ এবং (৩) সায়্যেদ অর্থাৎ আইহাম। এরা শাহী মাযহাবের লোক ছিল বটে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ রাখতো। হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের তিনটি ধারণা ছিল। অর্থাৎ তিনি

নিজেই আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং তিন আল্লাহর মধ্যে এক আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপবিত্র কথা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় সমস্ত খ্রীষ্টানেরই এ বিশ্বাস। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আল্লাহ হওয়ার দলীল তাদের নিকট এই ছিল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, অন্ধদেরকে চক্ষু দান করতেন, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করতেন, ভবিষ্যতের সংবাদ দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখী তৈরী করতঃ ওর মধ্যে ফুঁদিয়ে উড়িয়ে দিতেন। এর উত্তর এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই এ সমস্ত কাজ তাঁর দ্বারা প্রকাশ পেতো। কারণ এই যে, যেন তাঁর কথা সত্য হওয়ার উপর এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের উপর তাঁর নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যাঁরা তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো তাদের দলীল এই যে, তাঁর পিতা ছিল না এবং তিনি দোলনা হতে কথা বলেছেন, যা তাঁর পূর্বে কখনও ঘটেনি। আর তিন আল্লাহর তৃতীয় আল্লাহ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালাম পাকে বলেছেনঃ "আমরা করেছি, আমাদের নির্দেশ, আমাদের সৃষ্ট, আমরা মীমাংসা করেছি ইত্যাদি।" সুতরাং যদি আল্লাহ একজনই হতেন তবে এরূপ না বলে বরং বলতেনঃ 'আমি করেছি, আমার নির্দেশ, আমার সৃষ্ট, আমি মীমাংসা করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তিনজন। একজন স্বয়ং আল্লাহ, দ্বিতীয় জন হযরত মারইয়াম এবং তৃতীয় জন হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা ঐ অত্যাচারী ও কাফিরদের কথা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাদের এসব কথার অসারতা প্রকাশক আয়াত কুরআন মাজীদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ তিনজন পাদরীর সাথে আলোচনা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 'তোমরা মুসলমান হয়ে যাও।' তখন তারা বলেঃ 'আমরা তো স্বীকারকারী রয়েছিই।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না, না, তোমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছি।' তারা বলে, 'আমরা তো আপনার পূর্বেকার মুসলমান।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না, তোমাদের এ ইসলাম গ্রহণীয় নয়। কেননা, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তান সাব্যস্ত করে থাক, ক্রুশের পূজো কর এবং শূকর খেয়ে থাক।' তারা বলে, 'আচ্ছা, তাহলে বলুন তো হযরত ঈসা (আঃ)-এর পিতা কে ছিলেন?' এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকেন এবং প্রথম হতে আশিটিরও বেশী আয়াত তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) এগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর বর্ণনা করার পর লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এ আয়াতগুলো পাঠ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। মুবাহালার আয়াতটি পাঠ করতঃ তাদেরকে বলেনঃ 'তোমরা যদি স্বীকার না কর তবে এসো আমরা 'মুবাহালা'য় বের হই। এ কথা শুনে তারা

বলে, 'হে আবুল কাসিম (সঃ)! আমাদেরকে কিছুদিন সময় দেন। আমরা পরস্পর পরামর্শ করে আপনাকে এর উত্তর দেবো।' তখন তারা নির্জনে বসে আ'কবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে যাকে তাদের মধ্যে বড় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মনে করা হতো। সে তার শেষ সিদ্ধান্তের কথা নিম্ন লিখিত ভাষায় স্বীয় সঙ্গীদেরকে শুনিয়ে দেয়, "হে খ্রীষ্টানের দল! তোমরা নিশ্চিতরূপে এটা জেনে নিয়েছো যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল। তোমরা এটাও জান যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূলতত্ত্ব তাই যা তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুখে শুনেছো। আর তোমরা এটাও খুব ভাল জান যে, যে সম্প্রদায় নবীর সাথে পরস্পর অভিসম্পাত দেয়ার কাজে অংশ নেয় সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় কেউ বাকি থাকে না বরং সবাই সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। যদি তোমরা 'মুবাহালা'র জন্যে অগ্রসর হও তবে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করে নাও। আর যদি তোমরা কোনক্রমেই এ ধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হও এবং ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণা রয়েছে ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও তবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাঁথে সন্ধি করতঃ স্বদেশে ফিরে যাও।" অতএব তারা এ পরামর্শ করতঃ নবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেঃ 'হে আবুল কাসিম (সঃ)! আমরা আপনার সাথে 'মুবাহালা' করতে প্রস্তুত নই। আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন এবং আমরা আমাদের ধারণার উপর রয়েছি। কিন্তু আপনি আমাদের সাথে আপনার সহচরদের মধ্যে হতে এমন একজনকে প্রেরণ করুন যাঁর উপর আপনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি আমাদের আর্থিক বিবাদের মীমাংসা করে দেবেন। আপনারা আমাদের দৃষ্টিতে খুবই পছন্দনীয়।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ 'আচ্ছা, তোমরা দুপুরে আবার এসো। আমি একজন খুব বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তোমাদের সাথে পাঠিয়ে দেবো।' হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি এদিন ছাড়া অন্য কোন দিন নেতা হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করিনি শুধুমাত্র এ আশায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে গুণের প্রশংসা করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমিই যেন ঐ গুলোর অধিকারী হতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি সেদিন খুব সকাল সকাল যোহরের নামাযের জন্যে বেরিয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে আগমন করতঃ যোহরের নামায পড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি ডানে বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমি বারবার আমার জায়গায় উঁচু হতে থাকি যে, যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টি আমার প্রতি নিপতিত হয়। তিনি মনযোগের সাথে দেখতেই থাকেন। অবশেষে তার দৃষ্টি হযরত আবূ উবাইদাই ইব্নুল জাররাহ্ (রাঃ)-এর

প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। তাঁকে তিনি ডেকে বলেনঃ 'এদের সাথে গমন কর এবং সত্যের সাথে তাদের মতবিরোধের মীমাংসা করে দাও।' সুতরাং তিনি তাদের সাথে গমন করেন। 'ইবনে মীরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থের মধ্যেও এ ঘটনাটি এভাবেই নকল করা হয়েছে, কিন্তু তথায় নেতৃবর্গের সংখ্যা রয়েছে বারজন এবং এ ঘটনার মধ্যে কিছু দীর্ঘতাও রয়েছে, তাছাড়া কিছু বেশী কথাও আছে।

সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দু'জন নেতা আ'কিব ও সায়্যেদ 'মুবাহালা'র জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। কিন্তু একজন অপরজনকে বলেঃ 'এ কাজ করো না। আল্লাহর শপথ! যদি ইনি নবী হন আর আমরা তাঁর সাথে 'মুবাহালা' করি তবে আমরা আমাদের সন্তানাদিসহ ধ্বংস হয়ে যাব।' সুতরাং তারা একমত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ 'জনাব! আপনি আমাদের নিকট যা চাইবেন আমরা তা প্রদান করবো। আপনি আমাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করুন এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত লোককেই পাঠাতে হবে।' তিনি বলেনঃ 'তোমাদের সাথে আমি পূর্ণ বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করবো।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাকে নির্বাচন করেন এটা দেখার জন্যে তাঁর সহচরবর্গ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেনঃ 'হে আবূ উবাইদাহ! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।' তিনি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এ লোকটিই এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।'

সহীহ বুখারী শরীফের অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রত্যেক উম্মতের বিশ্বস্ত লোক থাকে এবং এ উম্মতের বিশ্বস্ত লোক হচ্ছে হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্নুল জাররাহ (রাঃ)।' মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত আবূ জেহেল বলেছিলঃ 'যদি আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে কাবায় নামায পড়তে দেখতাম তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।' বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদি সে এরূপ করতো তবে সবাই দেখতে পেত যে, ফেরেশতাগণ তারই গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন এবং যদি ইয়াহূদীরা মৃত্যুর আখাঙ্ক্ষা করতো তবে অবশ্যই তাদের মৃত্যু এসে যেতো, আর তারা তাদের স্থান জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখে নিতো। যেসব খ্রীষ্টানকে মুবাহালার জন্যে আহবান করা হয়েছিল, যদি তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মুবাহালার জন্যে বের হতো তবে তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ ও ছেলে মেয়েকে পেতো না।

সহীহ্ বুখারী, জামেউত তিরমিযী এবং সুনানে নাসাঈর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম বায়হাকীও (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'দালাইলুন্নবুওয়াহ্'-এর মধ্যে নাজরান হতে আগত খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদের ঘটনাটি সুদীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে ওটা নকল করছি। কেননা, এতে বহু উপকার রয়েছে। তবে এতে দুর্বলতাও আছে। কিন্তু এ স্থানের সাথে এর যথেষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। সালমা ইবনে আবদ্ ইয়াসু' স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি পূর্বে খ্রীষ্টান ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, طس سليمان অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নাজরান বাসীর নিকট একখানা পত্র লিখেন যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

"بِاسْمِ اِلٰهِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى اَسْقُفَ نَجْرَانَ وَاَهْلِ نَجْرَانَ اَسْلِمْ اَنْتُمْ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكُمْ اِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكُمْ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَاَدْعُوْكُمْ اِلٰى وِلَايَةِ اللّٰهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعِبَادِ فَاِنْ اَبَيْتُمْ فَالْجِزْيَةُ فَاِنْ اَبَيْتُمْ فَاٰذَنْتُكُمْ بِالْحَرْبِ وَالسَّلَامُ"

অর্থাৎ 'এ পত্রটি আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর মা'বূদের নামে আরম্ভ করছি। এটা আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে নাজরানের বাদশাহ ও ওর অধিবাসীর নিকট। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আমি তোমাদের সামনে হযরত ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকবুব (আঃ)-এর প্রভুর প্রশংসা করছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বান্দার উপাসনা ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি এবং আমি তোমাদেরকে বান্দার নৈকট্য ছেড়ে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে ডাকছি। যদি এটা অস্বীকার কর, তবে অধীনতা স্বীকার করতঃ জিযিয়া কর প্রদান কর। আর যদি এটাও মানতে সম্মত না হও তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি, ওয়াস্সালাম।' এ পত্র প্রাপ্তির পর বাদশাহ তা পাঠ করেন এবং অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তিনি শুরাহবীল ইবনে অদাআহ্কে ডেকে পাঠান। সে ছিল হামদান গোত্রের লোক। সে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় পরামর্শদাতা ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়লে সর্বপ্রথম অর্থাৎ আইহাম, সায়্যেদ এবং আকেবের পূর্বেও তার নিকট পরামর্শ নেয়া হতো। সে উপস্থিত হলে নেতা তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্রটি

প্রদান করেন। তার পড়া হলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বল, তোমার অভিমত কি?' সে বলে, 'বাদশাহর খুব ভাল জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হতে একজন নবী পাঠাবার অঙ্গীকার করেছেন। ইনিই হয়তো সেই নবী, এতে বিস্ময়ের কি আছে? নবুওয়াতের বিষয়ে আমি কি অভিমত পেশ করতে পারি? তবে রাজ্যের ব্যাপারে কোন কিছু হলে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে বের করতাম।' বাদশাহ তাকে পৃথক জায়গায় বসিয়ে দেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীলকে আহ্বান করেন। এ লোকটিও রাজ্যের একজন পরামর্শদাতা ছিল। সে ছিল হুমায়ের গোত্রের লোক। বাদশাহ তাকে পত্রটি দিয়ে পাঠ করিয়ে নেন এবং মতামত জিজ্ঞেস করেন। সে ঠিক প্রথম পরামর্শদাতার মতই কথা বলে। একেও বাদশাহ দূরে পৃথক জায়গায় বসিয়ে রাখেন। অতঃপর জাববার ইবনে ফায়েযকে ডাক দেন। এ লোকটি ছিল বানূ হারিস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এও পূর্বের দু'জনের মতই মন্তব্য করেন। বাদশাহ যখন দেখেন যে, ঐ তিন জনের অভিমত একই হয়ে গেছে তখন তিনি নির্দেশ দেন যে, যেন শঙ্খ বাজান হয়, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং গীর্জায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। তথায় এ প্রথা ছিল যে, যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়তো এবং জনগণকে রাত্রে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো তখন তারা এরূপই করতো। আর দিনের বেলায় লোকদেরকে জমা করার প্রয়োজন হলে তারা গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিতো এবং জোরে জোরে শঙ্খ বাজাতো। এ নির্দেশ হওয়া মাত্রই চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং শঙ্খের শব্দ সকলকে সতর্ক করে দেয়। পতাকা উত্তোলিত দেখে আশে-পাশের উপত্যকার সমস্ত লোক জমা হয়ে যায়। ঐ উপত্যকার দৈর্ঘ্য এতো বেশী ছিল যে, একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে ওর শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারতো। ওর মধ্যে তিহাত্তরটি গ্রাম ছিল এবং এক লক্ষ বিশ হাজার তরবারী চালক তথায় বাস করতো।

এসব লোক এসে গেলে বাদশাহ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্র পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং তাদের মতামত জিজ্ঞেস করেন তখন সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি একবাক্যে বলে যে, শুরাহবীল ইবনে অদাইআহ্ হামদানী, আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল আসবাহী এবং জাব্বার ইবনে ফায়েয হারেসীকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান হোক। তারা তথা হতে পূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসবে। তখন এখানকার প্রতিনিধি দল এ তিনজনের নেতৃত্বে রওয়ানা হয়। মদীনায় পৌঁছে এ লোকগুলো

তাদের ভ্রমণের পোষাক খুলে ফেলে এবং লম্বা লম্বা রেশমী চাদর ও লুঙ্গী পরিধান করে। তারা স্বর্ণ নির্মিত আংটি অঙ্গুলিতে পরে নেয়। অতঃপর তারা স্বীয় চাদরের প্রান্ত ধরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয় এবং সালাম জানায়। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। এরা বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে থাকে যে, তিনি কিছু আলাপ আলোচনা করবেন। কিন্তু ঐ রেশমী চাদর, লুঙ্গী এবং সোনার আংটির কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সাথে কোন কথাও বললেন না। তখন এ লোকগুলো হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ)-এর খোঁজে বের হয়। এ দু'জন মনীষীর সাথেই ছিল তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তারা মুহাজির ও আনসারের এক সভাস্থলে তাঁদের দু'জনকে পেয়ে যায়। তাঁদের নিকট তারা ঘটনাটি বর্ণনা করে বলে, 'আপনাদের নবী (সঃ) আমাদেরকে পত্র লিখেছিলেন। আমরা তাঁর উত্তর দেবার জন্যে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছি। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে সালাম করি কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দেননি। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে কিছু আলোচনা করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করি কিন্তু তিনি আমাদের সাথে কোন কথাই বলেননি। অবশেষে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছি। এখন আপনারা বলুন, আমরা কি এমনিই চলে যাবো?' ঐ দু'জন হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ)-কে বলেনঃ 'আপনিই তাদেরকে উত্তর দিন।' হযরত আলী (রাঃ) তখন বলেন, 'আমার ধারণায় এ লোকদের এ চাদর, লুঙ্গীগুলো ও আংটিসমূহ খুলে ফেলে দিয়ে ভ্রমণের ঐ সাধারণ পোষাকগুলো পরেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে পুনরায় উপস্থিত হওয়া উচিত।' লোকগুলো তাই করে। তারা ঐ সাধারণ পোষাকেই তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা তাঁকে সালাম করে এবং তিনি উত্তর দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'যে আল্লাহ আমাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! এ লোকগুলো যখন আমার নিকট প্রথমবার এসেছিল তখন তাদের সাথে ইবলীস ছিল।' তখন প্রশ্ন-উত্তর এবং আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ন করছিলেন এবং উত্তরও দিচ্ছিলেন। অনুরূপভাবে ঐ প্রতিনিধি দলও প্রশ্ন করছিল এবং উত্তর দিচ্ছিল। অবশেষে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কি বলেন?' তখন তিনি বলেনঃ 'আজ আমার নিকট এর উত্তর নেই। তোমরা অপেক্ষা কর, আমার প্রভু এ বিষয়ের যে উত্তর দেবেন আমি তোমাদেরকে তা শুনিয়ে দেবো।' পরের দিন তারা পুনরায় আসে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখনই অবতারিত إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ-এ আয়াতটি كَٰذِبِينَ পর্যন্ত পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তারা এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে। পরের

দিন সকাল হওয়া মাত্রই পরস্পর লা'নত দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে স্বীয় চাদরে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যান, পিছনে পিছনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) আসছিলেন। সে সময় তাঁর কয়েকজন সহধর্মিণী ছিলেন। শুরাহবীল এ দৃশ্য দেখামাত্র স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে বলেঃ 'তোমরা জান যে, নাজরানের সারা উপত্যকা আমার কথা মত চলে এবং আমার মতানুসারেই তারা কাজ করে থাকে। জেনে রেখো যে, এটা খুব জটিল বিষয়। যদি এ লোকটি সত্য সত্যই নবীরূপে প্রেরিত হয়ে থাকেন তবে তাঁর দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম আমরাই অভিশপ্ত হবো এবং তাঁর নবুওয়াতকে সর্বপ্রথম দূরে নিক্ষেপকারীরূপে সাব্যস্ত আমরাই হবো। এ কথাটি তাঁর ও তাঁর সহচরদের অন্তর হতে মুছে যাবে না এবং আমাদের উপর কোন না কোন বিপদ আপতিত হবে। সারা আরবে তাঁর সবচেয়ে নিকটতম আমিই। আর জেনে রেখো যে, যদি তিনি সত্যই আল্লাহর নবী হন তবে মুবাহালা করা মাত্রই পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমাদের একটি চুল বা নখ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।' তখন তাঁর সঙ্গীদ্বয় বলে, 'হে আবূ মারইয়াম! আপনার অভিমত কি?' সে বলে, 'আমার মত এই যে, তাঁকে আমরা নির্দেশ দাতা বানিয়ে দেই। তিনি যা নির্দেশ দেবেন আমরা তা মেনে নেবো। তিনি কখনও অন্যায় নির্দেশ দেবেন না।' তারা দু'জন শুরাহবীলের কথা সমর্থন করে। তখন শুরাহবীল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলে, 'জনাব, আমি 'মুবাহালা' অপেক্ষা উত্তম জিনিস আপনার সামনে পেশ করছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'সেটা কি?' সে বলে, 'আজকের দিন, আগামী রাত্রি এবং কাল সকাল পর্যন্ত আপনি আমাদের সম্বন্ধে যা নির্দেশ দেবেন আমরা তা মেনে নেবো।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে বলেনঃ 'সম্ভবতঃ অন্যান্য লোক তোমাদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না।

শুরাহবীল বলেঃ 'আপনি আমার এ সঙ্গীদ্বয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে নিন।' তিনি ঐ দু'জনকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেঃ 'সারা উপত্যকার লোক তাঁরই মতের উপর চলে থাকে। তথায় এমন কেউ নেই যে তাঁর সিদ্ধান্ত অমান্য করতে পারে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং 'মুবাহালা' হতে বিরত হন, তারা তখনকার মত ফিরে যায়। পরের দিন সকালেই তারা নবী (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি চুক্তিপত্র তাদের হাতে দেন। 'বিসমিল্লাহ'-এর পরে ঐ চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

'এ চুক্তিপত্রটি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে নাজরান বাসীদের জন্য লিখিত হলো। তাদের প্রত্যেক হলদে, সাদা, কৃষ্ণ এবং গোলামের উপর

আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর হুকুম জারী ছিল। কিন্তু তিনি সবই তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। প্রতি বছর তারা শুধু দু'হাজার হুল্লা (লুঙ্গী ও চাদর) প্রদান করবে। এক হাজার দেবে রজব মাসে ও এক হাজার সফর মাসে ইত্যাদি।' পূর্ণ চুক্তিপত্র তাদেরকে দেয়া হয়। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তাদের প্রতিনিধি দল হিজরী নবম সনে এসেছিল। কেননা, হযরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম ঐ নাজরানবাসীরাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিযিয়া কর প্রদান করে। আর জিযিয়ার আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

(৯ঃ ২৯) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ

শেষ পর্যন্ত। এ আয়াতে কিতাবীদের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। ইবনে মিরদুওয়াই স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, আকিব ও তায়্যেব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাদেরকে 'মুবাহালা'র জন্যে আহ্বান করেন এবং তিনি হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তাদেরকে বলে পাঠালে তারা অস্বীকৃতি জানায় এবং জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহর শপথ! যদি এরা দু'জন 'না' বলতো তবে এ উপত্যকাই তাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করতো।' হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, نَدْعُ اَبْنَاءَنَا আয়াতটি তাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। اَنْفُسَنَا শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ), ও হযরত আলী (রাঃ)। اَبْنَاءَنَا শব্দের দ্বারা হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে এবং نِسَاءَنَا শব্দ দ্বারা হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। মুসতাদরিক-ই-হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও এ অর্থের হাদীস বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তা চরম সত্য। এতে চুল পরিমাণও বেশী কম নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ইবাদতের যোগ্য, অন্য কেউ নয়। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহান বিজ্ঞানময়। কিন্তু এখনও যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য কিছু মানতে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা বাতিলপন্থী ও বিবাদীদেরকে ভাল করেই জানেন। তিনি তাদেরকে জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন এবং এর উপরে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। কেউ না পারবে তার নিকট হতে পালাতে না পারবে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। তিনি পবিত্র ও প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁর শাস্তি হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

٦٤- قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৬৪। তুমি বল- হে আহ্‌লে কিতাব! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্য সৌসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি ও তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভু রূপে গ্রহণ না করি, অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তবে বল- সাক্ষী থাক যে, আমরাই মুসলমান।

ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান এবং ঐ প্রকারের লোকদেরকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। كَلِمَةٌ শব্দের প্রয়োগ جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ -এর উপর হয়ে থাকে। যেমন এখানে كَلِمَةٍ বলার পর سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ বলে ওর বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে। سَوَآءٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে সমান। অর্থাৎ যাতে মুসলমান ও ইয়াহূদ-খ্রীষ্টান সবাই সমান। অতঃপর ওর তাফসীর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ওটা এই যে, মানুষ এক আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে না কোন প্রতিমার উপাসনা করবে, না ক্রুশের পূজো করবে, না পূজো করবে কোন ছবির। না আল্লাহ ছাড়া আগুনের পূজো করবে, না অন্য কোন জিনিসের উপাসনা করবে। বরং তারা এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদত করবে। সমস্ত নবী (আঃ) মানুষকে এ আহ্বানই জানিয়েছিলেন। ঘোষিত হয়েছেঃ

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি সবারই নিকট এই অহীই করেছি যে, আমি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।' (২১ঃ ২৫) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে এই বলিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং দেবতাদের উপাসনা হতে বিরত থাক'। (১৬ঃ ৩৬)

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'আল্লাহকে ছেড়ে পরস্পর আমরা একে অপরকে প্রভু বানিয়ে নেবো না।' ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করবো না।' ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে–'আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও সিজদা করবো না।' অতঃপর তারা যদি এ ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানেও সাড়া না দেয় তবে– 'হে মুসলমানগণ, তোমরা যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছো ঐ লোকদেরকে তার সাক্ষী বানিয়ে নাও।' আমি সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ওর মধ্যে রয়েছে যে, আবূ সুফইয়ান (রাঃ) যখন রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে আহুত হন এবং সম্রাট তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশের অবস্থা জিজ্ঞেস করেন, সে সময় তিনি অমুসলিম ও তাঁর চরম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বংশের আভিজাত্যের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অনুরূপভাবে তিনি প্রত্যেক প্রশ্নেরই স্পষ্ট ও সঠিক উত্তর দেন। এটি হোদায়বিয়ার সন্ধির পরের ও মক্কা বিজয়ের পূর্বের ঘটনা। এ কারণেই নবী (সঃ) সম্বন্ধে কায়সারের 'তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?' এ প্রশ্নের উত্তরে আবূ সুফইয়ান (রাঃ) বলেছিলেনঃ 'তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন না, তবে এখন আমাদের ও তার মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে, না জানি তিনি এতে কি করেন।' এখানে উদ্দেশ্য এটাই যে, এ সমস্ত কথা বার্তার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র চিঠি পেশ করা হয়, যাতে 'বিসমিল্লাহ'-এর পরে রয়েছেঃ 'এ পত্রটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে রোমের বাদশাহ কায়সারের নিকট। হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ কর তবে শান্তি লাভ করবে এবং আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুণ্য দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে সমস্ত প্রজাদের পাপ তোমার উপর বর্তিত হবে।' অতঃপর এ আয়াতটিই লিখেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) প্রমুখ মনীষী লিখেছেন যে, এ সূরা অর্থাৎ সূরা-ই-আলে-ইমরানের প্রথম হতে নিয়ে কিছু কম বেশী আশি পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, সর্বপ্রথম এ লোকগুলোই জিযিয়া কর প্রদান করে এবং এ বিষয়ে মোটেই মতবিরোধ নেই যে, জিযিয়ার আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি করে এ আয়াতটি হিরাক্লিয়াসের পত্রে লিখলেন? এর উত্তর কয়েক প্রকারের দেয়া যেতে পারে। প্রথম এই যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি দু'বার অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ একবার হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে এবং

দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের পর। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হয়তো সূরার প্রথম হতে এ আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এ আয়াতটি পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এ অবস্থায় ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর 'আশির উপর আরও কিছু আয়াত' -এ উক্তি রক্ষিত হয় না। কেননা, আবূ সুফইয়ান (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ উল্টো। তৃতীয় উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নাজরানের প্রতিনিধিদল হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে এসেছিল এবং তারা যা কিছু দিতে সম্মত হয়েছিল তা হয়তো মুবাহালা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সন্ধি হিসেবেই দিয়েছিল, জিযিয়া হিসেবে নয়। আর এটাইতো সর্বসম্মত কথা যে, জিযিয়ার আয়াত এ ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে ওর সাদৃশ্য এসে যায়। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) বদরের পূর্বেকার যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন এবং এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকীগুলো সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অতঃপর গনীমতের মাল বন্টনের আয়াতগুলোও ওর অনুরূপই অবতীর্ণ হয় এবং এ নির্দেশই দেয়া হয়। চতুর্থ উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে পত্র হিরাক্লিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এ কথাগুলো নিজের পক্ষ হতেই লিখেছিলেন, অতঃপর তাঁর ভাষাতেই অহী অবতীর্ণ হয়। যেমন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর পর্দার নির্দেশের ব্যাপারে ঐ রকমই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দী হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও হযরত উমার (রাঃ)-এর মতের অনুরূপই আয়াত নাযিল হয়। মুনাফিকদের জানাযার নামায না পড়ার ব্যাপারেও তাঁর মতের অনুরূপ নির্দেশ জারী করা হয়। মাকাম-ই-ইবরাহীম (আঃ)-কে নামাযের স্থান বানানোর ব্যাপারেও এরূপই অহী অবতীর্ণ হয়। عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ (৬৬ঃ ৫) -এ আয়াতটিও তাঁর কথারই সাদৃশ্যে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এ আয়াতটিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণার সাদৃশ্যে নাযিল হয়। এটাই খুব সম্ভব।

৬৫। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন বিতর্ক করছো? অথচ তার পরে ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়নি, তবুও কি তোমরা বুঝছো না।

٦٥- يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِیْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

٦٦- هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاۤءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৬৬। হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল, তা নিয়েও তোমরা কলহ করেছিলে, কিন্তু যদ্বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই, তা নিয়ে তোমরা কেন কলহ করছো? এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নও।

٦٧- مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৬৭। ইবরাহীম ইয়াহূদী ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না, বরং সে সুদৃঢ় মুসলমান ছিল এবং সে অংশীবাদীগণের অন্তর্গত ছিল না।

٦٨- اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৬৮। নিশ্চয়ই ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুগামী হয়েছেন আর এই নবী এবং মুমিনগণ, এবং আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীগণের অভিভাবক।

ইয়াহূদীরা বলতো যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহূদী ছিলেন এবং খ্রীষ্টানরা বলতো যে, তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন এবং একথা নিয়ে তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করতো। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে তাদের এ দাবীকে খণ্ডন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নাজরান হতে আগত খ্রীষ্টানদের নিকট ইয়াহূদী আলেমগণ আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনেই তারা কলহ আরম্ভ করে দেয়। প্রত্যেক দলেরই এ দাবী ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে বলা হয়, 'হে ইয়াহূদীর দল! তোমরা কি করে হযরত

ইবরাহীম (আঃ)-কে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত বলছো? অথচ তার যুগে তো হযরত মূসাও (আঃ) ছিলেন না এবং তাওরাতও ছিল না। মূসা (আঃ) এবং তাওরাত তো ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে এসেছে।' অনুরূপভাবে- 'হে খ্রীষ্টানের দল! তোমরা ইবরাহীম (আঃ)-কে খ্রীষ্টান কিরূপে বলছো? অথচ খ্রীষ্টান ধর্ম তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে প্রকাশ পেয়েছে। এ মোটা কথাটা বুঝার মতও কি তোমাদের জ্ঞান নেই?' অতঃপর এ দু'টি দল যে কিছু না জেনেও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনা করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাদের রয়েছে তা নিয়ে যদি তারা কলহ করতো তবে কিছুটা খাপ খেতো। কিন্তু তারা এমন বিষয় নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়েছে, যে বিষয়ে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়টি সর্বজ্ঞাত আল্লাহকে সমর্পণ করাই তাদের উচিত, যিনি প্রত্যেক জিনিসের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। একমাত্র মহান আল্লাহর প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। এ জন্যেই তিনি বলেন-'আল্লাহ তা'আলা পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমারা অবগত নও। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহূদীও ছিলেন না এবং খ্রীষ্টানও ছিলেন না। বরং তিনি অংশীবাদকে ঘৃণা করতেন এবং মুশরিকদের হতে বহু দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার। তিনি কখনও মুশরিক ছিলেন না।' এ আয়াতটি সূরা-ই-বাকারার নিম্নের আয়াতটির মতঃ

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا

অর্থাৎ 'তারা বলেছিল, তোমরা ইয়াহূদী হয়ে যাও অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও তবে সুপথ প্রাপ্ত হবে।' (২ঃ ১৩৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণের বেশী দাবীদার ঐ সব লোক যারা তাঁর যুগে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখন এ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁর অনুসারী মুমিনদের দল, যারা হচ্ছে মুহাজির ও আনসার এবং তাদের পরেও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারী যত লোক আসবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু নবীদের (আঃ) মধ্য হতে হয়ে থাকে এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছেন নবীদের মধ্যে হতে আমার পিতা আল্লাহ তা'আলার বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)।' অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (জামেউত্ তিরমিযী ইত্যাদি) তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে কেউ আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করবে তার অভিভাবক আল্লাহ।

٦٩- وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

৬৯। এবং কিতাবীগণের মধ্যে এক দলের বাসনা যে, তোমাদেরকে পথভ্রান্ত করে; কিন্তু তারা নিজেকে ব্যতীত বিপথগামী করে না এবং তারা বুঝছে না।

٧٠- يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

৭০। হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করছো? এবং তোমরাই ওর সাক্ষী।

٧١- يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ع

৭১। হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিলিয়ে নিচ্ছ? অথচ তোমরা তা অবগত আছ।

٧٢- وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৭২। আর আহলে কিতাবের মধ্যে একদল এটাই বলে যে, বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি পূর্বাহ্নে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং অপরাহ্নে তা অস্বীকার কর– তাহলে তারা ফিরে যাবে।

٧٣- وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ

৭৩। আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তারা ব্যতীত বিশ্বাস করো না; তুমি বল– আল্লাহর পথই সুপথ– যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, তদ্রূপ অন্যকেও

أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

প্রদত্ত হতে পারে; অথবা যদি তোমার প্রভুর সম্বন্ধে তোমার সাথে কলহ করে তবে তুমি বল-গৌরব আল্লাহরই হস্তে; তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন এবং আল্লাহই প্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

٧٤- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

৭৪। তিনি যার প্রতি ইচ্ছে করেন স্বীয় করুণা নির্দিষ্ট করেন এবং আল্লাহ মহান গৌরবশালী।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ঐ ইয়াহূদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে মুসলমানদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তারা কতইনা গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে এবং তাদেরকে প্রতারিত করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এসব অন্যায় কার্যের শাস্তি স্বয়ং তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা তা মোটেই বুঝছে না।,

অতঃপর তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কার্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা সত্য জেনে শুনে আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করছে। তাদের বদভ্যাস এও আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। তাদের কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী বর্ণিত আছে, তারা তা গোপন করছে। মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার যেসব পন্থা তারা বের করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে- 'তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং মুসলমানদের সাথে নামায পড়বে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে মূর্খদেরও এ ধারণা হবে যে, এরা এ ধর্মের ভেতর কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পেয়েছে বলেই এটা গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, কাজেই তারাও এ ধর্ম ত্যাগ করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।' মোটকথা তাদের এটা একটা কৌশল ছিল যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা ইসলাম হতে ফিরে যাবে এই জেনে যে, এ বিদ্বান লোকগুলো যখন ইসলাম গ্রহণের পরেও তা হতে ফিরে গেলো তাহলে

অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষত্রুটি রয়েছে। ঐ লোকগুলো বলতো– 'তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করো না, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করো না এবং নিজেদের গ্রন্থের কথা তাদেরকে বলো না, নচেৎ তারা ওর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটও তাদের জন্যে ওটা আমাদের উপর দলীল হয়ে যাবে।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। তিনি মুমিনদের অন্তরকে ঐ প্রত্যেক জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ঐ দলীলগুলোর উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও তোমরা নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)-এর গুণাবলী গোপন রাখছো তথাপি যারা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁরা তাঁর নবুওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন একবার দেখেই চিনে নেবে।' অনুরূপভাবে তারা তাদের লোককে বলতো– 'তোমাদের নিকট যে বিদ্যা রয়েছে তা তোমরা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করো না, নতুবা তারা তা শিখে নেবে, এমনকি তাদের ঈমানী শক্তির কারণে তোমাদের চেয়েও বেড়ে যাবে কিংবা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই তারা তোমাদের উপর দোষারোপ করবে এবং তোমাদেরই উপর তোমাদেরই দলীল প্রতিষ্ঠিত করে বসবে।' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা বলে দাও যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। সমস্ত কার্য তাঁরই অধিকারে রয়েছে। তিনিই প্রদানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন ঈমান আমল এবং অনুগ্রহ রূপ সম্পদ পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছে করেন সত্যপথ হতে অন্ধ, ইসলামের কালেমা হতে বধির এবং সঠিক বোধ হতে বঞ্চিত করেন। তাঁর সমস্ত কাজই নিপুণতাপূর্ণ এবং তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যাকে চান স্বীয় করুণার সাথে নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। হে মুসমলমানগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের নবী (সঃ)-কে সমস্ত নবী (আঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ শরীয়ত তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।'

٧٥- وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৫। কিতাবীদের মধ্যে এরূপ আছে যে, যদি তুমি তার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও গচ্ছিত রেখে দাও, তবুও সে তা তোমার নিকট প্রত্যর্পণ করবে এবং তাদের মধ্যে এরূপও আছে যে, যদি তুমি তার নিকট একটি 'দীনার'ও গচ্ছিত রাখ, তবে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে না: কিন্তু যে পর্যন্ত তুমি তার শিরোপরি দণ্ডায়মান থাক, কারণ তারা বলে যে, আমাদের উপর ঐ অশিক্ষিতদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই এবং তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তারাও জানে।

٧٦- بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭৬। হ্যাঁ–যারা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও সংযত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে ভালবাসেন।

ইয়াহূদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মাসৎ করে থাকে এখানে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ইয়াহূদীদের প্রতারণায় না পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই বিশ্বস্ত রয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ বড়ই আত্মসাৎকারী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি রাশি সম্পদ রাখলেও সে যেমনকার তেমনই প্রত্যর্পণ করবে। কিন্তু কেউ কেউ এত বড় আত্মসাৎকারী যে, তার নিকট শুধুমাত্র একটি 'দীনার' গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দেবে না। তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা করা হয় তবে হয়তো ফিরিয়ে দেবে নচেৎ একেবারে হজম করে নেবে। সে যখন একটা দীনারেরও

লোভ সামলাতে পারলো না তখন বেশী সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত রাখলে যে অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। قِنْطَارٌ শব্দটির পূর্ণ তাফসীর সূরার প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে। আর দীনারের অর্থতো সর্বজন বিদিত। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত মালিক ইবনে দীনারের উক্তি বর্ণিত আছেঃ 'দীনারকে দীনার বলার কারণ এই যে, ওটা 'দীন' অর্থাৎ ঈমানও বটে এবং 'নার' অর্থাৎ আগুনও বটে।' ভাবার্থ এই যে, সত্যের সাথে গ্রহণ করলে দীন এবং অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলে জাহান্নামের অগ্নি। এ স্থলে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করাও যথোপযুক্ত বলে মনে করি যা সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে কয়েক জায়গায় এসেছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বানী ইসরাঈলের মধ্যে একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ চায়। ঐ লোকটি বলেঃ 'সাক্ষী নিয়ে এসো।' সে বলেঃ 'আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।' সে বলেঃ 'জামিন আন।' সে বলেঃ 'জামানত আল্লাহ তা'আলাকেই দিচ্ছি।' সে তাতে সম্মত হয়ে যায় এবং পরিশোধের মেয়াদ ঠিক করে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দেয়।'

অতঃপর ঋণী ব্যক্তি সামুদ্রিক সফরে বেরিয়ে পড়ে। কাজ-কাম শেষ করে সে সমুদ্রের ধারে এসে কোন জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, মহাজনের নিকট গিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু কোন জাহাজ পেলো না। তখন সে এক খণ্ড কাঠ নিয়ে ওর ভেতর ফাঁপা করলো এবং ওর মধ্যে এক হাজার দীনার রেখে দিল এবং মহাজনের নামে একটি চিঠিও দিল। অতঃপর ওর মুখ বন্ধ করে দিয়ে ওটা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। অতঃপর বললোঃ 'হে আল্লাহ! আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি আপনাকেই সাক্ষী ও জামিন রেখেছি। সেও তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ঋণ দিয়েছে। এখন আমি সময়মত তার ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে নৌকা খোঁজ করছি কিন্তু পাচ্ছি না। কাজেই আমি বাধ্য হয়ে আপনারই উপর ভরসা করতঃ তা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। আপনি তাকে তা পৌঁছে দিন।' এ প্রার্থনা জানিয়ে সে চলে আসে। কাঠটি পানিতে ডুবে যায়। সে কিন্তু নৌকার অনুসন্ধানেই থাকে যে, গিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করবে। এদিকে ঐ মহাজন লোকটি এ আশায় নদীর ধারে আসে যে, হয়তো ঋণী ব্যক্তি নৌকায় তার প্রাপ্য নিয়ে আসছে। যখন দেখল যে, কোন নৌকা আসেনি তখন সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। এমতাবস্থায় একটি কাঠ

নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে জ্বালানীর কাজ দেবে মনে করে তা উঠিয়ে নেয় এবং বাড়ী গিয়ে কাঠটি ফাঁড়লে এক হাজার দীনার ও একটি চিঠি বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর ঋণ গ্রহীতা লোকটি এসে পড়ে এবং বলেঃ 'আল্লাহ জানেন আমি সদা চেষ্টা করেছি যে, নৌকা পেলে তাতে উঠে আপনার নিকট আগমন করতঃ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আপনার ঋণ পরিশোধ করবো। কিন্তু কোন নৌকা না পাওয়ায় বিলম্ব হয়ে গেল।' সে তখন বলেঃ 'আপনি যে মুদ্রা পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এখন আপনি আপনার মুদ্রা নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান।'

আহলে কিতাবের ভুল ধারণা এই ছিল যে, ধর্মান্ধ ও অশিক্ষিতদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করলে কোন দোষ নেই। ওটা তাদের জন্য বৈধ। তাদের এ বদ ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কেননা, ওটা যে তাদের জন্য বৈধ নয় তা তারাও জানে। কারণ তাদের গ্রন্থেও অন্যায় মালকে আল্লাহ তা'আলা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এ নির্বোধের দল নিজেদের মনগড়া কথাকে শরীয়তের রঙ্গে রঞ্জিত করছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জনগণ ফতওয়া জিজ্ঞেস করেনঃ 'জিহাদের অবস্থায় কখনো কখনো আমরা জিম্মী কাফিরদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি পেয়ে থাকি এবং মনে করি যে ঐগুলো গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই (এতে আপনার মত কি?)।' তিনি বলেনঃ 'কিতাবধারীরাও ঠিক এ কথাই বলতো যে, মূর্খদের মাল গ্রহণে কোন দোষ নেই। জেনে রেখো যে, যখন তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে তখন তাদের কোন মাল তোমাদের জন্যে বৈধ হবে না। তবে যদি তারা খুশী মনে দেয় তা অন্য কথা'। (মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাক) হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন যে, যখন গ্রন্থধারীদের নিকট হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথা শ্রবণ করেন তখন তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর শত্রুরা মিথ্যাবাদী। একমাত্র আমানত ছাড়া অজ্ঞতা যুগের সমস্ত কিছুই আমার পায়ের নীচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেননা, আমানত কোন পাপী ও দুরাচারের হলেও ফিরিয়ে দিতে হবে।'

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে-'কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পুরো করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আর আহলে কিতাব হয়েও স্বীয় ধর্মগ্রন্থের হিদায়াত অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে, যে অঙ্গীকার সমস্ত নবী (আঃ)-এর নিকট হতে নেয়া হয়েছিল এবং যে অঙ্গীকার প্রতিপালনের

দায়িত্ব তাঁদের উম্মতগণের উপরও রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ পাকের অবৈধকৃত জিনিস হতে দূরে থাকে, তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করে এবং নবীগণের (আঃ) নেতা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, সেই মুত্তাকী এবং মুত্তাকী ব্যক্তিরাই আল্লাহর বন্ধু।'

٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৭। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই এবং আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না ও উত্থান দিবসে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

অর্থাৎ গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গীকারের কোন ধার ধারে না, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণ করে না, তাঁর গুণাবলীর কথা জনগণের সামনে প্রকাশ করে না, তাঁর সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করে না এবং মিথ্যা শপথ করে থাকে আর এসব জঘন্য কার্যের বিনিময়ে এ নশ্বর জগতে কিছু উপকার লাভ করে, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কোন ভালবাসাপূর্ণ কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। তাদেরকে তিনি পাপ হতে পবিত্রও করবেন না, রবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেবেন। তথায় তারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। ঐগুলোর মধ্যে সামান্য কয়েকটি হাদীস এখানে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

(১) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা না কথা বলবেন, না তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন।' একথা শুনে হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ লোকগুলো কে? এরা তো বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার

একথাই বলেন। অতঃপর তিনি উত্তর দেনঃ ১. যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, ২. মিথ্যা শপথ করে যে নিজের পণ্য বিক্রি করে এবং ৩. অনুগ্রহ করার পরে যে তা প্রকাশ করে।' সহীহ মুসলিম প্রভৃতির মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে।

(২) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আবূ আহমাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "আমি হযরত আবূ যার (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ তাঁকে বলি—আমি শুনেছি যে, আপনি নাকি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন? তিনি বলেন, 'জেনে রাখুন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যা শুনি সে ব্যাপারে আমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারি না। বলুন, ঐ হাদীসটি কি?' আমি বলি, (তা হচ্ছে) তিন প্রকারের লোককে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং তিন প্রকারের লোকের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন। তখন তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, এ হাদীসটি আমি বর্ণনাও করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছিও বটে।' আমি জিজ্ঞেস করি, কোন কোন্ লোককে তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন? তিনি বলেনঃ 'প্রথম ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বীরত্বের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর হয় সে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়ে দেয়, না হয় বিজয়ী বেশে ফিরে আসে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে কোন যাত্রী দলের সাথে সফররত হয়েছে। বহু রাত পর্যন্ত যাত্রী দল চলতে থাকে। যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন এক জায়গায় অবতরণ করে। সবাই তো ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু ঐ লোকটি জেগে থাকে এবং নামাযে মশগুল হয়ে পড়ে। অতঃপর যাত্রার সময় সকলকে জাগিয়ে দেয়। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয় এবং সে ধৈর্যধারণ করে, যে পর্যন্ত না মৃত্যু অথবা সফর তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করে।' আমি বলিঃ ঐ তিন ব্যক্তি কারা যাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট? তিনি বলেনঃ ১. খুব বেশী শপথকারী ব্যবসায়ী, ২. অহংকারী দরিদ্র এবং ৩. অনুগ্রহ প্রকাশকারী কৃপণ।' এ হাদীসটি এ সনদে গারীব।

(৩) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, কিন্দা গোত্রের ইমরুল কায়েস নামক একটি লোকের সঙ্গে হাযরে মাউতের একটি লোকের জমিজমা নিয়ে বিবাদ ছিল। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেনঃ 'হাযরামী ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করুক।' তার নিকট কোন প্রমাণ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কিন্দী ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করুক।' তখন হাযরামী লোকটি বলেঃ 'আপনি যখন তার শপথের উপরেই ফায়সালা করলেন তখন

কা'বার প্রভুর শপথ করে আমি বলতে পারি যে, সে আমার জমি নিয়ে নেবে।' তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কারও মাল নিজের করে নেবে সে যখন আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন ইমরুল কায়েস বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি কেউ তার দাবী ছেড়ে দেয় তবে সে তার কি প্রতিদান পাবে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'জান্নাত।' সে বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি তাকে সমস্ত ভূমি ছেড়ে দিলাম।' এ হাদীসটি সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও রয়েছে।

(৪) 'যে ব্যক্তি কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হবেন।' হযরত আশ্‌আস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! এটা আমারই সম্বন্ধে। আমারও একজন ইয়াহূদীর মধ্যে ভাগে এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করে বসে। আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বলেনঃ 'তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?' আমি বলিঃ না। তিনি ইয়াহূদীকে শপথ করতে বলেন। আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি শপথ করে আমার মাল নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও রয়েছে।

(৫) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে সে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এমন সময় তথায় হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ 'আবূ আব্দির রহমান আপনার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করেন?' আমি দ্বিতীয় বার বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেনঃ এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ব্যাপারেই বর্ণনা করেছেন। আমার এবং আমার এক চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিল। কূপটি তারই অধিকারে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে আমরা এ মামলা নিয়ে গেলে তিনি আমাকে বলেনঃ 'তুমি প্রমাণ উপস্থিত কর যে, কূপটি

তোমারই, নতুবা তার শপথের উপরেই ফায়সালা হবে।' আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই, আর যদি তার শপথের উপরে নির্ভর করে মীমাংসা করা হয় তবে সে আমার কূপ নিয়ে নেবে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তো দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করতঃ এ আয়াতটি পাঠ করেন।

(৬) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কতক বান্দা এমনও রয়েছে যাদের সঙ্গে তিনি কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দেখবেন না।' জিজ্ঞেস করা হয়ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কে? তিনি বলেনঃ 'স্বীয় বাপ-মার প্রতি অসন্তোষ ও অনাগ্রহ প্রকাশকারী ছেলে, ছেলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশকারী ও তার নিকট হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী বাপ এবং ঐ ব্যক্তি যার উপর কোন গোত্রের অনুগ্রহ রয়েছে কিন্তু সে তা অস্বীকার করে এবং নিজেকে ওটা হতে মুক্ত মনে করতঃ তাদের দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়।

(৭) মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'একটি লোক স্বীয় পণ্য দ্রব্য বাজারে রেখে শপথ করে বলে যে, ঐ গুলোর এত এত দর দেয়া হতো।' কিন্তু আসলে তা দেয়া হতো না। উদ্দেশ্যে ছিল যেন মুসলমানেরা তার ফাঁদে পড়ে যায়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীর মধ্যেও এটা বর্ণিত আছে।

(৮) মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তিন ব্যক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে দেখবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না', আর তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে কিন্তু কোন মুসাফিরকে সে তা প্রদান করে না। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় মাল বিক্রি করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে মুসলমান বাদশাহর হাতে বায়আত গ্রহণ করে, অতঃপর যদি বাদশাহ তাকে মাল প্রদান করেন তবে সে বায়আত পুরো করে এবং মাল না দিলে তা পুরো করে না।' এ হাদীসটি সুনান-ই-আবি দাউদ এবং জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৭৮। আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে-যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয় এবং তারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত, অথচ ওটা আল্লাহর নিকট হতে নয় এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে ও তারা তা অবগত আছে।

৭৮- وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

এখানেও ঐ অভিশপ্ত ইয়াহূদীদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে একটি দল এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কথাকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়, তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে এবং প্রকৃত অর্থ ও সঠিক ভাবার্থ বিকৃত করে দেয়। আর এর মাধ্যমে তারা মূর্খদেরকে এই চক্রে ফেলে দেয় যে, এটাই আল্লাহর কিতাব। আবার তারা ওটাকে আল্লাহর কিতাবের নাম দিয়ে পাঠ করতঃ তাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। তারা জেনে শুনে এভাবে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। এখানে ভাষাকে বক্র বা কুঞ্চিত করার অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করে দেয়া। সহীহ বুখারীর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকগুলো পরিবর্তন করে দিতো এবং সরিয়ে দিতো। সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের কোন শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। তবে হ্যাঁ, ঐ লোকগুলো অর্থ পরিবর্তন করতো এবং বাজে ব্যাখ্যা করতো। হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রাঃ) বলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল ঐ রূপই রয়েছে। যেরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ওগুলো অবতীর্ণ করেছেন। ওগুলোর একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু ঐ লোকেরা অর্থের পরিবর্তন, মনগড়া ব্যাখ্যা করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করতো। তারা নিজেদের পক্ষ হতে সে পুস্তকগুলো লিখতো এবং আল্লাহ তা'আলার কিতাব বলে প্রচার করতো, ওগুলো দ্বারাও লোকদেরকে বিপথে চালিত করতো, অথচ ওগুলো আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কিতাবগুলো

রক্ষিতই রয়েছে, ঐগুলো কখনও পরিবর্তিত হয় না। (মুসনাদ-ই-ইবনে হাতিম) হযরত অহাব (রঃ)-এর এ ঘোষণার ভাবার্থ যদি এই হয় যে, তাদের নিকট এখন যে গ্রন্থসমূহ রয়েছে তবে তো আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ওগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং ওগুলো হ্রাস বৃদ্ধি হতে মোটেই পবিত্র নয়। অতঃপর আরবী ভাষায় অনুদিত হয়ে যেগুলো আমাদের হাতে রয়েছে ওগুলো তো বড়ই ত্রুটিপূর্ণ এবং এগুলোর মধ্যে খুবই বাড়াবাড়ি আছে ও মূল হতে বহু ঘাটতিও রয়েছে। তাছাড়া ঐগুলোর মধ্যে স্পষ্ট সন্দেহ ও প্রকাশ্য ত্রুটি বিদ্যমান। বরং প্রকৃত প্রস্তাবে ওকে অনুবাদ বলাই শোভনীয় নয়। ওটাতো তাফসীর, তাও আবার এমন তাফসীর যা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। ওগুলো নির্বোধের লিখা তাফসীর। আর যদি হযরত অহাব (রঃ)-এর ঘোষণার ভাবার্থ হয় আল্লাহ তা'আলার কিতাব, অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কিতাব, তবে তা নিঃসন্দেহে রক্ষিত রয়েছে। ওর মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবই নয়।

৭৯। এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ যাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও নবুওয়াত দান করেন, তৎপরে সে মানবমণ্ডলীর মধ্যে বলে— তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও; বরং প্রভুরই ইবাদত কর— কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষা দান কর এবং ওটা পাঠ করে থাক।

৭৯- مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۙ○

৮০। আর তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর; তোমরা আত্ম-সমর্পণকারী হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে বিশ্বাসদ্রোহীতার আদেশ করবেন?

৮০- وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ ع

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যখন ইয়াহূদী ও নাজরানের খ্রীষ্টানগণ একত্রিত হয় এবং তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান তখন আবূ রাফি' ফারাযী বলেঃ 'আপনি চান যে, খ্রীষ্টানেরা যেমন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর ইবাদত করে তদ্রূপ আমরাও আপনার ইবাদত করি?' তখন নাজরানী খ্রীষ্টানদের মধ্যে 'আঈস' নামক এক ব্যক্তিও এ কথাই বলেঃ 'আপনি কি এটাই চান? এই কি আপনার দাওয়াত?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি এটা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। না নিজে আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি, না অন্য কাউকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করার শিক্ষা দেই। আমার প্রেরিতত্বের উদ্দেশ্যও এটা নয় এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর নির্দেশও দেননি।' তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয়–'কোন মানুষের জন্যে বাঞ্ছনীয় নয় যে, ধর্মীয় গ্রন্থ, নবুওয়াত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের পর সে মানুষকে স্বীয় ইবাদতের জন্যে আহ্বান করে।' এত বড় বড় নবী যাঁদেরকে এত বেশী শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করা হয়েছে। তাঁদেরকেই যখন মানুষের ইবাদত গ্রহণের মর্যাদা দেয়া হয়নি। তখন অন্য লোক কোন মুখে মানুষকে নিজের ইবাদতের জন্যে আহ্বান করতে পারে? ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ একজন সাধারণ মুমিন দ্বারাও এটা হতে পারে না যে, সে মানুষকে স্বীয় ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। এখানে এটা বলার কারণ এই যে, ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা পরস্পরের মধ্যেই একে অপরের ইবাদত করতো। পবিত্র কুরআনই তার সাক্ষী। ইরশাদ হচ্ছেঃ

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেমদেরকে ও দরবেশদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (৯ঃ ৩১) মুসনাদ-ই-আহমাদ ও জামেউত্ তিরমিযীর এ হাদীসও আসছে যে, হযরত আ'দী ইবনে হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আরয করেন যে, তারা তো তাদের পূজো করতো না। তখন তিনি বলেনঃ 'কেন নয়? তারা তাদের উপর হারামকে হালাল করতো এবং হালালকে হারাম করতো এবং ওরা ওদের কথা মেনে চলতো। এটাই ছিল তাদের ইবাদত।' সুতরাং মূর্খ দরবেশ এবং নির্বোধ আলেমরা এ ধমকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর অনুসারী আলেমগণ এটা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা, তাঁরা তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথাই প্রচার করে থাকেন এবং এসব কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখেন যেসব কাজ হতে নবীগণ (আঃ) বিরত রাখতেন। নবীগণতো হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টের মাঝে দূত স্বরূপ। তাঁরা প্রেরিতত্বের কার্যাবলী পালন

করেন এবং আল্লাহ তা'আলার আমানত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন। রাসূলদের সুপথ প্রদর্শন তো হচ্ছে মানুষকে প্রভুর ইবাদতকারী বানিয়ে দেয়া। ওর মাধ্যমে তারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মুত্তাকী এবং পুণ্যবান হয়ে যায়।

হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন, 'কুরআন কারীম শিক্ষাকারীদের উপর এ দাবী রয়েছে যে, তারা যেন বিবেচক হয়। তা'আলামুনা এবং তুআল্লেমুনা এ দু'টো পঠনই রয়েছে। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে অনুধাবন করা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে শিক্ষা দান করা। تَدْرُسُوْنَ শব্দের অর্থ হচ্ছে শব্দসমূহ মুখস্থ করা।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ সে এই নির্দেশ দেয় না যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর, সে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূলই হোক বা তাঁর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাই হোক। এ কথা ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে কুফরী করে এবং কুফরী করা নবীদের (আঃ) কাজ নয়। তাদের কাজ তো হচ্ছে ঈমান, আর ঈমান হচ্ছে একক আল্লাহর ইবাদত করার নাম। নবীদের কণ্ঠে এ শব্দই উচ্চারিত হয়। যেমন স্বয়ং কুরআন মাজীদ ঘোষণা করেঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ۔

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও আমি যত রাসূল পাঠিয়েছিলাম সবারই উপরেই এ অহী করেছিলাম যে, আমি ছাড়া কেউ মা'বূদ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদত কর। (২১ঃ ২৫) অন্য জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۔

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত হতে বিরত থাক।' (১৬ঃ৩৬), অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'তোমার পূর্বেকার সমস্ত নবী (আঃ)-কে জিজ্ঞেস কর যে, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মা'বুদ নির্ধারিত করেছি যাদের তারা ইবাদত করবে?' ফেরেশতাদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেনঃ

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ۔

অর্থাৎ 'তাদের মধ্যে যে বলে– আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমিই পূজনীয় আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করাবো এবং এভাবেই আমি অত্যাচারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।' (২১ঃ ২৯)

٨١- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৮১। এবং আল্লাহ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করবার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে– তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমারা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও বলেছিলেন– তোমারা কি এতে স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল– আমরা স্বীকার করলাম, তিনি বললেন– তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

٨٢- فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৮২। অতঃপর এর পরে যারা ফিরে যাবে, তারাই দুষ্কার্যকারী।

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে– হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবী (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলা এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, কোন সময় যখন তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ পাক গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করবেন এবং তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন, তখন যদি তাঁর যুগেই অন্য কোন নবী এসে যান তবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা এ নবীর অবশ্য কর্তব্য। এই নয় যে, স্বীয় জ্ঞান ও নবুওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করতঃ তিনি তাঁর পরবর্তী নবী (আঃ)-এর অনুসরণ ও সাহায্য হতে বিরত থাকবেন। অতঃপর তিনি নবীদেরকে বলেনঃ 'তোমরা কি

এটা স্বীকার করলে এবং আমার সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করলে?' তাঁরা তখন বললেনঃ 'আমরা স্বীকার করলাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও সাক্ষী থাকলাম। অতঃপর যে কেউ এই অঙ্গীকার হতে ফিরে যাবে সে নিশ্চিতরূপে দুষ্কার্যকারী।'

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর নিকট এই অঙ্গীকার নেন যে, যদি তিনি তাঁর যুগে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেন তবে তাঁর অবশ্যকর্তব্য হবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা, আর স্বীয় উম্মতকেও উপদেশ দেয়া যে, তারাও যেন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে থাকে। হযরত তাঊস (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা নবীদের (আঃ) নিকট অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা যেন একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদন করেন।' কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, এ তাফসীর উপরের তাফসীরের বিপরীত বরং এটা ওরই পৃষ্ঠপোষক। এ জন্যেই হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত বর্ণনার মতই হযরত তাঊস (রঃ) হতে তাঁর পূর্বের বর্ণনাও বর্ণিত আছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার এক কুরাইযী ইয়াহূদী বন্ধুকে বলেছিলাম যে, সে যেন আমাকে তাওরাতের সমস্ত কথা লিখে দেয়। আপনার অনুমতি হলে আমি ঐগুলো পেশ করি।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত (রাঃ) তখন হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেনঃ 'আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখমণ্ডলের অবস্থা লক্ষ্য করছেন না?' তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আল্লাহকে প্রভুরূপে, মুহাম্মাদ (সঃ)-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে ধর্মরূপে আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিচ্ছি।' এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্রোধ বিদূরিত হয় এবং তিনি বলেনঃ 'যে আল্লাহর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি হযরত মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে আগমন করেন এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর তবে তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমার অংশের উম্মত তোমরাই এবং সমস্ত নবী (আঃ)-এর মধ্যে তোমাদের অংশের নবী আমি।'

মুসনাদ-ই-আবু ইয়ালার মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা কিতাব ধারীদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করো না। তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট, সুতরাং তোমাদেরকে কিরূপে তারা সুপথ প্রদর্শন করবে? বরং সম্ভবতঃ তোমরা কোন মিথ্যার সত্যতা প্রতিপাদন করবে এবং কোন সত্যকে মিথ্যা বলে দেবে। আল্লাহর শপথ! যদি হযরত মূসাও (আঃ) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতেন তবে তাঁর জন্যে আমার আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু বৈধ হতো না।' কোন কোন হাদীসে রয়েছেঃ 'যদি হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁদেরও আমার আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় ছিল না।' সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নবীদের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সবচেয়ে বড় ইমাম। যে কোন যুগে তিনি নবী হয়ে আসলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা সবারই জন্যে অবশ্য কর্তব্য হতো। আর সেই যুগের সমস্ত নবী (আঃ)-এর আনুগত্যের উপর তাঁর আনুগত্য অগ্রগণ্য হতো। এ কারণেই মিরাজের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁকেই সমস্ত নবী (আঃ)-এর ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছি। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠেও আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র সুপারিশকারী তিনিই হবেন। এটাই ঐ 'মাকাম-ই-মাহমুদ' যা তিনি ছাড়া আর কারও জন্যে উপযুক্ত নয়। সমস্ত নবী এবং প্রত্যেক রাসূল সেদিন এ কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। অবশেষে তিনিই বিশেষভাবে এ স্থানে দণ্ডায়মান হবেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সদা-সর্বদার জন্যে তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন।

৮৩। তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

٨٣- اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৮৪। তুমি বল– আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা

٨٤- قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ

ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও নবীগণকে তাদের প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা তাদের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য জ্ঞান করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

وَاسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৮৫। আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮৫- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ ও রাসূলদের মাধ্যমে যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদত করা, এছাড়া যদি কোন ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তবে তা কখনই গৃহীত হবে না। একথাই এখানে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু খুশী মনেই হোক বা অসন্তুষ্ট চিত্তেই হোক, তাঁর বাধ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا (সেজদার আয়াত)

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত মখলুক আল্লাহর সামনে খুশী মনে বা বাধ্য হয়ে সিজদা করে থাকে।' (১৩ঃ ১৫) অন্য জায়গায় রয়েছে– 'তারা কি দেখে না যে, সমস্ত সৃষ্টজীবের ছায়া ডানে ও বামে ঝুঁকে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করে থাকে এবং আকাশসমূহের সমস্ত জিনিস ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহরই জন্যে সিজদা করে থাকে, কেউ অহংকার করে না এবং তারা সবাই স্বীয় প্রভুকে ভয় করে থাকে ও তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা

তারা পালন করে।' সুতরাং মুমিনদের ভেতর ও বাহির দু'টোই আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে। আর কাফিরেরাও তাঁর মুষ্টির মধ্যে রয়েছে এবং বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে নত হয়ে আছে। সর্বদিক দিয়েই তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর প্রতাপ ও ক্ষমতার বাইরে নেই। এ আয়াতের তাফসীরে একটি গারীব হাদীসও এসেছে। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আকাশবাসী তো হচ্ছেন ফেরেশতাগণ। তাঁরা সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে নিয়োজিত রয়েছেন। আর পৃথিবীবাসী ওরাই যারা ইসলামের উপর সৃষ্ট হয়েছে। এরাও খুশী মনে আল্লাহর অনুগত। নিরানন্দ অধীন তারাই যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমান সৈনিকদের হাতে বন্দী হয় এবং শৃংখলিত অবস্থায় আনীত হয়। এ লোকদেরকেই জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার হয় কিন্তু তারা তা চায় না। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছেঃ 'তোমার প্রভু ঐ লোকদের জন্যে বিস্ময়বোধ করেন যাদেরকে শৃংখল ও রশিতে বেঁধে জান্নাতের দিকে টেনে আনা হয়।' এ হাদীসের আরও সনদ রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতের অর্থ ওটাই বেশী দৃঢ় যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

অর্থাৎ 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে যে আল্লাহ।' (৩৯ঃ ৩৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ প্রথম দিন বুঝানো হয়েছে যেদিন তাদের সবারই নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল।

'সবাই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলকেই আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে মুমিনগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআন কারীমের উপর, ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক ও ইয়াকূব (আঃ)-এর উপর যে পুস্তিকাসমূহ ও অহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলোর উপর, আর তাঁদের সন্তানদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।'

اَلْاَسْبَاطُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের গোত্র যারা হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত ছিল। এরা ছিল হযরত ইয়াকূবের বারোটি পুত্রের সন্তান। হযরত মূসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল তাওরাত এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল ইঞ্জীল। আরও যত নবী (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট হতে যা কিছু এনেছেন ঐগুলোর উপরও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আনয়ন করি না। অর্থাৎ কাউকে মানবো এবং কাউকে মানবো না, এ কাজ আমরা করি না, বরং সকলের উপরেই আমাদের ঈমান রয়েছে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত। সুতরাং এ উম্মতের মুমিনগণ সমস্ত নবী (আঃ) ও গ্রন্থ মেনে থাকে। তারা কোন নবীকে অস্বীকার করে না এবং তারা প্রত্যেক নবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আল্লাহর দ্বীন-ই-ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসন্ধানে যে লেগে থাকে তা কখনও গৃহীত হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার নির্দেশের বহির্ভূত, তা প্রত্যাখ্যাত।' মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন কার্যাবলী আগমন করবে। নামায এসে বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আমি নামায।' আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'তুমি ভাল জিনিস।' সাদকা এসে বলবে– 'হে প্রভু! আমি সাদকা।' উত্তর হবে– 'তুমিও মঙ্গলের উপর রয়েছো।' রোযা এসে বলবে– 'আমি রোযা।' আল্লাহ তা'আলা বলবেন– 'তুমিও মঙ্গলের উপর আছ।' তারপর আরও আমলসমূহ আসবে এবং সবকেই এ উত্তরই দেয়া হবে। অতঃপর ইসলাম এসে বলবে–'হে আল্লাহ! আপনি সালাম এবং আমি ইসলাম।' আল্লাহ তা'আলা বলবেন– 'তুমি মঙ্গলের উপর রয়েছো। আজ আমি তোমার কারণেই ধরবো এবং তোমার কারণেই পুরস্কৃত করবো।' আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বলেনঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔

অর্থাৎ 'যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' এ হাদীসটি শুধুমাত্র মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে এবং বর্ণনাকারী হাসানের হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে এটা শুনা প্রমাণিত নয়।

٨٦- كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৮৬। কিরূপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছে এবং তারা রাসূলের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল এবং তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ এসেছিল, আর আল্লাহ অত্যচারী সম্প্রদায়কে পথ-প্রদর্শন করেন না।

٨٧- اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ لا

৮৭। ওরাই– যাদের প্রতিফল এই যে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতা-গণের ও সমস্ত মানবের অভিসম্পাত।

٨٨- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○ لا

৮৮। তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে–তাদের উপর হতে শাস্তি প্রশমিত হবে না এবং তাদেরকে বিরাম দেয়া যাবে না।

٨٩- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا قف فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৮৯। কিন্তু যারা এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একজন আনসারী ধর্ম ত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর যে অনুশোচনা করতঃ স্বগোত্রীয় লোকের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) -কে জিজ্ঞেস করে যে, পুনরায় তার তাওবা গৃহীত হবে কি-না? তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। তার গোত্রের লোক তাকে বলে পাঠায়। তখন সে তাওবা করতঃ নতুনভাবে মুসলমান হয়ে হাযির হয়। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম

হাকিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ)-এর গ্রন্থেও এ বর্ণনাটি বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম হাকিম (রঃ) এ ইসনাদকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ-ই-আবদুর রাজ্জাকে রয়েছে যে, হযরত হারিস ইবনে সাভীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করতঃ স্বগোত্রের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর সম্বন্ধে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। তাঁর সম্প্রদায়ের একজন লোক এ আয়াতগুলো তাঁকে পড়ে শোনান। তিনি লোকটিকে বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আমার ধারণায় আপনি একজন সত্যবাদী লোক, আর নবী (সঃ) তো আপনার চেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সত্যবাদী অপেক্ষা খুব বেশী সত্যবাদী।' অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খুব ভালভাবেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। بَيِّنَاتٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতার উপর দলীল প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করেছে, দলীল প্রমাণাদি স্বচক্ষে দেখেছে, অতঃপর শিরকের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে, তারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য নয়। কেননা, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধত্বকে তারা পছন্দ করেছে। অবিবেচক লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করেন না। তাদের উপর আল্লাহও অভিশাপ দেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবও তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়ে থাকে। এ অভিশাপ হচ্ছে চিরস্থায়ী অভিশাপ। কোন সময়ের জন্য তাদের শাস্তি না হালকা করা হবে, না বন্ধ করা হবে। তারপর মহান আল্লাহ স্বীয় করুণা ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করেছেন যে, এ জঘন্য পাপ কার্যের পরেও যদি কেউ আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায় তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৯০। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছে, তৎপরে অবিশ্বাস পরিবর্ধিত করেছে তাদের ক্ষমা-প্রার্থনা কখনই পরিগৃহীত হবে না এবং তারাই পথভ্রান্ত।

٩٠- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۝

৯১। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মরেছে, ফলতঃ তাদের কারও

٩١- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ

أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَّمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ○

নিকট হতে পৃথিবী পরিপূর্ণ স্বর্ণও নেয়া হবে না- যদিও সে স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে তা প্রদান করে; ওদেরই জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্যে কোনই সাহায্যকারী নেই।

বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসকারী এবং ঐ অবিশ্বাসের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ কারীদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেছেন। বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় তাদের তাওবা গৃহীত হবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

অর্থাৎ 'জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি মৃত্যু দেখে তাওবা করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না।' (৪ঃ ১৮)

এখানেও ঐ কথাই বলা হয়েছে যে, তাদের তাওবা কখনই গৃহীত হবে না এবং এরাই তারা যারা সুপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'কতক লোক মুসলমান হয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে। তারপর তারা স্বীয় গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে যে,এখন তাদের তাওবা গৃহীত হবে কি-না? তাদের গোত্রের লোক তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (মুসনাদ-ই-বায্যার) এর ইসনাদ খুবই উত্তম।

এরপর বলা হচ্ছেঃ 'কুফরের উপর মৃত্যুবরণ কারীদের তাওবা কখনও গৃহীত হবে না, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে খরচ করে।' নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আবদুল্লাহ ইবনে জাদআন একজন বড় অতিথি সেবক ও গোলাম আযাদকারী লোক ছিল। তার এ পুণ্য কোন কাজে আসবে কি?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না, কেননা সে সারা জীবনে একবারও رَبِّ اغْفِرْلِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! কিয়ামতের দিন আমাকে ক্ষমা করুন বলেনি।' তার দান যেমন গৃহীত হবে না তেমনই তার বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

অর্থাৎ 'না তাদের বিনিময় গৃহীত হবে, না সুপারিশ কোন উপকার দেবে'। (২ঃ ১২৩) আরেক জায়গায় বলেনঃ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ অর্থাৎ 'সেইদিন না থাকবে ক্রয়-বিক্রয় না থাকবে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা।' অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছেঃ 'পৃথিবী পরিমাণ জিনিস যদি কাফিরদের নিকট থাকে এবং আরও এ পরিমাণ জিনিস হয়, অতঃপর সে ঐ সমস্তই কিয়ামতের শাস্তির বিনিময়ে মুক্তিপণরূপে প্রদান করে তবুও তা গ্রহণ করা হবে না, তাকে সেই কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিভোগ করতে হবে। ঐ বিষয়ই এখানেও বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ وَلَوِ افْتَدٰى শব্দের وَاوْ -টিকে অতিরিক্ত বলেছেন। কিন্তু وَاوْ-টিকে সংযোগের وَاوْ স্বীকার করতঃ আমরা যে তাফসীর করেছি ঐ তাফসীর করা খুব উত্তম। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে কোন জিনিসই রক্ষা করতে পারবে না। যদিও সে অত্যন্ত সৎ ও খুবই দানশীল হয়। যদিও সে পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, কিংবা পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি এবং সিক্ত মাটি পরিমাণ সোনা শাস্তির বিনিময়ে খরচ করে দেয় তবুও তা তার কোন উপকারে আসবে না।

'মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'জাহান্নামবাসীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে—'পৃথিবীতে যত কিছু রয়েছে সবই যদি তোমার হয়ে যায় তবে কি তুমি এ দিনের ভীষণ শাস্তির বিনিময়ে ঐ সমস্তই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে?' সে বলবে— হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'আমি তোমার নিকট এর তুলনায় অনেক কম চেয়েছিলাম। যখন তুমি তোমার পিতা আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। তুমি আমার সাথে কাউকেও অংশীদার করবে না। কিন্তু তুমি শির্ক ছাড়া থাকতে পারনি।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও অন্য সনদে রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এক জান্নাতবাসীকে আনা হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'বল, তুমি কিরূপ জায়গা পেয়েছো।' সে উত্তরে বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আমি খুব উত্তম জায়গা পেয়েছি।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেনঃ 'আচ্ছা, আরও চাইতে হলে চাও এবং মনের কিছু আকাঙ্খা থাকলে তা প্রকাশ কর।' সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমার শুধুমাত্র বাসনা এটাই এবং এ একটি মাত্রই যাচ্ঞা যে, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমি আপনার পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হবো, আবার জীবিত হবো এবং পুনরায় শহীদ হবো। দশবার যেন এ

রকমই হয়।' কেননা, শাহাদাতের প্রকৃষ্টতা এবং শহীদের পদ-মর্যাদা সে স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। অনুরূপভাবে একজন জাহান্নামবাসীকে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার স্থান কিরূপ পেয়েছো?' সে বলবেঃ 'হে আল্লাহ! খুবই জঘন্য স্থান।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেনঃ 'পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়া তুমি পছন্দ কর কি?' সে বলবেঃ 'হে প্রভু! হ্যাঁ'। সেই সময় মহান প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেনঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট এর চেয়ে বহু কম ও অত্যন্ত সহজ জিনিস চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি ওটাও করনি।' অতএব, তাকে জাহান্নামে পাঠিয় দেয়া হবে। তাই, এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'তাদের জন্যে বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং এমন কোন জিনিস নেই যা তাদেরকে এ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে বা তাদেরকে কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারে।

(তৃতীয় পারা সমাপ্ত)

৯২- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

৯২। তোমরা যা ভালবাস, তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না; এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন।

হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রঃ) বলেন যে, এখানে بِرٌّ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে জান্নাত। অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর সে পর্যন্ত তোমরা কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আনসারের মধ্যে হযরত আবূ তালহা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী। তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তির মধ্যে بَيْرُحَاءَ নামক বাগানটিকে সর্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করতেন। বাগানটি মসজিদই-ই-নববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই ঐ বাগানে গমন করতেন এবং ওর কূপের নির্মল পানি পান করতেন। যখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত আবূ তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা এরূপ কথা বলেছেন এবং এ بَيْرُحَاءَ (নামক

বাগানটিই) হচ্ছে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এ জন্যে আমি ওটি আল্লাহর পথে সাদকা করছি এ আশায় যে, তার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে তাই আমার জন্যে জমা থাকবে। সুতরাং আপনাকে অধিকার দিয়ে দিলাম যেভাবে ভাল মনে করেন ওটা বন্টন করে দিন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুশী হয়ে বলেনঃ 'বাঃ বাঃ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ। এর দ্বারা জনগণের বেশ উপকার সাধিত হবে। আমার মত এই যে, তুমি এ সম্পদ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও।' হযরত আবূ তালহা (রাঃ) বলেন, 'খুব ভাল।' অতঃপর তিনি ওটা তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (মুসনাদ-ই- আহমাদ, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, একবার হযরত উমারও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার সবচেয় প্রিয় ও উত্তম মাল ওটাই যা খাইবারে আমার জমির একটি অংশ রয়েছে। (আমি ওটা আল্লাহর পথে সাদকা করতে চাই) বলুন, কি করি?' তিনি বলেনঃ 'মূলকে (জমিকে) তোমার অধিকারে রাখ এবং ওর উৎপাদিত শস্য, ফল ইত্যাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দাও।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'পাঠের সময় যখন আমি উপরোক্ত আয়াতে পৌঁছি তখন আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ সম্বন্ধে চিন্তা করি। কিন্তু আমার রুমী দাসীটি অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন জিনিস আমার চোখে পড়লো না। কাজেই আমি ঐ দাসীটিকেই আল্লাহর পথে আযাদ করে দিলাম। আমার অন্তরে ওর প্রতি এত বেশী ভালবাসা রয়েছে যে, যদি আমি আল্লাহর পথে প্রদত্ত কোন জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারতাম তবে আমি অবশ্যই তাকে বিয়ে করে নিতাম।' (মুসনাদ-ই-বাযযার)

৯৩। তাওরাত অবতারণের পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্যে যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্যে বৈধ ছিল; তুমি বল- যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আনয়ন কর -তৎপরে ওটা পাঠ কর।

٩٣- كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَىٰةِ فَاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○

৯৪। অনন্তর যদি কেউ এর পর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তবে তারাই অত্যাচারী।

٩٤- فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৯৫। তুমি বল– আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং তিনি অংশীবাদীগণের অন্তর্গত ছিলেন না।

٩٥- قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার কয়েকজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ বলেঃ 'আমরা আপনাকে এমন কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করছি যেগুলো নবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আপনি ঐগুলোর উত্তর দিন।' তিনি বলেনঃ 'যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে সম্মুখে বিদ্যমান জেনে আমার নিকট ঐ অঙ্গীকার কর যে অঙ্গীকার হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদের (বানী ইসরাঈল) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি ঐ কথাগুলো তোমাদেরকে ঠিক ঠিক বলে দেই তবে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করতঃ আমার অনুগত হয়ে যাবে।' তারা শপথ করে বললোঃ 'আমরা একথা মেনে নিলাম। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করতঃ আপনার অনুগত হয়ে যাবো।'

অতঃপর তারা বললোঃ 'আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নে উত্তর দিনঃ (১) হযরত ইসরাঈল (হযরত ইয়াকূব আঃ) নিজের উপর কোন খাদ্য হারাম করেছিলেন? (২) পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনো পুত্র ও কখনো কন্যা হয় কেন? (৩) নিরক্ষর নবীর ঘুম কিরূপ হয়? এবং (৪) ফেরেশতাদের মধ্যে কোন্ ফেরেশতা তাঁর নিকট অহী নিয়ে আসেন?' এরপর তিনি দ্বিতীয়বার তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উত্তরে বলেনঃ (১) হযরত ইসরাঈল (আঃ) কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঐ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তবে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ করবেন। তারপরে তিনি আরোগ্য লাভ করলে উটের গোশ্ত খাওয়া ও দুধ পান পরিত্যাগ করেন। (২) পুরুষের বীর্যের রং

সাদা ও গাঢ় হয় এবং নারীর বীর্যের রং হলদে ও তরল হয়। এ দু-এর মধ্যে যা উপরে এসে যায় ওর উপরে সন্তান ছেলে বা মেয়ে হয়ে থাকে এবং আকার ও অনুরূপতাও ওর উপর নির্ভর করেই হয়। (৩) এ নিরক্ষর নবীর ঘুমের সময় চক্ষু ঘুমিয়ে থাকে বটে কিন্তু অন্তর জেগে থাকে এবং (৪) আমার নিকট ঐ ফেরেশতাই অহী নিয়ে আসেন যিনি সমস্ত নবীর নিকট অহী নিয়ে আসতেন। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)।' একথা শুনেই তারা চীৎকার করে বলে উঠেঃ 'যদি অন্য কোন ফেরেশতা আপনার বন্ধু হতেন তবে আপনার নবুওয়াতকে মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকতো না।' প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে শপথ করাতেন ও প্রশ্ন করতেন এবং তারা স্বীকার করতো যে উত্তর সঠিক হয়েছে। তাদের ব্যাপারেই مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ (২ঃ ৯৭)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ইসরাঈল (আঃ)-এর 'আরাকুন্ নিসা' রোগ ছিল এবং ঐ বর্ণনায় ইয়াহূদীদের ৫ম প্রশ্ন ছিলঃ 'বজ্র কি জিনিস?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা রয়েছেন যিনি মেঘের উপর নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁর হাতে একটি আগুনের চাবুক রয়েছে যার সাহায্যে তিনি মেঘকে ঐদিকে নিয়ে যান যেদিকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয় এবং এ গর্জনের শব্দ হচ্ছে ওরই শব্দ।' হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর নাম শুনে ঐ ইয়াহূদীরা বলেঃ 'তিনি তো হলেন শাস্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফেরেশতা এবং তিনি আমাদের শত্রু। যদি উৎপাদন ও মেঘের ফেরেশতা হযরত মীকাঈল (আঃ) আপনার বন্ধু হতেন তবে আমরা মেনে নিতাম।' হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানাদিও তাঁর নীতির উপরই ছিলেন এবং তাঁরাও উটের গোশ্ত খেতেন না। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক এক তো এ রয়েছে যে, ইসরাঈল (আঃ) যেমন তাঁর প্রিয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার 'নযর' করেছিলেন তদ্রূপ তোমরাও কর। কিন্তু হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর শরীয়তে এর নিয়ম এই ছিল যে, তারা স্বীয় পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ পাকের নামে পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু আমাদের শরীয়তে ঐ নিয়ম নেই। বরং আমাদেরকে এই বলা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের প্রিয় জিনিস হতে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করি। যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

অর্থাৎ 'মালের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও সে তা প্রদান করে থাকে।' (২ঃ১৭৭) অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا۔

অর্থাৎ 'চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, পিতৃহীন এবং বন্দীকে ভোজন করিয়ে থাকে'। (৭৬ঃ ৮) দ্বিতীয় সম্পর্ক এও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে খ্রীষ্টানদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত ছিল। কাজেই এখানে ইয়াহূদীদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, তাদের রীতিতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঠিক জন্মের ঘটনা বর্ণনা করতঃ তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হচ্ছে। এখানে তাদের ধর্ম রহিতকরণের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর তাদের বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান ছিল যে, হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকা হতে স্থলভাগে অবতরণ করেন তখন তাঁর জন্য সমস্ত জন্তু হালাল ছিল। অতঃপর হযরত ইয়াকূব (আঃ) উটের গোশ্ত ও দুধ হারাম করে নেন এবং তাঁর সন্তানেরাও ও দু'টো জিনিস হারামই মনে করতে থাকে। অতএব তাওরাতেও ওর অবৈধতা অবতীর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু জিনিস হারাম করা হয়। এটা রহিত ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রাথমিক যুগে হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে পরস্পর সহোদর ভাই বোনের বিবাহও বৈধ ছিল। কিন্তু পরে তা হারাম করে দেয়া হয়। পত্নীদের উপর কৃতদাসীর বিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর শারীয়াতে বৈধ ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আঃ) সারার (রাঃ) উপর হাজেরাকে বিয়ে করেন। কিন্তু আবার তাওরাতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সাথে দু' ভগ্নীকে বিয়ে করা ইয়াকুব (আঃ)-এর যুগে বৈধ ছিল। স্বয়ং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ঘরে একই সাথে দু' সহোদরা ভগ্নী পত্নীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাওরাতে এটাও হারাম করা হয়। এটাকেই রহিতকরণ বলে। এগুলো তারা দেখছে এবং স্বীয় গ্রন্থে পাঠ করছে। অথচ রহিতকরণকে অস্বীকার করত ঃ ইঞ্জীল ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে অমান্য করছে। অতঃপর তারা শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথেও এ ব্যবহারই করছে। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে, 'ইসরাঈল (আঃ) নিজের উপর যা হারাম করেছিলেন তাছাড়া তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সমস্ত খাবারই হালাল ছিল। সুতরাং তোমরা তাওরাত আনয়ন করত ঃ তা পাঠ কর। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ সব কিছুই ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি তোমাদের এ অপবাদ প্রদান যে, তিনি তোমাদের জন্য শনিবার দিনকে চিরদিনের জন্য সাপ্তাহিক খুশির দিন করেছেন, তোমাদের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তোমরা সদা-সর্বদা তাওরাতের উপরেই আমল করবে এবং অন্য কোন নাবীকে মানবেনা, এটা কত বড় অত্যাচারমূলক কথা! এসব কথা সত্ত্বেও তোমাদের এ

ব্যবহার নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে অত্যাচারী সাব্যস্ত করছে। আল্লাহ তা'আলা সত্য সংবাদ প্রদান করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম ওটাই যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। তোমরা এ কিতাব ও এ নবী (সঃ)-এর অনুসরণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কোন নবীও নেই এবং তাঁর শরীয়ত অপেক্ষা উত্তম শরীয়তও আর নেই।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বল যে, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল-সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন।' (৬ঃ ১৬১) অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 'আমি তোমার নিকট অহী করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

৯৬- اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًی لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

৯৬। নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা ঐ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত; ওটা সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্বাসীর জন্যে পথ-প্রদর্শক।

৯৭- فِیْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِیْمَ ۚ۬ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৯৭। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকাম-ই-ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা সেসব মানুষের কর্তব্য যারা তদ্দিকে পথাতিক্রমে সমর্থ এবং যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই অল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত।

অর্থাৎ মানবমণ্ডলীর ইবাদত, কুরবানী, তাওয়াফ, নামায, ই'তিকাফ ইত্যাদির জন্য আল্লাহর ঘর, যার নির্মাতা হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আঃ), যে ঘরের আনুগত্যের দাবী ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান, মুশরিক এবং মুসলমান সবাই করে থাকে ওটা ঐ ঘর যা সর্বপ্রথম মক্কায় নির্মিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বন্ধু এ ইবরাহীম (আঃ)-ই ছিলেন হজ্বের ঘোষণাকারী। কিন্তু বড়ই বিস্ময় ও দুঃখের কথা এই যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী করে, অথচ এ ঘরের সম্মান করে না, এখানে হজ্ব করতে আসে না, বরং নিজের কিবলা ও কা'বা পৃথক পৃথক করে বেড়ায়। এ বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যেই হিদায়াত নিহিত রয়েছে এবংএটা সারা বিশ্ববাসীর জন্যেই পথ-প্রদর্শক। হযরত আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি নির্মিত হয়েছে?' তিনি বলেনঃ 'মসজিদ-ই-হারাম।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ 'তারপরে কোন্টি'? তিনি বলেনঃ 'মসজিদ-ই-বায়তুল মুকাদ্দাস।' হযরত আবূ যার (রাঃ) আবার প্রশ্ন করেনঃ 'এ দু'টি মসজিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'চল্লিশ বছর।' তারপরে হযরত আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'এরপরে কোন্ মসজিদ?' তিনি বলেনঃ 'যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে, সমস্ত ভূমিই মসজিদ'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 'পূর্বে তো বহু ঘরই ছিল, কিন্তু বিশেষ করে আল্লাহর ইবাদতের ঘর সর্বপ্রথম এটাই।' কোন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'পৃথিবী পৃষ্ঠে কি সর্বপ্রথম এ ঘরটিই নির্মিত হয়েছে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'না, তবে কল্যাণময়, মাকাম-ই-ইবরাহীম এবং নিরাপত্তার ঘর সর্বপ্রথম এটাই'। বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-বাকারা وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ (২ঃ ১২৫)-এ আয়াতের তাফসীরে লিখিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ 'ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম এ ঘরটিই নির্মাণ করা হয়'। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তিটিই সঠিক। আর বায়হাকীর ঐ হাদীসটি, যার মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন, তাওয়াফ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তুমি সর্বপ্রথম মানুষ এবং এটাই সর্বপ্রথম ঘর'। এ হাদীসটি ইবনে লাহীআ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। সম্ভবতঃ এটা হযরত

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ)-এর নিজস্ব উক্তি এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি যে কিতাবীদের পুস্তকের দু'টি থলে পেয়েছিলেন ঐগুলোর মধ্যে এটাও লিখিত থাকবে। 'বাক্কা' হচ্ছে মাক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ নাম। বড় বড় স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির স্কন্ধ এখানে ভেঙ্গে যেত এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মস্তক এখানে নুয়ে পড়তো বলে একে মাক্কা বলা হয়েছে। একে মাক্কা বলার আর একটি কারণ এই যে, এখানে জনগণের ভীড় জমে থাকে। আরও একটি কারণ এই যে, এখানে মানুষ মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এমনকি কখনো কখনো স্ত্রী লোকেরা সম্মুখে সালাত আদায় করতে থাকে এবং পুরুষ লোকেরা তাদের পিছনে হয়ে যায়, যা অন্য কোন জায়গায় হয়না। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'ফাজ্জ হতে তানঈম পর্যন্ত হচ্ছে মাক্কা এবং বাইতুল্লাহ হতে বাতহা পর্যন্ত হচ্ছে বাক্কা। বায়তুল্লাহ এবং মসজিদকে বাক্কা বলা হয়েছে। বায়তুল্লাহ এবং ওর আশে-পাশের জায়গাকে বাক্কা, আর অবশিষ্ট শহরকে মক্কাও বলা হয়েছে। এর আরও বহু নাম রয়েছে। যেমন বায়তুল আতীক, বায়্তুল হারাম, বালাদুল আমীন, বালাদুল মামূন, উম্মে রহাম, উম্মুল কুরা, সিলাহ, আরশ, কাদিস, মুকাদ্দাস, নাসেবাহ, নাগেসাহ, হাতেমাহ, রা'স কাউসা, আল বালাদাহ, আল বায়েনাহ এবং আল কা'বা।' এর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার প্রমাণ বহন করে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাকের ঘর এটাই। এখানে মাকাম-ই-ইবরাহীমও (আঃ) রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নিকট হতে পাথর নিয়ে নিয়ে কা'বার দেয়াল উঁচু করতেন। এটা প্রথমে বায়তুল্লাহ শরীফের দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন, যেন তাওয়াফ পূর্ণভাবে হতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকাম-ই-ইবরাহীমের পিছনে নামায পড়তে চান তাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। ঐ দিকেই নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় পূর্ণ তাফসীরও وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ (২ঃ ১২৫) -এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে মাকাম-ই-ইবরাহীম। অবশিষ্টগুলো হচ্ছে অন্যান্য নিদর্শন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেছেন, মাকাম-ই-ইবরাহীমের উপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যে পদচিহ্ন রয়েছে ওটাও একটি নিদর্শন। সম্পূর্ণ হারাম শরীফকে,

হাতীমকে এবং হজ্বের সমুদয় রুকনকেও মুফাসসিরগণ মাকাম-ই-ইবরাহীমের তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যারা এ ঘরে প্রবেশ করে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। অজ্ঞতার যুগেও মক্কা নিরাপদ জায়গা হিসেবে গণ্য হতো। এখানে পিতৃহন্তাকে পেলেও তারা তাকে হত্যা করতো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'বায়তুল্লাহ আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়ে থাকে কিন্তু স্থান ও খানাপানি দেয় না।' কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا-

অর্থাৎ 'তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপত্তার জায়গা করেছি'? অন্য স্থানে রয়েছেঃ (২৯ঃ ৬৭)

وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

অর্থাৎ 'তিনি তাদেরকে ভয় হতে নিরাপত্তা দান করেছেন'। (১০৬ঃ ৪) শুধু যে মানবের জন্যেই নিরাপত্তা রয়েছে তা নয়, বরং তথায় শিকার করা, শিকারকে তথা হতে তাড়িয়ে দেয়া, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, তাকে তার অবস্থান স্থল হতে বা বাসা হতে সরিয়ে দেয়া বা উড়িয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ। তথাকার বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং ঘাস উঠিয়ে ফেলাও বৈধ নয়। এ বিষয়ে আরও বহু হাদীস সূরা-ই-বাকারার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে ওর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। মুসনাদ-ই-আহমাদ, জামেউত তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈর মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে যেটাকে ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাসান সহীহ বলেছেন। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার হারূরা বাজারে দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'হে মক্কা! তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার উপর হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না হতো তবে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' এ আয়াতের একটি অর্থ এও আছে যে, সে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ পেয়ে গেল। বায়হাকীর একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছেঃ 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলো সে পুণ্যের মধ্যে এসে গেল ও পাপ হতে দূর হলো এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হলো।' কিন্তু এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে নাওমাল, যিনি বর্ণনাকারী হিসেবে বলিষ্ঠ নন। আয়াতের শেষাংশ হচ্ছে হজ্ব ফরয হওয়ার দলীল। কেউ কেউ বলেন যে, وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এ আয়াতটিই হচ্ছে হজ্জ

ফরয হওয়ার দলীল। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই অধিকতর সঠিক। কয়েকটি হাদীসে এসেছে যে, হজ্ব ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন। এটা যে ফরয এর উপর মুসলমানদের ইজমা রয়েছে। আর একথাও সাব্যস্ত যে, সমর্থ ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার হজ্ব করা ফরয। নবী (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলেছিলেনঃ 'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ্ব করবে।' একটি লোক জিজ্ঞেস করেন– 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রতি বছরই কি?' তিনি তখন নীরব হয়ে যান। লোকটি তিনবার ঐ প্রশ্নই করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'আমি যদি 'হাঁ' বলতাম তবে প্রতি বছরই হজ্ব ফরয হয়ে যেতো। অতঃপর তোমরা পালন করতে পারতে না। আমি যা বলবো না তোমরা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অধিক প্রশ্ন করার ফলে এবং নবীদের (আঃ) উপর মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন কর এবং যে জিনিস হতে আমি নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ মুসলিম শরীফের এ হাদীসে এতটুকু বেশী রয়েছে যে, এ প্রশ্নকারী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আকরা' ইবনে হাবিস (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে এ কথাও বলেছিলেন যে, একবার ফরয ও পরে নফল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধেই لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদি আমি 'হাঁ' বলতাম ও প্রতি বছর হজ্ব ফরয হয়ে যেতো তবে তোমরা পালন করতে পারতে না, ফলে শাস্তি অবতীর্ণ হতো'। (সুনানে ইবনে মাজাহ) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সঃ) বিদায় হজ্বে স্বীয় সহধর্মিণীগণকে বলেছিলেনঃ 'হজ্ব হয়ে গেছে। এখন আর বাড়ী হতে বের হবে না।' এখন বাকী থাকলো ক্ষমতা ও সামর্থ। ওটা কখনও কারও মাধ্যম ব্যতিরেকেই মানুষের হয়ে থাকে, আবার কখনও কারও মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন আহকামের পুস্তকগুলোর মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাজী কে?' তিনি বলেনঃ 'বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত ব্যক্তি।' অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ হজ্ব উত্তম?' তিনি

বলেনঃ 'যে হজ্বে খুব বেশী কুরবানী করা হয় এবং 'লাব্বায়েক' শব্দ অধিক উচ্চারিত হয়।' আর একটি লোক প্রশ্ন করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! سَبِيل শব্দের ভাবার্থ কি?' তিনি বলেনঃ 'পাথেয়, পানাহারের উপযুক্ত খরচ এবং সোয়ারী।' এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল হলেও এর পিছনে অন্য সনদও রয়েছে। বিভিন্ন সাহাবী হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -এর তাফসীরে পাথেয় এবং সোয়ারীর কথা বলেছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা ফরয হজ্ব তাড়াতাড়ি আদায় করে নাও, না জানি কি ঘটে যায়।' সুনান-ই-আবূ দাঊদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছেঃ 'হজ্ব করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন শীঘ্রই স্বীয় বাসনা পূর্ণ করে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যার নিকট তিনশ রৌপ্যমুদ্রা রয়েছে সে সক্ষম ব্যক্তি।' হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, 'ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তা কখনও গৃহীত হবে না'। যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন ইয়াহূদীরা বলতে থাকেঃ 'আমরাও মুসলমান।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে বলেনঃ 'মুসলানদের উপর তো হজ্ব ফরয, তাহলে তোমরাও হজ্ব কর।' তখন তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বসে। ফলে এ আয়াতটি অবর্তীণ হয় এবং বলা হয় যে, হজ্বের অস্বীকারকারী কাফির। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি খাদ্য, পানীয় ও যানবাহনের উপর ক্ষমতা রাখে এ পরিমাণ মাল তার নিকট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করে না, সে ইয়াহূদী বা খ্রীষ্টান ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে।' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্ব করা মানুষের কর্তব্য যারা তদ্দিকে পথ অতিক্রমে সমর্থ, আর যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত।' এ হাসীসের বর্ণনাকারীর উপরও সমালোচনা রয়েছে। হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেন, 'ক্ষমতা থাকতেও যে ব্যক্তি হজ্ব করে না, সে ইয়াহূদী হয়ে বা খ্রীষ্টান হয়ে মারা যাবে।' এর সনদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। (হাফিয আবূ বাকর ইসমাঈলী) মুসনাদ-ই- সাঈদ ইবনে মানসুরের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলেছেনঃ "আমার ইচ্ছে রয়েছে যে, আমি বিভিন্ন শহরে লোক পাঠিয়ে দেবো এবং তারা ঐসব লোকের উপর জিযিয়া কর বসিয়ে দেবে যারা ক্ষমতা থাকতেও হজ্ব করে না। কেননা তারা মুসলমান নয়।"

৯৮। তুমি বল−হে কিতাবধারীরা! তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছো? এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ তদ্বিষয়ে সাক্ষী।

٩٨- قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৯। হে গ্রন্থপ্রাপ্তগণ! যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার মধ্যে কুটিলতার কামনায় কেন তোমরা তাকে আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করছো এবং তোমরাই সাক্ষী রয়েছো? আর তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

٩٩- قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

কিতাবীদের ঐ কাফিরদেরকে আল্লাহ ধমক দিচ্ছেন যারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকেও জোরপূর্বক ইসলাম হতে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি ছিল। পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁদের শুভ সংবাদ তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। নিরক্ষর, হাশেমী, আরবী, মক্কা ও মদীনাবাসী, বানী আদমের নেতা ও নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বর্ণনা তাদের গ্রন্থসমূহে মওজুদ ছিল। তথাপি তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেনঃ 'আমি খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করছি যে, তোমরা কিভাবে আমার নবীদেরকে অস্বীকার করছো, কি প্রকারে শেষ নবী (সঃ)-কে কষ্ট দিচ্ছ এবং কিরূপে আমার খাঁটি বান্দাদেরকে তাদের ইসলামের পথে বাধা প্রদান করছো। আমি তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী নই। তোমাদের প্রত্যেক অন্যায় কার্যের আমি পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো। আমি তোমাদেরকে সেদিন ধরবো যেদিন তোমরা তোমাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী পাবে না।'

١٠٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

১০০। হে মুমিনগণ! যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে- যদি তোমরা তাদের এক দলের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর কাফির বানিয়ে দেবে।

١٠١- وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ع

১০১। আর কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করতে পার- যখন আল্লাহর নিদর্শনাবলী তোমাদের সামনে পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বিদ্যমান রয়েছে? আর যে কেউ আল্লাহকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে, তবে নিশ্চয়ই তাকে সরল পথ-প্রদর্শিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে আহ্লে কিতাবের ঐ দলটির অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমাযুক্ত। কেননা, তারা হিংসুটে ও ঈমানের শত্রু। আল্লাহ তা'আলা যে আরবে নবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আহলে কিতাবের অনেকে তোমাদের প্রতি হিংসা বশতঃ তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয়া পছন্দ করে।' এখানেও আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন- 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তবে অবশ্যই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার ক্রটি মোটেই করবে না। আমি জানি যে, তোমরা কুফর হতে বহু দূরে রয়েছো, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা, তোমরা রাত দিন আল্লাহ

তা'আলার নিদর্শনাবলী পাঠ করতে রয়েছো এবং স্বয়ং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ 'তোমরা কেন বিশ্বাস স্থাপন করবে না? অথচ রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান করতে রয়েছেন এবং তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকারও করা হয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও।' হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা তাঁর সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈমানদার কে'? তাঁরা বলেনঃ 'ফেরেশতাগণ।' তিনি বলেনঃ 'তাঁরা ঈমান আনবেন না কেন? স্বয়ং তাদের উপর তো অহী অবতীর্ণ হচ্ছে'। সাহাবীগণ (রাঃ) বলেনঃ 'অতঃপর আমরা।' তিনি বলেনঃ 'তোমরা ঈমান আনবে না কেন? স্বয়ং আমি তো তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি।' তখন তাঁরা বলেনঃ 'দয়া করে আপনিই বলুন।' তিনি বলেনঃ 'সবচেয়ে ঈমানদার তারাই যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা গ্রন্থে লিখিত পাবে এবং ওর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর দ্বীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করলেই তারা সরল সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে এবং ভ্রান্ত পথ হতে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে পুণ্য লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।

১০২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মরো না।

١٠٢- يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ○

১০৩। আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেয়ো না; এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে

١٠٣- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, তৎপরে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনলকুণ্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন– যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।

আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবে না, তাঁকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন সময়েই তাঁকে ভুলে যাওয়া চলবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতঘ্ন হতে পারবে না। কোন কোন বর্ণনায় এ তাফসীর মারুফূ' রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাওকুফ হওয়াই সঠিক কথা। অর্থাৎ এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উক্তি। হযরত আনাস (রাঃ)-এর ঘোষণা এই যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার দাবী পূরণ করতে পারে না যে পর্যন্ত না সে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত করে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ আয়াতটি فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (৬৪ঃ ১৬)-এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। এ দ্বিতীয় আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ সাধ্যানুসারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি রহিত হয়ে যায়নি। বরং ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাঁর কার্যে যেন কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, এমনকি নিজের উপরেও যেন ন্যায়ের নির্দেশ জারী করে। নিজের পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের ব্যাপারেও যেন ইনসাফ কায়েম করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ কর'। অর্থাৎ সারা জীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও তার উপরেই হয়। ঐ মহান প্রভুর অভ্যাস এই যে, মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে চালিত করে ঐভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। যার উপরে তার মৃত্যু সংঘটিত হবে ওর উপরেই কিয়ামতের দিন তাকে উত্থিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা এর

বিপরীত হতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন, আমীন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, মানুষ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন এবং হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর হাতে একখানা কাষ্ঠখণ্ড ছিল। তিনি বর্ণনা করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করতঃ বলেনঃ 'যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তবে দুনিয়াবাসীদের আহার্য নষ্ট হয়ে যাবে। তারা কোন জিনিস খেতে ও পান করতে পারবে না। তাহলে কল্পনা কর যে, ঐ জাহান্নামীদের অবস্থা কি হতে পারে যাদের আহার্য হবে এ যাক্কুম।' অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে পৃথক থাকতে ও জান্নাতে যেতে চায় তার উচিত যে, যেন সে আমরণ আল্লাহ তা'আলার উপর এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে ও লোকদের সাথে ঐ ব্যবহার করে যে ব্যবহার সে নিজের জন্য তাদের নিকট কামনা করে'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তাঁর মুখে শুনেছিঃ 'দেখ, মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে'। (সহীহ্ মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তার ধারণার পার্শ্বেই রয়েছি। যদি আমার প্রতি তার ভাল ধারণা হয় তবে আমি তার মঙ্গল সাধন করবো। আর যদি আমার প্রতি তার মন্দ ধারণা হয় তবে তার নিকট ঐভাবেই হাযির হবো'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসটির পূর্ব অংশ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। মুসনাদ-ই-বায্যারে রয়েছে যে, এক রুগ্ন আনসারীকে দেখার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিকট গমন করেন। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ 'অবস্থা কিরূপ?' তিনি বলেনঃ 'আলহামদুলিল্লাহ্, ভালই আছি। প্রভুর করুণার আশা করছি এবং তাঁর শাস্তির ভয় করছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'জেনে রেখো, এরূপ অবস্থায় যার অন্তরে ভয় ও আশা উভয়ই থাকে তাকে আল্লাহ্ তার আশার জিনিস প্রদান করেন এবং ভয়ের জিনিস হতে রক্ষা করেন।' মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত হাকীম ইবনে খারাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করতঃ বলেনঃ 'আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পতিত হয়ে যাবো।' ইমাম নাসাঈ (রঃ) সুনানে নাসাঈর মধ্যে একথার ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি অধ্যায় করেছেনঃ 'সিজদায় কিভাবে যাওয়া উচিত তারই অধ্যায়।' তথায় বলা হয়েছে যে, সিজদায় ঐভাবে যাওয়া উচিত। আবার

নিম্নের ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়ছে– 'আমি মুসলমান না হয়ে মরবো না।' এ ছাড়া নিম্নের আর একটি ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়েছে– 'আমি জিহাদে শত্রুর দিকে পিঠ করে মৃত্যুবরণ করবো না।'

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে থাক, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ো না। (حَبْلُ اللّٰهِ) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন কারীম আল্লাহ তা'আলার একটি দৃঢ় রজ্জু এবং তাঁর সরল পথ। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে– 'আল্লাহর কিতাব তাঁর আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে লটকানো রজ্জু বিশেষ।' আরও একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে– 'এ কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার শক্ত রজ্জু, এটা প্রকাশ্য দীপ্তি। এটা সরাসরি আরোগ্য দানকারী এবং উপকারী। এর উপর আমলকারীর জন্যে এটা রক্ষাকবচ, এর অনুসারীদের জন্যে এটা মুক্তির উপায়।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ 'ঐ সব পথে তো শয়তানেরা চলে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে এসে যাও। তোমরা আল্লাহ পাকের রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। ঐ রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন। তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করো না এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেয়ো না।' সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ই'বাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলমান বাদশাহদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে বাজে ও অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ ধ্বংস করা।' বহু হাদীস এমন রয়েছে যেগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, একতার সময় মানুষ ভুল ও অন্যায় হতে রক্ষা পায়। আবার বহু হাদীসে মতানৈক্য হতে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও উম্মতের মধ্যে মতভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে ৭৩টি দল হয়ে গেছে, যাদের মধ্যে একটি দল মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। এরা ঐসব যারা এমন জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যার উপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয়

বান্দাদেরকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বড়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় লেগেই থাকতো। অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা পুণ্যের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে।

هُوَ الَّذِىٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ * وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

অর্থাৎ 'তিনিই সেই আল্লাহ যিনি স্বীয় সাহায্য দ্বারা এবং মুমিনদের সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেছেন।' (৮ঃ ৬২-৬৩)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন— 'হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে জাহান্নামের অগ্নির ধারে পৌঁছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে ওর ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিত'। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান করতঃ তোমাদেরকে ঐ আগুন থেকেও বাঁচিয়ে নিয়েছেন।'

হুনায়েন যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করতে গিয়ে কোন কোন লোককে কিছু বেশী প্রদান করেন তখন কোন একজন লোক কিছু কটূক্তি করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আনসার দলকে একত্রিত করতঃ একটি ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে তিনি একথাও বলেনঃ 'হে আনসারের দল! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুপথ-প্রদর্শন করেন? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি স্থাপন করেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করেন?' প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ করে সমস্বরে বলে উঠেনঃ 'আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) -এর অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশী রয়েছে।' হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, আউস ও খাযরাজের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে শত্রুতা ছিল, অথচ তারাও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছে দেখে ইয়াহূদীরা চোখে আঁধার দেখতে থাকে। তারা লোক নিযুক্ত করে যে, তারা যেন আউস ও খাযরাজের সভাস্থলে গমন করে এবং তাদেরকে তাদের পুরাতন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের নিহত

ব্যক্তিদের কথা যেন নতুনভাবে তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় এবং এভাবে যেন তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলে। এ ঔষধ একদা তাদের উপর পড়েও যায় এবং উভয় গোত্রের মধ্যে পুরাতন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। এমনকি তাদের মধ্যে তরবারী চালনারও উপক্রম হয়ে যায়। সেই অজ্ঞতার যুগের গণ্ডগোল ও চীৎকার শুরু হয়ে যায় এবং একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে পড়ে। স্থির হয় যে, তারা হুররার প্রান্তরে গিয়ে প্রাণ খুলে যুদ্ধ করবে এবং পিপাসার্ত ভূমিকে রক্ত পানে পরিতৃপ্ত করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সংবাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উভয় দলকে শান্ত করে দেন। অতঃপর তিনি তাদের উভয় দলকে বলেনঃ 'পুনরায় তোমরা অজ্ঞতা যুগের ঝগড়া শুরু করে দিলে? আমার বিদ্যমানবস্থায় তোমরা পরস্পরের মধ্যে তরবারী চালনা আরম্ভ করলে?' তারপরে তিনি তাদেরকে এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। এতে সবাই লজ্জিত হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পূর্বের কার্যের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে। আবার তারা পরস্পরে কোলাকুলি করে এবং হাতে হাত মিলিয়ে নেয়। পুনরায় তারা ভাই ভাই হয়ে যায়। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-কে যখন মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল এবং তাকে দোষমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন, তখন মুসলমানেরা একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছিল, সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

১০৪। এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত–যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সদ্বিষয়ে আদেশ করে ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।

١٠٤- وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০৫। এবং তাদের সদৃশ্য হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

١٠٥- وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

١٠٦- يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ قف اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

১০৬। সেই দিন কতকগুলো মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলো মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে! (তাদেরকে বলা হবে) তবে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব, তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে।

١٠٧- وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১০৭। আর যাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভুক্ত; তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে।

١٠٨- تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১০৮। আল্লাহর এ সকল নিদর্শন- যা আমি তোমার প্রতি সত্যসহ আবৃত্তি করছি এবং আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছে করেন না।

١٠٩- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ ع

১০৯। আর যা নভোমণ্ডলের মধ্যে আছে ও যা ভূমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে তা আল্লাহর জন্যে; এবং আল্লাহর দিকে কৃতকর্মসমূহ প্রত্যাবর্তিত হয়।

হযরত যাহ্হাক (রঃ) বলেন যে, 'এই দল' হতে ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবা ও বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী। অর্থাৎ মুজাহিদ এবং আলেমগণ। ইমাম আবূ যাফর বাকের (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন, অতঃপর বলেনঃ خَيْر শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের প্রচার ফরয। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দল এ কার্যে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত দ্বারা বাধা দেয়, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তবে যেন জিহ্বা (কথা) দ্বারা বাধা প্রধান করে, যদি এটাও করতে না পারে তবে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।' অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে – 'ওর পরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নেই'। (সহীহ মুসলিম) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা সৎকার্যের আদেশ ও মন্দকার্য হতে নিষেধ করতে থাক, নতুবা সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা গৃহীত হবে না।' এ বিষয়ের আরও হাদীস রয়েছে সেগুলো ইনশাআল্লাহ অন্য স্থলে বর্ণিত হবে।

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করো না। ভাল কার্যের আদেশ ও মন্দ কার্য হতে নিষেধ করা তোমরা পরিত্যাগ করো না।' মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফইয়ান (রাঃ) হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। যোহরের নামাযের পর তিনি দাঁড়িয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন–'কিতাব প্রাপ্তগণ তাদের ধর্মের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে ৭২টি দল হয়ে গেছে। আর আমার এ উম্মতের ৭৩টি দল হয়ে যাবে। অর্থাৎ সবাই প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়বে। কিন্তু আরও একটি দল রয়েছে এবং আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও হবে যাদের শিরায় শিরায় কুপ্রবৃত্তি এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমন কুকুরে কাটা ব্যক্তির শিরায় শিরায় বিষক্রিয়া পৌঁছে যায়। হে আরববাসী! তোমরাই যদি তোমাদের নবী (সঃ) কর্তৃক আনয়নকৃত বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত না থাক, তবে অন্যান্য লোক তো আরও বহু দূরে সরে পড়বে।' এ হাদীসটির বহু সনদ রয়েছে। এর পর আল্লাহ পাক বলেন– 'সেদিন কতকগুলো লোকের

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করবে এবং কতকগুলো লোক কৃষ্ণ চেহারা বিশিষ্টও হবে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখমণ্ডল শ্বেত বর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদ'আতের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণ বর্ণের। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট লোকেরা মুনাফিকের দল। তাদেরকে বলা হবে– তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে অস্বীকার করেছিলে বলে আজকার স্বাদ গ্রহণ কর। আর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট লোকগণ আল্লাহ তা'আলার করুণার মধ্যে সদা অবস্থান করবে। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) খারেজীদের মস্তকগুলো দামেশ্কের মসজিদের স্তম্ভে লটকানো দেখে বলেনঃ 'এরা নরকের কুকুর। এদের চেয়ে বেশী জঘন্য নিহত ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও নেই। এদেরকে হত্যাকারীগণ উত্তম মুজাহিদ।' অতঃপর يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ-এ আয়াতটি পাঠ করেন। আবূ গালিব (রঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি কি এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ হতে শুনেছেন?' তিনি বলেনঃ 'একবার দু'বার নয় বরং সাতবার শুনেছি। এরূপ না হলে আমি এ শব্দগুলো আমার মুখ দ্বারা বেরই করতাম না।' এখানে ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত আবূ যার (রাঃ)-এর বর্ণনায় একটি সুদীর্ঘ হাদীস নকল করেছেন, যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু সনদ হিসেবে এটা গারীব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী (সঃ)! ইহকাল ও পরকালে এ কথাগুলো আমি তোমার নিকট প্রকাশ করে দিচ্ছি। আল্লাহ ন্যায় বিচারক, তিনি মোটেই অত্যাচারী নন। প্রত্যেক জিনিসকেই তিনি খুব ভালই জানেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবানও বটে। সুতরাং তিনি যে কারও উপর অত্যাচার করবেন এটা মোটেই সম্ভব নয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। সমুদয় কৃতকর্ম তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। ইহজগতের ও পরজগতের পূর্ণ ক্ষমতবান শাসক একমাত্র তিনিই।'

১১০। তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্যে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে সমুদ্ভূত হয়েছ, তোমরা সদ্বিষয়ে আদেশ কর ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

١١٠- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

কর; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তগণ বিশ্বাস স্থাপন করতো তবে অবশ্যই তাদের জন্যে মঙ্গল হতো; তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুমিন এবং তাদের অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী।

١١١- لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

১১১। দুঃখ প্রদান ব্যতীত তারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না; আর যদি তারা তোমাদের সাথে সংগ্রাম করে, তবে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

١١٢- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

১১২। আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ এবং মনুষ্যগণের নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে– আল্লাহর কোপে নিপতিত হয়েছে এবং দারিদ্রে আক্রান্ত হয়েছে; এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছিল এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছিল; যেহেতু তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সীমা অতিক্রম করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 'তোমরা অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম উম্মত। তোমরা মানুষের ঘাড় ধরে ধরে তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করছো'। অন্যান্য ব্যাখ্যাদাতাগণও এ কথাই বলেন। ভাবার্থ হচ্ছে–'তোমরা সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই সবচেয়ে বেশী মুসলমানদের উপকার সাধনকারী।' আবূ লাহাবের কন্যা হযরত দুর্রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর ছিলেন এমন সময় একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার নিকট কোন্ ব্যক্তি উত্তম?' তিনি বলেনঃ 'মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী কুরআন কারীমের পাঠক, সবচেয়ে বেশী ধর্মভীরু, সবচেয়ে বেশী সৎকার্যের আদেশ দানকারী, সর্বাপেক্ষা অধিক মন্দকার্যে বাধাদানকারী এবং সর্বাপেক্ষা বেশী আত্মীয়তার বন্ধন সংযুক্তকারী।'(মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইনি ঐ সহচরিণী যিনি মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সঠিক কথা এই যে, এ আয়াতের মধ্যে সমস্ত উম্মত জড়িত রয়েছে। তবে অবশ্যই নিম্নের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সর্বোত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, তারপরে তার নিকটবর্তী যুগ এবং তারপরে তার পরবর্তী যুগ'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের সংখ্যা সত্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছো। আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা তাদের অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।' এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে এ উম্মতের নবী (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি সমস্ত মাখলুকের নেতা, সমস্ত রাসূল অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। তাঁর শরীয়ত এত পূর্ণ যে, এ রকম শরীয়ত আর কোন নবীর নেই। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এসব শ্রেষ্ঠত্ব একত্রকারী উম্মত ও সমস্ত উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ হবে। এ শরীয়তের সামান্য আমলও অন্যান্য উম্মতের অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি ঐ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি।' জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ 'ঐ নিয়ামতগুলো কি?' তিনি বলেনঃ (১) 'আমাকে প্রভাব প্রদান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমাকে পৃথিবীর চাবি প্রদান করা হয়েছে। (৩) আমার নাম আহমাদ (সঃ) রাখা হয়েছে। (৪) আমার জন্যে মাটিকে পবিত্র করা হয়েছে।

(৫) আমার উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা বেশী শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে'। মুসনাদ-ই-আহমাদ এ হাদীসটির ইসনাদ উত্তম। হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ আমি আবুল কাসিম (সঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)–কে বলেছিলেন, 'আমি তোমার পরে একটি উম্মত প্রতিষ্ঠিত করবো যারা শান্তির সময় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং বিপদে পুণ্য যাচ্ঞা করবে ও ধৈর্য ধারণ করবে, অথচ তাদের সহিষ্ণুতা ও জ্ঞান থাকবে না।' তিনি তখন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ 'সহিষ্ণুতা, দুরদর্শিতা এবং পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া এটা কিরূপে সম্ভব?' বিশ্ব প্রভু তখন বলেনঃ 'আমি তাদেরকে সহনশীলতা ও জ্ঞান দান করবো।' আমি এখানে এমন কতগুলো হাদীস বর্ণনা করতে চাই যেগুলোর বর্ণনা এখানে যথোপযুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময় হবে। তারা হবে সবাই একই অন্তর বিশিষ্ট। আমি আল্লাহ আ'আলার নিকট আবেদন করি– 'হে আমার প্রভু! এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'প্রত্যেকের সাথে আরও সত্তর হাজার।' হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেনঃ 'তাহলে তো এ সংখ্যার মধ্যে গ্রাম ও পল্লীবাসীও চলে আসবে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার প্রভু আমাকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' হযরত উমার (রাঃ) একথা শুনে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বেশী যাচ্ঞা করলে ভাল হতো।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি আমাকে সুসংবাদ দেন যে, প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার করে হবে।' হযরত উমার ফারূক (রাঃ) পুনরায় বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল(সঃ)! আরও বৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করলে ভাল হতো।' তিনি বলেনঃ 'আবার প্রার্থনা জানালে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সত্তর হাজারের অঙ্গীকার করেন।' হযরত উমার (রাঃ) পুনরায় আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু চাইতেন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি চেয়েছি এবং আরও এত বেশী লাভ করেছি।' অতঃপর তিনি দু' হাত প্রসারিত করে বলেনঃ 'এরূপ।' হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন যে, এভাবে যখন আল্লাহ তা'আলা একত্রিত করবেন তখন কত সংখ্যক মানুষ তাতে আসবে তা একমাত্র তিনিই জানেন। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত সাওবান (রাঃ) হিম্‌সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত্

ছিলেন তথাকার আমীর। তিনি হযরত সাওবান (রাঃ)-কে দেখতে যেতে পারেননি। কিলাঈ গোত্রের একটি লোক তাঁকে দেখতে যান। হযরত সাওবান (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি লেখা পড়া জানেন কি?' লোকটি বলেনঃ 'হ্যাঁ'। তখন হযরত সাওবান (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ 'লিখুন, 'এ পত্রটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেবক সাওবানের পক্ষ হতে আমীর আবদুল্লাহ ইবনে কুর্তকে দেয়া হচ্ছে। হাম্দ ও দরূদের পর প্রকাশ থাকে যে, যদি হযরত ঈসা (আঃ) অথবা হযরত মূসা (আঃ)-এর কোন খাদেম এখানে অবস্থান করতেন এবং রোগাক্রান্ত হতেন তবে আপনি অবশ্যই তাঁকে দেখতে যেতেন।' অতঃপর তিনি লোকটিকে বলেনঃ 'এ পত্রটি নিয়ে গিয়ে আমীরের নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন।' পত্রটি হিম্সের আমীরের নিকট পৌঁছলে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত সাওবান (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। দীর্ঘক্ষণ বসে তাঁকে দেখার পর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে হযরত সাওবান (রাঃ) তাঁর চাদর টেনে ধরেন এবং বলেনঃ একটি হাদীস শুনুন! আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখ হতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তি ভোগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার করে হবে'। (মুসনাদ -ই-আহমাদ) এ হাদীসটিও বিশুদ্ধ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ 'একদা রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে আলাপ আলোচনো করি। অতঃপর প্রত্যূষে তাঁর খিদমতে হাযির হলে তিনি বলেনঃ 'জেনে রেখো, আজ রাত্রে নবীগণ (আঃ)-এর নিজ নিজ উম্মতসহ আমাকে দেখানো হয়েছে। কোন কোন নবীর সাথে মাত্র তিনজন ছিলেন, কারও কারও সাথে ছিল ক্ষুদ্র একটি দল, কারও কারও সঙ্গে ছিল একটি জামা'আত এবং কারও কারও সাথে আবার একজনও ছিল না। যখন হযরত মূসা (আঃ) আগমন করেন তখন তাঁর সাথে বহু লোক ছিল। এ দলটি আমার নিকট পছন্দনীয় হয়। আমি জিজ্ঞেস করিঃ 'এটা কে?' বলা হয়ঃ 'ইনি আপনার ভাই হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা হচ্ছে বানী ইসরাঈল।' আমি বলিঃ আমার উম্মত কোথায়? উত্তর হয়ঃ 'আপনার ডান দিকে লক্ষ্য করুন।' অতঃপর আমি লক্ষ্য করে দেখি যে, অসংখ্য লোকের সমাগম হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন পর্বতও ঢাকা পড়ে যাবে। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি?' আমি বলি– হে আমার প্রভু! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর আমাকে বলা হয় 'এদের সাথে আরও সত্তর হাজার করে রয়েছে যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে

যাবে।' তখন নবী (সঃ) বলেনঃ 'যদি সম্ভব হয় তবে এ সত্তর হাজারের অন্তর্গত হয়ে যাও। তা যদি সম্ভব না হয় তবে ওদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যারা পর্বতসমূহ ঢেকে ফেলেছিল। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তবে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যারা আকাশের প্রান্তে প্রান্তে অবস্থান করছিল।' হযরত উক্কাসা ইবনে মুহসিন (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করেন।' তিনি প্রার্থনা করলে অন্য একজন সাহাবীও (রাঃ) দাঁড়িয়ে এ আরযই করেন। তখন তিনি বলেনঃ 'তোমার পূর্বে উক্কাসা (রাঃ) অগ্রাধিকার লাভ করেছে।' তখন আমরা পরস্পর বলাবিল করি যে, সম্ভবতঃ এ সত্তর হাজার ঐলোকেরাই হবে যারা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করতঃ সারা জীবনে কখনও আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করেনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এ আলোচনা জানতে পেরে বলেনঃ 'এরা ঐসব লোক যারা ঝাড় ফুঁক করিয়ে নেয় না, আগুন দ্বারা দাগিয়ে নেয় না এবং আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রাখে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য এক সনদে নিম্নের এটুকু বেশীও রয়েছে– 'যখন আমি আমার সম্মতি প্রকাশ করি তখন আমাকে বলা হয়– 'এখন আপনার বাম দিকে লক্ষ্য করুন। আমি তখন লক্ষ্য করে দেখি যে, অসংখ্য জনসমাবেশ রয়েছে যারা আকাশ প্রান্তকে ঘিরে ফেলেছে।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা হজ্ব মওসুমের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার উম্মতের এ আধিক্য আমার খুব পছন্দ হয়। তাদের দ্বারা সমস্ত পাহাড় পর্বত ও মাঠ প্রান্তর ভরপুর ছিল'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত উক্কাসা (রাঃ)-এর পরে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন আনসারী। (হাদীস তাবরানী) আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার বা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে চলে যাবে। যারা একে অপরের হাত ধরে থাকবে। তারা সবাই এক সাথে জান্নাতে যাবে। চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও তাবরানী) হযরত হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'রাত্রে যে তারকাটি ভেঙ্গে পড়েছিল তা তোমরা কেউ দেখেছিলে কি?' আমি বলিঃ হ্যাঁ, জনাব! আমি দেখেছি। আমি তখন নামাযে ছিলাম না। বরং আমাকে বিচ্ছুতে কেটে ছিল। তখন হযরত সাঈদ (রঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি তখন কি করেছিলে?' আমি বলিঃ ফুঁক দিয়েছিলাম। তিনি বলেনঃ কেন? আমি বলিঃ

হযরত শা'বী (রঃ) হযরত বুরাইদাহ্ ইবনে হাসীব (রঃ)-এর বর্ণনা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নযরবন্দী ও বিষাক্ত জন্তুর ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁক করিয়ে নিতে হবে।' তিনি বলেনঃ আচ্ছা বেশ! যার নিকট যা পৌঁছবে তার উপরেই সে আমল করবে। আমাকে তো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার উপরে উম্মতদেরকে পেশ করা হয়েছিল। কোন নবীর সাথে ছিল একটি দল। কারও সাথে ছিল একটি, কারও সাথে ছিল দু'টি এবং কারও কারও সাথে একটিও ছিল না। অতঃপর একটি বড় দল আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি তখন মনে করি যে, এদলটি আমারই উম্মত। পরে আমি জানতে পারি যে, ওটা হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মত। আমাকে বলা হয়-'আকাশ প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত কর।' আমি তখন দেখি যে, তথায় অসংখ্য লোক রয়েছে। আমাকে বলা হয়-'এগুলো আপনারই উম্মত এবং ওদের সাথে আরও ৭০ হাজার রয়েছে যারা বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিভোগে জান্নাতে চলে যাবে।' এ হাদীসটি বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো বাড়ী চলে যান, অপর সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন যে, সম্ভবতঃ এরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীই হবেন। কোন একজন বলেন যে, না, এঁরা ইসলামের উপরে জন্মগ্রণকারী এবং ইসলামের উপরেই মৃত্যুবরণকারী, ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর নবী (সঃ) আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমরা কি সম্বন্ধে আলোচনা করছো?' আমরা বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ 'না, বরং এরা ঐসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করে না ও করিয়ে নেয় না, দাগিয়ে নেয় না এবং ভাবী শুভাশুভের লক্ষণের উপর বিশ্বাস করে না, বরং স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা করে।' হযরত উক্কাসা (রাঃ) দু'আর প্রার্থনা জানালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।' অতঃপর অন্য এক ব্যক্তিও এ কথাই বললে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ 'উক্কাসা অগ্রগামী হয়েছে।' এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারীর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তথায় ঝাড় ফুঁক করিয়ে নেয় না এ কথাটি নেই। মুসলিমের মধ্যে এ কথাটিও রয়েছে। অন্য একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, প্রথম দলটি তো মুক্তি পেয়ে যাবে, তাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে, তাদের নিকট হিসাবও গ্রহণ করা হবে না। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্তিময় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট হবে। (সহীহ মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার সঙ্গে আমার প্রভুর অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রত্যেক

হাজারের সঙ্গে আরও ৭০ হাজার হবে এবং আমার মহাসম্মানিত প্রভুর লোপের (অঞ্জলি) তিন লোপ'। (হাফিজ আবূ বকর ইবনে আসেমের কিতাবুস সুনান) এর ইসনাদ খুবই উত্তম। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে তাঁর উম্মতের ৭০ হাজারের সংখ্যা শুনে হযরত ইয়াযিদ ইবনে আগনাস (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উম্মতের সংখ্যার তুলনায় তো এ সংখ্যা খুবই কম।' তখন তিনি বলেনঃ 'প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরও এক হাজার করে রয়েছে এবং এর পরে আল্লাহ তা'আলা তিন লোপ (করপুট) ভরে আরও দান করেন।' এর ইসনাদও উত্তম। (কিতাবুস সুনান) অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার মহা মহিমান্বিত প্রভু আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হতে ৭০ হাজার বিনা হিসেবে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। অতঃপর এক এক হাজারের সুপারিশক্রমে আরও ৭০ হাজার করে মানুষ জান্নাতে চলে যবে। তারপর আমার প্রভু স্বীয় দু' হাতের তিন লোপ ভরে আরও নিক্ষেপ করবেন।' এটা শুনে হযরত উমার (রাঃ) খুশী হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং বলেনঃ 'তাঁদের সুপারিশ হবে স্বীয় বাপ-দাদা, পুত্র-কন্যা এবং বংশ ও গোত্রের পক্ষে'। আল্লাহ করেন আমি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হই যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় লোপ ভরে শেষে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।' (তাবরানী হাদীস) এ সনদের মধ্যেও কোন ত্রুটি নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাদীদ নামক স্থানে একটি হাদীস বর্ণনা করেন. যার মধ্যে তিনি এও বর্ণনা করেনঃ 'এ ৭০ হাজার যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আমার ধারণায় তারা আসতে আসতে তো তোমরা তোমাদের জন্যে, তোমাদের ছেলে মেয়েদের জন্যে এবং তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে জান্নাতে স্থান নির্ধারিত করেই ফেলবে।' (মুসনাদ-ই আহমাদ) এর সনদও মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর রয়েছে। অন্য আর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার রয়েছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে চার লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।' হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বেশী করুন।' একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'হে আবূ বকর (রাঃ)! এটাই যথেষ্ট মনে করুন।' তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেন, 'কেন জনাব? আমরা যদি সবাই জান্নাতে চলে যাই তবে আপনার ক্ষতি কি?' হযরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ 'যদি আল্লাহ পাক চান তবে একই হাতে সমস্ত সৃষ্টজীবকে জান্নাতে নিক্ষেপ করবেন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'উমার (রাঃ) ঠিকই বলেছে।' (মুসনাদ-ই-আবদুর

রাযযাক) এ হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণনা করা হয়েছে, ওতে সংখ্যা রয়েছে এক লাখ। (ইসবাহানী) আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ ৭০ হাজার ও প্রত্যেকের সঙ্গে আরও ৭০ হাজার এবং আল্লাহ তা'আলার লোপ ভরে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়ার বর্ণনা শুনেন তখন তাঁরা বলতে থাকেনঃ 'তাহলে এতদ্‌সত্ত্বেও যে জাহান্নামে যাবে তার মত হতভাগা আর কে আছে?' (আবূ ইয়ালা) উপরের হাদীসটি অন্য একটি সনদেও বর্ণিত আছে, তাতে সংখ্যা রয়েছে তিন লাখ। অতঃপর হযরত উমার (রাঃ)-এর উক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাঁর উক্তির সত্যতা স্বীকারের বর্ণনা রয়েছে। (তাবারানী হাদীস গ্রন্থ) অন্য একটি বর্ণনায় জান্নাতে প্রবেশকারীদের বর্ণনা করতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের সমস্ত মুহাজির তো এ সংখ্যার মধ্যে এসে যাবে এবং অবশিষ্টগুলো হবে পল্লীবাসীদের দ্বারা পূর্ণ'। (মুহাম্মদ ইবনে সাহল) হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হিসেব করা হলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় চার কোটি নব্বই হাজার। তাবরানীর হাদীসের মধ্যে আরও একটি হাসান হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ! তোমরা এক অন্ধকার রাত্রির মত অসংখ্য লোক একই সাথে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবে, জমীন তোমাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। সমস্ত ফেরেশতা সশব্দে বলে উঠবেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সঙ্গে যে দল এসেছে তা সমস্ত নবীর দলসমূহ অপেক্ষা অনেক বেশী।' হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– শুধুমাত্র আমার অনুসারী উম্মত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে।' সাহাবীগণ খুশী হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। পুনরায় তিনি বলেন, 'আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে।' আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করি। আবার তিনি বলেন, 'আমি আশা করছি যে, তোমরা অর্ধেক হয়ে যাবে'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বলেন, 'তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে এতে সন্তুষ্ট নও?' তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও?' তাঁরা পুনরায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করতঃ তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি তখন বলেন, 'আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হয়ে যাবে।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) তাবরানীর হাদীসের মধ্যে এ বর্ণনাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)

হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি চাও যে, জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হবে এবং বাকী তিন চতুর্থাংশ অন্যান্য সমস্ত উম্মত হবে।' সাহাবীগণ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) সবচেয়ে ভাল জানেন।' তিনি বলেন, 'আচ্ছা, যদি তোমরা এক তৃতীয়াংশ হও তবে?' তাঁরা বলেন, 'এটা খুব বেশী।' তিনি বলেন, 'আচ্ছা যদি তোমরা অর্ধেক হও তবে?' তাঁরা বলেন 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তা হলে তো এটা আরও অনেক বেশী'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেন, 'জেনে রেখো, সমস্ত জান্নাতবাসীর মোট একশ বিশটি সারি হবে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র আমার এ উম্মতেরই হবে আশিটি সারি।' মুসনাদ-ই-আহমাদেও রয়েছে যে, জান্নাত বাসীদের একশ বিশটি সারি হবে, তন্মধ্যে আশিটি সারি এ উম্মতেরই হবে। এ হাদীসটি তাবরানী, জামেউত তিরমিযী প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে। তাবরানীর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ - وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ, 'একটি বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং একটি বিরাট দল হবে পরবর্তীদের মধ্যে হতে'। (৫৬ঃ ৩৯-৪০)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'তোমরা জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ, আবার বলেন, 'এক তৃতীয়াংশ, তার পরে বলেন, বরং অর্ধেক, সর্বশেষে বলেন, 'দুই তৃতীয়াংশ।' সহীহ বুখারী শরীফে ও সহীহ মুসলিম শরীফ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে এসেছি এবং জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবো। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব পূর্বে দেয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক প্রদান করেছেন। জুম'আর দিনও এরূপই যে, ইয়াহূদীরা আমাদের পিছনে রয়েছে, অর্থাৎ শনিবার এবং খ্রীষ্টানেরা তাদেরও পিছনে রয়েছে অর্থাৎ রবিবার।' দারেকুতনীর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'আমি যে পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ না করবো সে পর্যন্ত অন্যান্য নবীদের জন্যে জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর যে পর্যন্ত আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে সে পর্যন্ত অন্যান্য উম্মতের জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।' এগুলোই ছিল ঐ সব হাদীস যেগুলোকে আমরা এখানে বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। উম্মতের উচিত যে, এখানে এ আয়াতের মধ্যে যতগুলো বিশেষণ রয়েছে সেগুলোর উপর যেন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান, মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় হজ্বে এ আয়াতটি পাঠ করতঃ বলেনঃ 'যদি তোমরা এ

আয়াতের প্রশংসার মধ্যে আসতে চাও তবে এ সমুদয় গুণও নিজেদের ভেতর সৃষ্টি কর।' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, 'গ্রন্থ প্রাপ্তগণ ঐ সব কাজ পরিত্যাগ করেছিল বলেই আল্লাহ পাক স্বীয় কালামে তাদেরকে নিন্দে করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ

অর্থাৎ "তারা মানুষকে অন্যায় কর্ম হতে বিরত রাখতো না।" (৫ঃ৭৯) যেহেতু উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাই পরে গ্রন্থধারীদের নিন্দে করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–'এ লোকগুলোও যদি আমার শেষ নবী (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতো তবে তারাও এ মর্যাদা লাভ করতো। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অবিশ্বাস, দুষ্কার্য ও অবাধ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের মধ্যে কতক লোক ঈমানদারও রয়েছে'।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন– 'তোমরা হতবুদ্ধি ও চিন্তিত হয়ে পড়ো না, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত করবেন।' যেমন আল্লাহ তা'আলা খায়বারের যুদ্ধে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন এবং এর পূর্বে বানূ কাইনুকা, বানূ নাযীর এবং বানূ কুরাইযাকেও লাঞ্ছিত ও পরাভূত করেছিলেন। অনুরূপভাবে সিরিয়ার খ্রীষ্টানগণ সাহাবীদের আমলে পরাজিত হয়েছিল এবং সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় ও চিরদিনের জন্যে মুসলমানদের অধিকারে এসে পড়ে। তথায় এক সত্যপন্থী দল হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। হযরত ঈসা (আঃ) এসে ইসলাম ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর শরীয়ত অনুযায়ী নির্দেশ দান করবেন এবং ক্রুশ ছিন্ন করবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন না এবং শুধুমাত্র ইসলামই গ্রহণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'তাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও হীনতা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কোন জায়গাতেই তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নেই, তবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় দানের দ্বারা নিরাপত্তা পেতে পারে।' অর্থাৎ যদি তারা জিযিয়া প্রদান করে ও মুসলমান বাদশাহদের আনুগত্য স্বীকার করে তবে এক নিরাপত্তা পেতে পারে। কিংবা মুসলমানদের আশ্রয়দানের দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করতে পারে, অর্থাৎ যদি মুসলমানদের সাথে চুক্তি হয়ে যায় বা কোন মুসলমান যদি তাদেরকে আশ্রয় দান করে তবেও তারা নিরাপত্তা লাভ

করতে পারে। যদি সে নিরাপত্তা কোন স্ত্রী লোক বা কোন ক্রীতদাসও দান করে তবুও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। আলেমদের একটি উক্তি এও রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে حَبْل শব্দের অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে পতিত হয়েছে এবং দারিদ্রে আক্রান্ত হয়েছে। এটাও তাদের কুফ্‌র, নবীদেরকে হত্যা, অহংকার, হিংসা এবং অবাধ্যতারই প্রতিফল। এ কারণেই তাদের উপর চিরদিনের জন্যে লাঞ্ছনা, হীনতা এবং দৈন্য নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের অবাধ্যতা এবং সত্যের সীমা অতিক্রমেরই প্রতিদান। আবু দাউদ এবং তায়ালেসীর মধ্যে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈল এক এক দিনে তিনশ জন করে নবী হত্যা করতো এবং দিনের শেষভাগে বাজারে নিজ নিজ কাজে লেগে যেতো।

১১৩। তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে এক সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় রয়েছে যারা রজনী যোগে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সিজদা করে থাকে।

١١٣- لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○

১১৪। তারা আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে এবং সদ্বিষয়ে আদেশ ও অসদ্বিষয়ে নিষেধ করে এবং সৎকার্যসমূহে তৎপর থাকে, আর তারাই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

١١٤- يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১১৫। আর তারা যে সৎকার্য করবে, ফলতঃ তা কখনও ব্যর্থ হবে না; এবং আল্লাহ ধর্মভীরুগণকে পরিজ্ঞাত আছেন।

١١٥- وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

١١٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১১৬। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধনরাশি আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র ফলপ্রদ হবে না এবং তারাই অগ্নির অধিবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

١١٧- مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১১৭। তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্য পূর্ণ ঝঞ্ঝা বায়ুর অনুরূপ–যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে–ওটা সে সকল সম্প্রদায়ের শস্য ক্ষেতে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আহ্লে কিতাব এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অনুসারীগণ সমান নয়। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ইশার নামাযে আসতে বিলম্ব করেন। অতঃপর যখন আগমন করেন তখন সাহাবীগণ অপেক্ষমান ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ 'তোমরা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের লোক এখন আল্লাহ তা'আলার যিকির করছে না।' তখন আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাতার মতে এ আয়াতগুলো আহলে কিতাবের আলেমগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), হযরত আসাদ ইবনে উবায়েদ (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে শু'বা (রাঃ) প্রভৃতি। এসব লোক ঐসব আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নন পূর্বে যাদের জঘন্য কাজের নিন্দে করা হয়েছে এবং এ ঈমানদার

লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর শরীয়তের তারা অনুসারী, তাদের মধ্যে ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে। এ নির্মল নিষ্কলুষ লোকগুলো রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযেও আল্লাহ পাকের কালাম পাঠ করে থাকে এবং জনগণকেও তারা এসব কাজেই নির্দেশ দেয় এবং এরা বিপরীত কার্য হতে বিরত রাখে। ভাল কাজে তারা সদা অগ্রগামী থাকে।' এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেন যে, তারা ভাল লোক। এ সূরার শেষেও বলেনঃ 'আহলে কিতাবের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর উপর, তোমাদের উপর অবতারিত গ্রন্থের উপর এবং তাদের উপর অবতারিত গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে থাকে।' এখানেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সৎকার্যাবলী বিনষ্ট হবে না এবং তাদেরকে তাদের সমুদয় কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। সমস্ত আল্লাহ-ভীরু মানুষ আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতেই রয়েছে। তিনি কারও সৎকার্য বিনষ্ট করেন না। তবে ধর্মদ্রোহী লোকদের জন্যে তাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন উপকারে আসবে না। তারা জাহান্নামের অধিবাসী। صِرٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা যা শস্যসমূহ ধ্বংস করে থাকে। মোটকথা যেমন শস্য ক্ষেত্রে বরফ জমে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়, এ কাফিরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এরা যা কিছু খরচ করে তার পুণ্য লাভ তো দূরের কথা, বরং তাদের আরও শাস্তি হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং এটা তাদের মন্দ কার্যাবলীরই শাস্তি।

১১৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদের ব্যতীরেকে অন্য কাউকে মিত্ররূপে গ্রহণ করো না- তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সংকুচিত হবে না এবং তোমরা যাতে বিপন্ন হও, তারা তাই কামনা করে; বস্তুতঃ তাদের মুখ হতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয় এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে

١١٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ

اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

তা গুরুতর; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করছি– যেন তোমরা বুঝতে পার।

١١٩- هٰاَنْتُمْ اُولَاۤءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْاۤ اٰمَنَّا ۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১১৯। সাবধান হও– তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর; আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে– আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে অঙ্গুলিসমূহ দংশন করে; তুমি বল– তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও! নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন।

١٢٠- اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۫ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○ ع

১২০। যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তারা আনন্দিত হয়ে থাকে এবং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না; তারা যা করে–নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

এখানে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন–'এরা তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাদের বাহ্যিক মিষ্ট কথায় ভুলে যেও না এবং তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ো না। নতুবা তারা সুযোগ পেয়ে তোমাদেরকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তদের ভেতরের শত্রুতা তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমরা তাদের নিকট তোমাদের গুপ্ত কথা কখনও প্রকাশ করো না'। بِطَانَةً বলা হয় মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধুকে এবং مِنْ دُوْنِكُمْ দ্বারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলকে বুঝানো হয়েছে। সহীহ বুখারী প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা যে নবীকেই প্রেরণ করেছেন এবং যে প্রতিনিধিকেই নিযুক্ত করেছেন, তাঁর জন্যে তিনি দু'জন বন্ধু নির্ধারিত করেছেন। একজন তাঁকে ভাল কথা বুঝিয়ে থাকেন ও ভালকার্যে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং অপরজন তাঁকে মন্দকার্যের পথ-প্রদর্শন করে ও সেই কার্যে উত্তেজিত করে। সুতরাং আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষা পেতে পারে।' হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে বলা হয়ঃ 'এখানে 'হীরার' একজন লোক রয়েছে, খুব ভাল লিখতে পরে এবং তার স্মরণশক্তি খুব ভাল সুতরাং আপনি তাকে আপনার লিখক নিযুক্ত করুন।' একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'তাহলে তো আমি একজন অমুসলিমকে আমার বন্ধু বানিয়ে নেবো যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন'! এ ঘটনাটিও এ আয়াতটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, যিম্মী কাফিরদেরকেও এরূপ কার্যে নিয়োগ করা উচিত নয়। কেননা, হতে পারে যে, তারা শত্রুপক্ষকে মুসলমানদের গোপনীয় কথা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেবে। কারণ, মুসলমানদের পতনই তাদের কাম্য। হযরত আযহার ইবনে রাশেদ (রঃ) বলেন যে, মানুষ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকট হাদীস শুনতেন। কোন হাদীসের ভাবার্থ বোধগম্য না হলে তাঁরা হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর নিকট তা বুঝে নিতেন। একদা হযরত আনাস (রাঃ) নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেনঃ 'তোমরা অংশীবাদীদের অগ্নি হতে আলোক গ্রহণ করো না এবং স্বীয় আংটিতে আরবী অংকন করো না।' তাঁরা এসে খাজা সাহেবকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ দ্বিতীয় বাক্যটির ভাবার্থ হচ্ছে– 'তোমরা আংটিতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম খোদাই করো না' এবং প্রথম বাক্যটির ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'তোমরা নিজেদের কার্যের ব্যাপারে মুশরিকদের পরামর্শ

গ্রহণ করো না।'দেখুন, আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় গ্রন্থে বলেনঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্যদের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না'। (আবূ ইয়ালা) কিন্তু খাজা সাহেবের এ ব্যাখ্যাটি একটি বিবেচ্য বিষয়। সম্ভবতঃ হাদীসটির সঠিক ভাবার্থ হবেঃ 'مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ (৪৯ঃ ২৯) আরবী অক্ষরে আংটির উপর খোদাই করো না।' যেমন অন্য হাদীসে এর নিষিদ্ধতা পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এর কারণ এই যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মোহরের সঙ্গে সাদৃশ্য এসে যাবে। আর প্রথম বাক্যটির ভাবার্থ হবেঃ 'তোমরা মুশরিকদের গ্রামের পার্শ্বে থেকো না, তাদের প্রতিবেশী হয়ো না এবং তাদের শহর হতে হিজরত কর।' যেমন সুনান-ই-আবূ দাউদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যকার যুদ্ধ কি তোমরা দেখ না?' অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যারা মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করে, তাদের সাথে বসবাস করে, তারা তাদের মতই।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তাদের কথাতেও শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখেই শুভাশুভ নিরূপকগণ তাদের ভেতরের দুষ্টামির কথা জানতে পারে। তাদের অন্তরে যে ধ্বংসাত্মক মনোভাব রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম। সুতরাং জ্ঞানীরা কখনও তাদের প্রতারণার ফাঁদে পড়বে না।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'দেখ, এটা কত বড় দুর্বলতার কথা যে, তোমরা তাদেরকে ভালবাসছো, অথচ তারা তোমাদেরকে চায় না। তোমরা সমস্ত গ্রন্থকে স্বীকার করে থাক বটে, কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। তোমরা তাদের গ্রন্থে বিশ্বাস কর বটে, কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থে বিশ্বাস করে না। অতএব, উচিত তো ছিল যে, তোমরা তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে দেখতে। পক্ষান্তরে তারা কিন্তু তোমাদের প্রতি শত্রুতাই পোষণ করছে'।

তারা মুসলমানদের মুখোমুখি হলে নিজেদের ঈমানদারীর কাহিনী বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখনই তাদের হতে পৃথক হয় তখনই হিংসা ও ক্রোধে নিজেদের অঙ্গুলি কামড়াতে থাকে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত যে, তারা যেন মুনাফিকদের বাহ্যিক ভাব দেখেই তাদেরকে বন্ধু মনে না করে। এ মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরলেও আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি সাধন করতেই থাকবেন। মুসলমানরা সর্বদিক

দিয়ে বেড়েই চলবে, যদিও মুশরিক ও মুনাফিকরা হিংসা ও ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। আল্লাহ পাক তাদের অন্তরের কথা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রের উপর মাটি পড়ে যাবে এবং তারা তাদের জঘন্য কার্যে কৃতকার্য হবে না। তারা মুসলমানদের উন্নতি চায় না তথাপি মুসলমানেরা দিন দিন উন্নতি লাভ করতেই থাকবে এবং পরকালেও তাদেরকে সুখময় জান্নাতে দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে এ মুশরিক ও মুনাফিকরা ইহজগতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তারা জাহান্নামের জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হবে। তারা যে তোমাদের চরমশত্রু তার বড় প্রমাণ এই যে, যখন তোমাদের কোন মঙ্গল সাধিত হয় তখন তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় তখন তারা তাতে আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করতঃ যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তখন ঐ মুনাফিকরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যখন মুমিনগণ পরাজয় বরণ করে তখন তারা কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এখন মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন- 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা তাদের দুষ্টামি হতে মুক্তি পেতে চাও তবে ধৈর্যধারণ কর, সংযমী হও এবং আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমাদের শত্রুদেরকে ঘিরে নেবো। কোন মঙ্গল লাভ করা এবং কোন অমঙ্গল হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারে না। তোমরা যদি আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর তবে তিনিই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট।' এ সম্পর্কেই এখন উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যার মধ্যে মুসলমানদের ধৈর্য ও সহনশীলতার বর্ণনা রয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষার পূর্ণচিত্র ও যদ্দ্বারা মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

১২১। যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করবার জন্যে প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

١٢١- وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১২২। যখন তোমাদের দু' দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল এবং আল্লাহ সে দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং মুমিনগণই আল্লাহর উপর নির্ভর করে থাকে।

١٢٢- اِذْ هَمَّتْ طَّآىِٕفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১২৩। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

١٢٣- وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

এখানে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। তবে কোন কোন মুফাস্সির এটাকে পরীখার ঘটনাও বলেছেন। কিন্তু এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা হওয়াই সঠিক কথা। উহুদের যুদ্ধ হিজরী তৃতীয় সনের ১১ই শাওয়াল রোজ শনিবার সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে মুশরিকরা পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। তাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক সেই যুদ্ধে মারা যায়। তখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঐ ব্যবসায়ের মাল যা বদরের যুদ্ধের সময় অন্য পথে রক্ষা পেয়েছিল ঐ সবগুলোই তারা এ যুদ্ধের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলো। চুতর্দিক থেকে লোক সংগ্রহ করে তারা তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ণ আসবাসপত্রসহ মদীনার উপর আক্রমণ করে। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জুম'আর নামায শেষে হযরত মালিক ইবনে আমর (রাঃ)-এর জানাযার নামায পড়িয়ে দেন, তিনি ছিলেন বনী নাজ্জার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি জনগণকে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যে বলেনঃ "এ আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বোত্তম পন্থা তোমাদের নিকট কি আছে?" তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলেনঃ "আমাদের মদীনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়। যদি তারা এসে বাইরে অবস্থান করে তবে যেন জেলখানার মধ্যে পড়ে যাবে। আর যদি মদীনার ভেতরে প্রবেশ করে তবে একদিকে রয়েছে আমাদের বীর পুরুষদের তরবারীসমূহ এবং অপর দিকে রয়েছে আমাদের তীরন্দাজদের

লক্ষ্যভ্রষ্টহীন তীরগুলো। আর যদি তারা এমনি ফিরে যায় তবে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই ফিরে যাবে।” কিন্তু তার মতের বিপরীত মত পেশ করেছিলন ঐ সাহাবীবৃন্দ যাঁরা বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাঁরা খুব জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মদীনার বাইরে গিয়ে প্রাণ খুলে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাড়ী গমন করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তখন ঐ সাহাবীগণের ধারণা হয় যে, না জানি তাঁরা হয়তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইচ্ছের বিপরীত মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁরা বলেনঃ ‘হে আল্লাহ রাসূল (সঃ)! যদি এখানে থেকেই যুদ্ধ করা ভাল মনে করেন তবে তাই করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন হঠকারিতা নেই।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ‘নবী (সঃ)-এর জন্যে এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পর তা খুলে ফেলবেন। এখন আমি আর ফিরে যেতে পারি না। যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক যা চান তাই সংঘটিত না হয়।’ অতএব তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার বাইরে বেরিয়ে পড়েন। ‘শাওত’ নামক স্থানে পৌঁছার পর ঐ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করতঃ তার তিনশ লোক নিয়ে ফিরে আসে। তারা বলে যে, যুদ্ধ যে হবে না এটা জানা কথা কাজেই অযথা কষ্ট করে লাভ কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের গ্রাহ্য না করে অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে নিয়েই উহুদ পর্বত অভিমুখে রওয়ানা হন। পর্বতকে পিছনে করতঃ পর্বত উপত্যকায় তিনি সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেন এবং তাঁদের নির্দেশ দেন, ‘আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না।’ পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সাহাবীকে পৃথক করতঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁদেরকে বলেনঃ ‘তোমারা পাহাড়ের উপর উঠে যাও এবং এটা লক্ষ্য রাখ যে, শত্রুরা যেন পিছন দিক থেকে আসতে না পারে। জেনে রেখো, আমরা জয়যুক্ত হবো। (আল্লাহ না করেন) আমরা যদি পরাজিত হয়েই যাই তথাপিও তোমরা কখনও তোমাদের জায়গা থেকে সরবে না।’ এসব সুব্যবস্থা করার পর স্বয়ং তিনিও প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি দু’টি লৌহবর্ম পরিধান করেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ)-কে পতাকা প্রদান করেন। এদিন কয়েক জন বালককেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। এ ক্ষুদে সৈনিকেরাও আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্যান্য বালককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সঙ্গে নেননি। পরিখার যুদ্ধে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিখার যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধের দু’বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল।

কুরাইশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। তাদের সৈন্য সংখ্য ছিল তিন হাজার। তাদের সঙ্গে দু'শটি সুসজ্জিত অশ্ব যেগুলো সময়ে কাজে আসতে পারে বলে সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তাদের ডান অংশে ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং বাম অংশে ছিলেন ইকরামা ইবনে আবূ জেহেল (এঁরা দু'জন পরে মুসলমান হয়েছিলেন)। তাদের পতাকা বাহক ছিল বানূ আবদুদ্দার গোত্র। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলী ঐ সম্পর্কীয় আয়াতগুলোর তাফসীরের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকবে। মোটকথা এ আয়াতে ওরই বর্ণনা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা হতে বের হয়ে সৈন্যগণকে যুদ্ধের যথাস্থানে নিযুক্ত করতে থাকেন। সৈন্যশ্রেণীর দক্ষিণ বাহু ও বাম বাহু নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথা শুনে থাকেন এবং তিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন।

বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, শুক্রবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধের জন্যে মদীনা হতে বের হন। কুরআন কারীম ঘোষণা করছে– "হে নবী (সঃ)! বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থ যথাস্থানে সংস্থাপিত করবার জন্যে তুমি প্রভাতেই পরিজন হতে বের হয়েছিলে।" তাহলে ভাবার্থ এই যে, শুক্রবারে বের হয়ে তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম শুরু হয় শনিবার দিন । হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ বানূ হারেসা ও বানূ সালমার গোত্রদ্বয়ের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে বলা হয়– "তোমরা দু'টি দল কাপুরুষতা প্রদর্শনের ইচ্ছে করেছিলে।" এতে আমাদের একটি দুর্বলতার বর্ণনা রয়েছে বটে, কিন্তু এ আয়াতটিকে আমাদের পক্ষে অতি উত্তম বলে মনে করি। কেননা, এ আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ঐ দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'দেখ, আমি তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধেও বিজয়ী করেছি, অথচ তোমরা অতি অল্পসংখ্যক ছিলে এবং তোমাদের আসবাবপত্রও অতি নগণ্য ছিল।' বদরের যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রামাযানুল মুবারাক রোজ শুক্রবার সংঘটিত হয়। ঐদিনকেই 'ইয়াওমুল ফুরকান' বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান লাভ হয় এবং শিরক ধ্বংস হয়ে যায়, শিরকের স্থান বিধ্বস্ত হয়। অথচ সেই দিন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ তেরজন। তাঁদের নিকট ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং অবশিষ্ট সবাই পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছিলেন।

অস্ত্রশস্ত্র এত অল্প ছিল যে, যেন ছিলই না। পক্ষান্তরে শত্রুর সংখ্যা ছিল সে দিন মুসলমানদের তিনগুণ, এক হাজারের কিছু কম ছিল। তারা সবাই ছিল বর্ম পরিহিত। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং যথেষ্ট সংখ্যক সুন্দর সুন্দর ঘোড়া ছিল। তারা এত বড় বড় ধনী ছিল যে, তাদের নিকট স্বর্ণের অলংকার ছিল। এ স্থলে মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্মান ও বিজয় দান করেন। তিনি স্বীয় নবী (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং শয়তান ও তার সঙ্গীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে ও জান্নাতী সৈন্যদেরকে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন– "তোমাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও বাহ্যিক আসবাবপত্রের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। যেন তোমরা জানতে পার যে, বিজয় লাভ বাহ্যিক আড়ম্বর ও জাঁকজমকের উপর নির্ভর করে না।" এ জন্যেই দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন–'হুনায়েনের যুদ্ধে তোমরা বাহ্যিক আসবাবপত্রের প্রতি লক্ষ্য করেছিলে এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে খুশী হয়েছিলে। কিন্তু ঐ সংখ্যাধিক্য ও আসবাবপত্রের বিদ্যমানতা তোমাদের কোন উপকারে আসেনি।' হযরত আইয়ায্ আশআরী (রঃ) বলেনঃ 'ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমাদের পাঁচজন নেতা ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ (১) হযরত আবূ উবাইদা (রাঃ), (২) হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফইয়ান (রাঃ), (৩) হযরত ইবনে হাসানা, (রাঃ) (৪) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এবং (৫) হযরত আইয়ায (রাঃ)। আর মুসলমানদের খলীফা হযরত উমার (রাঃ)-এর নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধের সময় হযরত আবূ উবাইদা (রাঃ) নেতৃত্ব দেবেন। এ যুদ্ধে চতুর্দিক হতেই আমাদের পরাজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমরা তখন হযরত উমার (রঃ)-কে পত্র লিখে জানাই– "মৃত্যু আমাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে। সুতরাং সাহায্য প্রেরণ করুন।" আমাদের এ আবেদনের উত্তরে খলীফা হযরত উমার (রাঃ) আমাদেরকে লিখেন– 'তোমাদের সাহায্য প্রার্থনার পত্র পেয়েছি। আমি তোমাদেরকে এমন এক সত্তার কথা বলছি যিনি সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী এবং যাঁর হাতে শক্তিশালী সৈন্য রয়েছে। ঐ সত্তা হচ্ছেন স্বয়ং মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ। যিনি বদর যুদ্ধে স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন। বদরী সৈন্য তো তোমাদের অপেক্ষা বহু কম ছিলেন। আমার এ পত্র পাঠমাত্রই জিহাদ শুরু করে দাও এবং আমাকে কিছুই লিখবে না ও কিছুই জিজ্ঞেস করবে না।' এ পত্র পাঠের পর আমাদের বীরত্ব

বৃদ্ধি পায়। আমরা দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ শুরু করি। মহান আল্লাহর দয়ায় শত্রুরা পরাজিত হয় এবং পলায়ন করে। আমরা বার মাইল পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। আমরা বহু যুদ্ধলব্ধ মাল প্রাপ্ত হই এবং পরস্পরে বন্টন কর নেই। অতঃপর হযরত আবূ উবাইদা (রাঃ) বলেনঃ 'আমার সাথে কে দৌড় প্রতিযোগিতা করবে?' এক নব্য যুবক দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'আপনি অসন্তুষ্ট না হলে আমি হাজির আছি।' অতঃপর দৌড়ে যুবকটি অগ্রে হয়ে যান। আমি লক্ষ্য করি যে, ঐ দু'জনের চুলেরগুচ্ছ বাতাসে উড়ছিল। হযরত আবূ উবাইদা (রাঃ) ঐ যুবকের পিছনে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন।' বদর ইবনে নারীণ নামক একটি ছিল। তার নামেই একটি কূপের নামকরণ করা হয় এবং যে প্রান্তরে ঐ কূপটি ছিল ওটাও বদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বদরের যুদ্ধও ঐ নামেই খ্যাতি লাভ করে। মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে এ জায়গাটি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।'

১২৪। যখন মু'মিনদেরকে বলছিলে– এটা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিনসহস্র ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন?'

١٢٤- إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ آلَٰفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ ○

১২৫। বরং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

١٢٥- بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَٰفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ○

١٢٦- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

১২৬। আর আল্লাহ এ সাহায্য শুধু এ জন্যেই করেছেন যেন তোমাদের জন্যে সুসংবাদ হয় এবং যেন তোমাদের অন্তরে শান্তি আসে আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

١٢٧- لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝

১২৭। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে–তিনি এরূপে তাদের একাংশকে কর্তিত করেন অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন, যাতে তারা অকৃতকার্যতা সহকারে ফিরে যায়।

١٢٨- لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

১২৮। এ কার্যে তোমার কোনই সম্বন্ধ নেই যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; পরন্তু নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী।

١٢٩- وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১২৯। আর নভোমণ্ডলে যা রয়েছে ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই; তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

মহান আল্লাহ এখানে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলেন যে, এটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। হযরত হাসান বসরী (রঃ), আমির (রঃ), শা'বী (রঃ), রাবী' ইবনে আনাস (রাঃ) প্রভৃতির এটাই উক্তি। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুসলমানদের নিকট এ সংবাদ

পৌঁছে যে, কার্‌য ইবনে জাবির মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে, কেননা সে মুশরিকদের নিকট এটা অঙ্গীকার করেছিল। এটা মুসলমানদের নিকট খুব কঠিন ঠেকে। তখন আল্লাহ তা'আলা اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ হতে مُسَوِّمِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কার্‌য ইবনে জাবির মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাদের সাহায্যার্থে আসেনি এবং আল্লাহ তা'আলাও পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠাননি। হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে প্রথমে এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, তার পরে তিন হাজারে পৌঁছে যায় এবং শেষে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। এখানে এ আয়াতে তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য দানের অঙ্গীকার রয়েছে এবং বদরের যুদ্ধের সময় এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার অঙ্গীকার ছিল। তথায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَنِّیْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ -

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পিছনে আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্যকারী।' (৮ঃ ৯) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমতা এভাবেই হতে পারে। কেননা, তথায় مُرْدِفِيْنَ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে পাঠান হয়েছিল এক হাজার অতঃপর তাঁদের পরে আর দু'হাজার পাঠিয়ে তাঁদের সংখ্যা তিন হাজার করা হয় এবং সর্বশেষে আরও দু'হাজার প্রেরণ করে তাঁদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এ অঙ্গীকার ছিল বদরের যুদ্ধের জন্যে, উহুদের যুদ্ধের জন্যে নয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, এ অঙ্গীকার উহুদের যুদ্ধের জন্যেই ছিল। মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), যহ্হাক (রঃ), মূসা ইবনে উকবা (রঃ) প্রভৃতির এটাই উক্তি। কিন্তু তাঁরা বলেন যে, মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্র হতে সরে পড়েছিলেন বলে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়নি। কেননা, সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা اَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا অর্থাৎ 'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও'-এ কথা বলেছেন। فَوْرٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছেঃ (১) নিমিষে, (২) ক্রোধ ও (৩) ভ্রমণ। مُسَوِّمِيْنَ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বিশিষ্ট। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের চিহ্নছিল সাদা পশম। আর তাদের ঘোড়ার চিহ্ন ছিল মস্তকের শুভ্রতা, হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, তাঁদের লাল পশমের চিহ্ন ছিল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, স্কন্ধের চুল ও লেজের চিহ্ন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেনাবাহিনীর এ চিহ্নই

ছিল। অর্থাৎ পশমের চিহ্ন। মাকহুল (রাঃ) বলেন যে, ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল পশমের শিরস্ত্রাণ এবং ঐ গুলোর রং ছিল কাল। হুনায়েনের যুদ্ধে যেসব ফেরেশতা এসেছিলেন তাঁদের চিহ্ন ছিল সাদা রঙ্গের পাগড়ী। তাঁরা এসেছিলেন শুধুমাত্র সাহায্য করার জন্যে ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে। তাঁরা যুদ্ধ করেনি। এও বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর মাথায় ছিল সাদা রঙ্গের পাগড়ী এবং ফেরেশতাদের মস্তকোপরি হলদে রঙ্গের পাগড়ী ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করা এবং তোমাদেরকে এর সুসংবাদ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও তোমাদের মনে শান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি ফেরেশতা অবতীর্ণ না করেও এবং তোমাদের যুদ্ধ ছাড়াও তোমাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। সাহায্য শুধু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই এসে থাকে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–'এবং যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তাদের দিক হতে প্রতিশোধ নিতেন, কিন্তু যেন তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন; আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যাবলী কখনও বিনষ্ট করবেন না। আল্লাহ তাদেরকে তাদের ইপ্সিত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তিনি তাদেরকে ওটা চিনিয়ে দেবেন।'

তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রত্যেক কার্যে বড় বিজ্ঞানময়। এ জিহাদের নির্দেশও বিভিন্ন প্রকারের নিপুণতায় পরিপূর্ণ। এর ফলে কাফিরেরা ধ্বংস হবে বা লাঞ্ছিত হবে কিংবা তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে।

এরপরে বলা হচ্ছে– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত কিছু আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। হে নবী (সঃ)! কোন কার্যের অধিকার তোমার নেই।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে–

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

অর্থাৎ 'হে নবী ! তোমার দায়িত্ব শুধুমাত্র পৌঁছিয়ে দেয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।'(১৩ঃ ৪০) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ 'তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার নেই, বরং আল্লাহ যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করে থাকেন।' (২ঃ ২৭২) আর এক জায়গায় রয়েছে–

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ 'তুমি যাকে ভালবাস তাকে সুপথ দেখাতে পার না, বরং আল্লাহ যাকে চান সুপথ দেখিয়ে থাকেন।' (২৮ঃ ৫৬) সুতরাং হে নবী! আমার বান্দাদের কার্যের সাথে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার কাজ তো শুধু তাদের নিকট আমার নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়া। এও সম্ভবনা রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাওবা করার তাওফীক প্রদান করবেন, ফলে তারা মন্দ কার্যের পর ভাল কার্য করতে থাকবে এবং তিনি তাদের তাওবা কবূল করবেন। অথবা এরও সম্ভবনা রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে তাদের কুফ্র ও পাপ কার্যের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন। তখন এটা কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি অত্যাচার হবে না, বরং তারা তারই উপযুক্ত। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযে যখন দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ' হতে মস্তক উত্তোলন করতেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলে নিতেন তখন তিনি কাফিরদের উপর বদদুআ করতঃ বলতেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।' সে সম্বন্ধেই لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। যে কাফিরদের জন্যে তিনি বদদু'আ করতেন, মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে ওদের নামও এসেছে। যেমন হারিস ইবনে হিশাম, সাহীল ইবনে উমার এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। ওর মধ্যেই রয়েছে যে, শেষে ঐ লোকগুলো হিদায়াত প্রাপ্ত হয় ও মুসলমান হয়ে যায়। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ বদদু'আ চার ব্যক্তির উপর ছিল, যা হতে তাঁকে বিরত রাখা হয়। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কারও উপর বদদু'আ বা ভাল দু'আ করার ইচ্ছে করতেন তখন রুকুর পরে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পর দুআ করতেন। কখনো বলতেনঃ 'হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সালমা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবূ রাবী'আ এবং দুর্বল মুমিনদেরকে কাফিরদের হাত হতে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! মুযির গোত্রের উপর ধর পাকড় শাস্তি অবতীর্ণ করুন এবং তাদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত করুন যেমন দুর্ভিক্ষ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে ছিল।' এ প্রার্থনা তিনি উচ্চৈঃস্বরে করতেন। আবার কোন সময় ফজরের নামাযের কুনূতে এ কথাও বলতেনঃ 'হে আল্লাহ! অমুক অমুকের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন' এবং আরবের কতকগুলো গোত্রের নাম নিতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে যখন তাঁর পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে যায়, মুখমণ্ডল আহত হয় এবং রক্ত বইতে থাকে তখন পবিত্র মুখ দিয়ে বের হয়ঃ 'ঐ সম্প্রদায় কিরূপে মুক্তি পেতে পারে যে স্বীয় নবীর সাথে এরূপ ব্যবহার

করলো?' অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছিলেন। তখন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি ঐ যুদ্ধে একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিলেন এবং অনেক রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, কতক তো এ কারণে এবং একটি কারণ এও ছিল যে, তিনি দু'টি বর্ম পরিহিত ছিলেন, কাজেই উঠতে পারেননি। হযরত হুযাইফা (রাঃ)-এর ক্রীতদাস হযরত সালিম (রাঃ) তথায় পৌঁছেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক হতে রক্ত মুছে নেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি এ কথা বলেন এবং ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু তাঁরই। সবাই তাঁর দাস। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন। তিনি যা চান তাই নির্দেশ দেন। কেউ তাঁর কার্যের হিসেব নিতে পারে না। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১৩০। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।

١٣٠- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

১৩১। আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

١٣١- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۚ

১৩২। আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর যেন তোমার করুণা প্রাপ্ত হও।

١٣٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ

১৩৩। তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও- যার প্রসারতা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্যে নির্মিত হয়েছে।

١٣٣- وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ

١٣٤- الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

১৩৪। যারা স্বচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানবদেরকে ক্ষমা করে; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

١٣٥- وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

১৩৫। এবং যখন কেউ অশ্লীল কার্য করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, তৎপরে আল্লাহকে স্মরণ করে অপরাধসমূহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে; আর আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করেছে, সে ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করে না।

١٣٦- اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۚ

১৩৬। তাদের পুরস্কার হবে তাদের প্রভুর নিকট হতে মার্জনা এবং এমন উদ্যানসমূহ যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং কর্মীদের জন্যে কি সুন্দর প্রতিদান!

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদের সুদ আদান প্রদান হতে এবং ভক্ষণ হতে নিষেধ করেছেন। অজ্ঞতা যুগের লোকেরা সুদের উপর ঋণ প্রদান করতো। ঋণ পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হতো। ঐ সময়ের মধ্যে ঋণ

পরিশোধ করতে না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হতো। এভাবে চক্রাকারে সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন কয়েক গুণ হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে এরূপ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ধ্বংস করতে চরমভাবে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করতঃ ওর উপর মুক্তিদানের অঙ্গীকার করছেন। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ তদীয় রাসূলের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ দান করতঃ ওর উপর করুণা প্রদর্শনের ওয়াদা দিচ্ছেন। এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎকার্যের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রশংসা করছেন। এর প্রস্থ বর্ণনা করতঃ দৈর্ঘ্যের অনুমানের ভার শ্রোতাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। যেমন তিনি জান্নাতী বিছানার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ অর্থাৎ 'ওর ভেতর হবে নরম রেশমের।' (৫৫ঃ ৫৪) ভাবার্থ এই যে, ভেতরই যখন এরূপ তখন বাহির কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অনুরূপভাবে এখানেও বলা হচ্ছে যে, জান্নাতের প্রস্থই যখন সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীনের সমান, তখন দৈর্ঘ্য কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেউ কেউ বলেন যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা, জান্নাত গম্বুজের মত আরশের নীচে রয়েছে এবং যে জিনিস গম্বুজ সদৃশ তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস যাঞ্চা করো। এটাই সবচেয়ে উঁচু ও সর্বোত্তম জান্নাত। এ জান্নাতের মধ্য দিয়েই সমস্ত নদী প্রবাহিত হয় এবং ওর ছাদই হচ্ছে পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর আরশ।' মুসনাদ-ই আহমাদে রয়েছে যে, হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি প্রতিবাদমূলক পত্র লিখে পাঠায়। পত্রে লিখা ছিল– 'আপনি আমাকে এমন জান্নাতের দিকে আহবান করছেন যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। তাহলে বলুন, জাহান্নাম কোথায় গেল? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'সুবহান্নাল্লাহ! যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় যায়'? যে দূতটি হিরাক্লিয়াসের পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলো তার সাথে হিমস নামক স্থানে হযরত আবূ ইয়ালার সাক্ষাৎ হয়েছিল। হযরত আবূ ইয়ালা বলেন যে, ঐ সময় উক্ত দূতটি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে বলেঃ 'যখন আমি পত্রটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করি তখন তিনি উক্ত পত্রটি তাঁর বাম দিকের একজন সাহাবীকে প্রদান করেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করিঃ 'তাঁর নাম কি?' জনগণ বলেনঃ 'ইনি হচ্ছেন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)। হযরত

উমারকেও (রাঃ) এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনিও বলেছিলেন ঃ 'রাতের সময় দিন কোথায় যায়?' এ উত্তর শুনে ইয়াহূদী লজ্জিত হয়ে বলেঃ 'এটা তাওরাত হতেই গ্রহণ করা হয়েছে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এ উত্তর বর্ণিত আছে। একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যখন প্রত্যেক জিনিসের উপর রাত এসে যায় তখন দিন কোথায় যায়?' তখন সে বলেঃ 'যেখানে আল্লাহ চান'। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এ রকমই জাহান্নামও সেখানেই যায়। যেখানে আল্লাহ চান'। (বায্যারা) এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একতো এই যে, রাত্রে যদিও আমরা দিনকে দেখতে পাই না, তথাপি দিন কোন জায়গায় থাকা অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদিও জান্নাতের বিস্তার এত বেশী তথাপি জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেতে পারে না। যেখানে আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন সেখানে ওটাও রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন দিন একদিকে চড়ে যায় তখন রাত অন্য দিকে থাকে। তদ্রূপ জান্নাত সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে এবং জাহান্নাম সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। কাজেই এ দুয়ের অবস্থানের কোন অসুবিধে নেই।

অতঃপর আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের বিশেষণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং স্বচ্ছলতায় ও অভাবে, মোটকথা সর্বাবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

অর্থাৎ 'যারা দিনে-রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সম্পদ খরচ করে থাকে।' (২ঃ ১৭৪) কোন কিছু তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত রাখতে পারে না। তারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর সৃষ্টজীবের উপর অনুগ্রহ করে থাকে। كظم শব্দের অর্থ গোপন করাও হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমন কি তারা তাদের ক্রোধ প্রকাশ পর্যন্তও করে না। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ কর অর্থাৎ আমার নির্দেশ মান্য করতঃ ক্রোধ সংবরণ করে নাও তবে আমিও আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করবো অর্থাৎ তোমার ধ্বংসের সময় তোমাকে ধ্বংস হতে রক্ষা করবো'। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করে, আল্লাহ তার উপর হতে শাস্তি সরিয়ে নেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বাকে

(শরীয়ত বিরোধী কথা হতে) সংযত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার গোপনতা রক্ষা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট ওযর পেশ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ওযর গ্রহণ করে থাকেন'। (মুসনাদ-ই-আবি ইয়ালা) এ হাদীসটি গারীব এবং এর সনদের ব্যাপারেও সমালোচনা রয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কাউকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে,বরং প্রকৃতপক্ষ ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করতে পারে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর মাল নিজের মাল অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয়?' জনগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি তো দেখেছি যে, তোমরাই তোমাদের নিজস্ব মাল অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের মালকেই বেশী পছন্দ করছো! কেননা, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব মালতো ওটাই যা তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে থাক এবং যা তোমরা ছেড়ে যাও তা তো তোমাদের মাল নয়, বরং তোমাদের উত্তরাধিকারীদের মাল। তাহলে তোমাদের আল্লাহ পাকের পথে খরচ কম করা এবং জমা বেশী রাখা ওরই প্রমাণ যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের মাল অপেক্ষা উত্তরাধিকারীদের মালকেই বেশী ভালবাস।' অতঃপর তিনি বলেনঃ 'তোমারা কোন্ লোককে বীর পুরুষ মনে কর?' জনগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ ব্যক্তিকে (আমরা বীর পুরুষ মনে করি) যাকে কেউ মল্লযুদ্ধে নীচে ফেলতে পারে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না, বরং প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে সামলিয়ে নিতে পারে।' তারপরে তিনি বলেনঃ 'তোমরা নিঃসন্তান কাকে বল?' জনগণ বলেনঃ 'যাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই।' তিনি বলেনঃ 'না, বরং নিঃসন্তান ঐ ব্যক্তি যার সামনে তার কোন সন্তান মারা যায়নি'। (সহীহ মুসলিম) একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'দরিদ্র কে তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ বলেনঃ 'যার কোন ধন-সম্পদ নেই।' তিনি বলেনঃ 'না, বরং ঐ ব্যক্তি দরিদ্র যে নিজের জীবদ্দশায় স্বীয় মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে না'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত হারেসা ইবনে কুদ্দামা সা'দী (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কোন উপকারী কথা বলুন। তা যেন সংক্ষিপ্ত হয়, তাহলে আমি মনেও রাখতে পারবো।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'রাগ করো না।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ উত্তরই দেন। কয়েকবার একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বলেনঃ 'রাগ করো না।' তিনি বলেনঃ 'আমি চিন্তা করে বুঝলাম যে, ক্রোধই হচ্ছে সমস্ত খারাপ ও অন্যায়ের মূল'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবূ যর (রাঃ) একবার ক্রোধান্বিত হয়ে বসে পড়েন এবং তার পরে শুয়ে যান। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন 'যার ক্রোধ হয় সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে পড়ে তাতেও যদি ক্রোধ প্রশমিত না হয় তবে যেন শুয়ে পড়ে'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) মুসনাদ-ই-আহমাদের আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত উরওয়া ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) একবার ক্রোধান্বিত হন। তিনি অযু করতে বসে পড়েন এবং বলেনঃ আমি আমার শিক্ষকগণ হতে এ হাদীসটি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে এবং শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, আর আগুনকে নির্বাপণকারী হচ্ছে পানি। সুতরাং তোমাদের ক্রোধ হলে অযু করতে বসে পড়।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এটাও ইরশাদ আছে যে, 'যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে থাকেন। হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখো যে, জান্নাতের কাজ খুব কঠিন এবং জাহান্নামের কাজ সহজ। সৎ ঐ ব্যক্তি যে গণ্ডগোল হতে বেঁচে যায়। কোন চুমুককে পান করে নেয়া অল্লাহ তা'আলার ততো পছন্দনীয় নয় যতো পছন্দনীয় ক্রোধের চুমুককে পান করে নেয়া। এরূপ ব্যক্তির অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে বসে যায়।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমন করে রাখে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি জাঁকজমক পূর্ণ পোষাক পরিধানে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশার্থে তা পরিত্যাগ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানের হুল্লা (লুঙ্গী ও চাদর) পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কারও রহস্য গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে বাদশাহী মুকুট পরাবেন।' (সুনানে আবি দাউদ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমন করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের সামনে ডেকে অধিকার প্রদান করবেন যে, সে কোন হূরকে ইচ্ছে মত পছন্দ করতে পারে'।

(মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হলো এই যে, তাদের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পায় না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন অন্যায় হয় না। বরং তারা উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে। আর তারা আল্লাহকে ভয় করতঃ পুণ্যের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'আলার উপর সমর্পণ করে। তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করে না। একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরূপ অনুগ্রহশীল বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ করছিঃ (১) সাদকা দ্বারা মাল হ্রাস পায় না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় এবং (৩) আল্লাহ্ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।' মুসতাদরিক-ই-হাকীমে হাদীস রয়েছে, 'যে ব্যক্তি চায় যে, তার ভিত্তি উঁচু হোক এবং মর্যাদা বেড়ে যাক তার জন্যে উচিত হবে যে, সে যেন অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে দেয়, যারা দেয় না তাদেরকে প্রদান করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত করে।' অন্য হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এক আহবানকারী ডাক দিয়ে বলবেনঃ 'হে জনগণকে ক্ষমাকারীগণ! তোমাদের প্রভুর নিকট এসো এবং স্বীয় প্রতিদান গ্রহণ কর। ক্ষমাকারী প্রত্যেক মুসলমানের জান্নাতে যাওয়ার অধিকার রয়েছে।' এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তারা পাপ কার্য করার পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন কোন ব্যক্তি কোন পাপ কার্য করে, অতঃপর আল্লাহ্ পাকের সামনে হাযির হয়ে বলেঃ 'হে আমার প্রভু! আমার দ্বারা পাপকার্য সাধিত হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আমার বান্দা যদিও পাপকার্য করেছে, কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে যে, তার প্রভু তাকে পাপের কারণে ধরতেও পারেন, আবার ক্ষমা করতেনও পারেন, আমি আমার ঐ বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম।' সে আবার পাপ করে ও তাওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা এবারেও ক্ষমা করেন। সে তৃতীয়বার পাপ করে ও তাওবা করে, আল্লাহ্ পাক তৃতীয়বারও ক্ষমা করেন। সে চতুর্থবার পাপ করে ও তাওবা করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করতঃ বলেনঃ 'আমার বান্দা এখন যা ইচ্ছে আমল করুক'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'আমরা একদা রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর নিকট আরয করিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন আমরা আপনাকে দর্শন করি তখন আমাদের অন্তরে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় এবং আমরা মুত্তাকী হয়ে যাই। কিন্তু যখন আপনার নিকট হতে চলে যাই তখন ঐ অবস্থা আর থাকে না, ছেলে মেয়েদের ফাঁদে পড়ে যাই এবং পারিবারিক কাজ কর্মে লেগে পড়ি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'জেনে রেখো, আমার নিকট অবস্থান কালে তোমাদের মনের অবস্থা যেমন থাকে, যদি সর্বদা এরূপ থাকতো তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের করমর্দন করতেন এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তোমাদের বাড়ীতেই আগমন করতেন। মনে রেখো, তোমরা যদি পাপ কর্ম না কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নেবেন এবং অন্য এক সম্প্রদায়কে এখানে বসিয়ে দেবেন যারা পাপকার্য করবে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।' আমরা বলিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জান্নাতের ভিত্তি কিসের তৈরী তা আমাদেরকে বলুন।' তিনি বলেনঃ 'একটি সোনার ইট ও একটি চাঁদির ইট এবং ওর গারা (দেয়াল ইত্যাদি বাঁধবার জন্যে চুন, বালি ও মাটি পানিতে মিশিয়ে যে কাদা তৈরী করা হয়) খাঁটি মৃগনাভির। ওর পাথর মনি মুক্তার এবং মাটি হচ্ছে যাফরানের। জান্নাতের নিয়ামতরাজি কখনও শেষ হবে না। তথায় হবে চিরস্থায়ী জীবন। তথাকার অধিবাসীদের কাপড় কখনও পুরাতন হবে না। তাদের যৌবন ক্ষয় হবে না।' তিন ব্যক্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাঃ (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ, (২) রোযাদার ব্যক্তি এবং (৩) অত্যাচারিত ব্যক্তি। তাদের প্রার্থনা মেঘে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং ওর জন্যে আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং মহান আল্লাহ ঘোষণা করেনঃ 'আমার মর্যাদার শপথ! কিছু সময় পরে হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন পাপকার্য করার পর অযু করতঃ দুই রাকা'আত নামায আদায় করে এবং পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, মহাসম্মানিত আল্লাহ তার পাপ মার্জনা করে দেন'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে অযু করতঃ

اَشْــهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْــدَهٗ لَا شَــرِيْكَ لَهٗ وَاَشْــهَدُ اَنَّ مُـحَـمَّدًا عَبْــدُهٗ وَرَسُــوْلُهٗ ـ

অর্থাৎ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল' পাঠ করে, তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছে ভেতরে প্রবেশ করবে।' আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ) সুন্নাত অনুযায়ী অযু করেন অতঃপর বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আমার মত অযু করে, অতঃপর খাঁটি অন্তরে দু'রাকা'আত নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করে দেন'। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এটাই সেই কল্যাণময় আয়াত যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইবলীস কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। (মুসনাদ-ই-আবদুর রায্যাক) মুসনাদ-ই-আবূ ইয়া'লার মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ খুব বেশী করে পাঠ কর এবং সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। ইবলীস পাপের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করতে চায় এবং তার নিজের ধ্বংস রয়েছে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু পাঠে ও ক্ষমা প্রার্থনায়। এ অবস্থা দেখে ইবলীস মানুষকে প্রবৃত্তির উপাসনায় নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং মানুষ নিজেকে সঠিক পথের পথিক বলে মনে করে, অথচ সে ধ্বংসের পথে রয়েছে। কিন্তু এ হাদীসটির দু'জন বর্ণনাকারী দুর্বল। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ইবলীস বলেছিল, 'হে আমার প্রভু! আপনার মার্যাদার শপথ! আমি আদম সন্তানকে তাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকবো।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেনঃ 'আমার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার শপথ! যে পর্যন্ত তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে সে পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করতেই থাকবো।' মুসনাদ-ই-বায্যারে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি পাপকার্য করেছি।' তিনি বলেনঃ 'তাওবা কর।' সে বলেঃ 'আমি তাওবা করেছি, পরে আবার পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি বলেনঃ 'পুনরায় তাওবা কর।' সে বলেঃ 'আমার দ্বারা পুনরায় পাপকার্য সাধিত হয়েছে।' তিনি বলেনঃ 'পুনরায় তাওবা কর।' সে বলেঃ 'আমি আবার পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাক, শেষ পর্যন্ত শয়তান পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।' এর পর বলা হচ্ছে– 'পাপ মার্জনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একজন বন্দী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ বলেঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি না।' রাসূলুল্লাহ

(সঃ) তখন বলেনঃ 'সে প্রকৃত অধিকারীকেই অধিকার প্রদান করেছে।' হঠকারিতা না করার ভাবার্থ এই যে, তাওবা না করেই সে পাপকার্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে না। কয়েকবার পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়লে কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। মুসনাদ-ই-আবূ ইয়া'লার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ঐ ব্যক্তি হঠকারী নয় যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকে যদিও তার দ্বারা দিনে সত্তরবারও পাপকার্য সাধিত হয়।' এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা জানে।' অর্থাৎ তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবূলকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ

অর্থাৎ 'তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করে থাকেন?' (৯ঃ ১০৪) অন্য স্থানে রয়েছে– 'যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করে কিংবা নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল দয়ালু পাবে।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর বর্ণনা করেনঃ হে জনমণ্ডলী! তোমরা অন্যদের উপর দয়া প্রদর্শন কর, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। হে লোকসকল! তোমরা অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। যারা কথা বানিয়ে বলে তাদের দুর্ভাগ্য এবং যারা পাপকার্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে তাদেরও দুর্ভাগ্য। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তাদের ঐ সব সৎকার্যের পুরস্কার হবে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে মার্জনা, এমন উদ্যানসমূহ যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং কর্মীদের জন্যে কি সুন্দর প্রতিদান।'

১৩৭। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে আদর্শসমূহ অতিক্রান্ত হয়েছে; অতএব পৃথিবীতে বিচরণ কর, তৎপরে লক্ষ্য কর যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

١٣٧- قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১৩৮। এটা মানবমণ্ডলীর জন্যে বিবরণ এবং ধর্মভীরুগণের জন্যে পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ।

١٣٨- هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

١٢٩- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৩৯। আর তোমরা শৈথিল্য করো না ও বিষণ্ন হয়ো না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই সমুন্নত হবে।

١٤٠- اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ۙ

১৪০। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়ের তদ্রূপ আঘাত লেগেছে; এবং এ দিবসসমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ এরূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতকগুলোকে শহীদরূপে গ্রহণ করবেন আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

١٤١- وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৪১। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে- তাদেরকে আল্লাহ এরূপে নির্মল করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে নিপাত করেন।

١٤٢- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৪২। তোমরা কি ধারণা করছো যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ যারা ধর্মযুদ্ধ করে ও যারা ধৈর্যশীল- আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও প্রকাশ করেননি।

১৪৩। এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই ওর সাক্ষাৎ কামনা করছিলে, অনন্তর নিশ্চয়ই তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছো এবং তোমরা অবলোকন করছো।

١٤٣- وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

যেহেতু উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বলছেনঃ 'তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্মভীরু লোকদেরকেও জান ও মালের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ তাদেরই হয়েছে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেই তোমাদের উপর এ রহস্য উৎঘাটিত হয়ে যাবে। এ পবিত্র কুরআনের মধ্যে তোমাদের শিক্ষার জন্যে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের বর্ণনাও রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের হিদায়াতের জন্যে এবং তোমাদেরকে ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সজাগকারী এ কুরআন পাকই বটে।' মুসলমানদেরকে ঐ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বেশী সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলছেন– 'তোমরা এ যুদ্ধের ফলাফল দেখে মন খারাপ করো না এবং চিন্তিত হয়ে বসে পড়ো না। এ যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে থাক এবং তোমাদের লোক শহীদ হয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে; কেননা, এর পূর্বে তো তোমাদের শত্রুরাও আহত ও নিহত হয়েছিল। এরূপ উত্থান-পতন তো পৃথিবীতে চলেই আসছে। হ্যাঁ, তবে প্রকৃত কৃতকার্য ওরাই যারা পরিণামে বিজয়ী হয়, আর আমি তো তোমাদের জন্যে এ বিজয় নির্দিষ্ট করেই রেখেছি। তোমাদের কোন কোন বারে পরাজয় এবং বিশেষ করে এ উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ ছিল তোমাদের মধ্যকার ধৈর্যশীল ও অধৈর্যশীলদেরকে পরীক্ষা করা। আর যারা বহুদিন হতে শাহাদাত লাভের আকাংখী ছিল তাদের আকাংখা পূর্ণ করাও ছিল একটি কারণ। তারা যেন স্বীয় জান ও মাল আমার পথে ব্যয় করার সুযোগ লাভ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। এর আরও কারণ এই যে, ঈমানদারদের পাপ থাকলে তা মোচন হয়ে যাবে, আর পাপ না থাকলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং এর দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করারও উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা, তারা বিজয়ী হয়ে গর্বিত হয়ে যাবে এবং তাদের অবাধ্যতা ও অহংকার আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং শেষে তারা সমূলে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এসব কঠিন বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেউ জান্নাত লাভ করতে পারে না।' যেমন সূরা-ই-বাকারায় রয়েছে– 'তোমরা কি এটা জান যে,

তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে যেভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল সেভাবে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না এবং তোমরা জান্নাতে চলে যাবে?' এটা হতে পারে না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔

অর্থাৎ 'মানুষ কি মনে করেছে যে, তারা–'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না'? (২৯ঃ ২) এখানেও ঐ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়, অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে প্রকাশিত না হয় সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা এর পূর্বে তো এরূপ সুযোগেরই আকাংখা করছিলে যে, নিজেদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে প্রদর্শন করবে এবং তাঁর পথে শাহাদাত বরণ করবে। কাজেই এস, আমি তোমাদেরকে ঐ সুযোগ প্রদান করলাম, তোমরা এখন তোমাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর।' হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আকাঙ্খা করো না, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা কর এবং যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন লৌহস্তম্ভের মত অটল ও স্থির থাক এবং জেনে রেখো যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।' এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছ যে, তরবারী কচ্‌কচ্‌ শব্দ করছে, বর্শা তীব্র বেগে বের হচ্ছে, তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং এদিকে-ওদিকে মৃতদেহ পড়তে রয়েছে।'

١٤٤- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

১৪৪। এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয়, তবে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পশ্চাদপদে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।

১৪৫। আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেউই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না; এবং যে কেউ দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা হতেই প্রদান করি এবং যে কেউ পরকালের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা হতেই প্রদান করে থাকি; এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করবো।

١٤٥- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

১৪৬। আর এমন নবীগণ ছিল– যাদের সহযোগে প্রভুভক্ত লোকেরা যুদ্ধ করেছিল; পরন্তু আল্লাহর পথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি ও শক্তিহীন হয়নি এবং বিচলিত হয়নি; এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।

١٤٦- وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

১৪৭। আর এতদ্ব্যতীত তাদের কথা ছিল না যে, তারা বলতো– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আমাদের অপরাধ ও আমাদের অপচয়সমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের চরণসমূহ সুদৃঢ় করুন এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।

١٤٧- وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৪৮। অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করলেন এবং পরকালের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর;এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

١٤٨- فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

উহুদ প্রান্তরে মুসলমানগণ পরাজিতও হয়েছিলেন এবং তাঁদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদও হয়েছিলেন। সেদিন শয়তান এও প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মাদও (সঃ) শহীদ হয়েছেন। আর এদিকে ইবনে কামিআ' নামক একজন কাফির মুশরিকদের মধ্যে প্রচার করে–'আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে হত্যা করে আসছি।' প্রকৃতপক্ষে শয়তানের কথা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং ঐ উক্তিও মিথ্যা ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু তাতে শুধুমাত্র তাঁর চেহারা মুবারক কিছুটা আহত হয়েছিল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। এ মিথ্যা সংবাদে মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যায়, তাঁদের পা টলে যায় এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নে উদ্যত হন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, পূর্বের নবীদের মত মুহাম্মাদও (সঃ) একজন নবী। হতে পারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবেন কিন্তু আল্লাহ পাকের দ্বীন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবে না। একটি বর্ণনায় রয়েছে, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে উহুদের যুদ্ধে দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তিনি উক্ত আনসারী (রাঃ)-কে বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'যদি এ সংবাদ সত্য হয় তবে তিনি তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনারা সবাই তাঁর ধর্মের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন।' ঐ সমন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ পাকের ধর্ম হতে পশ্চাদপদে ফিরে যাবে এবং যে এভাবে ফিরে যাবে সে মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারেব না। আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকেই উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন যারা তাঁর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তাঁর ধর্মের সাহায্যের কার্যে লেগে পড়ে ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণে সুদৃঢ় থাকে–রাসূলুল্লাহ (সঃ) জীবিত থাকুন আর নাই থাকুন।' সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

ইন্তেকালের সংবাদ শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করতঃ জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হিবরার চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চুম্বন দান করেন এবং কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেনঃ 'আমার পিতা-মাতা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলার শপথ! তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দু'বার মৃত্যু দিতে পারেন না। যে মৃত্যু তাঁর জন্যে নির্ধারিত ছিল তাঁর উপর এসে গেছে।' এরপর তিনি পুনরায় মসজিদে আগমন করেন এবং দেখেন যে, হযরত উমার (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেনঃ 'নীরবতা অলম্বন করুন।' তাঁকে নীরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপাসনা করতা সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতো সে যেন সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ পাক জীবিত আছেন। মৃত্যু তাঁর উপর পতিত হয় না।' অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। জনগণের অনুভূতি এই হয় যে, আয়াতটি যেন তখনই অবতীর্ণ হলো। তখন তো প্রত্যেকের মুখেই আয়াতটি উচ্চারিত হলো এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আর এ জগতে নেই। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মুখে এ আয়াতটির পাঠ শ্রবণ করে হযরত উমার (রাঃ)-এর চরণযুগল যেন ভেঙ্গে পড়লো। তাঁরও পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এ নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই বলতেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুবরণ করলে বা শহীদ হলে আমরা ধর্মত্যাগী হবো না। আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিহত হন তবুও আমরা তাঁর ধর্মের উপরেই আমরণ প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আল্লাহর কসম! আমি তো তাঁর বন্ধু ও চাচাতো ভাই এবং তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর আমার চেয়ে বড় হকদার আর কে হবে'?

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার উপর নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে– 'কারও বয়স বৃদ্ধি করা হয় না বা কারও বয়স হ্রাস করা হয় না, বরং সব কিছুই আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।' অন্য স্থানে রয়েছে–'তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি সময় পূর্ণ করেছেন এবং মৃত্যু নির্ধারিত করেছেন।' উপরোক্ত আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, বীরত্ব

প্রকাশের কারণে বয়স হ্রাস পায় না, আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করতঃ জিহাদ হতে সরে থাকার ফলে বয়স বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয় না। মৃত্যু তো নির্ধারিত সময়ে আসবে, মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদে যোগদান করুক বা ভীরুতা প্রদর্শন করে জিহাদ হতে সরেই থাকুক। হযরত হাজার ইবনে উদ্দী (রাঃ) ধর্মীয় শত্রুদের সম্মুখীন হতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে যান। সে সময় তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ 'নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউই মারা যায় না। এসো, এ টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিক্ষেপ কর।' একথা বলেই তিনি টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিক্ষেপ করেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও নিজ নিজ ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শত্রুদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে– এরা তো পাগল। এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করে না। কাজেই চল আমরা পলায়ন করি। অতএব তারা সবাই পালিয়ে যায়।

এর পরে ইরশাদ হচ্ছে–'যার কার্য শুধুমাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়ে থাকে সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ পেয়ে যায় বটে, কিন্তু পরকালে সে একেবারে শূন্য হস্ত হয়ে যায়। আর পরকাল লাভের যার উদ্দেশ্য থাকে সে পরকাল তো পায়ই, এমনকি দুনিয়াতেও সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছে–'পরকালের ক্ষেত্র যাচ্ঞাকারীকে আমি আরও বেশী দিয়ে থাকি। আর ইহকালের ক্ষেত্র যাচ্ঞাকারীকে আমি তা প্রদান করি বটে, কিন্তু পরকালে তার জন্যে কোনই অংশ নেই।' আর এক জায়গায় রয়েছে–'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়াই চায়, আমি তাদের মধ্যে যাকে চাই এবং যে পরিমাণ চাই দুনিয়া প্রদান করি; অতঃপর সে জাহান্নামী হয়ে যায় এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের সঙ্গে তথায় গমন করে; আর যে পরকাল চায় এবং ঈমানদার হয়, তাদের চেষ্টা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রশংসনীয় হবে।' এজন্যেই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি।' এরপর আল্লাহ তা'আলা উহুদ যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেন– 'ইতিপূর্বেও বহু নবী তাঁদের দলবল নিয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তোমাদের মতই তাদেরকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তাঁরা দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞই রয়েছিলেন। তাঁরা অলস ও দুর্বল হননি এবং ঐ ধৈর্যের বিনিময়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের ভালবাসা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।' একটি অর্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, 'হে উহুদের যোদ্ধাগণ! মুহাম্মাদ (সঃ) শহীদ হয়েছেন, এ সংবাদ শুনে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলছ

কেন? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণের (আঃ) শাহাদাত লক্ষ্য করেও সাহস হারাও হয়নি বা পিছনে সরেও যায়নি, বরং তারা আরও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। এত বড় বিপদেও তাদের পা টলমলিয়ে যায়নি এবং তারা দুঃখের ভারে ভেঙ্গেও পড়েনি। অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে তোমাদের এত মুষড়ে পড়া মোটেই উচিত হয়নি।' (رِبِّيُّوْنَ) শব্দটির বহু অর্থ এসেছে–যেমন জ্ঞানবান, সৎ ধর্মভীরু, সাধক, নির্দেশ পালনকারী ইত্যাদি। কুরআন কারীম সেই বিপদের সময় তাদের প্রার্থনা নকল করেছেন। এরপর আল্লাহ্ পাক বলেছেন যে, তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে তাদের জন্যে পারলৌকিক পুরস্কারও বিদ্যমান রয়েছে, আর পরকালের পুরস্কার দুনিয়ার পুরস্কার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। এ সৎ কর্মশীল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা।

১৪৯। হে মুমিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে–যদি তোমরা তাদের আজ্ঞাবহ হও, তবে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদে ফিরিয়ে নেবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে।

١٤٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

১৫০। বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

١٥٠- بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

১৫১। যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সেই বিষয়ের অংশী স্থাপন করেছে যদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতারণ করেননি এবং জাহান্নাম তাদের অবস্থান স্থল এবং ওটা অত্যাচারীদের জন্যে নিকৃষ্ট বাসস্থান।

١٥١- سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

١٥٢ - وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৫২। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করেছেন– যখন তাঁর আদেশে তোমরা ভগ্নোদ্যম না হওয়া পর্যন্ত কলহ করছিলে এবং অবাধ্য হয়েছিলে; তৎপর তোমরা যা ভালবেসেছিলে, তা তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করলেন; তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথিবী কামনা করছিলে; তৎপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্যে বিরত করলেন এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্ষমা করলে; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহশীল।

١٥٣ - اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৫৩। আর যখন তোমরা আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও দেখছিলে না ও রাসূল তোমাদেরকে পশ্চাদ হতে আহবান করছিল; অনন্তর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করলেন, কিন্তু যা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তোমাদের উপর যা উপনীত হয়নি তোমরা তজ্জন্যে দুঃখ করো না; এবং তোমরা যা করছো– আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করতে নিষেধ করছেন এবং বলছেন, 'যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা ইহকালে ও পরকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। তাদের চাহিদা তো এই যে, তারা তোমাদেরকে দ্বীন ইসলাম হতে ফিরিয়ে দেয়'। অতঃপর তিনি বলেন, আমাকেই তোমরা তোমাদের প্রভু ও সাহায্যকারী রূপে মেনে নাও, আমার সাথেই ভালবাসা স্থাপন কর, আমার উপরেই নির্ভর কর এবং একমাত্র আমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ঐ দুষ্টদের দুষ্টামির কারণে আমি তাদের অন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেবো।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নবী (আঃ)-কে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভক্তিযুক্ত ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্যে ভূমিকে মসজিদ ও অযুর জন্যে পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবীকে বিশেষ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু আমার নবুওয়াতকে সারা জগতের জন্যে সাধারণ করা হয়েছে।' মুসনাদ-ই আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমস্ত নবী (আঃ)-এর এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে, সমস্ত উম্মতের উপর চারটি মর্যাদা দান করেছেন–(১) আমাকে সারা জগতের নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) আমার উম্মতের জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে সেই জায়গাটাই তাদের জন্যে মসজিদ ও অযুর স্থান। (৩) আমার শত্রু আমা হতে এক মাসের পথের ব্যবধানে থাকলেও আল্লাহ পাক তার অন্তর আমার ভয়ে কাঁপিয়ে তুলবেন। (৪) আমার জন্যে যুদ্ধলব্ধ মাল বৈধ করা হয়েছে।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রত্যেক শত্রুর অন্তরে ভীতি উৎপাদন দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।' মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাকে পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছেঃ (১) আমি প্রত্যেক লাল ও সাদার নিকট প্রেরিত হয়েছি। (২) আমার জন্যে সমস্ত যমীনকে মসজিদ ও অযুর জন্যে পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধলব্ধ মালকে বৈধ করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীর জন্যে বৈধ করা হয়নি। (৪) এক মাসের রাস্তা

পর্যন্ত (শত্রুর অন্তরে) ভীতি উৎপাদন দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (৫) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সমস্ত নবী সুপারিশ চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার উম্মতের ঐ সব লোকের জন্যে সুপারিশ গোপন রেখেছি যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করেনি'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'আবূ সুফইয়ান (রাঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ভীতি উৎপাদন করেছেন, সুতরাং তিনি যুদ্ধ হতে ফিরে গেলেন।' এরপরে ইরশাদ হচ্ছে– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করেছেন।' এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ অঙ্গীকার ছিল উহুদের যুদ্ধে। শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার, তথাপি তাদের চরণসমূহ টলে যায় এবং মুসলমানেরা বিজয় লাভ করে। কিন্তু আবার তীরন্দাজদের অবাধ্যতার কারণে এবং কয়েকজনের কাপুরুষতা প্রদর্শনের ফলে শর্তের উপর যে অঙ্গীকার ছিল তা উঠিয়ে নেয়া হয়। তাই আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। প্রথম দিনেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেন। কিন্তু তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করলে এবং নবী (সঃ)-এর অবাধ্য হয়ে গেলে ও তাঁর নির্দেশিত স্থান হতে সরে পড়লে, আর পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করলে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস প্রদর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ তোমরা স্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছিলে। গনীমতের মাল তোমাদের চক্ষের সামনে বিদ্যমান ছিল। শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করেছিল। কাফিরদের পরাজয় দেখে নবী (সঃ)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে গনীমতের মালের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সৎ নিয়াতের অধিকারী এবং পরকালের আকাঙ্ক্ষী থাকলেও কতগুলো লোকের অবাধ্যতার কারণে কাফিরদের সুযোগ এসে পড়ে এবং তোমাদের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায় যে, তোমরা বিজয় লাভের পরেও পরাজিত হয়ে যাও। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কেননা, তিনি জানেন যে, স্পষ্টতঃই তোমরা সংখ্যা ও আসবাবপত্রে খুবই নগণ্য ছিলে।' ভুল মার্জনা হওয়াও عَفَا عَنْكُمْ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এভাবে কিছু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শাহাদাত দানের পর তিনি স্বীয় পরীক্ষা উঠিয়ে নেন এবং অবশিষ্টকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসী লোকদের প্রতিই অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করে থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উহুদের যুদ্ধে যত সাহায্য করা হয়েছিল তত সাহায্য

অন্য কোন যুদ্ধে করা হয়নি। ঐ সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার তোমাদের জন্যে সত্য করেছেন, কিন্তু তোমাদের কর্মদোষের কারণেই ফল উল্টো হয়ে যায়।' কোন কোন লোক দুনিয়ালোভী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্য হয়ে যায়, অর্থাৎ কয়েকজন তীরন্দাজ, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্বত ঘাঁটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন– 'এখান হতে তোমরা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য কর যে, তারা যেন আমাদের পিছনের দিক দিয়ে আসতে না পারে, যদি তোমরা দেখ যে, আমরা পরাজিত হয়ে চলেছি তবুও তোমরা স্বীয় স্থান হতে সরে যেয়ো না। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সবদিক দিয়েই আমরা জয়যুক্ত হয়েছি, তবুও তোমরা গনীমত লুটের উদ্দেশ্যে স্বীয় জায়গা পরিত্যাগ করো না।' যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিজয় লাভ করেন তখন তীরন্দাজগণ তাঁর নির্দেশ পরিবর্তন করে এবং তারা তাদের স্থান ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় ও গনীমতের মাল জমা করতে আরম্ভ করে। পর্বত ঘাঁটি শূন্য পেয়ে মুশরিকরা পলায়ন বন্ধ করে এবং ভাবনা চিন্তা করে এ জায়গায় আক্রমণ চালিয়ে দেয়। যে কয়েকজন মুসলমান তখনও তথায় স্থির ছিলেন তাঁরা শহীদ হয়ে যান। তখন তারা পিছন দিক থেকে মুসলমানদেরকে তাদের অজ্ঞাতে এমন ভীষণভাবে আক্রমণ করে যে, মুসলমানদের চরণসমূহ টলটলায়মান হয়ে যায় এবং প্রথম দিনের বিজয় লাভ পরাজয়ে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শহীদ হয়েছেন এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি মুসলমানদের মনে এর বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। অল্পক্ষণ পরেই মুসলমানদের দৃষ্টি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে পতিত হয় তখন তাঁরা সমস্ত বিপদ ভুলে যান এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দিকে আসছিলেন এবং বলছিলেনঃ 'ঐ লোকদের উপর আল্লাহর কঠিন ক্রোধ বর্ষিত হোক যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর চেহারা রক্তাক্ত করে দিয়েছে। তাদের কোনই অধিকার ছিল না যে, এভাবে তারা আমাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারে।' বর্ণনাকারী বলেনঃ অল্পক্ষণ পরেই আমরা শুনি যে, আবূ সুফইয়ান পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'হে হোবল! আপনার মস্তক উন্নত হোক, হে হোবল! আপনামর মস্তক উন্নত হোক। আবূ বকর কোথায়? উমার কোথায়?' হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আমাকে অনুমতি হলে আমি তাকে উত্তর দেই।' তিনি অনুমতি দেন। হযরত উমার (রাঃ) তখন উত্তরে বলেনঃ اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ অর্থাৎ 'আল্লাহই সর্বোচ্চ ও মহাসম্মানিত,

আল্লাহই সর্বোচ্চ ও মহাসম্মানিত'। আবূ সুফইয়ান জিজ্ঞেস করেনঃ 'বল মুহাম্মাদ (সঃ) কোথায়? আবূ বকর কোথায়? উমার (রাঃ) কোথায়?' তিনি বলেন, 'এই তো এখানেই রাসূলুল্লাহ (সঃ), ইনিই হচ্ছেন হযরত আবূ বকর (রাঃ), আর আমিই হচ্ছি উমার।' আবূ সুফইয়ান তখন বলেনঃ 'এটা বদরের যুদ্ধেরই প্রতিশোধ। এভাবেই রৌদ্র ও ছায়া পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যুদ্ধের দৃষ্টান্ত তো কূপের বালতির ন্যায়।' হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'এটা সমান কখনই নয়। তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামে গিয়েছে এবং আমাদের শহীদগণ জান্নাতে গিয়েছেন।' আবূ সুফইয়ান তখন বলেনঃ 'যদি এটাই হয় তবে তো অবশ্যই আমরা ক্ষতির মধ্যে রয়েছি। জেনে রেখো, তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের কতগুলোকে তোমরা নাক কান কর্তিতও পাবে। আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের এটা অভিমত ছিল না বটে, তবে এটা আমাদের নিকট মন্দ বলেও মনে হয়নি।' এ হাদীসটি গারীব এবং এ গল্পটিও বিস্ময়কর। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মুরসালারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিও তাঁর পিতা কেউই উহুদের যুদ্ধে বিদ্যমান ছিলেন না। মুসতাদরিক-ই-হাকিমের মধ্যেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম এবং বায়হাকী (রাঃ)-এর فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ -এর মধ্যেও এটা বর্ণিত আছে। তাছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এর কতক অংশের সত্যতার সাক্ষ্য বিদ্যমান। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ 'উহুদের যুদ্ধের দিন স্ত্রীলোকেরা মুসলমান সৈনিকদের পিছনে অবস্থান করছিলেন এবং আহতদের দেখাশুনা করছিলেন। আমার তো পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সেদিন আমাদের কেউই দুনিয়া লিপ্সু ছিলেন না। বরং সেদিন যদি আমাকে ঐ কথার উপর শপথ করানো হতো তবে আমি শপথ করতাম।' কিন্তু কুরআন কারীমে مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়া লিপ্সুও ছিল' এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন সাহাবীগণ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নির্দেশের বিপরীত কার্য সাধিত হয় এবং তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ পায় তখন তাঁদের পদসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে টলায়মান হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে শুধুমাত্র সাতজন আনসারী এবং দু'জন মুহাজির অবশিষ্ট থাকেন। যখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নেয় তখন তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর করুণা বর্ষণ করবেন যে তাদেরকে সরিয়ে দেবে।' এ কথা শুনে একজন আনসারী দাঁড়িয়ে যান এবং একাকী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করেন। কিন্তু শেষে তিনি শহীদ হয়ে যান। আবার কাফিরেরা

আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় ঐ কথাই বলেন। এবারেও আর একজন আনসারী প্রস্তুত হয়ে যান এবং এমন ভীষণ বেগে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে অসমর্থ হয়। কিন্তু অবশেষে তিনিও শহীদ হয়ে যান। এভাবে সাতজন সাহাবীই (রাঃ) মহান আল্লাহর নিকট পৌঁছে যান। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুজাহিরগণকে বলেনঃ 'বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে পক্ষপাতহীন ব্যবহার করলাম না।' তখন আবূ সুফইয়ান সশব্দে বলেনঃ اُعْلُ هُبَلُ অর্থাৎ 'হে হোবল! আপনার শির উন্নত হোক!' রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে বলেনঃ 'তোমরা বল– اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ অর্থাৎ, আল্লাহ উচ্চ ও মহা সম্মানিত।' আবূ সুফইয়ান বলেনঃ لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ অর্থাৎ 'আমাদের জন্য উয্যা রয়েছেন, তোমাদের জন্যে কোন উয্যা নেই।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা বল– اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَالْكٰفِرُوْنَ لَا مَوْلَا لَهُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ই আমাদের প্রভু এবং কাফিরদের কোনই প্রভু নেই।' আবূ সুফইয়ান বলেনঃ 'আজকের দিন হচ্ছে বদরের দিনের প্রতিশোধ। কোনদিন আমাদের এবং কোনদিন তোমাদের। এটা তো হাতে হাতের সওদা। একের পরিবর্তে একটি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'সমান কখনই নয়। আমাদের শহীদগণ জীবিত আছেন এবং তাদেরকে আহার্য দেয়া হচ্ছে, আর তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের জাহান্নামে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে।' পুনরায় আবূ সুফইয়ান বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কতগুলোকে দেখতে পাবে যে, তাদের নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এটা করিনি, করতে নিষেধও করিনি, আমি এটা পছন্দও করিনি, অপছন্দ ও করিনি, এটা আমাদের নিকট না ভাল বলে অনুভূত হয়েছে, না মন্দ বলে।' তখন শহীদগণের খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে, হযরত হামযা (রাঃ)-এর পেট ফেড়ে দেয়া হয়েছে এবং হিন্দা কলিজা বের করে চিবিয়েছে, কিন্তু গলাধঃকরণ করতে না পেরে উগরিয়ে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হযরত হামযা (রাঃ)-এর সামান্য গোশ্ত হিন্দার পেটে যাওয়া অসম্ভব ছিল। মহান আল্লাহ চান না যে, হযরত হামযা (রাঃ)-এর শরীরের কোন অংশ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হোক।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হামযা (রাঃ)-এর জানাযা সামনে রেখে জানাযার নামায আদায় করেন। তারপর একজন আনসারীর জানাযা হাযির করা হয়। তাঁকে হযরত হামযা (রাঃ)-এর পার্শ্ব দেশে রাখা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। আনসারীর জানাযা উঠিয়ে নেয়া হয় কিন্তু হযরত হামযা (রাঃ)-এর

জানাযা সেখানেই থেকে যায়। এভাবে সত্তরজন শহীদকে আনা হয় এবং সত্তরবার হযরত হামযা (রাঃ)-এর জানাযার নামায পড়া হয়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'মুশরিকদের সাথে আমাদের উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তীরন্দাজদের একটি দলকে একটি পৃথক স্থানে নিযুক্ত করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-কে তাঁদের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। তাঁদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেনঃ 'যদি তোমরা আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত দেখতে পাও তবুও এখান হতে সরে যেয়ো না। আর তারা আমাদের উপর বিজয়ী হলেও তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করো না।' যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহর ফযলে মুশরিকদের চরণগুলো পিছনে সরে পড়ে। এমনকি নারীগণও লুঙ্গী উঁচু করতঃ পর্বতের উপর এদিক ওদিক দৌড়াতে আরম্ভ করে। তখন তীরন্দাজ দলটি 'গনীমত' 'গনীমত' বলতে বলতে নীচে নেমে আসে। তাদের নেতা তাদেরকে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না। এ সুযোগে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে। ফলে সত্তরজন মুসলমান শহীদ হন। আবূ সুফইয়ান একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'মুহাম্মাদ (সঃ) আছে কি? আবূ বকর কি বিদ্যমান আছে? উমার জীবিত আছে কি'? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে সবাই নীরব থাকেন। তখন তিনি আত্মহারা হয়ে বলতে থাকেনঃ 'এরা সবাই আমাদের তরবারীর ঘাটে অবতরণ করেছে। এরা জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত।' তখন হযরত উমার (রাঃ) অধৈর্য হয়ে বলে উঠেন ঃ 'হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহর ফযলে আমরা সবাই বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমাকে ধ্বংসকারী আল্লাহ আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন।' তারপরে ঐ সব কথাবার্তা হয় যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় ঘটে এবং ইবলীস উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বলেঃ 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পিছনের সংবাদ লও। আগের দল পিছনের উপর পতিত হয়েছে।' হযরত হুযায়ফা (রাঃ) দেখেন যে, মুসলমানদের তরবারী তাঁর পিতা হযরত ইয়ামান (রাঃ)-এর উপর বর্ষিত হচ্ছে। বার বার তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহর বান্দারা। ইনি আমার পিতা হযরত ইয়ামান (রাঃ)।' কিন্তু কে শুনে কার কথা। তিনি এভাবেই শহীদ হয়ে যান। কিন্তু হযরত হুযায়ফা (রাঃ) কিছুই না বলে শুধুমাত্র বললেনঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।' হযরত হুযাইফা

(রাঃ)-এর এ সৌজন্য তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সীরাতে ইবনে ইসহাকের মধ্যে রয়েছে, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেনঃ 'আমি স্বয়ং দেখেছি যে, মুশরিকরা মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই পালাতে আরম্ভ করে, এমনকি তাদের নারীরা যেমন হিন্দা প্রভৃতি লুঙ্গী উঁচু করে দ্রুত দৌড়াতে থাকে। কিন্তু এরপরে যখন তীরন্দাজগণ কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করে এবং কাফিরেরা একত্রিত হয়ে পিছন দিক হতে আমাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে ও একজন সশব্দে ঘোষণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শহীদ হয়েছেন। তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। নচেৎ আমরা তাদের পতাকা বাহক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং তার হাত হতে পতাকা নীচে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমরা' বিনতে আলকামা হারেসিয়্যা' নাম্নী একজন স্ত্রীলোক ওটা উঠিয়ে নিয়েছিল এবং কুরায়েশরা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল। হযরত আনাস ইবনে মালিকের চাচা হযরত আনাস ইবনে নায্র (রাঃ) এ পরিস্থিতি দেখে হযরত উমার (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) প্রভৃতির নিকট আগমন করতঃ বলেনঃ 'আপনারা সাহস হারিয়েছেন কেন?' তাঁরা বলেনঃ 'রাসূলল্লাহ তো শহীদ হয়েছেন।' হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'তাহলে আপনারা জীবিত থেকে কি করবেন?' একথা বলে তিনি শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন। ইনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তাই তিনি অঙ্গীকার করে বলেছিলেনঃ 'আগামী কোন দিনে সুযোগ আসলে দেখা যাবে।' এ যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। যখন মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় তখন তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমি মুসলমানদের এ কার্যের জন্যে দায়ী নই এবং আমি মুশরিকদের এ কার্য হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।' অতঃপর তিনি তরবারী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। পথে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁকে বলেন, কোথায় যাচ্ছেন? আমি তো উহুদ পাহাড় হতে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' এ কথা বলেই মুশরিকদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর আশিটিরও বেশী যখম ছিল। তাকে চিনবার কোন উপায় ছিল না। অঙ্গুলির গ্রন্থি দেখে চেনা গিয়েছিল।' সহীহ্ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, একজন হাজী বায়তুল্লাহ শরীফে একটি জনসমাবেশ দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'এ লোকগুলো কে?' উত্তরে বলা হয়ঃ 'কুরায়েশী'। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তাঁদের শায়েখ কে?' বলা হয়, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)।' তখন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আগমন করলে উক্ত হাজী সাহেব তাঁকে বলেন, 'আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেত চাই।' তিনি বলেন, 'জিজ্ঞেস করুন।' তিনি বলেন, 'আপনাকে এ বায়তুল্লাহ শরীফের কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে পলায়ন করেছিলেন।' তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এ সংবাদ কি আপনার জানা আছে যে, তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেননি? তিনি বলেন , 'হ্যাঁ'। লোকটি আবার প্রশ্ন করেন, 'এ খবর কি আপনি অবগত আছেন যে, তিনি বায়'আতুর রিযওয়ানেও অংশগ্রহণ করেননি?' তিনি বলেন, 'এটাও সঠিক কথা।' এবারে লোকটি খুশী হয়ে তাকবীর পাঠ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন বলেন 'এদিকে আসুন। এখন আমি আপনার নিকট বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করছি। উহুদের যুদ্ধ হতে পলায়ন তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ ছিল এই যে, তাঁর বাড়িতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা ছিলেন এবং সে সময় তিনি কঠিন রোগে ভুগছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি মদীনাতেই অবস্থান কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পুণ্য দান করবেন এবং যুদ্ধলব্ধ মালেও তোমার অংশ থাকবে। বায়'আতুর রিযওয়ানের ঘটনা এই যে, তাঁকে তিনি মক্কাবাসীদের নিকট স্বীয় পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কেননা, মক্কাবাসীদের নিকট তাঁর যেমন সম্মান ছিল অন্য কারও ছিল না। তাঁর মক্কা গমনের পর এ বায়'আত গ্রহণ করা হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত উঠিয়ে বললেন, 'এটা উসমানের হাত।' অতঃপর তিনি ঐ হাতখানা তাঁর অন্য হাতের উপর রাখেন (যেন তিনি বায়'আত গ্রহণ করলেন)।' তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, 'এখন প্রস্থান করুন এবং এ ঘটনাটি সঙ্গে নিন।'

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যখন তোমরা শত্রুগণ হতে পলায়ন করে পর্বতের উপরে আরোহণ করছিলে এবং ভয়ের কারণে কারও দিকে ফিরেও দেখছিলে না, আর রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে পশ্চাৎ হতে আহ্বান করছিলেন এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলছিলেন, তোমরা পলায়ন করো না, বরং ফিরে এসো।' হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, মুশরিকদের এ আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুসলমানদের পদসমূহ টলটলায়মান হয়ে যায়। তাঁরা মদীনার পথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেউ কেউ পর্বতের শিকরে আরোহণ করেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁদেরকে পিছন হতে ডাক দিয়ে বলছিলেনঃ 'হে আল্লাহর

বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে এসো।' এ ঘটনারই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সে সময় মাত্র বারজন সাহাবীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি দুদীর্ঘ হাদীসেও এসব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। 'দালায়েলুন নবুওয়াহ'-এর মধ্যেও রয়েছে যে, যখন মুসলমানদের পরাজয় ঘটে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মাত্র এগারজন লোক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাহাড়ের উপর আরোহণ করছিলেন এমন সময় মুশরিকরা তাঁকে ঘিরে নেয়। তিনি তাঁর সঙ্গীরদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে এমন কেউ আছে কি?' হযরত তালহা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেন এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'তুমি এখন থেমে যাও'। তখন একজন আনসারী প্রস্তুত হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং অবশেষে শহীদ হয়ে যান। এভাবে সবাই একের পর এক শাহাদাত বরণ করেন। তখন শুধুমাত্র হযরত তালহা (রাঃ) রয়ে যান। এ মহান ব্যক্তি বার বার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন কিন্তু বারবারই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বাধা দিচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন যে, শত্রুরা সবাই এক দিকে এবং তিনি একাই এক দিকে। এ যুদ্ধে তাঁর অঙ্গুলিগুলো কেটে পড়ে। ফলে তাঁর মুখ দিয়ে 'ইস' শব্দ বের হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'তুমি যদি বিসমিল্লাহ বলতে বা আল্লাহ তা'আলার নাম নিতে তবে তোমাকে ফেরেশ্‌তাগণ আকাশে উঠিয়ে নিতেন এবং লোকেরা দেখতে থাকত।' ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সমাবেশে পৌঁছে গেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হযরত কায়েস ইবনে হাযেম (রাঃ) বলেনঃ 'হযরত তালহা (রাঃ) তাঁর যে হাতখানা ভালরূপে ব্যবহার করছিলেন তা অচল হয়ে গিয়েছিল।' হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেনঃ 'উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় তূণ হতে সমস্ত তীর আমার নিকট ছড়িয়ে দেন এবং বলেনঃ 'তোমার উপর আমার বাপ মা উৎসর্গ হোন। লও, মুশরিকদেরকে মারতে থাকো।' তিনি আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন এবং আমি লক্ষ্য করে করে মুশরিকদেরকে মেরে চলছিলাম। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ডানে-বামে এমন দু'জন লোককে দেখেছিলাম যাঁরা প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন এবং যাঁদেরকে আমি ওর পূর্বেও কখনও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।' এ দু'জন ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ)। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

'সকলের পলায়নের পর যে কয়েজন মহান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অবস্থান করছিলেন এবং এক এক করে শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদেরকে তিনি বলে চলছিলেনঃ 'তাদেরকে বাধা প্রদান করতঃ জান্নাতে চলে যাবে ও জান্নাতে আমার বন্ধু হবে এমন কেউ আছ কি?' মক্কায় উবাই ইবনে খালফ শপথ করে বলেছিল, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করবো।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, 'সে তো নয় বরং ইনশাআল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করবো।' উহুদের যুদ্ধে সেই দুরাচার আপাদমস্তক লৌহ বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে অগ্রসর হয় এবং বলতে বলতে আসেঃ 'যদি মুহাম্মাদ বেঁচে যান তবে আমি নিজেকেই ধ্বংস করে দেবো'। এদিকে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ) ঐ দুরাচারের দিকে অগ্রসর হন। তার সারা দেহ লৌহবর্মে আবৃত ছিল। শুধুমাত্র কপালের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল। তিনি ঐ স্থান লক্ষ্য করে স্বীয় বর্শা দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। তা ঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগে যায়। এর ফলে সে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। আঘাত প্রাপ্ত স্থান হতে রক্তও বের হয়নি, অথচ তার অবস্থা এই ছিল যে, সে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিল। তার লোকেরা তাকে উঠিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট নিয়ে যায় এবং সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, বেশী আঘাত তো লাগেনি, তুমি এত কাপুরুষতা প্রদর্শন করছো কেন? অবশেষে সে তাদের বিদ্রূপে বাধ্য হয়ে বলে, 'আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি উবাইকে হত্যা করবো।' তোমরা এটা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, আমি বাঁচতে পারি না। এটা তোমরা মনে করো না যে, এ সামান্য আঁচড়ে কি হতে পারে? যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি সারা আরববাসীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিজ হাতের এ সামান্য আঘাত লাগতো তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যেতো।' এরকম অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে সেই পাপিষ্টের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায়। 'মাগাযী-ই-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকে' রয়েছে যে, যখন এ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্মুখীন হয় তখন সাহাবীগণ তাঁর মোকাবিলা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন কিন্তু তিনি তাদেরকে বাধা দেন এবং বলেনঃ 'তাকে আসতে দাও।' যখন সে নিকটবর্তী হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হারিস ইবনে সাম্মার (রাঃ) হাত হতে বর্শা নিয়ে তার উপর আক্রমণ করেন। তাঁর হাতে বর্শা দেখেই সে কেঁপে উঠে। সাহাবীগণ (রাঃ) তখনই বুঝে নেন যে, তার মঙ্গল নেই।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার স্কন্ধে আঘাত করেন, এর ফলেই সে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, 'বাতনে রাবেগ' নামক স্থানে ঐ কাফিরের মৃত্যু ঘটে। তিনি বলেনঃ একবার শেষরাত্রে এখান দিয়ে গমনের সময় এক জায়গায় এক ভীতিপ্রদ অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত দেখি এবং দেখতে পাই যে, একটি লোককে লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ করে ঐ আগুনে ছেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর সে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা বলে চিৎকার করছে। অন্য এক ব্যক্তি বলছেঃ 'তাকে পানি দিও না। সে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর হস্তে নিহত ব্যক্তি। সে হচ্ছে উবাই ইবনে খালফ'। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনের যে চারটি দাঁত মুশরিকরা উহুদের যুদ্ধে শহীদ করে দিয়েছিল ঐদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলছিলেনঃ 'ঐ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার কঠিন অভিশাপ রয়েছে যারা তাদের নবীর সাথে এ ব্যবহার করেছে এবং তার উপরও আল্লাহ পাকের ভীষণ অভিশাপ যাকে তাঁর রাসূল (সঃ) তাঁর পথে হত্যা করেন।' অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ রয়েছেঃ 'যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করেছে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার ভীষণ অভিশাপ রয়েছে।' উৎবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের হাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখমণ্ডলে এ আঘাত লেগেছিল। তাঁর সম্মুখের চারটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। গণ্ডদেশও আহত হয়েছিল এবং ওষ্ঠেও আঘাত লেগেছিল। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলতেনঃ 'ঐ লোকটিকে হত্যা করার যেমন লোভ আমার ছিল অন্য কাউকে হত্যা করার তেমন ছিল না। ঐ লোকটি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিল এবং সারা গোত্রই তার শত্রু ছিল। তার দুশ্চরিত্রতা ও জঘন্য আচরণের প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের উক্তিটিই যথেষ্ট। নবী (সঃ)-কে আহতকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত রাগান্বিত। মুসনাদ-ই-আবদুর রায্যাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জন্যে বদদুআ করে বলতেনঃ 'হে আল্লাহ! সারা বছরের মধ্যে সে যেন ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুফরীর অবস্থায় যেন তার মৃত্যু ঘটে।' বস্তুতঃ হলোও তাই। সেই দুরাচার কাফির হয়েই মারা গেল এবং জাহান্নামের অধিবাসী হলো। একজন মুহাজির বর্ণনা করেনঃ 'উহুদের যুদ্ধের দিন চতুর্দিক হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর তীর বর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সমস্তই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।' আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী সেদিন শপথ করে বলেছিলঃ 'মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দেখিয়ে দাও, সে আজ আমার হাত হতে রক্ষা পেতে পারে না। সে যদি মুক্তি পেয়ে যায় তবে আমার

মুক্তি নেই।' সে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর পার্শ্বেই এসে পড়ে। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কেউই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার চক্ষুর উপর পর্দা নিক্ষেপ করেন। সুতরাং সে তাঁকে দেখতেই পায় না। যখন সে বিফল হয়ে ফিরে যায় তখন শাফওয়ান তাকে বিদ্রূপ করে। সে তখন বলেঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দেখতেই পাইনি। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবেন। আমরা তাঁকে মারতে পারব না। জেনে রেখো, আমরা চার জন লোক তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি এবং পরস্পর প্রতিজ্ঞাও করে বসি। কিন্তু শেষে অকৃতকার্য হয়ে পড়ি।' ওয়াকেদী (রঃ) বলেনঃ 'কিন্তু প্রমাণজনক কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কপালে আঘাতকারী ছিল ইবনে কামইয়্যাহ এবং তাঁর ওষ্ঠে ও দাঁতে যে আঘাত করেছিল সে ছিল উৎবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস।' উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রাঃ) যখন উহুদের ঘটনা বর্ণনা করতেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে বলতেনঃ "সে দিনের সমস্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন হযরত তালহা (রাঃ)। আমি ফিরে এসে দেখি যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। আমি বলিঃ 'আল্লাহ করেন ইনি তালহা হন!' তখন আমি নিকটে গিয়ে দেখি যে, তিনি তালহাই (রাঃ) বটে। আমি তখন আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতঃ বলি–'ইনি আমারই গোত্রের একজন লোক।' আমার এবং মুশরিকদের মধ্যস্থলে একজন লোক দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণ মুশরিকদের সাহস হারিয়ে দিয়েছিল। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখি যে, তিনি ছিলেন হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)। তারপরে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পাই যে, তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেছে এবং চেহারা মুবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং কপালে লৌহ বর্মের দু'টি কড়া ঢুকে গেছে। আমি তখন দ্রুত বেগে তাঁর দিকে ধাবিত হই। কিন্তু তিনি বলেনঃ "আবূ তালহা (রাঃ)-এর সংবাদ লও।" আমি চাচ্ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল হতে কড়া দু'টি বের করে ফেলি। কিন্তু হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) আল্লাহর কসম দিয়ে আমাকে নিষেধ করেন এবং নিজেই নিকটে এসে হাত দিয়ে বের করতে খুবই কষ্ট অনুভব করেন। কাজেই দাঁত দিয়ে ধরে একটি বের করেন। কিন্তু এতে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়। তখন আমি পুনরায় চাইলাম যে, দ্বিতীয়টি আমি বের করবো। কিন্তু আবার তিনি আমাকে

আল্লাহর কসম দিয়ে বিরত রাখলেন। সুতরাং আমি বিরত থাকলাম। তিনি দ্বিতীয় কড়াটিও বের করলেন। এবারেও তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল। এ কার্য সাধনের পর আমি হযরত তালহা (রাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করি এবং দেখি যে, তাঁর দেহে সত্তরটি যখম হয়েছে। তাঁর অঙ্গুলিগুলোও কেটে পড়েছে। আমি পুনরায় তাঁর সংবাদ নেই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যখমের রক্ত চুষে নেন, যেন রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তাঁকে বলা হয়ঃ 'কুলকুচা করে ফেল'। কিন্তু তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি কুলকুচা করবো না।' তারপরে তিনি যুদ্ধেক্ষেত্রে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদি কেউ জান্নাতী লোককে দেখতে ইচ্ছে করে তবে যেন এ লোকটিকে দেখে।' এরূপে তিনি ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন।'' সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল আহত হয়, সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং মস্তকের শিরস্ত্রাণ পড়ে যায়। হযরত ফাতিমা (রাঃ) রক্ত ধৌত করছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করছিলেন। যখন দেখেন যে, রক্ত কোন কোনক্রমেই বন্ধ হচ্ছে না তখন হযরত ফাতিমা (রাঃ) মাদুর পুড়িয়ে ওর ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ প্রদান করলেন।' بِغَمٍّ শব্দে بَ অক্ষর عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ (২০ঃ ৭১)-এর মধ্যে فِىْ অক্ষরটি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক দুঃখ তো পরাজয়ের দুঃখ, যখন এটা প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ না করুন রাসূলুল্লাহ (সঃ) শহীদ হয়েছেন। দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে বিজয়ী বেশে মুশরিকদের পর্বতের উপর আরোহণ, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেনঃ 'তাদের জন্যে এ উচ্চতা বাঞ্ছনীয় ছিল না।' হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেনঃ 'প্রথম দুঃখ হচ্ছে পরাজয়ের দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ। এ দুঃখ প্রথম দুঃখ অপেক্ষা অধিক ছিল।' অনুরূপভাবে এক দুঃখ গনীমত হাতে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ পরাজয়ের দুঃখ। এরূপভাবে এক দুঃখ স্বীয় ভাইদের শহীদ হওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় দুঃখ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে জঘন্য সংবাদের দুঃখ।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যে গনীমত ও বিজয় তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল তার জন্যে দুঃখ করো না। প্রবল প্রতাপান্বিত ও মহা সম্মানিত আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত আছেন।'

১৫৪। অনন্তর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতারণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা যা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর একদল নিজের জীবনের জন্যে চিন্তা করছিল; তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যের বিনিময়ে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল, এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নেই? তুমি বল—সকল বিষয়ে আল্লাহর অধিকার; তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে, তা তোমার নিকট প্রকাশ করে না; তারা বলে—যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকতো, তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না; তুমি বল—যদি তোমরা তোমাদের গৃহের মধ্যেও থাকতে, তবুও যাদের প্রতি হত্যা বিধিবদ্ধ হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই স্বীয় বধ্যস্থানে এসে উপস্থিত হতো; এবং এটা এ জন্যে যে, তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন এবং এরূপে তিনি তোমাদের হৃদয়ের কথা পরীক্ষা করে থাকেন; এবং আল্লাহ অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন।

١٥٤- ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১৫৫। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদাবর্তিত হয়েছিল, তারা যা অর্জন করেছিল, তার কোন কোন বিষয় হতে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছিল; এবং অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

١٥٥- إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ ও চিন্তার সময় যে অনুগ্রহ করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে তন্দ্রাভিভূত করেছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র হাতে রয়েছে এবং শত্রু সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অন্তরে এত শান্তি রয়েছে যে, চক্ষু তন্দ্রায় ঢলে পড়েছে যা শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষণ। যেমন সূরা-ই-আনফালের মধ্যে বদরের ঘটনায় রয়েছে–

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

অর্থাৎ 'তাঁর পক্ষ হতে শান্তিরূপে যখন তন্দ্রা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে। (৮ঃ ১১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ 'যুদ্ধের সময় যে তন্দ্রা আসে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং নামাযের সময় যে তন্দ্রা আসে তা শয়তানের পক্ষ হতে আসে।' হযরত আবূ তালহা (রাঃ) বলেনঃ 'উহুদের যুদ্ধের দিন আমার চক্ষে এত বেশী তন্দ্রা এসেছিল যে, আমার হাত হতে তরবারী বারবার ছুটে গিয়েছিল।' তিনি আরও বলেনঃ 'আমি চক্ষু উঠিয়ে দেখি যে, প্রায় সবারই ঐরূপ অবস্থাই ছিল। তবে অবশ্যই একটি দল এরূপও ছিল যাদের অন্তর ছিল কপটতায় পরিপূর্ণ এবং তারা ছিল সদা ভীত–সন্ত্রস্ত। তাদের কুধারণা শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। অতএব বিশ্বস্ত আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং সত্যপন্থী লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। কিন্তু কপট সন্দেহ পোষণকারী এবং টলমলে ঈমানের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের প্রাণ শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা সদা হায় হায় করছিল এবং তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের কুমন্ত্রণা ঢুকে পড়েছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা মরতে চলেছে। তাদের অন্তরে বিশ্বাসও বদ্ধমূল

হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুমিনগণ আর দুনিয়ায় থাকবে না। কাজেই বাঁচার কোন উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা এই হয় যে, যেখানেই তারা সামান্য নিম্নভূমি দেখে, তাদের নৈরাশ্যের ঘনঘটা তাদেরকে ঘিরে নেয়। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ মন্দ হতে মন্দতম অবস্থাতেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভাল ধারণাই রাখেন। মুনাফিকদের মনের ধারণা ছিল এই যে, যদি তাদের কোন অধিকার থাকতো তবে তারা সেদিনের মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যেতো এবং তারা গোপনে ওটা বলতোও বটে। হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ 'ঐ কঠিন ভয়ের সময়েও আমাদেরকে এত ঘুম পেয়ে বসে যে, আমাদের চিবুকগুলো বক্ষের সাথে লেগে যায়। আমি আমার সে অবস্থাতেই মু'তাব ইবনে কুশায়েরের নিম্নের উক্তি শুনতে পাইঃ 'যদি আমার সামান্য কিছু অধিকার থাকতো তবে এখানে নিহত হতাম না।' আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বলছেনঃ 'মৃত্যু তো আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। মৃত্যুর সময় পরিবর্তিত হতে পারে না। তোমরা যদি বাড়ীতেও অবস্থান করতে, তথাপি এখানে যার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা রয়েছে সে অবশ্যই বাড়ী ছেড়ে এখানে চলে আসতো। ফলে আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্য লিখন পূর্ণ হয়ে যেতো। এ সময়টি এ জন্যেই ছিল যে, যেন আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন কথা প্রকাশ করে দেন। এ পরীক্ষা দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ হয়ে গেল। যে আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন কথা অবগত আছেন তিনি এ সামান্য ঘটনা দ্বারা মুনাফিকদেরকে প্রকাশ করে দিলেন এবং মুসলামনদেরও স্পষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল।' এখন আল্লাহ পাক খাঁটি মুসলমানদের পদস্খলনের বর্ণনা দিচ্ছেন যা মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। শয়তানই তাদের এ পদস্খলন ঘটিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের কর্মেরই ফল। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্যও হতো না এবং তাদের পদগুলো টলমলও করতো না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করতঃ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের কাজই হচ্ছে ক্ষমা করে দেয়া। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) প্রভৃতির ঐ অপরাধকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হযরত ওলীদ ইবনে উকবা (রাঃ) একদা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে বলেনঃ 'শেষ পর্যন্ত আপনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-এর উপর এত চটে রয়েছেন কেন?' তিনি তাকে বললেনঃ 'হযরত উসমান (রাঃ)-কে তুমি বল– আপনি কি উহুদের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেননি? বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেননি এবং হযরত উমার (রাঃ)-এর পন্থা পরিত্যাগ করেননি?'

হযরত ওলীদ (রাঃ) গিয়ে হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন হযরত উসমান (রাঃ)এর উত্তরে বলেন وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ অর্থাৎ (উহুদ যুদ্ধের অপরাধের) জন্যে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং সে জন্যে আর দোষারোপ কেন? বদরের যুদ্ধের সময় আমার সহধর্মিণী এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়াহ রোগাক্রান্ত হওয়ায় তার রোগ দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত থাকি। সে ঐ রোগেই মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে গনীমতের মালের পূর্ণ অংশ দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, একমাত্র সে ব্যক্তিই যুদ্ধলব্ধ মাল পেয়ে থাকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে আমার উপস্থিত থাকাই সাব্যস্ত হয়েছে। এখন বাকী থাকলো হযরত উমার (রাঃ)-এর পন্থা, ওটার ক্ষমতা আমারও নেই এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফেরও (রাঃ) নেই। যাও তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও।

১৫৬- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১৫৬। হে মুমিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে- তোমরা তাদের মত হয়ো না এবং যখন তাদের ভ্রাতৃগণ পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা যুদ্ধে নিহত হয় তখন তারা বলে- যদি ওরা আমাদের নিকট থাকতো তবে মৃত্যুমুখে পতিত হতো না। অথবা নিহত হতো না; আল্লাহ এরূপে তাদের অন্তরে দুঃখ সঞ্চার করেন, এবং আল্লাহই জীবন দান ও মৃত্যু দান করেন, এবং তোমরা যা করছো, তৎপ্রতি আল্লাহ লক্ষ্যকারী।

১৫৭। আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হও, তবে আল্লাহর নিকট হতেই ক্ষমা রয়েছে এবং তারা যা সঞ্চয় করেছে তদপেক্ষা তাঁর করুণা শ্রেষ্ঠতর।

١٥٧- وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

১৫৮। আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর বা নিহত হও তবে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকে একত্রিত করা হবে।

١٥٨- وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاْ اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ○

এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কাফিরদের ন্যায় অসৎ ও জঘন্য বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করছেন। এ কাফিরেরা মনে করতো যে, তাদের বন্ধু-বান্ধব যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ না করতো বা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হতো তবে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এ বাজে ও ভিত্তিহীন ধারণা তাদের দুঃখ ও অনুশোচনা আরও বৃদ্ধি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই মানুষ মরে থাকে এবং তাঁর চাহিদা হিসেবেই তারা জীবন লাভ করে। তাহলে তাঁর ইচ্ছাক্রমে সমস্ত কাজ চালু করা তাঁরই অধিকার। তিনি ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন টলবার নয়। তাঁর জ্ঞান হতে ও দৃষ্টি হতে কোন কিছু বাইরে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রত্যেক কাজ তিনি খুব ভাল করেই জানেন।' দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে– 'আল্লাহর পথে নিহত হওয়া বা মরে যাওয়া তাঁর ক্ষমা ও করুণা লাভেরই মাধ্যম এবং এটা নিশ্চিতরূপে দুনিয়া ও ওর সমুদয় জিনিস হতে উত্তম। কেননা, এটা ক্ষণস্থায়ী এবং ওটা চিরস্থায়ী।' এরপরে বলা হচ্ছে যে, মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদই হোক, যেভাবেই ইহজগত হতে বিদায় গ্রহণ করুক না কেন আল্লাহর নিকটই সকলে একত্রিত হবে। অতঃপর তারা তথায় তাদের কৃতকর্মের ফল স্বচক্ষে দর্শন করবে–কাজ ভালই হোক আর মন্দই হোক।

১৫৯। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশ ভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হতো, অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করেছ তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।

١٥٩- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে কেউই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে না; এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করে? এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে থাকে।

١٦٠- اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

১৬১। আর কোন নবীর পক্ষে আত্মসাত করণ শোভনীয় নয় এবং যে কেউ আত্মসাত করেছে তবে যা সে আত্মসাত করেছে তা উত্থান দিবসে আনয়ন করা হবে; অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা নির্যাতিত হবে না।

١٦١- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

١٦٢- اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৬২। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সে কি তার মত হতে পারে– যে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছে? এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম- আর ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

١٦٣- هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

১৬৩। আল্লাহর নিকট তাদের পদমর্যাদাসমূহ আছে; এবং তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী।

١٦٤- لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

১৬৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন– যখন তিনি তাদের নিজেরদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে, এবং নিশ্চয়ই তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর ও মুসলমানদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নবী (সঃ)-কে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বহু দূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-এর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর অনুকম্পা না হলে তাঁর নবীর হৃদয় এত কোমল হতো না। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, مَا শব্দটি صِلَة যাকে আরববাসী কখনও বা مَعْرِفَة -এর সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। যেমন- فَبِمَا نَقْضِهِمْ -এর মধ্যে। আবার কখনও نَكِرَة-এর সঙ্গেও মিলিয়ে থাকে। যেমন- عَمَّا قَلِيْلٍ -এর মধ্যে। এখানে ঐরূপই হয়েছে। অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি আল্লাহর করুণার ফলেই কোমল অন্তর বিশিষ্ট হয়েছ। হযরত হাসান বসরী

(রঃ) বলেনঃ এটাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র যার উপর তিনি প্রেরিত হয়েছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছেন, যাঁর উপর তোমদের কষ্ট কঠিন ঠেকে, যিনি তোমাদের উপর লোভী এবং যিনি মুমিনদের উপর স্নেহশীল, দয়ালু।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ)-এর হাত ধরে বলেন, 'হে আবূ উমামা! কতগুলো মুমিন এমন আছে যাদের জন্যে আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়'। فَظًّا শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্কশ ভাষা। কেননা, এর পরে غَلِيْظَ الْقَلْبِ শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ কঠিন হৃদয়। ইরশাদ হচ্ছে–যদি তুমি কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় বিশিষ্ট হতে তবে মানুষ তোমার চতুষ্পার্শ্ব হতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো এবং তোমাকে পরিত্যাগ করতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছেন। আর এজন্যে তাদের দিক হতে তোমাকেও প্রেম এবং নম্রতা দান করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলী দেখেছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয়, বাজারে গোলমালকারী এবং ন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণকারী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মার্জনাকারী ও ক্ষমাকারী। জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যে একটি গারীব হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মানুষকে অভিবাদন জানাতে, তাদের মঙ্গল কামনা করতে, তাদের অপরাধ এড়িয়ে চলতে আমাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ঐ রূপই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেরূপভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে'। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে–হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও আল্লাহ পাকের নিকট তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকল কার্যে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর। এ কারণেই সাহাবীগণকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সকল কার্যে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ওটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে তিনি তাঁদের নিকট পরামর্শ নেন। তখনি তাঁর সহচরবৃন্দ বলেছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করতঃ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ারও নির্দেশ প্রদান করেন তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই কুণ্ঠিত হবো না। আর যদি আপনি আমাদেরকে 'বারকুল গামাদ' পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেন তাহলেও

আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে গমন করবো। আমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর সহচরদের ন্যায় 'তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকছি' এরূপ কথা কখনও মুখে আনব না। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করবো। এরূপভাবে অবতরণস্থল কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ গ্রহণ করেন। হযরত মুনযির ইবনে আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, আগে বেড়ে তাদের সম্মুখে হতে হবে। অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ নেন যে, মদীনার ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, না বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে? অধিকাংশ লোক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মত প্রকাশ করেন। অতএব তিনি তাই করেন। পরিখার যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মদীনার উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গীকারে বিরুদ্ধ দলের সাথে সন্ধি করা হবে কি? হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইবনে মুআজ (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং তিনিও এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সন্ধি করা থেকে বিরত থাকেন। অনুরূপভাবে হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ পরামর্শ নেন যে, মুশরিকদেরকে আক্রমণ করা হবে কি? তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেনঃ 'আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। উমরাব্রত পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য'। আল্লাহর রাসূল (সঃ) এটাও স্বীকার করে নেন। এ রকমই যখন মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন, 'হে মুসলমান ভাই সব! যেসব লোক আমার গৃহিণীর দুর্নাম করছে তাদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে এ পরামর্শ দান কর। আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তো আমার গৃহিণীর কোন দোষ নেই। আর যে লোকাটির সাথে অপবাদ দিচ্ছে, আল্লাহর কসম। সেও তো আমার মতে ভাল লোকই বটে।' হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে পৃথক করণের ব্যাপারে তিনি হযরত আলী ও হযরত উসামা (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। মোটকথা যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্যে এবং অন্যান্য কার্যেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এ পরামর্শ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর ওয়াজিব ছিল, না সাহাবীগণের মনস্তুষ্টির জন্যে তাঁর ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল ছিল সে সম্বন্ধে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ আয়াতে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমার (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ রয়েছে। (হাকিম) এ দু'জন সহচরই ছিলেন তাঁর

সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা। আর ঐ দু'জনই ছিলেন মুসলমানদের পিতৃতুল্য। (কালবী) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দু'জন সাহাবী (রাঃ) কে বলেছিলেনঃ 'কোন কার্যে যদি তোমারা দু'জন একমত হয়ে যাও তবে আমি কখনও তোমাদের বিপরীত মত পোষণ করবো না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ عَزْمٌ শব্দের অর্থ কি? তিনি বলেনঃ 'জ্ঞানীদের পরামর্শক্রমে যখন কোন কার্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে তখন তা মেনে নেয়া।' (ইবনে মিরদুওয়াই) সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের ঘোষণাও বর্ণিত আছেঃ 'যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায় সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' সুনান-ই-আবি দাঊদ, জামেউত তিরমিযী এবং সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও বর্ণনাটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাই-এর নিকট কোন পরামর্শ গ্রহণ করে তখন সে যেন তাকে ভাল পরামর্শ দান করে।' (ইবনে মিরদুওয়াই)

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যখন তোমরা কোন কার্যের পরামর্শ গ্রহণের পর ওটা সাধনের দৃঢ় সংকল্প করে ফেল তখন মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর, আল্লাহ তা'আলা নির্ভরশীলদেরকে ভাল বাসেন।' অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা ঠিক এ রূপই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে- وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ। অর্থাৎ 'সাহায্য শুধু অল্লাহর পক্ষ থেকেই যিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।' তার পরে বলা হচ্ছে যে, মুমিনদের শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা উচিত। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন- 'আত্মসাত করা নবীর জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধে যে গনীমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল, তন্মধ্য হতে একটি লাল রং-এর চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করে যে, সম্ভবতঃ এটা রাসূলুল্লাহ-ই (সঃ) নিয়েছেন। তখনই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (জামেউত্ তিরমিযী) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোন জিনিসের অপবাদ দিয়েছিল যার ফলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রাসূলগণের নেতা হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) যে কোন প্রকারের বিশ্বাসঘাকতা ও আত্মসাৎ করণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সেটা মাল বন্টনই হোক বা আমানত আদায় করার ব্যাপারেই হোক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছেঃ 'নবী (সঃ) আত্মসাত করতে পারেন না

বা তিনি পক্ষপাতিত্বও করেন না যে, সৈন্যদের মধ্যে কাউকে যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ দেবেন এবং কাউকে বঞ্চিত রাখবেন'। এ আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপও করা হয়েছেঃ 'এটা হতে পারে না যে, নবী (সঃ) আল্লাহর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করবেন এবং স্বীয় উম্মতের নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন না।' يُغَلَّ শব্দের 'ي'-কে পেশ দিয়েও পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবেঃ 'নবী (সঃ)-এর ব্যক্তিত্ব এরূপ নয় যে, তাঁর নিকটতম সহচরগণ তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।' যেহেতু হযরত কাতাদাহ (রাঃ) এবং হযরত রাবী' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল হতে কিছু মাল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কয়েকজন সহচর বন্টনের পূর্বেই গ্রহণ করেছিল। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) অতঃপর আত্মসাতকারী লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং ভীষণ শাস্তির সংবাদ দেয়া হচ্ছে। হাদীসসমূহে এ সম্পর্কে অনেক কিছু ভীতির কথা রয়েছে। যেমন মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—'সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রের ভূমি বা ঘরের মাটি দাবিয়ে নেয়। যদি এক হাত মাটিও অন্যায়ভাবে নিজের দিকে চেপে নেয় তবে সাতটি যমীনের গলাবদ্ধ তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।' মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যাকে আমি শাসনকর্তা নিযুক্ত করি, তার বাড়ী না থাকলে বাড়ী করতে পারে, স্ত্রী না থাকলে স্ত্রী করতে পারে; খাদেম না থাকলে তা রাখতে পারে, সোয়ারী না থাকলে ওটাও সংগ্রহ করতে পারে এবং এগুলো ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে আত্মসাতকারী হিসেবে গণ্য হবে।' এ হাদীসটি সুনান-ই-আবি দাউদের মধ্যেও অন্য শব্দে বর্ণিত আছে। ইবনে জারীরের মধ্যে হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি ঐ লোকটিকে চিনি যে কিয়ামতের দিন এমন ছাগল নিয়ে আগমন করবে যে ভ্যাঁ ভ্যাঁ চীৎকার করবে, লোকটি আমার নাম নিয়ে ডাক দেবে। আমি বলবো—আজ আমি আল্লাহর নিকট তোমার কোন কাজে আসবো না, আমি তো তোমার নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ঐ লোকটিকেও চিনি যে শব্দকারী উট নিয়ে আগমন করবে। সে বলবেঃ 'হে মুহাম্মাদ (সঃ), হে মুহাম্মদ (সঃ)'! 'আমি বলবো—আমি তোমার জন্যে আল্লাহর নিকট কোন কিছুরই অধিকারী নই। আমি তো তাবলীগ করেছিলাম। ঐ লোকটিকেও আমি চিনে নেবো যে চিঁহি চিঁহি শব্দকারী ঘোড়া নিয়ে উঠবে। সেও আমাকে ডাক দেবে।

আমি তাকেও বলবো– আমি তো (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আমি কোন কাজে আসবো না। আমি ঐ লোকটিকেও চিনি যে চামড়া নিয়ে উপস্থিত হবে এবং বলতে থাকবে- 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! হে মুহাম্মাদ (সঃ)'! আমি বলবো–আমি আল্লাহর নিকট তোমার জন্যে কোন উপকারের অধিকারী নই। আমি তো তোমার নিকট (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েই দিয়েছিলাম। এ হাদীসটি ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়্দ গোত্রের একজন লোককে শাসনকর্তা করে পাঠান। লোকটিকে ইবনুল লাবতিয়্যাহ বলা হতো। সে যাকাত আদায় করে এসে বলে–'এগুলো আপনারদের এবং এটা আমার যা তারা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন–'ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, যখন আমি তাদেরকে কোন কাজে প্রেরণ করি তখন এসে বলে– 'এটা আপনাদের এবং এটা আমার উপঢৌকন?' এরা বাড়িতেই এসে বসে থাকলে দেখা যেতো, কেউ তাদেরকে উপঢৌকন পাঠায় কি-না। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে। সেই সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ ওর মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে ওটা স্কন্ধে বহন করে আগমন করবে। উট হলে চীৎকার করবে, গরু হলে হাম্বা রব করবে এবং ছাগল হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করবে।' অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় এত উঁচু করেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ চোখে পড়ে যায় এবং তিনবার বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি?' মুসনাদ- ই-আহমাদের একটি দুর্বল হাদীসে রয়েছে যে, এসব আদায়কারী ও শাসনকর্তা যেসব উপঢৌকন প্রাপ্ত হয় তা আত্মসাতের মধ্যেই গণ্য। এ বর্ণনাটি শুধুমাত্র মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যেই রয়েছে এবং এটা দুর্বল। মনে হচ্ছে যেন এটা পূর্ববর্তী দীর্ঘ বর্ণনাগুলোরই সারাংশ। জামেউত তিরমিযীর মধ্যে রয়েছে, হযরত মুআয্ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন। আমি তথায় গমন করলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর নিকট ফিরে আসলে তিনি আমাকে বলেনঃ 'আমি শুধুমাত্র কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। তা হচ্ছে এই যে, আমার অনুমতি ছাড়া যেটা গ্রহণ করবে তা আত্মসাত এবং প্রত্যেক আত্মসাতকারী তার আত্মসাতকৃত জিনিস নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। এ টুকুই আমার বলার ছিল। যাও, নিজ কার্যে লেগে পড়।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীগণের সামনে দাঁড়িয়ে

বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাত করণের বর্ণনা দেন এবং ওর বড় বড় পাপ ও শাস্তির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর মানুষের কিয়ামতের দিন জন্তুসমূহ নিয়ে উপস্থিত হওয়া ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন করা এবং তাঁর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করারও উল্লেখ আছে, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে সোনা-চাঁদিরও উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'হে লোক সকল! আমি যাকে আদায়কারী নিযুক্ত করি সে যদি একটি সুচ বা তার চেয়েও হালকা জিনিস চুরি করে তবে তা আত্মসাত রূপেই গণ্য হবে এবং তা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।' এ কথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) নামক শ্যাম বর্ণের একজন আনসারী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তাহলে আদায়কারী নিযুক্ত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেন, 'কেন?' তিনি বলেন, আপনার এ উক্তির কারণে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেন, হ্যাঁ, আরও জেনে রেখো যে, যার উপর আমি কোন কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করি তার উচিত হবে কম বেশী সব কিছুই নিয়ে আসা। যা তাকে দেয়া হবে তা সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে বিরত রাখা হবে তা হতে বিরত থাকবে।' এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই-আবি দাউদেও রয়েছে। হযরত আবূ রাফে' (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসর নামাযের পরে প্রায়ই বানূ আব্দুল আসহালের ওখানে গমন করতেন এবং প্রায়ই মাগরিব পর্যন্ত তথায় জনসমাবেশ থাকতো। একদা মাগরিবের সময় তিনি তথা হতে ফিরে আসছিলেন। সময় সংকীর্ণ ছিল বলে তিনি দ্রুত পদে চলছিলেন। 'বাকীতে' (জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থান) পৌঁছে তিনি বলেনঃ 'তোমার প্রতি অভিশাপ! তোমার প্রতি অভিশাপ!' আমি মনে করি যে, তিনি আমাকেই বলছেন। তাই আমি আমার কাপড় ঠিকঠাক করতে গিয়ে তাঁর পিছনে পড়ে যাই। তিনি আমাকে বললেনঃ 'ব্যাপার কি?' আমি বলি– 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার এ উক্তির কারণে আমি পিছনে থেমে গিয়েছিলাম।' তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে বলিনি, বরং এটি অমুক ব্যক্তির সমাধি। আমি তাকে অমুক গোত্রের আদায়কারী করে পাঠিয়েছিলাম। সে একটি চাদর লুকিয়ে নিয়েছিল। ঐ চাদরটি এখন আগুন হয়ে তার উপর জ্বলতে রয়েছে।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত উবাদা ইবনে সাবিদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) গনীমতের

মালের উষ্ট্রপৃষ্ঠের কিছু লোম গ্রহণ করতেন, অতঃপর বলতেনঃ 'এতে আমার ঐ অধিকারই রয়েছে যে অধিকার তোমাদের কোন একজনের রয়েছে। তোমরা আত্মসাত হতে দূরে থাক। কিয়ামতের দিন আত্মসাতকারী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। সুচ ও সূতাও পৌঁছিয়ে দাও এবং তদপেক্ষা নগণ্য জিনিসও (পৌঁছিয়ে দাও)। আল্লাহর পথে নিকটবর্তীদের সাথে এবং দূরবর্তীদের সাথে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ স্বদেশেও কর এবং বিদেশেও কর। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। জিহাদের কারণে আল্লাহ তা'আলা কাঠিন্য হতে এবং দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহর শাস্তি নিকটবর্তীদের উপর ও দূরবর্তীদের উপর জারী কর। আল্লাহর কাজ হতে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন তোমাদেরকে বিরত না রাখে'। (মুসনাদ-ই- আহমাদ) এ হাদীসের কিছু অংশ সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও বর্ণিত আছে। হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আদায়কারী করে পাঠাবার ইচ্ছে করে বলেনঃ 'হে আবূ মাসঊদ! যাও আমি তোমাকে যেন কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় না পাই যে, তোমার পৃষ্ঠোপরি শব্দকারী উট থাকে যা তুমি আত্মসাত করে নিয়েছো।' আমি বলি–হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তাহলে যেতে চাই না। তখন তিনি বলেনঃ 'আচ্ছ ঠিক আছে, আমি তোমাকে জোরপূর্বক পাঠাতেও চাইনে।' (সুনান-ই-আবি দাঊদ) ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় অতঃপর ওটা সত্তর বছর পর্যন্ত চলতে থাকে তথাপি জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আত্মসাতকৃত জিনিসকে ঐরূপভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আত্মসাতকারীকে বলা হবে–'যাও ওটা নিয়ে এসো'। আল্লাহ পাকের وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -এ উক্তির ভাবার্থ এটাই। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, খাইবারের যুদ্ধের দিন সাহাবা-ই-কিরাম আসেন ও বলেন, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। একটি লোক সম্বন্ধে এ কথা বলা হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'কখনই নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। কেননা, সে গনীমতের মাল হতে একটি চাদর আত্মসাত করেছিল।' অতঃপর তিনি বলেন, 'হে উমার ইবনে খাত্তাব! তুমি যাও এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, শুধুমাত্র ঈমানদারগণই জান্নাতে যাবে।' হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি গিয়ে এটা ঘোষণা করে দেই।' এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম

তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, একদা হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রাঃ)-এর সঙ্গে সাদকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের ঘোষণা শুনেননি? তিনি সাদকার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতাকারীর সম্বন্ধে বলেছেন, 'ওর মধ্য হতে যে ব্যক্তি উট অথবা ছাগল নিয়ে নেবে, তাকে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উঠতে হবে।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তখন বলেন, 'হ্যাঁ'। এ বর্ণনাটি সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সাদকা আদায়কারী হিসেবে পাঠাবার ইচ্ছে করে বলেন, 'হে সা'দ! এরূপ যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তুমি উচ্চ শব্দকারী উট বহন করে আগমন কর।' তখন হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, 'আমি এ পদ গ্রহণও করব না, সুতরাং এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।' অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এ কার্য হতে নিষ্কৃতি দান করেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রূম যুদ্ধে হযরত মুসলিম ইবনে আবদুল মালিকের সঙ্গে হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহও ছিলেন। এক ব্যক্তির মালপত্রের মধ্যে কিছু আত্মসাতের মালও পাওয়া যায়। সেনাপতি হযরত সালিমকে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর পিতা হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কারও মালপত্রের মধ্যে তোমরা চুরির মাল পেলে তা পুড়িয়ে ফেলবে।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথাও বলেনঃ 'এবং তাঁকে শাস্তি প্রদান করবে।' ঐ লোকটির মাল বাজারের মধ্যে বের করা হলে ওর মধ্যে একখানা কুরআন মাজীদও পাওয়া যায়। হযরত সালিমকে পুনরায় ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ওটা বিক্রি করে মূল্য সাদকা করে দিন।' এ হাদীসটি সুনান-ই-আবি দাঊদ এবং জামেউত তিরিমিযীর মধ্যেও রয়েছে। ইমাম আলী ইবনে মাদীনী (রঃ) এবং ইমাম বুখারী (রঃ) প্রভৃতি বলেন যে, এ হাদীসটি মুনকার। ইমাম দারেকুতনী (রঃ) বলেন, 'সঠিক কথা এই যে, এটা হযরত সালিম (রঃ)-এর ফতওয়া।' হযরত ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণেরও এটাই উক্তি। হযরত হাসান বসরীও (রঃ) এ কথাই বলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, তার মালপত্র জ্বালিয়ে দেয়া হবে, তাকে দাসের

'হদ্দ' অপেক্ষা কম প্রহার করা হবে এবং তাকে গনীমতের কোন অংশ দেয়া হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং জমহূরের মাযহাব এর বিপরীত। তাঁরা বলেন যে, তার আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিতে হবে না, বরং ওর তুল্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আত্মসাতকারীর জানাযার নামায পড়তে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তার আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দেননি। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, যখন কুরআন কারীমের পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয় তখন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জনগণকে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ পারলে যেন ওটা গোপন করে রাখে। কেননা, যে ব্যক্তি যে জিনিস গোপন করে রাখবে ঐ জিনিস নিয়েই সে কিয়ামতের দিন আগমন করবে।' অতঃপর তিনি বলেন 'আমি সত্তর বার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভাষায় পাঠ করেছি। তবে কি আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পড়িয়ে দেয়া আয়াতকে পরিত্যাগ করবো?' ইমাম অকী'ও স্বীয় তাফসীরে এটা এনেছেন। সুনান-ই-আবি দাঊদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন গনীমতের মাল আসতো তখন তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে দিয়ে ঘোষণা করে দিতেনঃ 'যার কাছে যা আছে তা যেন সে নিয়ে আসে।' অতঃপর তিনি তা হতে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিতেন এবং অবশিষ্ট বন্টন করে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি এর পরে একগুচ্ছ চুল নিয়ে হাযির হয় এবং বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আমার নিকট রয়ে গিয়েছিল।' তিনি বলেনঃ 'হযরত বেলাল (রাঃ) যে তিনবার ঘোষণা করেছেন তা কি শুনতে পাওনি?' সে বলেঃ 'হাঁ, পেয়েছিলাম।' তিনি বলেনঃ 'তখন আননি কেন?' সে ওযর পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি এটা আর কখনও নেব না। তুমি এটা কিয়ামতের দিন নিয়ে যেয়ো।' এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ যারা আল্লাহর শরীয়তের উপর চলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে, তাঁর পুণ্যের অধিকারী হয় এবং তাঁর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পায় আর যারা তাঁর ক্রোধে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় এ দু'দল কি কখনও সমান হতে পারে? কুরআন কারীমের মধ্যে অন্য জায়গা রয়েছেঃ 'যারা আল্লাহর কথাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে এবং যারা ওটা হতে অন্ধ রয়েছে তারা সমান নয়'। অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে– 'যাদের সঙ্গে আল্লাহর উত্তম ওয়াদা হয়ে গেছে এবং যা তারা প্রাপ্ত হবে, তারা এবং দুনিয়ার উপকার লাভকারীরা সমান নয়। এরপর আল্লাহ্ পাক বলেন–'ভাল ও মন্দের অধিকারীরা ভিন্ন সোপানের উপর রয়েছে; ওরা রয়েছে জান্নাতের সোপানে এবং এরা রয়েছে

জাহান্নামের সোপানে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে– وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا অর্থাৎ 'প্রত্যেকের জন্যে তাদের কার্য অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ রয়েছে'। তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা কার্যাবলী দেখতে রয়েছেন এবং অতিসত্বরই তিনি সকলকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন; না পুণ্য মারা যাবে, না পাপ বৃদ্ধি পাবে বরং আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।' এরপর আল্লাহপাক বলেনঃ 'মুমিনদের উপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন নবী পাঠিয়েছেন যেন তারা তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তাঁর পার্শ্বে উঠতে বসতে পারে এবং পূর্ণভাবে উপকার গ্রহণ করতে পারে।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি বল নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার নিকট এই প্রত্যাদেশ হয়েছে যে নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ একজনই বটে।' (১৮ঃ ১১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ـ

অর্থাৎ 'হে নবী! তোমার পূর্বেও আমি যত নবী পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই খাদ্য ভক্ষণ করতো এবং বাজারসমূহে চলাফেরা করতো।' (২৫ঃ ২০) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও আমি পুরুষ লোকদের নিকটই অহী করেছিলাম যারা পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল।'(১২ঃ ১০৯) আর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

অথাৎ 'হে দানব ও মানবগণ! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতেই রাসূলগণ আসেনি?' মোটকথা এটা পূর্ণ অনুগ্রহ যে সৃষ্টজীবের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠান হয়েছে যেন তারা তাঁদের সঙ্গে উঠা বসা করে বার বার প্রশ্নোত্তর করতঃ ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, রাসূল (সঃ) জনগণের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে থাকেন

অর্থাৎ কুরআন কারীম পাঠ করে তাদেরকে শুনিয়ে থাকেন, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্যে হতে শির্‌ক ও অজ্ঞতার অপবিত্রতা দূর করতঃ তাদেরকে নির্মল ও পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এ রাসূল (সঃ)-এর আগমনের পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে প্রকাশ্য অন্যায় ও পূর্ণ অজ্ঞতা বিরাজমান ছিল।

১৬৫। হ্যাঁ, যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হলো বস্তুতঃ তোমরাও তাদের প্রতি তদনুরূপ দু'বার বিপদ উপস্থিত করেছিলে, যখন তোমরা বলছিলে- এটা কোথা হতে হলো? তুমি বল- ওটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

١٦٥- اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৬৬। এ দু' দলের সম্মুখীন হওয়ার দিবস তোমাদের উপর যা উপনীত হয়েছিল, তা আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে; এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে বিজ্ঞপিত করেন।

١٦٦- وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৬৭। আর তদ্দ্বারা তিনি কপটদেরকে পরিচিত করেন; এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল- এসো, আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর অথবা তাদেরকে বিনাশ কর; তারা বলেছিল- যদি আমরা যুদ্ধ

١٦٧- وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۖ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ هُمْ

لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ○

করতে জানতাম, তবে কি আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম না? তারা সেদিন বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল; তাদের অন্তরে যা নেই তাই তারা মুখে বলে থাকে এবং তারা যে বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন।

١٦٨- الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

১৬৮। যারা গৃহে বসে স্বীয় ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে বলেছিল, যদি তারা আমাদের কথা মান্য করতো তবে নিহত হতো না; তুমি বল– যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।

এখানে যে বিপদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের বিপদ। এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। কিন্তু মুসলমানগণ এর দ্বিগুণ বিপদ কাফিরদেরকে পৌঁছিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হয়েছিল এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল। মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করেন যে, এ বিপদ কি করে আসলো? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন–'এ বিপদ তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতেই এসেছে।' হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ মুক্তিপণ নিয়ে যেসব কাফিরকে মুক্তি দিয়েছিলেন তারই শাস্তি স্বরূপ উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করা হয়, তাঁদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্মুখের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর মাথার পাগড়ী পড়ে যায় এবং চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়ে যায়। উক্ত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ও মুসনাদ-ই-আহমাদ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং

বলেনঃ 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনার গোত্রের লোক যে কাফিরদেরকে বন্দী করেছে এটা আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দীয় নয়। এখন দু'টি সিদ্ধান্তের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের নির্দেশ দিন। হয় তারা বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলবে না হয় মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু পরে এ সংখ্যক মুসলমানও শহীদ হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে একত্রিত করে এ দু'টি সিদ্ধান্তই পেশ করেন। তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরা আমাদের গোত্রীয় লোক এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। আর এ অর্থ দ্বারা আমরা শক্তি অর্জন করতঃ অন্যান্য শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং আমাদের মধ্য হতে যে এতজন লোক শহীদ হবেন তাতে আমাদের ক্ষতি কি?' এরূপে ক্ষতিপূরণ আদায় করে সত্তরজন বন্দীকে ছেড়ে দেয়া হয়। উহুদ যুদ্ধে ঠিক সত্তরজন মুসলমানই শহীদ হন। (জামেউত তিরমিযী ও সুনান-ই-নাসাঈ) সুতরাং এক ভাবার্থতো এই হলো যে, এটা স্বয়ং মুসলমানদের পক্ষ হতেই হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা এই শর্তে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্য হতেও এ সংখ্যক মুসলমান শহীদ হবেন এবং ঘটেছিলও তাই। দ্বিতীয় ভাবার্থ হচ্ছে– 'তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্য হয়েছিলে বলেই তোমাদেরকে এ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।' তীরন্দাজগণকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের স্থান হতে সরতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ঐ নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত স্থান হতে সরে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর সক্ষম। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছে করেন তাই নির্দেশ দেন। কেউ তাঁর নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পরে না। দু'টি দলের মুখোমুখী হওয়ার দিন (হে মুমিনগণ!) তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, যেমন তোমরা শত্রুদের মোকাবিলা করতে গিয়ে পলায়ন করেছিলে, তোমাদের কতক লোক শহীদ হয়েছিল এবং কিছু আহতও হয়েছিল, এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে অটল ও দৃঢ় ঈমানের লোক এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করা হয়। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার সঙ্গীরা যারা রাস্তা হতে ফিরে এসেছিল। একজন মুসলমান তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা কমপক্ষে ঐ আক্রমণকারীদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও।' কিন্তু তারা কৌশল করে বলে, 'আমরা যুদ্ধবিদ্যায় মোটেই পারদর্শী নই। আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' ওরা যদি কমপক্ষে মুসলমানদের সঙ্গেও থাকতো তাহলেও কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যেতো। কেননা এর ফলে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী দেখানো হতো বা তারা দু'আ করতো, কিংবা প্রস্তুতি

গ্রহণ করতো। তাদের উপরের কথার ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছেঃ 'আমরা যদি জানতে পারতাম যে, সত্য সত্যই তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হবেই না। সীরাত-ই-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক হাজার লোক নিয়ে উহুদের প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হন। পথে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং বলে, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যদের কথা শুনে মদীনার বাইরে চলে আসলেন এবং আমার কথা শুনলেন না। আল্লাহর শপথ! কোন্ উপকারকে লক্ষ্য করে যে আমরা প্রাণ বিসর্জন দেবো তা আমাদের মোটেই জানা নেই। হে লোক সকল! কেন তোমরা জীবন হারাতে যাচ্ছ? কপট ও সন্দেহ পোষণকারী যত লোক সবাই তার কথা মেনে নেয় এবং এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে সে দুষ্ট ফিরে আসে। বানূ সালমার ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) তাদেরকে বুঝিয়ে বলেন, 'হে আমার গোত্র! স্বীয় নবী (সঃ)-কে ও স্বীয় সম্প্রদায়কে অপদস্থ করো না। তাঁদেরকে শত্রুর সম্মুকে নিক্ষেপ করে তোমরা পলায়ন করো না।' কিন্তু তারা কৌশল অবলম্বন করে বলে, 'আমরা জানি যে যুদ্ধ হবেই না।' মুসলমানগণ তাদেরকে বুঝাতে অসমর্থ হয়ে অবশেষে বলেন, 'হে আল্লাহর শত্রুর দল! যাও আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন! তোমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-এর সাহায্যকারী।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। ইরশাদ হচ্ছে–'সে দিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের বেশী নিকটবর্তী ছিল।' এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সে কুফরীর নিকটবর্তী হয় এবং কখনও ঈমানের নিকটবর্তী। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখে বলে থাকে।' যেমন তারা বলে থাকে–'আমরা যদি যুদ্ধ হওয়ার কথা জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম।' অথচ তারা নিশ্চিতরূপে জানতো যে, মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কেননা, ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে তাদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল। কাজেই তারা এখন দুর্বল মুমিনদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়েছে। সুতরাং এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তাদের অন্তরের গোপনীয় কথা আমি খুব ভালভাবেই জানি।' এ লোকগুলো ওরাই যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, 'যদি এরা আমাদের পরামর্শ মত কাজ করতো এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো তবে কখনও নিহত হতো না'।

এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যদি তোমাদের এ কথা সঠিক হয় যে, মানুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত না হলে মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যাবে তবে তো তোমাদের না মরাই উচিত, কেননা তোমরা তো বাড়ীতেই বসে রয়েছো। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, একদিন তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে, যদিও সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাদেরকে তখনই সত্যবাদী মনে করতে পারি যখন তোমরা নিজেরেদকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারবে।' হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।'

১৬৯। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়েছে।

١٦٩- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

১৭০। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং যারা পশ্চাতে থেকে তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি, তাদের এ অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিত হবে না।

١٧٠- فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

১৭১। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নিয়ামত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয়, আর এ জন্যে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

١٧١- يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ع

১৭ ১৭ ৮

١٧٢- اَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ
وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ
الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ
وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১৭২। যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করেছিল– তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করেছে ও সংযত হয়েছে, তাদের জন্যে মহান প্রতিদান।

١٧٣- اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا
وَّقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ ○

১৭৩। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেসব লোক সমবেত হয়েছে– অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল, আল্লাহই তাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক।

١٧٤- فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ
وَّاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ○

১৭৪। অনন্তর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল; আর আল্লাহ মহান গৌরবশালী।

١٧٥- اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ
يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○

১৭৫। নিশ্চয়ই শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুগণ হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন-'আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও আখেরাতে তাদের আত্মা জীবিত থাকে এবং আহার্য প্রাপ্ত হয়। এ আয়াতটির শান-ই-নযূল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চল্লিশ অথবা সত্তরজন সাহাবীকে 'বীরে মুআওনাহ' -এর দিকে পাঠিয়েছিলেন। এ দলটি যখন ঐ কূপের উপরে অবস্থিত গুহা পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁরা তথায় শিবির স্থাপন করেন। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করেন, 'এমন কে আছে যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর রাসূলে (সঃ)-এর কালেমাকে ঐ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে?' একজন সাহাবী ঐ জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং ঐসব লোকের বাড়ীর নিকটে এসে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, 'হে বীরে মুআওনার অধিবাসীবৃন্দ! জেনে রেখো যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর একজন দূত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মা'বূদ এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।' এ কথা শুনামাত্রই এক কাফির তীর নিয়ে বাড়ী হতে বেরিয়ে আসে এবং এমনভাবে লক্ষ্য করে চালিয়ে দেয় যে, তাঁর পঞ্জরের এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঐ সাহাবীর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে যায়ঃ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ। অর্থাৎ 'কা'বার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি'। তখন কাফিরেরা পদচিহ্ন ধরে ঐ গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তাদের নেতা আ'মের ইবনে তোফায়েল ঐ সব মুসলমানকে শহীদ করে দেয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'তাদের সম্বন্ধে কুরআন কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁদের উক্তি যেন নিম্নরূপ, 'আমাদের পক্ষ হতে আমাদের সম্প্রদায়কে এ সংবাদ জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' আমরা বরাবর এ আয়াতগুলো পড়তে থাকি। অতঃপর কিছুদিন পর ঐগুলো রহিত করে দিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং لَا تَحْسَبَنَّ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়'। (মুহাম্মাদ ইবনে জারীর) সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত মাসরূক (রঃ) বলেন, 'আমরা হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ 'তাদের আত্মাসমূহ সবুজ রং-এর পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্যে আরশে লটকান প্রদীপসমূহ রয়েছে। সারা জান্নাতের মধ্যে তারা যে কোন জায়গায় বিচরণ করে এবং ঐ প্রদীপসমূহে আরাম লাভ করে থাকে। তাদের প্রভু তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলেন-'তোমরা কিছু চাও কি?' তারা বলেঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আর কি চাবো? জান্নাতের সর্বত্র আমরা

ইচ্ছেমত চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। এরপরে আমরা আর কি চাইতে পারি?' আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন এবং তারা ঐ এক উত্তরই দেয়। তৃতীয় বার আল্লাহ পাক ঐ প্রশ্নই করেন। তারা যখন দেখে যে, কিছু চাওয়া ছাড়া উপায় নেই তখন বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আমাদের আত্মাগুলো আপনি আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন। আমরা আবার দুনিয়ায় গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করবো এবং শহীদ হবো'। তখন জানা হয়ে যায় যে, তাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। সুতরাং 'তোমরা আর কি চাও?' এ প্রশ্ন করা হতে আল্লাহ তা'আলা বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যারা মারা যায় এবং আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে তারা কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ করে না। কিন্তু শহীদগণ এ আকাংখা করে যে, তাদেরকে যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা দ্বিতীয় বার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারে। কেননা, তারা স্বচক্ষে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ) সহীহ মুসলিম শরীফে এ হাদীসটি রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেনঃ 'হে জাবির! তুমিও জান যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করেছেন এবং তাকে বলেছেন—'হে আমার বান্দা! কি চাবে চাও?' তখন সে বলেছে, 'হে আল্লাহ! পৃথিবীতে আবার আমাকে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি দ্বিতীয়বার আপনার পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারি।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন—'এটা তো আমি ফায়সালা করেই ফেলেছি যে, এখান হতে কেউ দ্বিতীয়বার ফিরে যাবে না।' তাঁর নাম ছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম আনসারী (রাঃ)। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমার পিতার শাহাদাত লাভের পর আমি কাঁদতে আরম্ভ করি এবং তাঁর মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরিয়ে সরিয়ে বার বার তাঁর চেহারা দেখতে থাকি। সাহাবীগণ আমাকে নিষেধ করছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ 'হে জাবির! ক্রন্দন করো না। যে পর্যন্ত তোমার পিতাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া না হবে সে পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে তাঁকে ছায়া করে থাকবেন।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমাদের ভাইদেরকে যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পক্ষীসমূহের দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল ভক্ষণ করে, জান্নাতী নদীর পানি পান করে এবং আরশের

ছায়ার নীচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ করে। যখন পানাহারের এরূপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয় তখন বলতে থাকে, 'আমাদের জগতবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের সংবাদ পেতো, তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতো না এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা নিশ্চিত থাক। আমি জগতবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবো।' তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো হযরত হামযা (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (মুসতাদরিক-ই-হাকিম) তাফসীর কারকগণ এ কথাও বলেছেন যে, উহুদের শহীদগণের ব্যাপারেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আবূ বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে দেখে বলেনঃ 'হে জাবির (রাঃ)! তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে চিন্তিত দেখছি?' আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর উপর অনেক ঋণের বোঝা রয়েছে। তা ছাড়া আমার বহু ছোট ভাই বোনও রয়েছে। তিনি বলেনঃ 'জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গে কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকেই বলেছেন। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি মুখোমুখী হয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাকে বলেছেনঃ 'তুমি আমার নিকট চাও। যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেবো।' তোমার আব্বা বলেছে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে আসতে পারি।' মহা সম্মানিত আল্লাহ তখন বলেছেন, 'এ কথা তো আমি পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে রেখেছি যে, কেউই এখান হতে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাবে না।' তখন তোমার পিতা বলেন, 'হে আমার প্রভু! আমার পরবর্তীদেরকে তাহলে আপনি এ মর্যাদার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। বায়হাকীর মধ্যে এটুকু আরও বেশী আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তো আপনার ইবাদতের হকও আদায় করতে পারিনি।' মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, শহীদগণ জান্নাতের দরজার উপর নদীর ধারে সবুজ গম্বুজের উপর রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের নিকট জান্নাতী দান পৌঁছে যায়। হাদীস দু'টির মধ্যে অনুরূপতা এই যে, কতগুলো শহীদ এমন রয়েছেন যাঁদের আত্মাগুলো পাখীর দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে, আবার

কতগুলো এমন রয়েছেন যাঁদের অবস্থান স্থল হচ্ছে এ গম্বুজ। আর এও হতে পারে যে, তাঁরা জান্নাতের মধ্যে ঘুরাফেরা করার পর এখানে একত্রিত হন এবং এখানেই তাঁদেরকে আহার করান হয়। এখানে এ হাদীসগুলো আনয়ন করাও খুবই উপযোগী হবে যেগুলোর মধ্যে প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এ সুসংবাদই রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুমিনের আত্মা হচ্ছে একটি পাখী যে জান্নাতের বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে বেড়ায়। শেষে কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা সকলকে দাঁড় করাবেন তখন ঐ আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেবেন।' এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে তিনজন মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম রয়েছেন, যাঁরা এমন চারজন ইমামেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁদের মাযহাব মান্য করা হয়। প্রথম হচ্ছেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)। তিনি এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফিঈ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর শিক্ষক হচ্ছেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস আসবাহী (রঃ)। সুতরাং ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং ইমাম মালিক (রঃ) এ তিনজন খ্যাতনামা ইমাম হচ্ছেন এ হাদীসের বর্ণনাকারী। অতএব, এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানদারের আত্মা জান্নাতী পাখীর আকারে জান্নাতে অবস্থান করে এবং শহীদগণের আত্মা পূর্ব বর্ণনা হিসেবে সবুজ রং-এর পাখীর দেহে অবস্থান করে। এ আত্মাগুলো তারকারাজির ন্যায়। সাধারণ মুমিনদের আত্মা এই মর্যাদা লাভ করবে না। ওরা নিজে নিজেই উড়ে বেড়ায়। পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে ঈমান ও ইসলামের উপর আমাদের মৃত্যু দান করেন, আমীন!

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন– 'এ শহীদগণ যেসব সুখ ও শান্তির মধ্যে রয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং তাদের নিকট এটাও খুশীর বিষয় যে, তাদের বন্ধু যারা তাদের পরে আল্লাহর পথে শহীদ হবে ও তাদের নিকট আগমন করবে, আগামীর জন্যে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা যা দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছে তজ্জন্যে তাদের কোন দুঃখ হবে না।' আল্লাহ পাক আমাদেরকেও জান্নাত দান করুন! হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেনঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, তারা সন্তুষ্ট, কেননা তাদের ভাই বন্ধুদের মধ্যে যারা জিহাদে লিপ্ত রয়েছে তারাও শহীদ হয়ে তাদের সুখের অংশীদার হবে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিদানে উপকৃত হবে।' হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ 'শহীদকে

একখানা পত্র দেয়া হয় যে, অমুক দিন তোমার নিকট অমুকের আগমন ঘটবে এবং অমুক দিন অমুক আসবে। সুতরাং যেমন দুনিয়াবাসী কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমন সংবাদে খুশী হয়ে থাকে, তদ্রূপ এ শহীদগণ ঐ শহীদদের আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হবে।' হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রঃ) বলেন, 'ভাবার্থ এই যে, যখন শহীদগণ জান্নাতে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় স্থান, করুণা ও সুখ-শান্তি দর্শন করেন তখন বলেন, 'যদি এ অবগতি আমাদের ঐ ভাইদের থাকতো যারা এখন পর্যন্ত দুনিয়াতেই রয়েছে, তবে তারা বীরত্বের সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করতো এবং এমন জায়গায় প্রবেশ করতো যেখান হতে জীবিত ফিরে আসার আশা থাকতো না, তাহলে তারাও আমাদের এ সুখ ভোগের অংশীদার হতো।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে তাঁদের এ সম্ভোগের কথা জানিয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন– 'আমি তোমাদের সংবাদ তোমাদের নবীর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি।' ফলে তাঁরা অত্যন্ত খুশী হন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বীরে মুআও'নার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন সত্তরজন সাহাবী। তারা সবাই একই দিনে সকালে কাফিরদের তরবারীর আঘাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাঁদের হত্যাকারীদের জন্যে একমাস পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযে 'কুনুতে' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদদু'আ করেন এবং তাদেরকে অভিশাপ দেন। তাদের ব্যাপারেই কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল–'আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' আল্লাহ পাক বলেন–'তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করার দরুন আনন্দিত হয়, আর এ জন্যেও আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।' হযরত আব্দুর রহমান (রঃ) বলেন যে, يَسْتَبْشِرُوْنَ -এ আয়াতটি সমস্ত মুমিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য, শহীদ হোক আর নাই হোক। এরূপে খুব কম স্থানই রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পর মুমিনদের প্রতিদানের বর্ণনা না করেন। অতঃপর ঐ খাঁটি মুমিনদের প্রশংসামূলক বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা 'হামরা-ই-আসাদের' যুদ্ধে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বিপদ পৌঁছিয়ে ছিল, অতঃপর তারা বাড়ীর দিকে প্রস্থান করেছিল। কিন্তু পরে তাদের ধারণা হয় যে, সুযোগ খুব ভাল ছিল। মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছিল এবং আহতও হয়েছিল, আর তাদের

বড় বড় বীর পুরুষেরা শহীদও হয়েছিল। কাজেই তাদের মতে তারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করলে কাজই ফায়সালা হয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতঃ বলেনঃ 'তোমরা আমার সাথে চল। আমরা মুশরিকদের পিছনে ধাওয়া করবো যেন তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন জেনে নেয় যে, মুসলমানেরাও শক্তিহীন হয়নি। তিনি শুধু তাঁদেরকেই সাথে নিয়েছিলেন যাঁরা উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছাড়া তিনি শুধু হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহ্বানে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, যখন মুশরিকরা উহুদ হতে প্রত্যাবর্তন করে তখন পথে তারা চিন্তা করতঃ পরস্পর বলাবলি করে, 'না তোমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করলে, না মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে ধরে ফেললে। দুঃখের বিষয় তোমরা কিছুই করনি। চল, ফিরে যাই।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাঁরা সব প্রস্তুত হয়ে যান এবং মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অবশেষে তারা হামরাউল আসাদ বা 'বী'রে আবি উয়াইনা' পর্যন্ত পৌঁছেন। মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং 'আচ্ছা, আগামী বছর দেখা যাবে' -এ কথা বলে তারা মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও মদীনায় ফিরে আসেন। এটাকেও একটি পৃথক যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। এ পবিত্র আয়াতে ওরই বর্ণনা রয়েছে। উহুদের যুদ্ধ ১৫ই শাওয়াল রোজ শনিবার সংঘটিত হয়েছিল। ১৬ই শাওয়াল রোজ রবিবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলেন, 'হে জনগণ! শত্রুদের অনুসন্ধানে চলুন এবং শুধুমাত্র তাঁরাই যাবেন যাঁরা গতকল্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এ আহ্বান শুনে হযরত জাবির (রাঃ) উপস্থিত হয়ে আরয করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গতকালের যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কেননা, আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বলেছিলে, 'বৎস! তোমার সাথে তোমার এ ছোট ছোট বোনেরা রয়েছে। তুমি বা আমি কেউই এদেরকে একাকী এখানে ছেড়ে দু'জনই যাওয়া পছন্দ করি না। একজন যাবে এবং একজন এখানে থাকবে। আমার দ্বারা এটা হতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তুমি যাবে আর আমি এখানে বসে থাকবো। এ জন্যেই আমার আনন্দ এই যে, তুমি তোমার বোনদের নিকট অবস্থান কর এবং আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে গমন করি।' এ কারণেই আমি ওখানেই ছিলাম

এবং আমার পিতা আপনার সাথে এসেছিলেন। এখন আমার আকাঙ্খা এই যে, আজ আপনি আমাকে আপনার সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, শত্রু যেন ভীত হয়ে পড়ে এবং তাদের পিছনে আসতে দেখে বুঝে নেয় যে, মুসলমানদেরও শক্তি কম নেই এবং তাদের সাথে মোকাবিলা করতে তারা অসমর্থ নয়। বানূ আব্দুশ্ শাহল গোত্রের একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, 'উহুদের যুদ্ধে আমরা দু' ভাই উপস্থিত ছিলাম। ভীষণভাবে আহত হয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহ্বানকারী যখন শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে ডাক দেন তখন আমরা দু' ভাই পরস্পর বলাবলি করিঃ 'বড়ই দুঃখের বিষয় যে, না আমাদের নিকট কোন সোয়ারী আছে যে ওর উপর সোয়ার হয়ে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সঙ্গে গমন করি, না জখমের কারণে শরীরে এতটুকু শক্তি আছে যে, তাঁর সাথে পদব্রজে চলি।

সুতরাং বড়ই আফসোস যে, এ যুদ্ধ আমাদের হাত থেকে ছুটে যাবে। আমাদের অসংখ্য গভীর জখম আজ আমাদেরকে গমন হতে বিরত রাখবে।' কিন্তু আবার আমরা সাহসে বুক বেঁধে নেই। আমার ভাইয়ের তুলনায় আমার জখম কিছু হালকা ছিল। যখন আমার ভাই সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়ে যেতো এবং তার পা উঠতো না তখন কোনও রকমে আমি তাকে উঠিয়ে নিতাম। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন নামিয়ে দিতাম। এভাবে অতি কষ্টে আমরা সৈন্যদের নিকট পৌঁছেই গেলাম'। (সীরাত-ই-ইবনে ইসহাক) সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত উরওয়া (রঃ)-কে বলেন, 'হে ভাগ্নে! তোমার দু' পিতা ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত সিদ্দীক (রাঃ)। উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং মুশরিকরা সামনে অগ্রসর হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারণা হয় যে, না জানি এরা পুনরায় ফিরে আসে। তাই, তিনি বলেনঃ 'তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে এরূপ কেউ আছে কি?' এ কথা শুনা মাত্রই সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং একজন ছিলেন হযরত যুবায়ের (রাঃ)। এ বর্ণনাটি আরও অনেক সনদে বহু কিতাবে রয়েছে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা

(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমার দু'জন পিতা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।' কিন্তু এটা মারফূ' রূপে বর্ণনা করা ভুল ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, এর ইসনাদগুলো বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের উল্টো। তাঁরা এ বর্ণনাটিকে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে মাওকুফরূপে এনেছেন। তাছাড়া এ জন্যেও যে, অর্থের দিক দিয়ে এর বিপরীত সাব্যস্ত আছে। হযরত যুবায়ের (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বাপ-দাদা কেউই হতেন না। সঠিক কথা এই যে, এ বর্ণনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ভাগ্নে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ)-এর ছেলে হযরত উরওয়া (রাঃ)-কে বলেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আবূ সুফইয়ানের অন্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন এবং যদিও তিনি উহুদের যুদ্ধে কিছুটা সফলকাম হয়েছিলেন, তথাপি মক্কার দিকে গমন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে বলেনঃ 'আবূ সুফইয়ান তোমাদের ক্ষতি করে চলে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করেছেন।' উহুদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল এবং ব্যবসায়ীগণ যীকা'দা মাসে মদীনায় এসেছিলো। প্রতি বছর তারা বদর-ই-সুগরায় তাদের শিবির স্থাপন করতো। এবারও তারা এ ঘটনার পরে এখানে আগমন করেন। মুসলমানগণ যুদ্ধে আহত হওয়ায় ক্ষত-বিক্ষত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তাঁরা নিজেদের কষ্টের কথা বর্ণনা করছিলেন এবং তাঁরা ভীষণ বিপদের মধ্যে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে এ কথার উপর উত্তেজিত করেন যে, তাঁরা যেন তাঁর সাথে গমন করেন। এ লোকগুলো এখন চলে যাবে এবং আবার হজ্বের সময় আসবে। সুতরাং আগামী বছর পর্যন্ত তাদের উপর এ ক্ষমতা চলবে না। কিন্তু শয়তান মুসলমানদেরকে ধমক দিতে এবং পথভ্রষ্ট করতে আরম্ভ করে। সে তাঁদেরকে বলে, 'তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে মুশরিকরা সৈন্য প্রস্তুত করে ফেলেছে।' এতে মুসলমানদের মন দমে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁদেরকে বলেনঃ 'তোমাদের একজনও না গেলেও আমি একাই যাবো।' অতঃপর উৎসাহ প্রদানের ফলে হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ), হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) প্রভৃতি সত্তর জন সাহাবী তাঁর সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। এ পবিত্র সেনাদল আবূ সুফইয়ানের

অনুসন্ধানে বদর-ই-সুগরা পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাঁদেরই মর্যাদা ও বীরত্বের বর্ণনা এ মুবারক আয়াতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সফরে মদীনা হতে আট মাইল দূরে 'হামরা-ই-আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান। মদীনায় তিনি হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। তথায় তিনি সোম, মঙ্গল ও বুধ এ তিন দিন অবস্থান করেন এবং তৎপর মদীনায় ফিরে আসেন। তথায় অবস্থানকালীন সময়ে খুযাআ' গোত্রের নেতা মা'বাদ খুযায়ী সেখান দিয়ে গমন করে। লোকটি নিজে মুশরিক ছিল। কিন্তু ঐ পুরো গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্ধি হয়েছিল। ঐ গোত্রের মুশরিক ও মুমিন নির্বিশেষে তাঁর মঙ্গলাকাঙ্খী ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলে, 'আপনার সঙ্গীদেরকে কষ্ট পৌঁছেছে বলে আমরা খুব দুঃখিত। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ও আপনার সহচরগণকে নিরাপদে রাখুন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হামরা-ই-আসাদে পৌঁছার পূর্বেই আবূ সুফইয়ান প্রস্থান করেছিলেন। যদিও তার ও তার সঙ্গীদের ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল যে, মুসলমানদেরকে হত্যা করে এবং আহত করে তাদের উপর বিজয় লাভের পরেও তাদের অবশিষ্টদেরকে হত্যা না করা ভুল হয়েছে। কাজেই ফিরে গিয়ে তাদের সকলকেই হত্যা করা উচিত। একথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, মা'বাদ খুযায়ীর তথায় আগমন ঘটেছিল। আবূ সুফইয়ান তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বল, সংবাদ কি?' সে বলে, 'রাসূলুল্লাহ স্বীয় সাহাবীবর্গসহ তোমাদের পিছনে আসছেন। তাঁরা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন। যাঁরা পূর্ব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তাঁরাও আসছেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং তাঁরা পূর্ণ শক্তির সাথে আক্রমণে উদ্যত হয়েছেন। আমি এরূপ সেনাবাহিনী পূর্বে কখনও দেখিনি।' একথা শুনে আবূ সুফইয়ানের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। তিনি মা'বাদ খুযায়ীকে বলেন, 'তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ভালই হলো। নতুবা আমরা তো স্বয়ং তাদের দিকে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।' মা'বাদ বলে, 'কখনও এরূপ ইচ্ছে করো না। আমার কথা কি? তোমরা এ স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই হয়তো স্বয়ং ইসলামী সেনাবাহিনীর অশ্বসমূহ দেখতে পাবে। আমি তাঁদের সেনাবাহিনী, তাঁদের বীরত্ব, ক্রোধ, প্রস্তুতি এবং দৃঢ় সংকল্পের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। আমি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলছি যে, তোমরা অতি তাড়াতাড়ি পলায়ন কর ও নিজেদের প্রাণ রক্ষা কর। আমি তাদের ভয়াবহ প্রস্তুতির কথা পূর্ণভাবে বর্ণনা করতে পারছি না। সংক্ষেপ কথা এই যে, প্রাণ বাঁচাতে হলে শীঘ্রই এখান হতে প্রস্থান কর।' আবূ সুফইয়ান ও তার সঙ্গীরা হতবুদ্ধি হয়ে মক্কার পথ ধরে।

আবদুল কায়েস গোত্রের লোক, যারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনা যাচ্ছিল, তাদেরকে আবূ সুফইয়ান বলেন, 'তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমাদের সম্বন্ধে এ সংবাদ দেবে যে, আমরা তাদেরকে হত্যা করার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করছি এবং আমরা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করে ফেলেছি। যদি তোমরা তাঁর নিকট এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও তবে আমরা তোমাদেরকে উকাযের বাজারে অনেক কিসমিস প্রদান করবো।' অতএব তারা হামরা-ই-আসাদে এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ ভয়াবহ সংবাদ শুনিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে উত্তর দেন, 'আমাদের জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যসম্পাদনকারী'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি তাদের জন্যে একটি পাথরের চিহ্ন ঠিক করে রেখেছি। যদি তারা ফিরে আসে তবে তথায় পৌঁছে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যেমন গতকালকের দিনটি ছিল।' কতগুলো লোক এও বলেছেন যে, এ আয়াত বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এটা হামরা-ই-আসাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর শত্রুরা মুসলমানদেরকে হতোদ্যম করার জন্যে শত্রুদের সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তাঁরা ধৈর্যের পর্বতরূপে সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তাঁদের আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন এবং হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এ কালেমাটি ঐ সময় পাঠ করেছিলেন যখন মানুষ তাঁকে কাফিরদের ভীরু ও কাপুরুষ সৈন্যদের হতে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। বড়ই বিস্ময়কর কথা এই যে, ইমাম হাকিম (রঃ) এ বর্ণনাটি আনয়নের পর বলেন, 'এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নেই।'

সহীহ বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মুখ দিয়ে যে শেষ কালেমাটি বের হয়েছিল তা ছিল এ কালেমাটিই। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কাফিরদের সৈন্যদের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে,

হযরত আলী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং পথে খুযাআ গোত্রের একজন লোক এ সংবাদ পরিবেশন করে তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন তোমাদের উপর কোন কাজ এসে পড়ে তখন তোমরা حَسْبُنَا اللّٰهُ শেষ পর্যন্ত পাঠ করে নাও।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু' ব্যক্তির মধ্যে ফায়সালা করেন। তখন যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়সালা হয় সে এ কালেমাটিই পাঠ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ডাকিয়ে নিয়ে বলেনঃ 'অপারগতা ও অলসতার উপর আল্লাহ তা'আলার তিরস্কার প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান কর। যখন কোন কঠিন কাজে পড়ে যাও তখন এটা পড়ে নাও।' মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'কিরূপে আমি নিশ্চিন্ত ও শান্তিতে থাকতে পারি? অথচ শিঙ্গাধারণকারী মুখে শিঙ্গা ধরে রয়েছেন এবং কপাল নীচু করে আল্লাহর নির্দেশের জন্যে অপেক্ষমান রয়েছেন যে, কখন আল্লাহর নির্দেশ হবে ও শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন।' সাহাবীগণ তখন বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি পড়বো?' তিনি বলেনঃ 'তোমরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا পাঠ করবে।' উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব (রাঃ) এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত যয়নাব (রাঃ) গর্ব করে বলেন, আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক দিয়েছেন এবং তোমার বিয়ে দিয়েছেন তোমার অভিভাবক ও উত্তরাধিকারীগণ।' হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার দোষহীনতা ও পবিত্রতার আয়াতগুলো আকাশ হতে স্বীয় পাক কালামে অবতীর্ণ করেন।' হযরত যয়নাব (রাঃ) ওটা স্বীকার করে নেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা বলতো, তুমি হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তালের সোয়ারীর উপর আরোহণের সময় কি পড়েছিলে?' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়েছিলাম।' একথা শুনে হযরত যয়নাব (রাঃ) বলেন, 'তুমি ঈমানদারদের কালেমাই পড়েছিলে।' এরূপে এ আয়াতেও আল্লাহ পাক বলেন—'ঐ নির্ভরশীলদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক। যারা অন্যায়ের ইচ্ছে পোষণ করতো তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন। মুসলমানেরা আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই স্বীয় শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং

কাফিরেরা স্বীয় ষড়যন্ত্রে অকৃতকার্য হয়। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা, তাঁরা সন্তুষ্টির কার্যই করেছে। আল্লাহ তা'আলা বড়ই গৌরবময়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে নিয়ামত ছিল এই যে, তারা নিরাপদে ছিল এবং ফযল ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বণিকদের এক যাত্রীদলের নিকট মাল ক্রয় করেন যাতে বহু লাভ হয় এবং ঐ লভ্যাংশ তিনি স্বীয় সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আবূ সুফইয়ান রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেন, 'এখন অঙ্গীকারের স্থান হচ্ছে বদর।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'সম্ভবতঃ তাই।' অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় পৌঁছেন। এ কাপুরুষের তথায় আগমন ঘটেনি। তথায় তখন বাজারের দিন ছিল। তিনি মাল ক্রয় করেন এবং লাভে বিক্রি করেন। ওরই নাম হচ্ছে বদর-ই-সুগরার যুদ্ধ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে ছিল শয়তান যে তার বন্ধুদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুমকি দিয়েছিল, তাদেরকে ভয় না করাই তোমাদের কর্তব্য। বরং একমাত্র আমার ভয়ই অন্তরে জাগিয়ে রাখ। কেননা, ঈমানদারীর শর্ত এই যে, যখন কেউ ভয় প্রদর্শন করবে বা ধমক দেবে এবং ধর্মীয় কার্যে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করবে তখন মুসলমান আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করবে, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই সাহায্যকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

অর্থাৎ 'আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট নন? এবং তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের হতে ভয় দেখাচ্ছে'। (৩৯ঃ ৩৬) শেষে বলেন–

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۔

অর্থাৎ 'তুমি বল– আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁর উপরই নির্ভরকারীগণ নির্ভর করে থাকে।' (৩৯ঃ ৩৮) অন্যস্থান রয়েছে–

فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۔

অর্থাৎ 'তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।' (৪ঃ ৭৬) আর এক জায়গায় আল্লাহপাক বলেন–

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ 'তারা শয়তানের সৈন্য, জেনে রেখো যে, শয়তানের সৈন্যরাই ক্ষতিগ্রস্ত'। (৫৮ঃ ১৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۔

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা লিখে দিয়েছেন– অবশ্যই আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয় লাভ করবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী, মহাপ্রতাপান্বিত।' (৫৮ঃ ২১) অন্য স্থানে রয়েছে–

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

অর্থাৎ 'যে আল্লাহকে সাহায্য করবে তিনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।' (২২ঃ ৪০) আর এক স্থানে বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।' (৪৭ঃ ৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন–

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ- يَوْمَ
لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ-

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি রাসূলগণকে ও মুমিগণকে ইহজগতেও সাহায্য করবো এবং সেদিনও সাহায্য করবো যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। যেদিন অত্যাচারীদের ওযর কোন উপকার দেবে না, তাদের জন্য অভিশাপ এবং তাদের জন্যে রয়েছে জঘন্য ঘর'। (৪০ঃ ৫১-৫২)

١٧٦- وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১৭৬। আর যারা অবিশ্বাস করে তৎপর তুমি তাদের জন্যে বিষণ্ন হয়ো না, বস্তুতঃ তারা আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না; আল্লাহ তাদের জন্যে পরকালের কোন অংশ ইচ্ছে করেন না এবং তাদেরই জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

١٧٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৭৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে, তারা আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না, এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٧٨- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوٓا اَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ
لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ
لِيَزْدَادُوٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

১৭৮। যারা অবিশ্বাস করেছে তারা যেন এটা ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের জীবনের জন্যে কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে তদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করিনি; এবং তাদের জন্যে অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

١٧٩- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ
الْمُؤْمِنِينَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ
عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ ص فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ
وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ
اَجْرٌ عَظِيمٌ ○

১৭৯। আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি পবিত্রতা হতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্যন্ত তারা যার উপরে আছে, তদবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে পরিত্যাগ করবেন; এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয় বিজ্ঞাপিত করবেন এবং আল্লাহ তদীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছে মনোনীত করে থাকেন; অতএব আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; এবং যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও সংযমী হও, তবে তোমাদের জন্যে মহান প্রতিদান রয়েছে।

١٨٠- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَبْخَلُونَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ

১৮০। আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় প্রতিদান হতে কিছু দান করেছেন তদ্বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা

شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١٨٠

তাদের জন্যে কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্যে ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে, উত্থানদিবসে ওটাই তাদের কণ্ঠনিগড় হবে; এবং আল্লাহ নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের স্বত্বাধিকারী, এবং যা তোমরা করছো আল্লাহ তদ্বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন বলে কাফিরদের পথভ্রষ্টতা তাঁর নিকট খুবই কঠিন ঠেকছিল। যেমন তারা কুফরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এজন্যই মহান আল্লাহ তাঁকে এটা হতে বিরত রাখছেন এবং বলছেন–'এরই মধ্যে আল্লাহ পাকের নিপুণতা রয়েছে। হে নবী (সঃ)! তাদের কুফরী তোমার বা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এসব লোক তাদের পরকালের অংশ ধ্বংস করতে রয়েছে এবং নিজেদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। সুতরাং তুমি তাদের জন্য দুঃখ করো না।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আমার নিকট এও নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে সেও আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে কাফিরদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছেন এ জন্য তাদের অহংকারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে– 'আমি যে কাফিরদের মাল-ধন ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিয়েছি এটা আমার পক্ষ হতে তাদের জন্য মঙ্গলের নিদর্শন এই কি তারা ধারণা করেছে? না, বরং তারা নির্বোধ ও অবুঝ।' অন্য জায়গায় রয়েছে–'আমাকে ও এ কথার অবিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে এমন আস্তে আস্তে ধরবো যে, তারা জানতেই পারবে না।' আর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে–'তাদের মাল ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে প্রতারিত না করে, আমি ওরই কারণে তাদরেকে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে চাই এবং তাদের মৃত্যু কুফরীর উপরেই হবে'।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'এটা মীমাংসিত ব্যাপার যে, কতগুলো পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও শত্রুকে যাচাই, বাছাই ও প্রকাশ

করে দিতে চান। ধৈর্যশীল মুমিন ও পাপী মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এর দ্বারা উহুদের যুদ্ধকেই বুঝানো হয়েছে। ঐদিন একদিকে মুমিনদের ধৈর্য, স্থিরতা, দৃঢ়তা, নির্ভরশীলতা ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে এবং অপরদিকে মুনাফিকদের অসহিষ্ণুতা, বিরুদ্ধাচরণ, অবিশ্বাস করণ এবং আত্মসাৎকরণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা জিহাদের হুকুম, হিজরতের হুকুম প্রভৃতি যেন এক একটা পরীক্ষা ছিল যা ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করেছে। হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, জনগণ বলেছিল, 'যদি মুহাম্মাদ (সঃ) সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে আমাদের মধ্যে কে সত্য মুমিন এবং কে মুমিন নয় তা বলে দিন তো?' তখন مَا كَانَ اللّٰهُ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–'তোমরা আল্লাহর অদৃশ্যকে জানতে পার না। তবে, তিনি এমন কারণ সৃষ্টি করে থাকেন যার ফলে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাঁকে চান এ জন্যে মনোনীত করে থাকেন'। যেমন এক জায়গায় রয়েছে–'আল্লাহ অদৃশ্য জানেন, অতঃপর তিনি কাউকেও সে অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন না, কিন্তু রাসূলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন (জ্ঞান দান করে থাকেন) তার সম্মুখে ও পিছনে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা চালিত করেন।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'তোমরা আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অর্থাৎ তাঁদের আনুগত্য স্বীকার কর, শরীয়তের অনুসারী হও এবং জেনে রেখো যে, ঈমান ও খোদাভীরুতার ব্যাপারে তোমাদের জন্যে বড় প্রতিদান রয়েছে।' এরপরে ইরশাদ হচ্ছে– 'কৃপণ ব্যক্তি যেন তার ধন-সম্পদকে তার জন্যে মঙ্গল মনে না করে, বরং ওটা তার জন্য চরম ক্ষতিকর। ধর্মের ব্যাপারে তো ক্ষতিকর বটেই, এমন কি কোন কোন সময় দুনিয়াতেও ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এর পরিণাম এই হয় যে, ঐ কৃপণের মাল কিয়ামতের দিন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে।' সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে ঐ মালের যাকাত আদায় করে না, তার মাল কিয়ামতের দিন টেকো মাথা বিশিষ্ট এবং চোখের উপর দু'টি চিহ্ন যুক্ত সর্প হয়ে গলাবন্ধের ন্যায় তার গলায় জড়িয়ে যাবে। অতঃপর তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার ধন ভাণ্ডার।' এরপর তিনি وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ-এ আয়াতটি পাঠ করেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি হাদীসে এও রয়েছে যে, লোকটি পালাতে থাকবে এবং সর্পটি তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকবে। অতঃপর তাকে ধরে নিয়ে গলাবন্ধের মত তার গলায় জড়িয়ে যাবে

এবং তাকে দংশন করবে। মুসনাদ-ই-আবু ইয়ালার মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি তার পিছনে ধন ভাণ্ডার ছেড়ে মারা যাবে, সেই ধন ভাণ্ডার একটি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত সর্পের আকারে– যার চক্ষু দ্বয়ের উপর দু'টি চিহ্ন থাকবে, তার পিছনে দৌড়াতে থাকবে। লোকটি পালাতে থাকবে এবং বলবে, 'তুমি কে?' সর্পটি বলবে, 'আমি তোমার সেই ধন ভাণ্ডার যা পিছনে ছেড়ে তুমি মারা গিয়েছিলে।' শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে নেবে এবং তার হাত চিবাতে থাকবে, অতঃপর অবশিষ্ট শরীরও চিবাতে থাকবে।' তাবরানীর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি তার মনিবের নিকট নিজের অভাবের কথা বলে এবং উদ্বৃত্ত মাল থাকা সত্ত্বেও মনিব তাকে কিছুই দেয় না, তার জন্যে কিয়ামতের দিন ক্রোধে ফোঁস ফোঁসকারী বিষাক্ত সাপকে ডেকে আনা হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যে অভাবী আত্মীয় তার ধনী আত্মীয়ের নিকট কিছু যাঞ্চা করে এবং সে কিছুই প্রদান করে না তারই এ শাস্তি হবে; ঐ সাপটি তার গলায় হার হয়ে যাবে'। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতে ঐ আহলে কিতাবের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা তাদের গ্রন্থের কথা পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতো কিন্তু প্রথমটিই সঠিক কথা।

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'আল্লাহই হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বধিকারী। তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা হতে তাঁর নামে কিছু খরচ কর। সমস্ত কিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা দান করতে থাক, যেন কিয়ামতের দিন তা কাজে লাগে এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের কথা এবং সমস্ত কাজের আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ খবর রাখেন।'

১৮১। অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন– যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনবান; তারা যা বলেছে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করা আমি লিপিবদ্ধ করবো; এবং তাদেরকে বলবো– তোমরা প্রদাহ কারী শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।

١٨١- لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

١٨٢- ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ

১৮২। এটা তাই– যা তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সেবকগণের প্রতি অত্যাচারী নন।

١٨٣- اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৮৩। যারা বলে থাকে, অবশ্য আল্লাহ আমাদের জন্যে অঙ্গীকার করেছেন যে, অগ্নি যা গ্রাস করে, আমাদের জন্যে এমন উৎসর্গ আনয়ন না করা পর্যন্ত আমরা যেন কোন নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি; তুমি বল– নিশ্চয়ই আমার পূর্বে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এবং তোমরা যা বল তৎসহ রাসূলগণ আগমন করেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে?

١٨٤- فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

১৮৪। অতঃপর যদি তারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল– যারা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন করেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন– 'আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিতে পারে এমন কে আছে? এবং তিনি তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ করে প্রদান করবেন'। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন ইয়াহূদীরা বলতে আরম্ভ করে, 'হে নবী (সঃ)! আপনার প্রভু দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং এ জন্যেই তিনি স্বীয় বান্দাদের নিকট কর্জ যাচ্ঞা করছেন।' তখন উপরের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা ইয়াহূদীদের বিদ্যালয়ে গমন করেন। ফানহাস নামক এখানকার একজন বড় শিক্ষক ছিল এবং তার অধীনে আশী' নামক একজন বড় আলেম ছিল। তথায় জন-সমাবেশ ছিল। তিনি তাদের ধর্মীয় আলোচনা শুনছিলেন। তিনি ফানহাসকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে ফানহাস! আল্লাহকে ভয় করতঃ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর সত্য রাসূল। তিনি আল্লাহ পাকের নিকট হতে সত্য আনয়ন করেছেন। তাঁর গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে বর্ণিত আছে যা তোমাদের হাতেই বিদ্যমান রয়েছে।' ফানহাস তখন উত্তরে বলে, 'হে আবূ বকর (রাঃ) শুনুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী নই। আমরা তাঁর নিকট ঐরূপ কাকুতি মিনতি করি না যেমন তিনি আমাদের নিকট কাকুতি মিনতি করে থাকেন। বরং আমরা তো তাঁর নিকট মোটেই মুখাপেক্ষী নই। কারণ, আমরা ধনবান। তিনি যদি ধনী হতেন তবে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেন না। যেমন আপনাদের নবী বলছেন। আল্লাহ তো আমাদেরকে সুদ হতে বিরত রাখতে চাচ্ছেন, অথচ নিজেই সুদ দিতে চাচ্ছেন। তিনি যদি ধনী হতেন তবে আমাদেরকে সুদ দিতে চাইবেন কেন?' এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফানহাসের মুখে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, 'যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি তোমাদের ইয়াহূদীদের সাথে আমাদের চুক্তি না থাকতো তবে আমি অবশ্যই তোমার মত আল্লাহদ্রোহীর মস্তক কেটে নিতাম।' ফানহাস সরাসরি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তাকে মেরেছো কেন?' হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন ঘটনাটি বর্ণনা করেন। ফানহাস চালাকি করে বলে, 'আমি তো এরূপ কথা মোটেই বলিনি।' সে সম্বন্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেন, তাদের এরূপ উক্তি এবং সাথে সাথে তাদের ঐরূপই বড় পাপ অর্থাৎ নবীদেরকে হত্যাকরণ আমি তাদের আমলনামায় লিখে নিয়েছি। এক দিকে তাদের মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহর শানে বেয়াদবী এবং অপর দিকে নবীগণকে হত্যা করার কারণে তাদেরকে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আমি তাদেরকে বলবো– 'এটা তোমাদের পূর্বের কৃতকর্মেরই প্রতিফল।' এ কথা বলে তাদেরকে শাস্তির উপর শাস্তি প্রদান করা হবে। এটা সরাসরি সুবিচারই বটে এবং এটাও স্পষ্ট কথা যে, মনিব কখনও স্বীয় দাসের উপর অত্যাচার করেন না। এরপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের ঐ ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন যে, তারা বলতো, 'যেসব আসমানী কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলোতে তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন,–আমরা যেন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করি যে পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে এ অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন না করবেন যে, তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন কিছু কুরবানী করবে, তার সেই কুরবানী খেয়ে নেয়ার জন্যে আকাশ হতে আল্লাহ-প্রেরিত আগুন এসে তা খেয়ে নেবে।' তাদের এই কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছে– 'তোমাদের চাহিদা মত অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী নবীগণ নিদর্শন ও প্রমাণাদি নিয়ে তো তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তথাপি তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে কেন? তাঁদেরকে তো আল্লাহ পাক ঐ মু'জিযাও দিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহীত কুরবানীকে আসমানী আগুন এসে খেয়ে নিত। কিন্তু তোমরা তাদেরকেও তো সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নাওনি। তোমরা তাঁদেরও বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করেছিলে, এমনকি তাদেরকে হত্যা করেও ফেলেছিলে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের কথারও কোন মর্যাদা দাও না। তোমরা সত্যের সাথীও নও এবং নবীকে সত্য বলে স্বীকার করতেও সম্মত নও। নিশ্চয়ই তোমরা চরম মিথ্যাবাদী'।

এরপর আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন–'হে নবী (সঃ)! তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে বলে তোমার মন ছোট করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী দৃঢ়চিত্ত নবীদের ঘটনাবলীকে সান্ত্বনাদায়ক হিসেবে গ্রহণ কর। তারাও স্পষ্ট দলীলসমূহ এনেছিল এবং ভালভাবে নিজেদের সত্যতা প্রকাশ করেছিল। তথাপি জনগণ তাদেরকে অবিশ্বাস করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি'। زُبُرٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঐসব আসমানী গ্রন্থ যেগুলো ক্ষুদ্র পুস্তিকারূপে নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। مُنِيْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকাশ্য, স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান।

١٨٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

১৮৫। সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছে ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

١٨٦- لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْٓا أَذًى كَثِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ○

১৮৬। অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন সমূহের দ্বারা পরিক্ষিত হবে; এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে, তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সংযমী হও, তবে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত।

সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টজীবকে জানানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক জীবই মরণশীল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ -

অর্থাৎ 'এ পৃথিবীর যত কিছু রয়েছে সবই ধ্বংসশীল। শুধু তোমার প্রভুর মুখমণ্ডলই চির বিদ্যমান থাকবে যিনি মহা সম্মানিত ও মহান দাতা।' (৫৫ঃ২৬-২৭) সুতরাং একমাত্র সেই এক আল্লাহই চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী। তিনি কখনও ধ্বংস হবেন না। দানব ও মানব প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে ফেরেশতামণ্ডলী ও আরশ বহনকারীগণও মরণশীল। শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহই চিরকাল বাকী থাকবেন। তাঁর কোন লয় ও ক্ষয় নেই। প্রথমেও তিনিই এবং শেষেও তিনিই থাকবেন। যখন সবাই মরে যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সময় শেষ হয়ে যাবে, হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ হতে যত সন্তান হবার ছিল হয়ে যাবে, অতঃপর সকলেই মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করবে এবং সমস্ত সৃষ্টজীব ধ্বংস হয়ে যাবে, সে সময় আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন তিনি সকলকেই তাদের ছোট বড় সমস্ত কার্যের প্রতিদান প্রদান করবেন। কারও উপর অণুপরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। এ কথাই পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমাদের নিকট এরূপ অনুভূত হয় যে, যেন কেউ আসছেন। পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে, কিন্তু কোন লোককে দেখা যায় না। তিনি এসে বলেনঃ 'হে নবী পরিবারের লোকগণ! আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক! প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী। কিয়ামতের পর আপনাদের সকলকেই সমস্ত কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে তাদের পুরস্কার মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করুন এবং তাঁরই নিকট মঙ্গলের আশা রাখুন। জেনে রাখুন যে, প্রকৃতপক্ষে বিপদগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি যে পুণ্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। আপনাদের উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে শান্তি, করুণা ও বরকত নাযিল হোক।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) হযরত আলী (রাঃ)-এর ধারণা মতে তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আঃ)। সারকথা এই যে, সফলকাম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করতঃ জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'জান্নাতের মধ্যে একটি চাবুক বরাবর জায়গা পেয়ে যাওয়া দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। তোমাদের ইচ্ছে পাঠ কর–

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অর্থাৎ 'যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছ ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলতঃ সেই সফলকাম হয়েছে'। এ পরবর্তী বেশীটুকু ছাড়া এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও

সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। আর বেশীটুকু সহ মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ও ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তি পাওয়ার ও জান্নাতে প্রবেশ করার যার ইচ্ছে রয়েছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখে এবং জনগণের সাথে সেই ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজের জন্যে পছন্দ করে।' এ হাদীসটি وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (৩ঃ ১০২) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদে এবং আকী ইবনে জাররাহের তাফসীরেও এই হাদীসটি রয়েছে। এরপর দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, দুনিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অর্থাৎ 'তোমরা ইহলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী।' (৭৮ঃ ১৬ -১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে—'তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনের উপকারের বস্তু ও সৌন্দর্য; উত্তম ও স্থায়ী তো ওটাই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে।' হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে অঙ্গুলী ডুবালে তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানির যে তুলনা পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রূপ'। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন, 'দুনিয়া প্রতারণার একটা বেড়া ছাড়া আর কি? যাকে ছেড়ে তোমাদেরকে বিদায় হতে হবে। যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তাঁর শপথ! এ তো অতিসত্বরই তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যাবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করতঃ আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে পড় এবং সাধ্যনুসারে পুণ্য অর্জন কর। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কাজ সাধিত হয় না।' অতঃপর মানুষের পরীক্ষার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ

অর্থাৎ 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করবো।' (২ঃ ১৫৫) ভাবার্থ এই যে, মুমিনের পরীক্ষা অবশ্যই হয়ে থাকে। কখনো জীবনের উপর, কখনো অর্থের উপর, কখনো পরিবারের উপর এবং কখনো অন্য কিছুর উপর, মুত্তকীর তারতম্য অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে

খুব বেশী ধর্মভীরু তার পরীক্ষা বেশী কঠিন হয়। আর যার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে তার পরীক্ষা হালকা হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)-কে সংবাদ দিচ্ছেন-'বদরের যুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক কথা শুনতে হবে।' তারপর তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন-'সে সময় তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়ার উপর এটা খুব কঠিন কাজই বটে'। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীবর্গ মুশরিক ও আহলে কিতাবের অপরাধ প্রায়ই ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্যধারণ করতেন ও আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশের উপর আমল করতেন। অবশেষে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের তাফসীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় গাধার উপর আরোহণ করতঃ হযরত উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে রোগাক্রান্ত হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-কে দেখবার জন্যে বানূ হারিস খাযরাজের গোত্রের মধ্যে গমন করেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথে একটি জনসমাবেশ দেখা যায়, যেখানে মুসলমান, ইয়াহূদী ও মুশরিক সবাই উপস্থিত ছিল। ওর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও ছিল। তখন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে কুফরীর রঙ্গেই রঞ্জিত ছিল। মুসলমানদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সোয়ারী হতে ধূলোবালি উড়তে থাকলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলেঃ 'ধূলা উড়াবেন না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিকটে পৌঁছেই গিয়েছিলেন। সোয়ারী হতে নেমে তিনি সালাম করেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদেরকে তিনি কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াতও শুনিয়ে দেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলে, 'শুনুন জনাব, আপনার এ পন্থা আমাদের নিকট মোটেই পছন্দনীয় নয়। আপনার কথা সত্যই বা হলো, কিন্তু তাই বলে এটা উচিত নয় যে, আপনি আপনার সমাবেশে এসে আমাদেরকে কষ্ট দেবেন। আপনার বাড়ীতে যে যাবে তাকেই আপনি শুনাবেন।' এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করবেন। আপনার কথা শুনবার তো আমাদের চাহিদা আছেই।' তাদের মধ্যে তখন হট্টগোলের সৃষ্টি হয়ে যায়। একে অপরকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবারও উপক্রম হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বুঝানোর ফলে অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত হয়

এবং সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনি স্বীয় সোয়ারীর উপর আরোহণ করে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং তথায় গিয়ে হযরত সা'দ (রাঃ)-কে বলেনঃ 'হে আবু হাব্বার! আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তো আজকে এরূপ এরূপ করেছে।' হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, 'এরূপ হতে দিন! ক্ষমা করুন! যে আল্লাহ আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! আপনার সঙ্গে তো তার চরম শত্রুতা রয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা. এখানকার মানুষ তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছিল এবং তার জন্যে নেতৃত্বের পাগড়ী তৈরীরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বীয় নবী করে পাঠিয়ে দেন। জনগণ আপনাকে নবী বলে স্বীকার করে নেয়। সুতরাং তার নেতৃত্ব চলে যায়। ফলে সে চরম দুঃখিত হয়। এ জন্যেই সে ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যা সে বলেছে বলেছেই। আপনি তার কথার উপর গুরুত্ব দেবেন না।' অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ক্ষমা করে দেন এবং এটা তাঁর অভ্যাসই ছিল। তার সাহাবীগণও ইয়াহূদী ও মুশরিকদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের উপর আমল করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রথম বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে কাফিরদের নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের এই অগ্রগতি দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ ও নিজেদেরকে বাহ্যতঃ মুসলমানরূপে পরিচিত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। সুতরাং এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক পন্থী যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে তাদের উপর অবশ্যই বিপদ-আপদ এসে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে এসব বিপদ-আপদ সহ্য করা, তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা মুমিনদের একান্ত কর্তব্য।

১৮৭। আর যখন আল্লাহ, যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই এটা লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবে না; কিন্তু তারা ওটা

١٨٧- وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ

ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ○

তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করলো, অতএব তারা যা ক্রয় করেছিলো তা নিকৃষ্টতর।

١٨٨- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

১৮৮। যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং যা করেনি তজ্জন্যে প্রশংসা প্রার্থী, এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করো না যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٨٩- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৮৯। আল্লাহরই জন্যে নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

এখানে আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থধারীদেরকে ধমক দিচ্ছেন যে, নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল তা হচ্ছে তারা শেষ নবী (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর বর্ণনা ও আগমন সংবাদ জনগণের মধ্যে প্রচার করবে, তাদেরকে তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে উত্তেজিত করবে। অতঃপর যখন তিনি আগমন করবেন তখন তারা খাঁটি অন্তরের সাথে তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা ঐ অঙ্গীকারকে গোপন করছে এবং এটা প্রকাশ করলে দুনিয়া ও আখেরাতের যে মঙ্গলের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছিল ওর বিনিময়ে সামান্য পুঁজির উপর জড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের এ ক্রয়-বিক্রয় জঘন্য হতে জঘন্যতর। এতে আলেমদের জন্যও সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ওদের মত না হন এবং সত্য জিনিস গোপন না করেন। নচেৎ তাদেরকেও ঐ শাস্তি ভোগ করতে হবে যে শাস্তি ঐ কিতাবীদেরকে ভোগ করতে হয়েছিল এবং তাঁদেরকেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়তে হবে যেমন ঐ কিতাবীদেরকে

পড়তে হয়েছিল। সুতরাং উলামা-ই-কিরামের উপর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যে উপকারী ধর্মীয় শিক্ষা তাঁদের মধ্যে রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সৎকার্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তা যেন তাঁরা ছড়িয়ে দেন এবং কোন কথা গোপন না করেন। হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তিকে কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' দ্বিতীয় আয়াতে রিয়াকারদেরকে নিন্দে করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করে অধিক যাঞ্চা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও কম দেবেন।' সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যাকে প্রদান করা হয়নি তার সাথে পরিতৃপ্তির সংবাদদাতা দু'জন মিথ্যা কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়।' মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একদা মারওয়ান স্বীয় দারোয়ান রাফে'কে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন কর এবং তাঁকে বল, 'স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের উপর প্রশংসা প্রার্থীকে যদি আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদান করেন তবে আমাদের মধ্যে কেউ মুক্তি পেতে পারে না।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ওর উত্তরে বলেন, 'এ আয়াতের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? এটা তো কিতাবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' অতঃপর তিনি وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ হতে এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কোন জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন তারা ওর একটি ভুল উত্তর দিয়েছিল এবং বাইরে এসে ধারণা করে যে, তারা নবী (সঃ)-এর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আর সাথে সাথে তাদের এ বাসনাও হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের প্রশংসা করবেন এবং তারা যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন রেখেছিল এতেও তারা সন্তুষ্ট ছিল। উল্লিখিত আয়াতে এর-ই বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী প্রভৃতির মধ্যেও রয়েছে। সহীহ বুখারীর মধ্যে এও রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকতো, সঙ্গে যেতো না। অতঃপর তারা যুদ্ধ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করতো। তারপর যখন আল্লাহর রাসূল (সঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসতেন তখন তারা সত্য-মিথ্যা ওযর পেশ করতো এবং শপথ করে করে নবী (সঃ)-এর নিকট তাদের ওযরের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইতো। আর তারা এ বাসনা রাখতো যে, তারা যে কাজ করেনি তার জন্যেও যেন তাদের প্রশংসা করা হয়। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, মারওয়ান হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) -কে এ আয়াত সম্বন্ধে ঐ রকমই প্রশ্ন করেছিলেন যেমন প্রশ্ন তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে করেছিলেন। তখন হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) আয়াতটির শানাই-নযূল ঐ মুনাফিকদেরকেই সাব্যস্ত করে ছিলেন যারা যুদ্ধের সময় বাড়ীতে বসে থাকতো অতঃপর মুসলমানগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা আনন্দ অনুভব করতো। আর তারা জয়যুক্ত হলে ঐ কপটেরা মিথ্যা ওযর পেশ করতো এবং মুসলমানদের বিজয় লাভের জন্যে বাহ্যতঃ উল্লাস প্রকাশ করতো। তখন মারওয়ান বলেন, 'কোথায় এ ঘটনা আর কোথায় এ আয়াত?' আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, "হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতও (রাঃ) এটা অবগত আছেন।" মারওয়ান হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনিও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তরপর হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, 'এটা হযরত রাফে' ইবনে খুদায়েজও (রাঃ) জানেন, তিনি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভয় করেন যে, যদি তিনি তা প্রকাশ করেন তবে আপনি তার সাদকার উটগুলো ছিনিয়ে নেবেন। বাইরে এসে হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ)-কে বলেনঃ "আমার সাক্ষ্য দানের উপর আপনি আমার প্রশংসা করলেন না কেন?" হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, "সত্য সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।" হযরত যায়েদ (রাঃ) তখন বলেনঃ "সত্য সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে তো আমি প্রশংসার দাবীদার।" ঐ যুগে এ মারওয়ান মদীনার আমীর ছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মারওয়ান সর্বপ্রথম হযরত রাফে' ইবনে খুদায়েজকেই (রাঃ) এ প্রশ্ন করেছিলেন। এর পূর্ববর্তী বর্ণনায় এটা বর্ণিত হয়েছে যে, মারওয়ান এ আয়াত সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাহলে স্মরণ রাখতে হবে এ দুয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নেই। এ আয়াতটি সাধারণ। এর মধ্যে ওটা ও এটা দু'টোই জড়িত রয়েছে। হযরত সাবিত ইবনে কায়েস আনসারী (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! স্বীয় বংশের উপর আমার বড় আশংকা রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কেন?" তিনি উত্তরে বলেন, "একটি কারণ তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা না করা কার্যের উপর প্রশংসাপ্রার্থী হতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমার অবস্থা এই যে, আমি ঐ রূপ কার্যের উপর প্রশংসা পছন্দ করি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা অহংকার করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি আমার সৌন্দর্যকে পছন্দ করি। তৃতীয় কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বরের উপর স্বর উঁচু করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ আমার স্বর খুব উচ্চ।" তখন

রাসূলুল্লাহ বলেনঃ "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার জীবন উত্তম ও মঙ্গলময় হোক, তোমার মৃত্যু শাহাদাতের মৃত্যু হোক এবং তুমি জান্নাতবাসী হয়ে যাও?" তিনি খুশী হয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! খুশী হবো না কেন? এটা তো খুব ভাল কথা।" শেষে তাই হয়েছিল। তিনি প্রশংসাময় জীবন লাভ করেছিলেন। আর তিনি পেয়েছিলেন শহীদের মৃত্যু। মুসাইলামা কায্যাবের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। تَحْسَبَنَّهُمْ শব্দটিকে يَحْسَبَنَّهُمْ ও পড়া হয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন-(হে নবী সঃ!) তাদেরকে তুমি শাস্তি হতে বিমুক্ত মনে করো না। তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে এবং সে শাস্তিও হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপরে ইরশাদ হচ্ছে-তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই অধিপতি এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নন। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করো না। তাঁর ক্রোধ হতে বাঁচবার চেষ্টা কর। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তাঁর চেয়ে বড় কেউই নেই এবং তার চেয়ে বেশী ক্ষমতাও কারও নেই।

১৯০। নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবস ও যামিনীর পরিবর্তনে জ্ঞানবাদের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

١٩٠- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

১৯১। যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িতভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেননি আপনিই পবিত্রতম অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন!

١٩١- الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্য আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করেন, ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং অত্যাচারীদের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নেই।

١٩٢- رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

১৯৩। হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি; হে আমাদের প্রভু! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত করুন এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।

١٩٣- رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۚ○

১৯৪। হে আমাদের প্রভু! আপনি স্বীয় রাসূলগণ যোগে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না; নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না।

١٩٤- رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

তাবরানীর মধ্যে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরায়েশরা ইয়াহূদীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'হযরত মূসা (আঃ) তোমাদের নিকট কি কি মুজিযা নিয়ে এসেছিলেন?' তারা বলেন, সর্পে পরিণত

হয়ে যাওয়া লাঠি এবং দীপ্তিময় হস্ত। তার পরে তারা খ্রীষ্টানদের নিকট গমন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদের নিকট কি কি নিদর্শন এনেছিলেন? তারা উত্তরে বলে, 'জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেত কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দেয়া এবং মৃতকে জীবিত করা।' তখন কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য 'সাফা' পাহাড়কে সোনা করে দেন।' নবী (সঃ) তখন প্রার্থনা করেন। সে সময় اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী দেখতে চায় তাদের জন্যে এগুলোর মধ্যেই বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। তারা এগুলোর মধ্যে চিন্তা গবেষণা করলেই সেই ক্ষমতাবান আল্লাহর সামনে তাদের মস্তক নুয়ে পড়বে। কিন্তু এ বর্ণনায় জটিলতা এই রয়েছে যে, এ প্রশ্ন হয়েছিল মক্কা শরীফে, আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মদীনা শরীফে। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত সৃষ্টবস্তু, ভূমণ্ডলের মত নিম্ন, শক্ত ও লম্বা চওড়া সৃষ্টবস্তু, তারপরে আকাশের বড় বড় নিদর্শনাবলী, যেমন গতিশীল ও একই জায়গায় স্থিতিশীল তারকারাজি, ভূপৃষ্ঠের বড় বড় সৃষ্টি যেমন পাহাড়, জঙ্গল, বৃক্ষ ঘাস, ক্ষেত্র, ফল এবং বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু, খনিজ দ্রব্য, পৃথক পৃথক স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফলসমূহ ইত্যাদি, মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার এসব নিদর্শন কি বিবেক সম্পন্ন মানুষকে তাঁর পরিচয় প্রদান করতঃ তাঁর পথে চালিত করতে পারে না? আরও নিদর্শন অবলোকন করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে কি? অতঃপর দিন-রাত্রির গমনাগমন এবং ঐ গুলোর হ্রাস-বৃদ্ধি তারপরে সমান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এসব কিছু সেই মহান পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন। এ জন্যেই এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে–'এগুলোর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে, যাদের আত্মা পবিত্র এবং যারা প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত। তারা নিরেটদের মত অন্ধ ও বধির নয়'। যেমন অন্য জায়গায় ঐ নিরেটদের অবস্থার বর্ণনা হয়েছে –'তারা আকাশ ও পৃথিবীর বহু নিদর্শন পদদলিত করে চলে যায় এবং কোন চিন্তা গবেষণা করে না। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আল্লাহকে মান্য করা সত্ত্বেও অংশীস্থাপন হতে বাঁচতে পারে না।'

এখন ঐ জ্ঞানবানদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা উঠতে, বসতে, শুইতে সর্বাবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-কে

বলেনঃ 'দাঁড়িয়ে নামায পড়। ক্ষমতা না হলে বসে পড়। এতেও অক্ষম হলে শুয়ে পড়।' অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন থেকো না। অন্তরে ও মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। এ লোকগুলো আকাশ ও যমীনের উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং ঐগুলোর নিপুণতার বিষয়ে চিন্তা করে, যেগুলো সেই এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা, নিপুণতা, স্বেচ্ছারিতা ও করুণার পরিচয় দিয়ে থাকে। হযরত শায়েখ সুলাইমান দারানী বলেনঃ 'বাড়ী হতে বেরিয়ে যে যে জিনিসের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হয়, আমি দেখি যে, ওর মধ্যে আল্লাহর একটি নিয়ামত আমার জন্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং আমার জন্যে ওতে শিক্ষা রয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এক ঘন্টাকাল চিন্তা ও গবেষণা করা সারারাত্রি দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হতে উত্তম। হযরত ফাযীল (রঃ) বলেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি এই যে, চিন্তা, গবেষণা ও ধ্যান এমন একটি দর্পণ যা তোমার সামনে তোমার ভালমন্দ পেশ করে দেবে। হযরত সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ) বলেন, 'চিন্তা ও গবেষণা এমন একটি আলোক যা তোমার অন্তরের উপর স্বীয় প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করবে।' প্রায়ই তিনি নিম্নের পংক্তিটি পাঠ করতেন—

إِذَا الْمَـــرْءُ كَـــانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ * فَـــفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِـــبْــرَةٌ

অর্থাৎ 'যখন মানুষের চিন্তা ও ধ্যানের অভ্যাস হয়ে যায় তখন প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যমান থাকে।' হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ 'ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যার কথা বলার মধ্যে আল্লাহর যিকি্র ও উপদেশাবলী প্রকাশ পায়, নীরবতার মধ্যে চিন্তা ও ধ্যান প্রকাশিত হয় এবং দর্শনের মধ্যে শিক্ষা ও সতর্কতা বিরাজ করে।' লোকমান হাকীমের জ্ঞানপূর্ণ উক্তিটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ 'নির্জনবাস যার যত বেশী হয় তার চিন্তা, ধ্যান পরিণামদর্শিতাও তত বেশী হয়। যে পরিমাণ এটা বেশী হয় ঐ পরিমাণ সেই রাস্তা মানুষের উপর খুলে যায় যা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।' হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর ধ্যান যত বেশী হবে, বোধশক্তি তত প্রখর হবে, আর বোধশক্তি যত প্রখর হবে, জ্ঞান লাভ তত বেশী হবে এবং জ্ঞান যত বেশী হবে সৎকার্যাবলীও তত বৃদ্ধি পাবে।' হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) বলেতন, 'মহান সম্মানিত আল্লাহর স্মরণে রসনা চালনা করা অতি উত্তম কাজ এবং তাঁর নিয়ামতের উপর চিন্তা ও গবেষণা করা উত্তম ইবাদত।' হযরত মুগীস আসওয়াদ (রঃ) সভাস্থলে বসে বলতেন, 'হে

জনমণ্ডলী! প্রত্যহ গোরস্থানে গমন কর, তাহলে পরিণাম সম্বন্ধে তোমাদের একটা ধারণা পয়দা হবে। অতঃপর স্বীয় অন্তরে ঐ দৃশ্য হাযির কর যে, তোমরা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছো। এরপর একটি লোককে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং অপর একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করছে স্বীয় অন্তরকে ঐ অবস্থায় টেনে আন এবং স্বীয় দেহকেও তথায় বিদ্যমান মনে কর। জান্নাতকে তোমাদের সামনে হাযির দেখ। ওর হাতুড়ী এবং অগ্নির জেলখানাকে চক্ষুর সম্মুখে নিয়ে এসো! এ পর্যন্ত বলেই চীৎকার করে কেঁদে উঠেন এবং শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যান। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) বলেন, একটি লোক একটি গোরস্থানে ও আবর্জনা ফেলার জায়গায় একজন দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁকে বলে, 'হে দরবেশ! আপনার সামনে এখন দু'টি ভাণ্ডার রয়েছে। একটি হচ্ছে লোকদের ভাণ্ডার অর্থাৎ গোরস্থান এবং অপরটি হচ্ছে ধন ভাণ্ডার অর্থাৎ আবর্জনা, পায়খানা ও প্রস্রাব নিক্ষেপ করার জায়গা।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার পার্শ্বে গমন করতেন এবং কোন ভাঙ্গাচুরা দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বলতেন, 'হে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর! তোমার অবিশ্বাসী কোথায় রয়েছে?' অতঃপর নিজে নিজেই বলতেন– 'সবাই মাটির নীচে চলে গেছে। সকলেই ধ্বংসের পেয়ালা পান করেছে। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সত্য সত্তা চির-বিদ্যমান থাকবে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আন্তরিকতার সাথে দু' রাকআত নামায পড়া ঐ সমুদয় নামায হতে উত্তম যেগুলোতে সারা রাত্রি কাটিয়ে দেয়া হয়েছিল কিন্তু আন্তরিকতা ছিল না।' খাজা হাসান বসরী (রঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমার পেটের এক তৃতীয়াংশে ভোজন কর এক তৃতীয়াংশে পানি পান কর এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ঐ শ্বাসের জন্যে রেখে দাও যার মধ্যে তুমি পরকালের কথার উপর, নিজ পরিণামের উপর এবং স্বীয় কার্যাবলীর উপর চিন্তা ও গবেষণা করতে পার। কোন বিজ্ঞ লোকের উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জিনিসসমূহের উপর শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঐ উদাসীনতা অনুপাতে তার অন্তরের চক্ষু দুর্বল হয়ে পড়ে। হযরত বাশীর ইবনে হারিস হাঈ (রঃ) বলেন, 'মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা করতো তবে কখনও তাদের দ্বারা অবাধ্যতা হতো না।' হযরত আমির ইবনে আবদ কায়েস (রঃ) বলেনঃ 'আমি বহু সাহাবীর নিকট শুনেছি যে, ঈমানের কিরণ হচ্ছে চিন্তা, গবেষণা এবং আল্লাহর ধ্যান।' হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) বলেনঃ

"হে আদম সন্তান! হে দুর্বল মানুষ! তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর, পৃথিবীতে বিনয় ও দারিদ্রের সাথে অবস্থান কর, মসজিদকে স্বীয় ঘর বানিয়ে নাও, নিজেদের চক্ষুগুলোকে ক্রন্দন শিখিয়ে দাও, দেহকে ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত কর, হৃদয়কে চিন্তা ও গবেষণাকারী বানিয়ে দাও এবং আগামীকালের রুযীর জন্যে আজকে চিন্তা করো না।"

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) একদা সভাস্থলে বসে ক্রন্দন করছিলেন। জনগণ কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমি দুনিয়া ও ওর উপভোগ এবং প্রবৃত্তির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেছি এবং তা হতে উপদেশ গ্রহণ করেছি। পরিণামে পৌঁছে আমার আশা ও আকাঙ্খা সব শেষ হয়ে গেছে।' প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই ওতে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। হযরত হাসান ইবনে আবদুর রহমানও (রঃ) স্বীয় কবিতায় এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা সৃষ্ট ও বিশ্বজগত হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে এবং তিনি ঐ লোকদেরকে নিন্দে করছেন যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করে না। মুমিনদের প্রশংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা উঠতে বসতে এবং শুইতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করে থাকে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করতঃ বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি এগুলোকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং সত্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং পুণ্যবানদেরকে তাদের পুণ্যের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার বর্ণনা করতঃ বলে, 'হে আল্লাহ! কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি হতে আপনি পবিত্র। হে সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং হে সারা বিশ্বের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী! হে দোষত্রুটি হতে মুক্ত সত্তা! আমাদেরকে স্বীয় ক্ষমতা বলে এমন কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন যার ফলে আমরা আপনার কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারি এবং আমাদেরকে এমন দানে ভূষিত করুন যার ফলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে পারি।' তারা আরও বলে, 'হে আমাদের প্রভু! যাকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তাকে তো আপনি ধ্বংস করে দেবেন, সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাদেরকে না কেউ ছাড়িয়ে নিতে পারবে, না কেউ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, না আপনার ইচ্ছেকে টলাতে পারবে। হে আমাদের প্রভু! আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান

শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে ডেকেছেন।' এ আহ্বানকারী দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি মানবমণ্ডলীকে বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' তাঁর কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং অনুগত হয়েছি। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্যের কারণে আমাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করে দিন এবং আমাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত করতঃ আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দান করুন। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন।' ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, 'আপনি আপনার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা আমরা পুরো করেছি। সুতরাং আমাদেরকে তার প্রতিদান দান করুন।' কিন্তু পূর্ব ভাবার্থটি বেশী স্পষ্ট। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আসকালান' হচ্ছে দুই 'আরূসের' মধ্যে একটি। এখান হতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার লোককে দাঁড় করাবেন যাঁদের হিসাব-নিকাশ কিছুই নেই। এখান হতেই পঞ্চাশ হাজার শহীদ উঠবেন এবং প্রতিনিধি হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করবেন। এখানে শহীদদের সারি হবে, যাদের কর্তিত মস্তক তাঁদের হাতে থাকবে।

তাঁদের স্কন্ধের শিরা হতে রক্ত বইতে থাকবে। তাঁরা বলবেন, 'হে আমাদের প্রভু! আপনার রাসূলগণ যোগে আপনি আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না। আপনি কখনও অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন– 'আমার বান্দাগণ সত্য বলছে। তাদেরকে 'নাহারে বায়যায়' গোসল করিয়ে দাও। তাঁরা তথায় গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে বের হবে। সমস্ত জান্নাতেই তাঁদের প্রবেশাধিকার থাকবে। যেখানে মনে করে সেখানেই তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন। যা চাইবেন তাই খাবেন।' এ হাদীসটি গারীব। কেউ কেউ তো একে মাওযূ' বলেছেন। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানবের সমাবেশে আমাদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করবেন না। আপনার অঙ্গীকার সত্য। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে যে সংবাদ আমাদেরকে দিয়েছেন তা সবই অটল। কিয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে। কাজেই হে আমাদের প্রভু! সেদিন আমাদেরকে লজ্জা ও অপমান হতে রক্ষা করুন। রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'বান্দার উপর লজ্জা, অপমান-শাসন-গর্জন এতো বেশী বর্ষিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে এমনভাবে অপদস্থ করা হবে যে, তারা কামনা করবে

'যদি আমাদেরকে জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হতো!' (আবূ ইয়ালা) এ হাদীসটির সনদও গারীব। হাদীসসমূহ দ্বারা এও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রে যখন তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে গাত্রোত্থান করতেন তখন তিনি সূরাঃ আলে ইমরানের এ শেষ দশটি আয়াত পাঠ করতেন যেমন সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমি একদা আমার খালা হযরত মাইমুনা (রাঃ)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করি। হযরত মাইমুনা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ঘরে এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলেন। শেষ এক তৃতীয়াংশ রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে তিনি উঠে পড়েন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করতঃ অযু করেন এবং এগারো রাকআত নামায আদায় করেন। হযরত বিলাল (রাঃ)-এর ফজরের আযান শুনে ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়েন। অতঃপর মসজিদে গমন করতঃ জনগণকে ফজরের নামায পড়িয়ে দেন।' সহীহ বুখারীর মধ্যে এ বর্ণনাটি অন্য জায়গাতেও রয়েছে। তাঁতে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিছানার উপর আমি শয়ন করি এবং দৈর্ঘ্যের উপর শয়ন করেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সহধর্মিণী হযরত মাইমুনা (রাঃ)। অর্ধেক রাত্রির কাছাকাছি, পূর্বে বা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে উঠেন এবং স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা স্বীয় চক্ষু মলতে মলতে উল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করেন। অতঃপর লটকানো মশক হতে পানি নিয়ে ভালভাবে পূর্ণ অযু করেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আমিও ঐরকমই সবকিছু করে তাঁর বাম দিকে তাঁর অনুসরণে দাঁড়িয়ে যাই। রাসূলল্লাহ (সঃ) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত আমার মাথায় রেখে আমার কান ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে করে নেন। অতঃপর দু'রাকআত করে করে ছয় বার অর্থাৎ বার রাকআত নামায পড়েন এবং তার পরে বেত্র পড়ে শুয়ে পড়েন। অতঃপর মুআযযিন এসে নামাযের জন্যে ডাক দেন। তিনি উঠে হালকা করে দু'রাকআত নামায পড়েন এবং বাইরে এসে ফজরের নামায পড়িয়ে দেন।' ইবনে মিরদুওয়াই-এর হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমাকে আমার পিতা হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তুমি আজকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিবারের মধ্যে রাত্রি যাপন কর এবং তাঁর রাত্রির নামাযের অবস্থা পরিদর্শন কর।' রাত্রে যখন সমস্ত লোক ইশার নামায পড়ে চলে যায়, আমি তখন বসে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাবার সময় আমাকে

দেখে বলেন, 'কে, আবদুল্লাহ?' আমি বলি জ্বি, হ্যাঁ! তিনি বলেনঃ 'এখানে রয়ে গেছ কেন?' আমি বলি, আব্বার নির্দেশ যে আমি যেন আপনার ঘরে রাত্রি যাপন করি। তিনি বলেনঃ 'বেশ ভাল কথা, এসো।' ঘরে এসে তিনি বলেনঃ 'বিছানা বিছিয়ে দাও।' চটের বালিশ আছে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর উপরে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। অবশেষে আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাই। অতঃপর তিনি জেগে উঠেন এবং আকাশের দিকে চেয়ে তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ পাঠ করতঃ সূরাঃ আলে ইমরানের শেষের এ আয়াতগুলো পাঠ করেন।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াতগুলো পাঠের পর তিনি নিম্নলিখিতে দু'আ পাঠ করেনঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَّمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوْرًا وَّمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তর আলোকিত করুন, আমার কর্ণে আলো সৃষ্টি করুন, আমার চক্ষে আলো পয়দা করুন, আমার দক্ষিণ দিক আলোকিত করুন, আমার বাম দিক আলোকিত করুন, আমার সামনের দিক আলোকিত করুন, আমার পিছনের দিক আলোকিত করুন, আমার উপরের দিক আলোকিত করুন, আমার নীচের দিক আলোকিত করুন এবং কিয়ামতের দিন আমার জন্যে আলোকরশ্মি বড় করে দিন।' (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) এ দু'আটি কতক সঠিক পন্থাতেও বর্ণিত আছে। এ আয়াতের তাফসীরের প্রারম্ভে তাবরানীর উদ্ধৃতি দিয়ে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে তো জানা যায় যে, এটি মাক্কী আয়াত। কিন্তু প্রসিদ্ধি এর উল্টো। অর্থাৎ এটি মাদানী আয়াত। এর দলীলরূপে তাফসীর-ই- ইবনে মিরদুওয়াই-এর নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যেতে পারে: 'হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নিকট হযরত আতা' (রঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) আগমন করেন। তাঁর ও তাঁদের মধ্যে পর্দা ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'উবায়েদ! তুমি আসনা কেন?' হযরত উবায়েদ (রঃ) উত্তরে বলেন, 'আম্মাজান! শুধুমাত্র কোন একজন কবির! زُرْغِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ কম কর তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে' এ উক্তির কারণে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'এসব কথা ছেড়ে দিন। আম্মাজান! আপনার নিকট আমাদের আগমনের কারণ

এই যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন কাজটি আপনার নিকট বেশী বিস্ময়কর মনে হয়েছিল?' হযরত আয়েশা (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'তাঁর সমস্ত কাজই অদ্ভুত ছিল। আচ্ছা, একটি ঘটনা শুন। একদা রাত্রে আমার পালায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ 'হে আয়েশা! আমি আমার প্রভুর কিছু ইবাদত করতে চাই। সুতরাং আমাকে যেতে দাও'। আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য কামনা করি এবং এও কামনা করি যে, আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদত করেন।' তিনি উঠে পড়েন এবং একটি মশক হতে পানি নিয়ে হালকা অযু করেন। এরপর নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। তারপরে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং এত কাঁদেন যে, তাঁর শ্মশ্রু মুবারক সিক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি ভিজে যায়। তার পরে তিনি কাত হয়ে শুয়ে পড়েন এবং কাঁদতেই থাকেন। অবশেষে হযরত বিলাল (রাঃ) এসে নামাযের জন্যে আহ্বান করেন এবং তাঁর নয়নে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর সত্য রাসূল (সঃ)! আপনি কাঁদছেন কেন?' আল্লাহ পাক তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন।' তিনি বলেনঃ 'হে বিলাল! আমি কাঁদবো না কেন? আজ রাত্রে আমার উপর إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।' অতঃপর তিনি বলেন : 'ঐ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে এটা পাঠ করে অথচ ঐ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে না।' আবদ ইবনে হুমায়েদ (রঃ)-এর তাফসীরেও এ হাদীসটি রয়েছে। ওতে এও রয়েছে– 'আমরা যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করি তখন আমরা তাঁকে সালাম জানাই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কে?' আমরা আমাদের নাম বলি। শেষে এও রয়েছে–নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ডান কটে গণ্ডদেশের নীচে হাত রেখে শয়ন করেন এবং কাঁদতে থাকেন, এমনকি অশ্রুতে মাটি ভিজে যায়। হযরত বিলাল (রাঃ)-এর কথার উত্তরে তিনি এও বলেনঃ 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না'? আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার ব্যাপারে عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত তিনি পাঠ করেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর একটি দুর্বল সনদবিশিষ্ট হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরাঃ আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত প্রত্যহ রাত্রে পাঠ করতেন। ঐ বর্ণনায় মুযাহির ইবনে আসলাম নামক বর্ণনাকারী দুর্বল।

১৯৫। অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের জন্যে ওটা স্বীকার করলেন যে, আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীর কৃতকার্য ব্যর্থ করবো না–তোমরা পরস্পর এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ করেছে ও স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে ও আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত হয়েছে– নিশ্চয়ই তাদের জন্যে আমি তাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত করবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে ঢুকাবো– যার নিম্নে স্রোতস্বীনীসমূহ প্রবাহিতা; এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রতিদান এবং আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

١٩٥- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

এখানে শব্দটি اِسْتَجَابَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আরবী ভাষায় এটা সমানভাবে প্রচলিত হয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'কুরআন শরীফের মধ্যে কোনও জায়গায় আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীলোকদের হিজরতের কথা বলেননি এর কারণ কি?' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আনসারগণ বলেন, 'সর্বপ্রথম যে স্ত্রীলোকটি হাওদায় চড়ে আমাদের নিকট হিজরত করে এসেছিলেন তিনি হযরত উম্মে সালমাই (রাঃ) ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়। আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানবান ও ঈমানদারগণ যখন পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বর্ণিত প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার

নিকট পেশ করেন তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করেন। এজন্যে আয়াতটিকে ف অক্ষর দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ـ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ـ

অর্থাৎ '(হে নবী সঃ!) আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন (তাদেরকে বলে দাও) আমি নিকটেই আছি, যখন কোন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে তখন অবশ্যই তার আহ্বানে আমি সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তাদেরও উচিত যে, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে।' (২ঃ ১৮৬) অতঃপর প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার তাফসীর বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক সংবাদ দিচ্ছেন–'আমি কোন কর্মীর কৃতকর্ম বিনষ্ট করি না। বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীই হোক। পুণ্য ও কার্যের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট সবাই সমান। সুতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে আগমন করে, কাফিরদের দেশ হতে হিজরত করে। আল্লাহর নামে ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করে না; তারা জনগণের কোন ক্ষতি করেনি, যার ফলে তারা তাদেরকে ধমকাচ্ছে বরং তাদের দোষ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেয়া হয়েছে'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

অর্থাৎ 'তারা রাসূল (সঃ)-কে এবং তোমাদেরকেও এ কারণেই দেশ হতে বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছো।' (৬০ ঃ ১) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

অর্থাৎ 'তারা তাদের সাথে শত্রুতা শুধু এ কারণেই করেছে যে, তারা প্রবল প্রতাপান্বিত ও প্রশংসিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।' (৮৫ঃ ৮)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'তারা জিহাদও করেছে এবং শহীদও হয়েছে। এটা অতি উচ্চ পদমর্যাদা যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে, সোয়ারী কর্তিত হচ্ছে এবং মুখমণ্ডল মাটি ও রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যদি ধৈর্যের সাথে, সৎ নিয়তে বীরত্বের সাথে এবং পিছনে আল্লাহর পথে জিহাদ করি তবে কি আল্লাহ তা'আলা আমার গোনাহ মার্জনা করবেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'হ্যাঁ।' দ্বিতীয়বার তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি বলেছিলে আবার বলতো? লোকটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবার উত্তরে বললেনঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু ঋণ মার্জনা করা হবে না। এ কথাটি আমাকে জিবরাঈল (আঃ) এখনই বলে গেলেন।' তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন-আমি উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবো যার চতুর্দিকে স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। সেগুলোর কোনটিতে দুগ্ধ, কোনটিতে মধু, কোনটিতে সুরা এবং কোনটিতে নির্মল পানি রয়েছে। তাছাড়া ঐ সব নিয়ামতও রয়েছে যা কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, কোন চক্ষু দর্শন করেনি এবং কোন হৃদয় কল্পনাও করেনি। এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে প্রতিদান। এটা স্পষ্ট কথা যে, সমস্ত সম্রাটের যিনি সম্রাট তাঁর নিকট হতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতইনা অমূল্য অসীম হবে! যেমন কোন কবি বলেন, "তিনি যদি শাস্তি দেন তবে সেই শাস্তিও হবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নকারী, আর যদি তিনি পুরস্কার দেন তবে সেটাও হবে বে-হিসাব ও ধারণার বাইরে। কেননা, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারও ধার ধারেন না। সৎ কর্মশীলদের উত্তম বিনিময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর তোমরা চিন্তিত ও অধৈর্য হয়ে যেয়ো না। জেনে রেখো যে, মুমিনের উপর অত্যাচার করা হয় না। তোমাদের যদি খুশী ও শান্তি লাভ হয় তবে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ পৌঁছে তবে ধৈর্য ধারণ কর ও তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং পুণ্য ও প্রতিদানের আকাঙ্খা পোষণ কর। আল্লাহ তা'আলার নিকটই উত্তম ও পবিত্র প্রতিদান রয়েছে।'

١٩٦- لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১৯৬। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

١٩٧- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৯৭। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।

١٩٨- لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

১৯৮। কিন্তু যারা স্বীয় প্রতিপালকের ভয় করে, তাদের জন্যে জান্নাত– যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর সন্নিধান হতে আতিথ্য; এবং যেসব বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা পুণ্যবানদের জন্যে বহুগুণে উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন–'হে নবী (সঃ)! তুমি কাফিরদের মাতালতা, আনন্দ-বিহ্বলতা, সুখ সম্ভোগ এবং জাঁকজমকের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। অতিসত্বরই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু তাদের দুষ্কার্যসমূহ শাস্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ সব সুখের সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য। এ বিষয়েরই বহু আয়াত কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে–

مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে শুধুমাত্র কাফিরেরাই ঝগড়া করে থাকে, সুতরাং তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।" (৪০ঃ ৪) অন্য জায়গায় রয়েছে– "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা মুক্তি পায় না; তারা দুনিয়ায় কিছুদিন উপকৃত

হবে, কিন্তু পরকালে তো তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট; আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর প্রতিশোধরূপে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো।” আর এক স্থানে রয়েছে—“আমি তাদেরকে অল্পদিন উপকার পৌঁছাবো, অতঃপর তাদেরকে পুরু শাস্তির দিকে আকৃষ্ট করবো।” আর এক জায়গায় রয়েছে—“আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে থাকি।” অন্য জায়গায় রয়েছে—“যে ব্যক্তি আমার উত্তম অঙ্গীকার পেয়ে গেছে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরাম উপভোগ করছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হবে তারা কি সমান হতে পারে?” যেহেতু কাফিরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হলো, কাজেই সাথে সাথে মুমিনদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে— ‘এ মুত্তাকী দলটি কিয়ামতের দিন এমন জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে যার পার্শ্ব দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে।’ তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তাদেরকে পুণ্যবান বলার কারণ এই যে, তারা পিতা-মাতার সাথে ও সন্তানাদির সাথে সৎ ব্যবহার করে থাকে। যেমন তোমার উপর তোমার পিতা-মাতার অধিকার রয়েছে, তদ্রূপ তোমার উপর তোমার সন্তান-সন্ততির অধিকার রয়েছে।” এ বর্ণনাটিই হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে মাওকুফরূপেও বর্ণিত আছে এবং এর মাওকুফ হওয়াই অধিকতর সঠিক পরিলক্ষিত হচ্ছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ)বলেন, ‘পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে কাউকেও কষ্ট দেয় না।’ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রঃ) বলেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক আর মন্দই হোক। যদি সে সৎ হয় তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম। আর যদি সে অসৎ হয় তবে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও তার পাপরাশি যা তার ইহলৌকিক জীবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই বৃদ্ধি এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে। প্রথমটির দলীল হচ্ছে— مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলার নিকট যা রয়েছে তা পুণ্যবানদের জন্যে উত্তম।” দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে—

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ۔

অর্থাৎ “অবিশ্বাসকারীরা যেন ধারণা না করে যে, আমি যে তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্যে উত্তম। আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি যেন তাদের পাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।” (৩ঃ১৭৮) হযরত আবূদ্দারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

১৯৯। এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তদ্বিষয়ে আল্লাহর ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে; যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রী করে না, তাদেরই জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

١٩٩- وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۤئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

২০০। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর- যেন তোমরা সুফলপ্রাপ্ত হও।

٢٠٠- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ ع

এখানে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের ঐ দলের প্রশংসা করছেন যারা পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করেছিল। তারা কুরআন কারীমেও বিশ্বাস করে এবং নিজেদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস রাখে। তারা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় রেখে তাঁর আদেশ পালনে সদা লিপ্ত থাকে। প্রভুর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করতঃ ক্রন্দন করে থাকে। তাদের কিতাবে শেষ নবী (সঃ)-এর যেসব বিশেষণের বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন করে না। বরং সকলকেই তা প্রদান করতঃ তাঁকে স্বীকার করে নিতে উৎসাহিত করে। এরূপ দল আল্লাহ তা'আলার নিকট পুণ্য প্রাপ্ত হবে, তারা ইয়াহূদীই হোক বা খ্রীষ্টানই হোক। সূরা-ই-কাসাসের মধ্যে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে—যাদেরকে আমি এর পূর্বে কিতাব দান করেছিলাম তারা ওর উপরেও ঈমান আনয়ন করে এবং এ কিতাব (কুরআন কারীম) তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তারা স্পষ্টভাবে বলে,

'আমরা ওর উপর ঈমান এনেছি। এটা আমাদের প্রভুর নিকট হতে সত্য কিতাব। আমরা তো প্রথম হতেই এটা মান্য করতাম।' 'তাদেরকে তাদের ধৈর্যের দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে।' অন্য জায়গায় রয়েছে–'যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি এবং যারা ওটা সঠিকভাবে পাঠ করে, তারা তো তৎক্ষণাৎ এ কুরআনের উপরও ঈমান এনে থাকে।' আর এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে–

وَمِنْ قَوْمِ مُوسٰى أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُونَ ـ

অর্থাৎ 'হযরত মূসা (আঃ)-এর কওমের মধ্যেও একটি দল সত্যের পথ প্রদর্শনকারী এবং সত্যের সঙ্গেই সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী।' (৭ঃ ১৫৯) অন্য স্থানে রয়েছে–'আহলে কিতাব সবাই সমান নয়, তাদের মধ্যে একটি দল রাত্রেও আল্লাহর কিতাব পাঠ করে থাকে এবং সিজদায় পড়ে যায়।' আর এক জায়গায় রয়েছে–'হে নবী (সঃ)! তুমি বল হে মানবমণ্ডলী! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আর নাই কর, পূর্ব হতেই যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে যখন তাদের নিকট কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা মুখের ভরে সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে, আমাদের প্রভু পবিত্র, নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা সত্য হয়েই থাকবে। এরা কাঁদতে কাঁদতে মুখের ভরে পড়ে যায় এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইয়াহূদীদের মধ্য এরূপ গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং তার মত আরও কয়েকজন ঈমানদার ইয়াহূদী আলেম। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা দশের বেশী হবে না। খ্রীষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিল এবং সত্যের অনুগত হয়েছিল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–'তুমি অবশ্যই ইয়াহূদ ও মুশরিকদেরকে মুমিনদের প্রতি ভীষণ শত্রুতা পোষণকারী পাবে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা স্থাপনকারী পাবে ঐ লোকদেরকে যারা বলে, 'আমরা খ্রীষ্টান।' এখান হতে তারা যা বলেছে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাত প্রদান করবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।' এ পর্যন্ত। এখন বলা হচ্ছে যে, এসব লোক বিরাট প্রতিদানের অধিকারী। হাদীস শরীফে এও রয়েছে যে, যখন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তাঁর সভাসদবর্গের সামনে সূরা-ই-মারইয়াম পাঠ করেন তখন তাঁর কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহ সহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করতঃ বলেন, 'তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর জানাযার নামায আদায় কর।'

অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করতঃ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, যখন নাজ্জাসী ইন্তেকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে বলেনঃ 'তোমাদের ভাই-এর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর।' এতে কতগুলো লোক বলে, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে সেই খ্রীষ্টানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছেন যে আবিসিনিয়ায় মারা গেছে।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কুরআন কারীমই যেন তাঁর মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে বলেনঃ 'তোমাদের ভাই আসহামা মারা গিয়েছেন।' অতঃপর তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং যেভাবে তিনি জানাযার নামায পড়াতেন ঐভাবেই চার তাকবীরে জানাযার নামায আদায় করেন। এতে মুনাফিকরা ঐ প্রতিবাদ করে এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'নাজ্জাসীর ইন্তেকালের পর আমরা এ শুনতে থাকি যে, তাঁর সমাধির উপর আলো দেখা যায়।' মুসতাদরীক-ই-হাকীমে রয়েছে যে, নাজ্জাসীর এক শত্রু তাঁরই সাম্রাজ্য হতে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। তখন মুহাজিরগণ বলেন, 'আপনি তার মোকাবিলার জন্যে চলুন। আমরাও আপনার সাথে রয়েছি। আপনি আমাদের বীরত্ব দেখে নেবেন এবং যে উত্তম ব্যবহার আপনি আমাদের সাথে করেছেন তার প্রতিদানও হয়ে যাবে।' কিন্তু নাজ্জাসী তখন বলেন, 'মানুষের সাহায্য নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার চাইতে আল্লাহর সাহায্যের নিরাপত্তাই উত্তম।' ঐ ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহ্‌লে কিতাবের মুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ আহ্‌লে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বে ছিল, তারা ইসলামকে বুঝতো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুগত হওয়ারও তারা সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কাজেই প্রতিদানও তাদেরকে দ্বিগুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বেকার ঈমানের এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতিদান। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আহলে কিতাবের ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং আমার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছে।'

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন—তারা অল্পমূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রী করে না। অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা গোপন করে না, যেমন তাদের মধ্যকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের ঐ অভ্যাস

ছিল। বরং ঐলোকগুলো তো ঐ শিক্ষাকে বেশী করে প্রচার করতো। তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে–'নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।' অর্থাৎ সত্বর একত্রিতকারী, পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন–'আমার পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। কঠিন অবস্থায়, সহজ অবস্থায়, বিপদের সময়, শান্তির সময় মোটকথা কোন অবস্থাতেই ওটা পরিত্যাগ করো না। এমনকি প্রাণবায়ু নির্গত হলে যেন ওরই উপর নির্গত হয় এবং ঐ শত্রুদের হতেও ধৈর্য ধারণ কর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর যারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করে থাকে।' ইমাম হাসান বসরী (রঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী আলেমগণও এ তাফসীরই করেছেন। ইবাদতের স্থানকে স্থায়ী করা এবং তথায় অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাকে مُرَابِطَةٌ বলা হয়। আবার এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করাকেও مُرَابِطَةٌ বলে। এটাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রঃ) এবং হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ)-এর উক্তি। সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই-নাসাঈতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এসো, আমি তোমাদেরকে এমন কাজ শিখিয়ে দেই যার ফলে আল্লাহ তা'আলা পাপ মার্জনা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (১) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অযু করা, (২) মসজিদের দিকে গমন করা, (৩) এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। ওটাই হচ্ছে رِبَاطٌ, ওটাই হচ্ছে مُرَابِطَةٌ এবং ওটাই হচ্ছে আল্লাহর পথের প্রস্তুতি গ্রহণ'। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, একদা হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হযরত আবূ সালমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি এ আয়াতটির শান-ই-নযূল জান কি?' হযরত আবূ সালমা (রাঃ) বলেন, 'আমার জানা নেই।' তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'শুন, ঐ সময় কোন জিহাদ ছিল না। এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা মসজিদকে আবাদ রাখতো এবং নামায ঠিক সময়ে আদায় করতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার যিকির করতো। তাদেরকেই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে–'তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, স্বীয় আত্মা ও প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখ, মসজিদের দিকে গমন করতে থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আর এ কার্যগুলোই হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি প্রাপ্তির কারণ।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেবো না যার ফলে আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহ মার্জনা করেন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? (১) অসুবিধার সময় পূর্ণভাবে অযু করা, (২) এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। এসব কাজেই তোমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।'

অন্য হাদীসে 'খুব বেশী মসজিদের দিকে গমন করা' এ কথাও রয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, পাপ মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আমলসমূহের দ্বারা মর্যাদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটাই হচ্ছে এ আয়াতের ভাবার্থ। কিন্তু এ হাদীসটি একেবারেই গারীব। হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন– رَابِطُوْا শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা।' কিন্তু উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা হচ্ছে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর উক্তি। এও বলা হয়েছে যে, رَابِطُوْا শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শত্রুদেরকে ইসলামী শহরে প্রবেশ করতে না দেয়া। এর উৎসাহ দানের ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে এবং ওর জন্যে বড় বড় পুণ্য প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এক দিনের এ প্রস্তুতি সারা দুনিয়া ও ওর সমুদয় বস্তু হতে উত্তম।' সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এক দিবস ও রজনীর জিহাদের প্রস্তুতি এক মাসের পূর্ণ রোযা এবং এক মাসের সারা রাত্রির জাগরণ হতে উত্তম। ঐ প্রস্তুতির অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলে সে যত ভাল ভাল কাজ করতো সব কিছুরই সে পুণ্য পেতে থাকবে এবং অল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তাকে আহার্য প্রদান করা হবে এবং গণ্ডগোল হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।" মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রস্তুতির কার্যে রয়েছে এবং ঐ অবস্থাতেই মারা গেছে তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও তাকে কবরের শাস্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে।' সুনান-ই-ইবনে মাজার বর্ণনায় এও রয়েছে যে, উত্থান দিবসের আতংক হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে যে, সকাল সন্ধ্যায় জান্নাত হতে আহার্য প্রদান করা হবে। কিয়ামত পর্যন্ত সে সৎকার্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান পেতে থাকবে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের সীমান্তের কোন প্রান্তে তিন দিন (জিহাদের) প্রহরায় নিযুক্ত থাকে তাকে সারা বছর ধরে প্রহরায় নিযুক্ত থাকার প্রতিদান দেয়া হবে।' আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) স্বীয় মিম্বরের উপর ভাষণ দান কালে একদা বলেন, 'আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনা কথা শুনাচ্ছি। আমি বিশেষ এক খেয়ালে এ পর্যন্ত তোমাদেরকে তা শুনাইনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহর পথে এক ঘন্টা পাহারা দেয়া এক হাজার রাত্রির ইবাদত হতে উত্তম যে রাত্রিগুলো দাঁড়িয়ে এবং দিনগুলো রোযায় কাটিয়ে দেয়া হয়।' এতদিন ধরে তাঁর এ হাদীসটি বর্ণনা না করার কারণ তিনি বর্ণনা করেন, 'আমার ভয় ছিল যে, এ মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা সবাই হয়তো মদীনা ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করবে। এখন আমি

তোমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, যে কাজ সে নিজের জন্যে পছন্দ করে তা যেন সে পালন করে।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি পরে বলেনঃ 'আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি?' জনগণ বলেঃ 'হ্যাঁ'। অতঃপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, হযরত শুরাহবিল ইবনে সামত (রাঃ) সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। বহুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি কিছু সংকীর্ণ মনা হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁর নিকট পৌঁছেন এবং বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি হাদীস শুনাবো। তিনি বলেছেনঃ 'একদিন সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত থাকা এক মাসের রোযা ও দাঁড়িয়ে ইবাদত হতে উত্তম। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থাতেই মারা যায় সে কবরের শাস্তি হতে মুক্তি পায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার কাজ চালু থাকে।' সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুসলমানদেরকে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে একরাত্রি আল্লাহর পথে পাহারা দেয়া একশ বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম, যদিও ঐ রাত্রি রমযানের রাত্রি না হয়, যে একশ বছরের দিনগুলো রোযায় এবং রাত্রিগুলো তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দেয়া হয়। আর মুসলমানদেরকে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে এবং পুণ্য লাভের নিয়তে রমযান মাসের দিন ছাড়াও কোন একটি দিনে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হাজার বছরের রোযা ও তাহাজ্জুদ হতে উত্তম। এখন যদি এ গাযী সহীহ সালামতে স্বীয় পরিবারের নিকট আগমন করে তবে এক হাজার বছরের পাপ তার আমল নামায় লিখা হয় না। কিন্তু পুণ্য লিখা হয় এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার পুণ্য পেতে থাকে।" এ হাদীসটি গারীব এমনকি পরিত্যক্ত। এর একজন বর্ণনাকারী মিথ্যায় অভিযুক্ত। সুনান-ই-ইবনে মাজার একটি গারীব হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুসলমান সৈন্যদের পিছনে এক রাত্রির পাহারা এক বছরের রাত্রি দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হতে এবং দিনগুলোর রোযা রাখা হতে উত্তম। প্রত্যেক বছরের মধ্যে তিনশ ষাট দিন রয়েছে এবং প্রত্যেক দিন বছরের মত।' এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী হচ্ছে সাঈদ ইবনে খালিদ, হযরত আবূ যারআ' (রঃ) প্রভৃতি ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। বরং ইমাম হাকিম (রঃ) বলেন যে, তার বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহের মধ্যে মাওযূ' হাদীসও রয়েছে। একটি মুনকাতা' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইসলামের সৈন্যের প্রহরীর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।' (সুনান-ই-ইবনে মাজা) হযরত সাহল ইবনে হানযালা (রাঃ) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গমন করি। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করি এমন সময়

একজন অশ্বারোহী এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি অগ্রে বেড়ে গিয়েছিলাম এবং অমুক পাহাড়ের উপর আরোহণ করে আমি লক্ষ্য করি যে, হাওয়াযেম গোত্রের লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে গেছে। তাদের সাথে উট, ছাগল, স্ত্রীলোক এবং শিশুরাও রয়েছে।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটু মুচকি হেসে উঠে বলেনঃ 'ইনশাআল্লাহ! এ সবগুলো মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' অতঃপর তিনি বলেনঃ 'আজকের রাত্রের পাহারা দেবে কে?' হযরত আনাস ইবনে আবূ মুরশিদ (রঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রস্তুত আছি'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যাও, সোয়ারী নিয়ে এসো।' তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে হাযির হন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "এ ঘাঁটিতে চলে যাও এবং ঐ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ কর। সাবধান! সকাল পর্যন্ত তাদের সাথে যেন তোমাদের কোন প্রকার বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।" ফজর হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের জায়গায় এসে দু' রাকআত সুন্নত আদায় করেন এবং জনগণকে জিজ্ঞেস করেনঃ "বল তো, তোমাদের অশ্বারোহী প্রহরীর কোন পদশব্দ শুনা যাবে কি?" জনগণ বলে, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! না।" তখন নামাযের জন্য তাকবীর দেয়া হয় এবং তিনি নামায আরম্ভ করেন। তাঁর খেয়াল ঘাঁটির দিকেই ছিল। নামাযের সালাম ফিরিয়েই তিনি বলেনঃ "তোমরা খুশী হও। তোমাদের অশ্বারোহী আসছে।" আমরাও ঝোপের মধ্য হতে উঁকি মেরে দেখি। অল্পক্ষণের মধ্যে আমরাও দেখতে পাই। সে এসেই রাসূল (সঃ)-কে বলে, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এ উপত্যকার উপরের অংশে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং আপনার নির্দেশক্রমে তথায়ই রাত্রি অতিবাহিত করি। সকালে আমি অন্য ঘাঁটিও দেখে লই কিন্তু সেখানেও কেউ নেই।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেন, রাত্রে তুমি ওখান হতে নীচেও নেমেছিলে কি? তিনি বলেনঃ "না, শুধু নামাযের জন্যে এবং প্রস্রাব পায়খানার জন্যে নীচে নেমেছিলাম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ "তুমি নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছো। এরপর আর কোন আমল না করলেও কোন ক্ষতি নেই।" (সুনান-ই-আবি দাঊদ ও নাসাঈ) মুসনাদ -ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আবূ রায়হানা বলেন, "এক যুদ্ধে আমরা একটি উঁচু ভূমির উপর ছিলাম। অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত লোক গর্ত খনন করে তাতে পড়ে রয়েছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) ডাক দিয়ে বলেনঃ 'আজ রাত্রে আমাদেরকে পাহারা দেবে এবং আমাদের নিকট হতে উত্তম দু'আ নেবে এমন কেউ আছে কি?" একথা শুনে একজন আনসারী (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রস্তুত আছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করতঃ তাঁর জন্যে বহু দু'আ

করেন। আমি এ দু'আ শুনে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমিও পাহারা দেবো। তিনি আমাকেও পার্শ্বে ডেকে নেন এবং নাম জিজ্ঞেস করে আমার জন্যেও দু'আ করেন। কিন্তু ঐ আনসারী সাহাবীর তুলনায় কম ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ঐ চক্ষুর উপর জাহান্নামের তাপ হারাম যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং ঐ চক্ষুর উপরেও জাহান্নামের তাপ হারাম যে আল্লাহর পথে রাত্রি জাগরণ করে।" মুসনাদ-ই- আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, বাদশাহর পক্ষ হতে বেতন ছাড়াই মুসলমানদের পিছন হতে তাদের উপর পাহারা দেয় সে স্বীয় চক্ষু দ্বারাও জাহান্নামের আগুন দর্শন করবে না, কিন্তু শুধুমাত্র কসম পুরো হওয়ার জন্যে (দর্শন করবে)।" যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে–

وَاِنْ مِّنْـــكُمْ اِلَّا وَارِدُهَــــا

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে সবাই ওর উপর আগমন করবে।" (১৯ঃ ৭১) সহীহ বুখারীর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "স্বর্ণ মুদ্রার দাস রৌপ্য মুদ্রার দাস এবং বস্ত্রের দাস ধ্বংস হয়েছে। যদি তাকে সম্পদ দেয়া হয় তবে সে খুশী হয় এবং না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়, সে ধ্বংস হয়েছে এবং বিনষ্ট হয়েছে। তার পায়ে কাঁটা ঢুকলে তা বের করার চেষ্টাও করা হয় না। সৌভাগ্যবান ও উন্নতশীল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্যে স্বীয় অশ্বের বল্গা ধারণ করে থাকে, তার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, পদদ্বয় ময়লা যুক্ত। তাঁকে পাহারায় নিযুক্ত করলে পাহারা দিয়ে থাকে, সেনাবাহিনীর অগ্রে নিযুক্ত করলে তাতেও খুশী হয়। লোকের দৃষ্টিতে সে এত নিকৃষ্ট যে, সে যেতে চাইলে অনুমতি পায় না, কারও জন্যে সুপারিশ করলে তা গৃহীত হয় না।" আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা যে, এ আয়াত সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ হাদীসসমূহ বর্ণিত হলো। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের উপর আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে আমরা ক্ষান্ত হতে পারি না। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে আমীরুল মুমিনীন, খালীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে একটি পত্র লিখেন এবং সেই পত্রে রোমক সৈন্যদের আধিক্য, তাদের যুদ্ধাস্ত্রের অবস্থা এবং তাদের প্রস্তুতির অবস্থা বর্ণনা করেন এবং লিখেন যে, ভীষণ বিপদের আশংকা রয়েছে। হযরত উমার (রাঃ) উত্তর পত্র প্রেরণ করেন যাতে আল্লাহর প্রশংসার পরে লিখিত ছিলঃ "মাঝে মাঝে মুমিন বান্দাদের উপরেও কঠিন বিপদ-আপদ নেমে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই কঠিন বিপদের পর তাদের পথ সহজ করে দেন। জেনে রেখো যে, ছুটি সরলতার উপর একটি কাঠিন্য জয়যুক্ত হতে পারে না। দেখ আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং

সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত হও।” হিজরী ১৭০ অথবা ১৭৭ সনে তারসুস শহরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) যখন জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন তখন হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাকীনা (রঃ) তাঁকে বিদায় দেয়ার জন্যে এসেছিলেন। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) নিম্নলিখিত কবিতা লিখে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (রঃ)-এর হাতে হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াস (রঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেনঃ

يَاعَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ اَبْصَرْتَنَا * لَعَلِمْتَ اَنَّكَ فِى الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

مَنْ كَانَ يَخْضَبُ خَدَّهٗ بِدُمُوْعِهٖ * فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

وَمَنْ كَانَ تَتْعَبُ خَيْلُهٗ فِىْ بَاطِلٍ * فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ

رِيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا * رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْاَطْيَبُ

وَلَقَدْ اَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا * قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ

لَا يَسْتَوِىْ غُبَارُ خَيْلِ اللّٰهِ فِىْ * اَنْفِ امْرِءٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ

هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا * لَيْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيِّتٍ لَا يُكْذَبُ

অর্থাৎ “হে মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করে ইবাদতকারী! আপনি যদি আমাদের মুজাহিদগণকে দেখতেন তবে আপনি অবশ্যই জানতে পারতেন যে, আপনি ইবাদতে খেল-তামাশা করছেন মাত্র। এক ঐ ব্যক্তি যার নয়নাশ্রু তার গণ্ডদেশ সিক্ত করে এবং এক আমরা যারা স্বীয় স্কন্ধ আল্লাহর পথে কাটিয়ে দিয়ে নিজেদের রক্তে নিজেরাই গোসল করে থাকি। এক ঐ ব্যক্তি যার ঘোড়া মিথ্যা ও বাজে কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের ঘোড়া আক্রমণ ও যুদ্ধের দিনেই শুধু ক্লান্ত হয়। আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে আপনাদের জন্যে, আর আমাদের জন্যে আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে ঘোড়ার খুরের মাটি ও পবিত্র ধূলাবালি। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, আমাদের নিকট নবী (সঃ)-এর এ হাদীসটি পৌঁছেছে যা সম্পূর্ণ সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না, তা এই যে, যার নাসিকায় সেই আল্লাহর সৈন্যের ধূলাবালিও পৌঁছেছে তার নাসিকায় অগ্নিশিখা যুক্ত জাহান্নামের আগুনের ধুঁয়াও প্রবেশ করবে না। নিন, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলছে ও সত্য বলছে যে, শহীদ মৃত নয়।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, যখন আমি মসজিদে হারামে পৌঁছে হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াস (রঃ)-কে এ কবিতাগুলো প্রদর্শন করি তখন তিনি

কান্নায় ফেটে পড়েন এবং বলেন, "আবূ আব্দির রহমানের উপর আল্লাহ দয়া করুন! তিনি সত্য কথাই বলেছেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ও আমার খুবই মঙ্গল কামনা করছেন।" অতঃপর আমাকে বলেন, "তুমি কি হাদীস লিখে থাক?" আমি বলি জ্বি, হ্যাঁ। তিনি বলেন, "আচ্ছা, তুমি যখন এ উপদেশনামা আমার নিকট নিয়ে এসেছো তখন তার পরিবর্তে আমি তোমার দ্বারা একটি হাদীস লিখিয়ে নিচ্ছি।" হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি আবেদন করেন- 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন যা পালন করলে আমি মুজাহিদের পুণ্য লাভ করতে পারি। তিনি তখন তাকে বলেনঃ 'তোমার মধ্যে কি এ শক্তি আছে যে, তুমি নামায পড়তেই থাকবে, কখনও ক্লান্ত হবে না এবং রোযা রাখতেই থাকবে এবং কখনও বে-রোযা থাকবে না?' লোকটি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর শক্তি কোথায়? আমি তো এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোকটিকে বলেনঃ "যদি তোমার মধ্যে এরূপ শক্তি থাকতো এবং তুমি এরূপ করতেও থাকতে তথাপি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারতে না। তুমিও তো এটা জান যে, যদি মুজাহিদদের ঘোড়ার দড়ি লম্বা হয়ে যায় এবং সে এদিক ওদিক চড়ে যায় তবে তজ্জন্যেও মুজাহিদের পুণ্য লিখা হয়।"

এরপরে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন- "তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব সময়, সর্বকাজে থাকতে হবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে যখন ইয়ামনে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ "হে মুআ'য! যেখানেই থাক না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। যদি তোমার দ্বারা কোন পাপকার্য হয়ে যায় তবে তৎক্ষণাৎ কোন পুণ্যের কাজও করবে, যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।"

তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'এ চারটি কাজ করলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।' হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কারাযী (রঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তোমরা আমার খেয়াল রাখ, আমার ভয়ে কাঁপতে থাক। আমার ও তোমাদের কার্যের ব্যাপার সংযমী হও। যখন আমার উপর ভরসা করবে তখন তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম হবে।'

সূরাঃ
আলে-ইমরান
সমাপ্ত

সূরাঃ নিসা মাদানী سُوۡرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াতঃ ১৭৬, রুকূ'ঃ ২৪) (اٰيَاتُهَا: ١٧٦، رُكُوْعَاتُهَا: ٢٤)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতও (রাঃ) এটাই বলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ বলেনঃ "এখন আর রুদ্ধরাখা নয়।" মুসতাদরিক-ই-হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "সূরা-ই-নিসার মধ্যে পাঁচটি এমন আয়াত আছে যে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেয়ে যেতাম তথাপি আমি তত খুশী হতাম না যত খুশী এ আয়াতগুলোতে হয়েছি। একটি আয়াত হচ্ছেঃ "আল্লাহ তা'আলা কারও উপর অণুপরিমাণও অত্যাচার করেন না, যার যে পুণ্য থাকে তার প্রতিদান তিনি তাকে বেশী বেশী করে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে পুরস্কার হিসেবে যে বড় প্রতিদান তা তো পৃথক।" দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছেঃ "তোমরা যদি বড় বড় পাপসমূহ হতে বেঁচে থাক তবে ছোট ছোট পাপগুলো তিনি নিজেই ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।" তৃতীয় আয়াত হচ্ছেঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না এবং অবশিষ্ট পাপীদের যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে থাকেন।" চতুর্থ আয়াত হচ্ছেঃ "ঐ লোকগুলো যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট এসে যেতো এবং নিজেও স্বীয় পাপের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো ও রাসূল (সঃ) তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেতো।" ইমাম হাকিম (রঃ) বলেনঃ 'এর ইসনাদ সহীহ বটে, কিন্তু এর আবদুর রহমান নামক একজন বর্ণনাকারীর তার পিতার নিকট হতে শুনার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আবদুর রায্যাকের বর্ণনায় এই আয়াতটির পরিবর্তে নিম্নের আয়াতটি রয়েছেঃ "যে ব্যক্তির দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হয় কিংবা সে নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।" হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এই ভাবে হবে যে, প্রথম হাদীসে একটি আয়াতের বর্ণনা বাকী রয়ে গেছে এবং ওর বর্ণনা দ্বিতীয় হাদীসে হয়েছে। তাহলে পূর্ববর্তী হাদীসের চার আয়াত এবং পরবর্তী হাদীসের এক আয়াত মিলে মোট পাঁচ আয়াত হয়ে গেল। কিংবা اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ

(৪ঃ ৪০) হতেই একটি আয়াত পূর্ণ হয়ে গেছে এবং وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً -কে পৃথক আয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তবে দু'টি হাদীসেই পাঁচটি পাঁচটি করে আয়াত হয়ে গেল। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ সূরায় এমন ৮টা আয়াত রয়েছে যেগুলো এ উম্মতের জন্যে প্রত্যেক ঐ জিনিস হতে উত্তম যার মধ্যে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়। প্রথমটি হচ্ছেঃ 'আল্লাহ স্বীয় আহকাম তোমাদের উপর পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদেরকে ঐ সৎ লোকদের পথ-প্রদর্শন করতে চান যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে ও তোমাদের তাওবা কবূল করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞাতা, বিজ্ঞানময়।' দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছেঃ "আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করতে এবং তোমাদের তাওবা কবূল করতে চান, আর স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারীরা চায় যে, তোমরা সত্য পথ হতে বহু দূরে সরে পড়।" তৃতীয় আয়াতটি হচ্ছেঃ "মানুষকে যেহেতু দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই আল্লাহ তোমাদের উপর হালকা করতে চান।" বাকী আয়াত হচ্ছে ঐগুলো যেগুলো পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবি মালকিয়্যাহ (রঃ) বলেনঃ 'আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে সূরা-ই-নিসা সম্পর্কে শুনেছি। কুরআন কারীম পড়েছি, অথচ আমি ছোট শিশু ছিলাম।' (মুসতাদরিক-ই-হাকিম)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

١- يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

১। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে তাগাদা কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং অন্তরে যেন তাঁরই ভয় রাখে। অতঃপর তিনি স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন—আল্লাহ তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। এবং ঐ ব্যক্তি হতেই তিনি হযরত হাওয়া (আঃ)-কেও সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাম পাঁজরের পিছন দিক হতে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তিনি জাগ্রত হয়ে তাঁকে দেখতে পান এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রতিও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, স্ত্রীকে পুরুষ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ জন্যে তাঁর প্রয়োজন ও কামভাব পুরুষের মধ্যেই রাখা হয়েছে। আর পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা এ জন্যেই তাঁর প্রয়োজন মাটিতেই রাখা হয়েছে। সুতরাং তোমরা স্বীয় স্ত্রীদেরকে রুদ্ধ রাখ। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছেঃ 'স্ত্রীলোককে পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে উঁচু পাঁজর হচ্ছে সবচেয়ে বেশী বক্র। সুতরাং তুমি যদি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করার ইচ্ছে কর তবে তাকে ভেঙ্গে দেবে। আর যদি তার মধ্যে কিছু বক্রতা রেখে দিয়ে উপকার লাভ করতে চাও তবে অবশ্যই উপকার লাভ করতে পারবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন— 'দু'জন হতে অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করতঃ দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের প্রকারে, বিশেষণে, রঙ্গে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। এ সমস্ত যেমন পূর্বে আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে ছিল, তিনি তাদেরকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নেবেন এবং একটি মাঠে জমা করবেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করতে থাক। তোমরা সেই আল্লাহরই মাধ্যম দিয়ে তাঁর নামেরই দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট তাগাদা করে থাক।' যেমন কেউ বলে— 'আমি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং আত্মীয়তাকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাকে এ কথা বলছি।' মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা

তাঁরই নামে শপথ করে থাক এবং অঙ্গীকার দৃঢ় করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় করতঃ আত্মীয়তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, ওর বন্ধন ছিন্ন করো না, বরং যুক্ত রাখ। একে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার কর। একটি পঠনে وَالْأَرْحَامِ ও রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং আত্মীয়তার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত অবস্থা ও কার্যাবলীর সংবাদ রাখেন এবং তিনি খুব ভালভাবে তোমাদের তত্ত্বাবধান করতে রয়েছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী রয়েছেন।'

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো, অথবা তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।' ভাবার্থ এই যে, তোমরা তাঁর প্রতি মনোযোগ দাও যিনি তোমাদের উঠায়, বসায়, চলায় ও ফেরায় তোমাদের রক্ষক হিসেবে রয়েছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'হে মানবমণ্ডলী! একই বাপ-মায়ের মাধ্যমে তো তোমাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং তোমরা পরস্পরে একে অপরের প্রতি প্রেম-প্রীতি বজায় রেখো, দুর্বলদের সহায়তা কর এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে রয়েছে যে, 'মুযা'র গোত্র যখন নিজেদেরকে চাদরে আবৃত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে, কেননা, তাদের শরীরে কাপড় পর্যন্ত ছিল না, তখন রাসূলুল্লাহ যোহরের নামাযের পর দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন, যাতে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করতঃ নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই যেন দেখে যে, সে আগামীকালের জন্যে কি সামনে পাঠিয়েছে?' (৫৯ঃ ১৮) অতঃপর তিনি জনগণকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে যে যা পারলেন ঐ লোকগুলোকে দান করলেন। স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, খেজুর, গম ইত্যাদি সব কিছুই দিলেন। মুসনাদ ও সুনানের মধ্যে অভাবের ভাষণের বর্ণনায় রয়েছে যে, পরে তিনি তিনটি আয়াত পাঠ করেন যার মধ্যে একটি এ আয়াতটিই।

٢- وَاٰتُوا الْيَتٰمٰىٓ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰىٓ اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

২। আর পিতৃহীনগণকে তাদের ধন-সম্পত্তি প্রদান কর এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করো না ও তোমাদের ধন-সম্পত্তির সাথে তাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ।

٣- وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ط ○

৩। আর যদি তোমরা আশংকা কর যে পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীগণের মধ্য হতে তোমাদের মনমত দু'টি ও তিনটি ও চারটিকে বিয়ে কর; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, ন্যায় বিচার করতে পারবে না তবে মাত্র একটি অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী।

٤- وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

৪। আর নারীগণকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে পর কিয়দাংশ প্রদান করে তবে বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।

আল্লাহ তা'আলা পিতৃহীনদের অভিভাবকগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন–পিতৃহীনেরা যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে ও বিবেকসম্পন্ন হয় তখন তাদেরকে তাদের মাল পুরোপুরি প্রদান করবে। কিছুমাত্র কম করবে না বা আত্মসাৎও করবে না। তাদের মালকে তোমাদের মালের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করার বাসনা অন্তরে পোষণ করো না। হালাল মাল যখন আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রদান করেছেন–তখন হারামের দিকে যাবে কেন? তোমাদের ভাগ্যে যে অংশ লিপিবদ্ধ তা তোমরা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। তোমাদের হালাল মাল ছেড়ে দিয়ে অপরের মাল যা তোমাদের জন্যে হারাম তা কখনও গ্রহণ করো না। নিজেদের দুর্বল ও পাতলা পশুগুলো দিয়ে অপরের মোটাতাজাগুলো হস্তগত করো না। মন্দ দিয়ে ভাল নেয়ার চেষ্টা করো না। পূর্বে লোকেরা এরূপ করতো যে, তারা পিতৃহীনদের ছাগলের পাল হতে বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে নিজেদের দুর্বল ছাগলগুলো দিতো এবং এভাবে গণনা ঠিক রাখতো। মন্দ দিরহামগুলো তাদের মালে রেখে দিয়ে তাদের ভালগুলো নিয়ে নিতো। অতঃপর মনে করতো যে তারা ঠিকই করেছে। কেননা, ছাগলের পরিবর্তে ছাগল দিয়েছে এবং দিরহামের পরিবর্তে দিরহাম দিয়েছে। তারা পিতৃহীনদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের মধ্যে মিশ্রিত করে দিয়ে এ কৌশল করতো যে, এখন আর স্বাতন্ত্র্য কি আছে? তাই আল্লাহ পাক বলেন–'তাদের সম্পদ নষ্ট করো না, কেননা, এটা বড় পাপ।' একটি দুর্বল হাদীসেও আয়াতটির শেষ বাক্যের এ অর্থই বর্ণিত আছে।

সুনান-ই-আবূ দাঊদের একটি দু'আতেও حُوْبٌ শব্দটি পাপের অর্থে এসেছে। হযরত আবূ আইয়ূব (রাঃ) স্বীয় পত্নীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'এক তালাক প্রদানে পাপ হবে।' সুতরাং তিনি স্বীয় সংকল্প হতে বিরত থাকেন। অন্য বর্ণনায় এ ঘটনাটি হযরত আবূ তালহা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সুলায়েম (রাঃ)-এর ঘটনা বলে বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'কোন পিতৃহীনা বালিকার লালন পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তোমরা তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে কর, কিন্তু যেহেতু তার অন্য কেউ নেই, কাজেই তোমরা এরূপ করো না যে, তাকে মোহর কম দিয়ে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করবে, বরং আরও বহু স্ত্রীলোক রয়েছে তাদের মধ্যে তোমাদের পছন্দমত দু'টি, তিনটি এবং চারটিকে বিয়ে কর।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল। তার মাল-ধনও ছিল এবং বাগানও ছিল। যে লোকটি তাকে লালন পালন করছিল সে

শুধুমাত্র তার মাল-ধনের লালসায় পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে করে নেয়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আমার ধারণা এই যে, ঐ বাগানে ও মালে এ বালিকাটির অংশ ছিল।'

সহীহ্ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হযরত ইবনে শিহাব (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীনা বালিকার বর্ণনা, যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার মালে তার অংশ রয়েছে। আর সে বালিকার মাল ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে। সুতরাং সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অন্য জায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেতো ততটা সে দেয় না। সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে, সে যেন সে বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদেরকে পছন্দমত বিয়ে করে নেয়।'

অতঃপর জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐ ব্যাপারেই প্রশ্ন করে এবং وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ (৪ঃ ১৬৭) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তথায় বলা হয়–'যখন পিতৃহীনা মেয়ের মাল ও সৌন্দর্য কম থাকে তখন তো অভিভাবক তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না, সুতরাং এর কোন কারণ নেই যে, তার মাল ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পূর্ণ হক আদায় না করেই তাকে বিয়ে করে নেবে। হ্যাঁ, তবে ন্যায়ের সাথে যদি পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ করতঃ বিয়ে করে তবে কোন দোষ নেই। নচেৎ স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই। তাদের মধ্যে হতে যেন পছন্দ মত সে বিয়ে করে। ইচ্ছে করলে দু'টি, তিনটি এবং চারটি পর্যন্ত করতে পারে। অন্য জায়গাতেও এ শব্দগুলো এ অর্থেই এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে–

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

অর্থাৎ 'যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূতরূপে প্রেরণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন দু'টি ডানা বিশিষ্ট, কেউ রয়েছেন তিনটি ডানা বিশিষ্ট এবং কেউ রয়েছেন চারটি ডানা বিশিষ্ট।'(৩৫ঃ ১) ফেরেশতাদের মধ্যে এর চেয়ে বেশী ডানা বিশিষ্ট ফেরেশতাও রয়েছেন। কেননা এটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু পুরুষের জন্যে এক সাথে চারটের বেশী স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ, যেমন এ আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং জমহূরের এটাই উক্তি। এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুতরাং চারটের বেশীর উপর সমর্থন থাকলেও অবশ্যই তা বলতেন।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ 'কুরআন কারীমের ব্যাখ্যাকারী হাদীস শরীফ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া আর কারও জন্যে একই সাথে চারটের বেশী স্ত্রী একত্রিত করা বৈধ নয়।' এর উপরই উলামা-ই-কিরামের ইজমা' হয়েছে। তবে কোন কোন শিআ'র মতে তা নয়টি পর্যন্ত একত্রিত করা বৈধ। বরং কোন কোন শিআ'র মতে তা নয়টির বেশী একত্রিত করলেও কোন দোষ নেই। তাদের মতে কোন সংখ্যাই নির্ধারিত নেই। তাদের দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজ। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, তাঁর নয়জন পত্নী ছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফের মুআল্লাক হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারী এগার জন বলেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পনেরজন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তেরজনের সাথে তাঁর সহবাস হয়েছিল। একই সময়ে এগারজন পত্নী তাঁর নিকট বিদ্যমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নয়জন পত্নী রেখে ইন্তেকাল করেন। আমাদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, এটা একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যেই বৈধ ছিল। তাঁর উম্মতের জন্যে একই সাথে চারটের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি নেই।

এর প্রমাণ রূপে নিম্নের হাদীসগুলো পেশ করা যেতে পারেঃ (১) হযরত গায়লান ইবনে সালমা সাকাফী (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ(সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'তোমার ইচ্ছেমত চারটি স্ত্রী রেখে বাকীগুলো পরিত্যাগ কর।' তিনি তাই করেন। অতঃপর হযরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে তিনি তাঁর ঐ স্ত্রীগুলোকেও তালাক দিয়ে দেন এবং স্বীয় ধন-সম্পদ স্বীয় ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত উমার (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে বলেনঃ 'সম্ভবতঃ তোমার শয়তান কথা চুরি করেছে এবং তোমার মনে এ ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে, তুমি সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এজন্যেই তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছো যেন তারা তোমার সম্পত্তির অংশ না পায়। আর এ কারণেই তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে রাজআত কর (ফিরিয়ে নাও) এবং তোমার ছেলেদের নিকট হতে মাল ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি এ কাজ না কর তবে তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকেও তোমার উত্তরাধিকারিণী বানিয়ে দেবো। কেননা, তুমি তাদেরকে এ ভয়েই তালাক দিয়েছো। আর মনে হচ্ছে যে,

তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর তবে জেনে রেখো যে, আমি তোমার কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার জন্যে জনগণকে নির্দেশ প্রদান করবো, যেমন আবূ রাগালের কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।' (মুসনাদ-ই-আহমাদ, শাফিঈ, জামেউত তিরমিযী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, দারেকুতনী ইত্যাদি) মারফূ' হাদীস পর্যন্ত তো এসব কিতাবেই রয়েছে।

তবে হযরত উমার (রাঃ)-এর ঘটনাটি শুধুমাত্র মুসনাদ-ই-আহমাদেই রয়েছে। কিন্তু এ অতিরিক্তটুকু হাসান। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে দুর্বল বলেছেন এবং এর ইসনাদের দ্বিতীয় ধারা বর্ণনা করার পর ঐ ধারাকে অরক্ষিত বলেছেন। কিন্তু এ ত্রুটি প্রদর্শনের ব্যাপারটাও চিন্তার বিষয়। সম্মানিত হাদীস বিশারদগণও এর উপর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মুসনাদ-ই-আহমাদে বর্ণিত হাদীসটির সমস্ত বর্ণনাকারীই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে নির্ভরযোগ্য। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ দশজন স্ত্রীও মুসলমান হয়েছিলেন। (সুনান-ই-নাসাঈ)

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, একই সময়ে যদি চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা বৈধ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) গায়লান (রাঃ)-কে দশজন স্ত্রীর মধ্যে যে কোন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট ছয়জনকে তালাক দিতে বলতেন না, কেননা তাঁরা সবাই ঈমান এনেছিলেন। এখানে এটাও স্মরণ রাখার কথা যে, গায়লান (রাঃ)-এর নিকট তো দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেনই, তথাপি তিনি ছয়জনকে পৃথক করিয়ে দিলেন, তাহলে নতুনভাবে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? (২) সুনান-ই-আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা ইত্যাদির মধ্যে হাদীস রয়েছে, হযরত উমাইয়া আসাদী (রাঃ) বলেনঃ 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার আটটি স্ত্রী ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি বলেনঃ 'তোমার ইচ্ছেমত ওদের মধ্যে চারজনকে রাখ।' এর সনদ হাসান এবং এর সাক্ষীও রয়েছে। বর্ণনাকারীদের নামের হেরফের ইত্যাদি এরূপ বর্ণনায় ক্ষতিকর হয় না। (৩) মুসনাদ-ই-শাফিঈর মধ্যে রয়েছে, হযরত নাওফিল ইবনে মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেনঃ 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার ৫টা স্ত্রী ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ওদের মধ্যে পছন্দমত চারটিকে রাখ এবং একটিকে পৃথক করে দাও।' ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়স্কা ছিল এবং নিঃসন্তান ছিল তাকে আমি তালাক দিয়ে দেই।' সুতরাং এ হাদীসগুলো হযরত গায়লানযুক্ত হাদীসের সাক্ষী, যেমন ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে না পারার ভয় থাকে তবে একটিকেই যথেষ্ট মনে কর বা দাসীদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা ইচ্ছে করলেও স্ত্রীর মধ্যে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে না।'(৪ঃ ১২৯) এখানে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, দাসীদের মধ্যে পালা করা ইত্যাদি ওয়জিব নয়, তবে মুস্তাহাব বটে। যে করে সে ভালই করে এবং যে না করে তারও কোন দোষ নেই। এর পরবর্তী বাক্যের ভাবার্থ কেউ কেউ বলেছেন, 'এটা তোমাদের দারিদ্র বেশী না হওয়ার অতি নিকটবর্তী।' যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ وَاِنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর।' কোন আরব কবি বলেছেনঃ

فَمَا يَدْرِى الْفَقِيْرُ مَتٰى غَنَاهُ * وَمَا يَدْرِى الْغِنٰى مَتٰى يَعِيْلُ

অর্থাৎ 'দরিদ্র ব্যক্তি জানে না যে, সে কখন ধনী হবে এবং ধনী ব্যক্তিও জানে না যে, সে কখন দরিদ্র হবে।' যখন কোন ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে পড়ে তখন আরবের লোকেরা বলে থাকে (عَالَ الرَّجُلُ) অর্থাৎ লোকটি দরিদ্র হয়ে পড়েছে। মোটকথা এ অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে এ তাফসীর খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, যদি আযাদ স্ত্রীলোকদের আধিক্য দারিদ্রের কারণ হতে পারে তবে দাসীদের আধিক্যও দারিদ্রের কারণ হতে পারবে। সুতরাং জমহূরের উক্তি সত্যিই সঠিক যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'তোমরা অত্যাচার হতে বেঁচে যাও এটা তারই অতি নিকটবর্তী।' আরবে বলা হয়– (عَالَ فِى الْحُكْمِ) অর্থাৎ 'সে হুকুমের ব্যাপারে অত্যাচার করেছে।' আবূ তালিবের নিম্নের বিখ্যাত কাসিদায় রয়েছে–

بِمِيْزَانِ قِسْطٍ لَا يُخَيِّسُ شَعِيْرَةً * لَهٗ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهٖ غَيْرُ عَائِلٍ

অর্থাৎ 'এমন দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করছো যা এক যব পরিমাণও কম করে না। তার নিকট স্বয়ং তার আত্মাই সাক্ষী রয়েছে যে অত্যাচারী নয়।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, যখনই কুফাবাসী হযরত উসমান (রাঃ)-কে প্রদত্ত এক চিঠিতে তাঁকে কিছু দোষারোপ করে তখন তার উত্তরে তিনি লিখেন, اِنِّىْ لَسْتُ بِمِيْزَانٍ اَعُوْلُ অর্থাৎ 'আমি অত্যাচারের দাঁড়ি-পাল্লা নই।' সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতির মধ্যে একটি মারফূ' হাদীসে এ বাক্যের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে–'তোমরা অত্যাচার করো না।'

হযরত ইবনে আবি হাতিম বলেন যে, এর মারফূ' হওয়া ভুল কথা, তবে এটা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তি বটে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা, (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত আবূ মালিক (রঃ), হযরত আবূ যারীন (রঃ), হযরত নাখঈ (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ), যাহ্হাক (রঃ), হযরত আতা খুরাসানী (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত মুকাতিল (রঃ) প্রভৃতি হতেও এ অর্থ বর্ণিত আছে। হযরত ইকরামাও (রাঃ) আবূ তালিবের উক্ত কাসিদাটি পেশ করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজেও এটাই পছন্দ করেন।

এরঁপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও যা দিতে তোমরা স্বীকৃত হয়েছো। তবে যদি স্ত্রী ইচ্ছে প্রণোদিত হয়ে তার সমস্ত মোহর বা কিছু অংশ মাফ করে দেয় তবে তা করার তার অধিকার রয়েছে এবং সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষে তা ভোগ করা বৈধ। নবী (সঃ)-এর পরে কারও জন্যে মোহর ওয়াজিব করা ছাড়া বিয়ে করা জায়েয নয় এবং ফাঁকি দিয়ে শুধু নামমাত্র মোহর ধার্য করাও বৈধ নয়।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রোগাক্রান্ত হয় তখন তার উচিত যে, সে যেন তার স্ত্রীর মালের তিন দিরহাম বা কিছু কম বেশী গ্রহণ করতঃ তা দিয়ে মধু ক্রয় করে এবং আকাশের বৃষ্টির পানি তার সাথে মিশ্রিত করে, তাহলে তিনটি মঙ্গল সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে স্ত্রীর মাল যাকে আল্লাহ পাক তৃপ্তি সহকারে খেতে বলেছেন, দ্বিতীয় হচ্ছে মধুর শিকা এবং তৃতীয় হচ্ছে কল্যাণময় বৃষ্টির পানি।' হযরত আবূ সালিহ (রঃ) বলেন যে, মানুষ তাদের মেয়েদের মোহর নিজেরা গ্রহণ করতো। ফলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এ কাজ হতে বিরত রাখা হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম ও তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) এ নির্দেশ শুনে জনগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের পরস্পরের মোহর কি?' তিনি বলেনঃ 'যে জিনিসের উপরেই তাদের পরিবার সম্মত হয়ে যায়।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

রাসূলুল্লাহ (সঃ)! স্বীয় ভাষণে তিনবার বলেনঃ 'তোমরা বিধবাদের বিয়ে দিয়ে দাও।' তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের পরস্পরের মোহর কি'? তিনি বলেনঃ 'যার উপর তাদের পরিবারের লোক সম্মত হয়ে যাবে।' এ হাদীসের ইবনে সালমানী নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল, তা ছাড়া এতে ইনকিতাও রয়েছে।

٥- وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ○

৫। আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারিত করেছেন, তা অবোধদেরকে প্রদান করো না; এবং তা হতে তাদেরকে ভক্ষণ করাতে থাক, পরিধান করাতে থাক এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।

٦- وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ○

৬। আর পিতৃহীনগণ বিবাহযোগ্যা না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেকবুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর; এবং তারা বয়োঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা অপব্যয় ও সত্বরতা সহকারে আত্মসাৎ করো না; এবং যে ব্যক্তি অভাব মুক্ত হবে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অনন্তর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্যে সাক্ষী রেখো এবং আল্লাহ হিসেব গ্রহণে যথেষ্ট।

মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নির্বোধদেরকে তাদের মাল প্রদান না করে। মাল-ধন ব্যবসা ইত্যাদিতে খাটিয়ে আল্লাহ তা'আলা ওর দ্বারা মানুষের জীবন যাপনের উপায় করে দিয়েছেন, এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অবোধদেরকে তাদের মাল খরচ করা হতে বিরত রাখা উচিত। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, পাগল, নির্বোধ এবং বেদ্বীন অন্যায়ভাবে স্বীয় মাল-ধন নিঃশেষে ব্যয় করে ফেলছে, তাদের এভাবে মাল খরচ করা হতে বাধা দিতে হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির স্কন্ধে বহু ঋণের ভার চেপে গেছে, যে ঋণ সে তার সমস্ত মাল দিয়েও পরিশোধ করতে পারে না, যদি মহাজন সে সময়ের শাসনকর্তার নিকট আবেদন করে তবে শাসনকর্তা তার সমস্ত মাল হস্তগত করবেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে দেবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে سُفَهَاءُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সন্তান-সন্তুতি ও স্ত্রীগণ, তদ্রূপ হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত হাকাম ইবনে উয়াইনা (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত যহ্হাক (রঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, سُفَهَاءُ শব্দের ভাবার্থ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েই বটে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পিতৃহীনেরা। মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ) এবং কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রীগণ। সুনান-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'স্বীয় স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে এরা ছাড়া নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধিহীনা।' তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও এ হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে দুষ্ট দাস।

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন—'তাদেরকেও খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ পাক তোমার যে মালকে তোমার জীবন ধারণের উপায় করে দিয়েছেন তা তুমি তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে প্রদান করতঃ তাদের হাতের দিকে চেয়ে থেকো না। বরং তোমার মাল তুমি তোমার দখলেই রেখে ওকে ঠিক রাখ এবং তুমি স্বহস্তে তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর।' হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলেনঃ 'তিন প্রকারের লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে কিন্তু তাদের প্রার্থনা (আল্লাহ পাক) কবূল করেন না। প্রথম ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী দুষ্টা ও দুশ্চরিত্রা সত্ত্বেও সে তাকে তালাক প্রদান করে না। দ্বিতীয়

ঐ ব্যক্তি যে তার মাল নির্বোধদেরকে প্রদান করে থাকে, অথচ আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–'তোমরা তোমাদের মাল নির্বোধদেরকে প্রদান করো না।' তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যার কারও উপরে ঋণ রয়েছে এবং সে ঐ ঋণের উপর কাউকে সাক্ষী রাখেনি।'

এরপরে বলা হচ্ছে–' তাদেরকে ভাল কথা বল'। অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম ও নম্রভাবে ব্যবহার কর। এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত। যার নিজ হাতে খরচ করার অধিকার নেই তার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা ও খবরা-খবর লওয়া এবং নম্র ব্যবহার করা উচিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা পিতৃহীনদের দেখাশুনা কর যে পর্যন্ত না তারা যৌবনে পদার্পণ করে।' এখানে- نِكَاح শব্দ দ্বারা প্রাপ্ত বয়স বুঝনো হয়েছে এবং প্রাপ্ত বয়সের পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্ন দেখা যায় এবং এক বিশেষ প্রকারের পানি তীব্র বেগে বহির্গত হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তিটি ভালভাবেই স্মরণ আছেঃ 'স্বপ্নদোষের পর পিতৃহীনতাও নেই এবং সারা দিনরাত নীরব থাকাও নেই।' অন্য হাদীসে রয়েছেঃ 'তিন প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (১) শিশু, যে পর্যন্ত না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না সে জেগে উঠে। (৩) পাগল ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে।' সুতরাং প্রাপ্ত বয়সের নিদর্শন একতো হচ্ছে এই।

দ্বিতীয় নিদর্শন কারও কারও মতে এই যে, যখন তার বয়স পনেরো বছর হবে। এর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি, যাতে তিনি বলেনঃ 'উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সঙ্গে নেননি। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির করা হলে তিনি সম্মতন হন। সে সময় আমার বয়স ছিল পনেরো বছর।' হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর নিকট এ হাদীসটি পৌঁছলে তিনি বলেনঃ 'প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমা এটাই।'

প্রাপ্ত বয়সের তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে নাভীর নীচে চুল গজান। এ ব্যাপারে আলেমদের তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন! দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন নয় এবং তৃতীয় উক্তি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন নয় কিন্তু যিম্মীদের মধ্যে এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন। কেননা, এটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোন ঔষধের কারণে এ চুল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে এবং যুবক হওয়া মাত্রই যিম্মীদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়। তাহলে তারা ওটা ব্যবহার করতে লাগলো কেন? কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সকলের পক্ষেই এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন। কেননা, প্রথমতঃ এটা প্রকৃতিগত ব্যাপার। প্রতিষেধকের সম্ভাবনা খুব দূরের সম্ভাবনা । প্রকৃত কথা এই যে, এ চুল স্বীয় সময়মতই বের হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে–মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসটি, যাতে হযরত আতিয়া যারাযীর (রাঃ) বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেনঃ 'বানূ কুরাইযার যুদ্ধের পর আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হাযির করা হয়। তিনি নির্দেশ দেনঃ 'এক ব্যক্তি দেখুক যে, বন্দীদের মধ্যে যাদের এ চুল বের হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং যাদের বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।' সে সময় আমার এ চুল বের হয়নি বলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।' সুনান-ই-আরবাআর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরিমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হযরত সা'দ (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তের উপর বানূ কুরাইযা গোত্র সম্মত হয়ে যুদ্ধ হতে বিরত হয়েছিল। অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) এ ফায়সালা করেন যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশুদেরকে বন্দী করা হোক। 'গারায়েবী আবি উবায়েদের' মধ্যে রয়েছে যে, একটি ছেলে একটি যুবতী মেয়ের সম্পর্কে বলে, 'আমি তার সাথে ব্যভিচার করেছি।' প্রকৃতপক্ষে এটা অপবাদ ছিল। হযরত উমার (রাঃ) তাকে অপবাদের হদ্দ গালাবার ইচ্ছে করেন। কিন্তু বলেনঃ 'তোমরা দেখ, যদি তার নাভীর নীচে চুল গজিয়ে থাকে তবে তার উপরে হদ্দ লাগাবে নচেৎ নয়।' যখন দেখা যায় যে, তার সেই চুল গজায়নি তখন তার হদ্দ লাগানা বন্ধ রাখা হয়।

অতঃপর আল্লাহ বলেন–'যখন তোমরা দেখ যে, তাদের ধর্ম গ্রহণের সামর্থ এবং মাল রক্ষার যোগ্যতা হয়েছে তখন তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য হবে তাদের মাল তাদেরকে সমর্পণ করা। প্রয়োজন ছাড়াই শুধুমাত্র এই ভয়ে যে,

তারা বড় হওয়ামাত্রই তাদের মাল নিয়ে নেবে, কাজেই তার পূর্বেই তাদের মাল শেষ করে দেবে, খবরদার! এ কাজ করো না। যে ধনী হবে, নিজেরই খাওয়া পরার জিনিস যথেষ্ট থাকবে, তার তো কর্তব্য হবে তাদের মাল হতে কিছুই গ্রহণ না করা। মৃত জন্তু এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ মাল তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। হ্যাঁ, তবে যদি অভিভাবক দরিদ্র হয় তাহলে অবশ্যই তাকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক হিসেবে সময়ের প্রয়োজন ও দেশ প্রথা অনুযায়ী তার মাল হতে গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে। যদি প্রয়োজন পরিশ্রম অপেক্ষা কম হয় তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। আর যদি পরিশ্রম প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তবে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে।

অতঃপর এরূপ অভিভাবক যদি ধনী হয়ে যায় তবে তার সেই ভক্ষণকৃত ও গ্রহণকৃত মাল ফিরিয়ে দিতে হবে কি না সেই ব্যাপার দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি তো এই যে, ফিরিয়ে দিতে হবে না। কেননা, সে নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে তা গ্রহণ করেছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর সহচরদের মতে এটাই সঠিক। কেননা, আয়াতে বিনিময় ছাড়া তাদের মাল হতে খাওয়াকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট কোন মাল নেই। একজন পিতৃহীনকে আমি লালন-পালন করছি। আমি তার আহার্যের মধ্য হতে কিছু খেতে পারি কি?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, তুমি পিতৃহীনের মাল নিজের কাজে লাগাতে পার, যদি প্রয়োজনের বেশী গ্রহণ না কর, জমা না কর এবং এটাও না কর যে, নিজের মাল বাঁচিয়ে রেখে তার মাল খেয়ে ফেল।' মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে এ রকমই বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে হিব্বান (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আমি পিতৃহীনকে ভদ্রতা শিখাবার জন্যে প্রয়োজন বশতঃ কোন জিনিস দিয়ে মারবো?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যা দিয়ে তুমি তোমার শিশুকে শাসন-গর্জন করে থাক। নিজের মাল বাঁচিয়ে তার মাল খরচ করো না, তার সম্পদ দ্বারা ধনবান হওয়ার চেষ্টা করো না।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করে, 'আমার নিজের উট রয়েছে এবং আমার নিকট যে পিতৃহীন প্রতিপালিত হচ্ছে তারও উট রয়েছে। আমি আমার উষ্ট্রগুলো দরিদ্রদেরকে দুধ পান করার জন্যে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে থাকি। ঐ ইয়াতিমদের উষ্ট্রগুলোর দুধ পান করা কি আমার জন্যে বৈধ হবে?'

তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'ঐ ইয়ামতিমদের হারান উটগুলো যদি খুঁজে আন, ওগুলোর খড় পানির ব্যবস্থার কর, ওদের হাউজগুলো ঠিক করে থাক, ঐগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কর তবে অবশ্যই তুমি ওগুলোর দুধ দ্বারা উপকার লাভ করতে পারবে। তবে এভাবে যে, যেন ঐ শিশুদের কোন ক্ষতি না হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও নেবে না।' (মুআত্তা-ই-ইমাম মালিক) হযরত আতা' ইবনে আবূ রিবাহ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), হযরত আতিয়া আওফী (রঃ) এবং হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এরও এটাই উক্তি।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, অস্বচ্ছলতা দূর হয়ে যাওয়ার পর ইয়াতিমের মাল হতে ভক্ষিত ও গৃহীত জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা, মূলে তো তা নিষিদ্ধ। কোন কারণ বশতঃ বৈধ হয়েছিল মাত্র। ঐ কারণ যখন দূর হয়ে গেল তখন তার বিনিময় দিতে হবে। যেমন কেউ নিঃসহায় ও নিরুপায় হয়ে অপরের মাল ভক্ষণ করলো। অতঃপর প্রয়োজন মিটে যাবার পর যদি সুসময় ফিরে আসে তবে সেই ভক্ষিত মাল তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় দলীল এই যে, হযরত উমার (রাঃ) যখন খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হন তখন ঘোষণা করেনঃ 'এখানে আমার জীবনোপায় পিতৃহীনের অভিভাবকের জীবনোপায়ের মতই। আমার প্রয়োজন না হলে বায়তুল মাল হতে আমি কিছুই গ্রহণ করবো না। আর যদি অভাব হয়ে পড়ে তবে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করবো। যখন স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে তখন ফিরিয়ে দেবো।' (ইবনে আবিদ দুনিয়া) এ হাদীসটি হযরত সাঈদ ইবনে মানসুরও (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এর ইসনাদ সহীহ। বায়হাকীর হাদীসের মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের বাক্যটির তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, ঋণরূপে ভক্ষণ করবে। অন্যান্য মুফাসসিরগণ হতেও এটা বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'সঙ্গতভাবে খাবার ভাবার্থ এই যে, তিন অঙ্গুলী দ্বারা খাবে। অন্য বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, সে নিজেরই মালকে শুধু নিজের প্রয়োজন পুরো হবার উপযাগীরূপেই খরচ করবে যাতে তার ইয়াতিমের মাল খরচ করার প্রয়োজনই না হয়। হযরত আমের শা'বী (রঃ) বলেনঃ 'যদি এমনই নিরুপায় অবস্থা হয় যাতে মৃতদেহ ভক্ষণ হালাল হয়ে থাকে তবে অবশ্যই খাবে (ইয়াতিমের মাল) কিন্তু পরে তা

পরিশোধ করতে হবে।' হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (রঃ) এবং হযরত রাবীআ' (রঃ) হতে এর তাফসীর নিম্নরূপ বর্ণিত আছে–'যদি ইয়াতিম দরিদ্র হয় তবে তার অভিভাবক তাকে তার প্রয়োজন অনুপাতে প্রদান করবে এবং তার অভিভাবক কিছুই পাবে না।' রচনায় কিন্তু এ অর্থ ঠিকভাবে বসে না। কিন্তু পূর্বে রয়েছে যে, যে ধনী হবে সে বিরত থাকবে। অর্থাৎ যে অভিভাবক ধনবান হবে সে ইয়াতিমের মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। তাহলে এখানেও এ ভাবার্থই হবে যে, 'যে অভিভাবক দরিদ্র হবে' এ অর্থ নয়। অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

অর্থাৎ 'তোমরা পিতৃহীনের মালের নিকটও যেওনা, কিন্তু শুদ্ধকরণের নিমিত্ত যেতে পার, অতঃপর যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় তবে প্রয়োজনানুপাতে সংগতভাবে ওর মধ্য হতে খাও।' (১৭ঃ ৩৪)

এরপর অভিভাবকদেরকে বলা হচ্ছে–যখন তারা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যাবে এবং তোমরা তাদের মধ্যে বিবেচনা জ্ঞান লক্ষ্য করবে তখন সাক্ষী রেখে তাদের মাল তাদেরকে সমর্পণ করবে, যেন অস্বীকার করার সুযোগই না আসে। প্রকৃতপক্ষে সত্য সাক্ষী, পূর্ণ রক্ষক এবং সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই রয়েছেন, ইয়াতিমের মালের ব্যাপারে অভিভাবকের নিয়ত কি ছিল তা তিনি খুব ভালই জানেন।

অভিভাবক নিজেই হয়তো বা ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করেছে, ধ্বংস করেছে এবং মিথ্যা হিসেব লিখে রেখেছে, কিংবা হয়তো সৎ নিয়তের অধিকারী অভিভাবক ইয়াতিমের মাল পুরোপুরি রক্ষা করেছে এবং সঠিক হিসেব রেখেছে, এসব সংবাদ সেই সবজান্তা এবং মহান রক্ষক আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা রয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ যার (রাঃ)-কে বলেনঃ 'হে আবূ যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখছি এবং আমি নিজের জন্যে যা পছন্দ করি তোমার জন্যে তা পছন্দ করি। সাবধান! কখনই তুমি দু' ব্যক্তিরও নেতা বা আমীর নির্বাচিত হয়ো না এবং কখনও কোন ইয়াতিমের মালের অভিভাবক নিযুক্ত হয়ো না।'

৭- لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

৭। পুরুষদের জন্যে পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যেও পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে– অল্প বা অধিক নির্দিষ্ট পরিমাণ।

৮- وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

৮। আর যখন তা বন্টনের সময়ে স্বজনগণ, পিতৃহীনগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয়, তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল।

৯- وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

৯। আর যারা নিজেদের পশ্চাতে নিজেদের অসমর্থ সন্তানদেরকে ছেড়ে যাবে তাদের উপর যে ভীতি আসবে, তজ্জন্যে তাদের শংকিত হওয়া উচিত; সুতরাং তাদের আল্লাহকে ভয় করা ও সদ্ভাবে কথা বলা আবশ্যক।

১০- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

১০। যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে।

আরবের মুশরিকরদের প্রথা ছিল এই যে, কেউ মারা গেলে তার বড় সন্তানেরা তার সমস্ত মাল পেয়ে যেতো। তার ছোট সন্তানেরা ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যেতো। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবারই জন্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মীয়তাই হোক বা বিবাহ বন্ধনের কারণেই হোক বা আযাদী সম্পর্কীয় কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই পাবে– অংশ কমই হোক আর বেশীই হোক।

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে কাজ্জাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার দুটি ছেলে আছে। তাদের পিতা মারা গেছে এবং তাদের নিকট কিছুই নেই।' এ হাদীসটি অন্য শব্দে উত্তরাধিকারের অন্য দু'টি আয়াতের তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ্ অতিসত্বরই আসবে। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে–'যখন কোন মৃত ব্যক্তির মীরাস বন্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পড়ে যার কোন অংশ নেই এবং ইয়াতিম ও মিসকীনেরাও এসে যায় তবে তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর।'

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তো এটা ওয়াজিব ছিল এবং কারও কারও মতে এটা মুসতাহাব ছিল, আর এখনও এ হুকুম বাকী আছে কি না সে বিষয়ে দু'টি উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এ হুকুম এখনও বাকী আছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবূ মূসা (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ), হযরত আবুল আলিয়া (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ) , হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত ইবনে সীরীন (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হযরত মাকহূল (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), হযরত আতা' ইবনে আবি রিবাহ্ (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ) এবং হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআম্মারও (রঃ) একথাই বলেছেন। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাড়া এসব পণ্ডিত এ হুকুমকে ওয়াজিব বলেছেন।

হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) এক অসিয়তের অভিভাবকত্ব করেন। তিনি একটি ছাগী যবেহ করেন এবং ঐ তিন প্রকারের লোককে ডেকে ভোজন করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'এ আয়াতটি না থাকলে এটাও আমার মালই ছিল।' হযরত উরওয়া (রাঃ) হযরত মুসআব (রাঃ)-এর মাল বন্টনের সময়েও এটা প্রদান করেন। হযরত যুহরীরও (রঃ) উক্তি এই যে, এ আয়াতটি

'মুহকাম'– 'মানসুখ' নয়। একটি বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা অসিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ)-এর ইন্তিকালের পর যখন তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ তাঁর পিতার মীরাস বন্টন করেন তখন তিনি পরিবারের সকল মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রদান করেন এবং এ আয়াতটিই পাঠ করেন। আর সে সময় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশাও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটা জানতে পেরে বলেনঃ 'তিনি ঠিক করেননি'। এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এটা তখনই কার্যকরী হবে যখন মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে যাবে।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি রহিতই হয়ে গেছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি রহিত এবং একে রহিতকারী হচ্ছে يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ -এ আয়াতটি। অংশ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে এ নির্দেশ ছিল। অতঃপর হকদারকে যখন আল্লাহ্ পাক হক পৌঁছিয়ে দেন তখন সাদকা শুধু ওটাই থাকে যা মৃত ব্যক্তি বলে যায়। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবও (রঃ) এটাই বলেন যে, যদি ঐ লোকদের জন্যে অসিয়ত থাকে তবে সেটা অন্য কথা নচেৎ এ আয়াতটি মানসুখই বটে।

জমহূর ও ইমাম চতুষ্টয়ের এটাই মাযহাব। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এখানে এক বিস্ময়কর উক্তি করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও কয়েকবারের লিখার সার কথা হচ্ছে নিম্নরূপঃ 'অসিয়তের মাল বন্টনের সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন এসে গেলে তাদেরকেও দাও এবং তথায় আগত মিসকীনদের সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা বল ও উত্তর প্রদান কর'। কিন্তু এটা বিবেচ্য বিষয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এখানে বন্টনের অর্থ হচ্ছে মীরাসের বন্টন। সুতরাং এ উক্তিটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তির বিপরীত। এ আয়াতের সঠিক ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সময় যদি এসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয়ে যায় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দিও না। তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শূন্য হস্তে ফিরিয়ে দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ পছন্দ করেন না। সুতরাং আল্লাহর পথে সাদকা হিসেবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর যেন তারা খুশী হয়ে যায়।'

যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাকের ঘোষণা রয়েছেঃ 'তোমরা তাঁর ফল হতে খাও যখন তিনি ফল দান করেন এবং শস্য কর্তনের দিন তাঁর হক আদায় কর।' ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ও দরিদ্র লোকদের ভয়ে যারা তাদেরকে না জানিয়ে গোপনে ক্ষেত্রের ফসল কেটে নেয় এবং গাছের ফল নামিয়ে থাকে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিন্দে করেছেন। যেমন সূরা-ই-নূন-এ রয়েছে যে, এক বাগানের মালিকের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা দরিদ্র ও মিসকীনদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে একদা রাত্রিকালে অতি সন্তর্পণে বাগানের ফল নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে রওনা হয়। তাদের পৌঁছার পূর্বেই তথায় আল্লাহ তা'আলার শাস্তি নেমে আসে এবং সমস্ত বাগান পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। অন্যের হক নষ্টকারীদের পরিণতি এরূপই হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, যে মালে সাদকা মিলিত হয় অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করে না, তার মাল সে কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—'যারা নিজেদের পশ্চাতে নিজেদের অসমর্থ সন্তানদেরকে ছেড়ে যাবে তাদের উপর যে ভীতি আসবে তজ্জন্যে তাদের শংকিত হওয়া উচিত।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যাচ্ছে এবং সেই অসিয়তে তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি হচ্ছে এমতাবস্থায় যে তা শ্রবণ করছে তার আল্লাহকে ভয় করতঃ ঐ অসিয়তকারীকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করা উচিত এবং তার কর্তব্য এই যে, সে যেন ঐ অসিয়তকারীর মঙ্গল কামনা করে যেমন সে নিজের উত্তরাধিকারীদের মঙ্গল কামনা করে থাকে, যখন তাদের ক্ষতির ও ধ্বংসের আশংকা থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে যান। সে সময় হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বহু মাল রয়েছে এবং আমার একটি মাত্র কন্যা আছে। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ মাল আল্লাহর পথে দান করে দেই। আপনি আমাকে এর অনুমতি দিচ্ছেন কি'? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'আচ্ছা, অর্ধেকের অনুমতি আছে কি?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'না।' তিনি বলেনঃ 'তাহলে এক তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি যদি তোমার পিছনে তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাও তবে এটা ওটা হতে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে

দরিদ্ররূপে ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পেতে বেড়াবে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মানুষ যদি এক তৃতীয়াংশেরও কম অর্থাৎ এক চতুর্থাংশের অসিয়ত করে তবে ওটাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক তৃতীয়াংশকেও বেশী বলেছেন।

ধর্মশাস্ত্রবিদগণ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি ধনী হয় তবে তো এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা মুসতাহাব। আর যদি উত্তরাধিকারী দরিদ্র হয় তবে তার চেয়ে কমের অসিয়ত করাই মুসতাহাব। এ আয়াতের দ্বিতীয় ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছেঃ 'তোমরা ইয়াতিমদের প্রতি এরূপই খেয়াল রাখ যেমন তুমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার ছোট সন্তানদের প্রতি অন্য লোকদের খেয়াল রাখার কামনা কর। তুমি যেমন চাও না যে, তাদের মাল অন্যেরা অন্যায়ভাবে খেয়ে নিক এবং তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দরিদ্র থেকে যাক, তদ্রূপ তুমিও অন্যদের সন্তানগণের মাল খেয়ো না।' এ ভাবার্থও খুব উত্তম বটে। এ কারণেই এর পরেই পিতৃহীনদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের শাস্তির কথা বলা হয় যে, এ লোকগুলো নিজেদের পেটে অগ্নি ভক্ষণ করছে এবং তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সাতটি এমন পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাকো যা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।' তিনি জিজ্ঞাসিত হনঃ পাপগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ (১) 'আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন, (২) যাদু, (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা, (৪) সুদ ভক্ষণ, (৫) পিতৃহীনদের মাল ভক্ষণ, (৬) জিহাদ হতে মুখ ফিরানো এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মুসলিম নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া।'

সুনান-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মিরাজের রাত্রের ঘটনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ওষ্ঠ নীচে ঝুলতে রয়েছে এবং ফেরেশ্তাগণ তাদেরকে হেঁচড়িয়ে টেনে তাদের মুখ খুলে দিচ্ছেন। অতঃপর জাহান্নামের গরমপাথর তাদের মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন যা তাদের মুখের ভেতর দিয়ে ডুকে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তারা ভীষণভাবে চীৎকার করছে। আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করিঃ 'এরা কারা?' তিনি বলেনঃ 'এরা ইয়াতিমদের মাল ভক্ষণকারী যারা তাদের পেটের ভেতর আগুন ভরতে রয়েছে। অতিসত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ 'পিতৃহীনদের মাল ভক্ষণকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার কবর হতে এমনভাবে উঠবে যে, তার মুখ দিয়ে, চক্ষু দিয়ে, নাক দিয়ে এবং কান দিয়ে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে! প্রত্যেক ব্যক্তি দেখেই চিনে নেবে যে, সে কোন পিতৃহীনের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে।' তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর একটি মারফূ' হাদীসেও এ বিষয়েরই কাছাকাছি বর্ণিত আছে। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি যে, তোমরা ঐ দু' দুর্বলের মাল পৌঁছিয়ে দাও, স্ত্রীদের মাল এবং পিতৃহীনদের মাল। তোমরা তাদের মাল হতে বেঁচে থাকো।"

সূরা-ই-বাকারায় এটা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন যাঁদের কাছে পিতৃহীনেরা লালিত পালিত হচ্ছিল তাঁরা তাদের আহার্য এবং পানীয় পর্যন্ত পৃথক করে দেন। তখন অবস্থা প্রায় এই দাঁড়ালো যে, যদি ঐ পিতৃহীনদের খানা পানির কোন কিছু বেঁচে যেতো তখন হয় তারা নিজেরাই ঐ বাসী জিনিস খেয়ে নিতো না হয় তা পচে নষ্ট হয়ে যেতো। বাড়ীর লোকেরা কেউ তাতে হাতও লাগাতো না। এটা উভয় দিক দিয়েই অপছন্দনীয় হলো। নবী (সঃ)-এর সামনেও এটা আলোচিত হলো। তখনঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى (২ঃ ২২০)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। এর ভাবার্থ এই যে, যে কাজে তোমরা পিতৃহীনদের মঙ্গল বুঝতে পারো তাই কর। ফলে এর পরে খানা-পিনা এক সাথেই হতে থাকে।

১১। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের জন্যে দু' কন্যার অংশের তুল্য; আর যদি শুধু কন্যাগণ দু' জনের অধিক হয়, তবে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে সে অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে এবং যদি মৃত ব্যক্তির কোন

١١- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَهٗۤ اِخۡوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِىۡ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمۡ وَاَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُوۡنَ اَيُّهُمۡ اَقۡرَبُ لَـكُمۡ نَفۡعًا ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ○

সন্তান থাকে, তবে তার পিতা-মাতার জন্যে অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকেরই জন্যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মাতার জন্যে হবে এক তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা থাকে, তবে সে যা নির্দেশ করে গেছে–সেই নির্দেশ ও ঋণ অন্তে তার জননীর জন্যে এক ষষ্ঠাংশ, তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপরকারী তা তোমরা অবগত নও, এটাই আল্লাহর নির্দেশ; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

এ আয়াতটি, এর পরবর্তী আয়াতটি এবং সূরার শেষের আয়াতটি ইলমে ফারায়েযের আয়াত। এ পূর্ণ ইলমের দলীলরূপে এ আয়াতগুলোকে এবং হাদীসগুলোকে দলীলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, হাদীসগুলো যেন এ আয়াতগুলোরই তাফসীর ও ব্যাখ্যা। এখানে আমরা এ আয়াতটিরই তাফসীর লিখছি। বাকী মীরাসের যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং ওতে যে দলীলসমূহের অনুধাবনে কিছু মতভেদ আছে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে আহকামের পুস্তকসমূহ–তাফসীর নয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহায্য করুন! ফারায়েয বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। এ আয়াতসমূহে যে নির্ধারিত অংশসমূহের বর্ণনা রয়েছে সেগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সুনান-ই-আবি দাঊদ ও সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে যে, 'ইলম' প্রকৃতপক্ষে তিনটি। এছাড়া সবই অতিরিক্ত। প্রথম হচ্ছে কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ যা দৃঢ় এবং যার আহকাম বাকী রয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত অর্থাৎ হাদীসসমূহ যা প্রমাণিত। তৃতীয় হচ্ছে 'ফারিযা-ই-আদেলা' অর্থাৎ উত্তরাধিকারের জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ যা কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। সুনান-ই-ইবনে মাজার দ্বিতীয় দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা ফারায়েয শিক্ষা কর এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দান কর, এটা হচ্ছে অর্ধেক ইল্‌ম। মানুষ এটা ভুলে যায় এবং এটাই প্রথম জিনিস যা আমার উম্মতের নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে।' হযরত ইবনে উইয়াইনা (রঃ) বলেনঃ 'একে অর্ধেক ইল্‌ম বলার কারণ এই যে, প্রায় সমস্ত মানুষকেই এর সম্মুখীন হতে হয়।'

সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের তাফসীরে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আমি রুগ্ন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবূ বকর (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। বানূ সালমার মহল্লায় তাঁরা পদব্রজে আগমন করেন। আমি সে সময় অজ্ঞান ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পানি চেয়ে নিয়ে অযু করেন। অতঃপর আমার উপর অযুর পানি ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তখন বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার মাল কিভাবে বন্টন করবো? সে সময় এ পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।' সহীহ মুসলিম, সুনান-ই-নাসাঈ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে।

সুনান-ই-আবি দাঊদ, জামেউত তিরমিযী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, মুসনাদ-ই-আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ ইবনে রাবী'র সহধর্মিণী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ দু'টি হযরত সা'দের (রাঃ) কন্যা, এদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক ছিলেন। ঐ যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন। এদের চাচা তাঁর সমস্ত মাল নিয়ে নেয়। এদের জন্যে কিছুই রাখেনি। এটা স্পষ্ট কথা যে, মাল ছাড়া এদের বিয়ে হতে পারে না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'এর ফায়সালা স্বয়ং আল্লাহ পাকই করবেন।' সে সময় উত্তরাধিকারের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এদের চাচার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেনঃ 'দুই তৃতীয়াংশ (তোমার ভাইয়ের সম্পত্তির) এ মেয়েগুলোকে দিয়ে দাও, এক অষ্টমাংশ এদের মাকে প্রদান কর এবং বাকি তোমার অংশ।' বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, হযরত জাবের (রাঃ)-এর প্রশ্নের উপর এ সূরাটির শেষ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকবে যেমন অতিসত্বরই ইনশাআল্লাহ আসছে। কেননা, তাঁর উত্তরাধিকারিণী তো শুধুমাত্র তাঁর বোনেরা ছিল। তাঁর মেয়ে তো ছিলই না। তিনি তো [১] كَلَالَةٌ ছিলেন। আর এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অর্থাৎ হযরত সাদ ইবনে রাবী' (রাঃ)-এর উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এর বর্ণনাকারীও হচ্ছেন স্বয়ং হযরত জাবির (রাঃ)। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটিকেও এ আয়াতের তাফসীরেই এনেছেন। এ জন্যে আমরাও তাঁর অনুসরণ করেছি।

আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে– 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা তাদের সমস্ত মাল ছেলেদেরই শুধু প্রদান করতো এবং মেয়েদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের জন্যে অংশ নির্ধারণ করেন। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন। কেননা, যতগুলো কর্তব্য পালন পুরুষদের দায়িত্বে রয়েছে ততটা স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই। যেমন পরিবারের খাওয়া পরার জন্যে আয় ব্যয়ের দায়িত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে হয়। এ জন্যেই তাদের প্রয়োজন অনুপাতে তাদেরকে স্ত্রীদের দ্বিগুণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা হতেও বহু গুণে দয়ালু ও স্নেহশীল। পিতা-মাতাকে তিনি তাদের সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা করুণাময় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবের উপর যত বেশী দয়াবান তত দয়াবান বাপ মা তাদের সন্তানদের প্রতি নয়। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। মা তার শিশুর খোঁজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে শিশুকেই পায় তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে বলেনঃ 'আচ্ছা বলতো, অধিকার থাকা

---

১. যে ব্যক্তির পিতা ও পুত্র থাকে না তাকে كَلَالَةٌ বলে।

সত্ত্বেও কি এ স্ত্রী লোকটি তার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কখনই না!' তিনি তখন বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও বেশী দয়ালু।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে অংশীদার ও হকদার শুধু পুত্রই ছিল। পিতা-মাতা অসিয়ত হিসেবে কিছু পেয়ে যেতো মাত্র। আল্লাহ তা'আলা এটা রহিত করে দেন এবং পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ পিতা-মাতাকে এক ষষ্ঠাংশ ও এক তৃতীয়াংশও বটে, স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ, স্বামীকে এক চতুর্থাংশ ও অর্ধেক দেয়ার নির্দেশ দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন যে, উত্তরাধিকারের আহকাম অবতীর্ণ হলে কতগুলো লোক এটা অপছন্দ করে ও বলেঃ 'স্ত্রীকে দেয়া হবে এক চতুর্থাংশ ও এক অষ্টমাংশ, মেয়েকে দেয়া হবে অর্ধাংশ এবং ছোট ছোট ছেলেদের জন্যেও অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ এদের মধ্যে কেউই না যুদ্ধের জন্যে বের হতে পারে, না গনীমতের মাল আনতে পারে। সুতরাং তোমরা এ আয়াত হতে নীরব থাক তাহলে সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভুলে যাবেন, কিংবা আমাদের বলার কারণে তিনি এ আহকাম পরিবর্তন করবেন।'

অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি মেয়েকে তার পিতার পরিত্যক্ত মাল হতে অর্ধেক দিচ্ছেন অথচ না সে ঘোড়ার উপর বসার যোগ্যতা রাখে, না সে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। আপনি শিশুকেও উত্তরাধিকারীরূপে সাব্যস্ত করেছেন, তার দ্বারা কি উপকার পাওয়া যেতে পারে?' এ লোকগুলো অজ্ঞতার যুগে এরূপ করতো যে, মীরাস শুধু তাদেরকেই প্রদান করতো যারা যুদ্ধের যোগ্য ছিল। তারা সবচেয়ে বড় ছেলেকে উত্তরাধিকার করতো।

فَوْقَ শব্দটিকে কেউ কেউ অতিরিক্ত বলে থাকেন। যেমন– فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ (৮ঃ ১২)-এর মধ্যে فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত। কিন্তু আমরা এটাকে স্বীকার করি না। এ আয়াতেও না, ঐ আয়াতেও না। কেননা, কুরআন কারীমের মধ্যে এমন কোন অতিরিক্ত জিনিস নেই যা বিনা উপকারে আনা হয়েছে। আল্লাহ পাকের কালামে এরূপ হওয়া অসম্ভব। আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি এরূপই হতো তবে ওর পরে فَلَهُنَّ আসতো না, বরং فَلَهُمَا আসতো। হ্যাঁ,

এটা দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, যদি মেয়ে দু'য়ের অধিক না হয়, অর্থাৎ শুধু দু'টোই হয় তাহলেও এটাই হুকুম অর্থাৎ তারাও দুই তৃতীয়াংশই পাবে। কেননা, দ্বিতীয় আয়াতে দু' বোনকে দুই তৃতীয়াংশ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যদি দু' বোন দুই তৃতীয়াংশ পায় তবে দু' মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ পাবে না কেন? তাদের জন্যে তো দুই তৃতীয়াংশ হওয়া আরও বাঞ্ছনীয়।

অন্য হাদীসে এসেছে যে, দু'টি মেয়েকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ দিয়েছেন। যেমন এ আয়াতের শান-ই-নযূলের বর্ণনায় হযরত সা'দের কন্যাদের ব্যাপারে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে এটাও এর দলীল যে, যদি পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা থাকে তবে সে অর্ধেক অংশ পেয়ে যাবে, সুতরাং যদি দু'টি কন্যা থাকার অবস্থাতেও অর্ধেক অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া উদ্দেশ্যে হতো তবে এখানে তা বর্ণনা করা হতো। এককে যখন পৃথক করা হয়েছে তখন জানা যাচ্ছে যে, দুয়ের বেশী থাকা অবস্থায় যে হুকুম দু'জন থাকা অবস্থাও সেই হুকুম।

অতঃপর বাপ-মায়ের অংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাপ-মায়ের অবস্থা বিভিন্নরূপ। প্রথম অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক মেয়ে থাকে এবং পিতা-মাতাও থাকে তবে পিতা-মাতা উভয়েই এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ পাবে পিতা এবং এক ষষ্ঠাংশ পাবে মাতা। আর যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র কন্যা থাকে তবে অর্ধেক মাল তো মেয়েটি পাবে এবং এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে ও এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে, আরও যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকছে ওটাও বাপ[১] 'আসাবা' হিসেবে পেয়ে যাবে। তাহলে এখানে পিতা তার নির্ধারিত এক ষষ্ঠাংশ পেয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে 'আসাবা' হিসেবেও অবশিষ্ট অংশ পেয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা। এ অবস্থায় মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত মাল পিতা 'আসাবা' হিসেবে পেয়ে যাবে। তাহলে পিতা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ মায়ের তুলনায় বাপ দ্বিগুণ পাবে। এখন যদি মৃতা স্ত্রীর স্বামীও বিদ্যমান থাকে কিংবা মৃত স্বামীর স্ত্রী থাকে, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নেই, বরং আছে শুধু পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রী, তবে এ ব্যাপারে তো আলেমগণ একমত যে, এ অবস্থায়

১. 'যে উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারিত নেই অথচ অংশ পেয়ে থাকে, তাকে 'আসাবা' বলে। যেমন পুত্র ইত্যাদি কোন কোন সময় উত্তরাধিকারী ও 'আসাবা' হয়ে থাকে।

স্বামী পাবে অর্ধেক এবং স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ। কিন্তু আলেমদের এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এ অবস্থায় এর পরে মা কত পাবে? এতে তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, স্বামী বা স্ত্রীর (অংশ) নেয়ার পর যা বাকী থাকবে মা তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। হয় স্ত্রী স্বামী ছেড়ে যাক বা স্বামী স্ত্রী ছেড়ে যাক। কেননা, অবশিষ্ট মাল তাদের ব্যাপারে যেন পুরো মাল। আর মায়ের অংশ হচ্ছে বাপের অর্ধেক। সুতরাং অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ মা নিয়ে নেবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বাপ প্রাপ্ত হবে।

হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর এটাই ফায়সালা। এটাই হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবিতেরও (রাঃ) উক্তি। সাতজন ফকীহ, ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহূরেরও এটাই ফতওয়া। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ দু' অবস্থায়ই মা সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে। কেননা, আয়াতটি সাধারণ, স্বামী-স্ত্রী থাক আর নাই থাক, সাধারণভাবে ছেলেমেয়ে না থাকার সময় মাকে সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতেও এভাবেই বর্ণিত আছে। হযরত শুরায়েহ্ (রাঃ) এবং হযরত দাঊদ যাহেরীও (রঃ) এ কথাই বলেন। হযরত আবুল হাসান ইবনে লাব্বান বাসারীও (রঃ) স্বীয় 'ইলম-ই-ফারায়েয সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল 'ঈজাযে' এ উক্তিকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এ উক্তিটি বিবেচনা সাপেক্ষ, এমন কি দুর্বলও বটে। কেননা, আয়াতে মায়ের এ অংশ সেই সময় নির্ধারণ করেছে যখন সম্পূর্ণ মালের উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা হয়। আর যখন স্বামী বা স্ত্রী রয়েছে তখন তারা তাদের নির্ধারিত অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে মা তারই এক তৃতীয়াংশ পাবে। তৃতীয় উক্তি এই যে, মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় এবং তার স্ত্রী বিদ্যমান থাকে তবে শুধু এ অবস্থাতে মা সম্পূর্ণ মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে। কেননা, স্ত্রী সমস্ত মালের এক চতুর্থাংশ পাবে। যদি সমস্ত মালকে বার ভাগ করা হয় তবে তিন ভাগ নেবে স্ত্রী, চার ভাগ নেবে মা এবং অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ পাবে পিতা।

কিন্তু যদি স্ত্রী মারা যায় এবং তার স্বামী বিদ্যমান থাকে তবে মা অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে। ঐ অবস্থাতেও যদি মাকে সমস্ত মালের এক তৃতীয়াংশ দেয়া হয় তবে সে বাপ অপেক্ষাও বেশী পেয়ে যাবে। যেমন মালের

ছয় ভাগ করা হলো, তিন ভাগ তো স্বামী পেয়ে গেল, মা পেলো দু'ভাগ এবং বাপ পাচ্ছে মাত্র এক ভাগ, যা মা অপেক্ষাও কম। সুতরাং এ অবস্থায় ছয় ভাগের মধ্যে তিন ভাগ পাবে স্বামী এবং বাকী তিন ভাগের মধ্যে মাকে দেয়া হবে এক ভাগ ও বাপকে দেয়া হবে দু'ভাগ। ইমাম ইবনে সীরীন (রঃ)-এর এটাই উক্তি। এরূপই বুঝতে হবে যে, এ উক্তিটি দু'টি উক্তির সংমিশ্রণ। এটাও দুর্বল। প্রথম উক্তিটিই সঠিক।

বাপ-মায়ের তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা মৃত ব্যক্তির ভাইদের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হয়, তারা সহোদর ভাইই হোক অথবা বৈপিত্রেয় ভাইই হোক। এ অবস্থায় বাপের বিদ্যমানতায় ভাইগুলো কিছুই পাবে না, তবে তারা মাকে এক তৃতীয়াংশ হতে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে দেবে। আর যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারীই না থাকে এবং মায়ের সাথে শুধু বাপ থাকে তবে বাকী মাল সমস্তই বাপ পেয়ে যাবে। জমহূরের এটাই উক্তি। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা হযরত উসমান (রাঃ)-কে বলেনঃ 'দু' ভাই মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরিয়ে এক ষষ্ঠাংশে নিয়ে যায় না। কুরআন কারীমের মধ্যে إِخْوَةٌ শব্দ এসেছে এবং এটা বহু বচন। ভাবার্থ দু' ভাই হলে إِخْوَانِ শব্দ অর্থাৎ দ্বিবচন ব্যবহার করা হতো।' তৃতীয় খলিফা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ 'এটা বহু পূর্ব হতে চলে আসছে এবং এ 'মাসআলা'টি এভাবেই চতুর্দিকে পৌঁছে গেছে। সমস্ত মানুষ এর উপরই আমল করছে। সুতরাং আমি এটা পরিবর্তন করতে পারি না।' প্রথমতঃ এ বর্ণনাটি তো প্রমাণিতই নয়। এর বর্ণনাকারী শা'বার উপর ইমাম মালিক (রঃ)-এর মিথ্যা প্রতিপাদন বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এ কথাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর না হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তাঁর বিশিষ্ট সহচরগণ এবং উচ্চ পর্যায়ের ছাত্রগণও এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

হযরত যায়েদ (রঃ) বলেন যে, দুইকেও إِخْوَةٌ বলা হয়। আমি এ মাসআলাটি পৃথক পুস্তিকায় পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। হযরত সাঈদ ইবনে কাতাদা' (রঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। হ্যাঁ, তবে যদি মৃত ব্যক্তির একটিমাত্র ভাই থাকে তবে সে মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরাতে পারবে না। উলামা-ই-কিরামের ঘোষণা মতে এতে নিপুণতা রয়েছে এই যে, ভাইদের বিয়ে, খাওয়া, পরা ইত্যাদির খরচ বহন পিতারই দায়িত্বে রয়েছে, মাতার দায়িত্বে নেই। সুতরাং পিতাকে অধিক দেয়ার মধ্যেই হিকমত নিহিত রয়েছে। এটা উত্তম উক্তি। কিন্তু

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে যে, ভাইয়েরা মায়ের যে এক ষষ্ঠাংশ কমিয়ে দিল তা পিতা পাবে না, বরং ওরাই পাবে। ঐ উক্তি খুবই বিরল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ উক্তি সমস্ত উম্মতের বিপরীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, كَلَالَةٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পিতা না থাকে।

এরপরে বলা হচ্ছে– 'অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর মীরাস বন্টিত হবে।' পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মনীষী এতে একমত যে, ঋণ অসিয়তের অগ্রবর্তী। আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি গভীর চিন্তা সহকারে লক্ষ্য করলে এটাই পরিলক্ষিত হবে। জামেউত্ তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেনঃ 'তোমরা কুরআন কারীমের অসিয়তের নির্দেশ পূর্বে এবং ঋণের হুকুম পরে পাঠ করে থাক। কিন্তু জেনে রেখো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিয়েছেন এবং পরে অসিয়ত জারী করেছেন। একই মাতাজাত ভ্রাতাগণ পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে, বৈমাত্রেয় ভাইদের উত্তরাধিকারী হবে না। মানুষ তার সহোদর ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হবে, কিন্তু ঐ ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হবে না যার মা অন্য। এ হাদীসটি শুধু হযরত হারিস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং তাঁর এ হাদীস কোন কোন মুহাদ্দিস খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তিনি ফারায়েযের হাফিজ ছিলেন। এ বিদ্যায় তাঁর বিশেষ চিত্তাকর্ষতা ও দক্ষতা ছিল। অংকেও তাঁর বেশ পাণ্ডিত্য ছিল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– 'আমি পিতা ও পুত্রগণকে প্রকৃত মীরাসে নিজ নিজ নির্ধারিত অংশ গ্রহণকারী করেছি এবং অজ্ঞতা যুগের প্রথা দূরীভূত করেছি। বরং ইসলামেও প্রথমে মাল শুধুমাত্র সন্তানদেরকে দেয়ার নির্দেশ ছিল এবং বাপ মা শুধু অসিয়ত হিসেবে কিছু লাভ করতো, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকেও রহিত করে দিয়েছেন। এখন এ হুকুম হচ্ছে যে, পিতার দ্বারা তোমাদের বেশী উপকার সাধিত হবে কি পুত্রের দ্বারা হবে তা তোমাদের জানা নেই। উভয় হতেই উপকারের আশা রয়েছে। এদের একের অপর হতে বেশী উপকার লাভের নিশ্চয়তা নেই। পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশী উপকার লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে, আবার পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারাও বেশী উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।'

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন–'ঐ নিধারিত অংশ ও উত্তরাধিকারের এ আহকাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফরয করা হয়েছে। কোন আশায় বা ভয়ে এতে কম-বেশী করার কোন স্থান নেই। না কাউকে বঞ্চিত করা যাবে, না কাউকে বেশী দেয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞ। যে যার হকদার তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের স্থান তিনি খুব ভালই জানেন। তোমাদের লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর কোন কাজ ও কোন নির্দেশ নিপুণতা শূন্য নয়। সুতরাং তাঁর নির্দেশাবলী তোমাদের মেনে চলা উচিত।'

١٢- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

১২। আর তোমাদের পত্নীগণের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে তারা যা পরিত্যাগ করে যায় তোমাদের জন্য তার অর্ধাংশ, কিন্তু যদি তাদের সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে তারা যা অসিয়ত করেছে সেই অসিয়ত ও ঋণ অন্তে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ এবং যদি তোমাদের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে তোমরা যা পরিত্যাগ করে যাবে, তাদের জন্য তার এক চতুর্থাংশ, কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তবে তোমরা যা অসিয়ত করবে সেই অসিয়ত ও ঋণ অন্তে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তাদের জন্যে এক অষ্টমাংশ; যদি কোন মূল ও

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوٓا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

শাখা বিহীন পুরুষ বা স্ত্রী মারা যায় এবং তার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে, তবে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তবে কৃত অসিয়ত পূরণ করার পর অথবা ঋণের পর কারও অনিষ্ট না করে তারা তার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে; এটাই আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহিষ্ণু।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–'হে পুরুষ লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যাবে, যদি তাদের ছেলে মেয়ে থাকে তবে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে। এটা তাদের অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পরে হবে। শৃংখলা বিধান হচ্ছে এই যে, পূর্বে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তারপরে তাদের অসিয়ত পূরণ করতে হবে এবং পরে তাদের পরিত্যক্ত মাল বন্টিত হবে। এটা এমন একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় যার উপর উম্মতের সমস্ত আলেমের ইজমা রয়েছে। এ মাসআলায় পুত্রের হুকুমে পৌত্র রয়েছে। এমনকি তাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানও এ হুকুমেরই আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তাদের বিদ্যমানতায়ও স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের অংশের কথা বলছেন যে, তারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে বা এক অষ্টমাংশ পাবে। স্বামীর সন্তান না থাকলে চতুর্থাংশ পাবে এবং সন্তান থাকলে এক অষ্টমাংশ পাবে। এই এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশের মধ্যে মৃত স্বামীর সমস্ত স্ত্রীই জড়িত থাকবে। চারজন, তিনজন বা দু'জন হলে তাদের মধ্যে এই অংশ সমানভাবে বন্টিত হবে। আর যদি একজনই হয় তবে অংশ সে একাই পাবে। مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ -এর তাফসীর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। كَلَالَةً শব্দটিকে اِكْلِيْلُ শব্দ হতে বের করা হয়েছে اِكْلِيْلُ ঐ মুকুট ইত্যাদিকে বলা হয় যা মস্তককে চতুর্দিক হতে ঘিরে

নেয়। এখানে এর ভাবার্থ এই যে, তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে চার পাশের লোক। তার আসল ও ফরা' অর্থাৎ মূল ও শাখা নেই।

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে كَلاَلَةً শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ 'আমি আমার মতানুসারে উত্তর দিচ্ছি। যদি সেটা সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হবে। আর যদি ভুল হয় তবে শয়তানের পক্ষ থেকে হবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সঃ) এটা হতে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হবেন। كَلاَلَةً তাকেই বলে যার পিতা ও পুত্র থাকে না।' হযরত উমার ফারূক (রাঃ) খলীফা হলে তিনিও তাঁর অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন এবং বলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমি লজ্জাবোধ করি।' (তাফসীর-ই ইবনে জারীর ইত্যাদি)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হযরত উমার (রাঃ)-এর সর্বশেষ যুগ আমি পেয়েছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি-'কথা ওটাই যা আমি বলেছি। সঠিক কথা এই যে, كَلاَلَةً তাকেই বলা হয় যার পিতা ও পুত্র নেই'। হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত আশবাঈ (রাঃ), হযরত নাখঈ (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত জাবির ইবনে যায়েদও (রঃ) এ কথাই বলেন। মদীনাবাসী, কুফাবাসী এবং বসরাবাসীরও এটাই উক্তি। সাতজন ধর্মশাস্ত্রবিদ, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত জমহূর-ই-উলামাও এটাই বলেন। বহু মনীষী এর উপর ইজমা নকল করেছেন। একটি মারফূ' হাদীসেও এটাই এসেছে। ইবনে লাব্বান (রঃ) বলেনঃ 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, كَلاَلَةً তাকেই বলে যার সন্তান থাকে না।' কিন্তু প্রথমটিই সঠিক এবং খুব সম্ভব বর্ণনাকারী ভাবার্থই বুঝেনি।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে-তার ভাই অথবা বোন থাকে, অর্থাৎ মা পক্ষীয় ভাই বা বোন যেমন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী কয়েকজন মনীষীর কিরআত রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) প্রভৃতি (মহামানব) হতেও এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। আর যদি একাধিক থাকে তবে সবাই এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে। মাতাজাত ভ্রাতাগণ কয়েকটি কারণে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ হতে পৃথক। একটি এই যে, যারা তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিচ্ছে তাদেরও তারা উত্তরাধিকারী হবে। যেমন মা। দ্বিতীয় এই যে, তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী অর্থাৎ ভাই ও বোন সমান

সমান মীরাস পাবে। তৃতীয় এই যে, তারা শুধুমাত্র ঐ সময়েই উত্তরাধিকারী হবে যখন মৃত ব্যক্তি পিতা ও পুত্রহীন হবে। সুতরাং তারা পিতা ও পিতামহ এবং পুত্র ও পৌত্রের বিদ্যমানতায় উত্তরাধিকারী হবে না। চতুর্থ এই যে, তারা এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন অবস্থাতেই পায় না। তাদের সংখ্যা যতই বেশী হোক না কেন এবং পুরুষই হোক আর স্ত্রীই হোক।

হযরত উমার (রাঃ)-এর ফায়সালা মতে মাতাজাত ভ্রাতা ভগ্নী তাদের মীরাস পরস্পরের মধ্যে এভাবে বন্টন করবে যে, ভাই পাবে দ্বিগুণ এবং বোন পাবে একগুণ। হযরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) এ ফায়সালা করতে পারেন না যে পর্যন্ত না তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনে থাকবেন। আয়াতে তো এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, যদি একাধিক থাকে তবে তারা সবাই এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে। এমন অবস্থায় আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, যদি মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্বামী, মাতা বা পিতামহী এবং দু' মা পক্ষীয় ভাই ও একটি বা একাধিক বাপ ও মা পক্ষীয় ভাই থাকে তবে জমহূরের মতে এ অবস্থায় স্বামী অর্ধেক পাবে, মাতা বা পিতামহী পাবে এক ষষ্ঠাংশ, মা পক্ষীয় ভ্রাতাগণ পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং এতে মা ও বাপ উভয় পক্ষীয় ভ্রাতাগণও জড়িত থাকবে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-এর যুগে এরূপই একটি ঘটনা ঘটেছিল। তখন তিনি অর্ধেক মাল স্বামীকে প্রদান করেন এবং মা পক্ষীয় ভ্রাতাগণকে প্রদান করেন এক তৃতীয়াংশ। পরে মা ও বাপ উভয় পক্ষীয় ভ্রাতাগণ তাদের নিজেদের দাবীর কথা জানালে তিনি বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের মা পক্ষীয় ভাইদের সঙ্গেই অংশীদার রয়েছ। অন্যান্য বর্ণনায় হযরত উসমানেরও (রাঃ) এরূপ অংশীদার করে দেয়ার কথা বর্ণিত আছে। এরূপই একটি বর্ণনা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ), কাজী শুরাইহ (রঃ), মাসরূক (রঃ), তাউস (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ), সাওরী (রঃ) এবং শুরায়েক (রঃ)-এর এটাই উক্তি। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং ইমাম ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ্ও (রঃ) এ দিকেই গিয়েছেন।

তবে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এতে অংশীদার হওয়ার মত সমর্থন করতেন না। বরং তিনি ঐ অবস্থায় মা পক্ষীয় সন্তানদেরকে এক

তৃতীয়াংশ প্রদান করতেন এবং একই মা-বাপের সন্তানদেরকে কিছুই প্রদান করতেন না। কেননা এরা আসাবা। আর আসাবা তখনই পেয়ে থাকে যখন নির্দিষ্ট অংশ প্রাপকদের অংশ নেয়ার পর বেঁচে যায়। এমন কি হযরত অকী ইবনে জাররাহ (রঃ) বলেন যে, হযরত আলী (রাঃ) হতে এর বিপরীত করার কথা বর্ণিতই নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এবং আবূ মূসা আশ আরীরও (রাঃ) এটাই উক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। শা'বী (রঃ), ইবনে আবি লাইলা (রঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (রঃ), হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ), যুফার ইবনে হাযীল (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ), ইয়াহইয়া ইবনে আদম (রঃ), নাঈদ ইবনে হাম্মাদ (রঃ), আবূ সাউর (রঃ), দাঊদ ইবনে যাহেরীও (রঃ) ঐদিকেই গিয়েছেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'এই মীরাস বন্টন অসিয়ত পুরো করার পরে হতে হবে। অসিয়ত এমন হবে যে, যেন কোন অবিচার না হয়, কারও কোন ক্ষতি না হয়, কেউ অত্যাচারিত না হয়, কোন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার যেন মারা না যায় বা যেন কোন কম বেশী না হয়। এর বিপরীত অসিয়তকারী এবং এরূপ শরীয়ত বিরোধী অসিয়তের ব্যাপারে চেষ্টাকারী হচ্ছে আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণকারী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'অসিয়তের ব্যাপারে কারও কোন ক্ষতি সাধন করা কাবীরা গুনাহ। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিও এভাবেই বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তাঁর এ ঘোষণার পরে আয়াতের এ অংশটি পাঠ করার কথাও বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে সঠিক কথা এই যে, এটা মারফূ' হাদীস নয়, বরং মাওকুফ হাদীস। মৃত ব্যক্তি স্বীয় উত্তরাধিকারীর জন্যে কিছু চুক্তি করতে পারে কি-না এ ব্যাপারে ইমাম মহোদয়গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে এরূপ চুক্তি করা ঠিক নয়। কেননা, এতে অপবাদের সুযোগ রয়েছে।

হাদীস শরীফে বিশুদ্ধ সনদে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখন উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন অসিয়ত নেই।' ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আহমাদ

ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর প্রথম উক্তি এটাই ছিল। কিন্তু তাঁর শেষ উক্তি এই যে, চুক্তি করা ঠিক হবে। তাঊস (রঃ), আতা' (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এরও উক্তি এটাই। হযরত ইমাম বুখারীও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীর মধ্যে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এর প্রমাণ হিসেবে নিম্নরূপ একটি বর্ণনাও রয়েছেঃ 'হযরত রাফে' ইবনে খুযায়েজ (রাঃ) অসিয়ত করেন যে, ফাযারিয়্যাহ যে জিনিসের উপর স্বীয় দরজা বন্ধ রাখে তা যেন খোলা না হয়।' হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) বলেনঃ 'কোন কোন লোক বলেন যে, মৃত ব্যক্তির এ চুক্তি উত্তরাধিকারীগণের কুধারণার কারণেই বৈধ হয়। কিন্তু আমি বলি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো বলেছেনঃ 'তোমরা কুধারণা হতে বেঁচে থাক, কুধারণা সবেচেয়ে বড় মিথ্যা।' আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাদের আমানত তোমদের নিকট রয়েছে তাদের নিকট তোমরা তা পৌঁছিয়ে দাও। এখানে উত্তরাধিকারী ও অউত্তরাধিকারীকে বিশিষ্ট করা হয়নি। এটা স্মরণীয় বিষয় যে, এ মতবিরোধ ঐ সময় রয়েছে যখন এ চুক্তি প্রকৃতই সঠিক হবে এবং প্রকৃত কাজ অনুযায়ী হবে। যদি এ চুক্তি শুধুমাত্র ছল- চাতুরীর জন্য হয় এবং কোন কোন উত্তরাধিকারীকে বেশী দেয়া ও কাউকে কম দেয়ার জন্যে হয় তবে তা পুরো করা যে হারাম এ বিষয়ে সবাই একমত। এ আয়াতের স্পষ্ট শব্দগুলোও এর অবৈধতার ফতওয়া দিচ্ছে। এরপরে বলা হচ্ছে যে, এগুলো হচ্ছে সেই আল্লাহর নির্দেশ যিনি মহাজ্ঞানী ও সহিষ্ণু।

১৩। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ এবং যে কেউ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন- যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং এটাই বড় সফলতা।

١٣- تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

১৪। আর যে কেউ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্যে লাঞ্ছনাপ্রদ শাস্তি রয়েছে।

١٤- وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অবাধ্য হয় ও তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। এরূপ লোকদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। অর্থাৎ এসব অবশ্য করণীয় কাজ এবং এ পরিমাণ যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে তাদের আত্মীয়তার নৈকট্য এবং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যার জন্যে যে অংশ নির্দিষ্ট করেছেন এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা, তোমরা ঐগুলো ভেঙ্গে দিয়ো না বা অতিক্রম করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশাবলী মেনে নেয়, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কোন উত্তরাধিকারীকে কম বেশী দেয়ার চেষ্টা করে না, বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করে, আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারাই সফলকাম হবে এবং তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ পরিবর্তন করে দেয়, কোন ওয়ারিসের মীরাস কম বেশী করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে না, বরং তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ করে বা তাঁর বন্টনকে ভাল চক্ষে দেখে না কিংবা তাঁর আদেশকে ন্যায় মনে করে না, তারা চিরস্থায়ী অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'একটি লোক সত্তর বছর পর্যন্ত পুণ্যের কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসিয়তে সময় অন্যায় ও অবিচার করে, ফলে তার পরিণতি খারাপ কার্যের উপর হয়ে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে।'

অপরপক্ষে আর একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত অসৎ কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে স্বীয় অসিয়তে ন্যায় পন্থা অবলম্বন করে, ফলে তার পরিণতি ভাল কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে।' অতঃপর এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'তোমরা تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

হতে عَذَابٌ مُّهِينٌ পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ কর। সুনান-ই-আবি দাউদে بَابُ الْاَضْرَارِ فِى الْوَصِيَّةِ - এর মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'একজন পুরুষ লোক বা স্ত্রীলোক ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কার্যে লেগে থাকে, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় অসিয়তের ব্যাপারে কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ করে থাকে, তখন তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়'।

অতঃপর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। জামেউত্ তিরমিযী ও সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেন। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

১৫। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জতার কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ না করেন।

١٥- وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

১৬। আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দু' ব্যক্তি এ নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর; কিন্তু তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সদাচারী হয়, তবে তদুভয় হতে প্রত্যাবর্তিত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাওবা গ্রহণকারী, করুণাময়।

١٦- وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সত্য সাক্ষ্য দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশ্লীলতা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে যেন বাড়ীর বাইরে যেতে দেয়া না হয় বরং জন্মের মত বাড়ীতেই যেন আটক রাখা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক বলেন–হ্যাঁ তবে এটা অন্য কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন পূর্বের ঐ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা-ই-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের জন্যে এ নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা-ই-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশ চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হয়।

হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত আতা' খুরাসানী (রঃ), হযরত আবূ সালেহ (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ), এবং হযরত যহ্হাকেরও (রঃ) এটাই উক্তি যে, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে সবাই একমত। হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর যখন অহী অবতীর্ণ হতো তখন তা তাঁর উপর বড় ক্রিয়াশীল হতো এবং তিনি কষ্ট অনুভব করতেন ও তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেতো। একদা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ণ করেন। অহীর সময়কালীন অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বলেনঃ 'তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে পথ নির্দেশ করেছেন।

যদি বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করে তবে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে, অতঃপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে এবং এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। (সহীহ মুসলিম ইত্যাদি) জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যেও এ হাদীসটি শব্দের পরিবর্তনের সাথে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এ রকমই সুনান-ই-আবি দাউদেও রয়েছে।

ইবনে মিরদুওয়াই-এর গারীব হাদীসে অবিবাহিত ও বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীর এ নির্দেশের সাথে সাথে এও রয়েছে যে, যদি তারা বুড়ো বুড়ী হয় তবে

তাদেরকে রজম করতে হবে। কিন্তু এ হাদীসটি গারীব। তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সূরা-ই-নিসা অবতীর্ণ হওয়ার পর আবদ্ধ রাখার হুকুম অবিশষ্ট নেই।' এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, বিবাহিত ও বিবাহিতা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে চাবুকও মারতে হবে এবং রজমও করতে হবে। আর জমহূরের মতে চাবুক মারতে হবে না, শুধু রজম করতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মায়েয (রাঃ)-কে এবং গামেদিয়্যাহ নারীকে রজম করেছিলেন কিন্তু চাবুক মারেননি। অনুরূপভাবে রাসূলল্লাহ (সঃ) দু'জন ইয়াহূদীকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং রজমের পূর্বে তাদেরকে চাবুক মারার নির্দেশ দেননি। সুতরাং জমহূরের এ উক্তি অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে, রজমের পূর্বে চাবুক মারার নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে, সুতরাং এটা জরুরী নয়।

অতঃপর বলা হচ্ছে—যদি দু'জন পুরুষ পরস্পর এ নির্লজ্জতার কাজ করে তবে তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অর্থাৎ তাদেরকে তিরস্কার কর, অপদস্থ কর, জুতো মার ইত্যাদি। চাবুক মারা ও রজব করার নির্দেশ দ্বারা এ নির্দেশও রহিত হয়ে যায়। হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত আতা' (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থও হচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রী। হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঐ নব যুবকগণ যারা বিবাহিত নয়।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি 'লাওয়াতাতের' ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেননঃ 'কাউকে তোমরা হযরত লুত (আঃ)-এর কওমের কাজ করতে দেখলে তাকে এবং যার উপরে সে সেই কাজ করেছে তাকেও হত্যা করে ফেল।'

এরপর বলা হচ্ছে— 'যদি তারা উভয়ে এ কাজ হতে বিরত থাকে এবং সংশোধিত হয় তবে তোমরা তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো না। কেননা, পাপ হতে প্রত্যাবর্তনকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতই।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—'আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, করুণাময়।' সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যভিচার করে তখন যেন সে তাকে চাবুক দ্বারা শাস্তি প্রদান করে এবং তার উপর আর যেন কোন শাসন গর্জন না করে।' অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের পর মনিব যেন তার দাসীকে আর কোন দোষারোপ না করে। কেননা, শাস্তি প্রদানই হচ্ছে পাপ মোচনের উপায়।

১৭। তাওবা কবূল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর রয়েছে তা তো শুধু তাদেরই জন্যে যারা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে থাকে, তৎপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে; সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন; আল্লাহ মহা জ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

١٧- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৮। আর তাদের জন্যে ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে-যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে; তাদেরই জন্যে আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

١٨- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۝

ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন যারা অজ্ঞানতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে বসে, অতঃপর তাওবা করে, যদিও এ তাওবা মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পরেও গড়গড়ার পূর্বে হয়। হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন, ইচ্ছেপূর্বকই হোক আর ভুল বশতঃই হোক যে কেউই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয় সেই অজ্ঞ, যে পর্যন্ত না সে তা হতে বিরত হয়।'

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেনঃ সাহাবা-ই-কিরাম বলতেন, 'বান্দা যে পাপ করে তা অজ্ঞতা বশতঃই করে।' হযরত কাতাদাও (রঃ) সাহাবীদের একটি

দল হতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত আতা' (রঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। অবিলম্বে তাওবা করে নেয়ার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, মরণের ফেরেশতাকে দেখে নেয়ার পূর্বে মৃত্যু যন্ত্রণার সময়কে 'অবিলম্বে' বলা হয়েছে। সুস্থ থাকার সময় তাওবা করা উচিত। গড়গড়ার সময়ের পূর্বে তাওবা করলে সেই তাওবা গৃহীত হয়ে থাকে। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার সমস্তই নিকটেই বটে। এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন যে পর্যন্ত না গড়গড়া উপস্থিত হয়।' (জামেউত্ তিরমিযী) ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

(২) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'যে কোন বান্দা তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বেও তাওবা করে, তার তাওবা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করে থাকেন, এমনকি তার পরেও বরং মৃত্যুর এক দিন পূর্বে হলেও, এমনকি এক ঘন্টা পূর্বে হলেও। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে ও সত্যতার (সততার) সাথে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তিনি তার তাওবা কবূল করে থাকেন।'

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা গ্রহণ করে থাকেন। আর যে এক মাস পূর্বে তাওবা করে তার তাওবাও আল্লাহ পাক কবূল করে থাকেন এবং যে এক সপ্তাহ পূর্বে তাওবা করে তার তাওবাও তিনি গ্রহণ করেন। আর যে একদিন পূর্বে তাওবা করে তার তাওবাও গৃহীত হয়ে থাকে।' এটা শুনে হযরত আইয়ূব (রঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যা শুনেছি তাই বলছি।'

(৪) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, চারজন সাহাবী একত্রিত হন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছিঃ 'যে ব্যক্তি তার মৃত্যুর একদিন পূর্বেও তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাও কবূল করে থকেন।' অন্য একজন জিজ্ঞেস করেনঃ 'সত্যই কি আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছেন?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ'। তখন ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছিঃ 'যদি অর্ধদিন পূর্বেও তাওবা করে তবে সেই তাওবাও আল্লাহ তা'আলা কবূল করে থাকেন।'

তৃতীয়জন বলেনঃ 'তুমি কি এটা শুনেছ?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ', আমি স্বয়ং শুনেছি।' তিনি বলেনঃ 'আমি তো শুনেছিঃ 'যদি এক প্রহর পূর্বেও তাওবা করার সৌভাগ্য হয় তবে সেই তাওবাও গৃহীত হয়ে থাকে।' চতুর্থ ব্যক্তি বলেনঃ 'আপনি এটা শুনেছেন?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ।' তিনি বলেনঃ 'আমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এমন পর্যন্ত শুনেছিঃ 'যে পর্যন্ত তার গড়গড়া উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত তার জন্যে তাওবার দরজা খোলা থাকে।'

(৫) তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে পর্যন্ত গড়গড়া আরম্ভ না হয় সে পর্যন্ত তাওবা কবূল হয়ে থাকে।' কয়েকটি মুরসাল হাদীসেও এ বিষয়টি রয়েছে। হযরত আবূ কালাবা (রঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ইবলিসের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন তখন সে অবকাশ চেয়ে বলেঃ 'আপনার সম্মান ও মর্যাদার শপথ! আদম সন্তানের অন্তরে যে পর্যন্ত আত্মা থাকবে সে পর্যন্ত আমি তার অন্তর হতে বের হবো না।' আল্লাহ তা'আলা তখন উত্তরে বলেনঃ 'আমিও আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ করে বলছি যে, যে পর্যন্ত তার দেহে আত্মা থাকবে সে পর্যন্ত আমি তার তাওবা কবূল করবো।' একটি মারফূ' হাদীসেও এর কাছাকাছি বর্ণিত আছে। সুতরাং এ সমুদয় হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, বান্দা যে পর্যন্ত জীবিত রয়েছে এবং তার জীবনের আশা আছে সে পর্যন্ত যদি সে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাওবা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল করে থাকেন ও তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

তবে হ্যাঁ, যখন সে জীবন হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে দেখতে পাবে এবং আত্মা দেহ হতে বেরিয়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাবে এবং গড়গড়া শুরু হয়ে যাবে তখন তার তাওবা গৃহীত হয় না। এ জন্যেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "জীবন ভর যে পাপ কার্যে লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু অবলোকন করে বলে, 'এখন আমি তাওবা করছি।' এরূপ লোকের তাওবা গৃহীত হয় না।" যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

(দুই আয়াত পর্যন্ত) ভাবার্থ এই যে, আমার শাস্তি দেখে নেয়ার পর ঈমানের স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসবে না। (৪০ঃ ৮৪)

অন্য জায়গায় রয়েছে- يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ايٰتِ رَبِّكَ ভাবার্থ এই যে, যখন মানুষ সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখবে তখন যে কেউ ঈমান আনয়ন করবে বা সৎকার্য সম্পাদন করবে তার সে সৎকাজ বা ঈমান কোন উপকারে আসবে না। (৬ঃ ১৫৮)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যারা কুফ্র ও শিরকের উপর মৃত্যু বরণ করে তাদেরও তাওবায় কোন উপকার হবে না, তাদের নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ বা বিনিময়ও নেয়া হবে না। যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দেবারও ইচ্ছে প্রকাশ করে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন যে পর্যন্ত পর্দা পড়ে না যায়'।

তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'পর্দা পড়ে যাওয়ার অর্থ কি?' তিনি বলেনঃ 'শিরকের অবস্থায় প্রাণ বহির্গত হওয়া। এরূপ লোকদের জন্যেই আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন।'

১৯। হে মুমিনগণ! এটা তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ গ্রহণের জন্যে তাদেরকে প্রতিরোধ করো না এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর; কিন্তু যদি অরুচি অনুভব কর তবে তোমরা যে বিষয় দূষিত মনে কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন।

১৯- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۭ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

٢٠- وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

২০। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছে কর এবং তাদের একজনকে রাশি রাশি ধন প্রদান করে থাক, তবে তোমরা তন্মধ্য হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না; তবে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করে সেটা গ্রহণ করবে?

٢١- وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

২১। এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হয়েছিলে এবং তারা তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল।

٢٢- وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ○ ع

২২। আর যা বিগত হয়েছে তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না; নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা।

সহীহ্ বুখারীর মধ্যে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছে করলে তাকে নিজেই বিয়ে করে নিতো, ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতো, আবার ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করতেই দিতো না। ঐ স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশী হকদার মনে করা হতো। অজ্ঞতা যুগের এ জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মানুষ ঐ স্ত্রীলোকটিকে বাধ্য করতো যে, সে যেন মোহরের দাবী পরিত্যাগ করে কিংবা সে যেন আর বিয়েই না করে। এও বর্ণিত আছে যে, কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে একটি লোক এসে ঐ স্ত্রীর উপর একখানা কাপড় নিক্ষেপ করতো এবং ঐ লোকটিকেই ঐ স্ত্রীলোকটির দাবীদার মনে করা হতো। এটাও বর্ণিত আছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটি সুন্দরী হলে ঐ কাপড় নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে নিতো এবং বিশ্রী হলে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বিধবা অবস্থাতেই রেখে দিতো। অতঃপর সে তার উত্তরাধকারী হয়ে যেতো। এও বর্ণিত আছে যে, ঐ মৃত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐ স্ত্রীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করতো। অতঃপর ঐ স্ত্রী তাকে কিছু মুক্তিপণ বা বিনিময় প্রদান করলে সে তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিতো, নচেৎ সে আজীবন বিধবাই থেকে যেতো।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন, মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল এই যে, কোন লোক মারা গেলে যে ব্যক্তি তার মালের উত্তরাধিকারী হতো সে তার স্ত্রীরও উত্তরাধিকারী হতো। তারা স্ত্রীলোকদের সাথে অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করতো। এমনকি তালাক প্রদানের সময়েও তাদের সাথে শর্ত করতো যে, তারা নিজেদের ইচ্ছেমত তাদের বিয়ে দেবে। এ প্রকারের বন্দীত্ব হতে মুক্ত হওয়ার এ পন্থা বের করা হয়েছিল যে, ঐ নারীগণ ঐ পুরুষ লোকদেরকে মুক্তিপণ স্বরূপ কিছু প্রদান করতো। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, আবূ কায়েস ইবনে আসলাত মারা গেলে তার পুত্র অজ্ঞতা যুগের প্রথা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে মানুষ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে কোন একটি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ কাজে লাগিয়ে দিতো। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন কোন লোক মারা যেতো তখন তার পুত্রকেই তার স্ত্রীর বেশী হকদার মনে করা হতো। সে ইচ্ছে করলে নিজেই তার বিমাতাকে বিয়ে করতো বা ইচ্ছেমত ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতো।

হযরত ইকরামা (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ কায়েসের ঐ স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে কাবীশাহ (রাঃ)। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐ সংবাদ প্রদান করে বলেন, এ লোকগুলো না আমাকে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গণ্য করে আমার স্বামীর মীরাস প্রদান করছে, না আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে যে আমি অন্য কারও

সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কাপড় নিক্ষেপের পূর্বেই যদি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পালিয়ে গিয়ে তার পিত্রালয়ে চলে যেতো তবে সে মুক্তি পেয়ে যেতো।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যার নিকট কোন পিতৃহীনা বালিকা থাকতো তাকে সে আটক রাখতো এ আশায় যে, তার স্ত্রী মারা গেলে সে তাকে বিয়ে করবে কিংবা তার পুত্রের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেবে। এসব কথার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ আয়াত দ্বারা এসব কুপ্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্ত্রীলোকদেরকে এসব বিপদ হতে রক্ষা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'স্ত্রীদের বাসস্থানকে সংকীর্ণ করতঃ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করো না যে, তারা যেন সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় বা তাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন হক পরিত্যাগ করে। কেননা, তাদেরকে শাসন গর্জন করে এই কাজে বাধ্য করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এর ভাবার্থ এই যে, স্ত্রী পছন্দ হচ্ছে না, তার সাথে মনোমালিন্য হচ্ছে, কাজেই তাকে ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু ছেড়ে দিলে মোহর ইত্যাদি সমস্ত হক পুরোপুরি দিতে হবে। এর থেকে বাঁচবার জন্যে স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছে এবং তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে, যেন সে নিজেই বাধ্য হয়ে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।'

আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে এসব জঘন্য প্রথা হতে বিরত রাখেন। ইবনে সালমানী (রঃ) বলেন, 'এ আয়াত দু'টির মধ্যে প্রথম আয়াতটি অজ্ঞতা যুগের প্রথাকে উঠিয়ে দেয়ার জন্যে এবং দ্বিতীয় আয়াতটি ইসলামী রীতির সংশোধনের জন্যে অবতীর্ণ হয়। ইবনে মুবারকও (রঃ) এটাই বলেন।

এরপর বলা হচ্ছে–'কিন্তু যদি তাদের দ্বারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।' সাহাবী ও তাবেঈগণের অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে প্রকাশ্য অশ্লীলতার ভাবার্থ হচ্ছে ব্যভিচার। অর্থাৎ সে সময় তাদের নিকট হতে মোহর ফিরিয়ে নেয়া বৈধ। সে সময় তাদের জীবনকে সঙ্কটময় করে তোলা উচিত, যেন তারা খোলা করে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে।' যেমন সূরা-ই-বাকারার মধ্যে রয়েছে– 'তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তাদেরকে প্রদত্ত মোহর হতে তোমরা কিছু গ্রহণ কর, কিন্তু শুধু সেই সময় পার যখন তাদের উভয়ের আল্লাহর সীমা ঠিক রাখতে না পারার ভয় হবে।' কারও কারও মতে (فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ)-এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বামীর

বিরুদ্ধাচরণ করা, তার অবাধ্য হওয়া, তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা, তার হক পুরোপুরি আদায় না করা ইত্যাদি।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ, এর মধ্যে ব্যভিচারও রয়েছে এবং এ আচরণও রয়েছে। অর্থাৎ এ সর্বাবস্থায় স্বামীর জন্যে স্ত্রীর জীবন সংকটপূর্ণ করে তোলা বৈধ, যেন সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় ও পরে তাকে পৃথক করে দেয়। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর একথা খুবই যুক্তিযুক্ত। ইতিপূর্বে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এ পর্যন্ত এ আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা যুগের ঐ কুপ্রথাগুলো যা হতে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ পূর্ণ বর্ণনা ইসলাম দ্বারা অজ্ঞতা যুগের প্রথাগুলোকে সরিয়ে দেয়ার জন্যেই দেয়া হয়েছে।

ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন, 'মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল যে, কোন লোক কোন ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করতো। অতঃপর তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতো। কিন্তু এ শর্ত করতো যে, স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া অন্য জায়গায় বিয়ে করতে পারবে না। ঐকথার উপর সাক্ষী নির্ধারণ করতো এবং চুক্তিপত্র লিখে নেয়া হতো। তখন কোন জায়গা হতে বিয়ের পয়গাম এলে স্ত্রী যদি সে বিয়েতে সম্মত হতো তবে তার পূর্ব স্বামী বলতো, তুমি যদি আমাকে এত টাকা দাও তবে তোমাকে বিয়ের অনুমতি প্রদান করবো। স্ত্রী সম্মত হলে তো ভালই, নচেৎ তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেয়া হতো না। ওর নিষিদ্ধতা ঘোষণায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।' মুজাহিদ (রঃ)-এর কথামত, এ নির্দেশ এবং সূরা-ই-বাকারার আয়াতের নির্দেশ একই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। সাধ্যানুযায়ী নিজের অবস্থাও ভাল রাখ। তোমরা যেমন চাও যে, তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে সুসজ্জিতা থাকুক, তদ্রূপ তোমরাও তাদের মনস্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে সুন্দর সাজে সজ্জিত রাখ।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে—

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ 'সদ্ভাবে যেমন তোমাদের অধিকার তাদের উপর রয়েছে তেমনই তাদের অধিকারও তোমাদের উপর রয়েছে।' (২ঃ২২৮) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারকারী হয়। আমি আমার সহধর্মিণীদের সাথে খুবই উত্তম ব্যবহার করে থাকি।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পত্নীদের সাথে অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করতেন, তাঁদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তাঁদেরকে সদা খুশী রাখতেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতেন, তাঁদের অন্তর তিনি স্বীয় মুষ্টির মধ্যে রাখতেন, তাঁদের জন্যে উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন, প্রশান্ত মনে তাঁদের উপর খরচ করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলতেন যে, তাঁরা হেসে উঠতেন। এমনও ঘটেছে যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রঃ)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। সে দৌড়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) আগে বেড়ে যান। কিছু দিন পর আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলে হযরত আয়েশা (রাঃ) পিছনে পড়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'শোধ বোধ হয়ে গেল।' এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সন্তুষ্ট রাখা।

যে পত্নীর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রাত্রি যাপনের পালা পড়তো তথায় তাঁর সমস্ত সহধর্মিণীগণ একত্রিত হতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেন, আলাপ আলোচনা হতো এবং মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের সাথে রাত্রের খাবার খেতেন। অতঃপর তাঁরা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন এবং তিনি তথায়ই রাত্রি যাপন করতেন। স্বীয় সহধর্মিণীর সাথে একই চাদরে শয়ন করতেন, জামা খুলে ফেলতেন, শুধু লুঙ্গি পরে থাকতেন। ইশার নামাযের পর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলতেন যেন সহধর্মিণীদের মন খুশী হয়। মোটকথা তিনি স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন। সুতরাং মুসলমানদেরও স্ত্রীদের সাথে প্রেম-প্রীতি বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আমার নবী (সঃ)-এর অনুসরণেই তোমাদের মঙ্গল রয়েছে।' এর বিস্তারিত আহকাম বর্ণনার জায়গা তাফসীর নয় বরং ওর জন্য ঐ বিষয়েরই গ্রন্থরাজি রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ "মন না চাইলেও স্ত্রীদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করার মধ্যেই এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ওর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বড় রকমের মঙ্গল দান করেন। হয় তো তাদের উদরে সৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ পাক উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন।" বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুমিন পুরুষ যেন মুমিন স্ত্রীকে পৃথক করে না দেয়। যদি সে তার একটি আধটি কথায় অসন্তুষ্টও হয় তবে সে স্ত্রী তার কোন ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্টও করবে।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তোমাদের কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছে করে এবং তার স্থানে অন্যকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায় তবে সে

যেন তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর হতে কিছুই ফিরিয়ে না নেয়, যদিও তাকে প্রচুর মাল প্রদান করে থাকে'। সূরাঃ আলে ইমরানের মধ্যে قِنْطَارًا শব্দের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন আবশ্যকতা নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে মোহর হিসেবে প্রচুর মাল প্রদান করাও বৈধ। হযরত উমার (রাঃ) প্রথমে প্রচুর মোহর হতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সে কথা ফিরিয়ে নেন।

যেমন মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, তিনি বলেছিলেনঃ 'তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। যদি এটা পার্থিব ব্যাপারে কোন ভাল জিনিস হতো বা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুত্তাকী পরিচয়ের কাজ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ই সর্ব প্রথম ওর উপর আমল করতেন। তিনি তো তাঁর কোন স্ত্রীর বা কন্যার মোহর বারো আওকিয়্যার (প্রায় একশ পঁচিশ টাকা) বেশী করেননি। মানুষ অতিরিক্ত মোহর বেঁধে বিপদে পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী তার উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে যায় এবং তার অন্তরে তার প্রতি শত্রুতার সৃষ্টি হয়। সে তখন স্ত্রীকে বলে, 'তুমি আমার স্কন্ধে মোশক ঝুলিয়ে দিয়েছ।'

এ হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) নবী (সঃ)-এর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা লম্বা চওড়া মোহর বাঁধতে আরম্ভ করলে কেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সহচরবর্গ তো চারশ দিরহামের (প্রায় একশ টাকা) বেশী মোহর করেননি। এটা যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া এবং দানশীলতার কাজ হতো তবে তোমরা ওর দিকে অগ্রগামী হতে না। সাবধান! আজ হতে আমি যেন শুনতে না পাই যে কেউ চারশ দিরহামের বেশী মোহর নির্ধারণ করেছ।' এ কথা বলে নীচে নেমে আসেন তখন একজন কুরাইশ রমণী সম্মুখে এসে তাঁকে বলেনঃ 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জনগণকে চারশ দিরহামের বেশী মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন?' তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। তখন স্ত্রীলোকটি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে কালাম অবতীর্ণ করেছেন তা কি আপনি শুনেননি?' তিনি বলেন, 'ঐ কালাম কি?' স্ত্রীলোকটি বলেন, 'শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا

অর্থাৎ 'এবং তোমরা তাদের কাউকে বিপুল ধনরাশি দিয়ে থাক'। হযরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমার (রাঃ) হতে তো প্রত্যেকেই বেশী জানে।' অতঃপর তিনি ফিরে যান এবং তৎক্ষণাৎ

মিম্বরের উপর উঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে চারশ দিরহামের বেশী মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন বলছি যে, যে কোন লোক তার মাল হতে ইচ্ছেমত মোহর নির্ধারণ করতে পারে। আমি বাধা দেব না।'

অন্য একটি বর্ণনায় ঐ স্ত্রীলোকটির আয়াতটিকে নিম্নরূপ পাঠ করার কথা বর্ণিত আছেঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا مِّنْ ذَهَبٍ

অর্থাৎ 'এবং তোমরা তাদেরকে প্রচুর স্বর্ণ প্রদান করে থাক।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর পঠনেও এরূপই বর্ণিত আছে এবং' উমারের উপর একটি স্ত্রীলোক বিজয় লাভ করলো' হযরত উমার (রাঃ)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে।

একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'যদিও বিল কিস্সা অর্থাৎ ইয়াযিদ ইবনে হুসাইন হারেসীরও, মেয়ে হয় তথাপি তারও মোহর বেশী নির্ধারণ করো না। আর তোমরা যদি এরূপ কর তবে ঐ অতিরিক্ত অংক বায়তুল মালে জমা করে নেবো।' তখন এক দীর্ঘ দেহ ও চওড়া নাক বিশিষ্টা স্ত্রীলোক বলেনঃ 'জনাব! আপনি এ কথা বলতে পারেন না'। তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'কেন?' তিনি বলেনঃ 'যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا -তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'স্ত্রীলোকটি ঠিক বলেছে এবং পুরুষ লোকটি ভুল করেছে।'

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন– 'তোমাদের স্ত্রীদেরকে প্রদত্ত মোহর তোমরা কিরূপে ফিরিয়ে নেবে? অথচ তোমরা তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছ, প্রয়োজন মিটিয়েছ, তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তোমারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঐ হাদীসে রয়েছে যার মধ্যে একটি লোকের তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ পেশ করার কথা বর্ণিত আছে, অতঃপর তাদের উভয়ের শপথ গ্রহণ তার পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তিঃ 'তোমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তোমাদের মধ্যে কেউ এখনও তাওবা করছে কি?' তিনি এ কথা তিনবার বলেন। তখন পুরুষ লোকটি বলে, 'তার মোহর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'ওর বিনিময়েই তো সে তোমার জন্য বৈধ হয়েছিল। এখন যদি তুমি তার উপর মিথ্যে অপবাদ দিয়ে থাক তবে তো এটা আরও বহু দূরের কথা।'

অনুরূপভাবে আরও একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত নায্রা (রাঃ) একটি কুমারীকে বিয়ে করেন। তার সাথে মিলিত হতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, সে ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করলে তিনি তাকে পৃথক করিয়ে দেন এবং হযরত নায্রা (রাঃ)-কে মোহর দিয়ে দিতে বলেন এবং স্ত্রীকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ 'যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে তোমার গোলাম হবে এবং মোহর তো তাকে বৈধ করার কারণ ছিল।' (সুনান-ই-আবি দাঊদ)

মোটকথা আয়াতের ভাবার্থ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়েই গেছে। সুতরাং এখন মোহর ফিরিয়ে নেয়ার কোন অর্থ থাকে না। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন–বিবাহ বন্ধন হচ্ছে একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যার মধ্যে তোমরা আবদ্ধ হয়েছ। তোমরা মহান আল্লাহর এ নির্দেশ শুনেছঃ 'তোমরা তাদেরকে বন্ধনে রাখলে ভালভাবে রাখ, আর পরিত্যাগ করলে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ কর।' হাদীস শরীফেও রয়েছেঃ 'তোমরা স্ত্রীদেরকে আল্লাহর আমানত দ্বারা গ্রহণ করে থাক এবং তাদেরকে আল্লাহর কালেমা দ্বারা নিজেদের জন্যে বৈধ করে থাক।' অর্থাৎ বিবাহের খুৎবার সাক্ষ্য দ্বারা তাদেরকে হালাল করে থাক।

মিরাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যেসব দানে ভূষিত করা হয়েছিল তন্মধ্যে একটি এও ছিল যে, তাঁকে বলা হয়েছিল–'তোমার উম্মতের কোন ভাষণই বৈধ নয় যে পর্যন্ত না সে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তুমি আমার বান্দা এবং রাসূল।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছিলেনঃ 'তোমরা স্ত্রীদেরকে আল্লাহর আমানতরূপে গ্রহণ করেছ এবং তাদেরকে আল্লাহর কালেমা দ্বারা হালাল করেছ।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বিমাতাকে বিয়ে করার অবৈধতা বর্ণনা করতঃ তার সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করেছেন। এমনকি বাপ হয়তো শুধু বিয়েই করেছে, এখনও মা পিত্রালয় হতে বিদায় হয়েও আসেনি। এমতাবস্থায় তার তালাক হয়ে গেল বা পিতা মারা গেল তথাপিও ঐ স্ত্রী তার ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে। এর উপর ইজমা হয়ে গেছে। হযরত আবূ কায়েশ (রাঃ) যিনি একজন বড় মর্যাদা সম্পন্ন আনসারী সাহাবী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কায়েস তাঁর স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, অথচ তিনি তার বিমাতা ছিলেন। তখন তার বিমাতা তাকে বলেন, 'তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সৎ লোক।

কিন্তু আমি তোমাকে আমার ছেলেরূপ গণ্য করে থাকি। আচ্ছা, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যাচ্ছি।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে তিনি (পুত্রের বিমাতা) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'তুমি বাড়ী ফিরে যাও।' অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়-'যাকে বাপ বিয়ে করেছে তাকে বিয়ে করা পুত্রের জন্য হারাম।' এ ধরনের আরও বহু ঘটনা সে সময় বিদ্যমান ছিল যাদেরকে এ কামনা হতে বিরত রাখা হয়েছিল। এক তো হলো এ আবূ কায়েশ (রাঃ)-এর ঘটনা। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল উম্মে উবাইদিল্লাহ যামরা' (রাঃ)।

দ্বিতীয় ঘটনা ছিল হযরত খালাফ (রাঃ)-এর যাঁর ঘরে হযরত আবূ তালহা (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সাফওয়ান তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে করেছিল। হযরত সাহিলী (রাঃ) বলেন যে, অন্ধকার যুগে এরূপ বিয়ে চালু ছিল এবং সেটাকে নিয়মিত বিয়ে মনে করা হতো ও সম্পূর্ণ হালাল বলে গণ্য করা হতো। এ জন্যেই এখানেও বলা হচ্ছে-'অতীতে যা হয়েছে তা হয়েছেই।' যেমন দু'বোনকে একত্রে বিয়ে করার অবৈধতার কথা বর্ণনা করার পর এটাই বলা হয়েছে। কিনানা ইবনে খুযাইমাও এ কাজ করেছিল অর্থাৎ স্বীয় পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। তার গর্ভেই নাযারের জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছেঃ 'আমার উপরের বংশের উৎপত্তিও বিয়ের দ্বারাতেই হয়েছে ব্যভিচারের দ্বারা নয়।' তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, এ প্রথা তাদের মধ্যে বরাবরই চালু ছিল, বৈধ ছিল এবং বিবাহ বলে গণ্য ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে আত্মীয়কে (বিয়ে করা) আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন ঐ সবকে অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও হারাম বলে জানতো। শুধুমাত্র বিমাতা ও দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করাকে তারা হালাল মনে করতো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের মধ্যে এদেরকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত আতা' (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহও (রঃ) এটাই বলেন।

এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সাহিলী (রাঃ) কিনানার যে ঘটনাটি নকল করেছেন তা চিন্তা ও বিবেচনার বিষয়-সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়। যা হোক, এ সম্বন্ধে এ উম্মতের উপর সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এমনকি আল্লাহ পাক বলেন যে, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা।

অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছে–'তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্টতর পন্থা।' এখানে ওর চেয়েও বেশী বলেছেন যে, এটা অরুচিকরও বটে। অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। এর ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এটা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে সে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি শত্রুতাই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণীগণকে মুমিনদের মা রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং উম্মতের উপর মা দের মতই তাঁদেরকেও হারাম করা হয়েছে। কেননা, তাঁরা নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণী, আর তিনি স্বীয় উম্মতের পিতার মতই। এমনকি ইজমা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাঁর হক বাপ দাদার হকের চাইতেও বেশী। বরং তাঁর প্রতি ভালবাসাকে জীবনের প্রতি ভালবাসার উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, একাজ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ এবং অতি নিকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং যে একাজ করে সে ধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য। কাজেই তাকে হত্যা করা হবে এবং তার মাল 'ফাই' [১] হিসেবে বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে।

সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন সাহাবীকে ঐ ব্যক্তির দিকে প্রেরণ করেন যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। উক্ত সাহাবীর প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তিনি যেন তাকে হত্যা করেন ও তার মাল নিয়ে নেন। হযরত বারা' ইবনে আযিব (রাঃ) বলেনঃ 'আমার পিতৃব্য হযরত হারিস ইবনে উমায়ের (রাঃ) নবী (সঃ) প্রদত্ত পতাকা নিয়ে আমার নিকট দিয়ে গমন করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে কোথায় পাঠিয়েছেন'? তিনি বলেন, 'আমি ঐ ব্যক্তির দিকে প্রেরিত হয়েছি যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। তার গর্দান মারার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

মাসআলাঃ এর উপর আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, যে স্ত্রীর সঙ্গে পিতার সঙ্গম হয়েছে, হয় বিয়ে করেই হোক বা দাসী করেই হোক কিংবা সন্দেহের কারণেই হোক, ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করা পুত্রের জন্যে হারাম। হ্যাঁ, তবে যদি সঙ্গম না হয়, শুধুমাত্র সহবাস হয় কিংবা তার এমন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যে অঙ্গের প্রতি নযর করা অপরিচিত হওয়ার অবস্থাতেও তার জন্যে হালাল ছিল না, এতে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ তো সে অবস্থাতেও স্ত্রীকে পুত্রের উপর

১. বিনা যুদ্ধেই শত্রুদের নিকট থেকে যে মাল পাওয়া যায় তাকে ফাই বলা হয়।

হারাম বলে থাকেন। হাফিয ইবনে আসাকেরের নিম্নের ঘটনা দ্বারাও এ মাযহাবের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঘটনাটি এই যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর ক্রীতদাস হযরত খুদায়েজ হামশী (রাঃ) হযরত মুআবিয়ার জন্যে গৌরবর্ণের একটি সুশ্রী দাসী ক্রয় করেন এবং কাপড় ছাড়াই সাদীটিকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। এ ছড়ি দ্বারা ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'উত্তম সামগ্রী, যদি তাঁর সামগ্রী হতো'।

অতঃপর তিনি বলেন, 'একে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দাও।' আবার বলেন, ' না, না থাম। রাবীআ' ইবনে আমর হারসী (রঃ)-কে আমার নিকট ডেকে আন।' তিনি একজন বড় ধর্মশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি এলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে নিম্নের মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেনঃ 'আমি এ স্ত্রীলোকটির এই এই অঙ্গ দেখেছি। সে কাপড় পরিহিতা ছিল না। এখন আমি তাকে আমার পুত্র ইয়াযীদের নিকট পাঠাবার মনস্থ করেছি। এ তার জন্যে বৈধ হবে কি?' হযরত রাবীআ' বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! এরূপ করবেন না। এ তাঁর যোগ্য হয়নি।' তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

অতঃপর তিনি তাঁর লোকদেরকে বলেন, 'যাও, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দা ফাযারী (রাঃ)-কে ডেকে আন।' তিনি এলেন। তিনি গোধুম বর্ণের ছিলেন। তাঁকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, 'এ দাসীটি আমি তোমাকে দান করছি, যেন তোমার সাদা বর্ণের সন্তান জন্ম লাভ করে।' এই আবদুল্লাহ ইবনে সা'দা (রাঃ) ছিলেন ঐ ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁকে লালন পালন করেন, অতঃপর আল্লাহর নামে আযাদ করে দেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট চলে আসেন।

২৩। তোমাদের জন্যে অবৈধ করা হয়েছে— তোমাদের মাতৃগণ, তোমাদের কন্যাগণ, তোমাদের ভগ্নিগণ, তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, তোমাদের ভ্রাতৃ কন্যাগণ, তোমাদে ভগ্নি কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা

٢٣- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ الرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ الَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ الَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিতা, কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তবে তোমাদের জন্যে কোন অপরাধ নেই; এবং যারা তোমাদের ঔরসজাত, সে পুত্রদের পত্নীগণ এবং যা অতীত হয়ে গেছে তদ্ব্যতীত দু' ভগ্নিকে একত্রিক করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল! করুণাময়।

বংশজাত, দুগ্ধ পান সম্বন্ধীয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেসব স্ত্রীলোক পুরুষদের জন্যে হারাম এ আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাত প্রকারের নারী বংশের কারণে এবং সাত প্রকারের নারী বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। ভগ্নি কন্যাগণ পর্যন্ত তো হচ্ছে বংশজাত আত্মীয়। জমহূর উলামা এ আয়াত দ্বারা দলীল নিয়েছেন যে, ব্যভিচার দ্বারা যে মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে সে মেয়েটিও ঐ ব্যভিচারীর উপর হারাম হবে। কেননা, সেও মেয়ে, অতএব হারাম। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। ইমাম শাফিঈ (রঃ) হতে এর বৈধতার কথা বর্ণিত আছে। কেননা, শরীয়ত হিসেবে এটা কন্যা নয়। সুতরাং উত্তরাধিকারের ব্যাপারে যেমন মেয়ের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে উত্তরাধিকার পায় না, তদ্রূপই আয়াতের মধ্য যে কয়জনকে হারাম করা হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত সে নয়।

এরপর বলা হচ্ছে-'তোমাদের আপন মাতা যেমন তোমাদের উপর হারাম, তদ্রূপ তোমাদের দুধ-মাতাও তোমাদের জন্য হারাম।' সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছেঃ 'জন্ম যাকে হারাম করে স্তন্যপানও তাকে হারাম করে।' সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, 'বংশের কারণে যে হারাম হয়, দুগ্ধ পানের কারণেও সে হারাম হয়।'

ধর্মশাস্ত্রবিদগণ এতে চারটি অবস্থা এবং কেউ কেউ ছয়টি অবস্থা নির্দিষ্ট করেছেন যা আহকামের শাখার গ্রন্থরাজির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এর মধ্যে কিছুই নির্দিষ্ট নেই। কেননা, ওরই মত কতগুলো অবস্থা বংশের মধ্যেও পাওয়া যায় এবং ঐ অবস্থাগুলোর মধ্যে কতগুলো শুধু বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণেই হারাম হয়ে থাকে। সুতরাং হাদীসের উপর কোন প্রতিবাদ উঠতে পারে না।

এখন কয়বার দুধপান করলে অবৈধতা সাব্যস্ত হয় সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। দুধপান করামাত্রই অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। ইমাম মালিক (রঃ) এ কথাই বলেন। হযরত ইবনে উমার (রঃ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ), উরওয়া (রঃ), ইবনে যুবাইর (রঃ) এবং যুহরী (রঃ)-এর উক্তিও এটাই। দলীল এই যে, স্তন্য পান এখানে সাধারণ।

কেহ কেহ বলেন যে, তিনবার পান করলে অবৈধতা সাব্যস্ত হবে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'একবার চোষণ করা বা দু'বার পান করা হারাম করেনা।' এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রঃ), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ (রঃ), আবূ উবাইদাহ (রঃ) এবং আবূ সাউরও এ কথাই বলেন। আলী (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), উম্মে আফযাল (রাঃ), ইব্ন যুবাইর (রঃ), সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার (রঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তাঁদের দলীল হচ্ছে সহীহ মুসলিমের উপরোক্ত হাদীসটি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে কুরআন পাকের মধ্যে দশবার দুধ পানের উপর অবৈধতার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। পরে ওটা রহিত হয়ে পাঁচবারের উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত ওটা পঠিত হতে থাকে। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে হযরত সালহা বিনতে সাহীল (রাঃ)-এর বর্ণনাটি, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন হযরত আবূ হুযাইফার (রাঃ) গোলাম হযরত সালিম (রাঃ)-কে পাঁচবার দুধপান করিয়ে দেন।

কোন স্ত্রীলোক তাঁর নিকট কোন পুরুষ লোকের যাতায়াতকে পছন্দ করলে এ হাদীসটি অনুযায়ীই হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে এ নির্দেশই দিতেন। ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণেরও ঘোষণা এটাই যে, পাঁচবার দুধ পানই নির্ভরযোগ্য। এটা স্মরণীয় বিষয় যে, জমহূরের মতে এ দুধপান শিশুর দুধ ছেড়ে দেয়ার পূর্বে অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যেই হতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা-ই-বাকারার حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (২ঃ ২৩৩)-এর তাফসীরের মধ্যে দেয়া হয়েছে। আবার এ দুধ পানের ক্রিয়া দুধ মাতার স্বামী পর্যন্ত পৌছবে কি-না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

জমহূর ও ইমাম চতুষ্টয়ের মতে এটা স্বামীর উপরও ক্রিয়াশীল হবে কিন্তু পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর মতে এটা শুধু দুধ দাত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, দুধ পিতা পর্যন্ত পৌছবে না। এর ব্যাখ্যার স্থান হচ্ছে আহকামের বড় বড় গ্রন্থগুলো, তাফসীর নয়।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'শাশুড়ী হারাম।' যে মেয়ের সাথে বিয়ে হবে, এ বিবাহ বন্ধনের সাথে সাথেই তার মা হারাম হয়ে যাবে, মেয়ের স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক। হ্যাঁ, তবে যে নারীকে বিয়ে করছে তার সাথে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা রয়েছে। এখন যদি বিয়ের পর ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে থাকে তবে তার মেয়েটি তার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যাবে।

আর যদি সঙ্গমের পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার কন্যা তার স্বামীর জন্যে হারাম হবে না। এজন্যেই এ আয়াতে এ শর্ত লাগানো হয়েছে। কোন কোন লোক هُنَّ সর্বনামটিকে শাশুড়ী ও প্রতিপালিতা মেয়ে উভয়ের দিকেই ফিরিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, শাশুড়ীও ঐ সময় হারাম হয় যখন তার মেয়ের সঙ্গে তার জামাতার নির্জনবাস হয়, নচেৎ হারাম হয় না। শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রীর মাতাও হারাম হয় না এবং স্ত্রীর মেয়েও হারাম হয় না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করেছে, অতঃপর সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিয়েছে, সে ঐ মেয়ের মাতাকে বিয়ে করতে পারে, যেমন প্রতিপালিতা মেয়েকে এভাবেই তার মাতাকে তালাক দেয়ার পর বিয়ে করা যায়। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতেই আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে,

যখন ঐ স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সঙ্গমের পূর্বেই মারা যাবে এবং এ স্বামী তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে তখন তার মাতাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা মাকরূহ হবে। হ্যাঁ, তবে যদি সঙ্গমের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তবে ইচ্ছে করলে তার মাতাকে বিয়ে করতে পারে।

হযরত আবূ বকর ইবনে কিনানা (রাঃ) বলেন, 'আমার পিতা তায়েফের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। তার সাথে আমার নির্জন বাস হয়নি এমতাবস্থায় আমার চাচা (মেয়েটির পিতা) মারা যান। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার শাশুড়ী বিধবা হন। তিনি বড় সম্পদ শালিনী ছিলেন। তাই আমার পিতা আমাকে পরামর্শ দেন যে, আমি যেন তাঁর মেয়েকে তালাক দিয়ে তাঁকেই বিয়ে করি।

আমি তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, 'তুমি তাকে বিয়ে করতে পার।' অতঃপর আমি হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞাস করি। তিনি বলেন, 'তুমি তাকে বিয়ে করতে পার না।' আমি আমার পিতার নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি ঐ দু' মনীষীর ফতওয়া লিখে দিয়ে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) উত্তরে লিখেন, 'আমি হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করতে পারি না। তোমরাই অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করছো, কারণ অবস্থা তোমাদের সামনে রয়েছে। সে ছাড়া আরও বহু স্ত্রীলোক রয়েছে।' মোটকথা তিনি অনুমতিও দিলেন না এবং নিষেধও করলেন না। আমার পিতা তখন তাঁর বাসনা আমার শাশুড়ীর দিক হতে ফিরিয়ে নেন এবং তাঁর সাথে আমার বিয়ে দেয়া হতে বিরত থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, স্ত্রীর কন্যা ও স্ত্রীর মাতার একই হুকুম। যদি স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম না হয় তবে এ দু'জনই হালাল হবে। কিন্তু এর ইসনাদে সন্দেহযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর এটাই উক্তি। ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এবং হযরত ইবনে আব্বাসও (রাঃ) ঐ দিকেই গেছেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। শাফিঈ মাযহাব অবলম্বীদের মধ্যে আবুল হাসান (রঃ) আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাবূনী (রঃ) হতেও রাফেঈর উক্তি অনুযায়ী এটাই বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে! কিন্তু পরে তিনি তাঁর একথা হতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাবরানীর হাদীসে রয়েছে যে, 'ফাযারাহ গোত্রের শাখা 'কাখ' গোত্রের একটি লোক একটি নারীকে বিয়ে করে। অতঃপর তার বিধবা মাতার সৌন্দর্যের প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। তাই সে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে মাসআলা জিজ্ঞেস করে, 'তার মাতাকে বিয়ে করা আমার জন্যে বৈধ কি?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' সুতরাং সেই মহিলাটিকে তালাক দিয়ে তার মাতাকে বিয়ে করে নেয়। তার ছেলেমেয়েও হয়।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মদীনায় আগমন করেন। এখানে তিনি এ মাসআলাটি বিশ্লেষণ করেন। ফলে তিনি জানতে পারেন যে, এটা হালাল নয়। অতঃপর তিনি কুফা প্রত্যাবর্তন করে ঐ লোকটিকে বলেন, 'তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। সে তোমার জন্যে হারাম।' লোকটি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতঃ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়।

জমহূর উলামা এ দিকেই গেছেন যে, মেয়ে শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা হারাম হয় না। যে পর্যন্ত না তার মায়ের সঙ্গে তার স্বামীর সঙ্গম হয়। তবে মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হওয়ার সাথে সাথেই সঙ্গম না হলেও মা হারাম হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় কিংবা মহিলাটি মারা যায়, তখন তার মা তার স্বামীর জন্যে হালাল নয়। এটা সন্দেহযুক্ত বলেই তিনি তা অপছন্দ করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ), হযরত মাসরূক (রঃ), হযরত তাউস (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত আতা' (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত ইবনে সীরীন (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হযরত যুহরী (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। ইমাম চতুষ্টয়, সাতজন ধর্মশাস্ত্রবিদ, জমহূর উলামা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীবর্গের এটাই মাযহাব।

ইমাম ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন, ঐ মনীষীদেরই উক্তি সঠিক যাঁরা শাশুড়ীকে উভয় অবস্থাতেই হারাম বলে থাকেন। কেননা, মহান আল্লাহ তাদের অবৈধতার সঙ্গে সঙ্গমের শর্ত আরোপ করেননি, যেমন মেয়ের মায়ের জন্যে এ শর্ত আরোপ করেছেন। তাছাড়া এর উপর ইজমা হয়েছে যা এমন দলীল যে, যার বিপরীত করা সে সময় বৈধই নয় যখন ওর উপর সবাই একমত হয়। সনদের ব্যাপারে সমালোচনা থাকলেও একটি গারীব হাদীসেও এটা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে বিয়ে করে তখন

তার মাকে বিয়ে করা হালাল নয়, স্বামী ঐ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক। হ্যাঁ, তবে যে মহিলাকে বিয়ে করেছে তাকে যদি সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে ইচ্ছে করলে তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।' এ হাদীসটির সনদ দুর্বল বটে, কিন্তু এ মাসআলার উপর ইজমা হয়ে গেছে যা এর বিশুদ্ধতার উপর এমন এক সাক্ষী যার পরে আর কোন সাক্ষ্যের আবশ্যকতা নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তোমাদের প্রতিপালিতা ঐ মেয়েগুলো তোমাদের জন্যে হারাম যারা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিতা, যদি তাদের মাতাদের সঙ্গে তোমাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে।' জমহূরের ঘোষণা এই যে, তারা ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থাতেই হারাম হবে। যেহেতু এরূপ মেয়েরা সাধারণতঃ তাদের মাতাদের সাথেই থাকে এবং স্বীয় বৈপিত্রের (সৎ বাপের) নিকট প্রতি পালিতা হয় সেহেতু একথা বলা হয়েছে। এটা কোন শর্ত নয়। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে–

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

অর্থাৎ 'যদি তোমাদের দাসীরা পবিত্র থাকতে ইচ্ছে করে তবে তোমরা তাদেরকে নির্লজ্জতার কার্যে বাধ্য করো না।' (২৪ঃ ৩৩) এখানেও 'যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছে করে' এ শর্তটি ঘটনার প্রাধান্য হিসেবে করা হয়েছে। অর্থ এই নয় যে, যদি তারা পবিত্র থাকতে না চায় তবে তাদেরকে নির্লজ্জতার কাজে উত্তেজিত কর। অনুরূপভাবে এ আয়াতেও বলা হয়েছে যে, যদি ক্রোড়ে অবস্থান করে। তাহলে বুঝা গেল যে, ক্রোড়ে অবস্থান না করলেও হারাম হবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমার বোন আবূ সুফইয়ানের কন্য ইয্যাহ্‌কে বিয়ে করুন।' তিনি বলেনঃ 'তুমি এটা পছন্দ কর?' হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন 'হ্যাঁ, আমি আপনাকে শূন্য রাখতে পারি না। তাছাড়া এ সৎকার্যে আমি আমার বোনকেও জড়িয়ে দেব না কেন?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, এটা আমার জন্যে বৈধ নয়।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) তখন বলেন, 'আমি তো শুনেছি যে, আপনি নাকি আবূ সালমা (রাঃ)-এর মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'উম্মে সালমা (রাঃ)-এর গর্ভের মেয়েটির কথা বলছ?'

তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'জেনে রেখো, প্রথমতঃ সে আমার উপর এ জন্যে হারাম যে, সে আমার প্রতিপালিতা, সে আমারই ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ যদি এরূপ না হতো তবুও সে আমার উপর হারামই হতো। কেননা, সে আমার দুগ্ধ ভ্রাতার কন্যা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবূ সালমা (রাঃ)-কে সাওবিয়া দুধ পান করিয়েছিলেন। সাবধান! তোমাদের কন্য ও ভগ্নীদেরকে আমার উপর পেশ করো না।'

সহীহ বুখারীর মধ্যে নিম্নরূপ শব্দ রয়েছেঃ 'উম্মে সালমা (রাঃ)-এর সাথে আমার বিয়ে যদি নাও হতো তথাপি সে আমার উপর হালাল হতো না।' সুতরাং অবৈধতার মূল তিনি বিয়েকেই স্থির করেছেন। এ মাযহাবই হচ্ছে ইমাম চতুষ্টয়ের, সাতজন ধর্ম শাস্ত্রবিদের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূরের। এও বলা হয়েছে যে, যদি মেয়েটি ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হয় তবে হারাম হবে নচেৎ হারাম হবে না।

হযরত মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদসান (রঃ) বলেন, আমার স্ত্রী সন্তানাদি রেখে মারা যায়। তার প্রতি আমার খুবই ভালবাসা ছিল। এ জন্য তার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়ি। ঘটনাক্রমে হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমাকে চিন্তিত দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমি ঘটনাটি তাঁর নিকট বর্ণনা করি। তিনি তখন আমাকে বলেন, 'তোমার পূর্বে তার স্বামীর কোন সন্তান আছে কি?' আমি বলি হ্যাঁ, একটি কন্যা আছে এবং সে তায়েফে অবস্থান করে।' তিনি বলেন, 'মেয়েটিকে বিয়ে করে নাও।'

আমি তখন কুরআন কারীমের এ আয়াতটি পাঠ করে তাঁকে বলি, এর ভাবার্থ কি হবে? তিনি বলেনঃ 'এটা সে সময় হতো যদি সে তোমার নিকট লালিতা পালিতা হতো। আর সে তো তোমার কথামত তায়েফে রয়েছে। তোমার নিকটেই তো নেই।' এর ইসনাদ সহীহ হলেও এ উক্তিটি সম্পূর্ণ গারীব।

হযরত দাউদ ইবনে আলী যাহেরী (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণ ঐদিকেই গেছেন। রাফেঈ (রঃ) হযরত ইমাম মালিক (রঃ)-এরও এ উক্তির কথাই বলেছেন। ইবনে হাযামও (রঃ) এটাই গ্রহণ করেছেন। আমাদের শায়েখ হাফিয

আবি আব্দিল্লাহ যাহবী (রঃ) বলেন, 'আমি এ কথাটি শায়েখ তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (রঃ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি ওটাকে অত্যন্ত কঠিন অনুভব করেন এবং নীরবতা অবলম্বন করেন। حجور শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঘর। যেমন হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তবে নিজের অধিকারে যে দাসী রয়েছে এবং তার সাথে তার মেয়েও রয়েছে, তার সম্বন্ধে হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, 'একের পর অন্য বৈধ হবে কি-না?' তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'এক আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হালাল এবং অন্য আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে হারাম। সুতরাং আমি ওটা কখনও করবো না।'

শায়েখ আবূ উমার ইবনে আব্দিল্লাহ (রঃ) বলেন, 'কারও জন্যে এটা হালাল নয় যে, কোন স্ত্রীলোকের উপর অধিকার লাভ করার কারণে তার সঙ্গে সঙ্গম করবে অতঃপর একই অধিকারের উপর ভিত্তি করে তার মেয়ের সঙ্গেও সঙ্গম করবে এবং এ মাসআলায় আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা ওটাকে বিয়েতেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।

আলেমদের মতে কারও উপরে অধিকার লাভ বিয়েরই অনুসারী। কিন্তু হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে যে বর্ণনা দেয়া হয় তার উপর ফতওয়া প্রদানকারী ইমামগণ এবং তাঁদের অনুসারী কেউই নেই। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ে এভাবে যতই নিম্নস্তরে যাক না কেন, সবাই হারাম। হযরত কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনা মতে হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -এর ভাবার্থ হচ্ছে 'নারীদেরকে বিয়ে করা।' হযরত আতা' (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তাদের কাপড় সরিয়ে দেয়া, স্পর্শ করা এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাদের পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে বসে পড়া।' ইবনে জুরাইজ জিজ্ঞেস করেন, 'যদি এ কাজ স্ত্রীর বাড়ীতেই হয়?' হযরত আতা' উত্তরে বলেন, 'এখানকার ওখানকার দু'টোর হুকুম একই। এরূপ যদি হয়ে যায় তবে তার মেয়ে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে।'

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, শুধু নির্জনবাসের দ্বারাই তার মেয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না। যদি সঙ্গম করা, স্পর্শ করা এবং কামপ্রবৃত্তির সাথে

তার কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে একথা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীর মেয়ে তার উপর হারাম হবে না।

এরপর বলা হচ্ছে–'তোমাদের পুত্রবধুগণও তোমাদের উপর হারাম, যারা তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের পত্নী'। অর্থাৎ পালক পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤئِهِمْ ـ

অর্থাৎ 'যখন যায়েদ তার নিকট হতে স্বীয় প্রয়োজন পুরো করে নেয়, তখন আমি তাকে তোমার বিবাহে দিয়ে দেই, যেন মুমিনদের উপর তাদের পালিত পুত্রদের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা না থাকে।' (৩৩ঃ ৩৭)

হযরত আতা' (রঃ) বলেন, 'আমরা শুনতাম যে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে বিয়ে করেন তখন মক্কার কুরাইশরা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দেয়। তখন وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْ (৩৩ঃ ৪) এ আয়াতটি এবং مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ (৩৩ঃ ৪০)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছেঃ 'তোমাদের পালক পুত্রগণকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি।' 'মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের কারও পিতা নয়।'

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতগুলো অস্পষ্ট, যেমন তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ, তোমাদের শাশুড়ীগণ। হযরত তাউস (রঃ), হযরত ইবরাহীম (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ) এবং হযরত মাকহুল (রঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। আমি বলি অস্পষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সবাই এর মধ্যে জড়িত। শুধু বিয়ে করার পরেই অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, সঙ্গম হোক আর নাই হোক। এ মাসআলার উপর সবাই একমত যে, কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'আয়াতে তো শুধু ঔরসজাত পুত্রের উল্লেখ আছে, তাহলে দুধ পুত্রের স্ত্রী অবৈধ হওয়া কিরূপে সাব্যস্ত হবে।' তবে এর উত্তর হবে এই যে, ওর অবৈধতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বলেনঃ 'স্তন্যপান দ্বারা ওটাই হারাম হয় যা হারাম হয় বংশের দ্বারা।' জমহূরের মাযহাব এটাই

যে, দুধ পুত্রের স্ত্রীও হারাম। কোন কোন লোক তো এর উপরই ইজমা নকল করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন-'বিবাহে দু' বোনকে একত্রিত করাও তোমাদের জন্যে হারাম। অধীনস্থ দাসীদের উপরও এ হুকুম প্রযোজ্য যে, একই সময় দু' বোনের সাথে সঙ্গম করা হারাম। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে যা হয়ে গেছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম।' সুতরাং জানা গেল যে, আগামীতে কোন সময় এ কাজ কারও জন্যে বৈধ নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى

অর্থাৎ 'প্রথম মৃত্যু ছাড়া তথায় তারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।' (৪৪:৫৬) তাহলে জানা যাচ্ছে যে, আগামীতে আর মৃত্যুর আগমন ঘটবে না।

সাহাবা, তাবেঈন, ঈমানগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের ইজমা আছে যে, একই সাথে দু' বোনকে বিয়ে করা হারাম। যে ব্যক্তি মুসলমান হবে এবং তার বিয়েতে দু'বোন থাকবে, তাকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, সে যে কোন একজনকে রাখবে অপরজনকে তালাক দেবে। আর এটা তাকে করতেই হবে। হযরত যহ্হাক ইবনে ফীরোয (রাঃ) বলেন, 'আমি যখন মুসলমান হই তখন আমার বিয়েতে দু' স্ত্রী ছিল যারা পরস্পর ভগ্নী ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন একজনকে তালাক দিয়ে দেই'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

সুনান-ই-ইবনে মাজা, সুনান-ই-আবি দাউদ ও জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে। জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এ দু'জনের মধ্যে যাকে ইচ্ছে রাখ অপরজনকে তালাক দাও।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদসিটি হাসান বলেছেন। সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে আবূ খাররাশের এরূপ ঘটনাও বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ যহ্হাক ইবনে ফীরোযেরই কুনইয়াত আবূ খাররাশ হবে এবং ঘটনাটি একই হবে। আবার এর বিপরীত হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত দায়লামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আরয করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বিবাহে দু'বোন রয়েছে।' তিনি বলেনঃ 'তাদের মধ্যে যাকে চাও একজনকে তালাক দিয়ে দাও'। (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)

সুতরাং দায়লামী অর্থে হযরত যহ্হাক ইবনে ফীরোযকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি ইয়ামনের ঐ নেতৃবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা অভিশপ্ত আসওয়াদ আনসী মুতানাব্বীকে হত্যা করেছিলেন। পরস্পর দু' বোন এ রূপ দু'জন দাসীকে একই সাথে একত্রিত করে তাদের সাথে সঙ্গম করাও হারাম। এর দলীল হচ্ছে এ আয়াতটির সাধারণতা, যার মধ্যে স্ত্রী ও দাসী উভয়ই জড়িত রয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি এটাকে মকরূহ বলেন। প্রশ্নকারী বলে, কুরআন কারীমে যে রয়েছে–

إِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

অর্থাৎ 'কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী।'(২৩ঃ ৭) তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'তোমার উটও তো তোমার দক্ষিণ হস্তের অধিকারে রয়েছে।' জমহূরের প্রসিদ্ধ উক্তিও এটাই এবং ইমাম চুতষ্টয় প্রভৃতি মনীষীও এ কথাই বলেন। তবে পূর্ববর্তী কোন কোন মহামানব এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'একটি আয়াত এটাকে হালাল করছে এবং অপরটি হারাম করছে। আমি তো এটা হতে নিষেধ করি না।' প্রশ্নকারী তথা হতে বের হয়। পথে একজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকেও এ প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, 'আমার অধিকার থাকলে এরূপ কার্যকারীকে আমি শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করতাম।'

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, 'আমার ধারণা এ উক্তিকারী খুব সম্ভব হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন।' হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। 'ইসতিয্কার-ই-ইবনে আবদিল বারর' গ্রন্থে রয়েছে যে, এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাবীসা' ইবনে যাভীব হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম নেয়নি, কারণ সে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রিয়পাত্র ছিল এবং তাদের উপর তাঁর নাম খুব কঠিন ঠেকতো।

হযরত আইয়াস ইবনে আমের বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি, 'আমার অধিকারে দু'টি দাসী রয়েছে যারা পরস্পর দু' বোন। একজনের সাথে আমি সম্পর্ক স্থাপন করেছি এবং আমার ঔরসে তার সন্তানাদিও হয়েছে। এখন আমার মনে চাচ্ছে যে, তার বোনটি যে

আমার দাসী হিসেবে রয়েছে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। তাহলে বলুন শরীয়তে এ ব্যাপারে কি হুকুম রয়েছে'?

তিনি বলেন, 'প্রথম দাসীটিকে আযাদ করে দিয়ে তার বোনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পার।' তিনি বলেন, লোকে তো বলে যে, আমি তার বিয়ে করিয়ে দিয়ে তার বোনের সঙ্গে মিলিত হতে পারি।' হযরত আলী (রাঃ) তখন বলেন, 'দেখ এ অবস্থাতেও ক্ষতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, যদি তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় বা মারা যায় তবে সে পুনরায় তোমার নিকট ফিরে আসবে। সুতরাং তাকে আযাদ করে দেয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে।'

অতঃপর তিনি আমার হাত ধারণ করে বলেন, 'জেনে রেখো যে, আযাদ ও দাসী স্ত্রীলোকদের হুকুম বৈধতা ও অবৈধতার দিক দিয়ে একই। হ্যাঁ, তবে সংখ্যায় পার্থক্য রয়েছে। আযাদ মহিলাদেরকে চারটের বেশী একত্রিত করা যায় না। কিন্তু দাসীদের সংখ্যার কোন শর্ত নেই।' দুগ্ধ পানের সম্পর্কের ফলে ঐ সমুদয় স্ত্রীলোক হারাম হয়ে যায়, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যেগুলো হারাম হয়ে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত উসমান (রাঃ)-এর মতই হযরত আলী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। যেমন তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'পরস্পর বোন হয় এরূপ দু'টি দাসীকে একই সময়ে একত্রিত করে তাদের সাথে সঙ্গম করার বৈধতা এক আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে এবং অপর আয়াত দ্বারা অবৈধতা সাব্যস্ত হচ্ছে।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'দাসীদের সাথে আমার আত্মীয়তার কারণে তারা অন্যান্য গুটিকয়েক দাসীকে আমার উপর হারাম করে থাকে। কিন্তু তাদের পরস্পরের আত্মীয়তার কারণে হারাম করে না। অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও ঐ সমুদয় নারীকে হারাম বলে জানতো যাদেরকে তোমরা হারাম মনে করে থাক। কিন্তু তারা শুধু পিতার স্ত্রীকে অর্থাৎ বিমাতাকে এবং একই সাথে বিবাহে দু' বোনকে একত্রিত করাকে হারাম মনে করতো না। কিন্তু ইসলাম এসে এ দু'টোকেও হারাম করে দেয়। এ জন্যেই এ দু'টোর অবৈধতার বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, যে বিয়ে হয়েছে তা হয়েছেই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'যে আযাদ স্ত্রীলোকগুলো হারাম ঐ দাসীগুলোও হারাম। হ্যাঁ, তবে সংখ্যায় এক নয়। অর্থাৎ আযাদ মহিলাদেরকে

চারটের বেশী একত্রিত করা যায় না। কিন্তু দাসীদের জন্যে কোন সীমা নেই।' হযরত শা'বীও (রঃ) এটাই বলেন।

হযরত আবূ আমর (রঃ) বলেন, 'হযরত উসমান (রাঃ) এ ব্যাপারে যা বলেছেন, পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দলও এটাই বলেছেন, যাঁদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রয়েছেন। কিন্তু প্রথমতঃ এর নকলে তো স্বয়ং ঐ মনীষীদের মধ্যেই বহু কিছু মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ উক্তির দিকে বিবেকসম্পন্ন আলেমগণ মোটেই মনোযোগ দেননি এবং তা গ্রহণও করেননি। হেজায, ইরাক, সিরিয়া এমনকি পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিদ ওর বিপক্ষে রয়েছেন।' মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুধু শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেই এবং কোন চিন্তা ও বুদ্ধি বিবেচনা না করেই তাঁদের হতে পৃথক রয়েছেন ও ইজমার বিপরীত মত পোষণ করেছেন। যাঁরা পূর্ণ জ্ঞানের ও বিবেচনা শক্তির অধিকারী তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, দু'বোন্‌কে যেমন বিবাহে একত্রিত করা যায় না, তদ্রূপ ঐ দাসীদের সাথেও একই সময় সঙ্গম করতে পারে না, যারা পরস্পর বোন।

অনুরূপভাবে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, এ আয়াতে মাতা, কন্যা, বোন ইত্যাদিকে হারাম করা হয়েছে। এদের সাথে যেমন বিয়ে হারাম, তদ্রূপ যদি তারা দাসী হয়ে অধীন হয়ে যায়, তবে তাদের সাথেও মিলন হারাম।

মোটকথা, বিয়ের ও দাসীদের উপর অধিকার লাভের পরে, এ দু' অবস্থাতেই এরা সবাই সমান। না তাদেরকে বিয়ে করে তাদের সাথে মিলন বৈধ, না তাদের উপর অধিকার লাভের পর তাদের সাথে মিলন বৈধ।

অনুরূপভাবে এ হুকুমই হচ্ছে একই সাথে দু' বোনকে একত্রিত করণ এবং শাশুড়ীর ও স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যার একত্রিত করণ। স্বয়ং তাদের জমহূরেরও এটাই মাযহাব। আর এটাই হচ্ছে ঐ দলীল যা ঐ গুটিকয়েক বিপক্ষীর উপর পূর্ণ সনদ ও পরিপূর্ণ হুজ্জত।

মোটকথা একই সাথে দু' বোনকে বিয়েতে একত্রিত করাও হারাম এবং দু' বোনকে দাসীরূপে রেখে তাদের সাথে মিলিত হওয়াও হারাম।

(চতুর্থ পারা সমাপ্ত)

٢٤- وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۗءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۗءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۭ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

২৪। এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ; কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী– আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে যে, তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবদ্ধ করার জন্যে তাদের অনুসন্ধান কর, অনন্তর তাদের দ্বারা যে ফলভোগ করেছ, তজ্জন্যে তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবে না– যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

অর্থাৎ যেসব নারীর স্বামী রয়েছে তারাও তোমাদের জন্যে হারাম। তবে হ্যাঁ, কাফিরদের যেসব স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা তোমাদের জন্যে বৈধ হবে। মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আওতাসের যুদ্ধে কতগুলো সধবা স্ত্রীলোক বন্দিনী হয়ে আসে। আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়’। জামেউত্ তিরমিযী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও এ হাদীসটি রয়েছে। তাবরানীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এটা খাইবার যুদ্ধের ঘটনা।

পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল এ আয়াতের সাধারণতা হতে দলীল গ্রহণ করে বলেন যে, দাসীকে বিক্রি করে দেয়াই হচ্ছে তার স্বামীর পক্ষ হতে তালাক

প্রাপ্তি। হযরত ইবরাহীম (রঃ)-কে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ফতওয়াটিই বর্ণনা করতঃ এ আয়াতটি পাঠ করেন।

অন্য সনদ দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন সধবা নারী বিক্রীতা হয় তখন তার দেহের বেশী হকদার হচ্ছে তার মনিব।' হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাসেরও (রাঃ) ফতওয়া এই যে, তার বিক্রিতা হওয়াই হচ্ছে তালাক প্রাপ্তি।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে রয়েছে যে, দাসীর তালাক ছয় প্রকারের। তাকে বিক্রি করাও তালাক, আযাদ করাও তালাক, দান করাও তালাক, অব্যাহতি দেয়াও তালাক এবং তার স্বামীর তালাক দেয়াও তালাক।[১] হযরত ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, সধবা নারীদের সাথে বিয়ে হারাম। কিন্তু দাসীরা এর ব্যতিক্রম, তাদের বিক্রি হওয়াই তালাক।

হযরত মুআম্মার (রঃ) এবং হযরত হাসান বসরীও (রঃ) এটাই বলেছেন। এ গুরুজনদের তো উক্তি এই, কিন্তু জমহূর তাঁদের বিরোধীমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, দাসীদের বিক্রি তাদের জন্যে তালাক নয়। কেননা, ক্রেতা হচ্ছে বিক্রেতার প্রতিনিধি এবং বিক্রেতা তার সুফল স্বীয় অধিকার হতে বের করছে এবং দাসীর নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়ে ক্রেতার নিকট বিক্রি করছে।

তাঁদের দলীল হচ্ছে হযরত বুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত বুরাইরা (রাঃ)-কে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। তখন কিন্তু তাঁর হযরত মুগীস (রাঃ)-এর সঙ্গেকার বিয়ে বাতিল হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সে বিয়ে বাতিল করার বা বাকী রাখার অধিকার প্রদান করেন। হযরত বুরাইরা (রাঃ) বিয়ে বাতিল করাকেই পছন্দ করেন। এ ঘটনাটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। সুতরাং ঐ গুরুজনদের কথা অনুযায়ী বিক্রি হওয়াই যদি তালাক হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বুরাইরা (রাঃ)-কে তাঁর বিক্রি হয়ে যাবার পর বিয়ে বাতিল করার বা ঠিক রাখার অধিকার দিতেন না।

---

১. এখানে ৫ প্রকারের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ প্রকারটি মূল তাফসীরে নেই।

অধিকার দেয়ার দলীল হচ্ছে বিয়ে ঠিক থাকার। কাজেই আয়াতে শুধু ঐ স্ত্রীলোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। এও বলা হয়েছে যে, مُحْصَنَاتٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে পুণ্যশীলা রমণীগণ। অর্থাৎ পুণ্যবতী নারীগণ তোমাদের জন্যে হারাম–যে পর্যন্ত না তোমরা বিয়ে, সাক্ষী, মোহর ও অভিভাবকের মাধ্যমে তাদের সতীত্বের অধিকারী হও, একজন হোক, দু'জন হোক, তিনজন হোক বা চারজন হোক। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) এবং হযরত তাউস (রঃ) এ ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। উমার (রঃ) এবং উবাইদাহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে–চারটের বেশী স্ত্রী তোমাদের জন্যে হারাম। হ্যাঁ, তবে দাসীদের ব্যাপারে এ সংখ্যা নেই।

অতপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লিখে দিয়েছেন, অর্থাৎ চারটের হুকুম। সুতরাং এটাই তোমাদের জন্যে অবশ্যপালনীয়, তোমারা ওর সীমা ছাড়িয়ে যেওনা। তোমরা তাঁর শরীয়ত ও ফরযগুলো মেনে চল।' এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হারাম নারীদেরকে স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এরপরে বলা হচ্ছে–'যেসব নারীর হারাম হবার কথা বর্ণনা করা হলো, তারা ছাড়া সমস্ত নারী তোমাদের জন্যে হালাল।' একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ চারের কম তোমাদের জন্যে হালাল। কিন্তু এ উক্তি দূরের উক্তি। প্রথমটিই সঠিক ভাবার্থ। এটাই হযরত আতা' (রঃ)-এর উক্তি।

হযরত কাতাদা (রঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করেন যে, এর দ্বারা দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতটিই ঐ লোকদের দলীল, যারা বিবাহে একই সময়ে দু' বোনকে একত্রিত করার বৈধতার সমর্থক এবং ঐ লোকদেরও দলীল যাঁরা বলেন যে, একটি আয়াত ওকে হালাল করছে ও একটি আয়াত হারাম করছে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তোমরা এ হালাল নারীদেরকে স্বীয় মাল দ্বারা গ্রহণ কর। আযাদ নারীদেরকে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে এবং দাসীদেরকে সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই বিয়ে করতে পারবে, তবে শরীয়তের পন্থায় হতে হবে'। এ জন্যেই বলা হয়েছে–'ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবন্ধ করার জন্যে।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'যেসব স্ত্রী হতে তোমরা ফল ভোগ কর, সে ফল ভোগের বিনিময়ে তাদেরকে মোহর প্রদান কর।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ 'কিরূপে তোমরা তা (মোহর) গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হয়েছিলে।' (৪ঃ ২১) আর এক জায়গায় রয়েছে–

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থাৎ 'তোমরা খুশী মনে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর।' (৪ঃ ৪) অন্য স্থানে রয়েছে–

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

অর্থাৎ 'তোমরা স্ত্রীদেরকে যা কিছু প্রদান করেছ তা হতে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়।' (২ঃ ২২৯) এ আয়াত দ্বারা 'মুত্‌আ'[১] বিবাহের উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'মুত্‌আ' শরীয়তেরই বিধান ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়। ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং উলামা-ই-কিরামের একটি দল বলেন যে, 'মুত্‌আ' দু'বার বৈধ করা হয়, অতঃপর রহিত করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, তার চেয়েও বেশীবার বৈধ হয়েছে ও রহিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, একবার মাত্র বৈধ হয়েছে, তারপরে রহিত হয়ে গেছে। এরপরে আর বৈধ হয়নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী হতে প্রয়োজনের সময় এর বৈধতার কথা বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতেও এরূপই একটি বর্ণনা বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ), উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) হতে مِنْهُنَّ শব্দের পরে اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى -এর পঠন বর্ণিত আছে। কিন্তু জমহূর এর উল্‌টো।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এর উত্তম মীমাংসা করেছে যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবারের যুদ্ধে মুতআ'র বিবাহ হতে এবং পালিত গাধার মাংস হতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসের শব্দগুলো আহকামের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত সুবরা' ইবনে মা'বাদ জুহ্‌নী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে মুতআ'র অনুমতি দিয়েছিলাম। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত ওটাকে হারাম করে দিয়েছেন। যার নিকট এ প্রকারের স্ত্রী রয়েছে সে যেন তাকে পরিত্যাগ করে এবং তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়ে রেখেছো তা হতে কিছুই গ্রহণ করো না।'

১. 'মুত্‌আ' হচ্ছে অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ। কোন বস্তুর বিনিময়ে কোনরূপ ফল ভোগ করলে তাকে 'মুত্‌আ' বলে।

সহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্বে একথা বলেছিলেন। হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে যার ব্যাখ্যার স্থান হচ্ছে আহকামের গ্রন্থসমূহ।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন–'মোহর নির্ধারণের পর যদি তোমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে কিছু মীমাংসা করে নাও তবে কোন অপরাধ হবে না'। যাঁরা পূর্ববর্তী বাক্যকে 'মুত্আ'র' অর্থে নিয়েছেন, তাঁরা এর ভাবার্থ এরূপ বর্ণনা করেন যে, যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন পুনরায় সময় বাড়িয়ে নেয়ায় এবং যা কিছু দিয়েছে তার উপর আরও কিছু দেয়ায় কোন পাপ নেই। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ইচ্ছে করলে পূর্বে নির্ধারিত মোহরের পর সময় শেষ হবার পূর্বে যা দিয়েছে সে বলবে–'আমি এত সময়ের জন্যে পুনরায় 'মুত্আ' করছি।'

সুতরাং যদি গর্ভাশয়ের পবিত্রতার পূর্বে ঐ বেশীটা ঠিক করে নেয় তবে সময় শেষ হয়ে যাবার পর তার কোন ক্ষমতা থাকবে না। ঐ স্ত্রী পৃথক হয়ে যাবে এবং এক ঋতুকাল অপেক্ষা করে স্বীয় গর্ভাশয়কে পবিত্র করে নেবে। এ দু' জনের মধ্যে উত্তরাধিকার নেই। স্ত্রীলোকটিও পুরুষ লোকটির উত্তরাধিকারিণী হবে না এবং পুরুষ লোকটিও স্ত্রীলোকটির উত্তরাধিকারী হবে না। আর যে মনীষীগণ বলেন যে, এটা সুন্নাত বিবাহ সম্পর্কীয় কথা, তাঁদের নিকটে এর ভাবার্থ তো পরিষ্কার যে, এখানে মোহর আদায়ের গুরুত্বের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন বলা হয়েছে– 'মোহর সহজভাবে ও খুশী মনে দিয়ে দাও। তবে মোহর নির্ধারিত হবার পর যদি স্ত্রী তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য মাফ করে দেয় তবে স্বামী বা স্ত্রীর কারও কোন পাপ নেই।' হযরত হাযরামী (রঃ) বলেন, 'মানুষ মোহর নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর তার দরিদ্র হয়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তবে তা বৈধ।' ইমাম ইবনে জারীরও এ উক্তিকেই পছন্দ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'তাদেরকে পূর্ণ মোহর প্রদান কর। অতঃপর তাদেরকে বসবাস করার বা পৃথক হয়ে যাবার পূর্ণ অধিকার দাও।' এরপর বলা হচ্ছে–'আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়'। এ বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে নিপুণতা ও যুক্তিযুক্ততা রয়েছে তা তিনিই খুব ভাল জানেন।

২৫। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশ্বাসিনী ও স্বাধীনা রমণীকে বিয়ে করার শক্তি সামর্থ না রাখে, তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী- সেই বিশ্বাসিনী দাসীঃ আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা এক অপর হতে সমুদ্ভূত, অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে ব্যভিচারিণী ও গুপ্ত প্রেমিকা ব্যতীত সতী-সাধ্বীদেরকে বিয়ে কর, অতএব যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্যে তোমাদের মধ্যে যারা দুষ্কার্যকে ভয় করে এবং যদি বিরত থাক, তবে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

২৫- وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

যারা স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে না এখানে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। হযরত রাবীআ' (রঃ) বলেন যে, طَوْلٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ইচ্ছে ও বাসনা। অর্থাৎ দাসীকে বিয়ে করবে যখন তার প্রতি বাসনা জাগবে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ উক্তিটি এনেছেন, অতঃপর তিনি সেটা খণ্ডন করেছেন। ভাবার্থ এই যে, মুসলমানদের অবস্থা যখন এরূপ হবে তখন তাদের অধিকারে যে দাসীগুলো থাকবে তাদেরকে তারা বিয়ে করবে।

সমস্ত কার্যের যথার্থতা আল্লাহ পাকের নিকটে প্রকাশমান। মানুষ তো শুধু বাহ্যিকটাই দেখে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্বাধীন ও দাস সবাই ঈমানী সম্পর্কের দিক দিয়ে একই। দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর'। জানা যাচ্ছে যে, দাসীদের অভিভাবক হচ্ছে তাদের মনিবগণ। তাদের অনুমতি ছাড়া দাসীদের বিবাহ সাধিত হয় না। অনুরূপভাবে দাসেরাও তাদের মনিবদের সম্মতি লাভ ছাড়া বিয়ে করতে পারে না।

হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'যে দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে সে ব্যভিচারী।' তবে যদি কোন দাসীর অধিকারিণী কোন স্ত্রীলোক হয় তবে তার অনুমতিক্রমে ঐ দাসীর বিয়ে ঐ ব্যক্তি দিয়ে দেবে যে স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারে। কেননা, হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'নারী যেন নারীর বিয়ে না করায়, নারী যেন নিজের বিয়ে নিজে না দেয়, ঐ নারীরা ব্যভিচারিণী যারা নিজেরা নিজেদের বিয়ে দিয়ে থাকে।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'স্ত্রীদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। তারা দাসী বলে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ নির্ধারিত মোহর হতে কিছুই কম করো না।'

অতঃপর বলা হচ্ছে–'তোমরা লক্ষ্য রাখ যে, নারীরা যেন নির্লজ্জতার কাজে আসক্তা না হয়, না তারা এমন হয় যে, কেউ যদি তাদের প্রতি আসক্ত হয় তবে তারাও তাদের প্রতি আসক্তা হয়ে পড়ে, না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হয়, না গোপনে গোপনে ব্যভিচার করে যে এদিকে ওদিকে গোপন বন্ধু খুঁজে বেড়ায়।' যাদের মধ্যে এরূপ জঘন্য আচরণ রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করতে আল্লাহ তা'আলা চরমভাবে নিষেধ করেছেন। উহ্সিন্না শব্দের দ্বিতীয় পঠন আহ্সান্নাও রয়েছে। বলা হয়েছে যে, দু'টোর অর্থ একই। এখানে اِحْصَانٌ শব্দের ভাবার্থ ইসলাম বা বিবাহিতা হওয়া।

মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, তাদের اِحْصَانٌ হচ্ছে ইসলাম ও পবিত্রতা। কিন্তু এ হাদীসটি মুনকার এবং এতে দুর্বলতাও রয়েছে। একজন বর্ণনাকারীর নাম নেই। এরূপ হাদীস দলীলের যোগ্য নয়। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, اِحْصَانٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বিবাহ। হযরত ইবনে আব্বাস

(রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), ইকরামা (রঃ), তাউস (রঃ), ইবনে যুবাইর (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখের এটাই উক্তি।

হযরত আবূ আলী তাবারী (রঃ) স্বীয় 'ঈযাহ্' নামক গ্রন্থে হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) হতে এটাই নকল করেছেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, 'দাসীর مُحْصَن হওয়ার অর্থ এই যে, সে কোন স্বাধীন ব্যক্তির সাথে বিবাহিতা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দাসের اِحْصَانٌ হওয়া এই যে, সে কোন স্বাধীনা মুসলিমা নারীর সাথে বিবাহিত হয়।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা নকল করা হয়েছে। হযরত শা'বী (রঃ) ও হযরত নাখঈও (রঃ) একথাই বলেন। এটাও বলা হয়েছে যে, এ দু' পঠন হিসেবে অর্থ কখনও পরিবর্তিত হয়ে যায়। 'উহ্সিন্না' শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বিবাহ এবং 'আহ্সান্না' শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ইসলাম। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাই পছন্দ করেন। কিন্তু বাহ্যতঃ ভাবার্থ এখানে বিবাহই হবে। কেননা, আয়াতের পরবর্তী আলোচনা ওটাই প্রমাণ করছে। 'আইমানের' বর্ণনা তো শব্দসমূহের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।"

মোটকথা জমহূরের মাযহাব অনুযায়ী আয়াতটির অর্থে এখনও জটিলতা রয়েছে। কেননা, জমহূরের উক্তি এই যে, দাসীকে ব্যভিচারের কারণে ৫০ চাবুক মারতে হবে, সে মুসলমানই হোক আর অবিশ্বাসিনীই হোক, বিবাহিতাই হোক বা অবিবাহিতাই হোক। অথচ আয়াতের অর্থে বুঝা যাচ্ছে যে, অবিবাহিতা দাসীর উপর কোন হদ্দই নেই (শাস্তিই নেই)। এর বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে। জমহূরের উক্তি এই যে, প্রকাশ্য অর্থ ভাবার্থের উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। এ জন্যে যে সাধারণ হাদীসগুলোর মধ্যে দাসীদের হদ্দ মারার বর্ণনা রয়েছে ঐগুলোকে আমরা এ আয়াতের ভাবার্থের উপর অগ্রগণ্য করেছি।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিজেদের দাসীদের উপর 'হদ্দ' প্রতিষ্ঠিত কর, তারা বিবাহিতাই হোক আর অবিবাহিতাই হোক। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তাঁর ব্যভিচারিণী দাসীকে ব্যভিচারের 'হদ্দ' (শাস্তি) মারার নির্দেশ প্রদান করেন। সে সময় দাসীটি 'নিফাসের' অবস্থায় ছিল বলে আমার ভয় হয় যে, না জানি সে হদ্দের চাবুক মারার কারণে মরেই যায়। তাই আমি সে সময় তাকে শাস্তি না দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তুমি ভাল কাজই করেছ। সে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত 'হদ্দ' লাগাবে না।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ 'সে নিফাস হতে মুক্ত হলে তাকে পঞ্চাশ কোড়া মারবে।' হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ 'যখন তোমাদের মধ্যে কারও দাসী ব্যভিচার করে এবং তা প্রকাশ পেয়ে যায় তখন সে যেন তাকে হদ্দ মারে, কিন্তু যেন তাকে শাসন গর্জন না করে। দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে তবে আবার যেন শাস্তি দেয়, কিন্তু এবারেও যেন শাসন গর্জন না করে। তৃতীয়বার যদি যিনা করে এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে যেন তাকে বিক্রি করে দেয়, যদিও চুলের রশির বিনিময়েও হয়।'

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যদি তৃতীয়বার তার দ্বারা এ কাজ হয় তবে চতুর্থবার যেন বিক্রি করে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবূ রাবী আল্‌মাখযুমী (রঃ) বলেন, 'আমাদের কয়েকজন কুরাইশ যুবককে হযরত উমার ফারূক (রাঃ) রাষ্ট্রীয় দাসীদের কয়েক জনকে হদ্দ মারার নির্দেশ দেন। আমরা তাদেরকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পঞ্চাশ চাবুক মারি।' এটা তাঁদেরই দ্বিতীয় উত্তর যাঁরা একথার দিকে গেছেন যে, অবিবাহিতা দাসীদের উপর কোন শাস্তি নেই। তাঁরা বলেন যে, এ প্রহার শুধুমাত্র আদব দেয়ার জন্যে এবং এ কাজ হতে বিরত রাখার জন্যে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ দিকেই গিয়েছেন। তাউস (রঃ), সাঈদ (রঃ), আবূ উবায়েদ (রঃ) এবং দাউদ ইবনে আলী আয্‌যাহেরীরও (রঃ) এটাই মাযহাব। তাঁদের বড় দলীল হচ্ছে আয়াতের ভাবার্থ এবং শর্তের ভাবার্থ এটাই। অধিকাংশের নিকট এটাই নির্ভরযোগ্য। এ জন্যেই এটা সাধারণের উপর অগ্রগণ্য হতে পারে। আর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন, 'যখন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করে তখন তার হুকুম কি?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদি সে ব্যভিচার করে তবে তাকে হদ্দ লাগাও, যদি পুনরায় ব্যভিচার করে তবে পুনরায় চাবুক মার, অতঃপর তাকে চুল দ্বারা পাকান রজ্জুর বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও।'

হাদীসটির বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব (রঃ) বলেন, 'আমি জানিনা যে, তৃতীয়বারের পর বলেছেন কি চতুর্থবারের পর বলেছেন।' সুতরাং এ হাদীসটিকে অবলম্বন করে তাঁরা উত্তর দেন, 'দেখুন এখানে হদ্দের পরিমাণ ও চাবুকের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু বিবাহিতার ব্যাপারে পরিষ্কার বর্ণনা

দেয়া হয়েছে এবং কুরআন পাকের মধ্যে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, দাসীদের শাস্তি হচ্ছে স্বাধীনা নারীদের অর্ধেক। সুতরাং কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের মধ্যে এভাবে আনুকল্য করা ওয়াজিব হয়ে গেল'। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এর চেয়েও অধিকতর স্পষ্ট হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা হযরত সাঈদ ইবনে মানসুর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নকল করেছেন। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কোন দাসীর উপর হদ্দ নেই যে পর্যন্ত না সে বিবাহিতা হয়। অতএব যখন সে বিবাহিতা হবে তখন তার উপর বিবাহিতা স্বাধীনা নারীর অর্ধেক হদ্দ হবে।' ইবনে খুযাইমাও (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, হাদীসটিকে মারফূ' বলা ভুল, বরং এটা মাওকুফ হাদীস। অর্থাৎ এটা হযরত ইবনে আব্বাসেরই (রাঃ) উক্তি। বায়হাকী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ফায়সালাও এটাই। তিনি বলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসগুলো একই ঘটনার মীমাংসা।

আর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিরও কয়েকটি উত্তর রয়েছে। একতো এই যে, এটাকে উঠানো হয়েছে ঐ দাসীর উপর যে বিবাহিতা। এরূপে হাদীসদ্বয়ের মধ্যে আরও সাদৃশ্য একত্রিত হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় এই যে, এ হাদীসের 'হদ্দ' শব্দটি কোন বর্ণনাকারী ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তার দলীল হচ্ছে উত্তরের প্রতারণা। তৃতীয় এই যে, এ হাদীসটি হচ্ছে দু'জন সাহাবীর এবং ঐ হাদীসটি শুধু একজন সাহাবীর এবং দুই ও একের মধ্যে দুই-ই অগ্রগণ্য। এভাবেই এ হাদীসটি সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে এবং ওর সনদ সহীহ্ মুসলিমের শর্তের উপর রয়েছে যে, হযরত ইবাদ ইবনে তামীম (রঃ) তাঁর চাচা বদরী সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন দাসী ব্যভিচার করে তখন তাকে চাবুক মার, আবার করে তো আবার মার, পুনরায় ব্যভিচার করলে পুনরায় চাবুক মার, অতঃপর চুল দ্বারা পাকান একটি রজ্জুর বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও'।

চতুর্থ উত্তর এই যে, কোন বর্ণনাকারী যে (جَلْدٌ) -এর উপর حَدٌّ শব্দের প্রয়োগ করেছেন এতে কোন বৈচিত্র নেই এবং তিনি হয়তো 'জিল্দ'কে 'হদ্দ' ধারণা করে থাকবেন কিংবা হয় তো আদব দেয়ার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেয়ার উপর হদ্দ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন হদ্দ শব্দের প্রয়োগ ঐ শাস্তির উপরও করা

হয়েছে যে রুগ্ন ব্যভিচারীকে একটি খেজুরের গুচ্ছ দ্বারা প্রহার করেছিল যে গুচ্ছে ছোট ছোট একশটি শাখা ছিল। আর যেমন 'হদ্দ' শব্দের প্রয়োগ ঐ ব্যক্তির উপরও করা হয়েছে যে স্বীয় স্ত্রীর ঐ দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল যে দাসীকে তার স্ত্রী তার জন্যে হালাল করেছিল। তবুও তাকে শুধুমাত্র শাসনমূলক শাস্তির জন্যে একশ চাবুক মারা হয়েছিল।

এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীর ধারণা। কিন্তু প্রকৃত 'হদ্দ' শুধু এই যে, অবিবাহিতকে একশ চাবুক মারা হবে এবং বিবাহিতকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর ঘোষণা এই যে, দাসীর যে পর্যন্ত বিয়ে না হবে সে পর্যন্ত তাকে ব্যভিচারের জন্যে প্রহার করা হবে না। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু এর দু'টো অর্থ হতে পারে। একতো এই যে, তাকে মোটেই প্রহার করা হবে না। 'হদ্দের'ও না, অন্য কোন শাস্তিরও না। এটা অর্থ হলে এ উক্তি সম্পূর্ণই গারীব। হতে পারে যে, তিনি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেই এ ফতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট হয়তো হাদীস পৌঁছেনি। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাকে হদ্দ মারা হবে না। যদি এ অর্থ নেয়া হয় তবে এটা ওর উল্টো নয় যে, তাকে অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে। তাহলে এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষীর ফতওয়ার অনুরূপ হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই আছে।

তৃতীয় উত্তর এই যে, বিবাহিতা দাসীর উপর স্বাধীনা নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি হওয়ার প্রমাণ আয়াতে কারীমায় রয়েছে। কিন্তু বিবাহিতা হওয়ার পূর্বে কিতাব ও সুন্নাতের সাধারণত্বের মধ্যে এও জড়িত রয়েছে যে তাকেও একশ চাবুক মারা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থাৎ 'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে একশ চাবুক মার।' (২৪ঃ ২)

আর যেমন হযরত 'উবাদা' ইবনে সামিত (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর, আমার কথা বুঝে নাও, আল্লাহ তাদের জন্যে রাস্তা বের করে দিয়েছেন, যদি উভয়ই অবিবাহিত ও অবিবাহিতা হয় তবে একশ চাবুক ও এক বছর নির্বাসন। আর যদি দু'জনই বিবাহিত ও বিবাহিতা হয় তবে এক বছর নির্বাসন ও প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করণ'।

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম শরীফেও রয়েছে এবং এ প্রকারের আরও হাদীস রয়েছে। হযরত দাঊদ ইবনে আলী আয্যাহেরী (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বিবাহিতা দাসীদেরকে স্বাধীনা নারীদের তুলনায় অর্ধেক চাবুক মারার বর্ণনা দিয়েছেন অর্থাৎ পঞ্চাশ চাবুক। তাহলে যদি সে বিবাহিতা না হয় তদুপরি তাকে তার চেয়েও অধিক চাবুক কিরূপে মারা যেতে পারে? অথচ শরীয়তের তো আইন এই যে, বিবাহের পূর্বে শাস্তি কম হবে এবং বিবাহের পর শাস্তি বেশী হবে। সুতরাং এর বিপরীত কিরূপে সঠিক হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর সাহাবীগণ অবিবাহিতা দাসীর ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন এবং তিনি উত্তর দিচ্ছেনঃ 'তাকে চাবুক মার'। কিন্তু 'একশ চাবুক মার' একথা বলছেন না। সুতরাং যদি তার এ হুকুমই হতো, যেমন দাঊদ ইবনে আলী আয্যাহেরী (রঃ) বুঝেছেন, তবে সে হুকুম বর্ণনা করে দেয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়াজিব হতো। কেননা, তাঁদের এ প্রশ্ন তো শুধু এজন্যেই ছিল যে, দাসী বিবাহিতা হয়ে যাওয়ার পর তাকে একশ চাবুক মারার বর্ণনা দেয়া হয়নি। নচেৎ এ শর্ত লাগানোর কি প্রয়োজন ছিল যে, তাঁরা বলছেন, 'যদি সে বিবাহিতা না হয়?' কেননা, ঐরূপ হলে বিবাহিতা ও অবিবাহিতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না যদি এ আয়াত অবতীর্ণ না হতো।

কিন্তু যেহেতু এ দু' অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হয়েই গিয়েছিলেন, এ জন্যেই দ্বিতীয় অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাহাবীগণ যখন রাসূলল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর উপর দরূদ পাঠ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তা বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'ইসলাম তো এরকমই যেরকম তোমাদের জানা আছে।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (৩৩ ঃ ৫৬) আল্লাহ তা'আলার এ ফরমান অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)- এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠাবার নির্দেশ দেয়া হয় তখন সাহাবীগণ বলেন, 'সালামের নিয়ম ও ওর শব্দগুলো তো আমাদের জানা আছে, আপনি 'সালাতের' অবস্থা বর্ণনা করুন।' সুতরাং এ প্রশ্নটিও ঠিক ঐ রকমই।

আয়াতের 'মাফহুমের' চতুর্থ উত্তর হচ্ছে আবূ সাওরের উত্তর যা দাউদের উত্তর হতেও বেশী দুর্বল। তিনি বলেন, 'যখন দাসীরা বিবাহিতা হয়ে যাবে তখন তাদের ব্যভিচারের 'হদ্দ' হবে বিবাহিতা স্বাধীনা ব্যভিচারিণী নারীদের হদ্দের অর্ধেক।' তাহলে এটাতো স্পষ্ট কথা যে, বিবাহিতা স্বাধীনা ব্যভিচারিণী নারীদের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা। আর এটাও স্পষ্ট কথা যে, এরূপ শাস্তির অর্ধেক করা যায় না। সুতরাং সে অবস্থায় দাসীদেরকেও হত্যা করতে হয় এবং বিবাহের পূর্বে পঞ্চাশ চাবুক মারতে হয়। কেননা, বিবাহের পূর্বে স্বাধীনা নারীদের একশ চাবুক মারার নির্দেশ রয়েছে।

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে ভাবার্থ বুঝতেই তিনি ভুল করেছেন। এটা জমহূরের মতেরও বিপরীত। এমন কি ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন, 'কোন মুসলমানের এতে মতবিরোধ নেই যে, দাস দাসীর ব্যভিচারের শাস্তি 'রজম' অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করা মোটেই নয়। কেননা, আয়াত এটা প্রমাণ করছে যে, তাদের উপর স্বাধীনা নারীদের তুলনায় অর্ধেক শাস্তি। اَلْمُحْصَنٰتُ শব্দে যে اَلِفْ لَام রয়েছে তা হচ্ছে عَهْد -এর আলিফ লাম। অর্থাৎ সেই مُحْصَنٰتُ -এর মধ্যে যাদের বর্ণনায় আয়াতের প্রারম্ভের اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ -এর মধ্যে হয়ে গেছে। এর ভাবার্থ শুধুমাত্র স্বাধীনা নারীগণ। এ সময় এখানে স্বাধীনা নারীদের বিবাহের মাসআলার আলোচনা নয় বরং আলোচনা হচ্ছে এই যে, ইরশাদ হচ্ছে– 'স্বাধীন নারীদের ব্যভিচারের যে শাস্তি ছিল, দাসীদের উপর তার অর্ধেক শাস্তি।' তাহলে জানা গেল যে, এটা ঐ শাস্তির বর্ণনা, যা অর্ধেক হতে পারে এবং তা হচ্ছে চাবুক। যেমন একশর অর্ধেক পঞ্চাশ। কিন্তু 'রজম' এমন এক শাস্তি যার অংশ হতে পারে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে একটি ঘটনা রয়েছে, যা আবূ সাউরের মাযহাবের পূর্ণ খণ্ডনকারী। ঘটনাটি এই যে, সুফিয়া নাম্নী একটি দাসী একজন দাসের সঙ্গে ব্যভিচার করে এবং ঐ ব্যভিচারের ফলেই একটি শিশুর জন্ম হয়। ব্যভিচারী দাসটি শিশুটির দাবী করে। মুকাদ্দমাটি হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর এর মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং এ ব্যাপারে যে মীমাংসা করেছেন আমিও সে মীমাংসাই করবো। শিশুটি হবে দাসীর মনিবের এবং ব্যভিচারীর জন্যে পাথর রয়েছে।' অতঃপর উভয়কে পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে চাবুক মারেন।

এও বলা হয়েছে যে, 'মাফহূম'–এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উপর হতে নীচের উপর সতর্কতা। অর্থাৎ যখন সে বিবাহিতা হবে তখন তার 'হদ্দ' হবে স্বাধীনা নারীদের তুলনায় অর্ধেক। অতএব, তাদের উপর 'রজম' তো কোন অবস্থাতেই নেই। বিয়ের পূর্বেও নেই, পরেও নেই। উভয় অবস্থাতেই শুধু চাবুকই রয়েছে। এর দলীল হচ্ছে হাদীস। 'ইফসাহ' নামক গ্রন্থের লেখক এ কথাই বলেন। ইবনে আবদিল হাকাম (রঃ) ইমাম শাফিঈ (রঃ) হতেও এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হকী স্বীয় পুস্তক কিতাবুস সুনানে ওয়াল আ'সারের মধ্যে এটা এনেছেন। কিন্তু এ উক্তিটি আয়াতের শব্দ হতে বহু দূরে রয়েছে। কেননা, অর্ধেক শাস্তি হবার দলীল শুধু কুরআন কারীমের আয়াত, অন্য কিছুই নয়। সুতরাং ওটা ছাড়া অন্য কিছুর অর্ধেক হওয়া কিরূপে বুঝা যাবে?

এটাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে বিবাহিতা হওয়া অবস্থায় শুধুমাত্র ইমামই 'হদ্দ' কায়েম করতে পারেন, ঐ অবস্থায় ঐ দাসীর মনিব তার উপর 'হদ্দ' জারী করতে পারে না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবে একটি উক্তি এটাই। তবে বিয়ের পূর্বে দাসীর মনিবের ঐ অবস্থায় তার উপর 'হদ্দ' জারী করার অধিকার রয়েছে এমন কি তার উপর নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই 'হদ্দ' অর্ধেকই থাকবে। এটাও কিন্তু বহু দূরের কথা। কেননা, আয়াতের মধ্যে এরও প্রমাণ নেই। যদি এ আয়াতটি না হতো তবে আমরা জানতে পারতাম না যে, দাসীদের ব্যাপারে অর্ধেক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে এবং সে অবস্থায় তাদেরকেও সাধারণেই অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণ 'হদ্দ' অর্থাৎ একশ চাবুক এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার হুকুম তাদের উপরও জারী করা ওয়াজিব হতো। যেমন সাধারণ বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত রয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'হে জনগণ! তোমাদের অধীনস্থা দাসীদের উপর 'হদ্দ' জারী কর। বিবাহিতাই হোক আর অবিবাহিতাই হোক। তাছাড়া পূর্ব বর্ণিত অন্যান্য সাধারণ হাদীসগুলোর মধ্যেও স্বামীবিশিষ্টা বা স্বামীহীনার কোন ব্যাখ্যা নেই। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে হাদীসটিকে জমহূর দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন তা এই যে, যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যভিচার করে, অতঃপর তার ব্যভিচার প্রকাশিত হয় তখন তার উপর 'হদ্দ' জারী করা তার উচিত এবং পরে শাসন গর্জন করা উচিত নয়।

মোটকথা, দাসীর ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ এই যে, তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে পঞ্চাশ চাবুক মারতে হবে

এবং বিয়ে হওয়ার পরেও এ শাস্তিই থাকবে। কিন্তু তাকে নির্বাসন দেয়া হবে কি-না সে ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, তাকে নির্বাসন দেয়া হবে। দ্বিতীয় এই যে, তাকে নির্বাসন দেয়া হবে না। তৃতীয় উক্তি এই যে, তার নির্বাসন অর্ধসমাপ্ত রাখা হবে। অর্থাৎ ছ'মাসের নির্বাসন হবে, পূর্ণ এক বছরের নয়। পূর্ণ এক বছর নির্বাসন হলো স্বাধীনা নারীদের জন্যে। এ তিনটি উক্তিই ইমাম শাফিঈর মাযহাবেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে নির্বাসন শুধুমাত্র শাসনমূলক শাস্তি, 'হদ্দ' হিসেবে নয়। এটা ইমামের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তিনি নির্বাসন দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। পুরুষ ও নারী উভয়ই এ হুকুমেরই অন্তর্গত।

তবে ইমাম মালিকের মাযহাব এই যে, নির্বাসন শুধু পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। কেননা, নির্বাসন তো শুধু তার নিরাপত্তার জন্যে এবং নারীদেরকে যদি নির্বাসন দেয়া হয় তবে নিরাপত্তা হতে বেরিয়ে যাবে। নর ও নারীদেরকে দেশান্তর করা সম্বন্ধীয় হাদীস শুধুমাত্র হযরত উবাদাহ ইবনে সাবিত (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবিবাহিতা ব্যভিচারীর ব্যাপারে 'হদ্দ' মারার এবং এক বছর দেশান্তর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী) এর ভেতরে উদ্দেশ্যে এটাই ছিল যে, এতে তার নিরাপত্তা থাকবে, কিন্তু নারীকে দেশান্তর করাতে কোন নিরাপত্তা নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, অবিবাহিতা দাসীকে ব্যভিচারের কারণে পঞ্চাশ চাবুক মারতে হবে এবং তাকে আদব দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু মারপিট করতে হবে। কিন্তু তার জন্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বিবাহের পূর্বে তাকে মারা হবে না, যেমন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ)-এর উক্তি। কিন্তু যদি তার ভাবার্থ এই হয় যে, তাকে মোটেই না মারা উচিত তবে এটা জটিল ব্যাখ্যাযুক্ত মাযহাব হবে। নচেৎ তাকে দ্বিতীয় উক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।

সে উক্তিটি এই যে, বিবাহের পূর্বে একশ চাবুক এবং বিবাহের পর পঞ্চাশ চাবুক। যেমন দাউদ ইবনে আলী আযযাহেরীর উক্তি এবং এটাই হচ্ছে সমস্ত উক্তির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল উক্তি এবং এটাও তদ্রূপ যে, বিয়ের পূর্বে পঞ্চাশ

চাবুক ও বিয়ের পর 'রজম'। যেমন আবূ সাউরের উক্তি। সঠিক কথা আল্লাহ পাকই সবচেয়ে বেশী জানেন।

এরপরে বলা হচ্ছে–'উপরোক্ত শর্তগুলোর বিদ্যমানতায় দাসীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হলো ঐ লোকদেরকে যাদের ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় রয়েছে এবং স্ত্রী মিলনের উপর ধৈর্যধারণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে অবশ্যই পবিত্র দাসীদের সাথে বিবাহ বৈধ।' সে সময়েও কিন্তু ধৈর্যধারণ করতঃ দাসীদেরকে বিয়ে না করাই উত্তম। কেননা, তাদের গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তারা তাদের মনিবের দাসী বা দাস হবে। হ্যাঁ, তবে যদি তাদের স্বামী দরিদ্র হয় তবে ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর প্রাচীন উক্তি অনুযায়ী এ সন্তানগুলোর অধিকারী তাদের মনিব হবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তবে এটা তোমাদের জন্যে উত্তম এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। জমহূর উলামা এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দাসীর সঙ্গে বিবাহ বৈধ। তবে এটা অবশ্যই বৈধ সে সময় যে সময় স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকবে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করারও শক্তি থাকবে না। বরং ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় থাকবে। কেননা, এতে একটি অসুবিধা এই রয়েছে যে, এর ফলে সন্তানেরা দাসত্বে আবদ্ধ হয় এবং স্বাধীনা নারীদেরকে ছেড়ে দিয়ে দাসীদেরকে বিয়ে করায় এক প্রকারের মানহানির কারণ হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও তাঁর সহচরগণ জমহূরের বিপরীত মতপোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, এ দু'টো শর্ত নেই বরং যার বিয়েতে কোন স্বাধীনা নারী নেই তার জন্যে দাসীকে বিয়ে করা বৈধ। ঐ দাসী মুসলমানই হোক বা আহলে কিতাবই হোক, যদিও তার আযাদ নারীকে বিয়ে করার ক্ষমতাও থাকে এবং যদিও তার নির্লজ্জতার কাজে পতিত হওয়ার ভয়ও না থাকে। এর বড় দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ 'এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পবিত্র ও পরহেজগার নারীদেরকে (বিয়ে কর)।' তাঁরা বলেন যে, আয়াতটি সাধারণ। এর মধ্যে স্বাধীনা ও দাসী সবাই জড়িত রয়েছে। مُحْصَنٰتٌ বলা হয় পবিত্র ও পরহেযগার মহিলাদেরকে। কিন্তু এর বাহ্যিক লক্ষণও ঐ মাসআলার উপরই রয়েছে যা জমহূরের মাযহাব। এ বিষয়ে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্যে বর্ণনা করতে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে করেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

٢٦- يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

২৭। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে করেন এবং যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা ইচ্ছে করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও।

٢٧- وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

২৮। আল্লাহ তোমাদের সাথে লঘু ব্যবহার করতে চান–যেহেতু মানুষ দুর্বল (রূপে) সৃষ্ট হয়েছে।

٢٨- يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

কুরআন ঘোষণা করে– 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হালাল ও হারাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান, যেমন এ সূরায় এবং অন্যান্য সূরাসমূহে তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তাঁর শরীয়তের উপর আমল করতে থাক যে কাজ তাঁর নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায়কার্য হতে তোমরা তাওবা করে থাক সে তাওবা তিনি সত্বর কবূল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়। স্বীয় শরীয়তে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কার্যে ও স্বীয় ঘোষণায় তিনি সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণ নিপুণতার অধিকারী। প্রবৃত্তি পূজারীরা অর্থাৎ শয়তানের দাস ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা এবং অসৎ লোকেরা তোমাদের পদস্খলন ঘটিয়ে তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথে চালাতে চায়। আল্লাহ তা'আলা শরীয়তের আহকাম নির্ধাণের ব্যাপারে তোমাদের পথ সহজ করতে চান এবং এর উপর ভিত্তি করেই কতগুলো শর্ত

আরোপ করতঃ দাসীদেরকে বিয়ে করে নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ করেছেন। মানুষ জন্মগত দুর্বল বলে মহান আল্লাহ স্বীয় আহকামের মধ্যে কোন কাঠিন্য রাখেননি। মানুষ সৃষ্টিগতই দুর্বল বলে তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি দুর্বল। তারা স্ত্রীদের ব্যাপারে দুর্বল। তারা এখানে এসে একেবারে বোকা বনে যায়।

তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মিরাজের রাত্রে 'সিদরাতুল মুনতাহা' হতে ফিরে আসেন এবং হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি রাসূল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনার উপর কি ফরয করা হয়েছে?' তিনি বলেনঃ 'প্রত্যহ দিন রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।' তখন হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ 'আপনি ফিরে যান এবং মহান আল্লাহর নিকট লঘুকরণের জন্যে প্রার্থনা করুন। আপনার উম্মতের মধ্যে এটা পালনের শক্তি নেই। আপনার পূর্ববর্তী লোকদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি। তারা এর চেয়ে বহু কমেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আর আপনার উম্মত তো কর্ণের, চক্ষুর এবং অন্তরের দুর্বলতায় তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরে যান এবং দশ ওয়াক্ত কমিয়ে আনেন। পুনরায় হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে একই আলোচনা হয়। তিনি পুনরায় ফিরে যান এবং আবার দশ ওয়াক্ত কম করিয়ে আনেন। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত থেকে যায়।

২৯। হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল।

٢٩- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

৩০। আর সীমা অতিক্রম করে ও অত্যাচার করে যে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।

٣٠- وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

৩১। তোমরা যদি সেই মহা পাপসমূহ হতে বিরত হও যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো এবং তোমাদেরকে সম্মান-প্রদ গন্তব্যস্থানে প্রবিষ্ট করবো।

٣١- اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ○

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে নিষেধ করছেন। সে উপার্জনের দ্বারাই হোক যা শরীয়তে হারাম, যেমন–সুদ খাওয়া, জুয়া খেলা বা এরকমই প্রত্যেক প্রকারের কৌশলের দ্বারাই হোক, যদিও এটাকে শরীয়তে বৈধ রাখা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হচ্ছে, একটি লোক কাপড় ক্রয় করছে এবং বলছে, 'আমার যদি পছন্দ হয় তবে রেখে দেব, নচেৎ কাপড় এবং একটি দিরহাম ফিরিয়ে দেব'। এর হুকুম কি? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ তাকে অন্যায়ভাবে মাল ভক্ষণকারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি 'মুহাকাম' অর্থাৎ রহিত নয়। এটা কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন মুসলমানগণ একে অপরের মাল ভক্ষণ করা পরিত্যাগ করেন। যার ফলে لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ (৪৮ঃ ১৭) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তিজারাতান শব্দটিকে তিজারাতুনও পড়া হয়েছে। এটি اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ- যেমন বলা হচ্ছে–'অবৈধতাযুক্ত কারণসমূহ দ্বারা মাল জমা করো না।' কিন্তু শরীয়তের পন্থায় ব্যবসা দ্বারা লাভ করা বৈধ, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। যেমন অন্য জায়গায় বলা হয়েছে–'কোন নিষ্পাপ প্রাণকে মেরো না। তবে হকের সঙ্গে হলে জায়েয আছে।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–'তথায় তারা প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।'

হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করে বলেন, 'সম্মতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। কেননা, এটাই হচ্ছে সম্মতির পূর্ণ সনদ। শুধুমাত্র আদান-প্রদান কখনও সম্মতির উপর দলীল হতে পারে না।' জমহুর এর বিপরীত

মতপোষণ করেন। অন্যান্য তিনজন ইমামের উক্তি এই যে, মৌখিক কথা বার্তা যেমন সম্মতির প্রমাণ, তদ্রূপ আদান-প্রদানও সম্মতির দলীল। কোন কোন মনীষী বলেন যে, কম মূল্যবান সাধারণ জিনিসে শুধু লেন-দেনই যথেষ্ট এবং এরকমই ব্যবসার সে নিয়ম থাকে। সহীহ মাযহাবে তো সতর্কতামূলক দৃষ্টিতে কথা বার্তায় স্বীকৃতি থাকা অন্য কথা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় হোক বা দান হোক, সব কিছুর মধ্যেই এ হুকুম রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীর (রঃ)-এর একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছেঃ 'ব্যবসা হচ্ছে সম্মতি এবং ব্যবসার পরেই ইখতিয়ার রয়েছে। কোন মুসলমানের অন্য মুসলমানকে প্রতারিত করা বৈধ নয়।' এ হাদীসটি 'মুরসাল'। মজলিসের শেষ পর্যন্তও পূর্ণ সম্মতির অধিকার রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার রয়েছে।' এ হাদীস অনুসারেই ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং তার সহচরদের ফতওয়া রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূরেরও ফতওয়া এর উপরে ভিত্তি করেই। এ পূর্ণ সম্মতির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের তিন দিন পরে ইখতিয়ার দেয়াও জড়িত রয়েছে যদিও সে ইখতিয়ার পূর্ণ এক বছরের জন্যেও হয়, যেমন গ্রামবাসী প্রভৃতি লোকদের মধ্যে রয়েছে।

ইমাম মালিক (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব এটাই, যদিও তাঁর মতে শুধুমাত্র আদান-প্রদান দ্বারাই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে থাকে। শাফিঈ মাযহাবেরও একটা উক্তি এটাই এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, মানুষ ব্যবসায়ের জন্যে যে অল্প মূল্যের সাধারণ জিনিস রেখে থাকে তাতে শুধুমাত্র আদান- প্রদানই যথেষ্ট হবে। আসহাবের কারও কারও ইখতিয়ার এটাই, যেমন মুত্তাফাকুন আলাইহি।

এরপর বলা হচ্ছে–'আল্লাহ তা'আলার হারাম কাজগুলো করে এবং তাঁর অবাধ্য হয়ে, আর অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধ দয়ায় পরিপূর্ণ'।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আমর ইবনে আল আস (রাঃ)-কে 'যাতুস্‌সালাসিলের' যুদ্ধের বছরে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি

বলেন, একদা কঠিন শীতের রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হয়, এমনকি গোসল করাতে আমি আমার জীবনের উপর ভয় করি। সুতরাং আমি তায়াম্মুম করে নিয়ে আমার জামাআতকে ফজরের নামায পড়িয়ে দেই। অতঃপর ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই। তাঁর নিকট আমি আমার এ ঘটনাটি বর্ণনা করি।

তিনি বলেনঃ 'তুমি কি তাহলে অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদেরকে নামায পড়িয়েছ?' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কঠিন ঠাণ্ডা ছিল এবং আমার প্রাণের ভয় ছিল। অতঃপর আমার মনে পড়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না।' একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠেন এবং আমাকে কিছুই বলেননি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরাই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করায় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) এ ওযর পেশ করেছিলেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছেঃ 'যে ব্যক্তি কোন লোহা দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে লোহা দ্বারা আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি জেনে-শুনে জীবন দেয়ার উদ্দেশ্যে বিষপান করবে, সে সদা-সর্বদার জন্যে জাহান্নামে বিষপান করতে থাকবে।'

আর একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ 'যে নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণায় রয়েছেঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে একটি লোক আহত হয়। সে ছুরি দিয়ে স্বীয় হাত কেটে দেয়। রক্ত বন্ধ হয় না এবং তাতেই সে মারা যায়। তখন আল্লাহ পাক বলেন–'আমার বান্দা নিজেকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করেছে, সুতরাং আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।'

এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন–'যে কেউ অত্যাচার ও সীমা অতিক্রম করে একাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরত্বপণা দেখিয়ে ঐ কাজ করবে, সে জাহান্নামী হবে।' সুতরাং প্রত্যেকেরই এ কঠিন ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ শ্রবণ করতঃ হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তোমরা যদি বড় বড় পাপ হতে বেঁচে থাক তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো।'

হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমরা ওর মত কিছুই দেখিনি যা আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, অতঃপর আমরা তাঁর জন্যে আমাদের পরিবার ও সম্পদ হতে পৃথক হবো না যে, তিনি আমাদের বড় বড় পাপগুলো ছাড়া ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন'। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। আমরা কিছু কিছু এখানে বর্ণনা করছি।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ 'জুম'আর দিন কি, তা তুমি জান কি'? আমি উত্তরে বলি, ওটা ঐদিন যে দিনে আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি জমা করেন।'

তিনি বলেনঃ 'আমি যা জানি তা শুন। যে ব্যক্তি এ দিন ভালভাবে পবিত্রতা লাভ করতঃ জুম'আর নামাযের জন্যে আগমন করে এবং নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করে, তার সে কাজ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত সমস্ত পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হত্যা কাজ হতে বেঁচে থাকে'।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত সাঈদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ভাষণ দান কালে বলেনঃ 'যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ!' এ কথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি মাথা নীচু করেন। আমরা সকলেই নীচু করি এবং জনগণ কাঁদতে আরম্ভ করে। আমাদের অন্তর কেঁপে উঠে যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) কোন্ জিনিসের উপরই বা শপথ করলেন এবং নীরবতাই বা অবলম্বন করলেন কেন? অল্পক্ষণ পরে তিনি মস্তক উত্তোলন করেন এবং তাঁর চেহারা প্রফুল্ল ছিল, যা দেখে আমরা এত খুশী হই যে, আমরা লাল রঙ্গের উট পেলেও এত খুশী হতাম না। তখন তিনি বলতে আরম্ভ করেনঃ 'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, যাকাত আদায় করে এবং সাতটি কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, তার জন্যে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে রাখা হবে এবং তাকে বলা হবে–'নিরাপত্তার সাথে তথায় চলে যাও।'

তাতে যে সাতটি পাপের উল্লেখ আছে তার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নিম্নরূপ এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ধ্বংসকারী সাতটি পাপ

হতে তোমরা বেঁচে থাক।' জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐপাপগুলো কি?' তিনি বলেনঃ '(১) আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা। (২) যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ তাকে হত্যা করা, তবে শরীয়তের কোন কারণে যদি তার রক্ত হালাল হয় সেটা অন্য কথা। (৩) যাদু করা। (৪) সুদ ভক্ষণ করা। (৫) পিতৃহীনের মাল ভক্ষণ করা। (৬) কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা। (৭) সতীসাধ্বী পবিত্র মুসলমান নারীদেরকে অপবাদ দেয়া।'

একটি বর্ণনায় যাদুর পরিবর্তে 'হিজরত করার পর পুনরায় ফিরে এসে স্বদেশে অবস্থান' এ উক্তিটি রয়েছে। এটা অবশ্যই স্মরণযোগ্য কথা যে, উল্লিখিত সাতটি পাপকে কাবীরা বলার ভাবার্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র এগুলোই কাবীরা গুনাহ, যেমন কারও কারও এ ধারণা রয়েছে। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল কথা, বিশেষ করে ঐ সময়, যখন ওর বিপরীত দলীল বিদ্যমান থাকে। আর এখানেতো পরিষ্কার ভাষায় অন্যান্য কাবীরা গুনাহ্গুলোরও বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নলিখিত হাদীসগুলো দ্রষ্টব্যঃ

মুসতাদরিক-ই-হাকিমে রয়েছে যে, বিদায় হজ্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখো যে, নামাযীরা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, ফরয জেনে এবং পুণ্য লাভের নিয়ত করে খুশী মনে যাকাত আদায় করে, আর ঐ সমুদয় কাবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে যেগুলো হতে আল্লাহ্ দূরে থাকতে বলেছেন।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ কাবীরা গুনাহ্গুলো কি?' তিনি বলেনঃ 'শির্ক, হত্যা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন, পিতৃহীনের মাল ভক্ষণ, পবিত্র নারীদেরকে অপবাদ দেয়া, পিতা- মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন ও মরণের কিবলাহ্ বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা। জেনে রেখো যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত এ বড় বড় পাপগুলো হতে দূরে সরে থাকবে এবং নামায ও যাকাত নিয়মিতভাবে আদায় করবে, সে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সঙ্গে জান্নাতে সোনার অট্টালিকায় অবস্থান করবে'।

হযরত তায়লাস ইবনে মাইয়াস (রঃ) বলেন, আমি কয়েকটি পাপকার্য করে বসি যা আমার মতে কাবীরা গুনাহই ছিল। আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলি যে, আমি কয়েকটি পাপকার্য করেছি যেগুলোকে কাবীরা গুনাহ বলেই মনে করি। তিনি বলেন, ঐগুলো কি?

আমি বলি যে, আমি এই এই কাজ করেছি। তিনি বলেন, এগুলো কাবীরা গুনাহ্ নয়। আমি বলি যে, আমি আরও এই এই কাজ করেছি। তিনি বলেন, 'এগুলোও কাবীরা গুনাহ নয়।' এসো, আমি তোমাকে কাবীরা গুনাহগুলো গণনা করে শুনিয়ে দেই। ঐগুলো হচ্ছে নয়টি। (১) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা। (২) কাউকে বিনা কারণে হত্যা করা। (৩) যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। (৪) পবিত্রা নারীদেরকে অপবাদ দেয়া। (৫) সুদ ভক্ষণ করা। (৬) অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা। (৭) মসজিদ-ই-হারামে ধর্মদ্রোহীতা ছড়িয়ে দেয়া। (৮) যাদুকে বৈধ মনে করা। (৯) বিনা কারণে পিতা-মাতাকে কাঁদানো।

হযরত তায়লাস (রঃ) বলেন, 'এটা বর্ণনা করার পরেও হযরত ইবনে উমার (রাঃ) লক্ষ্য করেন যে, আমার ভয় তখনও কমেনি। কাজেই তিনি বলেন, তোমার কি জাহান্নামে প্রবেশের ভয় এবং জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা আছে?' আমি বলি, হ্যাঁ! তিনি বলেন, 'আচ্ছা, তোমার পিতা-মাতা বেঁচে আছেন কি?' আমি বলি, শুধু মা বেঁচে আছেন। তিনি তখন বলেন, 'আচ্ছা, তুমি তাঁকে নরম কথা বল, আহার করাতে থাক এবং এসব কাবারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, তাহলেই তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত তায়তাসা ইবনে আলী হিন্দী (রঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে আরাফা প্রান্তরে আরাফার দিনে 'পীলু' বৃক্ষের নীচে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় মস্তক ও চেহারার উপর পানি ঢালছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) অপবাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করেন, তখন আমি বলি, এটাও কি হত্যার মতই খুব বড় পাপ? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওর মধ্যে পাপসমূহের বর্ণনায় যাদুরও উল্লেখ রয়েছে।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ সন্ধ্যার সময় হয়েছিল এবং আমি তাঁকে কাবীরা গুনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, কাবীরা গুনাহ সাতটি।' আমি জিজ্ঞেস করি, কি কি? তিনি বলেনঃ 'শির্ক ও অপবাদ।' আমি বলি, এ দু'টোও কি রক্তের মতই অন্যায়? তিনি বলেনঃ 'হাঁ, হাঁ। আর কোন মুমিনকে বিনা কারণে হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা, যাদু করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন ও মৃত্যুর কিবলাহ্ বায়তুল্লাহ শরীফে ধর্মদ্রোহীতার কাজ করা।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহর যে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করে না, নামায সু-প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে এবং কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, সে জান্নাতী।' একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, 'কাবীরা গুনাহগুলো কি?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা, মুমিন প্রাণকে হত্যা করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা'।

ইবনে মিরদুওয়াই স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়ামানবাসীর নিকট একটি পত্র লিখিয়ে পাঠিয়ে দেন। যাতে ফরযসমূহ, সুন্নাতসমূহ এবং দিয়্যাত অর্থাৎ জরিমানার নির্দেশসমূহ লিখিত ছিল এবং এ পত্রখানা তিনি হযরত আমর ইবনে হাযাম (রাঃ)-এর হাতে তাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এ পত্রে নিম্নলিখিত কথাটিও ছিলঃ 'কিয়ামতের দিন বড় বড় পাপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হবে এই যে, মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করে, কোন মুমিন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে, মা-বাপের অবাধ্য হয়, স্ত্রীলোকেরা যে পাপ করেনি তাদের প্রতি এরূপ পাপের অপবাদ দেয়, যাদু শিক্ষা করে, সুদ খায় এবং ইয়াতিমের মাল ধ্বংস করে।'

অন্য বর্ণনায় কাবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাও রয়েছে। আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, কাবীরা গুনাহগুলো বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা কথার উল্লেখ করেন তখন তিনি সোজা হয়ে বসে পড়েন এবং বলেনঃ 'সাবধান! তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা কথা হতে দূরে থাকবে।' তিনি একথা বার বার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ বলেন, 'যদি তিনি নীরব হতেন।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি? তিনি বলেনঃ 'তা এই যে, তুমি অন্য কাউকে আল্লাহর অংশীদার কর, অথচ একমাত্র তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি জিজ্ঞেস করি, তার পরে কোন্‌টি ? তিনি বলেনঃ 'তার পরে এই যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তুমি তাকে হত্যা করে ফেল।' আমি জিজ্ঞেস করি, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেনঃ 'তারপরে এই

যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (২৫ঃ ৬৮) হতে اِلَّا مَنْ تَابَ (২৫ঃ ৭০) পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন।

মুসনাদ-ই-ইবনে হাতিমে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) মসজিদ-ই-হারামে হাতীমের মধ্যে বসে ছিলেন। তাঁকে এক ব্যক্তি মদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি বলেনঃ 'আমার মত বুড়ো বয়সের মানুষ কি এ স্থানে বসে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) উপর মিথ্যা কথা বলতে পারে?' অতঃপর তিনি বলেন, 'মদ্য পান হচ্ছে বড় পাপসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ। এ কাজ হচ্ছে সমস্ত দুশ্চরিত্রতার মূল। মদখোর ব্যক্তি নামায পরিত্যাগকারী হয়ে থাকে। সে স্বীয় মা, খালা এবং ফুফুর সাথে ব্যভিচার করতেও দ্বিধাবোধ করে না।' এ হাদীসটি গারীব।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ) এবং অন্যান্য আরও বহু সাহাবা-ই-কিরাম একবার একটি মজলিসে বসেছিলেন। তথায় কাবীরা গুনাহগুলোর আলোচনা চলছিল যে, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্‌টি? কারও নিকট সর্বশেষ উত্তর ছিল না। তখন তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে পাঠান যে, তিনি যেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে আসেন। তিনি তাঁর নিকট গমন করেন। তিনি উত্তরে বলেন যে, সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে মদ্যপান। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি ফিরে এসে উক্ত মজলিসে এ উত্তর শুনিয়ে দেই। কিন্তু মজলিসের লোক সান্ত্বনা লাভ করলেন না। সুতরাং তাঁরা সবাই উঠে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর বাড়ী গমন করেন এবং তাঁরা নিজেরাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন।'

তখন তিনি বর্ণনা করেনঃ জনগণ নবী (সঃ)-এর সামনে একটি ঘটনা বর্ণনা করে যে, বানী ইসরাঈলের বাদশাহদের মধ্যে একজন বাদশাহ্ একটি লোককে গ্রেফতার করে। অতঃপর লোকটিকে বলে, হয় তুমি জীবনের আশা ত্যাগ কর না হয় এ কাজগুলোর মধ্যে কোন একটি কর, অর্থাৎ মদ্যপান কর বা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা কর কিংবা শূকরের মাংস ভক্ষণ কর। লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর হাল্‌কা জিনিস মনে করে মদ্যপান করতে সম্মত হয়। কিন্তু মদ্যপান করা মাত্রই সে নেশার অবস্থায় ঐ সমুদয় কাজও করে বসে যা হতে সে পূর্বে বিরত ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ ঘটনাটি শুনে আমাদেরকে বলেনঃ 'যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল করেন না। আর যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত অবস্থাতেই মারা যায় এবং তার মূত্রস্থলীতে সামান্য পরিমাণও মদ্য থেকে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং যদি মদ্যপান করার পর চল্লিশ দিনের মধ্যেই মারা যায় তবে তার অজ্ঞতা যুগের মৃত্যু হয়ে থাকে।' এ হাদীসটি দুর্বল। অন্য একটি হাদীসে মিথ্যা শপথকেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাবীরা গুনাহ বলে গণ্য করেছেন। (সহীহ বুখারী ইত্যাদি)

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে মিথ্যা শপথের পর নিম্নের উক্তিও রয়েছেঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর শপথ করে কোন কথা বলে এবং তাতে মশার সমানও বাড়িয়ে কিছু বলে, তার অন্তরে একটা কাল দাগ হয়ে যায়, যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থেকে যায়।' মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মানুষের তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়াও কাবীরা গুনাহ।' জনগণ জিজ্ঞেস করে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মানুষ তার পিতা-মাতাকে কিরূপে গালি দেবে?' তিনি বলেনঃ 'এভাবে যে, সে অন্যের বাপকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার বাপকে গালি দেয়, সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার মাকে গালি দেয়।'

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ এই যে, মানুষ তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়।' জনগণ জিজ্ঞেস করে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরূপে হতে পারে?' তিনি বলেনঃ 'অন্যের মা-বাপকে বলে নিজের মা-বাপকে বলিয়ে নেয়া।' সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুসলমানকে গালি প্রদান মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করা হচ্ছে কুফরী।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কাবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে কোন মুসলমানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা এবং একটা গালির পরিবর্তে দু'টো গালি দেয়া। জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি বিনা ওযরে দু'টি নামাযকে একত্রিত করে, সে কাবীরা গুনাহসমূহের দু'টি দরজার একটি দরজার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবূ কাতাদাতুল আদাভী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর যে পত্র আমাদের সামনে পাঠ করা হয় তাতে এও ছিল যে, বিনা ওযরে দু' নামাযকে একত্রিত করা কাবীরা গুনাহ এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করাও কাবীরা গুনাহ।' মোটকথা, যোহর, আসর কিংবা মাগরিব ও ইশা সময়ের পূর্বে বা পরে শরীয়তের অবকাশ ছাড়া একত্রিত করে পড়া কাবীরা গুনাহ। তাহলে যারা মোটেই (নামায) পড়ে না তাদের পাপের তো কোন ঠিক ঠিকানাই নেই। যেমন, সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বান্দা ও শিরকের মধ্যেস্থলে রয়েছে নামাযকে ছেড়ে দেয়া।'

সুনানের একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাদেরও কাফিরদের মধ্যে পৃথককারী জিনিস হচ্ছে নামাযকে ছেড়ে দেয়া। যে ব্যক্তি নামাযকে ছেড়ে দিল সে কুফরী করলো'। অন্য একটি বর্ণনায় তাঁর এ উক্তিটিও নকল করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার কার্যাবলী বিনষ্ট হয়ে গেল। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল তার যেন মাল ও পরিবার পরিজন ধ্বংস হয়ে গেল।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কাবীরা গুনাহ কি কি?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, তাঁর নিয়ামত ও করুণা হতে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর মকর হতে [১] নির্ভয় থাকা এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহ।'

হযরত বায্যার (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কাবীরা গুনাহগুলো কি?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা, আল্লাহর নিয়ামত ও করুণা হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর মকর থেকে নির্ভয় থাকা এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ।' কিন্তু এর ইসনাদে সমালোচনা রয়েছে। সবচেয়ে সঠিক কথা এই যে, এ হাদীসটি মাওকুফ।

১. মকর শব্দটি আল্লাহর ব্যাপারে ফন্দির প্রতিশোধ নেয়া বুঝায়।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই এর মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হচ্ছে মহা সম্মানিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা।' এ বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। ইতিপূর্বে ঐ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে হিজরতের পর পুনরায় কাফিরদের দেশে বসতি স্থাপন করাকেও কাবীরা গুনাহ বলা হয়েছে। এ হাদীসটি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে। সাতটি কাবীরা গুনাহর মধ্যে একটি এটিকে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর ইসনাদের ব্যাপারে চিন্তার বিষয় রয়েছে এবং একে মারফূ' বলা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক কথা এটাই যা তাফসীরে ইবনে জারীরের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রাঃ) কুফার মসজিদে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তাতে তিনি বলেন, 'হে জনগণ! কাবীরা গুনাহ সাতটি।' একথা শুনে লোকগুলো চীৎকার করে উঠে। তিনি তিনবার ওরই পুনরাবৃত্তি করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করছো না কেন?' জনগণ তখন বলে, 'হে আমীরুল মুমিনীন! বলুন, ওগুলো কি?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, যে প্রাণ বধ করা আল্লাহ হারাম করেছেন তা বধ করা, পবিত্রা স্ত্রীলোকদের প্রতি অপবাদ দেয়া, পিতৃহীনের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং হিজরতের পর পুনরায় কাফিরদের দেশে এসে বসতি স্থাপন করা।' হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত সাহল (রঃ) তাঁর পিতা হযরত সাহল ইবনে খাইসুমার (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'এটাকে কিভাবে কাবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করলেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হে প্রিয় বৎস! একটি লোক হিজরত করে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হলো, গনীমতের মালে তার অংশ নির্ধারিত হলো, মুজাহিদদের নামের তালিকায় তার নাম এসে গেছে। অতঃপর সে সমস্ত জিনিস পরিত্যাগ করতঃ বেদুঈন হয়ে গিয়ে কাফিরদের দেশে ফিরে গেল এবং যেমন ছিল তেমনই হলো, এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে'?

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের খুৎবায় বলেনঃ 'সাবধান! আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, অন্যায় হত্যা হতে বেঁচে থাক, তবে শরীয়তের অনুমতি অন্য জিনিস, ব্যভিচার করো না এবং চুরি করো না।' ঐ হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, অসিয়তের ব্যাপারে কারও ক্ষতি সাধন করাও একটি কাবীরা গুনাহ। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে,

একদা সাহাবায়ে কেরাম কাবীরা গুনাহসমূহের উল্লেখ করেন যে, আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থির করা, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, ধর্মযুদ্ধ থেকে পলায়ন করা, পাক পবিত্র রমণীদের প্রতি অপবাদ দেয়া, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, খিয়ানত করা, যাদু করা, সুদ খাওয়া এগুলো সব কাবীরা গুনাহ। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আর ঐ গুনাহকে কোথায় রাখছে যে, লোকেরা আল্লাহর ওয়াদা এবং নিজেদের কসমকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে ফিরছে। আয়াতের শেষ পর্যন্ত তিনি তেলাওয়াত করেন। এর ইসনাদ স্পষ্ট এবং হাদীসটি হাসান।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, মিসরে কতগুলো লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মধ্যে আমরা কতগুলো জিনিস এমন পাচ্ছি যেগুলোর উপর আমাদের আমল নেই। তাই, আমরা এ সম্বন্ধে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে চাই।' হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কবে এসেছো?' তিনি উত্তরে বলেন, 'এতদিন হলো।' পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'অনুমতিক্রমে এসেছো কি?' তারও উত্তর তিনি দেন। অতঃপর তিনি জনগণের কথা উল্লেখ করেন।

হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'তাদেরকে একত্রিত কর।' এরপর তিনি তাদের নিকট আগমন করেন এবং তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাকে আল্লাহ ও ইসলামের সত্যতার শপথ! তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন কারীম পাঠ করেছো?' লোকটি বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তুমি কি ওকে তোমার অন্তরে রক্ষিতও রেখেছো?' তিনি বলেন ,'না।' তিনি যদি 'হ্যাঁ' বলতেন তবে হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে দলীল প্রমাণাদি দ্বারা অপারগ করে দিতেন।

এরপর তিনি বলেন, 'তুমি ওকে স্বীয় চক্ষে, স্বীয় জিহ্বায় এবং স্বীয় চালচলনেও রক্ষিত রেখেছো কি?' তিনি বলেনঃ 'না।' অতঃপর তিনি এক এক করে সবাইকেই এ প্রশ্নই করেন। তারপর তিনি বলেন, 'তোমরা উমার (রাঃ)-কে এ কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছ যে, তিনি যেন জনগণকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সোজা করে দেন। আমার দোষত্রুটির কথা আমার প্রভু পূর্ব হতেই জানতেন।' অতঃপর তিনি اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ -এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ 'যদি তোমরা সেই

মহাপাপসমূহ হতে বিরত হও যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো।' এরপর তিনি বলেন, 'মদীনাবাসী তোমাদের আগমনের কারণ জানে কি?' তাঁরা বলেন, 'না।' তিনি বলেন, 'তারাও যদি এটা জানতো তবে এ সম্বন্ধে আমার তাদেরকেও উপদেশ দিতে হতো।' এর ইসনাদও হাসান এবং পঠনও হাসান। যদিও হযরত উমার (রাঃ) হতে হাসানের এ বর্ণনাটির মধ্যে 'ইনকিতা' রয়েছে তথাপি এ ত্রুটি পূরণের পক্ষে এর পূর্ণ প্রসিদ্ধিই যথেষ্ট।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ্ হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, কাউকে হত্যা করা, পিতৃহীনের মাল ভক্ষণ করা, পবিত্র স্ত্রীলোকদেরকে অপবাদ দেয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা, হিজরতের পর কাফিরদের দেশে অবস্থান করা, যাদু করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, সুদ খাওয়া, জামাআত হতে পৃথক হওয়া এবং ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেয়া। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, তাঁর প্রশস্ততা ও করুণা হতে নিরাশ হওয়া এবং তার মকর হতে নির্ভয় থাকা।'

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, সূরা-ই-নিসার প্রথম ত্রিশটি আয়াতে কাবীরা গুনাহর বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর তিনি إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ -এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, বাপ-মাকে অসন্তুষ্ট করা, পরিতৃপ্তির পর অতিরিক্ত পানি প্রয়োজন বোধকারীদেরকে না দেয়া এবং নিজের নরপশুকে কারও মাদী পশুর জন্যে কিছু নেয়া ছাড়া না দেয়া।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখা যাবে না এবং অতিরিক্ত ঘাস হতেও বাধা দেয়া যাবে না'। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের পাপীদের দিকে আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি ও অতিরিক্ত ঘাসকে আটকিয়ে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন না।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ

দু'টি যা নারীদের নিকট বায়আ'ত নেয়ার বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا (৬০ঃ ১২) -এ আয়াতটির মধ্যে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এ আয়াতটিকে আল্লাহ তা'আলার বিরাট ইহসানের মধ্যে বর্ণনা করেন এবং এর উপর বড় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ -এ আয়াতটিকে।

একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সামনে জনগণ বলেন, 'কাবীরা গুনাহ হচ্ছে সাতটি।' তিনি বলেন, 'কোন কোন সময় সাতটি।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন, 'কমপক্ষে সাতটি নচেৎ সত্তরটি।' অন্য একটি লোকের কথায় তিনি বলেনঃ 'ওটা হচ্ছে সাতশ পর্যন্ত এবং সাতশ হচ্ছে খুবই নিকটে। হ্যাঁ, তবে জেনে রেখো যে, ক্ষমা প্রার্থনার পর কাবীরা আর কাবীরা থাকে না। আর সদা-সর্বদা করতে থাকলে সাগীরাও আর সাগীরা থাকে না।'

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'যে পাপের উপর জাহান্নামের, আল্লাহর ক্রোধের, অভিসম্পাতের এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন রয়েছে সেটাই কাবীরা গুনাহ।' আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যা হতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেন সেটাই কাবীরা। যে কার্যে আল্লাহর অবাধ্যতা প্রকাশ পায় ওটাই বড় পাপ। এখন তাবেঈগণের উক্তি আলোচনা করা যাচ্ছেঃ

হযরত উবাইদাহ (রঃ) বলেন, 'কাবীরা গুনাহ্ হচ্ছে—আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শিরক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, সচ্চরিত্রা মেয়েদের (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়া ও হিজরতের পর স্বদেশ প্রিয়তা।' হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আউন (রঃ) স্বীয় শিক্ষক মুহাম্মাদ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'যাদু কাবীরা গুনাহ্ নয় কি?' তিনি বলেন, 'এটা অপবাদের মধ্যে এসে গেল। এ শব্দটির মধ্যে বহু জঘন্যতা জড়িত রয়েছে।'

হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) কাবীরা গুনাহের উপর কুরআন কারীমের আয়াত পড়েও শুনিয়ে দেন। শিরকের উপর আয়াত পাঠ করেন—

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ -

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলো সে যেন আকাশ হতে পড়ে গেল অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে দূরে কোন অজানা জঘন্য স্থানে নিক্ষেপ করবে।' (২২ঃ ৩১) ইয়াতীমের মাল নষ্ট করার উপর আয়াত পেশ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ـ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের পেটের মধ্যে আগুন ভক্ষণ করে।' (৪ঃ ১০) সুদ খাওয়ার উপর পাঠ করেন-

اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ـ

অর্থাৎ 'যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা কিয়ামতের দিন জ্ঞানশূন্য ও পাগলের মত হয়ে উঠবে।' (২ঃ ২৭৫) অপবাদের উপর পড়েন-

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

অর্থাৎ 'যারা পবিত্রা, উদাসীনা, মুমিনা নারীদেরকে অপবাদ দেয়।' (২৪ঃ২৩) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারীদের উপর পাঠ করেন-

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ـ

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান হও, তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।' (৮ঃ ১৫) হিজরতের পর কাফিরদের দেশে অবস্থানের উপর আয়াত পাঠ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلٰى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى

অর্থাৎ 'যারা সুপথ প্রাপ্তির পর ধর্মত্যাগী হয়।' (৪৭ঃ ২৫) কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার উপর আয়াত পাঠ করেন-

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيهَا

অর্থাৎ 'যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে চির অবস্থান করবে।' (৪ঃ ৯৩)

হযরত আতা' (রঃ) হতেও কাবীরা গুনাহ্র বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে এবং তাতে মিথ্যা সাক্ষ্যের কথাও রয়েছে। হযরত মুগীরা (রঃ) বলেন, 'হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ)-কে মন্দ বলাও কাবীরা গুনাহ্ই।' আমি বলি যে, আলেমদের একটি দল ঐ লোকদেরকে কাফির বলেছেন যারা সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)-কে মন্দ বলে থাকে। হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ) হতে এটা বর্ণিত আছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন, 'আমি এটা কল্পনা করতে পারি না যে, কোন ব্যক্তির অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে অথচ হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।' (জামেউত্ তিরমিযী)

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'কাবীরা গুনাহ্ হচ্ছে–আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা, তাঁর আয়াতসমূহ ও রাসূলদের সাথে কুফরী করা, যাদু করা, সন্তানদেরকে হত্যা করা, আল্লাহ তা'আলার সন্তান ও স্ত্রী সাব্যস্ত করা এবং এ ধরনের কাজ ও কথা যার পরে কোন পুণ্যের কাজ গৃহীত হয় না। হ্যাঁ, তবে যেসব পাপকার্যের পর ধর্ম অবশিষ্ট থাকতে পারে এবং আমল গৃহীত হতে পারে এরূপ পাপসমূহ আল্লাহ তা'আলা পুণ্যের বিনিময়ে ক্ষমা করে থাকেন।'

হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকে ক্ষমা করার অঙ্গীকার করেছেন যারা কাবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকে।' আর আমাদের নিকট এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা কাবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাক, সোজা ও ঠিক এবং শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।'

মুসনাদ-ই-আবদুর রায্যাকে সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের কাবীরা গুনাহ্কারীদের জন্যেও আমার শাফা'আত রয়েছে।' ইমাম তিরমিযীও (রঃ) একে হাসান বলেছেন। যদিও এর বর্ণনা ও সনদ দুর্বলতা শূন্য নয়, তথাপি এর যে সাক্ষীগুলো রয়েছে তাতেও সঠিক বর্ণনা রয়েছে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা কি মনে কর যে, আমার শাফা'আত শুধু মুত্তাকী ও মুমিনদের জন্যই? না, না। বরং ঐ গুনাহ্গার পাপীদের জন্যেই।'

এখন আলেমদের উক্তি বর্ণিত হচ্ছেঃ কাবীরা গুনাহ্ কাকে বলে সে সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, যার উপর শরঈ হদ্দ (শরীয়তের শাস্তি) রয়েছে সেটাই কাবীরা গুনাহ্। কেউ বলেন যে, যার উপর কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে কোন শাস্তির উল্লেখ রয়েছে, সেটাই কাবীরা গুনাহ্। কারও উক্তি এই যে, যাতে দ্বীনদারী কম হয় এবং সততা হ্রাস পায়, সেটাই হচ্ছে কাবীরা গুনাহ্। কাযী আবূ সাঈদ হারভী (রঃ) বলেন যে, যার হারাম হওয়া শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং যার অবাধ্যতার উপর কোন হদ্দ থাকে, সেটাই কাবীরা গুনাহ্। যেমন হত্যা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যে কোন ফরয কাজ ছেড়ে দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা বর্ণনা এবং মিথ্যা শপথও কাবীরা গুনাহ্।

কাযী রূইয়ানী (রঃ) বলেন যে, কাবীরা গুনাহ্ হচ্ছে সাতটিঃ বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে নির্লজ্জতার কাজে (লোওয়াতাত) লিপ্ত হওয়া, মদ্যপান করা, চুরি করা, জবরদখল করা এবং অপবাদ দেয়া (সতী নারীকে)। অপর বর্ণনায় অষ্টমও একটি আছে, তা হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান। আর এর সাথে নিম্নেরগুলোকে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে–সুদ খাওয়া, বিনা ওযরে রমযানের রোযা পরিত্যাগ করা, মিথ্যা শপথ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, জিহাদ হতে পলায়ন করা, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, বিনা ওযরে সময়ের পূর্বে নামায আদায় করা ওজনে কম বেশী করা, বিনা কারণে মুসলমাকে হত্যা করা, জেনে শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা, তাঁর সাহাবীগণকে গালি দেয়া, বিনা কারণে সাক্ষ্য গোপন করা, ঘুষ নেয়া, পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা, বাদশাহের নিকট পরোক্ষ নিন্দে করা, যাকাত দেয়া বন্ধ করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভাল কার্যের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ না করা, কুরআন কারীম শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া, প্রাণীকে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলা, বিনা ওযরে স্ত্রীর তার স্বামীর নিকটে না যাওয়া, আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হওয়া, তাঁর মকর হতে নির্ভয় হওয়া, আলেম ও কারীদের ক্ষতিসাধন করা, যিহার করা,[১] শূকরের গোশত ভক্ষণ করা এবং মৃত জিনিস খাওয়া। তবে খুবই প্রয়োজন বোধে মৃত জন্তুর গোশত খেলে সেটা অন্য কথা।

ইমাম রাফেঈ (রঃ) বলেন যে, এগুলোর কয়েকটির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বড় বড় গুনাহ্সমূহের ব্যাপারে মনীষীগণ বহু গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। আমাদের শায়েখ হাকিম আবূ আবদুল্লাহ যাহবী (রঃ) একটি পুস্তক লিখেছেন, যার মধ্যে তিনি সত্তরটি কাবীরা গুনাহ্র সংখ্যা দিয়েছেন। এও বলা হয়েছে যে, কাবীরা গুনাহ্ হচ্ছে ঐগুলো যেগুলোর উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এ প্রকারের গুনাহ্ই যদি গণনা করা যায় তবে বহু গুনাহ্ই বেরিয়ে যাবে। আর যদি কাবীরা গুনাহ্ ঐ (ধরনের) কাজের প্রত্যেকটিকে বলা হয় যা হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দূরে থাকতে বলেছেন তবে তো কাবীরা গুনাহ্ অসংখ্য হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন।

১. যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ এরূপ কোন নারীর কোন অঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীর তুলনা করাকে যিহার বলে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ অর্থাৎ 'তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মত।'

৩২। এবং তোমরা ওর আকাঙ্খা করো না যদ্দ্বারা আল্লাহ একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন, পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীগণ যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ আছে এবং তোমরা আল্লাহরই নিকট গৌরব প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٣٢- وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পুরুষ লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে, আর আমরা নারীরা এ পুণ্য হতে বঞ্চিত থাকি। অনুরূপভাবে মীরাসও আমরা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পেয়ে থাকি। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (জামেউত্ তিরমিযী) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পরে আবার اِنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى (৩ঃ ১৯৫) -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, নারীরা নিম্নরূপ আকাঙ্খা পোষণ করেছিলঃ 'আমরা যদি পুরুষ হতাম তবে তো আমরাও জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম।' আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'দেখুনতো একজন পুরুষ দু'জন স্ত্রীর সমান অংশ পেয়ে থাকে, দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান মনে করা হয়, তাছাড়া আমলের ব্যাপারেও এরূপ যে, পুরুষের জন্যে একটি পুণ্য এবং নারীর জন্যে অর্ধপুণ্য।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সুদ্দী (রঃ) বলেন, পুরুষ লোকেরা বলেছিল, 'আমরা যখন দ্বিগুণ অংশের মালিক তখন আমরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হবো না কেন?' আর ঐ দিকে স্ত্রীলোকেরা বলেছিল, 'আমাদের উপর তো জিহাদ ফরযই নয় তবে আমরা

শাহাদাতের পুণ্য লাভ করবো না কেন?' এতে আল্লাহ তা'আলা উভয়কেই বাধা দেন এবং বলেন–'তোমরা আমার অনুগ্রহ যাঞ্চ্ঞা করতে থাক।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন–'মানুষ যেন এ আশা পোষণ না করে যে, যদি অমুক ব্যক্তির মাল ও সন্তান আমার হতো।' এর উপর এ হাদীস দ্বারা কোন অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে না যাতে রয়েছে যে, ঈর্ষার যোগ্য মাত্র দু'জন। এক ঐ ধনী ব্যক্তি যে স্বীয় মাল আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, আর অন্য ব্যক্তি বলে, 'যদি আমারও মাল থাকতো তবে আমিও এরূপ ভাবে তা আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করতে থাকতাম।' অতএব দু' ব্যক্তিই পুণ্য লাভের ব্যাপারে সমান। কেননা এটা নিষিদ্ধ নয়। অর্থাৎ এরূপ পুণ্য লাভের লোভ দুষণীয় নয়। এখানে এরূপ জিনিস এরূপ পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে লাভ করার আকাঙ্খা রয়েছে যা প্রশংসনীয়। আর ওখানে অপরের জিনিস নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়ার নিয়ত রয়েছে যা সব সময়ই নিন্দনীয়। সুতরাং এরূপভাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনুগ্রহ যাঞ্চ্ঞা করা নিষিদ্ধ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেককেই তার কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল কার্যের প্রতিদান ভাল এবং মন্দ কার্যের প্রতিদান মন্দ হবে'। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, সকলকেই তাদের হক অনুযায়ী উত্তরাধিকার প্রদান করা হবে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–'আমার নিকট আমার অনুগ্রহ যাঞ্চ্ঞা করতে থাক, পরস্পর একে অপরের ফযীলত চাওয়া অনর্থক হবে। হ্যাঁ, তবে আমার নিকট যদি আমার অনুগ্রহ যাঞ্চ্ঞা কর তবে আমি কৃপণ নই, বরং আমি দাতা, সুতরাং আমি দান করবো এবং অনেক কিছুই দান করবো।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর অনুগ্রহ যাঞ্চ্ঞা কর। তাঁর নিকট চাওয়া তিনি খুব পছন্দ করেন। জেনে রেখো যে, সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে প্রশস্ততা ও করুণার জন্যে অপেক্ষা করা এবং তার প্রতি আশা রাখা।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ আশা পোষণকারীকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। কে পাওয়ার যোগ্য এবং কে দারিদ্র্যের যোগ্য, কে পারলৌকিক নিআমতের দাবীদার, আর কে তথায় লাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য তা তিনিই খুব ভাল জানেন। তাকে তিনি তার আসবাব ও মাধ্যম জোগাড় করে দেন এবং তার জন্যে তা সহজ করে দেন।

৩৩। আর আমি সমস্তেরই উত্তরাধিকারী করেছি যা তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে যায় এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সাক্ষী।

٣٣- وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

বহু মুফাসসির হতে বর্ণিত আছে যে, (مَوَالِي) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে 'উত্তরাধিকারী'। কারও কারও মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে 'আসাবা'। পিতৃব্য পুত্রদেরকেও 'মাওলা' বলা হয়। যেমন হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিম্নের কবিতায় রয়েছেঃ

مَهْلًا بَنِيْ عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِيْنَا * لَا يَظْهَرَنَّ بَيْنَنَا مَا كَانَ مَدْفُوْنَا

সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, হে জনগণ! তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্যে আমি আসাবা বানিয়ে দিয়েছি যারা সে মালের উত্তরাধিকারী হবে যা তাদের পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যাবে। আর যারা তোমাদের মুখের ভাই তাদেরকে তাদের উত্তরাধিকারের অংশ প্রদান কর। যেমন শপথের সময় তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার হয়েছিল।

এটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের নির্দেশ। পরে এটা রহিত হয়ে যায় এবং নির্দেশ দেয়া হয় যে, যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে অঙ্গীকার ঠিক রাখতে হবে এবং তাদেরকে ভুলে যাওয়া চলবে না, কিন্তু তারা মীরাস পাবে না। সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (مَوَالِي) শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী। আর পরবর্তী বাক্যের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার প্রথা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের আনসার ভাইদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং আনসারদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের উত্তরাধিকারী হতেন না। সুতরাং এ আয়াত

দ্বারা উক্ত প্রথা রহিত হয়ে যায় এবং তাঁদেরকে বলা হয়–'তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য কর, তাদের উপকার কর এবং তাদের মঙ্গল কামনা কর। কিন্তু তারা তোমাদের মীরাস পাবে না। হ্যাঁ, তবে তোমরা তাদের জন্য অসিয়ত করে যাও।' ইসলামের পূর্বে প্রথা ছিল এই যে, দুই ব্যক্তি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে বলতো, 'আমি তোমার উত্তরাধিকারী।' এভাবে আরব গোত্রগুলো অঙ্গীকার ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়তো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'অজ্ঞতার যুগের শপথ এবং অঙ্গীকার ও চুক্তিকে ইসলাম আরও দৃঢ় করেছে। কিন্তু এখন ইসলামে শপথ এবং এ প্রকারের আহাদ ও অঙ্গীকার নেই। ঐগুলোকে এ আয়াতটি রহিত করে দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে, চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় আত্মীয়-স্বজনগণই আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশক্রমে বেশী উত্তম।'

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইসলামে শপথ নেই এবং অজ্ঞতা যুগের প্রত্যেক শপথকে ইসলাম আরও দৃঢ় করেছে। যদি আমাকে লাল রঙের উটও দেয়া হয় এবং ঐ শপথকে ভেঙ্গে দিতে বলা হয় যা দারুন নদওয়ায় করা হয়েছিল, তথাপি আমি তা পছন্দ করবো না।' হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি বাল্যকালে 'মুতায়্যাবাইনের' শপথের সময় আমার মাতুলদের সাথে ছিলাম। সুতরাং আমি লাল রঙের উট পেলেও সে শপথকে ভেঙ্গে দেয়া পছন্দ করবো না।' সুতরাং এটা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ ও আনসারের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তা ছিল শুধুমাত্র প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করার জন্যে।

হযরত কায়েস ইবনে আ'সেম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 'কসম' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'অজ্ঞতার যুগে যে কসম ছিল তা তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে, কিন্তু ইসলামে কসম নেই।'

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইসলামে 'হলফ' নেই, কিন্তু অজ্ঞতা যুগের হলফকে ইসলাম দৃঢ় করেছে।' মক্কা বিজয়ের দিনেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে স্বীয় ভাষণে এ কথাই ঘোষণা করেছিলেন।

হযরত দাঊদ ইবনে হুসাইন (রঃ) বলেন, আমি হযরত উম্মে সা'দ বিনতে রুবায়ের (রাঃ) নিকট কুরআন কারীম পাঠ করতাম। আমার সাথে তাঁর পৌত্র মূসা ইবনে সা'দও (রঃ) পড়তেন। হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ) পিতৃহীনা অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হয়েছিলেন। আমি এ আয়াতের عَاقَدَتْ পাঠ করি। তখন শিক্ষিকা আমাকে বাধা দিয়ে বলেনঃ عَقَدَتْ পড়। জেনে রেখ যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) প্রথমে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাই হযরত আবূ বকর (রাঃ) শপথ করে বলেনঃ 'আমি তাকে উত্তরাধিকারী করবো না'। অতঃপর যখন তিনি মুসলমানদের তরবারীর চাপে বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয় যে, তিনি যেন স্বীয় পুত্র আবদুর রহমানকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত না করেন। কিন্তু এ উক্তিটি গারীব। প্রথমটিই সঠিক উক্তি।

মোটকথা, এ আয়াত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা ঐ মনীষীদের উক্তি খণ্ডন করা হচ্ছে যাঁরা শপথ ও অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে এখনও উত্তরাধিকার দেয়ার পক্ষপাতি। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরদের এ ধারণা রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সঠিক মাযহাব হচ্ছে জমহূরের মাযহাব এবং ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাবও সঠিকই বটে।

অতএব, উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে তার আত্মীয়-স্বজন, অন্য কেউ নয়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'অংশীদার উত্তরাধিকারীদেরকে তাদের অংশ মুতাবিক অংশ দিয়ে বাকী যা থাকবে তা আসাবাগণ পাবে। উত্তরাধিকারী হচ্ছে ওরাই যাদের বর্ণনা ফারায়েযের দু'টি আয়াতে রয়েছে। আর যাদের সঙ্গে তোমরা দৃঢ়চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছো (অর্থাৎ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে) তাদেরকে মীরাস প্রদান কর।' এর পরে যে হলফ হবে তা ক্রিয়াশীল মনে করা হবে না। আবার এও বলা হয়েছে যে, অঙ্গীকার ও শপথ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার

পূর্বেই হোক বা পরেই হোক নির্দেশ একই যে, যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হবে তারা মীরাস পাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে তাদের অংশ হচ্ছে সাহায্য সহানভূতি, মঙ্গল কামনা এবং অসিয়ত–মীরাস নয়। তিনি বলেন, 'জনগণ অঙ্গীকার ও চুক্তি করতো যে, তাদের মধ্যে যে প্রথমে মারা যাবে অপর জন তার ওয়ারিস হবে।' সুতরাং আল্লাহ তা'আলা–

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰۤئِكُمْ مَّعْرُوْفًا -

এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে নির্দেশ দেন যে, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন একে অপরের সাথে বেশী সম্পর্কযুক্ত, তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (৩৩ঃ ৬) অর্থাৎ তাদের জন্যে যদি এক তৃতীয়াংশ মাল অসিয়ত করে যাও তবে তা বৈধ। সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ কাজও এটাই। পূর্ববর্তী আরো বহু মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি وَاُولُوا الْاَرْحَامِ -এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন যে, 'তাদেরকে তাদের অংশ দাও' -এর ভাবার্থ হচ্ছে মীরাস। হযরত আবূ বকর (রাঃ) একটি লোককে স্বীয় 'মাওলা' বানিয়েছিলেন এবং তাকে উত্তরাধিকারী করেছিলেন। হযরত ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা নিজেদের পুত্রদের ছাড়া অন্যদেরকে নিজেদের পুত্র বানিয়ে নিতো এবং তাদেরকে তাদের সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে সাব্যস্ত করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের অংশ অসিয়তের মাধ্যমে দিতে বলেছেন এবং মীরাস দিতে বলেছেন مَوَالِىْ অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদেরকে। আল্লাহ তা'আলা শুধু মুখের ও পালিত পুত্রদেরকে মীরাস দিতে নিষেধ করেছেন এবং খুব অপছন্দও করেছেন। তবে তাদেরকে অসিয়তের মাধ্যমে দিতে বলেছেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, আমার নিকট মনোনীত উক্তি হচ্ছে এই যে, 'তাদেরকে অংশ দাও' -এর ভাবার্থ হচ্ছে–তাদেরকে সাহায্য সহানুভূতির অংশ দাও। কিন্তু এটা নয় যে, তাদেরকে তাদের মীরাসের অংশ দাও। এ অর্থ করলে আয়াতটিকে 'মানসুখ' বলার কোন কারণ থাকে না বা একথা বলারও প্রয়োজন হয় না যে, এ নির্দেশ পূর্বে ছিল এখন নেই। বরং আয়াত শুধু ঐ কথার নির্দেশ করেছে যে, তোমাদের মধ্যে একে অপরের সাহায্য সহানুভূতি করার যে অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা পূরণ কর। সুতরাং এ আয়াতটি

'মুহকাম' ও রহিতহীন। কিন্তু ইমাম সাহেবের এ উক্তির ব্যাপারে কিছু চিন্তার বিষয় রয়েছে। কেননা, এটা নিঃসন্দেহ যে, কতগুলো অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি শুধু সাহায্য সহানুভূতির উপরই হতো। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, কতগুলো অঙ্গীকার মীরাসের উপরও হতো। যেমন পূর্ববর্তী বহু গুরুজন হতে বর্ণিত হয়েছে এবং যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীরেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মুহাজিরগণ আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং তাঁদের আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী হতেন না। অবশেষে এটা রহিত হয়ে যায়। তাহলে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) একথা কিরূপে বলতে পারেন যে, এ আয়াতটি 'মুহকাম' ও রহিতহীন? এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٣٤- اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○

৩৪। পুরুষগণ নারীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং এ হেতু যে, তারা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে থাকে; সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে; এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশংকা হয়, তবে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক কর ও তাদেরকে প্রহার কর, অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্যে অন্য পন্থা অবলম্বন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহীয়ান।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ঐ সব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারেন না যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্রী বানিয়ে নেয়'। (সহীহ বুখারী) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের মাল খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। সুতরাং জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যেই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।

অন্য জায়গা রয়েছে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ "তাদের উপর (স্ত্রীদের) পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।' (২ঃ ২২৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হিফাযত করা ইত্যাদি।'

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, 'একটি স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর সামনে স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তার স্বামী থাকে থাপ্পড় মেরেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতিশোধ নেয়ার হুকুম প্রায় দিয়েই ফেলেছিলেন, এমন সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণ হতে বিরত রাখা হয়।'

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। ওর চিহ্ন এখনও আমার চেহারায় বিদ্যমান রয়েছে"। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "তার এ অধিকার ছিল না।" সেখানেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি চেয়েছিলাম এক রকম এবং আল্লাহ তা'আলা চাইলেন অন্য রকম।"

হযরত শা'বী (রাঃ) বলেন যে, মাল খরচ করার ভাবার্থ হচ্ছে মোহর আদায় করা। দেখা যায় যে, পুরুষ যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে

লে'আনের (একের অপরকে অভিশাপ দেয়াকে 'লে'আন' বলে) হুকুম রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী স্বামীর সম্পর্কে একথা বলে এবং প্রমাণ করতে না পারে তবে স্ত্রীকে চাবুক মারা হয়। অতএব, নারীদের মধ্যে সতী সাধ্বী হচ্ছে ঐ নারী, যে তার স্বামীর মাল রক্ষণাবেক্ষণ করে, যা রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "উত্তম ঐ নারী যখন তার স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন কোন নির্দেশ দেয় তখন তা পালন করে এবং যখন সে বিদেশে গমন করে তখন সে নিজেকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে নিরাপদে রাখে ও স্বীয় স্বামীর মালের হিফাযত করে।"

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন কোন নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, তাকে বলা হবে–যে কোন দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–যেসব নারীর দুষ্টামিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপরে হতে চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয় না এবং তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে উপদেশ প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অন্তরে তাক্ওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেকে বল–দেখ, স্বামীর এত অধিকার রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যদি কাউকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করবে তবে নারীকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। কেননা, তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই রয়েছে।'

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে তখন সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।' সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে রাত্রে কোন স্ত্রী রাগান্বিতা হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের ফেরেশ্তা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।'

তাই এখানে ইরশাদ হচ্ছে—এরূপ অবাধ্য নারীদেরকে প্রথমে বুঝাতে চেষ্টা কর অথবা বিছানা হতে পৃথক রাখ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "অর্থাৎ শয়ন তো বিছানার উপরেই করাবে, কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্তন করে থাকবে এবং সঙ্গম করবে না। তার সাথে কথা বলাও বন্ধ রাখতে পারো এবং স্ত্রীর জন্য এটাই হচ্ছে বড় শাস্তি।" কোন কোন তাফসীরকারকের মতে তাকে পার্শ্বে শুতেও দেবে না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "স্ত্রীর তার স্বামীর উপর কি হক রয়েছে?" তিনি বলেনঃ "যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে, তার মুখে মেরো না, গালি দিও না, ঘর হতে পৃথক করো না, ক্রোধের সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বন্ধ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের করো না।" অতঃপর বলেনঃ "তাতেও যদি ঠিক না হয় তবে তাকে শাসন-গর্জন করে এবং মেরে-পিটেও সরল পথে আনয়ন কর।"

সহীহ মুসলিমে নবী (সঃ)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণে রয়েছেঃ 'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের সেবিকা ও অধীনস্থা। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, যাদের যাতায়াতে তোমরা অসন্তুষ্ট তাদেরকে তারা আসতে দেবে না। যদি তারা এরূপ না করে তবে তোমরা তাদেরকে যেন-তেন প্রকারে সতর্ক করতে পার। কিন্তু তোমরা তাদেরকে কঠিনভাবে প্রহার করতে পার না, যে প্রহারের চিহ্ন প্রকাশ পায়। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে এবং এমন প্রহার করা উচিত নয় যার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় কিংবা কোন অঙ্গ আহত হয়।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এরপরও যদি তারা বিরত না হয় তবে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তালাক দিয়ে দাও।' একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না।' এরপর একদা হযরত উমার ফারুক (রাঃ) এসে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নারীরা আপনার এ নির্দেশ শুনে তাদের স্বামীদের উপর বীরত্বপনা দেখানো আরম্ভ করেছে।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে মারার অনুমতি দেন। তখন পুরুষদের পক্ষ হতে বেদম মারপিট শুরু হয়ে যায় এবং বহু নারী অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'জেনে রেখ যে, আমার নিকট নারীদের অভিযোগ পৌঁছেছে। মনে রেখ যে, যারা স্ত্রীদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তারা ভাল মানুষ নয়।' (সুনান-ই-আবি দাঊদ)

হযরত আশআস (রঃ) বলেন, একদা আমি হযরত উমার (রাঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করি। ঘটনাক্রমে সে দিন তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়। হযরত উমার (রাঃ) স্বীয় পত্নীকে প্রহার করেন, অতঃপর আমাকে বলেন, 'হে আশআস (রাঃ)! তিনটি কথা স্মরণ রেখ, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে স্মরণ রেখেছি। এক তো এই যে, স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হবে না যে, তিনি স্বীয় স্ত্রীকে কেন মেরেছেন। দ্বিতীয় এই যে, বিতরের নামায না পড়ে শুতে হবে না। তৃতীয় কথাটি বর্ণনাকারীর মনে নেই। (সুনান-ই-নাসাঈ) অতঃপর বলেন, 'তখন যদি নারীরা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তবে তোমরা তাদের প্রতি কোন কঠোরতা অবলম্বন করো না, মারপিট করো না এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশও করো না।'

'আল্লাহ সমুন্নত ও মহীয়ান।' অর্থাৎ যদি নারীদের পক্ষ হতে দোষত্রুটি প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই বা দোষত্রুটি করার পর সংশোধিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে শাসন-গর্জন কর, তবে জেনে রেখ যে, তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৩৫। আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তবে তার বংশ হতে একজন বিচারক ও ওর বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর; যদি তারা মীমাংসা আকাঙ্খা করে তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ।

٣٥- وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ○

উপরে ঐ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অবাধ্যতা ও বক্রতা যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়। আর এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয় হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করে তবে কি করতে হবে? এ ব্যাপারে উলামা-ই-কিরাম বলেন যে, এরূপ অবস্থায় শাসনকর্তা একজন

নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিচারক নিযুক্ত করবেন। যিনি দেখবেন যে, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি কার পক্ষ হতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি অত্যাচারীকে অত্যাচার হতে বাধা দান করবেন। যদি এর দ্বারা কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় তবে শাসনকর্তা স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন ও পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক নির্ধারণ করবেন এবং তাঁরা দু'জন মিলিতভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন। অতঃপর যাতে তাঁরা মঙ্গল বিবেচনা করবেন সে মীমাংসাই করবেন। অর্থাৎ হয় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করবেন, না হয় মিলন ঘটিয়ে দেবেন। কিন্তু শরীয়তের প্রচারক (সঃ) তো ঐ কাজের দিকেই আগ্রহ উৎপাদন করেছেন যে, তাঁরা যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটাবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিচারকদ্বয়ের যাচাইয়ে যদি স্বামীর দিক হতে অন্যায় প্রমাণিত হয় তবে তাঁরা এ স্ত্রীকে তার স্বামী হতে পৃথক করে রাখবেন এবং স্বামীকে বাধ্য করবেন যে, সে যেন তার চরিত্র ভাল না করা পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রী হতে পৃথক থাকে এবং তার খরচ বহন করে। আর যদি দুষ্টামি স্ত্রীর দিক হতে প্রমাণিত হয় তবে তাঁরা তার স্বামীকে খরচ বহন করতে বাধ্য করবেন না, বরং স্ত্রীকেই করবেন। অনুরূপভাবে যদি বিচারকদ্বয় তালাকের ফায়সালা করেন তবে স্বামী তালাক দিতে বাধ্য হবে। আর যদি তাঁরা তাদের পরস্পরেই বসবাসের ফায়সালা করেন তবে সেটাও তাদেরকে মানতে হবে। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তো বলেন যে, সালিসদ্বয় যদি তাদেরকে একত্রীকরণের ফায়সালা করেন এবং সে ফায়সালা একজন মেনে নেয় ও অপরজন না মানে আর ঐ অবস্থাতেই একজনের মৃত্যু হয়ে যায় তবে যে সম্মত ছিল সে অসম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যে অসম্মত ছিল সে সম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)

এ রকমই একটি বিবাদে হযরত উসমান (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে সালিস নিযুক্ত করেন এবং তাঁদেরকে বলেন, 'তোমরা যদি তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে চাও তবে সংযোগ স্থাপিত হয়ে যাবে। আর যদি বিচ্ছেদ আনয়নের ইচ্ছে কর তবে বিচ্ছেদই হয়ে যাবে।'

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আকীল ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) হযরত ফাতিমা বিনতে উৎবা ইবনে রাবিআ' (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত আকীল (রাঃ)-কে বলেন, 'তুমি আমার নিকট আসবেও এবং আমি তোমার খরচও বহন করবো।' তখন এই ঘটতে থাকে যে, হযরত

আকীল (রাঃ) যখন হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট আসার ইচ্ছে করতেন তখন তিনি (ফাতিমা রাঃ) জিজ্ঞেস করতেন, 'উৎবা ইবনে রাবিআ' এবং 'শাইবা ইবনে রাবীআ' কোথায় রয়েছে?' হযরত আকীল (রাঃ) বলতেন, 'তোমার বাম পার্শ্বে জাহান্নামে রয়েছে।' এতে হযরত ফাতিমা (রাঃ) কুপিতা হয়ে স্বীয় কাপড় ঠিক করে নিতেন (অর্থাৎ অনাবৃত দেহ বস্ত্রে আবৃত করতেন)। একদিন হযরত আকীল (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রাঃ) এতে হেসে উঠেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে তাঁদের সালিস নিযুক্ত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তো বলছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা হোক। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেছিলেন, 'আমি বানূ আবদ-ই-মানাফের মধ্যে এ বিচ্ছেদ অপছন্দ করি।' তখন তাঁরা হযরত আকীল (রাঃ)-এর গৃহে আগমন করেন। এসে দেখেন যে, দরজা বন্ধ রয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ভেতরে রয়েছেন। তখন তাঁরা ফিরে আসেন।

মুসনাদ-ই-আবদুর রাযযাকে রয়েছে যে, আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে এক দম্পত্তি মনোমালিন্যের ঝগড়া নিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। উভয়ের সাথে নিজ নিজ ভ্রাতৃপক্ষীয় লোক ছিল। হযরত আলী (রাঃ) উভয় দল হতে একজন করে লোক বেছে নিয়ে তাঁদেরকে সালিস নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি সালিসদ্বয়কে বলেন, 'তোমাদের কাজ কি তা তোমরা জান কি? তোমাদের কাজ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রিত করণ বা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান।' একথা শুনে স্ত্রী বলে, 'আমি আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্তের উপর সম্মত রয়েছি, সেটা হয় সংযোগ হোক, না হয় বিচ্ছেদই হোক।' কিন্তু স্বামী বলে, 'বিচ্ছেদে আমি সম্মত নই।' তাতে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'না, না। আল্লাহর শপথ! তোমাকে দু'টোতেই সম্মত হতে হবে।'

অতএব, আলেমদের ইজমা হয়েছে যে, এরূপ অবস্থায় ঐ সালীসদ্বয়ের দু'টোরই স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) বলেন যে, তাঁরা ইচ্ছে করলে দু'টি বা তিনটি তালাকও দিতে পারেন। হযরত ইমাম মালিক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হ্যাঁ, তবে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, তাঁদের একত্রি করণের অধিকার রয়েছে বটে, কিন্তু বিচ্ছেদ করণের অধিকার নেই। হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। ইমাম আহমাদ (রঃ), আবূ সাউর এবং (রঃ)

দাউদেরও মাযহাব এটাই। তাঁদের দলীল হচ্ছে إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا যুক্ত আয়াতটি। কেননা, এতে বিচ্ছেদের উল্লেখ নেই। হ্যাঁ, তবে যদি তাঁরা দু'জন দু'পক্ষ হতে ওয়াকীল (উকিল) নির্বাচিত হন তবে অবশ্যই তাঁদের সংযোগ ও বিচ্ছেদ দু'টোরই অধিকার রয়েছে। আর এতে কারও বিরোধ নকল করা হয়নি। এটাও মনে রাখতে হবে যে, এ দু'জন সালীস শাসনকর্তার পক্ষ হতে নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর পক্ষ হতেই ফায়সালা করবেন, যদিও তাতে উভয়পক্ষ অসম্মত থাকে। অথবা সালীসদ্বয় স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষ হতে ওয়াকীল (উকিল) নির্বাচিত হবেন। জমহূরের মাযহাব হচ্ছে প্রথমটি। তাঁদের দলীল হচ্ছে এই যে, কুরআন হাকিম তাঁদের নাম 'হাকাম' রেখেছে এবং 'হাকামে'র ফায়সালায় কেউ সন্তুষ্ট হোক আর অসন্তুষ্টই হোক সর্বাবস্থাতেই তাঁদের ফায়সালা শিরোধার্য।

আয়াতের বাহ্যিক শব্দগুলো জমহূরের পক্ষেই রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর নতুন উক্তি এটাই এবং ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) ও তাঁর সহচরদের এটাই উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি যাঁদের তাঁরা বলেন যে, যদি তাঁরা 'হাকামের' অবস্থায় হতেন তবে হযরত আলী (রাঃ) ঐ স্বামীকে কেন বললেন– তোমার স্ত্রী যখন দু' অবস্থাকেই মেনে নিয়েছে তখন তুমি না মানলে তুমি মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলারই জ্ঞান সবচেয়ে বেশী রয়েছে।

ইমাম ইবনে বার্‌র (রঃ) বলেন, এ কথার উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে যে, দু'জন সালীসের উক্তির মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দেবে তখন অপরের উক্তির উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। একথার উপরও ইজমা হয়েছে যে, যদি সালীসদ্বয় সংযোগ স্থাপন করতে চান তবে তাঁদের ফায়সালা কার্যকরী হবে। কিন্তু যদি তাঁরা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করতে চান তাহলেও তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে কি-না সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু জমহূরের মাযহাব এটাই যে, সে সময়েও তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে যদিও তাঁদেরকে ওয়াকীল (উকিল) বানানো না হয়।

৩৬। এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করো না; এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর	٣٦- وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ

এবং আত্মীয়-স্বজনগণ, পিতৃহীনগণ, দরিদ্রগণ, সম্পর্কীয় প্রতিবেশী ও সম্পর্ক বিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং স্বীয় একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করতে নিষেধ করছেন। কেননা, সৃষ্টিকর্তা, আহার্যদাতা, নিআমত প্রদানকারী এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর সদা-সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দানের বৃষ্টি বর্ষণকারী একমাত্র তিনিই। সুতরাং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ইবাদতের যোগ্য।

হযরত মু'আয (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কী তা জান কি?" তিনি উত্তরে বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তা হচ্ছে এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "বান্দা যখন এটা করবে তখন আল্লাহর জিম্মায় তাদের হক কী রয়েছে তা জান কি? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন—তোমরা পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে থাক। কেননা, তারাই তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে আনয়ন করার কারণ। কুরআন কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন এক জায়গায় রয়েছে—

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

অর্থাৎ "তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (৩১ঃ ১৪) আর এক জায়গায় রয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -

অর্থাৎ "তোমার প্রভু এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমার একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।" (১৭ঃ ২৩) এখানেও এ নির্দেশ দেয়ার পর হুকুম দিচ্ছেন– 'তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও ভাল ব্যবহার কর।' যেমন হাদীস শরীফে এসেছেঃ "মিসকীনদের উপর সাদকা শুধু সাদকাই হয় এবং আত্মীয়দের উপর সাদকা সাদকাও হয় এবং সাথে সাথে আত্মীয়তার সংযোগ স্থাপনও হয়।"

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে–'তোমরা পিতৃহীনদের সাথেও উত্তম ব্যবহার কর। কেননা, তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের মস্তকোপরি স্নেহের হস্তচালনাকারী, তাদেরকে সোহাগকারী এবং স্নেহ ও আদরের সাথে তাদেরকে পানাহারকারী দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছে।'

এরপর মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, তারা অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ পাক বলেন–'তোমরা এ মিসকীনদের অভাব দূর কর এবং তাদের কাজকর্ম করে দাও।' ফকীর ও মিসকীনের পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-বারাআতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

এবারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। তারা সম্পর্কীয় প্রতিবেশীই হোক আর সম্পর্ক বিহীনই হোক, তারা মুসলমানই হোক বা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানই হোক।' এও বলা হয়েছে যে, اَلْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى -এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রী এবং اَلْجَارِ الْجُنُبِ-এর ভাবার্থ হচ্ছে সফরের বন্ধু। প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। নিম্নে কিছু বর্ণিত হচ্ছে– (১) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এত বেশী উপদেশ দেন যে, আমার ধারণা হয় তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।" (২) মুসনাদ-ই-আহমাদেই রয়েছে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ "সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম সঙ্গী ঐ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে থাকে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ

তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে।" (৩) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষের উচিত নয় যে, সে প্রতিবেশীকে পরিতৃপ্ত না করে নিজে তৃপ্তি সহকারে আহার করে। (৪) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা স্বীয় সাহাবীবর্গকে জিজ্ঞেস করেনঃ "ব্যভিচার সম্বন্ধে তোমরা কি বল?" সাহাবীগণ বলেন, ওটা অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সঃ) ওটাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ওটা অবৈধই থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জেনে রেখ যে, দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কম পাপী যে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে।" পুনরায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা চুরি সম্বন্ধে কি বল? তাঁরা উত্তরে বলেন, "ওটাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) হারাম করেছেন এবং ওটাও কিয়ামত পর্যন্ত হারামই থাকবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "জেনে রেখ যে, যে চোর দশ বাড়ীতে চুরি করেছে তার পাপ ঐ চোরের পাপ হতে হালকা, যে তার প্রতিবেশীর ঘর হতে কিছু চুরি করে।" (৫) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি?" তিনি বলেনঃ "তা এই যে, তুমি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বলি, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেনঃ "তারপরে এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশিনীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও।" (৬) একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে বের হই। তথায় গিয়ে দেখি যে, একটি লোক দাঁড়িয়ে আছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ধারণা করি যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর কোন কাজ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং লোকটির সাথে কথাবার্তা চলছে। অধিক বিলম্ব হয়ে যায়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর ক্লান্তির ধারণা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। অনেকক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন এবং আমার নিকট আগমন করেন। আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকটি তো বহুক্ষণ ধরে আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আমি তো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। হয়তো আপনার পা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।" তিনি বলেনঃ "আচ্ছা তুমি তাকে দেখেছো?"

আমি বলি, হ্যাঁ খুব ভাল করে দেখেছি। তিনি বলেন, "তুমি কি জান তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। তিনি প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমার প্রতি চাপ সৃষ্টি করছিলেন। তিনি তাদের এত বেশী হক বর্ণনা করেন যে, আমার মনে সন্দেহ হয়, না জানি আজ তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারীই বানিয়ে দেন।" অতঃপর তিনি বলেন, 'তুমি যদি তাঁকে সালাম করতে তবে অবশ্যই তিনি তোমার সালামের উত্তর দিতেন।'(মুসনাদ-ই-আহমাদ)

(৭) মুসনাদ-ই-আব্দ ইবনে হামীদে রয়েছে, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, পল্লী অঞ্চল হতে একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঐ জায়গায় নামায পড়ছিলেন যেখানে জানাযার নামায পড়া হতো। নামায শেষে ঐ লোকটি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অন্য একটি লোক যে আপনার সাথে নামায পড়ছিলেন তিনি কে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'তুমি তাঁকে দেখেছো?' লোকটি বলেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বলেন, 'তুমি খুব উত্তম জিনিস দেখেছো। তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমার ধারণা হয় যে, অতিসত্ত্বরই তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।'

(৮) আবূ বকর আল বায্যায (রঃ)-এর গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "প্রতিবেশী তিন প্রকারের রয়েছেঃ (১) এক হক বিশিষ্ট অর্থাৎ নিম্নতম। (২) দু' হক বিশিষ্ট এবং (৩) তিন হক বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ। এক হক বিশিষ্ট ঐ প্রতিবেশী যে মুশরিক এবং যার সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। দু' হক বিশিষ্ট ঐ প্রতিবেশী যে মুসলমান, কিন্তু তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তার এক হক হলো ইসলামের হক এবং দ্বিতীয় হক হচ্ছে প্রতিবেশীর হক। তিন হক বিশিষ্ট হচ্ছে ঐ প্রতিবেশী যে মুসলমান এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। কাজেই তার প্রথম হক হলো ইসলামের হক, দ্বিতীয় হক হলো প্রতিবেশীর হক এবং তৃতীয় হক হলো আত্মীয়তার হক।"

(৯) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার দু'টি প্রতিবেশী রয়েছে। আমি একজনের কাছে উপঢৌকন পাঠাতে চাই, তাহলে কার কাছে পাঠাবো?' তিনি উত্তরে বলেনঃ "যার দরজা নিকটে হবে।"

(১০) তাবরানীর হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করেন। জনগণ তাঁর অযুর পানি নিয়ে শরীরে মলতে আরম্ভ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'এরূপ করছো কেন'? তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মহব্বতে'। তখন তিনি বলেনঃ 'যে এতে খুশী হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) তাকে ভালবাসেন সে যেন যখন কথা বলে তখন সত্য বলে, যখন আমানত দেয়া হয় তখন তা আদায় করে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে।'

(১১) মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে প্রথম যে ঝগড়া পেশ করা হবে তা হবে দু'জন প্রতিবেশীর ঝগড়া।"

এরপর আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন–'তোমরা পার্শ্ববর্তী সহচরের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর।' বহু তাফসীর কারকের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রী, আবার অনেকের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে সফরের সঙ্গী। এও বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণভাবে এর ভাবার্থ হচ্ছে বন্ধু ও সঙ্গী। সে সঙ্গী সফরেরই হোক বা বাড়ীর পার্শ্বেরই হোক। اِبْنُ السَّبِيْلِ-এর ভাবার্থ হচ্ছে অতিথি। আবার যে পথ চলতে চলতে থেমে গেছে এরূপ লোককেও 'ইবনুস সাবিল' বলা হয়েছে। সুতরাং যদি অতিথিরও এ অর্থ নেয়া হয় যে সফরে চলতে চলতে অতিথি হয়ে গেছে তবে দু'টো এক হয়ে যায়। এরও পূর্ণ বর্ণনা সূরা-ই-বারাআতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর বলা হচ্ছে–'তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সঙ্গেও সৎ ব্যবহার কর।' কেননা, ঐ গরীবেরা তো তোমাদের হাতে রয়েছে। তাদের উপর তো তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কাজেই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো স্বীয় মরণ রোগেও স্বীয় উম্মতকে এর জন্যে অসিয়ত করে গেছেন। তিনি বলেনঃ 'হে লোক সকল! নামায ও দাসদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।' বার বার তিনি একথা বলতেই থাকেন, অবশেষে তাঁর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তুমি নিজে যা খাও ওটাও সাদকা, যা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও ওটাও সাদকা, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও ওটাও সাদকা এবং যা তোমার পরিচারককে খাওয়াও ওটাও সাদকা।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) স্বীয় দারোগাকে বলেন, 'গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছো কি?' তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত দেইনি।' তখন হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) বলেন, যাও, দিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মানুষের জন্যে এ পাপই যথেষ্ট যে, সে যে আহার্যের মালিক তা সে আটকিয়ে রাখে।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'অধীনস্থ গোলামের হক এই-যে, তাকে খাওয়ানো, পান করানো ও পরানো হবে এবং তার দ্বারা তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া হবে না।'

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন তোমাদের কারও পরিচারক তার খাদ্য নিয়ে আসে তখন তোমাদের উচিত যে, যদি পার্শ্বে বসিয়ে খাওয়াতে না পার তবে কমপক্ষে তাকে দু' এক গ্রাস দিয়ে দেবে। তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে, রান্না করার গরম ও কষ্ট তাকেই ভোগ করতে হয়েছে।' অন্য বর্ণনা রয়েছেঃ 'তোমাদের উচিত তো এই যে, তাকে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। যদি খাদ্য কম হয় তবে তাকে দু' গ্রাস দিয়ে দেবে।' তিনি বলেন, 'তোমাদের গোলামও তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই থাকবে তাকে যেন সে তার খাবার হতে খেতে দেয়, যা সে পরবে তা হতে যেন তাকেও পরতে দেয়। তাদের দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নেবে না যাতে তারা অসমর্থ হয়ে পড়ে। যদি এরূপ কোন কাজ এসেই পড়ে তবে নিজেরাও তাদেরকে সাহায্য করবে'। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলা বলেন—'অহংকারীও আত্মাভিমানীকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন না।' তারা নিজেদেরকে ভাল মনে করলেও আল্লাহ পাকের নিকট তারা আদৌ ভাল নয়। তারা নিজেদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। জনগণের দৃষ্টিতেও তারা হেয় ও তুচ্ছ। তারা কত বড় অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ যে, কারও উপর কিছু অনুগ্রহ করলে তাকে সে অনুগ্রহের খোঁটা দেয়, কিন্তু তাদের প্রভুর যে নিআমত তাদের উপর রয়েছে তার জন্য তারা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। মানুষের মধ্যে বসে তারা গর্ব করে বলে আমি এত বড় লোক, আমার এটা আছে, ওটা আছে।

হযরত আবূ রাজা হারভী (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অহংকারী ও আত্মম্ভরী হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা হয়ে থাকে।' অতঃপর তিনি وَبَرًّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا (১৯ঃ ৩২) -এ আয়াতটি পাঠ করেন। হযরত আওয়াম ইবনে হাওশাবও (রঃ) এটাই বলেন।

হযরত মাতরাফ (রঃ) বলেন, 'আমার নিকট হযরত আবূ যার (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা পৌঁছেছিল এবং আমার মনের বাসনা ছিল যে, কোন সময় নিজেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিজেরই মুখে বর্ণনাটি শুনবো। ঘটনাক্রমে একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে বলি, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। হাদীসটি হচ্ছেঃ 'আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোককে পছন্দ করেন এবং তিন প্রকার লোককে অপছন্দ করেন।' হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেন–'হ্যাঁ, এটা সত্য। আমি কি আমার বন্ধুর (সঃ) উপর মিথ্যা আরোপ করবো'? এ কথা তিনি তিনবার বলেন। আমি তখন বলি আচ্ছা, ঐ তিন প্রকারের লোক কারা যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কুপিত? তিনি বলেন, 'অহংকারী ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি'। তারপরে তিনি বলেন–'এটা তো আপনি আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মধ্যেও পেয়ে থাকেন।' অতঃপর তিনি إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (৪ঃ ৩৬)-এ আয়াতটি পাঠ করেন।

বানূ হাজীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বলেনঃ 'কাপড় পায়ের গিঠের নীচে ঝুলিয়ে (লটকিয়ে) দিওনা। কেননা, এটা হচ্ছে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।'

৩৭। যারা কৃপণতা করে ও লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় সম্পদ হতে যা দান করেছেন তা গোপন করে এবং আমি সে অবিশ্বাসীদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

٣٧- الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

৩৮। এবং যারা লোকদেরকে দেখাবার জন্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আর যাদের সহচর শয়তান- সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে।

٣٨- وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ○

৩৯। আর এতে তাদের কি হতো- যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে যা প্রদান করেছেন তা হতে ব্যয় করতো? এবং আল্লাহ তাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

٣٩- وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ○

ইরশাদ হচ্ছে- যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কার্যে মাল খরচ করতে কার্পণ্য করে, যেমন বাপ-মাকে প্রদান করতে এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্ক বিহীন প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীকে অভাবের সময় আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার কার্যে কার্পণ্য করে, শুধু তাই নয় বরং লোকদেরকেও কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ না করার পরামর্শ দেয়, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ আর কি হতে পারে?' তিনি আরো বলেছেনঃ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কার্পণ্য হতে বেঁচে থাক। এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণেই তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতা, অন্যায় ও দুষ্কার্য প্রকাশ পেয়েছিল।'

এরপর বলা হচ্ছে- তারা এ দু'টি দুষ্কার্যের সাথে সাথে আরও একটি দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়। তা এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহ গোপন করে, ঐগুলো প্রকাশ করে না। ঐগুলো না তাদের খাওয়া পরায় প্রকাশ পায়, না আদান-প্রদানে প্রকাশিত হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ *

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর নিশ্চয়ই সে নিজেই তার ঐ অবস্থা ও অভ্যাসের উপর সাক্ষী।' (১০০ঃ ৬-৭) তার পরে বলেনঃ

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ *

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই সে মালের প্রেমে পাগল।' (১০০ঃ ৮) এখানেও বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন করছে। এরপর তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। 'কুফ্‌র' শব্দের অর্থ হচ্ছে গোপন করা এবং ঢেকে দেয়া। কৃপণও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে গোপন করে, ওর উপরে পর্দা নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ ঐ নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। সুতরাং সে নিয়ামতসমূহের অস্বীকারকারী হয়ে গেল।

হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার উপর স্বীয় নি'আমত দান করেন তখন চান যে, ওর চিহ্ন যেন তার উপরে প্রকাশ পায়।' নবী (সঃ)-এর প্রার্থনায় রয়েছে—

وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি আপনার নি'আমতের প্রতি কৃতজ্ঞ বানিয়ে দিন এবং তার কারণে আমাদেরকে আপনার প্রশংসাকারী করুন, ওগুলো গ্রহণকারী বানিয়ে দিন ও ঐগুলো আমাদের উপর পূর্ণভাবে দান করুন।'

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি ইয়াহূদীদের ঐ কার্পণ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে কার্পণ্য তারা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর গুণাবলী গোপন করার ব্যাপারে করতো। এ জন্যেই এর শেষে রয়েছে—'আমি কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'

এ আয়াতটি যে ইয়াহূদীদের কার্পণ্যের ব্যাপারেও হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্পষ্টতঃ এখানে মালের কৃপণতার কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে, যদিও ইলমের কৃপণতা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা ভুললে চলবে না যে, এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন ও দুর্বলদেরকে মাল প্রদানের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে লোকদেরকে দেখাবার জন্যে মাল প্রদানকারীদের নিন্দে করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঐ কৃপণদের যারা

টাকা পয়সাকে দাঁত দিয়ে ধরে রাখে। তার পরে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঐ লোকদের যারা মাল খরচ তো করে বটে, কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুনিয়ায় নাম নেয়ার জন্যে।

যেমন হাদীস শরীফে রয়েছেঃ 'যে তিন প্রকারের লোকের জন্যে জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে, তারা এ রিয়াকারগণই হবে। রিয়াকার আলেম, রিয়াকার গাযী এবং রিয়াকার দাতা। এ দাতা বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেক রাস্তায় স্বীয় মাল খরচ করেছিলাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছো। তোমার ইচ্ছা তো শুধু এই ছিল যে, তুমি বড় দাতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ কর। সুতরাং তা বলা হয়ে গেছে।' অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ। তা আমি তোমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তুমি তোমার উদ্দেশ্য লাভ করেছ।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাঃ)-কে বলেনঃ 'তোমার পিতা স্বীয় দান দ্বারা যা চেয়েছিল তা সে পেয়ে গেছে।' আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জাদ আনতো একজন বড় দাতা ছিল। সে দরিদ্র ও অভাবীদের সাথে বড়ই উত্তম ব্যবহার করতো এবং আল্লাহর নামে বহু গোলাম আযাদ করেছিল, সে কি এর কোন লাভ পাবে না?' তিনি বলেনঃ না, সে তো সারা জীবনে একদিনও বলেনি-'হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমার পাপ মার্জনা করুন।'

এজন্যেই এখানেও আল্লাহ তা'আল্লাহ বলেন-আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর তাদের বিশ্বাস নেই, নতুবা তারা শয়তানের ফাঁদে পড়তো না এবং খারাপকে ভালো মনে করতো না। তারা শয়তানের সঙ্গী। সঙ্গীর দুষ্কার্যের উপর তাদের দুষ্কার্য চিন্তা করে নাও। একজন আরব কবি বলেনঃ

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ * فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي

অর্থাৎ 'মানুষের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো না, বরং জিজ্ঞেস কর তার সাথী সম্বন্ধে, প্রত্যেক সাথী তার সাথীরই অনুসারী হয়ে থাকে।'

এরপর ইরশাদ হচ্ছে- 'তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে, সঠিক পথে চলতে, রিয়াকারী পরিত্যাগ করতে এবং ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তাতে তাদের ক্ষতি কি আছে? বরং সরাসরি উপকারই রয়েছে। কারণ এর ফলে তাদের পরিণাম ভাল হবে। তারা আল্লাহর

পথে খরচ করতে সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ করছে কেন? তারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে না কেন? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তাদের ভাল ও মন্দ নিয়তের জ্ঞান তাঁর পুরোপুরিই রয়েছে। ভাল কার্যের তাওফীক লাভ করার যোগ্য ও অযোগ্য সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান। ভাল লোকদেরকে তিনি ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করতঃ স্বীয় সন্তুষ্টির কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে নিয়ে তাদেরকে তাঁর নৈকট্য দান করে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকদেরকে তিনি স্বীয় মহা মর্যাদাসম্পন্ন দরবার হতে দূরে সরিয়ে দেন। যার ফলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে থাকে।' আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওটা হতে আশ্রয় দান করুন!

৪০। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দুমাত্র অত্যাচার করেন না এবং যদি কোন সৎকার্য থাকে তবে তিনি ওটা দ্বিগুণিত করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহান প্রতিদান প্রদান করেন।

٤٠- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ○

৪১। অনন্তর তখন কি দশা হবে-যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করবো এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করবো?

٤١- فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ○

৪২। যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা সেদিন কামনা করবে- যেন ভূমণ্ডল তাদের সাথে সমতল হয় এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।

٤٢- يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا ○ ع

আল্লাহ তা'আলা বলেন-'তিনি কারও উপর অত্যচার করেন না, কারও পুণ্য নষ্ট করেন না, আরও বৃদ্ধি করে তার পুণ্য ও প্রতিদান কিয়ামতের দিন দান করবেন।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ

অর্থাৎ 'আমি ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লা রাখবো।' (২১ঃ ৪৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন-

يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

অর্থাৎ 'বাছা! যদি কোন জিনিস সরিষার দানার সমানও হয় এবং তা কোন পাথরে বা আকাশসমূহ অথবা পৃথিবীর মধ্যে থাকে, আল্লাহ তা আনয়ন করবেন, নিশ্চয়ই তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ।' (৩১ঃ ১৬) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ * وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ *

অর্থাৎ 'সে দিন মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে যেন তাদেরকে তাদের কার্যাবলী দেখানো হয়, অতএব সে অণুপরিমাণও যা সৎকাজ করেছে তা দেখতে পাবে এবং অণুপরিমাণও যা মন্দ কাজ করেছে তাও দেখতে পাবে।' (৯৯ঃ৬-৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফ'আতযুক্ত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছেঃ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ফিরে এসো এবং যার অন্তরে সরিষার দানার সমানও ঈমান দেখ তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। সুতরাং বহু মাখলুক জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআন কারীমের- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -এ আয়াতটি পাঠ করে নাও।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কোন দাস বা দাসীকে আনয়ন করা হবে এবং একজন আহ্বানকারী হাশরের ময়দানের সমস্ত লোককে শুনিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলবেন, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক। যে কারও প্রাপ্য তার জিম্মায় রয়েছে সে যেন এসে নিয়ে যায়। সেদিন অবস্থা এই হবে যে, স্ত্রীলোক

চাইবে তার কোন প্রাপ্য পিতার উপর, মাতার উপর, ভ্রাতার উপর বা স্বামীর উপর থাকলে সে দৌড়িয়ে এসে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি فَلَآ اَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ (২৩ঃ ১০১)-এ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ সেদিন বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হক ইচ্ছেমত ক্ষমা করবেন। কিন্তু মানুষের প্রাপ্য ক্ষমা করবেন না। যখন দাবীদারগণ এসে যাবে তখন তাকে বলা হবে, তাদের প্রাপ্য আদায় কর। সে তখন বলবে, দুনিয়াতো শেষ হয়ে গেছে, আজ আমার হাতে কি রয়েছে যে, তা আমি দেবো? অতএব তার সৎ কার্যাবলী নেয়া হবে এবং দাবীদারদেরকে দেয়া হবে।

এভাবেই প্রত্যেকের প্রাপ্য আদায় করা হবে। এখন লোকটি যদি আল্লাহভক্ত হয় তবে তার কাছে এক সরিষার দানা পরিমাণ পুণ্য অবশিষ্ট থাকলেও আল্লাহ তা'আলা ওকে বৃদ্ধি করতঃ শুধুমাত্র ওরই উপর ভিত্তি করে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا

-এ আয়াতটি পাঠ করেন। আর যদি লোকটি আল্লাহভক্ত না হয়, বরং পাপী ও দুরাচার হয় তবে তার অবস্থা এই হবে যে, ফেরেশ্তাগণ বলবেন–'হে আল্লাহ! তার পুণ্যগুলো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও দাবীদারগণ বাকী রয়েছে।'

তখন নির্দেশ দেয়া হবে–'দাবীদারদের পাপগুলো তার উপর চাপিয়ে দাও। অতঃপর তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট কর।' এ মাওকুফ হাদীসটির কিছু কিছু 'শাওয়াহিদ' মারফূ' হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত উমার (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا-এ আয়াতটি মরুচারী আরবদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এর উপর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ঃ 'তাহলে মুহাজিরদের ব্যাপারে কোন্ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'এর চেয়ে উত্তম اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -এ আয়াতটি।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا -এ উক্তি হিসেবে এর কারণে মুশরিকেরও শাস্তি কম করা হবে। হ্যাঁ, তবে জাহান্নাম হতে তো বের হবেই না। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল

(সঃ)! আপনার চাচা আবূ তালিব আপনার আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি আপনাকে লোকদের কষ্ট দেয়া হতে রক্ষা করতেন এবং আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন, তাহলে তার কোন লাভ হবে কি?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হ্যাঁ, তিনি খুব অল্প আগুনের মধ্যে রয়েছেন। যদি আমার এ সম্পর্ক না থাকতো তবে তিনি জাহান্নামের একেবারে নিম্ন তলায় থাকতেন।'

কিন্তু খুব সম্ভব এ উপকার শুধুমাত্র আবূ তালিবের জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্যান্য কাফির এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, মুসনাদ-ই-তায়ালেসীর হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ মুমিনের কোন পুণ্যের উপর অত্যাচার করেন না। দুনিয়ায় খাওয়া-পরা ইত্যাদির আকারে ওর প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আখিরাতে সওয়াবের আকারে ওর প্রতিদান পাবে। হ্যাঁ, তবে কাফির তো তার পুণ্য দুনিয়াতেই খেয়ে নেয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তার নিকটে কোন পুণ্যই থাকবে না।

এ আয়াতে أَجْرًا عَظِيمًا -এর ভাবার্থ হচ্ছে জান্নাত। আমরা আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাত যাচ্ঞা করছি। মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি গারীব হাদীসে রয়েছে, হযরত আবূ উসমান (রঃ) বলেন, আমি সংবাদ পাই যে, আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাকে একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লক্ষ পুণ্য দান করে থাকেন।' আমার বড়ই বিস্ময় বোধ হয় এবং আমি বলি– আমি তো তোমাদের সবার চাইতে অধিক হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর খিদমতে থেকেছি। আমি তো কখনও তাঁর নিকট এ হাদীসটি শুনিনি। তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, আমি নিজেই গিয়ে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ এটা জিজ্ঞেস করে আসবো।

অতএব আমি সফরের আসবাবপত্র ঠিক করে নিয়ে এ বর্ণনাটির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যাত্রা শুরু করি। আমি জানতে পারি যে, তিনি হজ্বে গিয়েছেন। আমিও হজ্বের নিয়ত করে তথায় পৌঁছি। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! আমি শুনেছি যে, আপনি এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটা কি সত্য? তিনি তখন বলেন, 'তুমি কি এতে বিস্ময় বোধ করছো? তুমি কি কুরআন কারীম পাঠ করনি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন।'

অন্য আয়াতে রয়েছে, وَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ অর্থাৎ "পরকালের তুলনায় ইহকালের জগতের আসবাবপত্র খুবই অল্প।" (৯ঃ ৩৮) আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছিঃ 'একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করে ওর বিনিময়ে দু' লক্ষ পুণ্য প্রদান করবেন।' এ হাদীসটি অন্যান্য পন্থায়ও বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেদিন নবীগণকে সাক্ষী রূপে পেশ করা হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْىٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ

অর্থাৎ "পৃথিবী স্বীয় প্রভুর আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আমলনামা দেয়া হবে এবং নবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে আনয়ন করা হবে।" (৩৯ঃ ৬৯) অন্য এক জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে–

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ 'সেই দিন প্রত্যেক উম্মতের উপর আমি তাদেরই মধ্য হতে সাক্ষী প্রেরণ করবো।' (১৬ঃ ৮৯)

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে বলেন, "আমাকে কিছু কুরআন কারীম পাঠ করে শুনাও।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তখন বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনাকে কুরআন কারীম পাঠ করে কি শুনাবো? কুরআন কারীম তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে।" তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি অন্যের নিকট হতে শুনতে চাই।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, "আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করতে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন আমি

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا (৪ঃ ৪১)

-এ আয়াতটি পাঠ করি তখন তিনি বলেনঃ 'যথেষ্ট হয়েছে।' আমি দেখি যে, তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।"

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ফুযালা আনসারী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানী যুফ্র গোত্রের নিকট আগমন করেন এবং সে পাথরের উপর বসে পড়েন যা এখন পর্যন্ত সে মহল্লায় বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর সাথে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত মুয়ায্ ইবনে জাবাল (রঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীও ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন ক্বারীকে বলেনঃ "কুরআন কারীম পাঠ কর।" তিনি পড়তে পড়তে যখন উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তিনি এত ক্রন্দন করেন যে, তাঁর গণ্ডদেশ এবং শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি আরয করেনঃ "হে আমার প্রভু! আমি যাদের সামনে রয়েছি তাদের উপর আমার সাক্ষ্য দান সম্ভব, কিন্তু যাদেরকে আমি দেখিনি তাদের ব্যাপারে কিরূপে এটা সম্ভব?" (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি তাদের উপর সাক্ষী আছি যতদিন পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি। অতঃপর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন তখন আপনিই তাদের উপর রক্ষক।" হযরত আবূ আবদুল্লাহ কুরতুবী স্বীয় পুস্তক 'তাজকেরা'য় একটি পরিচ্ছেদ করেছেনঃ 'নবী (সঃ)-এর স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে যা এসেছে।' তাতে তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের এ উক্তি এনেছেন যে, সকাল সন্ধ্যায় নবী (সঃ)-এর উপর তাঁর উম্মতের কার্যাবলী তাদের নামসহ পেশ করা হয়। সুতরাং তিনি কিয়ামতের দিন তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন।

কিন্তু প্রথমতঃ এটা হযরত সাঈদ (রঃ)-এর নিজের উক্তি। দ্বিতীয়তঃ এর সনদে ইনকিতা [১] রয়েছে। এতে একজন বর্ণনাকারী সন্দেহযুক্ত যার নামই নেই। তৃতীয়তঃ এ হাদীসটি মারফূ'রূপে বর্ণনাই করেন না। হ্যাঁ, তবে ইমাম কুরতুবী (রঃ) এটাকে গ্রহণ করে থাকেন। হাদীসটি আনার পর তিনি বলেন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলার সামনে কার্যাবলী পেশ করা হয় এবং নবীদের উপর ও পিতা-মাতার উপর প্রতি শুক্রবার হাযির করা হয়, আর এতে কোন তা'আরুয্ বা পরস্পর বিরোধ নেই। কাজেই সম্ভবতঃ আমাদের নবী (সঃ)-এর কাছে প্রত্যেকদিন এবং অন্যান্য নবীদের কাছে প্রতি শুক্রবার উম্মতের কার্যাবলী পেশ করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—সেদিন কাফিরেরা এবং রাসূল (সঃ)-এর অবাধ্যাচরণকারীরা আকাঙ্খা করবে যে, যদি যমীন ফেটে যেতো এবং তারা ওর ভেতরে প্রবেশ করতে পারতো এবং পরে মাটি সমতল হয়ে যেতো তবে কতইনা ভাল হতো! কেননা, তারা সেই দিন অসহ্য সন্ত্রাস, অপমান এবং শাসন-গর্জনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে—

১. বর্ণনাকারীদের যোগসূত্র ছিন্ন হওয়াকে 'ইনকিতা' বলে।

يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا-

অর্থাৎ 'যেদিন মানুষ সম্মুখে প্রেরিত কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখে নেবে এবং কাফির বলবে– যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম।' (৭৮ঃ ৪০)

অতঃপর বলা হচ্ছে–'তারা সেদিন এ সমস্ত কাজের কথা স্বীকার করে নেবে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল এবং একটি কথাও তারা গোপন করতে পারবে না।' তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'কুরআন কারীমের এক জায়গায় তো রয়েছে–

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ-

অর্থাৎ 'আমাদের প্রভু আল্লাহর শপথ! আমার মুশরিক ছিলাম না।' (৬ঃ২৩) অন্য স্থানে রয়েছে– لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ 'তারা আল্লাহর নিকট কোন কথাই গোপন করবে না'। এ দু'টি আয়াতের ভাবার্থ কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুশরিকরা যখন দেখবে যে, মুসলমান ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে– এস আমরা অস্বীকার করে বসি। তখন তারা বলবে– وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডলের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন এবং তাদের হাতগুলো ও পাগুলো কথা বলতে থাকবে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا

মুসনাদ-ই-আবদুর রাযযাকে রয়েছে যে, ঐ লোকটি এসে বলেন, 'কুরআন পাকের মধ্যে বহু জিনিস আমার নিকট বৈসাদৃশ ঠেকছে।' তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'তোমার উদ্দেশ্য কি? কুরআন কারীমের ব্যাপারে তোমার কি সন্দেহ রয়েছে?' লোকটি বলেন, 'সন্দেহ তো নেই। কিন্তু আমার জ্ঞানে কুরআন পাকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেখানে যেখানে তুমি বৈসাদৃশ্য মনে করছো এগুলো উল্লেখ কর তো।' তখন লোকটি উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে বলেন, একটি দ্বারা গোপন করা প্রমাণিত হচ্ছে এবং অপরটি দ্বারা গোপন না করা প্রমাণিত হচ্ছে। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ উত্তর প্রদান করতঃ দু'টি আয়াতের আনুকূল্য বুঝিয়ে দেন।

অন্য একটি বর্ণনায় প্রশ্নকারীর নামও এসেছে যে, তিনি ছিলেন হযরত নাফে' ইবনে আযরাক (রঃ)। ঐ বর্ণনায় এও এসেছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) লোকটিকে বলেন, 'আমার ধারণা এই যে, তুমি তোমার সঙ্গীদের নিকট হতে আসছো। সেখানেও হয় তো এ আলোচনা চলছিল। তুমি হয়তো বলেছো– 'আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে আসছি।' আমার ধারণা যদি সত্য হয় তবে যখন তুমি তাদের নিকট ফিরে যাবে তখন তাদেরকে সংবাদ দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমস্ত লোককে একই স্থানে একত্রিত করবেন। সে সময় মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ তা'আলা একমাত্র একত্ববাদীদের ছাড়া কারও নিকট হতে কিছুই গ্রহণ করবেন না, কাজেই এসো আমরা অস্বীকার করি।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তখন তারা বলবে– وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহর শপথ। আমরা মুশরিক ছিলাম না।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা মুশরিক ছিল। সে সময় তারা কামনা করবে যে, যেন ভূমণ্ডল তাদের সাথে সমতল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কথাই তারা গোপন করতে পারবে না। এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

٤٣- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً

৪৩। হে মুমিনগণ! মত্ততাবস্থায় যে পর্যন্ত না স্বীয় বাক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পার এবং পথাতিক্রম ব্যতীত অবগাহন না করা পর্যন্ত অপবিত্রাবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না; এবং যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ○	পানি না পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করছেন। কেননা, সে সময় নামাযী নিজেই বুঝতে পারে না যে, সে কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে নামাযের স্থানে অর্থাৎ মসজিদে আসতে তাকেও নিষেধ করছেন এবং অবগাহনের পূর্বে অপবিত্র লোককেও নিষধ করছেন। হ্যাঁ, তবে এরূপ ব্যক্তি কোন কার্য বশতঃ যদি মসজিদের একটি দরজা দিয়ে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ফিরে আসে এবং তথায় অবস্থান না করে তবে এ যাতায়াত বৈধ।

নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। যেমনঃ সূরা-ই-বাকারার يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (২ঃ ২১৯)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে প্রকাশিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ আয়াতটি হযরত উমার (রাঃ)-এর সামনে পাঠ করেন তখন হযরত উমার (রাঃ) প্রার্থনা করেন–'হে আল্লাহ! মদ্য সম্বন্ধে আরও পরিষ্কারভাবে আয়াত অবতীর্ণ করুন।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নেশার অবস্থায় নামাযের নিটকবর্তী না হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরে লোকেরা নামাযের সময় মদ্যপান পরিত্যাগ করে। এটা শুনে হযরত উমার (রাঃ) পুনরায় এ প্রার্থনাই করেন। তখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ হতে فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (৫ঃ ৯০-৯১) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে মদ্য হতে দূরে থাকার পরিষ্কার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। এটা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'আমরা বিরত থাকলাম।' এ বর্ণনার একটি সনদে রয়েছে যে, যখন সূরা-ই-নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশার অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয় তখন প্রথা ছিল, যখন নামায আরম্ভ করা হতো তখন একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতো–'মাতাল ব্যক্তি যেন নামাযের নিকটবর্তী না হয়।'

সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে, হযরত সাদ (রাঃ) বলেন, 'আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একজন আনসারী খাদ্য রান্না করতঃ বহু লোককে দাওয়াত দেন। আমরা ভোজনে পরিতৃপ্ত হই। অতঃপর আমরা মদ্যপান করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। এরপরে আমরা পরস্পরের গৌরব প্রকাশ করতে থাকি। একটি লোক উটের চোয়ালের অস্থি উঠিয়ে হযরত সাদ (রাঃ)-কে মেরে দেয়, যার ফলে তাঁর নাক আহত হয় এবং ওর চিহ্ন থেকে যায়।' সে সময় পর্যন্ত মদ্য হারাম হয়নি। অতঃপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।' এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) জনগণকে জিয়াফত করেন। জনগণ আহারের পর মদ্যপান করেন এবং জ্ঞানশূন্য হয়ে যান। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। একজনকে ইমাম করা হয়। তিনি পাঠ করেনঃ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ * مَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ * وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ *

সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মত্ততাবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। এ হাদীসটি জামেউত্ তিরমিযীর মধ্যেও রয়েছে এবং এটা হাসান।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এবং তৃতীয় একজন সাহাবী মদ্যপান করেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-কে ইমাম বানান হয়। কুরআন কারীমের সূরা তিনি বিশৃংখলভাবে পাঠ করেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুনান-ই-আবি দাঊদ এবং সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরেও আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) ইমাম হন এবং যেভাবে পড়তে চেয়েছিলেন সেভাবে পড়তে পারেননি। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ইমাম হয়েছিলেন এবং তিনি নিম্নরূপ পাঠ করেছিলেনঃ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ * اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ * وَاَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ * وَاَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ * لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ *

তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং ঐ অবস্থায় নামায পড়া হারাম ঘোষণা করা হয়।

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, 'মদ্যের অবৈধতার পূর্বে মানুষ মাতাল অবস্থায় নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়।' (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর লোক এ কাজ হতে বিরত থাকে।

অতঃপর সম্পূর্ণরূপে মদ্যের অবৈধতা ঘোষিত হয়। হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ মদ্যের মত্ততা নয় বরং ভাবর্থ হচ্ছে নিদ্রালুতা। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এখানে মদ্যের মত্ততা ভাবার্থ হওয়াই সঠিক কথা এবং এখানে নেশায় উন্মত্ত লোকদেরই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এতটা নয় যে, শরীয়তের আহ্কাম তাদের উপর জারী হতেই পারে না। কেননা, নেশায় এরূপ মত্ততাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাগলেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'উসূল' শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মনীষীদের উক্তি এই যে, সম্বোধন দ্বারা ঐ লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যারা কথা বুঝতে পারে। এমন উন্মত্ত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করা যেতে পারে না যারা কিছুই বুঝে না যে, তাদেরকে কি বলা হচ্ছে। কেননা, সম্বোধন অনুধাবন করার শর্ত হচ্ছে তাকলীফের।

এও বলা হয়েছে যে, যদিও শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে–'তোমরা মাতাল অবস্থায় নামায পড়ো না, কিন্তু ভাবার্থ হচ্ছে–তোমরা নেশার জিনিস পানাহারও করো না।' কেননা, এটা কিরূপে সম্ভব যে, একজন মদ্যপায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক সময়ে আদায় করতে পারে অথচ সে বরাবর মদ্য পান করতেই থাকে? এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। তাহলে এ নির্দেশও ঠিক ঐ নির্দেশরই মত যেখানে বলা হয়েছে– 'হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটা ভয়ের তাঁর হক রয়েছে এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না।' এখানে ভাবার্থ এই যে, তোমারা সদা-সর্বদা এরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং এমন সৎ কার্যাবলী সব সময় সম্পাদন করতে থাক যে, যখন তোমরা মরণ বরণ করবে তখন যেন তোমাদের মৃত্যু ইসলামের উপরেই হয়।

তদ্রূপ এ আয়াতে যে নির্দেশ হচ্ছে– যে পর্যন্ত না তোমরা বুঝতে পার যে, তোমরা কি বলছ, এটা হচ্ছে নেশার সীমারেখা। অর্থাৎ নেশার অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে নিজের কথাই বুঝতে পারে না। নেশায় উন্মত্ত ব্যক্তি কুরআন কারীম বিশৃংখলভাবে পাঠ করে থাকে। তার বুঝবার এবং চিন্তা গবেষণা করবার সুযোগ হয় না। সে নামাযে বিনয়ও প্রকাশ করতে পারে না।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারও তন্দ্রা এলে সে যেন ফিরে আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ে যে পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে সে কি বলছে।' সহীহ বুখারী ও সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। হাদীসের কতক শব্দ এও রয়েছেঃ 'সে চায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিন্তু হয়তো তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা বেরিয়ে যাবে।'

এবারে বলা হচ্ছে–'অপবিত্র ব্যক্তিও যেন গোসল করার পূর্বে নামাযের নিকটবর্তী না হয়। হ্যাঁ, তবে অতিক্রম করা হিসেবে মসজিদের ভেতর দিয়ে গমন করা জায়েয'। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন যে, এরূপ অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভেতরে যাওয়া জায়েয নয়। তবে মসজিদের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। মসজিদে বসতে পারবে না। আরও বহু সাহাবী ও তাবেঈর এটাই উক্তি।

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবূ হাবীব বলেন যে,"কতগুলো আনসার যাঁরা মসজিদের চতুর্দিকে বাস করতেন তাঁরা অপবিত্র হলে বাড়ীতে হয়তো পানি থাকতো না, আর তাঁদের ঘরের দরজা মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকতো, তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তাঁরা ঐ অবস্থাতেই মসজিদ দিয়ে গমন করতে পারেন।

সহীহ বুখারী শরীফে তো একথা স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, লোকদের ঘরের দরজা মসজিদেই ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় মরণ রোগের সময় বলেনঃ 'মসজিদে যেসব লোকের দরজা রয়েছে সবগুলো বন্ধ করে দাও। শুধুমাত্র হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর দরজাটি রেখে দাও।' এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হযরত আবূ বকরই (রাঃ) হবেন এবং তাঁর প্রায় সব সময় মসজিদে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে যেন তিনি মুসমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করতে পারেন। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমস্ত দরজা বন্ধ করে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর দরজা খুলে রাখতে নির্দেশ দেন। সুনানের কোন কোন হাদীসে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পরিবর্তে হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক ওটাই যা সহীহ্‌তে রয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ ইমাম দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অপবিত্র লোকের মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ। তবে গমন করা বৈধ। হায়েয্ ও নিফাস্ বিশিষ্ট

নারীদেরও এ হুকুম। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ নারীদের জন্যে মসজিদ দিয়ে গমনও বৈধ নয়। কেননা, এতে মসজিদে অপবিত্রতা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার অন্য কেউ বলেন যে, যদি এ ভয় না থাকে তবে তাদের গমনও বৈধ।

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেনঃ 'আমাকে মসজিদ হতে মাদুরটি এনে দাও।' তিনি তখন বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি হায়েযের অবস্থায় রয়েছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হায়েয তো তোমার হাতে নেই।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঋতুবতী নারী মসজিদে যাতায়াত করতে পারে। নিফাস বিশিষ্টা নারীরও এ হুকুম। এরা রাস্তায় চলা হিসেবে যাতায়াত করতে পারে।

সুনান-ই-আবূ দাঊদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা রয়েছেঃ 'আমি ঋতুবতী নারী ও অপবিত্র লোকদের জন্যে মসজিদকে হালাল করি না।' ইমাম আবূ মুসলিম খাত্তাবী (রঃ) বলেন, 'এ হাদীসটিকে একটি দল দুর্বল বলেছেন। কেননা, এর একজন বর্ণনাকারী আফলাত ইবনে খালীফাতুল আমেরী অপরিচিত।' কিন্তু সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যে এ বর্ণনাটি রয়েছে। তাতে আফলাতের স্থলে মা'দূম যিহ্লী রয়েছে। প্রথম হাদীসটি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এবং এ দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু সঠিক নাম হযরত আয়েশারই (রাঃ) বটে।

জামেউত্ তিরযিমীর মধ্যে অন্য একটি হাদীস হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে আলী! এ মসজিদে অপবিত্র হওয়া তোমার ও আমার ছাড়া আর কারও জন্যে হালাল নয়।' এ হাদীসটি সম্পূর্ণই দুর্বল এবং এটা কখনই সাব্যস্ত হতে পারে না। এতে সালিম নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যে পরিত্যাজ্য এবং তার শিক্ষক আতিয়্যাও দুর্বল। এ বিষয়ে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'ভাবার্থ এই যে, অপবিত্র ব্যক্তি এ অবস্থায় গোসল না করে নামায পড়তে পারে না, কিন্তু যদি সফরে থাকে এবং পানি না পায় তবে পানি না পাওয়া পর্যন্ত পড়তে পারে।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) এবং হযরত যহ্হাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ) হযরত যায়েদ (রঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান (রঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, 'আমরা শুনতাম যে, এ হাদীসটি সফরের হুকুমে অবতীর্ণ হয়েছে।' এ হাদীস দ্বারাও এ মাসআলার সাক্ষ্য হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানকে পবিত্রকারী যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। যখন পানি পাওয়া যাবে তখন ওটাই ব্যবহার করবে, এটাই তোমার জন্যে উত্তম।' (সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদ)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ দু'টি উক্তির মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ লোকদের উক্তি যাঁরা বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে অতিক্রম করা হিসেবে মসজিদে গমন করা। কেননা, যে মুসাফির অপবিত্র অবস্থায় পানি পাবে না তার হুকুমতো পরে পরিষ্কারভাবে রয়েছে। সুতরং এখানেও যদি এ ভাবার্থই হয় তবে পরে আবার একে অন্য বাক্যে ফেরানোর কোন আবশ্যকতা থাকে না।

অতএব আয়াতের অর্থ এখন এই হলো যে, হে মুমিনগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় মসিজদে যেওনা যে পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কথা নিজেরাই বুঝতে না পার। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থাতেও তোমরা মসজিদে যেওনা যে পর্যন্ত অবগাহন না কর। তবে রাস্তা অতিক্রম করা হিসেবে যাওয়া বৈধ। عَابِرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে আসা-যাওয়া অর্থাৎ অতিক্রম করা। এর مَصْدَر - عِبْرًا বা عُبُوْرًا এসে থাকে। যখন কেউ নদী অতিক্রম করে তখন আরববাসীরা বলে, عَبَرَ فُلَانٌ النَّهْرَ অর্থাৎ 'অমুক নদী অতিক্রম করেছে।'

অনরূপভাবে যে শক্তিশালী উট সফরে পথ অতিক্রম করে তাকেও তারা বলে, عَبَّرَ الْاَسْفَارُ অর্থাৎ উট ভ্রমণ পথ অতিক্রম করেছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) যে উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করেন, জমহূরেরও ঐ উক্তি। আর আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে অসম্পূর্ণ অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করছেন যা নামাযের উদ্দেশ্যের বিপরীত। অনুরূপভাবে নামাযের স্থানে এমন অবস্থায় আসতে বাধা দিচ্ছেন যা সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার উল্টো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ভাল রয়েছে।

তারপর যে আল্লাহ পাক বলেন–'যে পর্যন্ত তোমরা গোসল না কর।' এটা দলীল হচ্ছে ইমাম আবূ হানিফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর যে, অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ, যে পর্যন্ত সে গোসল না করবে বা যদি পানি না পায় কিংবা পানি পায় কিন্তু তা ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকে তবে তায়াম্মুম করে নেবে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, অপবিত্র ব্যক্তি যখন নামায পড়ে নেবে তখন তার জন্যে মসজিদে অবস্থান বৈধ। যেমন মুসনাদ-ই-আহমাদ এবং সুনান-ই-সাঈদ মানসূরে বর্ণিত আছে। হযরত আতা' ইবনে ইয়াসার (রঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি যে, তারা অপবিত্র হতেন এবং অযু করে মসজিদে বসে থাকতেন।' এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এখন কোন্ কোন্ সময় তায়াম্মুম করা জায়েয তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যে রোগের কারণে তায়াম্মুম জায়েয হয় ওটা হচ্ছে ঐ রোগ যে ঐ সময় পানি ব্যবহার করলে কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার বা রোগের সময় বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। কোন কোন আলেম প্রত্যক রোগের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতির ফতওয়া দিয়েছেন। কেননা আয়াত সাধারণ।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, একজন আনসারী রুগ্ন ছিলেন। না তিনি দাঁড়িয়ে অযু করতে পারেতন, না তাঁর কোন সেবক ছিলো যে তাঁকে পানি দেয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করেন। সে সময় এ হুকুম অবতীর্ণ হয়। এ বর্ণনাটি মুরসাল।

তায়াম্মুমের বৈধতার দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে সফর। সে সফর দীর্ঘই হোক বা ক্ষুদ্র হোক। غَائِطٌ বলা হয় নরম ভূমিকে। এখানে ওর দ্বারা পায়খানাকে বুঝান হয়েছে। লা-মাসতুম শব্দের দ্বিতীয় পঠন হচ্ছে লামাসতুম। এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

অর্থাৎ 'যদি তোমরা সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্দিষ্ট কর তবে যা নির্দষ্ট করেছো তারা তার অর্ধেক পাবে।' (২ঃ ২৩৭)

অন্য আয়াতে রয়েছে– 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নারীদেরকে বিয়ে কর অতঃপর সঙ্গমের পূর্বে তালাক প্রদান কর তখন তাদের জন্যে 'ইদ্দত' নেই।' এখানেও مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ রয়েছে। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ (৫ঃ ৬)-এর ভাবার্থ সঙ্গম। হযরত আলী (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত তাউস (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ), হযরত

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন, 'একবার এ শব্দের উপর আলোচনা হলে কতগুলো মাওয়ালী বলেন যে, এটা সঙ্গম নয় এবং কতগুলো আরব বলেন যে, এটা সঙ্গম। আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন-'তুমি কাদের সঙ্গে ছিলে?' আমি বলি- 'আমি মাওয়ালীদের সঙ্গে ছিলাম।' তিনি বলেন, 'মাওয়ালীগণ পরাজিত হয়েছে।' لَمْس- مَسّ এবং مُبَاشَرَت অর্থ হচ্ছে সঙ্গম। আল্লাহ তা'আলা এখানে কিনায়া করেছেন। অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এর ভাবার্থ সাধারণ স্পর্শ করা নিয়েছেন।

নিজের শরীরের কোন অংশ স্ত্রীর শরীরের কোন অংশের সাথে মিলিয়ে নিলেই অযু ওয়াজিব হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'সঙ্গম ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করাকে لَمْس বলা হয়। তিনি বলেন যে, চুম্বনও لَمْس -এরই অন্তর্ভুক্ত এবং ওতেও অযু করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়বে।' তিনি আরও বলেন, 'সঙ্গম করায়, হাত দ্বারা স্পর্শ করায় এবং চুম্বন করায় অযু করতে হয়।' لَمْس -এর ভাবার্থ স্পর্শ করা।

হযরত ইবনে উমারও (রাঃ) চুম্বন দেয়াতে অযু ফরয হওয়ার উক্তিকারী ছিলেন এবং ওটাকেও لَمْس -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। হযরত উবাইদাহ (রাঃ), হযরত আবূ উসমান (রাঃ), হযরত সাবিতা (রাঃ), হযরত ইবরাহীম (রাঃ) এবং হযরত যায়েদও (রাঃ) বলেন যে, لَمْس -এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ স্পর্শ করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'মানুষের স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা হচ্ছে مُلَامَسَة - এতে অযু ফরয হয়ে যাবে।' (মুআত্তা-ই-মালিক)

দারেকুতনীর হাদীসের মধ্যে স্বয়ং হযরত উমার (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বর্ণনা এর বিপরীতও পাওয়া যায় যে, তিনি অযুর অবস্থায় ছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন দেন, অতঃপর অযু করেননি, ঐ অবস্থাতেই নামায আদায় করেন। সুতরাং এ দু'টি বর্ণনাকে সঠিক মেনে নেয়ার পর এ ফায়সালা করতেই হবে যে, তিনি অযুকে মুস্তাহাব মনে করতেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সাধারণ স্পর্শতেই অযু করতে হবে এ উক্তি হচ্ছে শাফিঈ (রঃ) এবং তাঁর সহচরের। ইমাম মালিক ও প্রসিদ্ধ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতেও এ উক্তিই বর্ণিত আছে। যাঁরা এ উক্তি করেন তাঁরা বলেন যে, এখানে দু'টি কিরআত রয়েছে। একটি হচ্ছে লা-মাসতুম এবং অপরটি হচ্ছে লামাসতুম। আর কুরআন কারীমের মধ্যে হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপরও لَمْس শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ (৬ঃ ৭) এটা স্পষ্টকথা যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা। অনুরূপভাবে হযরত মায়েয ইবনে মালিক (রাঃ)-কে রাসূল (সঃ) বলেছিলেনঃ 'সম্ভবতঃ তুমি চুম্বন দিয়ে বা হাত দ্বারা স্পর্শ করে থাকবে।' সেখানেও لَمَسْتَ শব্দ রয়েছে এবং শুধু হাত লাগানোর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য হাদীসে রয়েছে وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ অর্থাৎ 'হাতের ব্যভিচার হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরূপ খুব কম দিনই অতিবাহিত হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে চুম্বন দেননি বা হাত দ্বারা স্পর্শ করেননি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) بَيْعِ مُلَامَسَتْ হতে নিষেধ করেছেন । এখানেও এর অর্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করার ক্রয়-বিক্রয়। অতএব হাদীসটিকে যেমন সঙ্গমের উপর প্রয়োগ করা হয় তদ্রূপ হাত দ্বারা স্পর্শ করার উপরও প্রয়োগ করা হয়। কবি বলেনঃ

وَلَمَسْتُ كَفِّىْ كَفَّهُ اَطْلُبُ الْغِنٰى

অর্থাৎ 'আমার হাত তার হাতের সাথে মিলিত হয়েছে, আমি ধন চাই।'

ইবনে আবি লাইলা হযরত মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকটির ব্যাপারে মীমাংসা কী হতে পারে যে একটি অপরিচিতা নারীর সঙ্গে শুধু ব্যভিচার ছাড়া ঐ সমস্ত কাজ করেছে যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে।

তখন- اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ (১১ঃ ১১৪) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোকটিকে বলেন, অযু কর ও নামায আদায় কর। হযরত মুআয (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি একমাত্র তার জন্যে নির্দিষ্ট, না সমস্ত মুসলমানের জন্য

সাধারণ?' তিনি উত্তর দেনঃ "বরং এটা সমস্ত মুসলমানের জন্যে সাধারণ।" ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে যায়েদার হাদীস থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, এর সনদ সংযুক্ত নয়। ইমাম নাসাঈ (রঃ) হতে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন।

মোটকথা, এটার উক্তিকারী এ হাদীসটি সম্বন্ধে বলেন, 'লোকটিকে অযু করার নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, সে স্ত্রীলোকটিকে স্পর্শ করেছিল মাত্র সঙ্গম করেনি। এর উত্তর এই দেয়া যায় যে, প্রথমতঃ এটা মুনকাতা। ইবনে আবি লাইলা ও হযরত মু'আযের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ হতে পারে যে, তাকে ফরয নামায আদায়ের জন্যে অযু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে বান্দা কোন পাপ করার পর অযু করে দু' রাকআত নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করে থাকেন। এ হাদীসটি পূর্ণভাবে সূরাঃ আলে ইমরানের ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ (৩ঃ ১৩৫)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, 'এ উক্তি দুটির মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ লোকদের উক্তি যাঁরা বলেন যে, اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ -এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম, অন্য কিছু নয়।' কেননা, সহীহ মারফূ' হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন পত্নীকে চুম্বন দেন এবং অযু না করেই নামায আদায় করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করতেন, অতঃপর চুম্বন দিতেন এবং পরে অযু না করেই নামায আদায় করতেন।'

হযরত হাবীব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলূল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন সহধর্মিণীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামাযে যেতেন এবং অযু করতেন না।' আমি বলি, সে স্ত্রী আপনিই হতেন। তখন তিনি মুচকি হেসে উঠেন। এর সনদে সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সনদে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরের বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে শ্রবণকারী হচ্ছেন হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– 'অযুর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে চুম্বন করতেন এবং পুনরায় অযু করতেন না।' অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি চুম্বন করেন এবং পরে অযু না করেই নামায আদায় করেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুম্বন করতেন অথচ তিনি রোযার অবস্থায় থাকতেন এবং তাতে তাঁর রোযাও নষ্ট হতো না ও তিনি

নতুনভাবে অযুও করতেন না'। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) হযরত যায়নাব সাহমিয়া' (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুম্বন দেয়ার পর অযু না করেই নামায আদায় করতেন।'

এরপর আল্লাহ পাক বলেন–'যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।' এর দ্বারা অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে পানি অনুসন্ধানের পর। 'কুতুবে ফুরু'র মধ্যে অনুসন্ধানের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে দেখেন যে, সে লোকদের সাথে নামায না পড়ে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'জনগণের সাথে তুমি নামায পড়লে না কেন? তুমি কি মুসলমান নও?' লোকটি বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি মুসলমান তো বটে, কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ঐ অবস্থায় তোমার জন্যে মাটি যথেষ্ট ছিল।' تَيَمُّمٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা।

আরবেরা বলে– تَيَمَّمَكَ اللّٰهُ بِحِفْظِهٖ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হিফাযতের সঙ্গে তোমার প্রতি ইচ্ছে পোষণ করুন।' ইমরুল কায়েসের নিম্নের কবিতায়ও تَيَمُّمٌ শব্দটি এ অর্থেই এসেছেঃ

وَلَمَّا رَاَتْ اَنَّ الْمَنِيَّةَ وِرْدُهَا * وَاَنَّ الْحَصٰى مِنْ تَحْتِ اَقْدَامِهَا دَامِىْ
تَيَمَّمَتِ الْعَيْنَ الَّتِىْ عِنْدَ ضَارِجٍ * يَفِىْءُ عَلَيْهَا الْفَىْءُ عَرْضُهَا طَامِىْ

صَعِيْدٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ জিনিস যা ভূপৃষ্ঠের উপর চড়ে গেছে। সুতরাং মাটি, বালু, গাছ প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

বলা হয়েছে যে, যে জিনিস মাটির শ্রেণীভুক্ত, যেমন বালু, ইট এবং চুন ইত্যাদি। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব। আবার শুধু মাটিকেও صَعِيْدٌ বলা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে ইমাম শাফিঈ (রঃ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং তাঁদের সহচরদের উক্তি। এর প্রথম দলীল তো কুরআন কারীমের এ শব্দগুলো فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا অর্থাৎ 'সুতরাং ওটা পিচ্ছিল মাটি হয়ে যাবে।' (১৮ঃ ৪০) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সহীহ মুসলিমের নিম্নে হাদীসটিঃ

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমাদেরকে সমস্ত মানুষের উপর তিনটি মর্যাদা দেয়া হয়েছে

(১) আমাদের সারিগুলো ফেরেশতাদের সারির মত করা হয়েছে (২) আমাদের জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ করা হয়েছে এবং (৩) ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাকে আমাদের জন্যে পবিত্র ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে যখন আমরা পানি না পাই।'

হাদীসের শব্দগুলোর মধ্যে تُرْبَةٌ শব্দ রয়েছে এবং অন্য সনদে تُرْبَةٌ -এর স্থলে تُرَابٌ শব্দ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসে কৃপা প্রকাশের সময় মাটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি অন্য কোন জিনিস অযুর স্থলবর্তী হতো তবে সাথে সাথে ওরও উল্লেখ করতেন। এখানে طَيِّبٌ শব্দটির অর্থের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ওর ভাবার্থ হচ্ছে হালাল এবং কারও কারও মতে ওর ভাবার্থ হচ্ছে পবিত্র।

যেমন হাদীস শরীফ রয়েছে, হররত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানদের অযু, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন সে যেন তা তার শরীরে বুলিয়ে দেয়। এটাই তার জন্যে উত্তম।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। হাফিয আবুল হাসান কাত্তানও (রঃ) একে বিশুদ্ধ বলেছেন। সবচেয়ে পবিত্র মাটি হচ্ছে ক্ষেত্র ভূমির মাটি। এমন কি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে একে মারফূ' রূপে আনা হয়েছে।

এরপর বলা হচ্ছে-'ঐ মাটি স্বীয় মুখমণ্ডলে ও হাতে ঘর্ষণ কর।' তায়াম্মুম হচ্ছে অযুর স্থলবর্তী। এটা শুধুমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্যে সমস্ত শরীরে ঘর্ষণের জন্যে নয়। সুতরাং শুধু মুখে ও হাতে ঘর্ষণ করলেই যথেষ্ট হবে। এর উপর ইজমা হয়েছে। কিন্তু তায়াম্মুম করার নিয়মে মতবিরোধ রয়েছে।

নতুন শাফিঈ মাযহাব এই যে, দু'বার করে মুখ এবং দু'খানা হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করা ওয়াজিব। কেননা, يَدَيْنِ -এর প্রয়োগ কাঁদের নিম্নাংশ পর্যন্ত ও হাতের কনুই পর্যন্ত এর উপর হয়ে থাকে। যেমন অযুর আয়াতে রয়েছে। আর এ শব্দেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং ভাবার্থ শুধু হস্তদ্বয়ের তালু হয়ে থাকে। যেমন চোরের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক বলেন- فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا (৫ঃ৩৮) এখানে তায়াম্মুমের হুকুমে হাতের বর্ণনা হচ্ছে সাধারণ এবং অযুর হুকুমে হচ্ছে শর্তযুক্ত। এজন্যেই 'মুতলাক'-কে 'মুকাইয়াদ' -এর হুকুমে উঠান হবে। কেননা, অযুর মধ্যে ব্যাপক পবিত্রতা বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ এর দলীলরূপে দারেকুতনী (রঃ)-এর বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তায়াম্মুত হচ্ছে দু'বার (হাত) মারা। একবার হাত মেরে মুখের উপর ঘর্ষণ করা

এবং আর একবার হাত মেরে দু' হাতকে কনুই পর্যন্ত ঘর্ষণ করা।' কিন্তু হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এর ইসনাদে দুর্বলতা রয়েছে। হাদীসটি প্রমাণিত নয়।

সুনান-ই-আবূ দাউদের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্ত একটি দেয়ালের উপর মারেন এবং মুখমণ্ডলে ঘর্ষণ করেন, দ্বিতীয়বার হাত মেরে স্বীয় হস্তদ্বয়ের উপর ঘর্ষণ করেন। কিন্তু এর ইসনাদে মুহাম্মাদ ইবনে সাবিত আবদী দুর্বল। কোন কোন হাফিয-ই-হাদীস তাকে দুর্বল বলেছেন। এ হাদীসটিই কোন কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফূ' করেন না, বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাজ বলে থাকেন। ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবূ যারআ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আ'দীর (রঃ) সিদ্ধান্ত এই যে, এ হাদীসটি মাওকুফই বটে। ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসকে মারফূ' বলা মুনকার।

নিম্নের হাদীসটিও ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর দলীল। হযরত ইবনুস্ সাম্মা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তায়াম্মুম করেন এবং স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের উপর হাত ফিরিয়ে দেন। হযরত আবূ জাহাম (রাঃ) বলেন, 'আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রস্রাব করছেন। আমি তাঁকে সালাম দেই কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। তিনি দেয়ালের নিকট গিয়ে তাঁর উভয় হস্তদ্বয় মারেন এবং হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ঘর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি আমার সালামের উত্তর দেন।' (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) এতো ছিল ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর নতুন মাযহাব। তাঁর প্রাচীন মাযহাব এই যে, তায়াম্মুমে মার তো দু'টোই, কিন্তু দ্বিতীয় মারে হাতকে কব্জি পর্যন্ত ঘর্ষণ করতে হবে।

তৃতীয় উক্তি এই যে, শুধু একটি বার মার অর্থাৎ শুধু একবার হস্তদ্বয় মাটির উপর মেরে নেয়াই যথেষ্ট। ধূলিযুক্ত হাতকে মুখের উপর এবং হস্তদ্বয়ের কব্জি পর্যন্ত ফিরিয়ে নেবে।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলে-'আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি। আমাকে কি করতে হবে?' তিনি বলেন, 'নামায পড়তে হবে না।' তাঁর দরবারে হযরত আম্মারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক সেনাদলে

ছিলাম। আমি ও আপনি দু'জন অপবিত্র হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের নিকট পানি ছিল না। আপনি তো নামায পড়েননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায আদায় করেছিলাম। ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই এবং আমি তাঁর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি হেসে উঠেন ও বলেনঃ 'তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হতো।' অতঃপর তিনি মাটিতে হাত মারেন এবং ফুঁ দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ে হাত ফিরিয়ে নেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তায়াম্মুমে একবারই হাত মারতে হয় যা মুখমণ্ডলের জন্যে ও হস্তদ্বয়ের তালুর জন্যে।' মুসনাদ-ই-আহমাদেরই আর একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত শাকীক (রঃ) বলেন, 'আমি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ও হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর সঙ্গে বসেছিলাম। হযরত আবূ ইয়া'লা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেন, 'যদি কেউ পানি না পায় তবে সে যেন নামায না পড়ে।' একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ বলেন, 'হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে যা বলেছিলেন তা কি আপনার স্মরণ নেই? তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেছিলেন– 'আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমাকে ও আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উটে চড়িয়ে (কোন এক জায়গায়) পাঠিয়েছিলেন। তথায় আমি অপবিত্র হয়ে যাই এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়ে লই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ দেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠে বলেনঃ 'তুমি এরূপ করলেই যথেষ্ট হতো।' অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় ভূমির উপর মারেন এবং হস্তের তালুদ্বয় এক সাথে ঘর্ষণ করেন ও মুখমণ্ডলে একবার হাত ফিরিয়ে নেন। মার একবারই ছিল।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'এতে কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) সন্তুষ্ট হননি।' একথা শুনে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, তাহলে সূরা-ই-নিসার এ আয়াতটিকে কি করবেন যাতে রয়েছে–'পানি না পেলে পবিত্র মাটির ইচ্ছে কর।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর উত্তর দিতে পারেননি এবং বলেন, জেনে রাখুন যে, যদি আমরা জনগণকে তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়ে দেই তবে খুব সম্ভব পানি যখন তাদের কাছে খুব ঠাণ্ডা অনুভূত হবে তখন তারা তায়াম্মুম করতে আরম্ভ করবে।'

সুরাঃ মায়েদায় ঘোষিত হয়েছে–

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ

অর্থাৎ 'ওটা তোমাদের মুখমণ্ডলে ও তোমাদের হাতে ঘর্ষণ কর।' (৫ঃ ৬) এটা দ্বারা হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তায়াম্মুম পবিত্র

মাটি দ্বারা হওয়া ও ওটা ধূলিযুক্ত হওয়া যাতে ধূলি হাতে লেগে যায় এবং মুখ ও হাতের উপর ঘর্ষণ করা যায়, এটা জরুরী। যেমন হযরত আবূ জাহাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করা রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রস্রাব করতে দেখেন এবং সালাম করেন। তাতে এও রয়েছে যে, ঐ কার্য শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেয়ালের পার্শ্বে যান এবং স্বীয় লাঠি দ্বারা কিছু মাটি উঠিয়ে নিয়ে ওটা হাতে মেরে তায়াম্মুম করেন।

এরপর ঘোষিত হচ্ছে–' আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের ধর্মে সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান। এ জন্যেই পানি না পাওয়ার সময় মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করাকে তোমাদের জন্যে বৈধ করেছেন এবং তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত দান করেছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সুতরাং এ উম্মত এ নি'আমতের সঙ্গে নির্দিষ্ট। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কাউকেও দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্যে সমস্ত ভূমিকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমার উম্মতের যে কোন জায়গায় নামাযের সময় এসে যাবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে। তার মসজিদও তার অযু সেখানেই তার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। (৩) আমার জন্যে যুদ্ধলব্ধ মালকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নবী (আঃ)-কে শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হতো। কিন্তু আমি সারা দুনিয়ার নিকট প্রেরিত হয়েছি।'

সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'সমস্ত লোকের উপর আমাদেরকে তিনটি ফযীলত দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের সারিগুলো ফেরেশ্তাদের সারির মত বানানো হয়েছে। (২) আমাদের জন্য সারা ভূমিকে মসজিদ বানানো হয়েছে। (৩) পানি পাওয়া না গেলে ওর মাটিকে অযু বানানো হয়েছে।” উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন–পানি না পাওয়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের উপর মাসেহ্ কর, তিনি মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। তাঁর মার্জনা ও ক্ষমার অবস্থা এই যে, পানি না পাওয়ার সময় তায়াম্মুমকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করতঃ ঐভাবে নামায আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এ অনুমতি না দিলে তোমরা কঠিন

অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে। কেননা, এ পবিত্র আয়াতে নামাযকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন নেশার অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় কিংবা বে-অযু অবস্থায় নামায পড়াকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে পর্যন্ত সে নিজের কথা নিজেই বুঝতে না পারবে, নিয়মিতভাবে গোসল না করবে এবং শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী অযু না করবে। কিন্তু রোগের অবস্থায় ও পানি না পাওয়ার অবস্থায় তায়াম্মুমকে অযু ও গোসলের স্থলবর্তী করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের জন্যে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যেই।

এখন তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়ার ঘটনা বর্ণনা হচ্ছে। আমরা সূরা-ই-নিসার এ আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি যে বর্ণনা করছি, এর কারণ এই যে, সূরা-ই-মায়েদার তায়াম্মুমের আয়াতটি এ আয়াতের পর অবতীর্ণ হয়। এর প্রমাণ এই যে, স্পষ্টতঃ এটিই হচ্ছে মদ্য নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের আয়াত এবং মদ্য হারাম হয় উহুদ যুদ্ধের কিছুদিন পর, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানূ নাযীরের ইয়াহূদীদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। আর কুরআন শরীফের যে সূরাগুলো শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়, সূরা-ই-মায়েদাহ ঐগুলোর মধ্যে একটি। বিশেষ করে এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তায়াম্মুমের শান-ই-নযূল এখানে বর্ণনা করাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলার উত্তম তাওফীক দানের উপরই নির্ভর করছি।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত অয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে হযরত আসমা (রাঃ)-এর নিকট হতে একটি হার ধার করেছিলেন। উক্ত হারটি সফরে কোন জায়গায় হারিয়ে যায়। হারটি অনুসন্ধানের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোক পাঠিয়ে দেন। হার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওটা খুঁজতে খুঁজতে নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়। তাদের নিকট পানি ছিল না। তারা বিনা অযুতেই নামায আদায় করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ওটা বর্ণনা করেন। সে সময় তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হয়। হযরত উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রাঃ) তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আল্লাহর শপথ! আপনার উপর যে বিপদ এসে থাকে তার পরিণাম মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনকই হয়।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। যখন আমরা 'বায়দা' অথবা 'যাতুল জায়েশ' নামক স্থানে

ছিলাম তখন আমার হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। হারটি খুঁজবার জন্য যাত্রীদলসহ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় থেমে যান। তখন না আমাদের নিকট পানি ছিল, না ঐ প্রান্তরের কোন জায়গায় পানি ছিল। জনগণ আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন–'দেখুন আমরা তাঁর কারণে কি বিপদেই না পড়েছি!' অতএব আমার পিতা আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার উরুর উপর স্বীয় মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এসেই তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ও জনগণকে এখানে থামিয়ে দিয়েছো। এখন না তাদের নিকট পানি রয়েছে, না কোন জায়গায় পানি দেখা যাচ্ছে?' মোটকথা তিনি আমাকে খুব শাসন গর্জন করেন এবং আল্লাহ জানেন কত কি তিনি আমাকে বলেছেন। এমনকি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমার পার্শ্ব দেশে প্রহার করতেও থাকেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমি সামান্য নড়াচড়াও করিনি। সারা রাত্রি কেটে যায়। সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে উঠেন। কিন্তু পানি ছিল না। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন সমস্ত লোক তায়াম্মুম করেন। হযরত উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রাঃ) তখন বলেনঃ 'হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ! এ বরকত আপনাদের প্রথম নয়। তখন যে উটে আমি আরোহণ করেছিলাম ঐ উটটি উঠালে ওর নীচে আমার হার পেয়ে যাই।' (সহীহ বুখারী)

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে 'যাতুল জায়েশ' এর মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন। তথায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ইয়ামানী হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। ঐ হারটি খুঁজবার জন্য জনগণ তথায় থেমে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মুসলমানগণ সারা রাত্রি তথায় কাটিয়ে দেন। সকালে উঠে দেখেন যে, পানি মোটেই নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা লাভ করার অনুমতি দানের আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুসলমানগণ রাসূলুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে উঠে মাটির উপর হাত মারেন এবং হাতে যে মাটি লাগে তা ঝেড়ে না ফেলেই স্বীয় চেহারার উপর ও হস্তদ্বয়ের উপর কাঁধ পর্যন্ত ও হাতের নীচ হতে বগল পর্যন্ত ঘর্ষণ করেন।

ইবনে জারীর (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পূর্বে তো হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তায়াম্মুমের অনুমতির হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ শুনে আনন্দিত চিত্তে স্বীয় কন্যার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, 'তুমি বড়ই কল্যাণময়ী। মুসলমানেরা এত বড় অবকাশ পেয়েছে।'

অতঃপর মুসলমানগণ একবার হাত মেরে চেহারা ঘর্ষণ করেন এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে কনুই পর্যন্ত ও বগল পর্যন্ত হস্তদ্বয় ঘর্ষণ করেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আসলা' ইবনে সুরাইক (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উষ্ট্রীটি চালনা করছিলাম যার উপর তিনি আরোহিত ছিলেন। তখন ছিল শীতকাল, রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল, সে সময় আমি অপবিত্র হয়ে পড়ি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাত্রার ইচ্ছে করেছেন। ঐ অবস্থায় আমি তাঁর উষ্ট্রী ছালনা করতে অপছন্দ করি। সাথে সাথে আমার এটাও ধারণা হয় যে, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে আমি মরেই যাবো বা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বো। আমি চুপে চুপে একজন আনসারীকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উষ্ট্রীটির লাগাম ধরতে বলি। সুতরাং তিনি লাগাম ধরে চলতে থাকেন, আর আমি আগুন জ্বেলে পানি গরম করতঃ গোসল করে লই। তারপর দৌড়ে গিয়ে যাত্রীদলের নিকট পৌছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ 'আসলা' ব্যাপার কি? উষ্ট্রীটির চলন কেমন যেন বিগড়ে গেছে?' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতক্ষণ আমি উষ্ট্রী চালাইনি। বরং অমুক আনসার (রাঃ) চালনা করছিলেন। তিনি তখন বলেনঃ 'এর কারণ কি?' আমি তখন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। তখন আল্লাহ তা'আলা لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ হতে غَفُوْرًا পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।' এ বর্ণনাটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

৪৪। তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গ্রন্থের এক অংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা বিপথ ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছে করে যে, তুমিও পথভ্রান্ত হও।

٤٤- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝

৪৫। এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুকুলকে সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহই যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং আল্লাহই প্রচুর সাহায্যকারী।

٤٥- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

৪৬। ইয়াহূদীদের মধ্যে কেউ কেউ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে–আমরা শ্রবণ করলাম ও অগ্রাহ্য করলাম; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে যে, শোন–শোনা যায় না ও 'রায়েনা'; এবং যদি তারা বলতো– আমরা শুনলাম ও স্বীকার করলাম– এবং শুন ও 'উনযুর না' তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সুসঙ্গত হতো; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাসহেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করে না।

٤٦- مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন– ইয়াহূদীদের (কেয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক) একটি নিন্দনীয় স্বভাব এও রয়েছে যে, তারা সুপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথকে গ্রহণ করেছে, শেষ নবী (সঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং পূর্ববর্তী নবীগণ হতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর গুণাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেটাও তারা শিষ্যদের নিকট হতে নৈবেদ্য নেয়ার লোভে প্রকাশ করছে না। বরং সাথে সাথে

এটাও কামনা করছে যে, স্বয়ং মুসলমানেরাও যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থকে অস্বীকার করে এবং সুপথ ও সঠিক ইলম্‌কে পরিত্যাগ করে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের সংবাদ খুব ভালভাবেই রাখেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন তাদের প্রতারণার ফাঁদে না পড়। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্যই যথেষ্ট। তোমরা বিশ্বাস রাখ যে, যারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তিনি তাদের অবশ্যই সহায়তা করে থাকেন এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। তৃতীয় আয়াতটি যা مِنْ শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে তাতে مِنْ শব্দটি جِنْس বর্ণনা করার জন্য এসেছে। যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (২২ ঃ ৩০) অতঃপর ইয়াহূদীদের ঐ দলের যে পরিবর্তন করণের কথা বলা হচ্ছে, তার ভাবার্থ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার কথার ভাবার্থ বদলিয়ে দেয় এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর এ কাজ তারা জেনে শুনে ও বুঝে সুঝে করে থাকে। এর ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা নকল করেছেন যে, তারা বলে– 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি যা কিছু বলেন আমরা তা শুনি কিন্তু মান্য করি না।' তাদের কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা জেনে ও বুঝে স্পষ্টভাষায় কিভাবে নিজেদের অপবিত্র খেয়ালের কথা প্রকাশ করছে এবং বলছে– 'আমরা যা বলি তা আপনি শুনুন, আল্লাহ করেন আপনি না শুনেন।' কিংবা ভাবার্থ এই যে, 'আপনি শুনুন, কিন্তু আপনার কথা মান্য করা হবে না।' কিন্তু প্রথম ভাবার্থটিই অধিকতর সঠিক। এ কথা তারা উপহাস ও বিদ্রূপের ছলে বলতো। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। তারা رَاعِنَا বলতো। এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যেতো যে তারা বলছে– 'আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দিন।' কিন্তু তারা এ শব্দ দ্বারা ভাবার্থ গ্রহণ করতো– আপনি বড়ই উদ্ধত ও অহংকারী। এর পূর্ণ ভাবার্থ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا (২ঃ ১০৪)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যা তারা বাইরে প্রকাশ করতো, স্বীয় জিহ্বাকে বক্র করে বিদ্রূপ সূচক ভঙ্গিতে অন্তরের মধ্যে তার উল্টো ভাব গোপন করে রাখতো। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে বেয়াদবী করতো। তাই তাদেরকে হিদায়াত করা হচ্ছে যে, তারা যেন এ দু'অর্থযুক্ত শব্দগুলো বর্ণনা পরিত্যাগ করে এবং স্পষ্টভাবে বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম, আপনি আমাদের আরয শুনুন ও আমাদের দিকে

দেখুন। এ কথা তাদের জন্য উত্তম এবং এটাই হচ্ছে পরিষ্কার, সরল, সোজা এবং উপযুক্ত কথা। কিন্তু তাদের অন্তরকে মঙ্গল হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রকৃত ঈমান পূর্ণভাবে তাদের অন্তরে স্থানই পায় না। এ বাক্যের তাফসীরও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, উপকার দানকারী ঈমান তাদের মধ্যে নেই।

৪৭। হে গ্রন্থ প্রাপ্তগণ! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; এর পূর্বে যে, আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেই, তৎপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দেই অথবা শনিবারীয়দের প্রতি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করি; এবং আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে।

٤٧- يَايُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৪৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ– তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন; এবং যে কেউ আল্লাহর অংশী স্থির করে, সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে।

٤٨- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন– 'আমি আমার মহা মর্যাদাবান গ্রন্থ আমার উত্তম নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে স্বয়ং তোমাদের কিতাবের সত্যতা ও স্বীকৃত রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর

উপর ঈমান আনয়ন কর এর পূর্বে যে, আমি তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেই। অর্থাৎ মুখ বিপরীত দিকে করে দেই এবং তোমাদের চক্ষু এ দিকের পরিবর্তে ঐ দিকে হয়ে যায়।' কিংবা ভাবার্থ এই যে, 'তোমাদের চেহারা নষ্ট করে দেই যাতে তোমাদের কান, নাক সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এ বিকৃত চেহারাও উল্টো হয়ে যায়।' এ শাস্তি তাদের কর্মেরই পূর্ণ ফল। এরা সত্য হতে সরে মিথ্যার দিকে এবং সুপথ হতে বিপথের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কাজেই আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছেনঃ 'আমিও এভাবেই তোমাদের মুখ উল্টিয়ে দেবো যেন তোমাদেরকে পিছন পায় চলতে হয়। তোমাদের চক্ষুগুলো তোমাদের গ্রীবার দিকে করে দেবো'। আর এ রকমই তাফসীর কেউ কেউ إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ (৩৬ঃ ৮) -এ আয়াতের তাফসীরেও করেছেন। মোটকথা তাদের পথভ্রষ্টতা ও সুপথ হতে সরে পড়ার এ খারাপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'আমি তোমাদেরকে সত্যপথ হতে সরিয়ে ভ্রান্তির পথের দিকে নিয়ে যাবো, তোমাদেকে কাফির বানিয়ে দেবো এবং তোমাদের চেহারা বানরের চেহারার মত করে দেবো।'

আবূ যায়েদ (রঃ) বলেনঃ 'ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ এই যে, তাদেরকে হিযায্ হতে সিরিয়ায় পৌঁছিয়ে দেন।' এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি শুনেই হযরত কা'ব ইবনে আহবার (রাঃ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (রঃ)-এর সামনে যখন হযরত কা'ব (রঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের আলোচনা হয়, তখন তিনি বলেনঃ 'হযরত কা'ব (রঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর যুগে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে মদীনায় আগনম করেন। হযরত উমার (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বলেনঃ 'হে কা'ব (রঃ)! মুসলমান হয়ে যাও।' উত্তরে তিনি বলেনঃ আপনারা তো কুরআন কারীমে পড়েছেন–'যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তা উঠায়নি তাদের দৃষ্টান্ত গাধার ন্যায়, যে বোঝা বহন করে থাকে।' আর আপনি এটাও জানেন যে, যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আমিও তাদের মধ্যে একজন। তখন হযরত উমার তাঁকে ছেড়ে দেন। তিনি এখান হতে রওয়ানা হয়ে হেমসে পৌঁছেন। তথায় তিনি শুনতে পান যে, তাঁরই বংশের একজন লোক يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَا

-এ আয়াতটি পাঠ করছেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে হযরত কা'ব (রঃ) ভয় করেন যে, এ আয়াতে যাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান কি-না এবং না জানি তাঁর আকারই বিকৃত হয়ে যায়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠেনঃ يَا رَبِّ اَسْلَمْتُ অর্থাৎ "হে আমার প্রভু! আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।"

অতঃপর তিনি হেম্স হতেই স্বীয় দেশ ইয়ামনে ফিরে আসেন। এখানে এসে তিনি সপরিবারে মুসলমান হয়ে যান।

মসুনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত কা'ব (রঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁর শিক্ষক আবূ মুসলিম জালিলী তাঁর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে বিলম্বের কারণে সদা তাঁকে তিরস্কার করতে থাকেন। অতঃপর তাওরাতে যে নবীর শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, মুহাম্মাদ (সঃ) সত্যই সেই নবী কি-না তা দেখার জন্য হযরত কা'ব (রঃ)-কে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত কা'ব (রঃ) বলেনঃ 'আমি মদীনায় পৌঁছি। হঠাৎ আমি শুনতে পাই যে, একটি লোক কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটি পাট করছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَا-

অর্থাৎ 'হে গ্রন্থ প্রাপ্তগণ! তোমাদের সঙ্গে যা আছে–তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমি অবতীর্ণ করেছি, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এর পূর্বে যে, আমি বহু মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেই, তৎপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দেই।' এটা শুনেই আমি চমকিত হয়ে উঠি এবং তাড়াতাড়ি গোসলের কাজে লেগে পড়ি। আমি আমার চেহারার উপর হাত দিয়ে দেখি যে, না জানি আমার ঈমান আনয়নে বিলম্ব হয়, ফলে আমার মুখমণ্ডল পৃষ্ঠের দিকে উল্টে যায়! এরপর অতিসত্বর আমি মুসলমান হয়ে যাই।

অতঃপর বলা হচ্ছে– 'অথবা শনিবারীয়দের প্রতি আমি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রূপ তাদের উপরও অভিস্পাত করি।' অর্থাৎ যারা কৌশল করে শনিবার দিন মৎস শিকার করেছিল, অথচ সে দিন তাদেরকে মৎস শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যার প্রতিফল স্বরূপ তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছিল। এর বিস্তারিত ঘটনা ইন্শাআল্লাহ সূরা-ই-আ'রাফে আসবে।

এরপর বলা হচ্ছে– আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে। তিনি যখন কোন নির্দেশ দেন তখন এমন কেউ নেই যে, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বা তাকে বাধা প্রদান করে। এরপরে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে অংশীস্থাপনকারীর পাপ মার্জনা করেন না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে মুশরিক, তার জন্যে ক্ষমার দরজা বন্ধ। এ পাপ ছাড়া অন্য পাপ যত বেশী হোক না কেন তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ পবিত্র আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। আমরা এখানে কিছু কিছু বর্ণনা করছি।

(১) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পাপের বিভাগ (দেওয়ান) হচ্ছে তিনটি। প্রথম হচ্ছে ঐ পাপ যার আল্লাহ্ তা'আলা কোন পরওয়া করেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ পাপ যার মধ্যে হতে আল্লাহ্ তা'আলা কিছুই ছাড়েন না। তৃতীয় হচ্ছে ঐ পাপ যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনও ক্ষমা করেন না। যে পাপ তিনি ক্ষমা করেন না তা হচ্ছে শিরক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না।' অন্য জায়গায় বলেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন করে তিনি তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। যে দেওয়ানের আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন গুরুত্ব নেই তা হচ্ছে বান্দার নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করা, যার সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর সাথে রয়েছে। যেমন সে কোন দিনের রোযা ছেড়ে দিয়েছে বা নামায ছেড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এটা ক্ষমা করে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে দেওয়ানের কিছুই ছাড়েন না তা হচ্ছে বান্দাদের পরস্পরের অত্যাচার যার কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ জরুরী হয়ে থাকে।

(২) মুসনাদ-ই-আবূ বাকার আল-বায্যারের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেনঃ অত্যাচার তিন প্রকার। প্রথম হচ্ছে ঐ অত্যাচার যা আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ অত্যাচার যা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে থাকেন। তৃতীয় হচ্ছে ঐ অত্যাচার, আল্লাহ্ তা'আলা যার কিছুই ছাড়েন না। যে অত্যাচার আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তা হচ্ছে শির্ক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে বড় অত্যাচার।' দ্বিতীয় অত্যাচার হচ্ছে বান্দাদের নিজের জীবনের উপর অত্যাচার, যার সম্পর্ক তাদের ও তাদের প্রভুর মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে অত্যাচারের কিছুই

ছাড়েন না তা হচ্ছে বান্দাদের একের অপরের প্রতি অত্যাচার, আল্লাহ্ তা'আলা এটা ছেড়ে দেন না যে পর্যন্ত একে অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে।

(৩) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ 'আল্লাহ তা'আলা সমস্ত পাপই মার্জনা করে থাকেন, শুধু ঐ ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করেন না যে কুফরীর অবস্থায় মারা যায় এবং ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করেন না, যে কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করে।'

(৪) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–'হে আমার বান্দা! তুমি যে পর্যন্ত আমার ইবাদত করতে থাকবে এবং আমার নিকট হতে ভাল আশা পোষণ করবে, আমিও তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে থাকব। হে আমার বান্দা! তুমি যদি সারা পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আগমন কর, আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো এ শর্তে যে, তুমি আমার সাথে অংশীস্থাপন করনি।'

(৫) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলে এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।' এ কথা শুনে হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেন, 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে।' তিনবার একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদিও আবূ যারের নাক ধূলায় মলিন হয়।' তথা হতে হযরত আবূ যার (রাঃ) স্বীয় চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলতে বলতে যানঃ 'যদিও আবূ যারের নাক ধূলায় মলিন হয়'। এরপরেও যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন এ বাক্যটি অবশ্যই বলতেন। এ হাদীসটি অন্য সনদে কিছু অতিরিক্ততার সঙ্গেও বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেন, 'আমি মদীনার প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে চলছিলাম। আমাদের দৃষ্টি ছিল উহুদ পাহাড়ের দিকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে আবূ যার (রাঃ)!' আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি হাযির আছি। তিনি বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, যদি আমার নিকট এ উহুদ পাহাড়ের সমানও স্বর্ণ থাকে তবুও আমি চাইবো না যে, তৃতীয় সন্ধ্যায় আমার নিকট ওর মধ্য হতে কিছু অবশিষ্ট থাক ঐ দীনারটি ছাড়া যা আমি ঋণ

পরিশোধের জন্য রেখে দেই। বাকী সমস্ত মাল আমি এভাবে ও এভাবে আল্লাহর পথে আল্লাহর বান্দাদেরকে দিয়ে দেবো।' আর তিনি ডানে, বামে ও সম্মুখে অঞ্জলি নিক্ষেপ করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ ধরে আমরা চলতে থাকি। আবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাক দেন ও বলেনঃ এখানে যার অধিক রয়েছে, কিয়ামতের দিন তার অল্প থাকবে; কিন্তু যে এরূপ করে এবং তিনি তার ডানে, বামে ও সামনে অঞ্জলি ভরে এভাবে ইশারা করেন। আবার কিছুক্ষণ চলার পর আমাকে বলেনঃ 'হে আবূ যার (রাঃ)! তুমি এখানে থামো, আমি আসছি।' তিনি চলে যান এবং আমার চক্ষু হতে অদৃশ্য হন কিন্তু আমি তাঁর শব্দ শুনতে পাই। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে, না জানি একাকী পেয়ে তাঁকে কোন শত্রু আক্রমণ করে বসে। আমি তাঁর নিকট পৌঁছার ইচ্ছে করি, কিন্তু সাথে সাথে তাঁর এ নির্দেশ আমার স্মরণ হয়-'আমি না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা কর'। সুতরাং আমি সেখানই রয়ে গেলাম। অবশেষে তিনি ফিরে আসেন। আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কেমন যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম? তিনি বলেনঃ আমার নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন এবং বলেছিলেন- 'আপনার উম্মতের মধ্যে যে এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও শরীক করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।' আমি বলি- 'যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এও রয়েছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাত্রে বের হই। দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) চলতে রয়েছেন। আমি ধারণা করি যে, সম্ভবতঃ এ সময় তিনি কাউকেও সঙ্গে নিতে চান না। তাই আমি চন্দ্রের ছায়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে চলতে থাকি। তিনি ঘুরে যখন আমাকে দেখতে পান তখন বলেনঃ 'কে তুমি?' আমি বলি- আবূ যার, আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন। তখন তিনি আমাকে বলেনঃ 'এসো আমার সঙ্গে চল।' কিছুক্ষণ ধরে আমরা চলতে থাকি। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'আধিক্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন অল্পের অধিকারী হবে, তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধন-মাল দিয়েছেন, সেই মাল তারা ডানে, বামে, সামনে, পিছনে ভাল কাজে খরচ করে থাকে।' আবার কিছুক্ষণ চলার পর আমাকে বলেনঃ 'এখানে বস।' তিনি আমাকে এমন এক জায়গায় বসিয়ে দেন যার চতুর্দিকে পাথর ছিল। তিনি আমাকে বলেনঃ 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থাক।' অতঃপর তিনি চলে যান এবং দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর খুব বিলম্ব হয়ে যায়। অবশেষে

আমি দেখি যে, তিনি বলতে বলতে আসছেনঃ 'যদিও ব্যভিচার করে থাকে এবং যদিও চুরি করে থাকে।' যখন তিনি আমার নিকট পৌঁছেন তখন আমি থাকতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন, আপনি মাঠের প্রান্তে কার সাথে কথা বলছিলেন? আমি শুনেছি, তিনি আপনাকে উত্তরও দিচ্ছিলেন। তিনি বলেনঃ তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। এখানে এসে তিনি আমাকে বলেনঃ 'আপনার উম্মতকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।' আমি বলি, 'হে জিবরাঈল (আঃ)। যদিও সে চুরিও করে এবং ব্যভিচারও করে?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ'। আমি বলি, 'যদিও সে চুরিও করে এবং ব্যভিচারও করে?' তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, এমনকি যদি সে মদ্যপানও করে।'

(৬) মুসনাদ-ই-আব্দ ইবনে হামীদের মধ্যে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ওয়াজিবকারী জিনিসগুলো কি?' তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি শিরক না করেই মারা গেল তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি শিরক করে মারা গেল তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব।' এ হাদীসটি অন্য রীতিতেও বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক না করেই মারা গেল তার জন্যে ক্ষমা বৈধ। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দেবেন এবং ইচ্ছে করলে ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাকে তিনি ক্ষমা করেন না। ঐ ব্যক্তিকে ছাড়া যাকে তিনি ইচ্ছে ক্ষমা করে থাকেন'। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) অন্য সনদ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ 'বান্দার উপর ক্ষমা সর্বদা চালু থাকে যে পর্যন্ত পর্দা না পড়ে যায়।' জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পর্দা পড়া কি?' তিনি বলেনঃ 'যে ব্যক্তি শিরক না করা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাত করে তার জন্যে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা বৈধ হয়ে যায়। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দেবেন এবং ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেবেন।' অতঃপর তিনি إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ -এ আয়াতটি পাঠ করেন। (মুসনাদ-ই-আবূ ইয়া'লা)।

(৭) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।'

(৮) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীদের নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ 'তোমাদের মহান সম্মানিত প্রভু আমাকে আমার উম্মতের মধ্যকার সত্তর হাজার লোকের উপর এ অধিকার দিয়েছেন যে, তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমার জন্য আমার উম্মতের ব্যাপারে যা রক্ষিত রয়েছে তা আমি তাঁর নিকট প্রকাশ করবো।' তখন কোন একজন সাহাবী (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে কি ওটা সংরক্ষিত রাখবেন'? একথা শুনে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি তাকবীর পাঠ করতে করতে বাইরে আসেন এবং বলেনঃ 'আমার প্রভু আমাকে প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে সত্তর হাজার বেশী দান করেছেন এবং তাঁর নিকটে ঐ সংরক্ষিত অংশও রয়েছে।' হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন হযরত আবূ রাহাম (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'ঐ সংরক্ষিত জিনিস কি?' জনগণ তখন আবূ রাহাম (রঃ)-কে ধমক দিয়ে বলেনঃ 'কোথায় তুমি এবং কোথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংরক্ষিত জিনিস?' হযরত আবূ আইয়ূব (রাঃ) জনগণকে তখন বলেনঃ 'তোমরা লোকটিকে ছেড়ে দাও। এসো আমি আমার ধারণা মতে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংরক্ষিত জিনিসের সংবাদ দেই। এমনকি আমি প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি যে, ঐ জিনিস হচ্ছে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ লাভ যে খাঁটি অন্তরে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা এবং রাসূল।'

(৯) হযতর আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র রয়েছে, সে হারাম হতে বিরত থাকে না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'তার দ্বীনদারী কিরূপ?' লোকটি বলে, 'সে নামাযী ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'যাও, তার নিকট তার দ্বীন দান হিসেবে যাঞ্চ্ঞা কর। যদি অস্বীকার করে তবে কিনে নাও।' লোকটি গিয়ে তার নিকট যাঞ্চ্ঞা করে। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ সংবাদ দেয়। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি তাকে স্বীয় ধর্মের প্রতি অটল পেলাম।' সে সময় إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الخ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

(১০) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কোন প্রয়োজন ও প্রয়োজন বিশিষ্টকে না করে ছাড়িনি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তুমি কি তিন বার এ সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল?' লোকটি বলে, 'হাঁ।' তিনি বলেন: 'এটা এ সবগুলোর উপর জয়যুক্ত হবে।'

(১১) মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত যমযম ইবনে জাওশুল ইয়ামানী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমাকে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'হে জাওশ ইয়ামানী (রঃ)! কোন মানুষকে কখনও বল না যে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন না।' আমি তখন বলি, 'হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! এ কথাতো আমাদের প্রত্যেকেই ক্রোধের সময় তার ভাই ও বন্ধুকে বলে থাকে।' তিনি বলেন, সাবধান! কখনও বলো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'বানী ইসরাঈলের মধ্যে দু'টি লোক ছিল। একজন ছিল চরম উপাসক এবং অপরজন ছিল স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচারী। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বভাব ছিল। উপাসক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রায় কোন না কোন পাপ কার্যে লিপ্ত দেখত এবং তাকে বলতো, 'তুমি এ কাজ হতে বিরত থাক। সে তখন উত্তরে বলতো, 'আমাকে আমার প্রভুর উপর ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার রক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছো?' একদা উপাসক ব্যক্তি দেখে যে, সে পুনরায় এমন এক পাপ কাজ করতে রয়েছে যা তার নিকট অত্যন্ত বড় পাপ বলে মনে হয়। তাই সে তাকে বলে, 'তোমাকে সতর্ক করছি, তুমি বিরত থাক।' সে ঐ উত্তরই দেয়। উপাসক ব্যক্তি তখন বলেঃ 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন না।' আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন যিনি তাদের রূহ্ কবয্ করে নেন। যখন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ পাপীকে বলেন- 'আমার করুণার ভিত্তিতে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' আর ঐ উপাসককে বলেন– 'তোমার কি প্রকৃত জ্ঞান ছিল? তুমি কি আমার অধিকৃত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ছিলে? (হে ফেরেশতাগণ!) তোমরা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যাঁর হাতে আবুল কাসিম (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! সে এমন এক কথা মুখ দিয়ে বের করে যা তার দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে দেয়।'

(১২) তাবরানীর হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে যে, আমি পাপ মার্জনায় সক্ষম, আমি তার পাপ মার্জনাই করে থাকি এবং এতে কোন পরওয়া করি না যে পর্যন্ত না আমার সঙ্গে অংশী স্থাপন করে।'

হাফিয আবূ বাকর আল বায্যায্ (রঃ) এবং হাফিয আবুল ইয়ালা (রঃ)-এর গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে কার্যের উপর আল্লাহ তা'আলা কোন পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন এবং যে কার্যের উপর শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন তা তাঁর ইচ্ছাধীন।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ হত্যাকারী, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী, পবিত্র নবীদের উপর অপবাদ প্রদানকারী এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করতাম না। অবশেষে إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়– এবং নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত থাকেন।'

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের মধ্যে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মধ্যে যে সমস্ত পাপ কার্যের উপর জাহান্নামের বর্ণনা রয়েছে সেসব কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করতাম না। অবশেষে আমাদের উপর উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনার পর আমরা সাক্ষ্য দেয়া হতে বিরত থাকি এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করি।'

বায্যায্ (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, বড় বড় পাপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা হতে আমরা বিরত ছিলাম। অবশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে উপরোক্ত আয়াত শ্রবণ করি এবং তিনি একথাও বলেনঃ 'আমি আমার শাফাআতকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের কাবীরা গুনাহ্কারীদের জন্যে পিছিয়ে রেখেছি।' ইমাম আবূ জাফর রাযী (রঃ)-এর বর্ণনায় হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিম্নরূপ উক্তি রয়েছেঃ যখন يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ অর্থাৎ 'হে আমার ঐ বান্দাগণ যারা নিজেদের

জীবনের উপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আমার করুণা হতে নিরাশ হয়ো না'। (৩৯ঃ ৫৩) -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীও কি?' আল্লাহর রাসূল (সঃ) তার এ প্রশ্ন অপছন্দ করেন এবং তাকে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ -এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন।

ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর রীতি হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'সূরা-ই-তানযীল'-এর এ আয়াতটি তাওবার সঙ্গে শর্তযুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি যে কোন পাপ কার্য হতে তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন, যদিও সে বারবার সেই কাজ করে। সুতরাং নিরাশ না হওয়ার আয়াতে তাওবার শর্ত অবশ্যই রয়েছে। নচেৎ তার সাথে মুশরিকও চলে আসবে এবং ভাবার্থ সঠিক হবে না। কেননা اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ -এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশী স্থাপনকারীর ক্ষমা নেই। হ্যাঁ, তবে এটা ছাড়া অন্যান্য পাপের জন্য যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন যদিও সে তাওবা না করে। এ ভাবার্থ হলে এ আয়াতই অপেক্ষাকৃত বেশী আশা উৎপাদক হবে। এসব বিষয় আল্লাহ পাকই সব চেয়ে বেশী জানেন।

এরপর বলা হচ্ছে– 'যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই শির্ক খুব বড় অত্যাচার।'(৩১ঃ ১৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে বড় পাপ কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তা এই যে, তুমি আল্লাহর অংশ স্থির কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা বলছি।' অতঃপর তিনি وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا -এ অংশটুকু পাঠ করেন। তারপর বলেনঃ এবং মা-বাপের অবাধ্য হওয়া। অতঃপর তিনি اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ (৩১ঃ ১৪) -এ

অংশটুকু পাঠ করেন। অর্থাৎ 'আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।'

٤٩- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاۤءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا○

৪৯। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন এবং তারা সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।

٥٠- اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا○

৫০। লক্ষ্য কর- তারা কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে! এবং এটি স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

٥١- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا○

৫১। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে বলে যে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী।

٥٢- اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا○

৫২। এদেরই প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন; এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্যে কোনই সাহায্যকারী পাবে না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ –এ আয়াতটি ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা বলেছিলঃ 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র' এবং আরও বলেছিলঃ 'ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে না।'

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তারা তাদের নাবালক ছেলেদেরকে দুআ ও নামাযে তাদের ইমাম করতো এবং তাদেরকে নিষ্পাপ বলে ধারণা করতো। এও বর্ণিত আছে যে, তাদের ধারণায় তাদের যেসব ছেলে মারা গেছে তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে এবং তারা তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট সুপারিশ করবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে। তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডনে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইয়াহূদীদের তাদের ছেলেদেরকে ইমাম করার ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ 'তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা কোন পাপীকে কোন নিষ্পাপের কারণে পবিত্র করেন না।' তারা বলতোঃ 'আমাদের শিশুরা যেমন নিষ্পাপ, তদ্রূপ আমরাও নিষ্পাপ।' এও বলা হয়েছে যে, হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীর মুখ মাটির দ্বারা পূর্ণ করে দেই।'

সহীহ বুখারীর ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে অন্য একটি লোকের প্রশংসা করতে শুনতে পেয়ে বলেনঃ 'অফসোস! তুমি তোমার সঙ্গীর স্কন্ধ কেটে দিলে।' অতঃপর বলেনঃ 'যদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই পড়ে তবে যেন সে বলে–আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ মনে করি। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার নিকট এরূপই পবিত্র এ কথা যেন না বলে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি বলে–আমি আলেম সে মূর্খ এবং যে বলে –আমি জান্নাতী সে জাহান্নামী।' তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে ভয় এই যে, কেউ স্বীয় মতকেই পছন্দ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে, সে একজন মুমিন, সে কাফির। যে বলে যে, সে একজন আলেম সে মূর্খ এবং যে বলে যে, সে জান্নাতে রয়েছে। সে জাহান্নামে রয়েছে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন এবং খুব কম জুম'আই এরূপ গেছে যেখানে তিনি নিম্নের কথাগুলো বলেননিঃ 'যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলের ইচ্ছে করেন তাকে তিনি ধর্মের বোধ শক্তি দান করেন। এ মাল হচ্ছে মিষ্ট ও সবুজ রঙ্গের। সুতরাং এটা যে তার হকের সাথে গ্রহণ করবে তার জন্যে তাতে বরকত দেয়া হবে। তোমরা একে অপরের প্রশংসা করা হতে বিরত হও। কেননা, এটা হচ্ছে যবেহ্ করারই তুল্য।' এ পরের বাক্যটি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হতে সুনান-ই-ইবনে মাজার মধ্যেও বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ 'সকালে মানুষ তার ধর্ম নিয়ে বের হয়। অতঃপর যখন সে ফিরে আসে তখন তার নিকট তার ধর্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (এভাবে যে,) সে কারও সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে দেয় ও শপথ করে করে বলেঃ 'নিশ্চয়ই আপনি এরূপই বটে, আপনি এরূপই বটে।' অথচ না সে তার ক্ষতির অধিকারী, না লাভের অধিকারী এবং এ কথাগুলোর পরেও হয়তো তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে দিলো। অতঃপর তিনি اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ -এ আয়াতটি পাঠ করেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ (৫৩ঃ ৩২)-এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে। তাই, এখানে বলা হচ্ছেঃ 'বরং আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন।' কেননা, সমুদয় জিনিসের মূলতত্ত্ব একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'তারা সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।' অর্থাৎ তিনি সূত্রের ওজন পরিমাণও কারোও পুণ্য ছেড়ে দেবেন না। فَتِيْل শব্দের অর্থ হচ্ছে খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলের সূত্রটি। আবার এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওটা হচ্ছে ঐ সূতা যা অঙ্গুলি দ্বারা পাকানো হয়।

এরপর আল্লাহ পাক বলেন– 'লক্ষ্য কর, কিরূপে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে!' যেমন তারা বলছে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয় পাত্র, ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না, আমাদেরকে নির্দিষ্ট সামান্য কয়েক দিন জাহান্নামে থাকতে হবে। আর যেমন তারা তাদের পূর্বপুরুষের সৎকার্যের উপর নির্ভর করে রয়েছে। অথচ একের কাজ অন্যকে কোন উপকার দেয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ

অর্থাৎ 'ওটা একটা দল যা অতীত হয়েছে, তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের সঙ্গে এবং তোমরা যা উপার্জন করেছো তা তোমাদের সঙ্গে।' (২ঃ১৩৪)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাদের এসব কথা বলাই তাদের প্রকাশ্য অপরাধী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে جِبْت শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যাদু' এবং طَاغُوْت শব্দের অর্থ হচ্ছে শয়তান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), আতা' (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), শা'বী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), যহ্হাক (রঃ) এবং সুদ্দীও (রঃ) একথাই বলেন। এও বলা হয়েছে যে, جِبْت হচ্ছে আবিসিনীয় শব্দ। ওর অর্থ হচ্ছে শয়তান। এটা শির্ক, প্রতিমা, যাদুকর ইত্যাদি অর্থেও এসেছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা হুয়াই ইবনে আখতাবকে বুঝান হয়েছে। আবার কারও কারও মতে এ হচ্ছে কাব ইবনে আশরাফ। হাদীসে রয়েছে যে, পাখীসমূহের নাম নিয়ে শুভাশুভ সূচিত করা এবং মাটিতে রেখা টেনে কার্যাবলীর মীমাংসা করা হচ্ছে جِبْت হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, جِبْت হচ্ছে শয়তানের গুন গুন শব্দ। طَاغُوْت শব্দের বিশ্লেষণ সূরা-ই-বাকারায় হয়ে গেছে, সুতরাং এখানে ওর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

হযরত জাবির (রাঃ) طَاغُوْت সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ 'তারা ছিল যাদুকর এবং তাদের নিকট শয়তান আসতো।' মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছে মানুষ রূপী শয়তান। তাদের নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে বিচারক মেনে থাকে। হযরত ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেন– 'তাদের মূর্খতা, ধর্মহীনতা এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌঁছে গেছে যে, তারা কাফিরদেরকে মুসলমানদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুয়াই ইবনে আখতাব এবং কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কাবাসীদের নিকট আগমন করে। মক্কাবাসীরা তাদেরকে বলেঃ 'তোমরা আহলে কিতাব ও পণ্ডিত লোক। আচ্ছা বলতো আমরা ভাল, না মুহাম্মাদ (সঃ) ভাল? তখন তারা বলেঃ 'তোমরা কি এবং মুহাম্মাদ (সঃ) কি?' মক্কাবাসীরা বলেঃ 'আমরা আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখি, উট যবেহ্ করে আহার করিয়ে থাকি, দুগ্ধ মিশ্রিত পানি পান করিয়ে থাকি, ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করিয়ে থাকি।

হাজীদেরকে পানি পান করিয়ে থাকি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ (সঃ) তো আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং গেফার গোত্রের চোর হাজীরা তাঁর সঙ্গলাভ করেছে। এখন বলতো, আমরা ভাল, না সে ভাল? তখন ঐ দু'জন বলেঃ 'তোমরাই ভাল। তোমরাই সোজা ও সঠিক পথে রয়েছ।'

সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের ব্যাপারেই اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ- এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বানূ অয়েল ও বানূ নাযীর গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক যখন আরবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল এবং ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, সে সময় যখন তারা কুরাইশদের নিকট আগমন করে তখন কুরাইশরা তাদেরকে আলেম ও দরবেশ মনে করে জিজ্ঞেস করেঃ 'বলুন তো আমাদের ধর্ম উত্তম, না মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ধর্ম উত্তম?' ঐলোকগুলো বলেঃ 'তোমাদের ধর্মই উত্তম এবং তোমরাই অধিকতর সঠিক পথে রয়েছো।' সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে অভিশপ্ত দল বলে ঘোষণা করা হয়। আরও বলা হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তারা শুধু কাফিরদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্যই তাদের জ্ঞানের বিপরীত এ তোষামোদমূলক কথাগুলো উচ্চারণ করছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা কৃতকার্য হতে পারে না। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। তারা সমস্ত আরবকে দলভুক্ত করতঃ এ সম্মিলিত বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ চালায়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে বাধ্য হন। অবশেষে সারা জগত দেখে নেয় যে, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহ তা'আলাই মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান এবং স্বীয় প্রতাপ ও ক্ষমতার বলে কাফিরদেরকে উল্টো মুখে নিক্ষেপ করেন।

৫৩। তবে কি রাজত্বে তাদের জন্যে কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে খর্জুর কণাও প্রদান করবে না।

٥٣- اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۝

৫৪। তবে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্যে হিংসে করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি।

٥٤- أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ○

৫৫। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকেই ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে,; এবং (তাদের জন্যে) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট।

٥٥- فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○

এখানে অস্বীকৃতি সূচক ভাষায় আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেছেনঃ 'তারা কি রাজত্বের কোন অংশের মালিক?' অর্থাৎ তারা মালিক নয়। অতঃপর তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যদি এরূপ হতো তবে তারা কারো কোন উপকার করতো না। বিশেষ করে তারা আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী (সঃ)-কে এতটুকুও দিত না যতটুকু খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলে পর্দা থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আছে

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْۤ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ

অর্থাৎ 'তুমি বল-যদি তোমরা আমার প্রভুর করুণা ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবে তোমরা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে (খরচ করা হতে)সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে।' (১৭ঃ ১০০) এটা স্পষ্ট কথা যে, এতে সম্পদ কমে যেতে পারে না, তথাপি কৃপণতা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মানুষ বড়ই কৃপণ। তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের হিংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে- আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে যে বড় নবুওয়াত দান করেছেন

এবং তিনি যেহেতু আরবের অন্তর্ভুক্ত, বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নন সেহেতু তারা হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে ও জনগণকে তাঁর সত্যতা স্বীকার করা হতে বিরত রাখছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'এখানে اَلنَّاس-এর ভাবার্থ হচ্ছে আমরা, অন্য কেউ নয়।' আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আমি ইবরাহীমের বংশধরকে নবুওয়াত দিয়েছিলাম যারা ছিল বানী ইসরাঈল গোত্র এবং হযরত ইবরাহীমের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমি তাদের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছি এবং রাজত্বও দান করেছি। তথাপি তাদের মধ্যে অনেক মুমিন থাকলেও অনেক কাফিরও ছিল। তারা নবী ও কিতাবকে মেনে নেয়নি। নিজেরা তো স্বীকার করেইনি, এমনকি অন্যদেরকেও বিরত রেখেছিল। অথচ ঐ সব নবী (আঃ) বানী ইসরাঈল ছিল। কাজেই তারা যখন নিজেদের নবীদেরকেই অস্বীকার করেছে তখন হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তারা তোমাকে যে অস্বীকার করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কারণ তুমি তো তাদের মধ্য হতে নও।'

আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে কতক লোক শেষ নবী (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল এবং কতক লোক ঈমান আনেনি। সুতরাং এ কাফিরেরা তাদের কুফরীর উপর খুবই দৃঢ় রয়েছে এবং সুপথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছে।

অতঃপর তাদেরকে তাদের শাস্তির কথা শোনানো হচ্ছে যে, জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, মিথ্যা প্রতিপাদন ও বিরোধিতার এ শাস্তিই যথেষ্ট।

৫৬। নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট করবো; যখন তাদের চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দেবো– যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।

٥٦- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ○

٥٧- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○

৫৭। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো– যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; তথায় তাদের জন্যে শুদ্ধা সহধর্মিণীসকল রয়েছে; এবং আমি তাদেরকে ছায়াশীতল স্থানে প্রবিষ্ট করবো।

যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে, এখানে তাদেরই শাস্তি ও মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং সেই আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নেবে এবং তাদের শরীরের সূক্ষ্ম লোম পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে। শুধু এটাই নয়, বরং এ শাস্তি হবে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী। একটি চামড়া পুড়ে গেলে আবার নতুন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে, যা হবে সাদা কাগজের মত। এক একজন কাফিরের শত শত চামড়া হবে এবং প্রত্যেক চামড়ার উপর নানা প্রকার পৃথক পৃথক শাস্তি হবে। এক এক দিনে সত্তর হাজারবার চামড়া পরিবর্তন করা হবে। অর্থাৎ ঐ লোকগুলোকে বলা হবে– 'পুনরায় তোমরা ফিরে এসো' তখন এগুলো পুনরায় ফিরে আসবে।

হযরত উমার (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হলে তিনি পাঠককে দ্বিতীয়বার পাঠ করে শুনাতে বলেন। পাঠক দ্বিতীয়বার পাঠ করেন। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ 'আমি আপনাকে এর তাফসীর শুনাচ্ছি। এক এক ঘন্টায় একশবার করে পরিবর্তন করা হবে।' হযরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে এরূপই শুনেছি'। (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই প্রভৃতি)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সে সময় হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছিলেনঃ 'এ আয়াতের তাফসীর আমার মনে আছে। আমি এটা আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে পাঠ করেছিলাম।' তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আচ্ছা বলতো। যদি এটা ঐরূপই হয় যেরূপ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি তবে তো আমি তা মেনে নেবো, নচেৎ ওর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করবো না।' তখন হযরত কা'ব (রাঃ) বলেনঃ 'এক ঘন্টায় একশ বিশ বার।' এটা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এ রকমই শুনেছি।'

হযরত রাবী ইবনে আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'পূর্ববর্তী গ্রন্থে লিখা রয়েছে যে, তাদের চামড়া হবে চল্লিশ হাত ও পঁচাত্তর হাত। আর তাদের পেট এত বড় হবে যে, তাতে পর্বত রাখলেও ধরে যাবে। যখন ঐ চামড়াগুলো আগুনে পুড়ে যাবে তখন অন্য চামড়া এসে যাবে।' অন্য হাদীসে এর চেয়েও বেশী রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ জাহান্নামে জাহান্নামবাসীকে এত বড় করা হবে যে, তার কানের লতি ও স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হবে সাতশ বছরের পথ। তার চামড়া হবে সত্তরগজ পুরু এবং দাঁত হতে উহুদ পাহাড়ের মত। আবার চামড়া হতে ভাবার্থ পোষাকও নেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা দুর্বল এবং প্রকাশ্য শব্দের বিপরীত।

এরপর সৎ লোকদের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আদন জান্নাতে অবস্থান করবে যার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের ইচ্ছেমত নদীগুলো প্রবাহিত হবে। স্বীয় অট্টালিকায়, বাগানে, পথে মোটকথা যেখানেই তার মন চাইবে সেখানেই নদীগুলো বইতে থাকবে। সবচেয়ে বড় মজার কথা এই যে, এসব নিয়ামত হবে চিরস্থায়ী। এগুলো না নষ্ট হবে, না কিছু হ্রাস পাবে, না ধ্বংস হবে না শেষ হবে এবং না ফিরিয়ে নেয়া হবে। আরও থাকবে তাদের জন্যে সুন্দরী হূরগণ, যারা হবে হায়েয-নেফাস, ময়লা, দুর্গন্ধ এবং অন্যান্য জঘন্য বিশেষণ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। আর তাদের জন্যে হবে সুদূর প্রসারিত গাছের ছায়া, যা হবে অত্যন্ত আরামদায়ক ও মনোমুগ্ধকর।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ থাকবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে তবুও তার ছায়া শেষ হবে না। ওটা হচ্ছে 'শাজারাতুল খুলদ' (চিরস্থায়ী বৃক্ষ)।'

৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর, তখন ন্যায় বিচার করো; অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।

٥٨- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

আল্লাহ তা'আলা গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত সুমরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে তোমাদের সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তুমি তার গচ্ছিত দ্রব্য আদায় কর এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ ও সুনান) আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত হক আদায় করণও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন রোযা, নামায, কাফ্ফারা, নযর ইত্যাদি। আর বান্দাদের পরস্পরের সমস্ত হক এর অন্তর্গত। যেমন গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি যে হক আদায় করবে না তার জন্য কিয়ামতের দিন তাকে ধরা হবে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়া হবে। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল কোন শিং বিহনী ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে।"

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ সাক্ষ্য দানের কারণে সমস্ত পাপ মুছে যায়, কিন্তু আমানত মুছে যায় না। যদি কোন লোক আল্লাহর পথে শহীদও হয়ে থাকে তাকেও কিয়ামতের দিন আনয়ন করা হবে এবং বলা হবে– 'আমানত আদায় কর।' সে উত্তরে বলবে, 'এখন তো দুনিয়ায় নেই, সুতরাং আমি আমানত কোথা হতে আদায় করব'? অতঃপর সে ঐ জিনিস জাহান্নামের তলদেশে দেখতে পাবে এবং তাকে

বলা হবে–'ওটা নিয়ে এসো'। সে ওটা তার স্কন্ধে বহন করে চলতে থাকবে। কিন্তু ওটা পড়ে যাবে এবং সে পুনরায় ওটা নিতে যাবে। অতএব সে ঐ শাস্তিতেই জড়িত থাকবে।

হযরত যাযান (রাঃ) এ বর্ণনাটি শুনে হযরত বারা'র (রাঃ) নিকট এসে বর্ণনা করেন। হযরত বারা' (রাঃ) বলেনঃ "আমার ভাই সত্যই বলেছেন।" অতঃপর তিনি কুরআন কারীমের اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا -এ আয়াতটি পাঠ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রঃ) বলেন যে, সৎ ও অসৎ উভয়ের জন্যেই এ একই নির্দেশ।

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, যে জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে ঐসবগুলোই আমানত। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, নারীর নিকট তার লজ্জাস্থান একটি আমানত। হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রঃ) বলেন, তোমার ও অপরের মধ্যে যে লেন-দেন হয়ে থাকে ঐ সবগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওটাও এর অন্তর্ভুক্ত যে, বাদশাহ্ ঈদের দিন নারীদেরকে খুৎবা শুনাবেন।' এ আয়াতের শান-ই-নযূলে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা জয় করেন এবং শান্তভাবে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেন তখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করতঃ তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক হযরত উসমান ইবনে তালহাকে আহবান করেন এবং তার নিকট চাবি যাঞ্চা করেন। হযরত উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) চাবি প্রদানে সম্মত হয়েছেন এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! চাবিটি আমার হাতে সমর্পণ করুন, যেন যমযমের পানি পান করানো ও কা'বা গৃহের চাবি রক্ষণাবেক্ষণ এ উভয় কাজ আমাদের বংশের মধ্যে থাকে। একথা শোনামাত্রই হযরত উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) হাত টেনে নেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বার চাইলে একই ব্যাপারই ঘটে। তিনি তৃতীয়বার চাইলে তিনি নিম্নের কথাটি বলে চাবিটি প্রদান করেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার আমানতের সঙ্গে দিচ্ছি।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা গৃহের দরজা খুলে দেন। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মূর্তিও ছিল, যার হাতে শুভাশুভ নিরূপণের তীর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদেরকে ধ্বংস করুন। এ তীরের

সঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কি সম্বন্ধ রয়েছে?” অতঃপর তিনি ঐ সমুদয় জিনিসকে ধ্বংস করে ওদের স্থানে পানি ঢেলে দেন এবং ঐগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেন। অতঃপর তিনি বাইরে এসে কা'বার দরজার উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেনঃ “আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন। তিনি বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমুদয় সৈন্যকে একক সত্তাই পরাজিত করেছেন।

অতঃপর তিনি একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। সে ভাষণে তিনি এ কথাও বলেনঃ “অজ্ঞতা যুগের সমস্ত বিবাদ এখন আমার পদতলে দলিত হয়েছে, সেটা মালের বিবাদই হোক বা জানের বিবাদই হোক। হ্যাঁ, তবে বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা যাদের ছিল তাদেরই থাকবে।”

এ ভাষণ দানের পর তিনি সবেমাত্র বসেছেন এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! চাবিটি আমাকে প্রদান করুন, যেন বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানোর মর্যাদা এ দু'টোই এক জায়গায় একত্রিত হয়।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) চাবিটি তাঁকে দিলেন না। তিনি মাকাম-ই-ইবরাহীমকে কা'বার ভেতর হতে বের করে কা'বার দেয়ালের সাথে মিলিয়ে রেখে দেন এবং লোকদেরকে বলেনঃ 'এটাই আমাদের কিবলাহ।'

অতঃপর তিনি তাওয়াফের কাজে লেগে পড়েন। তিনি শুধুমাত্র দু'বার প্রদক্ষিণ করেছেন এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হন এবং রাসূলুল্লাহ إِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا -এ আয়াতটি পাঠ করতে আরম্ভ করেন। তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার মা-বাপ আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আমি-এর পূর্বে তো আপনাকে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনিনি।' তখন তিনি হযরত উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) -কে ডেকে তাঁকে চাবিটি দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'আজকের দিন হজ্ব পুরা করার দিন এবং উত্তম ব্যবহার করার দিন।' এ উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) যাঁর বংশের মধ্যে এখন পর্যন্ত কা'বাতুল্লাহর চাবি রক্ষিত হয়ে আসছে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ও হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) মুসলমান হন। তাঁর চাচা উসমান ইবনে তালহা উহুদের যুদ্ধে

মুশরিকদের সাথে ছিল, এমনকি তাদের পতাকাবাহক ছিল এবং সেখানেই কুফরীর অবস্থায় মারা যায়। মোটকথা প্রসিদ্ধ কথা তো এই যে, এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। এখন এ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়ে থাক আর নাই থাক এর হুকুম হচ্ছে সাধারণ। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক ব্যক্তির আমানত আদায় করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–'ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর।' বিচারকদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় বিচারপতির পক্ষ হতে নির্দেশ হচ্ছে– 'কোন অবস্থাতেই তোমরা ন্যায়ের অঞ্চল পরিত্যাগ করো না।' হাদীস শরীফে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যে পর্যন্ত না সে অত্যাচার করে। যখন সে অত্যাচার করে তখন তা তারই দিকে সমর্পণ করেন। একটি হাদীসে রয়েছেঃ 'এক দিনের ন্যায় বিচার চল্লিশ বছরের ইবাদতের সমান।'

অতঃপর বলা হচ্ছে–'গচ্ছিত জিনিস ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ এবং ন্যায় বিচার করার নির্দেশ ও অনুরূপভাবে শরীয়তের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উত্তম ও ফলদায়ক, যেসব আদেশ ও নিষেধ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি জারী করে থাকেন।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন–'তিনি শ্রবণকারী, পরিদর্শক।' অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথাসমূহ শ্রবণকারী এবং তোমাদের কার্যাবলী পরিদর্শনকারী। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি, তিনি سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا -এ আয়াতটি পড়ছিলেন। তিনি বলেন–'তিনি প্রত্যেক জিনিস পরিদর্শনকারী।' মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত আবূ ইউনুস (রঃ) বলেন, 'আমি হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا -এ আয়াতটি পড়তে শুনতে পাই, তিনি اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا -এ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি স্বীয় কানের উপর রাখেন ও ওর পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলিটি চক্ষুর উপর রাখেন এবং বলেন, এরূপই আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আয়াতটি পড়তে শুনছি এবং তিনি এভাবেই অঙ্গুলি দু'টি রাখতেন।' হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী হযরত যাকারিয়া (রঃ) বলেন, আমাদের শিক্ষক হযরত মুকরী (রঃ) অর্থাৎ আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) এভাবেই ইঙ্গিত করে আমাদেরকে এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়েছেন। সে সময়

হযরত যাকারিয়া (রঃ) তাঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তাঁর ডান চোখের উপর রাখেন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলি তাঁর ডান কানে রাখেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'এরূপে।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) এভাবে ইমাম আবূ দাউদও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বানও (রঃ) স্বীয় পুস্তক 'সহীহ'-এর মধ্যে এটা এনেছেন। ইবনে মিরদুওয়াইও (রঃ) স্বীয় তাফসীরে এটা এনেছেন। এর সনদের মধ্যে আবূ ইউনুস যে রয়েছেন তিনি হযরত আবূ হুরাইরার মাওলা। তাঁর নাম হচ্ছে সালিম ইবনে যুবাইর।

৫৯- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

৫৯। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের অন্তর্গত আদেশদাতাগণের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও– যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট নৌবাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন আনসারীকে তার নেতৃত্ব দান করেন। একদা তিনি সৈন্যদের উপর কি এক ব্যাপারে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি?' তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, 'তোমরা জ্বালানী কাষ্ঠ জমা কর।' অতঃপর তিনি আগুন আনিয়ে নিয়ে কাষ্ঠগুলো জ্বালিয়ে দেন।

তারপরে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম। তখন একজন নব্য যুবক সৈন্যদেরকে বলেন, 'আপনারা অগ্নি হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আপনারা তাড়াতাড়ি করবেন না যে পর্যন্ত না আপনারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তিনিও যদি আপনাদেরকে আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন তবে ওতে প্রবেশ করবেন।' অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি বলেনঃ তোমরা যদি আগুনে প্রবেশ করতে তবে আর কখনও সে আগুন হতে বের হতে না। জেনে রেখো, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কার্যেই রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যেও হাদীসটি হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। সুনান-ই-আবূ দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'শ্রবণ করা ও মান্য করা মুসলমানের উপর ফরয, তা তার নিকট প্রিয়ই হোক বা অপছন্দনীয়ই হোক, যে পর্যন্ত না (আল্লাহ ও রাসূলের) অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে তখন শ্রবণও করতে হবে না এবং মান্যও করতে হবে না।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা শ্রবণ করা ও মান্য করার উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করি, তাতে আমাদের সন্তুষ্টিই হোক বা অসন্তুষ্টিই হোক, আমরা কঠিন অবস্থাতেই থাকি বা সহজ অবস্থাতেই থাকি এবং যদিও আমাদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়া হয়, আর আমরা কার্যের যোগ্য ব্যক্তি হতে কার্য ছিনিয়ে না নেই। তিনি বলেন, কিন্তু এই যে, তোমরা স্পষ্ট কুফরী দেখ যার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত কোন প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। (সে সময় তোমাদেরকে শ্রবণও করতে হবে না, মান্যও করতে হবে না)।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা শ্রবণ কর ও মান্য কর যদিও তোমাদের উপর একজন ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানিয়ে দেয়া হয়। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমার বন্ধু (সঃ) আমাকে শ্রবণ করার ও মান্য করার উপদেশ দিয়েছেন যদিও সে একজন ত্রুটিযুক্ত হাত-পা বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসও হয়'।

সহীহ মুসলিমে হযরত উম্মে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে বলতে শুনেছেন—'যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে আমেল বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে তবে তোমরা তার কথা শ্রবণ করবে ও মান্য করবে।' অন্য বর্ণনায় 'কর্তিত অঙ্গ বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস'-এ শব্দগুলো রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার পরে সত্বরই তোমাদের উপর ভাল আমীর ভাল হুকুম চালাবে এবং মন্দ আমীর মন্দ হুকুম চালাবে। সত্যের অনুরূপ কার্যে তোমরা প্রত্যেকেরই আদেশ শুনবে ও মানবে এবং তাদের পিছনে নামায পড়তে থাকবে। যদি তারা ভাল কাজ করে তবে তাদের জন্যেও মঙ্গল এবং তোমাদের জন্যেও মঙ্গল। আর যদি তারা মন্দ কাজ করে তবে তোমাদের জন্যে মঙ্গল বটে কিন্তু তাদের মন্দ কর্মের প্রতিফল তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।'

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'বানী ইসরাঈলের মধ্যে ক্রমাগত একের পর এক নবী আসতে থাকতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই, বরং খলীফা রয়েছে এবং তারা অধিক সংখ্যক হবে।' জনগণ জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন?' তিনি বলেনঃ 'প্রথম জনের বায়আত পূর্ণ কর, তারপর তার পরবর্তী জনের বায়আত পূর্ণ কর। তোমরা তাদেরকে তাদের হক পূর্ণভাবে দিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের প্রজাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি স্বীয় আমীরের কোন অপছন্দীয় কাজ দেখে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। যে ব্যক্তি দল হতে অর্ধ হাত দূরে সরে যাবে সে অজ্ঞতা যুগের মৃত্যুবরণ করবে।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -কে বলতে শুনেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে হাত টেনে নেয় সে কিয়ামতের দিন হুজ্জত ও দলীল ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে তার স্কন্ধে কারও বশ্যতা স্বীকার নেই, সে অজ্ঞতার যুগের মৃত্যুবরণ করবে।' (সহীহ মুসলিম)

সহীহ মুসলিমেই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদ-ই-রাব্বিল কা'বা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ শরীফে গিয়ে দেখি যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাঃ) কা'বা ঘরের ছায়ায় বসে রয়েছেন এবং তথায় একটি জনসমাবেশ রয়েছে। আমিও ঐ সমাবেশের এক পার্শ্বে বসে পড়ি। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা এক মজলিসে অবতরণ করি। কেউ তাঁর তাঁবু ঠিক করতে লেগে পড়েন, কেউ স্বীয় তীর গুছিয়ে নেন এবং কেউ অন্য কোন কাজে লেগে পড়েন। এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণাকারী সকলকে ডাক দিয়ে বলেন—'নামাযের জন্য একত্রিত হোন।' অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একত্রিত হই। তখন তিনি বলেনঃ 'প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর উপর আল্লাহ পাক ফরয করেছেন যে, তিনি যেন স্বীয় উম্মতকে তাঁর জানা সমস্ত ভাল কথা শিখিয়ে দেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা কিছু মন্দ তা হতে যেন তাদেরকে সতর্ক করেন। জেনে রেখো, এ উম্মতের নিরাপত্তার যুগ হচ্ছে এ প্রথম যুগ। শেষ যুগে বড় বড় বিপদ আসবে যা মুসলমানগণ অপছন্দ করবে এবং ক্রমাগত ফিৎনা আসতে থাকবে। একটি হাঙ্গামা উপস্থিত হলে মুমিন মনে করবে যে, তাতেই তার ধ্বংস রয়েছে। ওটা সরে গিয়ে আর একটি ওর চেয়েও বড় গণ্ডগোল আসবে যাতে সে নিজের ধ্বংস অনিবার্য বলে বিশ্বাস করবে। এভাবেই ক্রমাগত হাঙ্গামা, ভয়াবহ পরীক্ষা এবং ভীষণ বিপদ আসতেই থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে দূরে থাকতে ও জান্নাতে অংশ নিতে চায়, সে যেন মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে। জনগণের সাথে যেন ঐ ব্যবহার করে যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে। জেনে রেখো যে ব্যক্তি ইমামের বায়আত গ্রহণ করলো সে তার হাতের ক্ষমতা এবং অন্তরের ফল তাকে দিয়ে দিল। তখন তার আনুগত্য স্বীকার করা তার উচিত। তখন যদি অন্য কেউ এসে ঐ ক্ষমতা ইমাম হতে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছে করে তবে তোমরা তার গর্দান উড়িয়ে দাও।' আবদুর রহমান (রঃ) বলেন, আমি নিকটে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে বলি, আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি স্বয়ং এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছেন? তখন তিনি তাঁর দু'খানা হাত স্বীয় কান ও অন্তরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে এ দু'কানে শুনেছি এবং এ অন্তরে রক্ষিত রেখেছি'। আমি তখন বলি, আপনার চাচাত ভাই হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ)-কে দেখুন যে, তিনি আমাদেরকে

আমাদের পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে খেতে ও পরস্পর যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা এদু'টো কাজ হতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা ব্যতীত অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যাও করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাশীল।' (৪ঃ ২৯) এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কাজে তোমরা তার আদেশ মান্য কর এবং তাঁর অবাধ্যাতার কোন নির্দেশ দিলে তা মান্য করো না'। এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ-এ আয়াতের তাফসীরেই হযরত সুদ্দী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে এর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ঐ সেনাবাহিনীতে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারও (রাঃ) ছিলেন। ঐ সেনাবাহিনী যে গোত্রের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে করেছিলেন সে দিকেই চলছিলেন। রাত্রিকালে তাদের গ্রামের নিকটে তাঁরা শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ লোকগুলো গুপ্তচরের মাধ্যমে এ সংবাদ জেনে নেয় এবং ঐ রাত্রেই তারা সবাই গ্রাম হতে পলায়ন করে। শুধুমাত্র একটি লোক রয়ে যায়। সে তার পরিবারের লোককে নির্দেশ দেয়ায় তারা তাদের আসবাবপত্র জমা করে। অতঃপর সে রাত্রির অন্ধকারেই হযরত খালিদ (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে চলে আসে এবং ঠিকানা জেনে হযরত আম্মার (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। হযরত আম্মার (রাঃ)-কে সে বলে, 'হে আবুল ইয়াকযান! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমার সারা গোত্র এখানে আপনাদের আগমন সংবাদ শুনে পলায়ন করেছে। শুধু আমি রয়ে গেছি। তাহলে আগামীকাল কি আমার এ ইসলাম আমার জন্যে উপকারী হবে? যদি আমি উপকৃত না হই তবে আমিও পালিয়ে যাই।' হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার এ ইসলাম দ্বারা

তোমার উপকার লাভ হবে। তুমি পালিয়ে যেয়ো না, ওখানেই থাক।' সকালে হযরত খালিদ (রাঃ) আক্রমণ চালান এবং ঐ লোকটি ছাড়া আর কাউকেও পেলেন না। তাকে তিনি মালসহ গ্রেফতার করেন। হযরত আম্মার (রাঃ) এ সংবাদ জানতে পেরে হযরত খালিদ (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাকে বলেন, 'একে ছেড়ে দিন। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আমার আশ্রয়ে রয়েছে।' হযরত খালিদ (রাঃ) তখন তাঁকে বলেন, 'আপনি তাকে আশ্রয় দেয়ার কে?' এতে উভয় মনীষীর মধ্যে কিছু বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)-এর এ আশ্রয় দানকে বৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং আগামীতে আমীরের পক্ষ হতে কাউকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করে দেন।

আবার দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। এতে হযরত খালিদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, 'আপনি এ নাক কাটা গোলামকে কিছু বলছেন না? দেখুন তো, সে আমাকে কিরূপ অন্যায় কথা বলছে?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে খালিদ (রাঃ)! হযরত আম্মার (রাঃ)-কে মন্দ বলো না। যে আম্মার (রাঃ)-কে গালি দেবে, আল্লাহ পাক তাকে গালি দেবেন। যে ব্যক্তি আম্মার (রাঃ)-এর শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবেন। যে ব্যক্তি আম্মার (রাঃ)-কে অভিশাপ দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অভিশাপ দেবেন।' হযরত আম্মার (রাঃ) ক্রোধে তথা হতে প্রস্থান করেন। হযরত খালিদ (রাঃ) তখন দৌড়ে গিয়ে তাঁর (কাপড়ের) অঞ্চল টেনে ধরেন এবং স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও অবশেষে তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে সম্মত হন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর ও তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, أُولِى الْأَمْرِ দ্বারা বোধশক্তি সম্পন্ন ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ। বাহ্যিক কথা তো এটাই মনে হচ্ছে, তবে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। এ শব্দটি সাধারণ, এর ভাবার্থ 'আমীর' ও 'আলেম' উভয়ই হতে পারে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ

অর্থাৎ 'তাদের আলেমগণ তাদেরকে মিথ্যা কথা বলা হতে এবং সুদ ভক্ষণ হতে নিষেধ করে না কেন?'(৫ঃ ৬৩) অন্য জায়গায় রয়েছে–

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ 'তোমরা না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।' (১৬ঃ ৫৩) সহীহ হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমার আনুগত্য স্বীকারকারী হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের অবাধ্য হয়েছে সে আমারই অবাধ্য হয়েছে।' সুতরাং এ হলো আলেম ও আমীরগণের অনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ। এ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর কিতাবের অনুসারী হও। 'আল্লাহ তা'আলার রাসূলের অনুগত হও' অর্থাৎ তাঁর সুন্নাতের উপর আমল কর। আর তোমাদের আদেশদাতাদের আনুগত্য স্বীকার কর। অর্থাৎ তাদের ঐ নির্দেশের প্রতি অনুগত হও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য রয়েছে। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীত কোন আদেশ করে তবে তাদের সে আদেশ মান্য করা মোটেই উচিত নয়। কেননা, ঐ সময়ে আলেম ও আমীরদের আদেশ মান্য করা হারাম। যেমন ইতিপূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কার্যেই রয়েছে। অর্থাৎ তাদের আনুগত্য রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশের বেষ্টনীর মধ্যে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে এর চেয়েও স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। সেখানে হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার কার্যে আনুগত্য নেই।' অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন–'যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হও।' অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীসের দিকে ফিরে এসো, যেমন হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর তাফসীরে রয়েছে। সুতরাং এখানে স্পষ্ট ভাষায় মহা সম্মানিত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে যে, যে মাসআলায় মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, ঐ মাসআলা ধর্মনীতি সম্পর্কীয়ই হোক বা ধর্মের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কীয়ই হোক, এর মীমাংসার জন্যে একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীসকে মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ দু'টোর মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নিতে হবে। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতের রয়েছে–

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

অর্থাৎ 'যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ সৃষ্টি কর, ওর ফায়সালা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে।' (৪২ঃ ১০) অতএব, কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দেবে এবং যে মাসআলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই মিথ্যা। কুরআন কারীমে ঘোষণা হচ্ছেঃ সত্যের পরে যা রয়েছে তা শুধু পথভ্রষ্টতাই বটে।' এ জন্যেই এখানেও এ নির্দেশের সাথেই ইরশাদ হচ্ছেঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক।' অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও তবে যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই এবং যাতে মতভেদ রয়েছে, যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা এসবের মীমাংসা কর, এ দু'টোর মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নাও।' অতএব, সাব্যস্ত হলো যে, মতভেদী জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যারা কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসে না তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস রাখে না।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে–বিবাদসমূহে ও মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তোমাদের জন্যে উত্তম এবং এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান লাভের কাজ।

٦٠- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۚ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○

৬০। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি– যারা ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা নিজেদের মোকদ্দমা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায় যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল– যেন তাকে অবিশ্বাস করে; এবং শয়তান ইচ্ছে করে যে, তাদেরকে সুদূর বিপদে বিভ্রান্ত করে।

٦١- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ○

৬১। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদ্দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে যে, তারা তোমা হতে বিমুখ হয়ে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

٦٢- فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ○

৬২। অনন্তর তখন কিরূপ হবে–যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্যে তাদের উপর বিপদ উপনীত হবে? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে তোমার দিকে আসবে যে–কল্যাণ ও সম্মিলন ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি।

٦٣- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ○

৬৩। তাদের অন্তরসমূহে যা আছে, আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত হও ও তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কথা বল।

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলার পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর এবং এ কুরআন কারীমের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু যখন কোন বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন তারা কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বরং অন্য দিকে যায়। এ আয়াতটি

ঐ দু'ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যাদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। একজন ছিল ইয়াহূদী এবং অপর জন ছিল আনসারী। ইয়াহূদী আনসারীকে বলছিল, চল আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট হতে এর মীমাংসা করিয়ে নেবো। আনসারী বলছিল চল আমরা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট যাই। এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করতো বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অজ্ঞতা যুগের আহ্কামের দিকে আকৃষ্ট হতে চাচ্ছিল। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। আয়াতটি স্বীয় আদেশ ও শব্দসমূহ হিসেবে সাধারণ। এ সমুদয় ঘটনা এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দে করছে, যে কিতাব ও সুন্নাহ্কে ছেড়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফায়সালা নিয়ে যায়। এখানে এটাই হচ্ছে 'তাগুত'-এর ভাবার্থ। صُدُوْد শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

অর্থাৎ 'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে–বরং আমরা অনুসরণ করবো ঐ জিনিসের যার উপরে আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।'(২ঃ ১৭০) মুমিনদের এ উত্তর হতে পারে না। বরং তাদের উত্তর অন্য আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْآ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط

অর্থাৎ 'মুমিনদেরকে যখন তাদের মধ্যে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের এ উত্তরই হয় যে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।'(২৪ঃ ৫১)

এরপর মুনাফিকদেরকে নিন্দে করা হচ্ছে যে, হে নবী (সঃ)! যখন তারা তাদের পাপের কারণে বিপদে পড়ে এবং তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন তারা দৌড়িয়ে তোমার নিকট আগমন করে এবং ওযর পেশ করতঃ শপথ করে করে বলে– 'আমরা কল্যাণ ও সম্মিলন ব্যতীত কিছুই কামনা করিনি এবং আপনাকে ছেড়ে আমাদের মোকদ্দমা অন্যের নিকট নিয়ে যাওয়ার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মন যোগানো ও তাদের সাথে বাহ্যিক মিল রাখা। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আস্থা মোটেই নেই।' যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى হতে فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ পর্যন্ত। অর্থাৎ

'যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তুমি তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) দেখবে যে, তারা তাদের (ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সর্বপ্রকারের চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং বলবে– আমাদের বিপদে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, সুতরাং খুব সম্ভব আল্লাহ বিজয় আনয়ন করবেন অথবা নিজের কোন হুকুম জারী করবেন এবং এর ফলে তারা তাদের অন্তরে লুক্কায়িত উদ্দেশ্যের কারণে লজ্জিত হবে।' (৫ঃ ৫২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবূ বারযা আসলামী ছিল একজন যাদুকর। ইয়াহূদীরা তাদের কতক মোকদ্দমার মীমাংসা তার দ্বারা করিয়ে নিত। একটি ঘটনায় মুশরিকেরাও তার নিকট দৌড়িয়ে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে أَلَمْ تَرَ হতে إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَّتَوْفِيقًا পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর বলা হচ্ছে– এ প্রকারের লোকের অর্থাৎ মুনাফিকদের অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তাঁর নিকট ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন জিনিসও গুপ্ত নয়। তিনি তাদের ভেতরের ও বাইরের সব খবরই রাখেন। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত থাক এবং তাদেরকে তাদের অন্তরের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে শাসন-গর্জন করো না। তারা যেন কপটতা দ্বারা অন্যদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি না করে তজ্জন্যে তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাক এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কথা বল ও তাদের জন্যে প্রার্থনাও কর।

৬৪। আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাদের আনুগত্য স্বীকার করা হবে, এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করতো, তৎপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো আর রাসূলও তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবা কবূলকারী, করুণাময় প্রাপ্ত হতো।

٦٤- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

٦٥- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৬৫। অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও বিশ্বাসস্থাপনকারী হতে পারবে না- যে পর্যন্ত তোমাকে অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক না করে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ করে।

ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক যুগের রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করা তাঁর উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফরয হয়ে থাকে। রিসালাতের পদমর্যাদা এই যে, তাঁর সমস্ত আদেশকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ মনে করা হবে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন ঃ بِإِذْنِ اللّٰهِ -এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এর ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে এবং তা তার শক্তি ও ইচ্ছের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছে ছাড়া কেউ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ অর্থাৎ 'যখন তুমি তাঁর হুকুমে তাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলে।' (৩ঃ ১৫২) এখানেও إِذْن শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য ও পাপীদের প্রতি ইরশাদ করেছেন যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটও যেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন জানায়। তারা যখন এরূপ করবে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবূল করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

আবূ মানসূর আস্সাববাগ্ (রঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ গল্পের পুস্তকে উৎবীর (রঃ) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। উৎবী (রঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমাধির পার্শ্বে বসেছিলাম। এমন সময় সেখানে এক বেদুঈনের আগমন ঘটে। সে বলে, আস্সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ (হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)! আমি আল্লাহ তা'আলার وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا

এ- اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا উক্তি শুনেছি। তাই আমি আপনার সামনে স্বীয় পাপের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও আপনার শাফাআত কামনা করছি।' অতঃপর সে নিম্নের কবিতাটি পাঠ করেঃ

يَاخَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهُ ٭ فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ
نَفْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهُ ٭ فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

অর্থাৎ 'হে ঐ সবের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি! যাদের অস্থিগুলো প্রান্তরে প্রোথিত হয়েছে এবং সেগুলোর সুবাসে পর্বত ও প্রান্তর সুরভিত হয়েছে। সে কবরের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত হোক, যে কবরে আপনি অবস্থানকারী। ওতে রয়েছে পবিত্রতা, দানশীলতা ও ভদ্রতা।' অতঃপর বেদুঈন চলে যায় এবং আমার চোখে নিদ্রা চেপে বসে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেন বলছেনঃ 'যাও, ঐ বেদুঈনকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করেছেন।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেনঃ 'কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারে না যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার শেষ নবী (সঃ)-কে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে না নেবে এবং প্রত্যেক নির্দেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতকে, প্রত্যেক হাদীসকে গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র ঐ রাসূলেরই (সঃ) অনুগত না করবে।' মোটকথা, যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে মুমিন। অতএব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং স্বীয় অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ না করে। তারা যেন সমস্ত হাদীসকেই স্বীকার করে নেয়। তারা যেন না হাদীসসমূহকে স্বীকার করা হতে বিরত থাকে, না ঐগুলোকে সরিয়ে দেয়ার উপায় অনুসন্ধান করে, না ওর মত অন্য কোন জিনিসকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে, না ঐ গুলো খণ্ডন করে এবং না ঐ গুলো মেনে নেয়ার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।' যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেনঃ 'যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ঐ জিনিসের অনুগত করে যা আমি আনয়ন করেছি।'

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নর্দমা দিয়ে বাগানে পানি নেয়ার ব্যাপারে একটি লোকের সঙ্গে হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর বিবাদ হয়। নবী (সঃ) তখন বলেনঃ 'হে যুবাইর (রাঃ)! তোমার বাগানে পানি নেয়ার পর তুমি আনসারীর বাগানে পানি যেতে দাও।' তাঁর একথা শুনে আনসারী বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে আপনার ফুপাতো ভাই তো!' এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বলেনঃ 'হে যুবাইর (রাঃ)! তুমি তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর তা বন্ধ রেখো যে পর্যন্ত না সে পানি বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর পানি তোমার প্রতিবেশীর দিকে ছেড়ে দাও।' প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন পন্থা বের করেন যাতে হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর কষ্ট না হয় এবং আনসারীরও প্রশস্ততা বেড়ে যায়। কিন্তু আনসারী যখন সেটা তার পক্ষে উত্তম মনে করলো না, তখন তিনি হযরত যুবাইর (রাঃ)-কে তাঁর পূর্ণ হক প্রদান করলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি ধারণা করি যে, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -এ আয়াতটি এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদ-ই-আহমাদের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, এ আনসারী বদরী সাহাবী ছিলেন। অন্য বর্ণনা হিসেবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল এই যে, পানির নালা হতে প্রথমেই ছিল হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর বাগান এবং তারপরে ঐ আনসারীর বাগান। আনসারী হযরত যুবাইর (রাঃ)-কে বলতেন, 'পানি বন্ধ করবেন না। পানি আপনা আপনি এক সাথে দু' বাগানেই আসবে।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের আর একটি খুব বেশী দুর্বল বর্ণনায় এ আয়াতের শান-ই-নযূল এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি তাদের বিবাদের মীমাংসার জন্যে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি একটা মীমাংসা করে দেন। কিন্তু মীমাংসা যার প্রতিকূল হয়েছিল সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মীমাংসার জন্যে আপনি আমাদেরকে হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ঠিক আছে, তোমরা সেখানেই যাও।' তারা এখানে আসলে যার অনুকূলে ফায়সালা হয়েছিল সে সমস্ত ঘটনা হযরত উমারের নিকট বর্ণনা করে। হযরত উমার (রাঃ) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, 'এটা সত্যা কি?' সে স্বীকার করে নেয়। হযরত উমার (রাঃ) তখন তাদেরকে বলেন, 'এখানে তোমরা থাম, আমি এসে ফায়সালা করছি।' তিনি তরবারী নিয়ে আসলেন এবং যে ব্যক্তি বলেছিল, 'আমাদেরকে হযরত উমার (রাঃ)এর নিকট পাঠিয়ে দিন' তার গর্দান উড়িয়ে দেন। অপর ব্যক্তি এটা দেখেই দৌড়ে পালিয়ে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি পালিয়ে না আসলে আমার মঙ্গল ছিল না'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'আমি উমার

(রাঃ)-কে এরূপ জানতাম না যে, তিনি এরূপ বীরত্বপনা দেখিয়ে একজন মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করবেন।' সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ফলে ঐ ব্যক্তির রক্ত বিফলে যায় এবং হযরত উমার (রাঃ)-কে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু এ নিয়ম চালু হয়ে যাওয়া আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। তাই তিনি وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ (৪ঃ ৬৬) -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন যা পরে আসছে।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে যা গারীব ও মুরসাল। ইবনে আবি লাহীআহ্ নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন। অন্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত আছে যে, দু' ব্যক্তি তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তিনি হক পন্থীর পক্ষে মীমাংসা করেন। কিন্তু মীমাংসা যার প্রতিকূলে হয়েছিল সে বলে, 'আমি সম্মত নই।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কি চাও?' সে বলে, 'আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট যেতে চাই।'

উভয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ঘটনাটি শুনে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে ফায়সালা করেছেন তোমাদের জন্যে ওটাই ফায়সালা।' সে তাতেও সম্মত না হয়ে সঙ্গীকে বলে, 'চল আমরা হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট যাবো।' তথায় তারা গমন করেন। তথায় যা সংঘটিত হয় তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীর-ই-ইবনে হাফিয আবূ ইসহাক)

৬৬। আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহপ্রাচীর হতে নিষ্ক্রান্ত হও, তবে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতো না এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করতো তবে নিশ্চয়ই ওটা তাদের জন্যে কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হতো।

٦٦- وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۝

٦٧- وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًاۙ

৬৭। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম।

٦٨- وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

৬৮। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ-প্রদর্শন করতাম।

٦٩- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

৬৯। আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তবে তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।

٧٠- ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ع

৭০। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ; এবং আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন– অধিকাংশ লোক এরূপ যে, তাদেরকে যদি ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করারও নির্দেশ দেয়া হতো যা তারা এ সময়ে করতে রয়েছে তবে তারা ঐ কাজগুলোও করতো না। কেননা, তাদের হীন প্রকৃতিকে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণের উপরই গঠন করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর ঐ জ্ঞানের সংবাদ দিচ্ছেন যা হয়নি। কিন্তু যদি হতো তবে কিরূপ হতো? হযরত আবূ ইসহাক সাবীঈ (রঃ) বলেন যে, যখন وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ –এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন একজন মনীষী বলেছিলেনঃ 'যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিতেন তবে অবশ্যই আমরা তা পালন করতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে এটা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনেন তখন তিনি বলেনঃ 'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে ঈমান মজবুত পর্বত অপেক্ষাও বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

অন্য সনদে রয়েছে যে, কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, একজন ইয়াহূদী হযরত কায়েস ইবনে শাম্মাস (রাঃ)-কে গর্ব করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর স্বয়ং আমাদের হত্যা ফরয করেছিলেন এবং আমরা তা পালন করেছিলাম।' তখন হযরত সাবিত (রাঃ) বলেনঃ 'যদি আমাদের উপর ওটা ফরয করা হতো তবে আমরাও তা পালন করতাম।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যদি এ নির্দেশ দেয়া হতো হবে তা পালনকারীদের মধ্যে একজন ইবনে উম্মে আবদও (রাঃ) হতো'। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পড়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করত বলেনঃ 'এর উপর আমলকারীদের মধ্যে এও একজন।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি এ লোকগুলো আমার আদেশ পালন করতো এবং আমার নিষিদ্ধ জিনিস ও কাজ হতে বিরত থাকতো তবে আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা ওটাই তাদের জন্যে উত্তম হতো। এটাই হতো তাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় আমি তাদেরকে জান্নাত দান করতাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পথ প্রদর্শন করতাম।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশের উপর আমল করে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে তাকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানের ঘরে নিয়ে যাবেন এবং নবীদের বন্ধুরূপে পরিগণিত করবেন। তারপর সত্য সাধকদের বন্ধু করবেন, যাদের মর্যাদা নবীদের পরে। তারপর তাদেরকে তিনি শহীদের সঙ্গী করবেন। অতঃপর সমস্ত মুমিনের সঙ্গী করবেন যাদের ভেতর ও বাহির সুসজ্জিত। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এঁরা কতই না পবিত্র ও উত্তম বন্ধু!

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক নবী (আঃ)-কে তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় দুনিয়ায় অবস্থানের এবং আখিরাতের দিকে গমনের মধ্যে অধিকার দেয়া হয়।' যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হন, যে রোগ হতে তিনি আর উঠতে পারেননি তখন তাঁর কণ্ঠস্বর বসে যায়। সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনি, 'ওদের সঙ্গে যাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন, যারা নবী, সত্য সাধক, শহীদ ও সৎকর্মশীল। আমি তখন জানতে পারি যে, তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছে'।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, তাঁর নিম্নের শব্দগুলো এসেছে, 'হে আল্লাহ! আমি সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সাথে মিলন যাচ্ঞা করছি।' অতঃপর তিনি এ নশ্বর জগত হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এ কথা তিনি তিনবার পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেন। পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত তাঁর উক্তির ভাবার্থ এটাই।

এ পবিত্র আয়াতের শানে নযূলঃ

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখানে তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা আপনার খেদমতে এসে উঠা বসা করছি এবং আপনার মুখমণ্ডলও দর্শন করছি। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন তো আপনি নবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন তো আমরা আপনার নিকট পৌঁছাতে পারবো না! রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন উত্তর দিলেন না। সে সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াতটি আনয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন লোক পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সুসংবাদ প্রদান করেন। এ হাদীসটি মুরসাল সনদেও বর্ণিত আছে, যে সনদটি খুবই উত্তম।

হযরত রাবী' (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ বলেন, 'এটা তো স্পষ্ট কথা যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মর্যাদা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন কারীদের বহু উর্ধে। সুতরাং জান্নাতে যখন এঁরা সব একত্রিত হবেন তখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপে দেখা সাক্ষাৎ হবে'? তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিম্নমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট নেমে আসবে এবং তারা সব ফুল বাগানে একত্রিত হবে। তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবে ও তাঁর প্রশংসা করবে। তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং তন্মধ্যে সদা তারা আমোদ-আহলাদ করতে থাকবে।'

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনাকে আমার প্রাণ হতে, পরিবার পরিজন হতে এবং সন্তান অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি। আমি বাড়ীতে থাকি বটে, কিন্তু আপনাকে স্মরণ করা মাত্র আপনার নিকট আগমন ছাড়া আমি আর ধৈর্য ধারণ

করতে পারি না। অতঃপর এসে আপনাকে দর্শন করি। কিন্তু যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আপনি নবীদের সঙ্গে সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন, তখন আমার ভয় হয় যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ লাভ করলেও আপনাকে হয়তো দেখতে পাবো না।' সে সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ বর্ণনাটির আরও ধারা রয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে, হযরত রাবিআ' ইবনে কা'ব আসলামী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে অবস্থান করতাম এবং তাঁকে পানি ইত্যাদি এনে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বলেনঃ 'কিছু যাচ্ঞা কর'। আমি বলি, জান্নাতে আপনার বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করছি। তিনি বলেনঃ 'এটা ছাড়া অন্য কিছু?' আমি বলি, এটাও এটাই বটে। তখন তিনি বলেনঃ 'তা হলে অধিক সিজদার মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনের উপর আমাকে সাহায্য কর।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আমর ইবনে মুররাতুল জাহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করি এবং রমযানের রোযা রাখি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় অঙ্গুলি উঠিয়ে ইঙ্গিত করতঃ বলেনঃ 'যে ব্যক্তি এর উপরই মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামতের দিন এভাবে নবীদের সঙ্গে, সত্য সাধকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন পিতা-মাতার অবাধ্য না হয়।'

মুসনাদ-ই-আহমাদেই রয়েছে, হযরত আনাস (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পথে এক হাজার আয়াত পাঠ করে সে কিয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ নবীদের, সত্য সাধকদের, শহীদদের এবং সৎ কর্মশীলদের সঙ্গে মিলিত হবে। আর এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী।' জামেউত তিরমিযীর মধ্যে হযতর আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলূল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বণিক– নবী, সিদ্দীক ও শহীদের সঙ্গে থাকবে।'

সহীহ ও মুসনাদ হাদীস গ্রন্থসমূহে সাহাবা-ই-কিরামের একটি বিরাট দল হতে ক্রম পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন যে একটি গোত্রের সাথে ভালবাসা রাখে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মানুষ তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে সে ভালবাসতো।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'মুসলমানেরা এ হাদীস শুনে যত খুশী হয়েছিল এত খুশী অন্য কোন জিনিসে হয়নি। আল্লাহর শপথ! আমার ভালবাসা তো রাসূলুল্লাহ (সঃ), হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযতর উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে রয়েছে। তাই, আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁদের সঙ্গেই উঠাবেন, যদিও আমার আমল তাঁদের মত নয়।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'জান্নতবাসীরা তাদের অপেক্ষা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন জন্নাতবাসীদেরকে তাদের প্রাসাদ এরূপ দেখবে যেরূপ তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কোন উজ্জ্বল তারকা দেখে থাক। তাদের মধ্যে বহু দূরের ব্যবধান থাকবে।' তখন সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এসব প্রাসাদ তো নবীদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। সুতরাং তথায় তো তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ পৌঁছতে পারবে না।' তখন নবী (সঃ) বলেনঃ 'হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যেসব লোক আল্লাহ তা'আলা উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে তারাও তথায় পৌঁছে যাবে।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন হাবশী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে কিছু প্রশ্ন করার জন্যে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'জিজ্ঞেস কর ও অনুধাবন কর।' সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে আকারে, রঙ্গে এবং নবুওয়াতে আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি যাঁর উপর ঈমান এনেছেন আমিও যদি তাঁর উপর ঈমান আনি এবং যেসব নির্দেশ আপনি পালন করেন আমিও যদি তা পালন করি তবে কি আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ লাভ করবো?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'হ্যাঁ। যে আল্লাহ তা'আলার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কৃষ্ণ বর্ণের হাবশী এমন সাদা উজ্জ্বল হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, তার ঔজ্জ্বল্য এক হাজার বছরের পথের দূরত্ব হতেও দৃষ্টিগোচর হবে।' অতঃপর তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট অঙ্গীকার রয়েছে এবং যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী' বলে তার জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পুণ্য লিখা হয়।' তখন আর এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন এত পুণ্য লাভ হবে তখন আমরা ধ্বংস কিরূপে হতে পারি। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'একজন লোক কিয়ামতের দিন এত পুণ্য নিয়ে হাযির হবে যে, যদি তা কোন পর্বতের উপর রাখা হয় তবে

তার উপর ভারী বোঝা হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি নি'আমত দাঁড়িয়ে যাবে এবং ওরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে এ সমুদয় আমল খুবই অল্প রূপ পরিলক্ষিত হবে। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে স্বীয় পূর্ণ করুণা দ্বারা ঢেকে দিয়ে জান্নাত দান করেন সেটা অন্য কথা। সে সময় هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـئًا مَّذْكُوْرًا হতে نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا (৭৬ঃ ১-২০) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। তখন হাবশী বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। জান্নাতে আপনার চক্ষু যা দেখবে আমার চক্ষুও কি তা দেখতে পাবে'? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হ্যাঁ'। একথা শুনে সে কেঁদে পড়ে এবং এত বেশী ক্রন্দন করে যে, তাতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে যায়। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি ঐ লোকটির মৃত দেহ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কবরে নামাতে দেখেছি।' এ বর্ণনাটি গারীব এবং মুনকারও বটে। এর সনদও দুর্বল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই অনুগ্রহ ও দান এবং তাঁর বিশেষ করুণা, যার কারণে তাঁর বান্দা এত মর্যাদা লাভ করেছে, এটা সে তার কার্যবলে লাভ করেনি। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন।' অর্থাৎ হিদায়াত ও তাওফীক লাভের হকদার যে কে তাঁর খুব ভালরূপেই জানা আছে।

৭১। হে মুমিনগণ! তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা গ্রহণ কর, তৎপর পৃথকভাবে বহির্গত হও অথবা সম্মিলিতভাবে অভিযান কর।

٧١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

৭২। আর তোমাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যে শৈথিল্য করে; অনন্তর যদি তোমাদের উপর বিপদ নিপতিত হয় তবে বলেঃ আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাদের সাথে বিদ্যমান ছিলাম না।

٧٢- وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○

৭৩। এবং যদি আল্লাহর সন্নিধান হতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ সম্পদ অবতীর্ণ হয় তবে এরূপভাবে বলে যেন তোমাদের মধ্যে ও তার মধ্যে কোনই সম্বন্ধ ছিল না- বস্তুতঃ যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম তবে মহান ফলপ্রদ সুফল লাভ করতাম।

٧٣- وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا○

৭৪। অতএব যারা ইহকালের বিনিময়ে পরকাল ক্রয় করেছে তারা যেন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে; এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তৎপর নিহত অথবা বিজয়ী হয় তবে আমি তাকে মহান প্রতিদান প্রদান করবো।

٧٤- فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا○

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সর্বদা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সদা যেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে যাতে শত্রুরা অতি সহজে তাদের উপর জয়যুক্ত না হয়। তারা সব সময় যেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র প্রস্তুত রাখে, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শক্তি দৃঢ় করে। নির্দেশ মাত্রই যেন তারা বীর বেশে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট সৈন্যদলে বিভক্ত হয়েই হোক বা সবাই সম্মিলিত হয়েই হোক সুযোগমত তারা যেন যুদ্ধের অহ্বান মাত্রই বেড়িয়ে পড়ে। ثُبَاتٌ হচ্ছে ثُبَةٌ শব্দের বহু বচন। আবার কখনও ثُبَةٌ -এর বহু বছন ثُبِيْنَ ও আসে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ -এর অর্থ হচ্ছে তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বহির্গত হও।' আর أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا -এর অর্থ হচ্ছে 'তোমরা সম্মিলিতভাবে বেড়িয়ে পড়।' মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সুদ্দী (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ), যহ্হাক (রঃ), আতা' আল খুরাসানী (রঃ), মুকাতিল ইবনে হিব্বান (রঃ) এবং খাসীফ আল জাযারীও (রঃ) এ কথাই বলেন।

মুজাহিদ (রঃ) এবং আরও কয়েকজন মনীষী বলেন যে, وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ -এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুনাফিকদের স্বভাব এই যে, নিজেও তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং অপরকেও যুদ্ধে না যেতে উৎসাহিত করে। যেমন মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের কার্যকলাপ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করুন।

তাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন হিকমতের কারণে যদি মুসলমানরা তাদের শত্রুদের উপর বিজয় লাভে অসমর্থ হয় বরং শত্রুরাই তাদের উপর চেপে বসে এবং মুসলমানদের ক্ষতি হয় ও তাদের লোক শাহাদাত বরণ করে তখন ঐ মুনাফিকরা বাড়িতে বসে ফুলতে থাকে এবং স্বীয় বুদ্ধির উপর গৌরব বোধ করে। তারা তখন তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আল্লাহ তা'আলার দান বলে গণ্য করে। কিন্তু ঐ নির্বোধেরা বুঝে না যে, ঐ মুজাহিদেরা জিহাদে অংশগ্রহণের ফলে যে পুণ্য লাভ করেছে তা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছে। যদি তারাও জিহাদে অংশ নিত তবে মুসলমানদের মত তারাও গাযী হওয়ার মর্যাদা এবং ধৈর্য ধারণের পুণ্য লাভ করতো অথবা শহীদ হওয়ার গৌরব লাভ করতো। পক্ষান্তরে যদি মুসলমান মুজাহিদগণ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শত্রুদের উপর জয়ী হয় এবং শত্রুরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় আর এর ফলে মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে ও দাস-দাসী নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে, তবে ঐ মুনাফিকরা চরম দুঃখিত হয় এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এত হা-হুতাশ করে ও এমন এমন কথা মুখ দিয়ে বের করে যে, যেন মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না। তাদের ধর্মই যেন অন্য। তারা তখন বলে, 'হায়! আমরাও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তবে আমরাও গনীমতের মাল পেতাম এবং তাদের মত আমরাও দাস-দাসী ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে যেতাম।'

মোটকথা, দুনিয়া লাভই তাদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। সুতরাং যারা ইহকালের বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ ঘোষণা করা উচিত। তারা কুফরী ও অবিশ্বাসের কারণে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্বংস করেছে। তাই মুনাফিকদের বলা হচ্ছে– হে মুনাফিকের দল! তোমরা জেনে রেখো যে, যারা আল্লাহ তা'আলার পথের মুজাহিদ তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। তাদের উভয় হস্তে লাড্ডু রয়েছে। নিহত হলেও তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসলেও রয়েছে গনীমতের মালের বিরাট অংশ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ 'আল্লাহর পথের মুজাহিদের যামিন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। হয় তিনি তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন, আর না হয় যেখান হতে সে বের হয়েছে সেখানেই যুদ্ধলব্ধ মালসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।'

৭৫। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না? অথচ পুরুষগণ, নারীবৃন্দ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল– তারা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে বহির্গত করুন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

٧٥- وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ؕ

٧٦- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

৭৬। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা শয়তানের পথে যুদ্ধ করে; অতএব তোমরা শয়তানের সুহৃদগণের সাথে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাঁর পথে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন– 'গুটি কয়েক দুর্বল ও অসহায় লোক মক্কায় রয়েগেছে যাদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। মক্কায় অবস্থান তাদের জন্যে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাদের উপর কাফিরেরা নানা প্রকার উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে মুক্ত করে আন। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছে– 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এ অত্যাচারীদের গ্রাম হতে অর্থাৎ মক্কা হতে বহির্গত করুন।' মক্কাকে নিম্নের আয়াতেও গ্রাম বলা হয়েছে–

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ

অর্থাৎ 'বহু গ্রাম তোমার ঐ গ্রাম অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ছিল যে গ্রাম অর্থাৎ গ্রামবাসী তোমাকে বের করে দিয়েছে।'(৪৭ঃ ১৩) ঐ দুর্বল লোকেরা মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করছে এবং সাথে সাথে স্বীয় প্রার্থনায় বলছে– 'হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ হতে আপনি আমাদের জন্যে পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নির্বাচন করুন।'

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি এবং আমার আম্মাও ঐ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ -এ অংশটুকু পাঠ করে বলেন, 'আমি ও আমার আম্মা ঐ লোকদের অন্তর্গত ছিলাম যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুর্বল ও অসহায় করে রেখেছিলেন।'

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'মুমিনগণ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে কাফিরেরা শয়তানের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। সুতরাং মুসলমানদের উচিত যে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার শত্রু ও শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, শয়তানের কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে বৃথায় পর্যবসিত হবে।

٧٧- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۚ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

৭৭। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি– যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্তসমূহ সংরুদ্ধ রাখ এবং নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করে দেয়া হলো তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো বরং তদপেক্ষাও অধিক ভয় এবং তারা বললো– হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্যে অবসর দিলেন না? তুমি বল– পার্থিব সম্পদ অকিঞ্চিৎকর এবং ধর্মভীরুগণের জন্যে পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খর্জুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।

৭৮। তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে– যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর; এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তবে বলে–এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তবে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে, তুমি বল– সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝবার নিকটবর্তীও হয় না।

٧٨- اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۤءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ○

৭৯। তোমার নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহর সন্নিধান হতে এবং তোমার উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হতে হয়ে থাকে; এবং আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি; আর আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।

٧٩- مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানরা মক্কায় অবস্থান করছিল তখন তারা ছিল দুর্বল। তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল। তথায় কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলমানরা তাদেরই শহরে ছিল।

কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল তাদের অধিক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেননি। বরং তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করেছেন ঐগুলোর উপর যেন তারা আমল করে। যেমন তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে। সাধারণতঃ যদিও তখন তাদের মালের আধিক্য ছিল না তথাপি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, তারা যেন এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং সবর ও ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ নেয়। আর ওদিকে কাফিররা ভীষণ বীরত্বের সাথে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারা ছোট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন হতে কঠিনতম শাস্তি দিতে থাকে। কাজেই মুসলমানগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিল। মাঝে' মাঝে তাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং তারা কামনা করতো যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিতেন।

অবশেষে যখন তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমিত দেয়া হয় তখন মুসলমানরা স্বীয় মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন সবকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে মদীনায় হিজরত করে। তথায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বপ্রকারের সুবিধা ও নিরাপত্তা দান করেন। সাহায্যকারী হিসেবে তারা মদীনার আনসারদেরকে পেয়ে যায় এবং তাদের সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া তারা যথেষ্ট শক্তিও অর্জন করে।

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই কতক লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জিহাদের কথা চিন্তা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং স্ত্রীদের বিধবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন হওয়ার দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। ভয় পেয়ে তারা বলে উঠে– 'হে আমাদের প্রভু! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন!' এ বিষয়কেই অন্য আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ (৪৭ঃ ২০)

এর সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে, মুমিনগণ বলে–(যুদ্ধের) কোন সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন রুগ্ন অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার করে উঠে এবং ভ্রুকুঞ্চিত করে তোমার দিকে তাকায় এবং ঐ ব্যক্তির মত চক্ষু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য হয়ে থাকে। তাদের জন্যে আফসোস!

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর নবী (সঃ)! কুফরীর অবস্থায় আমরা সম্মানিত ছিলাম, আর আজ ইসলামের অবস্থায় আমাদের লাঞ্ছিত মনে করা হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমার উপর আল্লাহ পাকের এ নির্দেশই রয়েছে যে, আমি যেন ক্ষমা করে দেই। সাবধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো না।'

অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর এখানে যখন জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন লোকেরা বিরত থাকে। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইমাম হাকিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)ও এটা বর্ণনা করেছেন।

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তাদের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। তখন তারা আকাঙক্ষা করে যে, জিহাদও যদি ফরয করা হতো!

অতঃপর যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয় তখন দুর্বল ঈমানের লোকেরা মানুষকে ঐরূপ ভয় করতে লাগে যেমন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত; বরং তার চেয়েও বেশী ভয় করতে থাকে এবং বলে–'হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরয করলেন? স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে দিলেন না কেন?' তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় যে, দুনিয়ার সুখ ভোগ খুবই অস্থায়ী এবং জান্নাতের তুলনায় খুবই নগণ্যও বটে। আর আখিরাত আল্লাহ ভীরুদের জন্য দুনিয়া হতে বহুগুণ উত্তম ও পবিত্র।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহূদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে উত্তরে বলা হয়–'আল্লাহভীরুদের পরিণাম সূচনা হতে বহুগুণে

উত্তম। তোমাদেরকে তোমাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের একটি সৎ আমলও বিনষ্ট হবে না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কারও উপর এক চুল পরিমাণও অত্যাচার হওয়া অসম্ভব। এ বাক্যে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ উৎপাদন করে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে জিহাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, হযরত হাসান বসরী (রঃ) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ-এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর সদয় হোন যে দুনিয়ায় এভাবেই থাকে। দুনিয়ার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ রকমই অবস্থা যেমন একজন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখতে পায় কিন্তু চক্ষু খোলা মাত্রই জানতে পারে যে, মূলে কিছুই ছিল না। হযরত আবূ মুসহির (রঃ)-এর নিম্নের কবিতাংশটি কতই না সুন্দরঃ

وَلَاخَيْرَ فِى الدُّنْيَا لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ * لَهٗ مِنَ اللّٰهِ فِىْ دَارِ الْمَقَامِ نَصِيْبُ

فَاِنْ تَعْجَبِ الدُّنْيَا رِجَالًا فَاِنَّهَا * مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَّالزَّوَالُ قَرِيْبُ

অর্থাৎ দুনিয়ায় ঐ ব্যক্তির জন্য কোনই মঙ্গল নেই, যার জন্যে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনই অংশ নেই, যদিও দুনিয়া কতক লোককে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে, কিন্তু এটা খুব অল্পই সুখ এবং এর ধ্বংস খুব নিকটবর্তী।

এরপর বলা হচ্ছে–'তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।' কোন মধ্যস্থতা কাউকেও এটা হতে বাঁচাতে পারবে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ-

অর্থাৎ 'এর উপর যত কিছু রয়েছে সবই ধ্বংসশীল।'(৫৫ঃ ২৬) আর এক আয়াতে আছেঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ-

আর্থাৎ 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী'। (৩ঃ ১৮৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ-

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়ী জীবন নির্ধারণ করিনি।'(২১ঃ ৩৪) এগুলো বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জিহাদ করুক আর

নাই করুক একমাত্র আল্লাহ পাকের সত্তা ছাড়া সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থানও নির্দিষ্ট রয়েছে।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) স্বীয় মরণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি বহু বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতঃ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি। তোমরা এসে দেখ যে, আমার শরীরের এমন কোন অঙ্গ নেই যেখানে বল্লম, বর্শা, তীর, তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিল না বলে আজ তোমরা দেখ যে আমি গৃহ শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। সুতরাং কাপুরুষের দল আমার জীবন হতে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন– মৃত্যুর থাবা হতে উচ্চতম, সুদৃঢ় এবং সংরক্ষিত দুর্গ ও অট্টালিকাও রক্ষা করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেন যে, بُرُوْجٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আকাশের বুরুজ। কিন্তু এটা দুর্বল উক্তি। সঠিক কথা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সুরক্ষিত প্রাসাদাসমূহ। অর্থাৎ মৃত্যু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন ওটা নির্ধারিত সময়েই আসবে, একটুও আগে পিছে হবে না। যুহাইর ইবনে আবি সালমা বলেনঃ

وَمَنْ هَابَ اَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ * وَلَوْ رَامَ اَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمٍ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর কারণে পলায়ন করে তাকে মৃত্যু পেয়ে বসবেই, যদিও সে সোপানের সাহায্যে আকাশ মার্গেও আরোহণ করে।'

مُشَيَّدَةٌ শব্দটিকে কেউ কেউ 'তাশদীদ' সহ বলেছেন এবং কেউ কেউ 'তাশদীদ' ছাড়াই বলেছেন। দু'টোরই একই অর্থ। কিন্তু কারও কারও মতে আবার এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মুশাইয়্যাদাহ্ পড়লে অর্থ হবে সুদীর্ঘ এবং মুশায়াদাহ পড়লে অর্থ হবে চুন দ্বারা সুশোভিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীর-ই-ইবনে জারীর এবং মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে একটি সুদীর্ঘ গল্প হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, পূর্ব যুগে একটি স্ত্রীলোক গর্ভবতী ছিল। তার প্রসব বেদনা উঠে এবং সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। সে তখন তার পরিচারককে বলে, 'যাও কোন জায়গা হতে আগুন নিয়ে এসো'। পরিচারক বাইরে গিয়ে দেখে যে, দরজার উপর একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটি পরিচারককে জিজ্ঞেস করে, 'স্ত্রী লোকটি কি সন্তান প্রসব করেছেন?' সে বলে, 'কন্যা সন্তান।'

লোকটি তখন বলে, 'জেনে রেখ যে, এ মেয়েটি একশ জন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করবে এবং এখন স্ত্রীলোকটির যে পরিচারক রয়েছে শেষে তার সাথে এ মেয়েটির বিয়ে হবে। আর একটি মাকড়সা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

এ কথা শুনে চাকরটি সেখান হতে ফিরে যায় এবং ঐ মেয়েটির পেট ফেড়ে দেয়। অতঃপর তাকে মৃতা মনে করে তথা হতে পলায়ন করে। এ অবস্থা দেখে তার মা তার পেট সেলাই করে দেয় এবং চিকিৎসা করতে আরম্ভ করে। অবশেষে মেয়েটির ক্ষতস্থান ভাল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক যুগ অতিবাহিত হয়। মেয়েটি যৌবনে পদার্পণ করে। সে খুব সুন্দরী ছিল।

তখন সে ব্যভিচারের কাজ শুরু করে দেয়। আর ওদিকে ঐ চাকরটি সমুদ্র পথে পালিয়ে গিয়ে কাজ-কাম আরম্ভ করে দেয় এবং বহু অর্থ উপার্জন করে। দীর্ঘদিন পর প্রচুর ধন-সম্পদসহ সে তার সেই গ্রামে ফিরে আসে। তারপর সে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ডেকে পাঠিয়ে বলেঃ 'আমি বিয়ে করতে চাই। এ গ্রামের যে খুব সুশ্রী মেয়ে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও।'

বৃদ্ধা তথা হতে বিদায় নেয়। ঐ গ্রামের ঐ মেয়েটি অপেক্ষা সুশ্রী মেয়ে আর একটিও ছিল না বলে সে তাকেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং বিয়ে হয়ে যায়। সে সব কিছু ত্যাগ করে লোকটির নিকট চলেও আসে। তার ঐ স্বামীকে জিজ্ঞেস করেঃ 'আচ্ছা বলুনতো, আপনি কে? কোথা হতে এসেছেন এবং কিভাবেই বা এখানে এসেছেন?' লোকটি তখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বলেঃ 'এখানে আমি একটি স্ত্রীলোকের পরিচারক ছিলাম। তার মেয়ের সঙ্গে এরূপ কাজ করে এখান হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বহু বছর পরে এসেছি।'

তখন মেয়েটি বলে, 'যে মেয়েটির পেট ফেড়ে আপনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমি সেই মেয়ে।' এ বলে সে তাকে তার ক্ষত স্থানের দাগও দেখিয়ে দেয়। তখন লোকটির বিশ্বাস হয়ে যায় এবং মেয়েটিকে বলে, 'তুমি যখন ঐ মেয়ে তখন তোমার সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা জানা আছে। তা এই যে, তুমি আমার পূর্বে একশ জন লোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছো।' মেয়েটি তখন বলে, 'কথা তো ঠিকই, কিন্তু আমার গণনা মনে নেই।'

লোকটি বলে 'তোমার সম্বন্ধে আমার আরও একটি কথা জানা আছে। তা এই যে, একটি মাকড়সা তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। যা হোক, তোমার প্রতি

আমার খুবই ভালবাসা রয়েছে। কাজেই আমি তোমাকে একটি সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করে দিচ্ছি। তুমি সেখানে অবস্থান করবে। তাহলে সেখানে কোন পোকা-মাকড়ও প্রবেশ করতে পারবে না'।

সে তাই করে। মেয়েটির জন্যে এরূপই একটি প্রাসাদ নির্মিত হয় এবং সে সেখানেই বাস করতে থাকে, কিছুদিন পর একদা তারা স্বামী-স্ত্রী ঐ প্রাসাদের মধ্যে বসে রয়েছে, এমন সময় হঠাৎ ছাদের উপর একটি মাকড়সা দেখা যায়। ঐ লোক তখন তার স্ত্রীকে বলে, 'দেখ, আজ এখানে মাকড়সা দেখা গেছে'। ওটা দেখা মাত্রই মেয়েটি বলে, 'আচ্ছা, এটা আমার প্রাণ নেয় নেবেই কিন্তু আমিই এর প্রাণ নেব।'

অতঃপর সে চাকরকে বলেঃ 'মাকড়সাটিকে আমার নিকট জ্যান্ত ধরে আন।' চারকটি ধরে আনে। সে তখন মাকড়সাটিকে স্বীয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দলিত করে। ফলে মাকড়সাটির প্রাণ বায়ু নির্গত হয়। ওর দেহের যে রস্ বের হয় ওরই এক আধ ফোঁটা তার বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ ও মাংসের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। ফলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং পা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তাতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে যায়।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপর বিদ্রোহীগণ যখন আক্রমণ চালায় তখন তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করুন।' অতঃপর তিনি নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করেনঃ

أَرَى الْمَوْتَ لَا يُبْقِي عَزِيزًا وَلَمْ يَدَعْ * لِعَادٍ مَلَاذًا فِي الْبِلَادِ وَمَرْبَعًا
يُبَيِّتُ أَهْلَ الْحِصْنِ وَالْحِصْنُ مُغْلَقٌ * وَيَأْتِي الْجِبَالَ فِي شَمَارِيخِهَا مَعًا

হায্‌রের বাদশাহ সাতেরূনকে পারস্য সম্রাট সাবূর যুল আলতাফ যে হত্যা করেছিল সে ঘটনাটিও আমরা এখানে বর্ণনা করছি। ইবনে হিশাম বলেছেন যে, সাবূর যখন ইরাকে অবস্থান করছিল সে সময় তার এলাকার উপর সাতেরূন আক্রমণ চালিয়েছিল। এর প্রতিশোধ স্বরূপ সাবূর যখন তার উপর আক্রমণ চালায় তখন সে দুর্গের দরজা বন্ধ করে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। দু'বছর পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয় কিন্তু কোনক্রমেই দুর্গ বিজিত হয় না।

একদা সাতেরূনের নাযীরা নাম্নী এক কন্যা তার পিতার দুর্গে টহল দিচ্ছিল। এমন সময় সাবূরের উপর তার দৃষ্টি যায়। সে সময় সাবূর শাহী রেশমী পোশাক পরিহিত ছিল এবং তার মস্তকে ছিল রাজমুকুট। নাযীরা মনে মনে বলে—তোর

সাথে আমার বিয়ে হলে কতইনা উত্তম হতো! সুতরাং গোপনে তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে আরম্ভ করে এবং সাবূর ওয়াদা করে যে, যদি এ মেয়েটি তাকে দুর্গ দখল করিয়ে দিতে পারে তবে সে তাকে বিয়ে করবে।

সাতেরূন ছিল বড়ই মদ্যপায়ী। সারারাত তার মদ্যের নেশাতেই কেটে যেতো। মেয়েটি এ সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে। রাতে স্বীয় পিতাকে মদমত্ত অবস্থায় দেখে চুপে চুপে তার শিয়র হতে দুর্গের দরজার চাবিটি বের করে নেয় এবং তার নির্ভরযোগ্য ক্রীতদাসের মাধ্যমে সাবূরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। সাবূর তখন ঐ চাবি দিয়ে দুর্গের দরজা খুলে দেয় এবং ভেতরে প্রবেশ করে সাধারণভাবে হত্যাকার্য চালিয়ে যায়।

অবশেষে দুর্গ তার দখলে এসে যায়। এও বলা হয়েছে যে, ঐ দুর্গে একটি যাদুযুক্ত জিনিস ছিল। ওটা ভাঙ্গতে না পারলে এ দুর্গ জয় করা সম্ভব ছিল না। ঐ মেয়েটিই ওটা ভাঙ্গবার পদ্ধতি বলে দেয় যে, একটি সাদাকালো মিশ্রিত রঙের কবুতর এনে তার পা কোন কুমারী মেয়ের প্রথম ঋতুর রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করতে হবে, তারপর কবুতরটিকে ছেড়ে দিলেই ওটা উড়ে গিয়ে ঐ দুর্গের দেয়ালে বসবে। আর তেমনি যাদুযুক্ত জিনিসটি পড়ে যাবে এবং দুর্গের সিংহদ্বার খুলে যাবে।

অতএব সাবূর তাই করে এবং দুর্গ জয় করতঃ সাতেরূনকে হত্যা করে। অতঃপর সমস্ত লোককে তরবারীর নীচে নিক্ষেপ করে এবং সারা শহর ধ্বংস করে দেয়। তারপর সাতেরূনের কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় রাজ্যে ফিরে আসে এবং তাকে বিয়ে করে নেয়। একদা রাত্রে মেয়েটি স্বীয় শয্যায় শুয়ে আছে কিন্তু তার ঘুম আসছে না। সে অস্থিরতা প্রকাশ করছে। তার এ অবস্থা দেখে সাবূর তাকে জিজ্ঞেস করেঃ 'ব্যাপার কি?' সে বলে, 'সম্ভবতঃ বিছানায় কিছু রয়েছে যে কারণে আমার ঘুমে ধরছে না।' প্রদীপ জ্বালিয়ে বিছানায় অনুসন্ধান চালানো হলো। অবশেষে তৃণ জাতীয় গাছের ছোট একটি পাতা পাওয়া গেল।

তার এ চরম বিলাসিতা দেখে সাবূর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো যে, ছোট একটি পাতা বিছানায় থাকার কারণে তার ঘুম আসছে না! তাই তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার পিতার নিকট তোমার জন্যে কি কি থাকতো'? সে বললোঃ 'আমার জন্যে থাকতো নরম রেশমের বিছানা এবং পাতলা নরম রেশমের পোশাক। আর আমি আহার করতাম পায়ের অস্থির মজ্জা এবং পান করতাম

খাঁটি সুরা। এ ব্যবস্থাই আমার আব্বা আমার জন্যে রেখেছিলেন।' মেয়েটি এরূপ ছিল যে, বাহির হতে তার পায়ের গোছার (গোড়ালির) মজ্জা পর্যন্তও দেখা যেতো।

একথাগুলো সাবূরের মনে অন্য এক উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং মেয়েটিকে বলেঃ 'যে পিতা তোমাকে এভাবে লালন পালন করেছে, তুমি তোমার সে পিতার সাথে এ ব্যবহার করেছো যে, আমার দ্বারা তাকে হত্যা করিয়েছো এবং তার রাজ্যকে ছারখার করিয়েছো। কাজেই আমার সঙ্গেও যে তুমি এরূপ ব্যবহার করবে না তা আমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি'? তৎক্ষণাৎ সে নির্দেশ দেয় যে, তার চুলকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ঘোড়াকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হোক। তাই করা হয়। ঘোড়া নাচতে লাফাতে আরম্ভ করে এবং এভাবে তাকে এ নশ্বর জগৎ হতে চির বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

আল্লাহপাক বলেন–যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যদি তারা খাদ্যশস্য, ফল, সন্তানাদি ইত্যাদি লাভ করে তবে তারা বলে–'এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসেছে।' আর যদি তাদের উপর কোন অমঙ্গল নিপতিত হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, মাল ও সন্তানের স্বল্পতা এবং ক্ষেত্র ও বাগানের ক্ষতি ইত্যাদি পৌঁছে যায় তখন তারা বলে–'হে নবী (সঃ)! এটা আপনার কারণেই হয়েছে।' অর্থাৎ এটা নবী (সঃ)-এর অনুসরণ এবং মুসলমান হওয়ার কারণেই হয়েছে। ফিরাউনের অনুসারীরাও অমঙ্গলের বেলায় হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কু-লক্ষণ বলে অভিহিত করতো। যেমন কুরআন কারীমের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهٖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ -

অর্থাৎ 'যখন তাদের নিকট কোন মঙ্গল পৌঁছে তখন তারা বলে– এটা আমাদের জন্যই হয়েছে এবং যখন তাদের নিকট কোন অমঙ্গল পৌঁছে তখন তারা মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে কুলক্ষণে বলে থাকে।'(৭ ঃ ১৩১)

আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ

অর্থাৎ 'কতক লোক এমন রয়েছে যারা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত **করে থাকে**।'(২২ঃ ১১) অতএব এখানেও এ মুনাফিকরা যারা বাহ্যিক মুসলমান

কিন্তু অন্তরে ইসলামকে ঘৃণা করে তাদের নিকট যখন কোন অমঙ্গল পৌঁছে তখন তারা ঝট করে বলে ফেলে যে, এ ক্ষতি ইসলাম গ্রহণের কারণেই হয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে حَسَنَةٌ শব্দের ভাবার্থ বৃষ্টিপাত হওয়া, গৃহপালিত পশুর আধিক্য হওয়া, ছেলেমেয়ে বেশী হওয়া এবং স্বচ্ছলতা আসা। এসব হলে তারা বলতো-'এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতেই হয়েছে।' আর যদি এর বিপরীত হতো তবে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কেই এ জন্যে দায়ী করতো এবং তাঁকে বলতো-'এটা আপনার কারণেই হয়েছে।' অর্থাৎ আমরা আমাদের বড়দের আনুগত্য ছেড়ে এ নবী (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করেছি বলেই আমরা এ বিপদে পড়েছি।

তাই আল্লাহ্ পাক তাদের এ অপবিত্র কথা ও জঘন্য বিশ্বাসের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন-'সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তাঁর ফায়সালা ও ভাগ্যলিখন প্রত্যেক ভাল-মন্দ, ফাসিক, ফাজির, মুমিন এবং কাফির সবারই উপরেই জারী রয়েছে। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।'

অতঃপর তিনি তাদের সে উক্তি খণ্ডন করছেন যা তারা শুধুমাত্র সন্দেহ, অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং অত্যাচারের বশবর্তী হয়েই বলে থাকে। তিনি বলেন- তাদের কি হয়েছে যে, কোন কথা বুঝবার যোগ্যতা তাদের মধ্য হতে লোপ পাচ্ছে? كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ সম্পর্কে যে একটি গারীব হাদীস রয়েছে তারও এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

'মুসনাদ-ই-বায্যাযে' হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন- তাঁর দাদা বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় কতগুলো লোককে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ) আগমন করেন। তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁরা দু'জন বসে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ 'উচ্চৈঃস্বরে কিসের আলোচনা চলছিল?' এক ব্যক্তি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলছিলেন যে, পুণ্য এবং মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হয়ে থাকে এবং মন্দ ও অমঙ্গল আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কি বলছিলে'? হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি বলছিলাম যে, দু'টোই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'এ তর্ক

প্রথম প্রথম হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাইল (আঃ)-এর মধ্যেও হয়েছিল। হযরত মিকাঈল (আঃ) ঐ কথাই বলেছিলেন যা হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলছিল এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) ঐ কথাই বলেছিলেন যা তুমি (হযরত উমার রাঃ) বলছিলে। তাহলে আকাশবাসীদের মধ্যে যখন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তখন পৃথিবীবাসীদের মধ্যে এটা হওয়া তো স্বাভাবিক'।

অতঃপর ইসরাফীল (আঃ)-এর উপর এর মীমাংসার ভার পড়ে যায়। তিনি মীমাংসা করেন যে, ভাল ও মন্দ দু'টোই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই হয়ে থাকে।' অতঃপর তিনি তাঁদের দু'জনকে সম্বোধন করে বলেনঃ 'তোমরা আমার সিদ্ধান্ত শুনে নাও এবং স্মরণ রেখো আল্লাহ তা'আলা যদি স্বীয় অবাধ্যাচরণ না চাইতেন তবে তিনি ইবলিশকে সৃষ্টি করতেন না।'

কিন্তু শায়খুল ইসলাম ইমাম তাকিয়ুদ্দীন আবূ আব্বাস হযরত ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি মাওযূ' এবং যেসব মুহাদ্দিস হাদীস পরীক্ষা করে থাকেন তাঁরা সবাই একমত যে, এ হাদীসটি তৈরী করে নেয়া হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ অতঃপর এ সম্বোধন সাধারণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকলকেই সম্বোধন করে বলছেন– 'তোমাদের নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা। আর তোমাদের উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমাদের স্বীয় কর্মেরই প্রতিফল।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ -

অর্থাৎ তোমাদের উপর যে বিপদ পৌঁছে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তারই কিছুটা প্রতিফল এবং তিনি তোমাদের অধিকাংশ পাপই ক্ষমা করে দেন। (৪২ঃ ৩০) এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'তোমার পাপের কারণে'। অর্থাৎ কার্যেরই প্রতিফল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তির শরীরের সামান্য ছাল উঠে যায় বা তার পদস্খলন ঘটে কিংবা তাকে কিছু কাজ করতে হয়, ফলে শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়, ওটাও কোন না কোন পাপের কারণেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা যে পাপগুলো দেখেও দেখেন না এবং ক্ষমা করে থাকেন সেগুলো তো অনেক রয়েছে।" এ মুরসাল হাদীসটির বিষয়বস্তু একটি মুত্তাসিল সহীহ হাদীসেও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মুমিনকে যে দুঃখকষ্ট পৌঁছে, এমনকি তার পায়ে যে কাঁটা ফুটে সে কারণেও আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করে থাকেন।' হযরত আবূ সালিহ (রঃ) বলেন- وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ -এর ভাবার্থ এই যে, যে অমঙ্গল তোমার উপর নিপতিত হয় তার কারণ হচ্ছে তোমার পাপ। হ্যাঁ, তবে ওটাও ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলাই লিখেছেন।

হযরত মুতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, তোমরা তকদীর সম্বন্ধে কি জিজ্ঞেস করছো? তোমাদের জন্যে কি সূরা-ই-নিসার-

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ط

-এ আয়াতটি যথেষ্ট নয়? আল্লাহর শপথ! মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পণ করা হয়নি বরং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাঁরই নিকট তারা ফিরে যাবে। এ উক্তিটি খুবই দৃঢ় ও মজবুত এবং এটা কাদরিয়্যাহ্ এবং জাবরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের উক্তিকে চরমভাবে খণ্ডন করেছে। এ তর্ক-বিতর্কের জায়গা তাফসীর নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'হে নবী (সঃ)! তোমার কাজ হচ্ছে শুধু শরীয়তকে প্রচার করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কাজকে, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরই সাক্ষ্য এ ব্যাপারেও যথেষ্ট যে, তুমি প্রচারকার্য চালিয়েছো। তোমার ও তাদের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তিনি সব কিছুই দেখছেন। তারা তোমার সাথে যে অবাধ্যাচরণ ও অহংকার করছে তাও তিনি দেখতে রয়েছেন।

৮০। যে কেউ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে; এবং যে ফিরে যায় আমি তার জন্যে তোমাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি।

٨٠- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط ○

٨١- وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৮১। আর তারা বলে– আমরা অনুগত; কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল– তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি বিমুখ হও ও আল্লাহর উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে– 'আমার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর যে অনুগত প্রকারান্তরে সে আমারই অনুগত। তার যে অবাধ্য সে আমারই অবাধ্য। কেননা, আমরা নবী (সঃ) নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলে না। আমার পক্ষ হতে তার উপর যে অহী করা হয় তাই সে বলে থাকে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আমাকে যে মানে সে আল্লাহ্কে মানে এবং যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহ্কে অমান্য করে। আর যে আমীরের অনুগত হয় সে আমারই অনুগত হয় এবং যে আমীরের অবাধ্য হয় সে আমারই অবাধ্য হয়'। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে নবী (সঃ)! তার পাপ তোমার উপর নেই। তোমার কাজ তো শুধুমাত্র পৌঁছিয়ে দেয়া। ভাগ্যবান ব্যক্তি মেনে নেবে এবং মুক্তি ও পুণ্য লাভ করবে। তবে তাদের ভাল কাজের পুণ্য তুমিও লাভ করবে। কেননা, তার পথপ্রদর্শক তো তুমিই এবং তার সৎকার্যের শিক্ষকও তুমিই। আর যে ব্যক্তি মানবে না সে হতভাগা। সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে।

তাদের পাপ তোমার উপর হবে না। কেননা, তুমি বুঝাতে ও সত্যপথ প্রদর্শনে কোন প্রকার ত্রুটি করনি। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত ব্যক্তি সুপথ প্রাপ্ত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অবাধ্য ব্যক্তি নিজের জীবনেরই ক্ষতি সাধনকারী।

এরপর মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বাহ্যিকভাবে তো আনুগত্য স্বীকার করছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করছে কিন্তু যখনই দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে, এখান হতে চলে গিয়ে নিজের জায়গায় পৌঁছে তখন এমন হয়ে যায় যে, তাদের রূপ যেন এরূপ ছিলই না। এখানে যা কিছু বলেছিল, রাত্রে গোপনে গোপনে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পরামর্শ করতে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ গোপন ষড়যন্ত্র সবই জানেন। তাঁর নির্ধারিত ফেরেশতাগণ তাদের এ কার্যাবলী এবং এসব কথা তাঁর নির্দেশক্রমে তাদের আমলনামায় লিখে নিচ্ছেন।

সুতরাং তাদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে যে, তাদের এ চাল-চলন কতই না জঘন্য। তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট তোমাদের ঐ সব কাজ গুপ্ত নেই। তোমরা তোমাদের ভেতর ও বাহির যখন এক রাখতে পারছো না তখন তোমাদের ভেতর ও বাহিরের সমস্ত সংবাদ যিনি রাখেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ নিকৃষ্ট কাজের জন্যে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

وَ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَ اَطَعْنَا

অর্থাৎ 'তারা বলে– আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছি ও আনুগত্য স্বীকার করেছি।'(২৪ঃ ৪৭)

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ) কে নির্দেশ দিচ্ছেন– তুমি তাদের প্রতি বিমুখ হও; ধৈর্য অবলম্বন কর, তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের অবস্থা তাদের নাম করে করে তাদেরকে বলো না। তুমি তাদের হতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় থাকো। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর। যে ব্যক্তি তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান।

৮২। তারা কেন কুরআনের প্রতি মনঃসংযোগ করে না? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হতো তবে তারা ওতে বহু মতানৈক্য প্রাপ্ত হতো।

٨٢- اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○

৮৩। আর যখন তাদের নিকট কোন শান্তি বা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের ও তাদের আদেশদাতাদের প্রতি সমর্পণ করতো তবে তাদের মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ওটা উপলব্ধি করতো, এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তবে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুগমন করতে।

٨٣- وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে,তারা যেন কুরআন কারীমকে চিন্তা ও গবেষণা সহকারে পাঠ করে। ওটা হতে যেন তারা বিমুখ না হয়, অবজ্ঞা না করে। ওর মজবুত রচনা, নৈপুণ্য পূর্ণ নির্দেশাবলী এবং বাকচাতুর্য সম্বন্ধে যেন চিন্তা করে। সাথে সাথে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, এ পবিত্র গ্রন্থটি মতভেদ ও মতানৈক্য হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা, এটা মহা বিজ্ঞানময় ও চরম প্রশংসিত আল্লাহরই বাণী। তিনি নিজে সত্য এবং তদ্রূপ তাঁর কালামও সম্পূর্ণ সত্য। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

অর্থাৎ 'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ রয়েছে?' (৪৭ ঃ ২৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—'মুশরিক ও মুনাফিকদের ধারণা হিসেবে এ কুরআন যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত না হতো এবং কারও মনগড়া কথা হতো তবে অবশ্যই মানুষ ওর মধ্যে বহু মতভেদ লক্ষ্য করতো।' অর্থাৎ মানুষের কথা বৈপরীত্যশূন্য হওয়া অসম্ভব। এটা অবশ্যই হতো যে, এখানে কিছু পেতো ওখানে কিছু পেতো, হয়তো এক জায়গায় ওরই বিপরীত

কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থের এসব ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া এরই পরিষ্কার দলীল যে, এটা আল্লাহ্ পাকেরই বাণী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানে পরিপক্ক আলেমদের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে, আমরা এগুলোর উপর ঈমান এনেছি, এগুলো সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত। অর্থাৎ স্পষ্ট আয়াত ও অস্পষ্ট আয়াত সবই সত্য। এ জন্যই তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলোকে স্পষ্ট আয়াতগুলোর দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা স্পষ্ট আয়াতগুলো অস্পষ্ট আয়াতগুলোর দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম প্রকারের লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের নিন্দে করেছেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর দাদা বলেনঃ আমি এবং আমার ভাই এমন এক সমাবেশে বসেছিলাম যা আমার নিকট এত প্রিয় ছিল যে, আমি একটি লাল বর্ণের উট পেলেও এ মজলিসের তুলনায় ওটাকে নগণ্য মনে করতাম। আমরা এসে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরজার উপর কয়েকজন মর্যাদাবান সাহাবী (রাঃ) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরা ভদ্রতা রক্ষা করে এক দিকে বসে পড়ি। তথায় কুরআন মাজীদের কোন আয়াত নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। অবশেষে কথা বেড়ে যায় এবং তাঁরা পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা শুনতে পেয়ে কুপিত অবস্থায় বাইরে আগমন করেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। তাঁদের উপর মাটি নিক্ষেপ করতঃ বলেনঃ 'তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নবীদের উপর মতানৈক্য আনয়ন করেছিল এবং আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত বলেছিল। জেনে রেখো যে, কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অপর আয়াতের সত্যতা প্রতিপাদন করে। তোমরা যেটা জান তার উপর আমল কর এবং যেটা জাননা সেটা যারা জানে তাদের উপর ছেড়ে দাও।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সাহাবা-ই-কিরাম তাকদীর সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ 'যদি আমি এ সমাবেশে না বসতাম!' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি দুপুরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারের উপস্থিত হই। আমি বসে রয়েছি এমন সময় দু'টি লোকের মধ্যে

একটি আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ধ্বংসের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহ তা'আলার কিতাবে তাদের মতভেদ সৃষ্টি করা'। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

এরপর ঐ তাড়াহুড়োকারীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে যারা কোন নিরাপত্তা বা ভয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সত্যাসত্য যাচাই না করেই এদিক হতে ওদিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। অথচ ওটা সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফের ভূমিকায় হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মানুষকে মিথ্যাবাদী বলার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে।' সুনান-ই-আবু দাউদের মধ্যেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) قِيْلَ ও قَالَ হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ অর্থাৎ 'লোকেরা যেসব কথা বলে থাকে এরূপ বহু কথা সত্যাসত্য যাচাই ও চিন্তা ভাবনা না করেই যে ব্যক্তি বর্ণনা করে থাকে।'

সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন কথা বর্ণনা করে এবং সে ধারণা করে যে, ওটা যথার্থ নয় সেও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী।' এখানে আমরা হযরত উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করছি যার বিশুদ্ধতার উপর মতৈক্য রয়েছে। যখন তিনি শুনেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় বাড়ী হতে বের হয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন। এখানেও তিনি জনগণকে একথাই বলতে শুনেন। সুতরাং স্বয়ং তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন?' তিনি বলেনঃ 'না।' তখন তিনি–'আল্লাহু আকবার' পাঠ করেন। হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, অতঃপর তিনি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পত্নীগণকে তালাক দেননি।'সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত উমার (রাঃ) এ ব্যাপারে তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং তিনি তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে একজন। কোন জিনিসকে ওর ঠিকানা ও আগার হতে বের করাকে استنباط বলা

হয়। যখন লোক খনি খনন করে ওর মধ্যে হতে কোন জিনিস বের করে তখন আরববাসীরা اِسْتَنْبَطَ الرَّجُلُ এ কথা বলে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তবে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ মুমিন ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসারী হয়ে যেতে।' এরূপ স্থলে এ অর্থও হয় যে, তোমরা সবাই শয়তানের অনুসারী হয়ে যেতে। আরবী কবিতাতেও এ অর্থের ব্যবহার দেখা যায়।

٨٤- فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ○

৮৪। অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধকর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কোন ভার অর্পণ করা হয়নি এবং বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর; অচিরেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন; এবং আল্লাহ সংগ্রামে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর।

٨٥- مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

৮৫। যে কেউ সৎ সুপারিশ করবে সে ওর দরুন অংশ পাবে এবং যে কেউ অসৎ সুপারিশ করবে সে ওর দরুন অংশ প্রাপ্ত হবে; এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিদাতা।

٨٦- وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ○

৮৬। আর যখন তোমরা শুভাশিষে সম্ভাষিত হও, তবে তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

৮৭। আল্লাহ– তিনি ব্যতীত কেউ মা'বূদ নেই; নিশ্চয়ই এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন; এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশী সত্যপরায়ণ!

٨٧- اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۟

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে তিনি যেন, নিজেই আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধ করেন, যদিও কেউ তাঁর সাথে যোগ না দেয়। হযরত আবূ ইসহাক (রঃ) হযরত বারা' ইবনে আযিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'যদি কোন মুসলমান একাই থাকে এবং শত্রুরা একশ জন হয় তবে কি মুসলমানটি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে?' তিনি বলেনঃ হ্যাঁ।

তখন হযরত আবূ ইসহাক (রঃ) বলেনঃ কিন্তু কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াত দ্বারা এর নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ো না।' (২ঃ১৯৫) হযরত বারা' (রাঃ) তখন বলেনঃ শুন, আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 'তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কোন ভার অর্পণ করা হয়নি এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর'। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম)

মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যে এটুকু বেশীও রয়েছে, মুশরিকদের উপর একাই আক্রমণকারী নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপকারী নয়, বরং এর ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে খরচ করা হতে নিজের হাতকে বাধাদানকারী। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ)-কে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং তোমরাও জিহাদ কর।" এ হাদীসটি দুর্বল।

এরপর বলা হচ্ছে–মুমিনদের মধ্যে সাহস জাগিয়ে তোল এবং তাদেরকে জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ কর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যূহ ঠিক করতে করতে বলেনঃ "তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাও যার প্রস্থ হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান।" জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করার বহু হাদীস রয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দেয় এবং রমযানের রোযা রাখে, আল্লাহর উপর (তার) এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, সে আল্লাহর পথে হিজরতই করুক বা স্বীয় জন্মভূমিতে বসেই থাকুক।' তখন সাহাবীগণ বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। আমরা লোকদেরকে কি এ শুভ সংবাদ শুনিয়ে দেবো না?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'জেনে রেখো, জান্নাতে একশটি সোপান রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে এক একটি সোপানের উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান। এ সোপানগুলো আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। অতএব তোমরা জান্নাত যাঞ্চা করলে ফিরদাউস জান্নাত যাঞ্চা করো। ওটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওর উপরই রহমানের আরশ রয়েছে এবং ওটা হতেই জান্নাতের নদীগুলো প্রবাহিত হয়।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে ধর্মরূপে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-কে রাসূল ও নবীরূপে মেনে নিতে সম্মত হয়েছে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব।' এতে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বিস্মিত হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর পুনরাবৃত্তি করুন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় ওটা বর্ণনা করে বলেনঃ 'আর একটি আমল রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার দরজা একশগুণ উঁচু করে দেন। এক দরজা হতে অন্য দরজার উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান।' তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ আমলটি কি?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যখন তুমি জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন মুসলমানেরাও তোমার শিক্ষার কারণে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হবে এবং আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সঙ্গেই থাকবে। সত্বরই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন, তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে।

কাজেই তারা তোমাদের মোকাবিলায় আসতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা সংগ্রামে সুদৃঢ় এবং তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানকারী। তিনি এর উপর সক্ষম যে, দুনিয়াতেও তাদেরকে পরাজিত করবেন ও শাস্তি দেবেন এবং অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাঁরই হাতে ক্ষমতা থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

অর্থাৎ 'তিনি ইচ্ছে করলে স্বয়ং তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ নিতে পারেন কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরস্পর পরীক্ষা করছেন।' (৪৭ ঃ ৪)

এরপর বলা হচ্ছে– 'যে কেউ উত্তম সুপারিশ করবে সে ওটা হতে অংশপ্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ নিকৃষ্ট সুপারিশ করবে সেও ওটা হতে অংশ পাবে'। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে নবী (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা চাইবেন স্বীয় নবী (সঃ)-এর ভাষায় তা জারী করবেন।' এ আয়াতটি একে অপরের সুপারিশ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলার এত দয়ালু যে, শুধু সুপারিশ করলেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। সে সুপারিশে কাজ হোক আর নাই হোক। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের রক্ষক এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর বিদ্যমান। তিনি প্রত্যেকের হিসেব গ্রহণকারী। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। প্রত্যেকের তিনি আহার দাতা এবং প্রত্যেক মানুষের কার্যাবলীর পরিমাণ গ্রহণকারী।

এরপর বলা হচ্ছে–'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম করে, তখন তোমরা তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্যে তার সালামের উত্তর দাও, অথবা তদ্রূপ শব্দই বলে দাও।' সুতরাং তার অপেক্ষা উত্তম শব্দে উত্তর দেয়া মুসতাহাব এবং তার অনুরূপ শব্দে উত্তর দেয়া ফরয।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হযরত সালামান ফারেসী (রাঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ । উত্তরে তিনি বলেনঃ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ অতঃপর একটি লোক এসে বলে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ । তিনি উত্তরে বলেনঃ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ আবার আর একটি লোক এসে বলে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ তখন তিনি উত্তরে বলেনঃ وَعَلَيْكَ । লোকটি তখন বলেঃ 'হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আপনার উপর আমার বাপ-মা কুরবান হোক, অমুক অমুক

ব্যক্তি আপনার নিকট এসে সালাম করলে আপনি তাদেরকে কিছু অতিরিক্ত শব্দের দ্বারা উত্তর প্রদান করলেন। কিন্তু আমাকে তো সেভাবে উত্তর দিলেন না?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ 'তুমি আমার জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন—"যখন তোমাদের উপর সালাম করা হয় তখন তোমরা তার অপেক্ষা উত্তম বাক্যে উত্তর দাও বা ওটাই ফিরিয়ে দাও।" এ জন্যেই আমি ঐ শব্দগুলোই ফিরিয়ে দিয়েছি।'

এ বর্ণনাটি মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমেও এরূপই মুআল্লাক রূপে বর্ণিত আছে। আবূ বকর ইবনে মিরদুওয়াইও এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি এটা মুসনাদে দেখিনি। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, সালামের বাক্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ-এ শব্দগুলোর চেয়ে বেশী নেই। যদি বেশী থাকতো তবে নবী (সঃ) অবশ্যই এ শেষের সাহাবীর সালামের উত্তরে ওটা বলতেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিয়ে বলেনঃ সে দশটি নেকী পেল; দ্বিতীয় একজন এসে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'সে বিশটি পুণ্য পেলো।' তৃতীয় একজন এসে বলেঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ। তিনি বলেনঃ 'সে ত্রিশটি পুণ্য লাভ করলো।' ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার মাখলুকের মধ্যে যে কেউ সালাম দেবে তাকে উত্তর দিতে হবে যদিও সে মাজুসীও হয়। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সালামের উত্তর উত্তমরূপে দেয়ার বিধান হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে এবং ওটাকেই ফিরিয়ে দেয়ার বিধান হচ্ছে যিম্মীদের জন্যে। কিন্তু এ তাফসীরের ব্যাপারে কিছু চিন্তার বিষয় রয়েছে। যেমন উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'তার সালামের চেয়ে উত্তম উত্তর দেবে এবং যদি মুসলমান সালামের সমস্ত শব্দই বলে দেয় তবে উত্তরদাতাকে ওটাই ফিরিয়ে দিতে হবে।' যিম্মীদেরকে নিজে সালাম দেয়া ঠিক নয়। তবে সে যদি সালাম দেয় হবে তাকে তার শব্দেই উত্তর দিতে হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন কোন ইয়াহূদী সালাম করে তখন খেয়াল রেখো, কেননা, তাদের কেউ اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলে থাকে, তখন তোমরা وَعَلَيْكَ বলবে।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানকে তোমরা প্রথমে সালাম করো না। পথে যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতার দিকে যেতে বাধ্য কর।'

ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, সালাম দেয়া নফল এবং সালামের উত্তর দেয়া ফরয। উলামা-ই-কিরামের উক্তিও এটাই। সুতরাং কেউ যদি উত্তর না দেয় তবে সে পাপী হবে। কেননা, সালামের উত্তর দেয়া হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশ।

সুনান-ই-আবি দাউদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পার না যে পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা স্থাপন না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে দেবো না যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসা স্থাপিত হবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় তাওহীদের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ইবাদতের যোগ্য যে তিনি একাই তা প্রকাশ করছেন। শপথও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এজন্যেই দ্বিতীয় বাক্যকে لَامْ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে যা কসমের জওয়াবে এসে থাকে। অতএব لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিটি হচ্ছে خَبَرْ এবং قَسَمْ যে তিনি পূর্বের ও পরের সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং সকলকেই তাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। আর কথায় আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? অর্থাৎ কেউই নেই। তাঁর সংবাদ, তাঁর অঙ্গীকার এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন সবই সত্য। ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া পালনকর্তা কেউ নেই।

৮৮- فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ
فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا
كَسَبُوْا ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ
اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

৮৮। অনন্তর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দ'দল হলে? এবং তারা যা অর্জন করেছে তজ্জন্যে আল্লাহ তাদেরকে বিবর্তিত করেছেন; আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তোমরা কি তাকে পথ প্রদর্শন করতে চাও? এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্যে কোনই পথ পাবে না।

৮৯- وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا
كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا
تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى
يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص وَلَا تَتَّخِذُوْا
مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○ لا

৮৯। তারা ইচ্ছে করে যে, তারা যেরূপ অবিশ্বাস করেছে, তোমরাও তদ্রূপ অবিশ্বাস কর যেন তোমরাও তাদের সদৃশ হও; অতএব তাদের মধ্য হতে বন্ধু গ্রহণ করো না- যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে; অতঃপর যদি তারা প্রতিগমন করে, তবে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও তাদেরকে সংহার কর; এবং তাদের মধ্য হতে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ করো না।

৯০- اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ
جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ

৯০। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে যারা সম্মিলিত হয়, অথবা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত চিত্ত হয়ে যারা

أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا
قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ
اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ○

তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন তবে তোমাদের উপর তাদেরকে শক্তিশালী করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে সংগ্রাম করতো; অতঃপর যদি তারা তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত হয় এবং তোমাদের সাথে সংগ্রাম না করে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ তাদের প্রতিকূলে তোমাদের জন্যে কোন পন্থা করেননি।

٩١- سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ
أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ
كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ
أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ
لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ
السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ○ ع ١٢

৯১। অচিরেই তুমি এরূপও প্রাপ্ত হবে– যারা তোমাদের দিক হতে শান্তির সাথে ও স্বীয় সম্প্রদায় হতে শান্তির সাথে থাকতে ইচ্ছে করে; যখন তারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন তাতেই নিপতিত হয়; অনন্তর যদি তারা তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে এবং তাদের হস্তসমূহ প্রতিরোধ না করে, তবে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও তাদেরকে সংহার কর; এদেরই জন্যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করেছেন।

মুনাফিকদের কোন ব্যাপারে যে মুসলমানদের দু' প্রকার মত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন উহুদ প্রান্তরে গমন করেন তখন তাঁর সাথে মুনাফিকেরাও ছিল। তারা যুদ্ধের পূর্বেই ফিরে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে কতক মুসলমান বলছিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করে ফেলা উচিত। আবার অন্য কয়েকজন বলছিলেন যে, হত্যা করা হবে না, কেননা তারাও মুমিন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'এটা পবিত্র শহর, এটা নিজেই মালিন্য এমনভাবে দূর করে দেবে যেমনভাবে ভাটি লোহাকে পরিষ্কার করে থাকে'। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) উহুদ যুদ্ধের ঘটনা সম্বন্ধে বলেন যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল তিনশ লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে সাতশ জন রয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মক্কায় এমন কতগুলো লোক ছিল যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করতো। তারা নিজেদের কোন বিশেষ প্রয়োজনে মক্কা হতে বের হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ তাদেরকে কোন বাধা প্রদান করবেন না। কেননা, প্রকাশ্যে তারা কালেমা পড়েছিল।

মদীনার মুসলমানগণ যখন এ সংবাদ জানতে পারেন তখন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেনঃ 'এ কাপুরুষদের সাথে প্রথমে জিহাদ করা হোক। কেননা, এরা আমাদের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষক।' কিন্তু কতক লোক বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! যারা আমাদের মতই কালেমা পড়ে তোমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে। শুধু এ কারণে যে, তারা হিজরত করেনি এবং নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়েনি? আমরা কিভাবে তাদের রক্ত ও মাল হালাল করতে পারি?'

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তাদের এ মতানৈক্য হয়েছিল। তিনি নীরব ছিলেন। সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিম) হযরত সাদ ইবনে মু'আয বলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে যখন অপবাদ দেয়া হয়েছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'কে আছে যে আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করে?' সে সময় আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় ঐ ব্যাপারেই

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ উক্তিটি গারীব। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করেছেন। তাদের হিদায়াতের কোন পথ নেই। তারাতো চায় যে খাঁটি মুসলমানও তাদের মত পথভ্রষ্ট হয়ে যাক।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'তাদের অন্তরে যখন তোমাদের প্রতি এত শত্রুতা রয়েছে তখন তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত তারা হিজরত না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে নিজের মনে করো না। তোমরা এটা মনে করো না যে, তারা তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। বরং তারা নিজেরাই এর যোগ্য যে, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। অতঃপর ওদের মধ্য হতে ঐ লোকদেরকে পৃথক করা হচ্ছে যারা কোন এমন সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে চলে যায় যাদের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে। তখন তাদের হুকুম সন্ধিযুক্ত সম্প্রদায়ের মতই হবে।

সুরাকাহ্ ইবনে মালিক মুদলেজী বলে–বদর ও উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানেরা জয়যুক্ত হয় এবং আশে-পাশের লোকদের মধ্যে ইসলাম ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন আমি জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার গোত্র বানূ মুদলিজের বিরুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করার সংকল্প করেছেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থি হয়ে আরয করি– আমি আপনাকে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তখন জনগণ বলেনঃ 'চুপ কর।' কিন্তু তিনি বলেনঃ 'তাকে বলতে দাও। তুমি কি বলতে চাও, বল।' আমি তখন বলি, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি আমার সম্প্রদায়ের দিকে সেনাবাহিনী পাঠাতে চাচ্ছেন। আমি চাই, আপনি তাদের সাথে এ শর্তে সন্ধি করুন যে, যদি কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর যদি তারা মুসলমান না হয় তবে তাদের উপরও আপনি আক্রমণ করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-এর হাতখানা স্বীয় হাতের মধ্যে নিয়ে বলেনঃ 'তুমি এর সাথে যাও এবং এর কথা অনুসারে তার কওমের সাথে সন্ধি করে এসো।' সুতরাং এ শর্তে সন্ধি হয়ে গেল যে, তারা ধর্মের শত্রুদেরকে কোন প্রকারের সাহায্য করবে না এবং যদি কুরাইশরা মুসলমান হয়ে যায় তবে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা–

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

-এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ এরা চায় যে, তাদের মত তোমরাও কুফরী কর যেন তোমরা সমান হয়ে যাও। সুতরাং তাদের মধ্যে হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এ বর্ণনাটি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যেও রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তখন إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে। সুতরাং যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হবে তারাও তাদের মতই পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। কালামের শব্দের সাথে এরই বেশী সম্পর্ক রয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হুদায়বিয়ার সন্ধি ঘটনায় রয়েছে যে, এরপর যে চাইতো মদীনার মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং চুক্তিপত্রের কারণে নিরাপত্তা লাভ করতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, নিম্নের আয়াতটি এ হুকুমকে রহিত করে দেয়ঃ

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

অর্থাৎ 'যখন হারাম মাসগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর'। (৯ঃ ৫) এরপর অন্য একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় বটে কিন্তু তারা সংকুচিত চিত্ত হয়ে হাযির হয়। তারা না তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, না তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা পছন্দ করে। বরং তারা তৃতীয় পক্ষীয় লোক। তাদেরকে না তোমাদের শত্রু বলা যেতে পরে, না বন্ধু বলা যেতে পারে। সুতরাং এটাও আল্লাহ পাকের একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে তোমাদের উপর শক্তিশালী করেননি। তিনি ইচ্ছে করলে তাদের ক্ষমতা দান করতেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্পৃহা তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতেন। সুতরাং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে তবে তোমাদের জন্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবার অনুমতি নেই।

বদরের যুদ্ধে বানূ হাশিম গোত্রের কতগুলো লোক মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছিল। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্তরে অপছন্দ করেছিল, তারাই ছিল এ প্রকারের লোক। যেমন হযরত আব্বাস (রাঃ)

ইত্যাদি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁকে জীবিত গ্রেফতার করতে বলেছিলেন।

অতঃপর আর একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা বাহ্যতঃ উপরোক্ত দলের মতই কিন্তু তাদের নিয়ত খুবই কুঞ্চিত, তারা মুনাফিক। এ মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম প্রকাশ করতঃ স্বীয় জান ও মাল মুসলমানের হাত হতে রক্ষা করতো আর ওদিকে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের বাতিল মা'বূদের ইবাদত করতো এবং তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করতঃ তাদের সাথেই মিলেমিশে থাকতো যেন তাদের নিকটেও নিরাপদে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল কাফির। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ

অর্থাৎ 'যখন তারা শয়তানদের সন্নিকটে একাকী হয়, তখন বলে-নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি।' (২ঃ ১৪) এখানেও বলা হচ্ছে-যখন তারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন তাতেই নিপতিত হয়। এখানেও فتنة শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শিরক। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ লোকগুলোও মক্কাবাসী ছিল। এখানে এসে তারা রিয়াকারী রূপে ইসলাম গ্রহণ করতো এবং মক্কায় ফিরে গিয়ে মূর্তিপূজা করতো। তাই তাদের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি তারা তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করো না, বরং তাদের সাথে যুদ্ধ কর, বন্দী কর এবং যেখানেই পাও হত্যা কর। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করেছেন।

৯২। কোন মুমিনের উচিত নয় যে, ভ্রম ব্যতীত কোন মুমিনকে হত্যা করে; যে কেউ ভ্রম বশতঃ কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে সে জনৈক মুমিন দাসকে মুক্ত করে দেবে এবং তার আত্মীয়-স্বজনগণকে হত্যা বিনিময় সমর্পণ করবে;

٩٢- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ

إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

কিন্তু হ্যাঁ, তবে যদি ক্ষমা করে দেয়, অনন্তর যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মুমিন হয় তবে জনৈক মুমিন দাসকে মুক্তি দান করবে; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তবে তার স্বজনদেরকে হত্যা বিনিময় অর্পণ করবে এবং জনৈক মুমিন দাসকে মুক্ত করবে; কিন্তু যদি সে ওটা প্রাপ্ত না হয়, তবে আল্লাহর নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্যে একাধিক্রমে দু' মাস রোযা রাখবে; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

٩٣- وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ○

৯৩। আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি জাহান্নাম–তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছেঃ 'কোন মুমিনের উচিত নয় যে, সে তার কোন মুমিন ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ মা'বূদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল, তার

রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কারণে (হত্যা করা বৈধ)। (১) কাউকে হত্যা করা, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করা এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করে দল হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া।' এ তিনটি কাজ কারও দ্বারা সংঘটিত হলে প্রজাদের মধ্যে কারও তাকে হত্যা করার অধিকার নেই বরং এটা হচ্ছে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির অধিকার। এরপরে إِلَّا خَطًأ রয়েছে এবং এটা হচ্ছে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ যেমন নিম্নের কবিতায় রয়েছেঃ

مِنَ الْبِيْضِ لَمْ تَطْعَنْ بَعِيْدًا اَوْ لَمْ تَطَا * عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا رَيْطًا يُرْدُ مُرحَلًا

এ আয়াতের শান-ই-নযূলে একটি উক্তি এই বর্ণিত আছে যে, এটা আবূ জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই আইয়াশ ইবনে আবূ রাবী'আর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁর মাতার নাম আসমা বিনতে মুখরামা। তিনি একটি লোককে হত্যা করেছিলেন। লোকটির নাম ছিল হার্‌স ইবনে ইয়াযীদ আল গামেদী।

ঘটনা এই যে, হযরত আইয়াশ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর ভাই আবূ জেহেলের সঙ্গে হার্‌স ইবনে ইয়াযীদ যোগ দিয়ে তাঁকে শাস্তি প্রদান করে। ফলে তিনি মনে সংকল্প করেন যে, সুযোগ পেলেই হার্‌স ইবনে ইয়াযীদকে হত্যা করবেন। কিছু দিন পর হার্‌সও মুসলমান হয়ে যায় এবং হিজরতও করে। হযরত আইয়াশ (রাঃ) কিন্তু এ খবর জানতেন না। মক্কা বিজয়ের দিন সে তাঁর চোখে পড়ে যায় এবং এখনও সে কুফরীর উপরই রয়েছে এই মনে করে হঠাৎ তার উপর আক্রমণ করতঃ তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য উক্তি এই যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, তিনি একজন কাফিরের উপর তরবারী উঠিয়েছেন এমন সময় সে ঈমানের কালেমা পাঠ করে। কিন্তু হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) তার উপর তরবারী বসিয়েই দেন এবং লোকটি নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে ঘটনাটি বর্ণিত হলে হযরত আবূ দ্দারদা (রাঃ) বলেন, 'সে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কালেমা পড়েছিল।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?' এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসেও রয়েছে কিন্তু সেখানে অন্য সাহাবীর নাম আছে।

অতঃপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করে তবে দু'টো জিনিস ওয়াজিব হবে।

প্রথম হচ্ছে একটি দাসকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা-বিনিময় প্রদান করা। ঐ দাসের ব্যাপারে আবার শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে মুমিন। কাফির দাসকে মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবে না এবং ছোট নাবালক দাসও যথেষ্ট হবে না যে পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়নের মত বয়স প্রাপ্ত না হবে।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মনোনীত উক্তি এই যে, ঐ ছেলের বাপ-মা দু'জনই যদি মুসলমান হয় তবে যথেষ্ট হবে, নচেৎ হবে না। জমহূরের মাযহাব এই যে, মুসলমান হওয়া শর্ত, ছোট বা বড় হওয়ার কোন শর্ত নেই।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, একজন আনসারী (রা) কৃষ্ণবর্ণের একটি দাসী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একটি মুসলমান দাস বা দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। যদি এ দাসীটিকে আপনি মুসলমান মনে করেন তবে আমি তাকে মুক্ত করে দেবো'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই?' সে বলেঃ 'হ্যাঁ।' তিনি বলেনঃ 'তুমি কি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেনঃ 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি'? সে বলে, 'হ্যাঁ'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আনসারীকে বলেনঃ 'তাকে আযাদ করে দাও।' এ হাদীসের ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং ঐ সাহাবী কে ছিলেন তা গুপ্ত থাকা সনদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

এ বর্ণনাটি হাদীসের আরও বহু পুস্তকে নিম্নরূপে বর্ণিত রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আল্লাহ কোথায় আছেন?' সে বলে, 'আকাশে।' তিনি বলেনঃ 'আমি কে?' সে বলে, 'আপনি আল্লাহ রাসূল (সঃ)'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন সাহাবীকে বলেনঃ 'তাকে আযাদ করে দাও, সে মুমিন।' তাহলে ভ্রমবশতঃ হত্যার কারণে এক তো গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব ও দ্বিতীয় হচ্ছে রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব যা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে সমর্পণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার হত্যার বিনিময়। এ রক্তপণ হচ্ছে একশটি উট এবং এগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। (১) বয়স প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (২) এ বয়সেরই বিশটি উষ্ট্র। (৩) দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে তৃতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৪) তৃতীয় বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। (৫) চতুর্থ বছর পেরিয়ে পঞ্চম

বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উষ্ট্রী। এটাই হচ্ছে ভ্রমে হত্যার বিনিময় যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফায়সালা করেছেন। (সুনান ও মুসনাদ-ই-আহমাদ)

এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) এবং একটি জামাআত হতেও এটাই নকল করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, এ রক্তপণ চার প্রকারেও বন্টন করা হয়েছে। এ রক্তপণে হত্যাকারীর 'আকেলার' উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের পরের নিকটতম আত্মীয়দের উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেনঃ 'এ বিষয়ে আমি কোন বিপরীত মতপোষণকারী পাইনি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তপণের ফায়সালা এ লোকদের উপর করেছেন। এটা হাদীস-ই-খাস্সাহ হতে অধিক। ইমাম শাফিঈ (রঃ) যে হাদীসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন ঐগুলো অনেক রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযাইল গোত্রের দু'টি মহিলা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে একটি পাথর মেরে দেয়। সে গর্ভবতী ছিল। সন্তানও নষ্ট হয়ে যায় এবং সেও মারা যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বর্ণিত হলে তিনি ফায়সালা দেন যে, এ শিশুর রক্তপণ হচ্ছে একটি প্রাণ, দাস বা দাসী এবং ঐ নিহত মহিলার রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারিণীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের পরবর্তী আত্মীয়দের উপর। এর দ্বারা এও জানা গেল যে, যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ভুল বশতঃ হয়ে যায়, রক্তপণ হিসেবে তার হুকুম শুধু ভুল বশতঃ হত্যার মতই। কিন্তু ঐ অবস্থায় বন্টন হবে তিনের উপর। কেননা, সেখানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খুযাইমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তথায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো বটে কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ أَسْلَمْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম'-এ কথার পরিবর্তে صَبَأْنَا অর্থাৎ 'আমরা বেদ্বীন হয়ে গেলাম' এ কথা বললো। হযরত খালিদ (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহ! আমি খালিদ (রাঃ)-এর এ কার্যে আপনার নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করছি এবং নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।'

অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে খুযাইমা গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তাদের নিহতদের রক্তপণ এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধির ভুলের বোঝা বায়তুলমালকেই বহন করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'রক্তপণ ওয়াজিব বটে, কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তবে তা করার অধিকার তাদের রয়েছে। তারা ওটা সাদকা হিসেবে ক্ষমা করে দিতে পারে।' এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে– নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির হয় তবে হত্যাকারীর দায়িত্বে রক্তপণ নেই। ঐ অবস্থায় তাকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তির অলী ও উত্তরাধিকারী এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে, তবে রক্তপণ আদায় করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি কাফির হয় তবে কারও মতে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারও মতে অধিক দিতে হবে এবং কারও মতে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আহকামের পুস্তকগুলোতে দ্রষ্টব্য। হত্যাকারীকে একজন মুমিন গোলামও আযাদ করতে হবে। দারিদ্রতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাতে সক্ষম না হয় তবে তাকে ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে হবে। রোগ, হায়েয, নিফাস ইত্যাদির মত কোন শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়াই মধ্যে কোন একদিন যদি রোযা ছেড়ে দেয় তবে আবার নতুনভাবে রোযা শুরু করতে হবে। সফরের ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটাও একটি শরীয়ত সমর্থিত ওযর। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এটা একটি শরীয়ত সমর্থিত ওযর নয়।

এরপরে বলা হচ্ছে– ভ্রমবশতঃ হত্যার তাওবার উপায় এই যে, গোলাম আযাদ করতে না পারলে ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে হবে। যদি রোযা রাখতেও সক্ষম না হয় তবে ষাটটি মিসকীনকে খানা খেতে দেয়া তার উপর ওয়াজিব কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, রোযা রাখতে না পারলে ৬০টি মিসকীনকে খানা খেতে দিতে হবে। যেমন যিহারের কাফ্ফারায় রয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা না করার কারণ এই যে, এটা হচ্ছে ভীতি প্রদর্শনের স্থান। সুতরাং সহজ পন্থা যদি বলে দেয়া হতো তবে আতংক ও সন্ত্রাস এতটা প্রকাশ পেতো না। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, রোযার পরে আর কিছুই নেই। যদি থাকতো

তবে সাথে সাথেই বর্ণনা করে দেয়া হতো। প্রয়োজনের সময় হতে বর্ণনাকে পিছিয়ে দেয়া ঠিক নয়। 'আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়' -এর তাফসীর ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনার পর এখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর কঠিন ভীতিযুক্ত শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এটা এমন একটা পাপ যাকে শির্কের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

অর্থাৎ 'মুমিন তারাই যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মা'বূদরূপে খাড়া করে না এবং তারা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না।' (২৫ঃ ৬৮)

অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছেঃ اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا الْاٰيَةَ (৬ঃ ১৫১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা হারামকৃত কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শির্ক ও হত্যার বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রক্তের ফায়সালা করা হবে।' সুনান-ই-আবি দাউদে হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুমিন পুণ্যে ও মঙ্গলে বেড়ে চলে যে পর্যন্ত না সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে। যখন সে এটা করে তখন সে ধ্বংস হয়ে যায়।' অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ আ'আলার নিকট সারা জগতের পতন একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা হালকা।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, যদি সারা ভূপৃষ্ঠের ও আকাশের অধিবাসী একজন মুসলমানকে হত্যার কাজে একত্রিত হয় তবে আল্লাহ সকলকেই উল্টো মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার ব্যাপারে অর্ধেক কথা দিয়েও সাহায্য করে, সে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে যে, তার কপালে লিখা থাকবেঃ এ ব্যক্তি আল্লাহর করুণা হতে বঞ্চিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি তো এই যে, যে ব্যক্তি মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তার তাওবা কবূলই হয় না। কুফাবাসী এ মাসআলায়

মতভেদ করলে হযরত ইবনে যুবাইর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (২৫ঃ ৬৮) -এটা শেষ আয়াত যাকে অন্য কোন আয়াত রহিত করেনি। তিনি আরও বলেনঃ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ -এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

অতএব যখন কোন লোক ইসলামের অবস্থায় শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম এবং তার তাওবা গ্রহণীয় হবে না। হযরত মুজাহিদ (রঃ) যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ বর্ণনাটি শ্রবণ করেন তখন বলেন, 'কিন্তু যে অনুতপ্ত হয়।' হযরত সালেম ইবনে আবুল জাদ (রঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সে সময় একদা আমরা তাঁর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় একটি লোক এসে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বলে, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করে তার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' তিনি বলেন, 'তার শাস্তি জাহান্নাম যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগান্বিত, তার উপর তাঁর অভিসম্পাত রয়েছে এবং তার জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি।' লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করে, 'যদি সে তাওবা করতঃ ভাল কাজ করে এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়?' তিনি বলেন, 'তার মা তার জন্যে ক্রন্দন করুক, তার তাওবা ও সুপথ প্রাপ্তি কোথায়? যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি তোমাদের নবী (সঃ) হতে শুনেছি ঃ তার মা তার জন্যে কাঁদুক, যে কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় ডান বা বাম হস্তে ধরে নিয়ে রহমানের আরশের সামনে আনবে এবং ডান হাতে বা বাম হাতে স্বীয় মস্তক ধারণ করবে। তার শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করবে এবং সে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে 'হে আল্লাহ! সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন।' যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়র পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত একে রহিতকারী কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।

অন্য বর্ণনায় এটুকু বেশীও রয়েছেঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)- এর ইন্তেকালের পর কোন অহী অবতীর্ণ হবে না।' হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ), হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে উমায়ের (রঃ), হযরত কাতাদাহ্ (রঃ) এবং হযরত যহ্হাকও (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতের সঙ্গে রয়েছেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি স্বীয় হত্যাকারীকে ধরে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিয়ে আসবে এবং অন্য হাতে স্বীয় মস্তক ধারণ করবে, অতঃপর বলবেঃ ' হে আমার প্রভু! সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন।' তখন হত্যাকারী বলবে, 'আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'নিশ্চয়ই ওটা আমার জন্যে।'

অন্য একজন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে আসবে এবং বলবেঃ 'হে আমার প্রভু! এ লোকটি কেন আমাকে হত্যা করেছিল তা তাকে জিজ্ঞেস করুন।' হত্যাকারী তখন বলবে, 'আমি তাকে হত্যা করেছিলাম যেন অমুকের সম্মান বৃদ্ধি পায়।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ 'ওটা তার জন্যে নয়। তুমি তার পাপের বোঝা নিয়ে ফিরে যাও।' অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সত্তর বছরে সে ঐ গর্তের তলদেশে পৌঁছবে।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ 'খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পাপ মার্জনা করবেন, কিন্তু শুধু ঐ ব্যক্তিকে (ক্ষমা করবেন না) যে কুফরীর অবস্থায় মারা যায়, অথবা ঐ ব্যক্তিকে (মার্জনা করবেন না) যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে।'

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে ইবনে যাকারিয়া (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উম্মু দ্দারদা (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবূ দ্দারদা (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "খুব সম্ভব আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত পাপ মার্জনা করবেন, কিন্তু (মার্জনা করবেন না) যে মুশরিক হয়ে মরেছে বা যে কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করেছে।" এ হাদীসটি দুর্বল। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই রক্ষিত।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, সে মহাসম্মানিত আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে।' এ হাদীসটি মুনকার এবং এর ইসনাদেও বহু সমালোচনা রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহ্মাদে রয়েছে, হযরত হুমায়েদ (রঃ) বলেন, আমার নিকট হযরত আবুল আলিয়া আগমন করেন। সে সময় আমার নিকট আমার এক

বন্ধুও ছিলেন।' তিনি আমাদেরকে বলেন, "তোমরা দু'জন আমার অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং আমার চেয়ে তোমাদের হাদীসও বেশী মনে রয়েছে, চল আমরা বাশার ইবনে আসেম (রঃ)-এর নিকট গমন করি।" আমরা তথায় পৌঁছলে হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) হযরত বাশার (রঃ)-কে বলেনঃ 'এদেরকেও ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন।' তিনি তখন হাদীসটি শুনাতে আরম্ভ করেন। হযরত উকবা ইবনে মালিক লাইসী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। তারা একটি গোত্রের উপর আক্রমণ চালায়। গোত্রের লোকগুলো পালিয়ে যায়। তাদের সাথে অন্য একটি লোকও পালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলিম সৈন্যদের একজন তার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং খোলা তরবারী নিয়ে তার নিকট পৌঁছে যায়। তখন লোকটি বলে, 'আমি তো মুসলমান।' মুসলিম সৈন্যটি তার কথার উপর কোনই গুরুত্ব না দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং কঠোর উক্তি করেন। হত্যাকারীও এ সংবাদ পেয়ে যায়। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ হত্যাকারী বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি তো এ কথা শুধু প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যেই বলেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং ভাষণ দিতেই থাকেন। লোকটি দ্বিতীয়বার ঐ কথাই বলে। কিন্তু এবারেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন। সে ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তৃতীয়বার বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি তো শুধু প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এ কথা বলেছিল। এবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি মনোযোগী হন এবং তাঁর চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তিনি বলেনঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনের হত্যাকারীর উপর অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এ বর্ণনাটি সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও রয়েছে।

অতএব একটি মাযহাব তো হলো এই যে, জেনে শুনে হত্যাকারীর তাওবা গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় মাযহাব এই যে, তাওবা তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূরের মাযহাব এটাই যে, সে যদি তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, বিনয় প্রকাশ করে এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা গ্রহণ করবেন এবং নিহত ব্যক্তিকে স্বীয় পক্ষ হতে বিনিময় প্রদান করতঃ সন্তুষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ হতে اِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا (২৫ঃ ৬৮-৬৯) পর্যন্ত আয়াত গুলোর মধ্যে যা বলেছেন তা হচ্ছে خَبَر এবং' خَبَر

-এর মধ্যে রহিতকরণের সম্ভাবনাই নেই। আর ঐ আয়াতটি মুশরিকদের জন্যে এবং এ আয়াতকে মুমিনের জন্যে নির্দিষ্ট করা প্রকাশ্যের বিপরীত এবং কোন দলীলের মুখাপেক্ষী। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

অর্থাৎ 'হে আমার ঐ বান্দারা যারা নিজেদের জীবনের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আমার করুণা হতে নিরাশ হয়ো না।' (৩৯ঃ ৫৩) এ আয়াতটি সাধারণ, সুতরাং কুফরী, শির্ক, নিফাক, হত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপকার্যে লিপ্ত হবার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (৪ঃ ৪৮)-এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা শির্ক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পাপ ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেবেন। এটা তাঁর একটা বড় অনুকম্পা যে, তিনি এ সূরার মধ্যেই এখন আমরা যে আয়াতের তাফসীর করছি এর পূর্বে একবার স্বীয় সাধারণ ক্ষমার আয়াত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের পরই অনুরূপভাবে স্বীয় সাধারণ ক্ষমার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন যেন আশা দৃঢ় হয়।

এখানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যাতে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন লোক একশোটি লোককে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার তাওবা গৃহীত হবে কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'তোমার মধ্যে ও তোমার তাওবার মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হবে?' অতঃপর তিনি তাকে পুণ্যময় শহরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে বলেন। অতএব সে ঐ শহরে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়। পথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং রহমতের ফেরেশতা এসে তাকে নিয়ে যান। এ হাদীসটিকে পূর্ণভাবে কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। বানী ইসরাঈলের মধ্যেই যখন ক্ষমার এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমাদের মধ্যে তো সে ক্ষমার ব্যবস্থা বহুগুণে বেশী থাকা উচিত। কেননা, বানী ইসরাঈল এমন বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুক্ত রেখেছেন। আর তিনি বিশ্ব শান্তির দূত ও নবীদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ

(সঃ)-কে পাঠিয়ে এমন ধর্ম তিনি আমাদেরকে দান করেছেন যা আকাশেও শান্তিদায়ক এবং পৃথিবীতেও শান্তিদায়ক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার ধর্ম। কাজেই এখানে হত্যাকারীর তাওবার দরজা বন্ধ হবে কেন?

তাহলে এখানে হত্যাকারীর যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই যে, তার শাস্তি হচ্ছে এই যদি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন। যেমন আবূ হুরাইরা (রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দল একথাই বলেন। এমনকি এ অর্থবোধক একটি হাদীসও তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সনদ হিসেবে হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক শাস্তির ভয় প্রদর্শনের ভাবার্থ এই যে, ওর পিছনে যদি কোন সৎ আমল না থাকে তবে সে পাপের শাস্তি ওটাই হবে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

শাস্তির ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও উত্তম পন্থা এটাই। সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আর হত্যাকারীর জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য যে, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না। তার জাহান্নামী হওয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে তাওবা গৃহীত না হওয়ার কারণেই হোক বা জমহূরের উক্তি অনুযায়ী ওর পিছনে কোন সৎকার্য না থাকার কারণেই হোক।

এখানে خُلُوْدُ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বহুদিন অবস্থান—চিরদিন অবস্থান নয়। যেমন হাদীস-ই-মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে সরিষার ছোট দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। উপরে যে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছেঃ "খুব সম্ভব আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু (ক্ষমা করবেন না) যে কাফির হয়ে যাবে বা যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে শুনে হত্যা করবে।" এ হাদীসে عَسٰى শব্দটি হচ্ছে تَرَجِّىْ বা আশা উদ্দীপক। তাহলে এ দু' অবস্থায় (কুফরী ও মুমিন হত্যা) যদিও আশা উঠে যায়, কিন্তু সংঘটন অর্থাৎ এরূপ ঘটে যাওয়া এ দু'টোর মধ্যে একটিতে উঠে যায় না এবং সেটা হচ্ছে হত্যা। কেননা, শির্ক ও কুফরীর ক্ষমা না হওয়া তো কুরআন মাজীদের শব্দ দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে হাদীসগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ধরে আনবে সেগুলোও সম্পূর্ণরূপে সঠিক। এতে মানুষের অধিকার রয়েছে বলে তাওবা দ্বারা এ পাপ ক্ষমা হতে পারে না। বরং মানুষের হক তো তাওবার অবস্থাতেও হকদারকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এতে যেমন হত্যা রয়েছে তদ্রূপ চুরি, জবরদখল, অপবাদ এবং অনান্য হককুল ইবাদও

রয়েছে। এগুলো তাওবা দ্বারা ক্ষমা না হওয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এ অবস্থায় তাওবার বিশুদ্ধতার জন্যে শর্ত হলো প্রাপকদের প্রাপ্যগুলো আদায় করে দেয়া। আর আদায় করা যখন অসম্ভব তখন কিয়ামতের দিন দাবীদারগণ দাবী অবশ্যই করবে। কিন্তু দাবী করলেই যে শাস্তি ঘটেই যাবে এটা জরুরী নয়। এও সম্ভব যে, হত্যাকারীর সমস্ত ভাল কাজের পুণ্য নিহত ব্যক্তিকে দেয়া হবে বা আংশিক পুণ্য দেয়া হবে এবং তাকে দেয়ার পরেও হয়তো হত্যাকারীর নিকট কিছু পুণ্য থেকেও যাবে, আর ওর বিনিময়ে হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আবার এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পক্ষ হতে নিহত ব্যক্তিকে হূর, প্রাসাদ, উচ্চ মর্যাদা এবং জান্নাত দিয়ে তার দাবী পূরণ করবেন এবং ওরই বিনিময়ে হয়তো সে তার হন্তাকে খুশী মনে ক্ষমা করে দেবে, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে মাফ করবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন। ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর জন্যে কিছু ইহলৌকিক নির্দেশ রয়েছে এবং কিছু পারলৌকিক নির্দেশ রয়েছে।

ইহজগতে তার উপর আল্লাহ তা'আলা নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে প্রভুত্ব দান করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, আমি তার অভিভাবককে প্রভুত্ব দান করেছি।' (১৭ঃ ৩৩) তাঁর অধিকার রয়েছে যে, প্রতিশোধ নিতে পারে অর্থাৎ হত্যাকারীকেও হত্যা করাতে পারে কিংবা ক্ষমা করতে পারে, রক্তপণও আদায় করতে পারে। এর রক্তপণও খুব কঠিন। এটা তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ত্রিশটি দিতে হবে ঐ উট যেগুলোর বয়স তিন বছর পার হয়ে চতুর্থ বছরে পড়েছে। (২) ত্রিশটি দিতে হবে ঐ উট যেগুলো পঞ্চম বছরে পড়েছে। (৩) চল্লিশটি দিতে হবে গর্ভবতী উষ্ট্রী। এগুলো আহকামের পুস্তকসমূহে সাব্যস্ত রয়েছে। সজ্ঞানে হত্যাকারীর উপর গোলাম আযাদ করা বা একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখা অথবা ষাটটি মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে কি-না সে ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও তাঁর সহচরগণের ও আলেমদের একটি দলের উক্তি এই যে, ভ্রমবশতঃ হত্যায় যখন এ ব্যবস্থা রয়েছে তখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় থাকাতো আরও যুক্তিযুক্ত। ঐগুলোর উপর উত্তর হিসেবে শরীয়ত অসম্মত, মিথ্যা শপথের কাফ্ফারা পেশ করা হয়েছে এবং তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযাকে তার ওযর বানিয়েছেন, যেমন ভুলের সময় তার উপর ইজমা রয়েছে।'

ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর সহচরগণ এবং অন্যান্যগণ বলেন যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যা কাফফারা হতে অনেক বড়। এজন্যেই তাতে কাফফারা নেই। অনুরূপভাবে মিথ্যা শপথ এবং ঐ দু' অবস্থায়ও ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের মধ্যে পার্থক্য করণের তাঁদের কোন পথ নেই। কেননা, তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা ওয়াজিব হওয়ার সমর্থক। পূর্বদলের একটি দলীল মুসনাদ-ই-আহমাদে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটিও বটেঃ হযরত গারীফ ইবনে আইয়াশ আদদায়লামী (রঃ) বলেন, আমরা হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রাঃ)-এর নিকট এসে বলি, আমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনিয়ে দিন যাতে কোন কম বেশী থাকবে না।' একথা শুনে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন–'তোমরা যখন কুরআন কারীম নিয়ে পাঠ কর তখন তাতে কম বেশী কর না কি?' তখন আমরা বলি, 'আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন।' তিনি তখন বলেন, আমরা আমাদের এমন একটি লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম যে লোকটি হত্যার কারণে নিজেকে জাহান্নামী করে নিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তার পক্ষ হতে একটি দাসকে মুক্ত কর। তার এক একটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ ঐ লোকটির এক একটি অঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্ত করবেন'।

٩٤- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৯৪। হে মুমিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে বহির্গত হও তখন প্রত্যেক কাজ তথ্য নিয়ে করো, এবং কেউ তোমাদেরকে 'সালাম' করলে তাকে বলো না যে, তুমি মুমিন নও; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছো? তবে আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন; অতএব তোমরা স্থির করে নাও যে, তোমরা যা করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানূ সালীম গোত্রের একটি লোক ছাগল চরাতে চরাতে সাহাবা-ই-কিরামের একটি দলের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে এবং তাদেরকে সালাম দেয়। তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেনঃ এ লোকটি মুসলমান তো নয় শুধু জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে সালাম করছে। অতএব তাঁরা তাকে হত্যা করতঃ ছাগলগুলো নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট চলে আসেন। সে সময়ই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হাদীসটি বিশুদ্ধ তো বটে কিন্তু কতক লোক কয়েকটি কারণে এটাকে ক্রটিযুক্ত বলেছেন। প্রথম কারণ এই যে, এর একজন বর্ণনাকারী সাম্মাক ছাড়া এ পন্থায় আর কেউ এটা বের করেনি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এটা তার হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণনা করার ব্যাপারেও সংশয় রয়েছে। তৃতীয় কারণ এই যে, এর শান-ই-নযূলে আরও ঘটনা বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এটা মুহলিম ইবনে জাসামার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অন্য কেউ বলেন যে, এটা হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। কিন্তু আমি বলি যে, এ সমুদয় কথাই বর্জনীয়। কেননা, সাম্মাক হতে বহু বড় বড় ইমাম এটা বর্ণনা করেছেন।

সহীহ গ্রন্থে ইকরামা (রঃ) হতেও দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। এ বর্ণনাটিই অন্য পন্থায় সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। হযরত সাঈদ ইবনে মানসূরও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীর এবং মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, একটি লোককে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ের লোক তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌঁছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে প্রেরণ করে। পথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রেরিত এক সেনাবাহিনীর সাথে রাত্রিকালে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁদের নিকট নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস না হওয়ায় শত্রু জ্ঞানে তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেলেন। তার পিতা এ সংবাদ পেয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করে। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে রক্তপণ আদায় করেন এবং তাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বিদায় করেন।

মুহলিম ইবনে জাসামার ঘটনা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবূ হাদরাদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ইয্মের দিকে প্রেরণ করেন। আমি একটি ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদলের সাথে বের হই যার মধ্যে ছিলেন

আবূ কাতাদাহ (রাঃ), হারিস ইবনে রাবঈ (রাঃ) এবং মুহলিম ইবনে জাসামা ইবনে কায়েস। আমরা বাতনে ইয্‌মে পৌঁছলে আমের ইবনে আযবাত আশজাঈ উটে চড়ে সেখান দিয়ে গমন করেন। তাঁর সাথে বহু আসবাবপত্র ছিল। আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় তিনি আমাদেরকে সালাম দেন। তখন আমরা তাঁকে হত্যা করা হতে বিরত থাকি। কিন্তু মুহলিম ইবনে জাসামা তাঁকে পারস্পরিক বিবাদের ভিত্তিতে হত্যা করে দেয় এবং তার উট ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আমের (রাঃ) ইসলামী রীতিতে সালাম দেন। কিন্তু অজ্ঞতা যুগে শত্রুতার কারণে মুহলিম ইবনে জাসামা তাঁকে তীর মেরে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আমের (রাঃ)-এর লোকদের সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর পক্ষ হতে উয়াইনা ও আকরা' কথা বলে। আকরা' বলে, 'হে আল্লাহ রাসূল (সঃ)! আজ সে খুশী হয়েছে, কিন্তু কাল সে দুঃখ ভোগ করবে'। তখন উয়াইনা বলে, 'না, না। আল্লাহর শপথ! (তাকে ছাড়া হবে না) যে পর্যন্ত তার স্ত্রীদের উপর ঐ বিপদ না পৌঁছবে যে বিপদ আমাদের স্ত্রীদের উপর পৌঁছেছে। মুহলিম ইবনে জাসামা দু' খানা চাদর পরিহিত হয়ে আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বসে পড়ে এ আশায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করবেন না।' সে তখন অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে ও চাদরে চক্ষু মুছতে মুছতে বিদায় হয়। সাতদিনও অতিক্রান্ত হয়নি এর মধ্যেই সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। জনগণ তাকে সমাধিস্থ করে। কিন্তু ভূমি তার দেহ উপরে উঠিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ 'তোমাদের এ সঙ্গী অপেক্ষা বহুগুণ দুষ্ট লোককেও ভূমি গ্রহণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তিনি তোমাদেরকে মুসলমানের মর্যাদা প্রদর্শন করবেন।' অতঃপর জনগণ তাকে পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করে এবং তার উপর পাথর চাপিয়ে দেয়। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর) সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মুআল্লাকরূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মিকদাদ (রাঃ)-কে বলেনঃ 'যখন একজন মুমিন কাফির সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ঈমান গোপন

রেখেছিল, অতঃপর সে তার ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো মক্কায় এরূপই তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে'?

মুসনাদ-ই-বাযযাযে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন যার মধ্যে হযরত মিকদাদও (রাঃ) ছিলেন। যখন তারা শত্রুদের নিকট পৌঁছেছেন তখন সবাই এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু একটি লোক রয়ে যায় যার নিকট বহু মাল ছিল। সে তাঁদেরকে দেখামাত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বূদ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মিকদাদ (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করতঃ তাকে হত্যা করে দেন। তখন তাঁর সঙ্গীদের এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ছাড়া কেন মা'বূদ নেই তাকে তুমি হত্যা করলে? আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এটা বর্ণনা করবো।' অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তাকে মিকদাদ (রাঃ) হত্যা করেছেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা মিকদাদ (রাঃ)-কে আমার নিকট ডেকে আন।' (তিনি আসলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেন)ঃ 'হে মিকদাদ (রাঃ)! তুমি এমন এক লোককে হত্যা করলে যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করেছিল? কিয়ামতের দিন তুমি এ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর সামনে কি করবে?' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেনঃ 'হে মিকদাদ (রাঃ)! এ লোকটি গোপন মুসলিম ছিল। আর সে ইসলাম প্রকাশ করা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করে দিলে?' অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন– 'আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রচুর গনীমত রয়েছে'। অর্থাৎ গনীমতের লোভে তোমরা এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করছো এবং ইসলাম প্রকাশকারীকেও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করছো, তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে এ গনীমতও রয়েছে এবং তা তাঁর নিকট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেগুলো তিনি তোমাদেরকে হালাল উপায়ে প্রদান করবেন। ওটা তোমাদের জন্যে এ মাল অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। তোমরা তোমাদের ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরাও এরূপ ছিলে। তখন তোমরাও দুর্বলতার কারণে তোমাদের ঈমান প্রকাশ করার সাহস রাখনি। তোমরা তোমাদের কওমের মধ্যে গোপনে চলাফেরা করতে। আজ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আজ তিনি তোমাদেরকে শক্তি

দিয়েছেন বলেই তোমরা খোলাখুলি ইসলাম প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছো। তাহলে আজও যারা শত্রুদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রয়েছে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করতে পারছে না, তারা যদি তোমাদের সামনে তার ইসলাম প্রকাশ করে তবে তা মেনে নিতে হবে। যেমন তিনি বলেনঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমরা অল্প ছিলে ও ভূপৃষ্ঠে দুর্বল বলে বিবেচিত হচ্ছিলে।'(৮ঃ ২৬ মোটকথা, ইরশাদ হচ্ছে যে, যেমন এ ছাগলের রাখালটি স্বীয় ঈমান গোপন রেখেছিল তদ্রূপ তোমরাও ইতিপূর্বে সংখ্যায় অল্প ছিলে, তোমাদের শক্তিও কম ছিল, কাজেই তোমরাও তখন মুশরিকদের মধ্যে তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে। ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরাও তখন মুমিন ছিলে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করতঃ তোমাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেছেন।

হযরত উসামা (রাঃ) শপথ করে বলেছিলেন, 'এরপরে আর কখনও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণকারীকে হত্যা করবো না'। কেননা, এ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। অতঃপর গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়বার বলা হচ্ছে–'তোমরা যা করছো তা খুব ভেবে চিন্তে কর।'

অতঃপর ধমক দেয়া হচ্ছে– 'আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে উদাসীন মনে করো না। তোমরা যা কিছু করছো তার তিনি পূর্ণ খবর রাখছেন'।

৯৫। মুমিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে– তারা সমান নয়; আল্লাহ ধন প্রাণ দ্বারা ধর্মযুদ্ধকারীগণকে উপবিষ্টগণের উপর পদ-মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন;

٩٥- لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ

وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى
وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى
الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং উপবিষ্টগণের উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন।

٩٦- دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৯৬। স্বীয় সন্নিধান হতে পদ-মর্যাদা ক্ষমা ও করুণা (দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন) এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত বারা' (রাঃ) বলেন যে, যখন এ আয়াতের প্রাথমিক শব্দগুলো অবতীর্ণ হয়–'গৃহে উপবিষ্টগণ ও ধর্মযোদ্ধাগণ সমান নয়' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে ডেকে নিচ্ছিলেন এমন সময়ে হযরত উম্মে মাকতূম (রাঃ) উপস্থিত হন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো অন্ধ।' তখন غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ -এ অংশটুকু অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ঐ উপবিষ্টগণ সমান নয় যারা বিনা ওযরে গৃহে উপবিষ্ট থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) স্বীয় দোয়াত, কলম ও কালি নিয়ে এসেছিলেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তবে আমি অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম।' তখন غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ - এ শব্দগুলো অবতীর্ণ হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উরু হযরত যায়েদ (রাঃ)- এর উপর ছিল। হযরত যায়দ (রাঃ)- এর উরুর উপর এত চাপ পড়ে যে, যেন তা ভেঙ্গেই যাবে। আর একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, যখন এ শব্দগুলোর অহী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয় এবং 'সকীনা' তাঁকে আবৃত করে সে সময় আমি তাঁর পার্শ্বদেশে বসেছিলাম, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উরু আমার উপর এত ভারী অনুভূত হয় যে, আমি এত ভারী বোঝা কখনও বহন করিনি। অতঃপর অহী সরে যাওয়ার পর তিনি اَجْرًا عَظِيْمًا পর্যন্ত আয়াত লিখিয়ে নেন। আমি ওটা কাঁধের অস্থির উপর লিখে লই।

অন্য একটি হাদীসে নিম্নের শব্দগুলো রয়েছেঃ 'তখনও ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর কথাগুলো শেষ হয়নি এর মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়ে যায়।'

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, 'ঐ দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে, আমি যেন দেখছি। পরে অবতীর্ণ এ শব্দগুলো আমি পূর্ব লিখার সঙ্গে সংযোগ করে দেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যুদ্ধে অনুপস্থিতদেরকে বুঝান হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা দু'জন তো অন্ধ। আমাদের জন্যে অবকাশ রয়েছে কি?' তখন তাঁদেকে কুরআন কারীমের এ আয়াতের মাধ্যমে অবকাশ দেয়া হয়। সুতরাং মুজাহিদগণকে যে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন ঐসব লোক যাঁরা সুস্থ ও সবল। প্রথমে মুজাহিদগণকে সাধারণভাবে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। অতঃপর غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ-এ শব্দগুলো অবতীর্ণ করতঃ যাঁদের শরীয়ত সমর্থিত ওযর রয়েছে, তাঁদেরকে সাধারণ উপবিষ্টগণ হতে পৃথক করা হয়। যেমন অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন ইত্যাদি। এসব লোক মুজাহিদগণেরই শ্রেণীভুক্ত। অতঃপর মুজাহিদগণের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ওটাও ঐসব লোকের উপর, যাঁরা বিনা কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন না। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস- (রাঃ)-এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা হওয়াই উচিতও বটে।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মদীনায় এমন কতক লোকও রয়েছে যে, তোমরা যে যুদ্ধের সফর কর এবং যে জঙ্গল অতিক্রম কর, তারা পুণ্যে তোমাদের সমান। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, 'যদিও তাঁরা মদীনাতেই অবস্থান করেন?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হ্যাঁ, কেননা ওযর তাদেরকে বাধা দিয়ে রেখেছে?' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'তোমরা যা খরচ কর তার পুণ্য তোমরাও যেমন পাও, তারাও তেমনই পেয়ে থাকে।' এ ভাবার্থকেই একজন কবি নিম্নের কবিতায় বর্ণনা করেছেনঃ

يَا رَاحِلِيْنَ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ لَقَدْ * سِرْتُمْ جُسُوْمًا وَسِرْنَا نَحْنُ اَرْوَاحَا
اِنَّا اَقَمْنَا عَلٰى عُذْرٍ وَعَنْ قَدَرٍ * وَمَنْ اَقَامَ عَلٰى عُذْرٍ فَقَدْ رَاحَا

অর্থাৎ 'হে আল্লাহর ঘরের দিকে হজ্ব যাত্রীগণ! তোমরা যদিও সশরীরে ঐ দিকে চলেছো, কিন্তু আমরা রূহানী গতিতে ঐ দিকে চলেছি। জেনে রেখো যে, শক্তিহীনতা ও ওযর আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং এটা স্পষ্ট কথা যে, ওযরের কারণে বাড়ীতে অবস্থানকারী যাত্রীদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।'

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'সকলকেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।' এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, জিহাদ ফরযে আইন নয়, বরং ফরযে কিফায়া। তারপরে ইরশাদ হচ্ছে–'বাড়ীতে উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদগণের বড়ই মর্যাদা রয়েছে।' অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের উচ্চ পদ-মর্যাদা, তাদের পাপ মার্জনা করণ এবং তাদের উপর যে করুণা ও অনুগ্রহ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর স্বীয় সাধারণ ক্ষমা ও সাধারণ দয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ জান্নাতে একশ দরজা রয়েছে। যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক দরজার মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে।' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর চালনা করে সে জান্নাতের দরজা লাভ করে।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেনঃ 'দরজা কি?' তিনি বলেনঃ "ওটা তোমাদের এখানকার ঘরের দরজার সমান নয় বরং দু' দরজার মধ্যে শত বছরের দূরত্ব রয়েছে।"

৯৭। নিশ্চয়ই যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল– ফেরেশতা তাদের প্রাণ হরণ করে বলবে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম; তারা বলবে, আল্লাহর

৯৭– اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ

اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۖ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ	পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তন্মধ্যে তোমরা হিজরত করতে? অতএব ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।
٩٨- اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ	৯৮। কিন্তু পুরুষ, নারী এবং শিশুগণের মধ্যে অসহায়তা বশতঃ যারা কোন উপায় করতে পারে না অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না।
٩٩- فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا	৯৯। ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।
١٠٠- وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۭ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۧ	১০০। আর যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করেছে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে, এবং যে কেউ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে– তৎপর সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়– তবে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত রয়েছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আল-আসওয়াদ (রঃ) বলেন, 'মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল তাতে আমারও নাম ছিল। আমি তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম হযরত ইকরামা (রঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতঃ এ কথাটি তাঁকে বলি। তিনি এতে আমাকে অংশগ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে যেসব মুসলমান মুশরিকদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল, মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, তাদের কেউ কেউ মুসলমানদেরই তীরের আঘাতে নিহত হতো বা তাদেরই তরবারী দ্বারা তাদেরকে হত্যা করা হতো। তখন আল্লাহ তা'আলা إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ লোক যারা তাদের ঈমান গোপন রেখেছিল, বদরের যুদ্ধে যখন তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন মুসলমানদের হাতে তাদের কয়েকজন লোক মারা যায়। ফলে মুসলমানেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেঃ 'আফসোস! এরা তো আমাদের ভাই ছিল, অথচ এরা আমাদেরই হাতে মারা গেল।' তারা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর অবশিষ্ট মুসলমানদের নিকট এ আয়াতটি লিখেন যে, তাদের কোন ওযর ছিল না। তখন তারা বের হয় এবং তাদের সাথে মুশরিকরা মিলিত হয় ও তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে। সে সময় وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ (২ঃ ৮) -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি কুরাইশের ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল এবং মক্কাতেই ছিল। তাদের মধ্যে ছিল আলী ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফ, আবূ কায়েস ইবনে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, আবূ মানসুর ইবনে হাজ্জাজ এবং হারেস ইবনে জামআ'।

হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হিজরতের পরেও মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গে এসেছিল। তাদের কয়েকজন যুদ্ধক্ষেত্রে মারাও যায়। ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হুকুম হচ্ছে সাধারণ। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যেই এ হুকুম প্রযোজ্য যে হিজরত করতে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে পড়ে থাকে এবং দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকে না। সে আল্লাহ তা'আলার নিকট

অত্যাচারী। এ আয়াতের ভাব হিসেবে এবং মুসলমানদের ইজমা হিসেবেও সে হারাম কার্যে লিপ্ত হওয়ার দোষে দোষী। এ আয়াতে হিজরত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেনঃ 'তোমরা এখানে পড়ে রয়েছো কেন? কেন তোমরা হিজরত করনি?' তারা উত্তর দেয়,"আমরা নিজেদের শহর ছেড়ে অন্য কোন শহরে চলে যেতে সক্ষম হইনি।" তাদের এ কথার উত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন–'আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না?'

মুসনাদ-ই-আবূ দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথেই বাস করে সে ওর মতই।' হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত আব্বাস (রাঃ), আকীল ও নাওফিলকে বন্দী করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ 'আপনি আপনার নিজের ও আপনার ভ্রাতুষ্পত্রের মুক্তি পণ প্রদান করুন।' তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি আপনার কিবলার দিকে নামায পড়তাম না এবং আমরা কি কালেমা-ই-শাহাদাত পাঠ করতাম না'? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হে আব্বাস (রাঃ)! আপনারা তর্কতো উত্থাপন করেছেন, কিন্তু আপনারা পরাজিত হয়ে যাবেন। শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলে–اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً অর্থাৎ 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না?'

এরপর যে লোকদের হিজরত পরিত্যাগের উপর ভর্ৎসনা নেই তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যারা মুশরিকদের হাত হতে ছুটতে পারে না বা ছুটতে পারলেও হয়তো পথ চেনা নেই, তাদেরকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন। عَسٰى শব্দটি আল্লাহ তা'আলার কালামে নিশ্চয়তা বোধক হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইশার নামাযে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার পর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে দু'আ করেছেনঃ 'হে আল্লাহ! আইয়াশ ইবনে রাবীআকে, সালাম ইবনে হিশামকে, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে এবং সমস্ত অসহায় ও শক্তিহীন মুসলমানকে কাফিরদের ছোবল হতে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! 'মুয্র' গোত্রের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করুন।' হে আল্লাহ! তাদের উপর আপনি এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যামানায় এসেছিল।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সালাম ফেরানোর পর কিবলাহ্ মুখী হয়েই হাত উঠিয়ে দু'আ করতেনঃ 'হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে, আইয়াশ ইবনে আবূ রাবীআকে সালমা ইবনে হিশামকে এবং অন্যান্য সমস্ত শক্তিহীন মুসলমানকে কাফিরদের হাত হতে রক্ষা করুন, যারা না পারে কোন উপায় করতে এবং না পায় কোন পথ।'

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যোহরের নামাযের পরে উপরোক্ত প্রার্থনা করতেন। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ, এ সনদ ছাড়া অন্যন্য সনদেও এটা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমি এবং আমার মাতা ঐসব দুর্বল নারী ও শক্তিহীন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওযর বিশিষ্টদের মধ্যে গণ্য করেছেন।' হিজরত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং মুশরিকদের হতে পৃথক থাকার হিদায়াত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর পথে হিজরতকারী যেন নিরাশ না হয়। তারা যেখানেই যাবে তিনি তাদের আশ্রয় লাভের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন এবং তারা শান্তিতে তথায় বসবাস করতে পারবে। مُرَاغَم শব্দের একটি অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়াও বটে। হযরত মুজাহিদ বলেন যে, তারা দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার বহু পন্থা পেয়ে যাবে। ওর বহু আসবাবপত্র সে লাভ করবে। সে শত্রুদের অত্যাচার হতেও রক্ষা পাবে এবং তার আহার্যেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভ্রান্তির পথের স্থলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং দারিদ্র ধনশীলতায় পরিবর্তিত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে বহির্গত হয় কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পূর্বেই পথে তার মৃত্যু এসে যায় সেও হিজরতের পূর্ণ পুণ্য প্রাপ্ত হবে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক কার্যের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ওটাই রয়েছে যার সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে, তার হিজরত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনন্দের কারণ। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্যে, সে প্রকৃত হিজরতের পুণ্য প্রাপ্ত হবে না। বরং হিজরত ঐ দিকেই মনে করা হবে।' এ হাদীসটি সাধারণ। হিজরত ও অন্যান্য সমস্ত আমলই এর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করে। অতঃপর একজন আবেদকে হত্যা করতঃ একশ পূর্ণ করে দেয়। তারপর তার তাওবা গৃহীহ হবে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম তাকে বলেনঃ তোমার তাওবা ও তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তুমি তোমার গ্রাম হতে হিজরত করে অমুক শহরে চলে যাও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আবেদগণ বাস করেন। অতএব সে হিজরতের উদ্দেশ্যে ঐ শহরের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। এখন করুণা ও শাস্তির ফেরেশতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। করুণার ফেরেশতাগণ বলেন যে, এ ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল। পক্ষান্তরে শাস্তির ফেরেশতাগণ বলেন যে, তথায় পৌঁছতে তো পারেনি। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় যে, এ দিকের এবং ঐ দিকের ভূমি মাপ করা হোক। যে গ্রাম সেখান হতে নিকটবর্তী হবে সে গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গেই তাকে মিলিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নির্দেশ দেন যে, ওটা যেন খারাপ গ্রাম হতে দূরবর্তী হয়ে যায় এবং ভাল গ্রামের নিকটবর্তী হয়। ভূমি মাপা হলে দেখা যায় যে, একত্ববাদীদের গ্রামটি অর্ধহাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে। ফলে তাকে করুণার ফেরেশতাগণ নিয়ে যান।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় সে সৎলোকদের গ্রামের দিকে বুকের ভরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বাড়ী হতে বের হয়, তারপর তিনি বলেনঃ আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ কোথায়? অতঃপর সে সোয়ারী হতে পড়ে মারা যায়, ওর পুণ্যদান আল্লাহ পাকের জিম্মায় চয়ে যায়। অথবা কোন জন্তু তাকে কামড়িয়ে নেয় ফলে সে মারা যায়, ওর পুণ্যদান আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। কিংবা সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তখনও জিহাদের পুণ্যদান আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় রয়েছে।' (বর্ণনাকারী বলেন যে, স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন এক শব্দ ব্যবহার করেন) আল্লাহর শপথ! আমি এরূপ শব্দ রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর পূর্বে কখনও কোন আরববাসীর মুখে শুনিনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেনঃ 'যে স্বীয় স্থানে মারা যায় সেও জান্নাতের অধিকারী হয়ে যায়।'

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, হযরত খালিদ ইবনে হিযাম (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে তাঁকে একটি সর্পে দংশন করে এবং তাতেই তিনি মারা যান। তাঁর ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আমি আবিসিনিয়ায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম এবং সংবাদ পেয়েছিলাম যে, হযরত খালিদ ইবনে হিযামও (রাঃ) হিজরত করে আসছেন। সুতরাং আমি তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম যে, বানূ আসাদ গোত্রের তিনি ছাড়া আর কেউ হিজরত করে আসছে না এবং কমবেশী যত মুহাজির ছিলেন তাঁদের সবারই সাথে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ ছিলেন না। তাই আমি উদ্বেগের সাথে হযরত খালিদ (রাঃ)-এর অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি তাঁর শাহাদাতের সংবাদ প্রাপ্ত হই। এতে আমার বড়ই দুঃখ হয়। এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব। এটা গারীব হওয়ার এও একটি কারণ যে, এটা হচ্ছে মক্কার ঘটনা, আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মদীনায়। কিন্তু খুব সম্ভব বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আয়াতটির হুকুম সাধারণ, যদিও শানে নযূল এটা না হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জুমরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বে পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবূ যামীরা ইবনে আয়িস আয্যারকী (রাঃ) বলেনঃ যখন إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আমি বলি যে, আমি ধনীও বটে এবং আমার উপায়ও রয়েছে কাজেই আমাকে হিজরত করতেই হবে। অতঃপর তিনি হিজরত করতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট পৌঁছার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি 'তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সম্বন্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

তাবরানীর হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, হযরত আবূ মালিক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার অঙ্গীকারকে সত্য জেনে এবং আমার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রেখে আমার পথে যুদ্ধের জন্য বের হয়, আল্লাহর জিম্মায় এটা রয়েছে যে, তিনি তাকে সৈন্যদের সাথে মৃত্যু দান করে জান্নাতে

প্রবিষ্ট করবেন, অথবা সে আল্লাহর দায়িত্বে পুণ্য, গনীমত এবং অনুগ্রহসহ ফিরে আসবে। আর যদি সে স্বাভাবিকভাবে মারা যায় বা নিহত হয় কিংবা ঘোড়া বা উট হতে পড়ে গিয়ে মারা যায় অথবা কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মারা যায় বা স্বীয় বিছানায় মারা যায় তবে সে শহীদ হবে।'

সুনান-ই-আবি দাউদে 'তার জন্যে জান্নাত রয়েছে' এটুকু বেশী আছে। এর কতগুলো সুনান-ই-আবি দাউদে নেই। হাফিয্ আবূ ইয়ালা (রঃ)-এর মুসনাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হয়, অতঃপর মারা যায়, কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্যে হজ্ব করার পুণ্য লিখা হয়। আর যে উমরার উদ্দেশ্যে বের হয় এবং মারা যায় তার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত উমরাকারীর পুণ্য লিখা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়, অতঃপর তার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত গাযীর পুণ্য লিখা হয়।' এ হাদীসটিও গারীব।

১০১। আর যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে পর্যটন কর, তখন নামায সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, যারা অবিশ্বাসকারী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

١٠١- وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا○

ইরশাদ হচ্ছে-'যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে পর্যটন কর' অর্থাৎ শহরসমূহের সফরে বের হও। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ 'জেনে রেখো যে, সত্বরই তোমাদের মধ্যে রুগীও হবে এবং অন্যান্য এমন লোকও হবে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানে ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করবে।' (৭৩ঃ ২০) তবে সে সময় নামায সংক্ষেপ করায় তোমাদের কোন অপরাধ

নেই। অর্থাৎ চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত, যেমন জমহুর এ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝেছেন, যদিও তাঁদের মধ্যে কতক মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, সালাত সংক্ষেপ করার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত। যেমন জিহাদের জন্য, হাজ্জ বা উমরার জন্য, বিদ্যা অনুসন্ধানের জন্য এবং যিয়ারত ইত্যাদির জন্য সফর করা। ইব্ন উমার (রাঃ), আতা' (রঃ) এবং ইয়াহ্ইয়ারও (রঃ) উক্তি এটাই। একটি বর্ণনা হিসাবে ইমাম মালিকেরও (রঃ) এটাই উক্তি। কেননা এরপরে ঘোষণা রয়েছে ঃ 'যদি তোমরা আশংকা কর যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।' কারও কারও মতে এ শর্ত আরোপের কোনই প্রয়োজন নেই যে, এ সফর আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে হতে হবে, বরং প্রত্যেক বৈধ সফরেই সালাত সংক্ষেপ করা যায়। যেমন মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণের অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ

অর্থাৎ 'যে পাপাসক্তি ব্যতীত ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়বে (তার জন্যে মৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণ বৈধ)।' (৫ঃ ৩) হ্যাঁ তবে শর্ত এই যে, সেটা যেন পাপ কার্যের উদ্দেশ্যে সফর না হয়। ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রমুখ ইমামগণের এটাই উক্তি।

হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতঃ বলে, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি একজন ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসা উপলক্ষে আমি সমুদ্র ভ্রমণ করে থাকি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দু' রাকআত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। এ হাদীসটি মুরসাল। কোন কোন লোকের মাযহাব এই যে, প্রত্যেক সফরেই নামায কসর করতে হবে। সফর হয় বৈধই হোক বা অবৈধই হোক। এমনকি, যদি কেউ ডাকাতি বা লুঠতরাজি করার উদ্দেশ্যেও সফর করে সেখানেও নামাযকে 'কসর' করার অনুমতি রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), সাওরী (রঃ) এবং দাউদেরও (রঃ) এটাই উক্তি যে, আয়াতটি সাধারণ। কিন্তু এ উক্তি জমহূরের উক্তির বিপরীত। কাফিরদের হতে ভয় করার যে শর্ত লাগানো হয়েছে তা অধিক প্রচলনের কারণেই লাগানো হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেহেতু অবস্থা প্রায় এরূপই ছিল সেহেতু আয়াতের মধ্যেও ওটা বর্ণনা করা হয়েছে। হিজরতের পর মুসলমানদেরকে যেসব সফরে যেতে হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল সন্ত্রাসের সফর। প্রতি পদে

পদে শত্রুর ভয় ছিল। এমনকি মুসলমানগণ জিহাদ ছাড়া এবং বিশেষ কোন সেনাবাহিনীর সঙ্গ ছাড়া সফরের জন্যে বের হতেই পারতেন না। আর নিয়ম আছে যে, অধিক হিসেবে যে কথা বলা হয় তার বোধগম্য ধর্তব্য হয় না। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে নির্লজ্জতার কার্যে বাধ্য করো না যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছে করে।' অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 'তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করছো তাদের ঐ মেয়েগুলোও তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের নিকট প্রতিপালিতা হচ্ছে।' অতএব এ আয়াত দু'টিতে যেমন শর্তের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওর হওয়ার উপরই হুকুম নির্ভর করে না, বরং এ শর্ত ছাড়াও ওটাই হুকুম। অর্থাৎ নির্লজ্জতার কার্যে দাসীদেরকে বাধ্য করা হারাম, তারা পবিত্র থাকার ইচ্ছে করুক আর নাই করুক। অনুরূপভাবে ঐ স্ত্রীর কন্যা তার স্বামীর পক্ষে হারাম যে স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে, তার কন্যা তার স্বামীর নিকট প্রতিপালিতা হোক আর নাই হোক। অথচ কুরআন কারীমের মধ্যে দু'জায়গায় এ শর্ত রয়েছে। তাহলে এ দু' জায়গায় যেমন এসব শর্ত ছাড়াও এ হুকুম, তদ্রূপ এখানেও যদিও ভয় না থাকে তবুও শুধু সফরের কারণেই নামাযকে 'কসর' করা বৈধ।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'নামায হালকা করার নির্দেশ তো ভয়ের অবস্থায় আর এখন তো নিরাপত্তা রয়েছে (সুতরাং এখন নির্দেশ কি)?' তখন হযরত উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ এ প্রশ্নই আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ 'এটা আল্লাহ তা'আলার একটা সাদকা যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর।' সহীহ মুসলিম, সুনান ইত্যাদির মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। বর্ণনাটি সম্পূর্ণই সঠিক।

হযরত আবূ হানযালা খুদামা (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে সফরের নামাযের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ' দু'রাকআত'। তিনি তখন বলেন, কুরআন পাকে তো ভয়ের অবস্থায় দু'রাকআতের কথা রয়েছে। আর এখন তো পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করছে?' হযরত উমার (রাঃ) তখন বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এটাই সুন্নাত'। (ইবনে আবি শাইবা) অন্য এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আকাশ থেকে তো এ অবকাশ অবতীর্ণ হয়েছে। এখন তোমার ইচ্ছে হলে তা ফিরিয়ে দাও।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'মক্কা ও মদীনার মধ্যে নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে দু'রাকআত নামায পড়েছি।' (সুনান-ই-নাসাঈ) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা হতে মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছেন, তখন সেখানে আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোন ভয় ছিল না। তখনও তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করতেন।

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, মক্কা হতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথেও তিনি দু'রাকআতই নামায আদায় করেছেন এবং সে সফরে তিনি মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত হারেসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'মিনার মাঠে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে যোহর ও আসরের নামায দু' রাকআত পড়েছি, অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক ছিলাম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম।' সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে, হযরত আবূ বকর (রাঁঃ)-এর সঙ্গে, হযরত উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে (সফরে) দু' রাকআত নামায পড়েছি। কিন্তু এখন হযরত উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের শেষ যুগে পূর্ণ পড়তে আরম্ভ করেছেন।'

সহীহ বুখারী শরীফের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট যখন হযরত উসমান (রাঃ)-এর চার রাকআত নামায পড়ার কথা বর্ণিত হয় তখন তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করেন এবং বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মিনায় দু'রাকআত নামায পড়েছি এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-এর সঙ্গেও পড়েছি। সুতরাং যদি আমার ভাগ্যে এ চার রাকআতের পরিবর্তে গৃহীত দু'রাকআতই পড়তো!' অতএব উল্লিখিত হাদীসগুলো এ কথার উপর স্পষ্টভাবে দলীল যে, সফরে নামায 'কসর' করার জন্যে ভয়ের অবস্থা হওয়া শর্ত নয়, বরং সম্পূর্ণ নিরাপদ সফরেও দু'রাকআত আদায় করা যায়। এ জন্যেই উলামা-ই-কিরাম বলেন যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে 'কাইফিয়াত' অর্থাৎ কিরআত, দাঁড়ান, রুকু, সিজদাহ ইত্যাদির মধ্যে কসর বা সংক্ষেপ করা, 'কামইয়াত' অর্থাৎ রাকআতের সংখ্যায় সংক্ষেপ করা নয়। যহ্হাক (রঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)-এর এটাই উক্তি। যেমন পরে আসছে। এর একটি দলীল হচ্ছে ইমাম মালিক (রঃ)-এর বর্ণনাকৃত নিম্নের হাদীসটিঃ হযরত

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নামায দু' দু' রাকআত করেই বাড়ীতে ও সফরে ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সফরে তো দু' রাকআতই থেকে যায়। কিন্তু বাড়ীতে অবস্থানের সময় আরও দু' রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হয়।' সুতরাং আলেমদের এ দলটি বলেন যে, প্রকৃত নামায ছিল দু' রাকআত, তাহলে এ আয়াতে কসরের অর্থ 'কামইয়াত' অর্থাৎ রাকাতের সংখ্যায় কম হওয়া কিরূপে হতে পারে? এই উক্তির স্বপক্ষে খুব বড় শক্তি নিম্নের হাদীস দ্বারা পাওয়া যাচ্ছেঃ

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'সফরে নামায হচ্ছে দু'রাকআত, ঈদুল আযহার নামায দু'রাকআত, ঈদুল ফিৎরের নামায দু'রাকআত এবং জুমার নামায দু'রাকআত, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ভাষায় এ হচ্ছে পূর্ণ নামায, কসর নয়।' এ হাদীসটি সুনান-ই-নাসাঈ, সুনান-ই-ইবনে মাজাহ্ এবং সহীহ ইবনে হিব্বানেও রয়েছে। এর সনদ মুসলিমের শর্তের উপরে রয়েছে। এর একজন বর্ণনাকারী ইবনে আবি লাইলা (রঃ)-এর হযরত উমার (রাঃ) হতে শ্রবণ করা সাব্যস্ত আছে। যেমন ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'সহীহ'-এর ভূমিকার মধ্যে লিখেছেন। স্বয়ং এ বর্ণনায় এবং এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনার মধ্যেও স্পষ্টভাবে এটা বিদ্যমান রয়েছে। আর এটা ইনশাআল্লাহ সঠিকও বটে, যদিও ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (রঃ), ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেন যে, ইবনে আবি লাইলা (রঃ) এটা হযরত উমার (রাঃ) হতে শুনেননি। কিন্তু এটা মেনে নিলেও এ সনদে কোন ত্রুটি থাকে না। কেননা, অন্য কোন পন্থায় হযরত ইবনে আবি লাইলার উপরে সিকাহ্ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন এবং তাঁর হযরত উমার (রাঃ) হতে শ্রবণ বর্ণিত আছে। আর সুনান-ই-ইবনে মাজায় ইবনে আবি লাইলা (রঃ)-এর হযরত কাব ইবনে আজরা হতে এবং তাঁর হযরত উমার (রাঃ) হতে রেওয়ায়াতও বর্ণিত আছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে অব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী (সঃ)-এর ভাষায় তোমাদের উপর নামায ফরয করেছেন বাড়ীতে অবস্থানের সময় চার রাকআত, সফরে দু' রাকআত এবং ভয়ের অবস্থায় এক রাকআত। অতএব বাড়ীতে অবস্থানের সময় এর পূর্বে ও পরে যেমনিভাবে নামায পড়া হতো তেমনিভাবে সফরেও পড়া হবে। এ বর্ণনায় এবং উপরে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় যে রয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা বাড়ীতে অবস্থানের সময়ও দু'রাকআতই ফরয করেছিলেন' এ দু'টো

বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্ব কিছুই নেই। কেননা, মূল তো দু'রাকআতই ছিল পরে আরও দু'রাকআত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তবে এখন বলা যেতে পারে যে, বাড়ীতে অবস্থানের অবস্থায় ফরয চার রাকআতই বটে, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। মোটকথা এ দু'টি বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, সফরে নামায দু'রাকআতই বটে এবং এটাই পূর্ণ নামায, অসম্পূর্ণ নামায নয়, আর হযরত উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হয়েছে। তাহলে 'কসর' বা নামায সংক্ষেপ করণের ভাবার্থ হচ্ছে 'কসর-ই-কাইফিয়াত' অর্থাৎ অবস্থার দিক দিয়ে সংক্ষেপণ, যেমন- 'সলাতুল খাওফ' বা ভয়ের সময়ের নামাযে সংক্ষেপ করা হয়। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন-'যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।' আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এর পরবর্তী আয়াতে বলেনঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ '(হে নবী সঃ) তুমি যখন তাদের মধ্যে থাক তখন তাদের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠিত কর।' অতঃপর নামায সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এর নিয়মাবলীও বর্ণনা করেছেন। ইমামুল মুহাদ্দেসিন হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) كِتَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ কে وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ হতে اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا পর্যন্ত লিখার পর আরম্ভ করেছেন। হযরত যহ্হাক (রঃ) فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ-এর তাফসীরে বলেন যে, এটা হচ্ছে যুদ্ধের সময়, সে সময় মানুষ সোয়ারীর উপর দু' তাকবীরে নামায পড়ে নেবে, তার মুখ যে দিকেই হোক না কেন।

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন, 'যখন তুমি সফরে দু' রাকআত নামায পড়ে নেবে তখন তোমার এ 'কসর' পুরো নামাযই হয়ে গেল। হ্যাঁ, তবে যদি ভয় থাকে যে, কাফিররা বিব্রত করবে তবে 'কসর' এক রাকআতই পড়তে হবে। ভয়ের সময় ছাড়া এক রাকআত 'কসর' হালাল নয়।'

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা ঐ দিনকে বুঝান হয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীগণসহ 'আসফান' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং মুশরিকরা ছিল 'যজনান' নামক স্থানে। একদল অপর দলের উপর আক্রমণের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। এদিকে যোহরের নামাযের সময় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণসহ পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণ চার

রাকআতই আদায় করেন। এদিকে মুশরিকরা মুসলমানদের আসবাবপত্র লুটে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), জাবির (রঃ) এবং হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাই অবলম্বন করেছেন এবং এটাকেই সঠিকও বলেছেন। হযরত খালিদ ইবনে উসায়েদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে বলেন, 'আমরা ভয়ের নামাযের কসরের হুকুম তো আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মধ্যে পাচ্ছি, কিন্তু মুসাফিরের নামাযের কসরের হুকুম তো আল্লাহ পাকের কিতাবে পাওয়া যায় না? 'হযরত ইবনে উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ 'আমরা আমাদের নবী (সঃ) -কে সফরের নামায কসর করতে দেখেছি এবং আমরাও ওটার উপর আমল করেছি।'

লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, হযরত খালিদ ইবনে উসায়েদ (রঃ) কসরের প্রয়োগ ভয়ের নামাযের উপর করলেন এবং আয়াতের ভাবার্থ ভয়ের নামাযই নিলেন, আর মুসাফিরের নামাযকে ওর অন্তর্ভুক্ত করলেন না। আবার হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ওটা সমর্থনও করলেন। এ আয়াত দ্বারা তিনি মুসাফিরের নামাযের কসরের বর্ণনা না দিয়ে বরং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজকে তাঁর জন্যে সনদ করলেন। এর চেয়েও স্পষ্ট হচ্ছে ইবনে জারীর (রঃ)-এর বর্ণনাটি। ওতে রয়েছে যে, হযরত সাম্মাক (রঃ) তাঁকে সফরের নামাযের মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'সফরের নামায দু'রাকআত এবং এ দু'রাকআতই হচ্ছে সফরের পূর্ণ নামায, কসর নয়। কসর তো রয়েছে ভয়ের নামাযে।' ইমাম একটি দলকে এক রাকআত নামায পড়াবেন, অন্য দলটি শত্রুদের সম্মুখে থাকবে। অতঃপর এ দলটি শত্রুদের সামনে চলে যাবে এবং ঐ দলটি চলে আসবে। এ দলটিকে ইমাম সাহেব এক রাকআত নামায পড়াবেন। তাহলে ইমামের দু'রাকআত হবে এবং দল দু'টির এক রাকআত করে হবে।

১০২। এবং যখন তুমি তাদের মধ্যে থাক, তখন তাদের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যেন তাদের একদল তোমার সাথে দণ্ডায়মান হয় এবং স্ব-স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সিজদাহ্

١٠٢- وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ ۚ قف فَإِذَا سَجَدُوا۟

فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ○

সম্পন্ন করে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা নামায পড়েনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে নামায পড়ে এবং স্ব-স্ব আত্মরক্ষিকা ও অস্ত্র গ্রহণ করে এবং অবিশ্বাসীরা ইচ্ছে করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয়; এবং তাতে তোমাদের অপরাধ নেই– যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব-স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

ভয়ের নামায কয়েক প্রকার এবং এর কয়েকটি অবস্থা আছে। কখনও এমন হয় যে, শত্রুরা কিবলার দিকে রয়েছে। কখনও তারা অন্য দিকে হয়। আবার নামাযও কখনও চার রাকআতের হয়। কখনও তিন রাকআতের হয়, যেমন মাগরিব। কখনও আবার দু'রাকআতের হয়, যেমন ফজর ও সফরের নামায। কখনও জামাআতের সাথে পড়া সম্ভব হয়, আবার কখনও শত্রুরা এত মুখোমুখী হয়ে থাকে যে, জামাআতের সাথে নামায পড়া সম্ভবই হয় না। বরং পৃথক পৃথকভাবে কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্য দিকে মুখ করে, পায়ে হেঁটে হেঁটে

বা সোয়ারীর উপরে, যেভাবেই সম্ভব হয় পড়ে নেয়া হয়। বরং এমনও হয় এবং ওটা জায়েযও বটে যে, শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকা হয়, তাদেরকে প্রতিরোধও করা হয়, আবার নামাযও আদায় করে যাওয়া হয়। আলেমগণ শুধু এক রাকআত নামায পড়ারও ফতওয়া দিয়েছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি যা এর পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আতা' (রঃ), জাবির (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ), হাম্মাদ (রঃ), তাঊস (রঃ), যহ্হাক (রঃ), মুহাম্মদ নাসর আল মারূযী (রঃ) এবং ইবনে হাযামেরও (রঃ) এটাই ফতওয়া। এ অবস্থায় যোহরের নামাযে এক রাকআতই রয়ে যায়।

হযরত ইসহাক ইবনে রাহউয়াই (রঃ) বলেন যে, এরূপ দৌড়াদৌড়ির সময় এক রাকআতই যথেষ্ট। ইশারা করেই পড়বে। যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে একটা সিজদাহ করবে। এটাও অল্লাহর যিকির। অন্যেরা বলেন যে, শুধু একটি তাকবীরই যথেষ্ট। কিন্তু এটাও হতে পরে যে, একটি সিজদা ও একটি তাকবীরের ভাবার্থ হচ্ছে এক রাকআত নামায। এটা হচ্ছে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের ফতওয়া। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হযরত কা'ব (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণেরও এটাই উক্তি। কিন্তু যেসব লোক শুধু একটি তাকবীরের কথা বলেছেন তাঁরা ওটাকে পূর্ণ রাকআতের উপর প্রয়োগ করেন না, বরং ভাবার্থ তাকবীরই নিয়ে থাকেন। যেমন এটা হচ্ছে ইসহাক ইবনে রাহ্উয়াইর মাযহাব। আমীর আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে বাখ্ত মাক্কীও (রঃ) ঐ দিকেই গিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেন যে, যদি একটি তাকবীরের উপরও সক্ষম না হয় তবে স্বীয় নাফসের মধ্যেও ওটা ছেড়ে দেবে না। অর্থাৎ শুধু নিয়ত করে নেবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

কোন কোন আলেম এরূপ বিশেষ সময়ে নামাযকে বিলম্বে পড়ারও অবকাশ দিয়েছেন। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরিখার যুদ্ধে সূর্যাস্তের পর যোহর ও আসরের নামায আদায় করেছেন। তার পরে মাগরিব ও ইশার নামায পড়েছেন। এর পরে বানূ কুরাইযার যুদ্ধে যাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদেরকে তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছিলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বানূ কুরাইযাদের নিকট পৌঁছার পূর্বে আসরের নামায না পড়ে।' ঐ লোকগুলো পথে থাকতেই আসরের সময় হয়ে যায়। তখন কেউ কেউ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

আমাদেরকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল শুধু এই যে, আমরা যেন তাড়াতাড়ি বানূ কুরাইযার নিকট পৌঁছে যাই, তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, পথে আসরের সময় হয়ে গেলেও আমরা নামায পড়বো না।' সুতরাং পথেই তাঁরা নামায আদায় করে নেন। অন্যেরা বানূ কুরাইযার নিকট পৌঁছার পর আসরের নামায আদায় করেন। সে সময় সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। নবী (সঃ)-এর সামনে ওটা বর্ণনা করা হলে কোন দলকেই ধমক দিলেন না। আমরা কিতাবুস সীরাতে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তথায় আমরা এটা প্রমাণ করেছি যে, ঐদলটিই বেশী সঠিক কাজ করেছিলেন যাঁরা সময়মত নামায আদায় করেছিলেন। তবে দ্বিতীয় দলটির ওযরও শরীয়ত সমর্থিত ওযরই ছিল। উদ্দেশ্যে এই যে, ঐ দলটি জিহাদের স্থলে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের দুর্গের উপর আক্রমণ অব্যাহত রেখে নামায বিলম্বে আদায় করেন। শত্রুদের ঐ দলটি ছিল অভিশপ্ত ইয়াহূদীর দল। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং সন্ধির শর্তের বিপরীত কাজ করেছিল। কিন্তু জমহূর বলেন যে, খাওফের নামাযের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এসব রহিত হয়ে যায়। এটা ছিল এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। খাওফের নামাযের নির্দেশ জারী হওয়ার পর জিহাদের সময় নামাযকে বিলম্বে পড়ার বৈধতা আর নেই। হযরত আবূ সাঈদ (রঃ)-এর রিওয়ায়েত দ্বারাও এটাই প্রকাশিত হয়েছে, ইমাম শাফিঈ (রঃ) যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে بَابُ الصَّلٰوةِ عِنْدَ مُنَاهِضَةِ الْحُصُوْنِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ এ অধ্যায়ে রয়েছে যে, আওযায়ী (রঃ) বলেনঃ 'যদি বিজয়ের প্রস্তুতি নেয়া হয় ও জামাআতের সঙ্গে নামায পড়া সম্ভবপর না হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় নামায পৃথক পৃথকভাবে ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। যদি ওটাও সম্ভব না হয় তবে বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় অথবা নিরাপত্তা লাভ হয়। অতঃপর দু'রাকআত পড়ে নেবে। কিন্তু যদি নিরাপত্তা লাভ না হয় তবে এক রাকআত আদায় করতে হবে। শুধু তাকবীর পাঠ যথেষ্ট নয়। যদি এ অবস্থাই হয় তবে নামায বিলম্বে পড়তে হবে, যে পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা না আসে।' হযরত মাকহূলেরও (রঃ) এটাই উক্তি।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেনঃ 'তিসতার দুর্গের অবরোধের সময় আমি বিদ্যমান ছিলাম। সুবেহ-সাদিকের সময় ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। আমরা ফজরের নামায পড়তে পারিনি, বরং যুদ্ধেই লিপ্ত ছিলাম। যখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুর্গের উপর বিজয় দান করেন তখন সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার

পর আমরা ফজরের নামায আদায় করি। ঐ যুদ্ধে আমাদের ইমাম ছিলেন হযরত আবূ মূসা (রাঃ)'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'ঐ নামাযের বিনিময়ে সারা দুনিয়া এবং ওর সমুদয় জিনিসও আমাকে খুশি করতে পারে না।'

এরপর ইমাম বুখারী (রঃ) পরিখার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায বিলম্বে পড়ার বর্ণনা দেন। তারপর তিনি বানূ কুরাইযা যুক্ত ঘটনাটি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্ন উক্তিটি আনয়ন করেনঃ 'তোমরা বানূ কুরাইযার নিকট পৌঁছার পূর্বে আসরের নামায আদায় করবে না।' সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী (রঃ) এটাই পছন্দ করেন যে, এরূপ তুমুল যুদ্ধে, ভয়াবহ বিপদ এবং আসন্ন বিজয়ের সময় নামায বিলম্বে আদায় করলে কোন দোষ নেই।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে তিসতার দুর্গ বিজিত হওয়ার ঘটনাটি হযরত উমার ফারূক (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে সংঘটিত হয়। হযরত উমার (রাঃ) বা অন্য কোন সাহাবী যে এর প্রতিবাদ করেছেন এরূপ কোন বর্ণনা নকল করা হয়নি। এসব লোক একথাও বলেন যে, পরিখার যুদ্ধের সময়ও 'খাওফের' নামাযের আয়াতগুলো বিদ্যমান ছিল। কেননা, আয়াতগুলো 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আর এটা হচ্ছে পরিখার যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধ। এর উপর 'সিয়ার' ও 'মাগাযীর' জামহূর-ই-উলামা একমত।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ), ওয়াকেদী (রঃ), ওয়াকেদীর লেখক মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রঃ) এবং খলীফা ইবনে খাইয়াত (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণেরও এটাই উক্তি। তবে ইমাম বুখারী (রঃ) এবং আরও কয়েকজন মনীষীর উক্তি এই যে, 'যাতুর রিকা'র যুদ্ধ পরিখার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর হাদীসটি এবং স্বয়ং তিনি খাইবারেই এসেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর কথা এই যে, আল মুযানী (রঃ), কাযী আবূ ইউসুফ (রঃ) এবং ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে 'আলিয়া (রঃ) বলেন যে, 'সলাতুল খওফ' (ভয়ের নামায) মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরিখার যুদ্ধে নামায বিলম্বে পড়েছেন। এ উক্তি সম্পূর্ণ গারীব। যেহেতু পরিখার যুদ্ধের পরবর্তী 'সলাতুল খওফের' হাদীসগুলো এ নামায রহিত না হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। ঐ দিনে নামায বিলম্বে আদায় করাকে মাকহূল (রঃ) এবং আওযায়ী (রঃ)-এর উক্তির উপর মাহমূল করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। অর্থাৎ তাঁদের ঐ উক্তিটি যা তাঁরা সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন তা এই যে, আসন্ন বিজয়ের সময় নামায আদায় করা অসম্ভব হলে নামায বিলম্বে আদায় করা বৈধ।

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন–'যখন তুমি তাদের মধ্যে থাক তখন তাদের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠিত কর।' অর্থাৎ যখন তুমি ভয়ের নামাযে ইমাম হয়ে নামায পড়াবে। এটা প্রথম অবস্থার সময় নয়। কেননা, সে সময় তো মাত্র এক রাকআত নামায পড়তে হবে এবং ওটাও আবার পৃথক পৃথকভাবে হেঁটে হেঁটে, সোয়ারীর উপরে, কিবলার দিকে মুখ করে বা না করে, বরং যে দিকে মুখ করে পড়া সম্ভব সে দিকেই পড়তে হবে। যেমন এর হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এখন ইমাম ও জামাআতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ আয়াতটি জামাআত ওয়াজিব হওয়ার প্রকৃষ্ট ও দৃঢ় দলীল। জামায়াতের কারণেই এত বড় সুবিধে দান করা হয়েছে। জামাআত ওয়াজিব না হলে এটা বৈধ করা হতো না। কেউ কেউ আবার এ আয়াত দ্বারা অন্য দলীলও গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এ সম্বোধন যখন নবী (সঃ)-কে করা হচ্ছে তখন জানা যাচ্ছে যে, 'সলাতুল খাওফ' -এর হুকুম তাঁর পরে রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল যুক্তি। এ যুক্তি ঐ রকমই যেমন যুক্তি ঐ লোকদের ছিল যারা খোলাফায়ে রাশেদীনকে যাকাত প্রদানে বিরত হয়েছিল এবং তারা কুরআন পাকের নিম্নের আয়াতটিকে দলীল রূপে পেশ করেছিলঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط
اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের মাল হতে যাকাত গ্রহণ কর যদ্দ্বারা তুমি তাদেরকে পাক-পবিত্র করবে এবং তুমি তাদের জন্যে করুণার প্রার্থনা জানাও, নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা তাদের জন্যে শান্তির কারণ হবে।' (৯ঃ ১০৩) এ আয়াতকে কেন্দ্র করেই তারা বলেছিলঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরে আর কাউকেও যাকাতের মাল প্রদান করবো না, বরং স্বহস্তে যাকে চাইবো তাকেই দেবো। আর শুধু তাকেই দেবো যার প্রার্থনা আমাদের জন্যে শান্তির কারণ হবে।' কিন্তু ওটা তাদের বাজে যুক্তি ছিল। এ কারণেই সাহাবীগণ তাদের যুক্তি অগ্রাহ্য করেন এবং তাদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। আর তাদের মধ্যে যারা এর পরেও যাকাত প্রদানে বিরত থাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

এখন আমরা এ আয়াতটির 'সিফাত' বর্ণনা করার পূর্বে তার শান-ই-নযূল বর্ণনা করছি। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, বানূ নাজ্জারের একটি গোত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা তো প্রায়ই ভূ-পৃষ্ঠে পর্যটন করে থাকি। অতএব আমরা নামায কিরূপে আদায় করবো?' তখন আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ 'যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে পর্যটন কর তখন তোমরা নামায 'কসর' (সংক্ষেপ) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই'-এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর বছর ধরে আর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক যুদ্ধে ছিলেন। তথায় তিনি যোহরের নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। মুশরিকরা তখন পরস্পর বলাবলি করে, 'খুব ভাল সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি মুসলমানদেরকে তাদের এ নামাযের অবস্থায় একযোগে অকস্মাৎ আক্রমণ করতে পারতাম।' একথা শুনে অপর একজন বলে, 'এ সুযোগ তো তোমরা আবার পাবে। ক্ষণেক পরেই তো তারা অপর একটি নামাযের (আসরের) জন্যে দাঁড়াবে।' কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আসরের নামাযের পূর্বেই এবং যোহরের পরে إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا হতে পূর্ণ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ করেন। ফলে কাফিররা বিফল মনোরথ হয়। এ বর্ণনাটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল হলেও ওকে দৃঢ়কারী অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে। হযরত আবূ আইয়াশ (রাঃ) বলেন, 'আসফান' নামক স্থানে আমরা নবী করীম (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) সে সময় কুফরীর অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুশরিক সেনাবাহিনীর সেনাপতি। মুশরিকরা আমাদের সামনে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে আমরা যোহরের নামায আদায় করি। মুশরিকরা তখন পরস্পর বলাবলি করেঃ 'আমরা তো সুযোগ ছেড়ে দিলাম। সময় এমন ছিল যে, তারা নামাযে লিপ্ত ছিল, এ অবস্থায় আমরা তাদেরকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতাম।' তখন তাদের কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি বললো, 'ভাল, কোন অসুবিধে নেই। এরপরে আর একটা নামাযের সময় আসছে এবং সে সময় নামায তাদের নিকট তাদের পুত্র ও স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।' অতঃপর যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ-এ আয়াতটি নিয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে আসরের নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে অস্ত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আমরা তখন অস্ত্র গ্রহণ করতঃ তাঁর

পিছনে দু'টি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। অতঃপর তিনি রুকু' করলে আমরা সবাই রুকূ' করি। তারপর নবী (সঃ) সিজদা করেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর পিছনের প্রথম সারির লোকেরাও সিজদা করে এবং অন্য সারির লোকেরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারপর যখন এ লোকগুলো সিজদাকার্য সমাপ্ত করে দাঁড়িয়ে যায় তখন দ্বিতীয় সারির লোকগুলো সিজদায় চলে যায়। যখন এ দু'টি সারির লোকেরই সিজদা করা হয়ে যায় তখন প্রথম সারির লোকগুলো দ্বিতীয় সারির লোকদের স্থানে চলে যায়, আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের স্থানে চলে আসে। এরপর কিয়াম, রুকু' এবং কাওমা সবই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গেই আদায় করে। তারপর যখন তিনি সিজদায় যান তখন প্রথম সারির লোকেরা তাঁর সাথে সিজদা করে এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। যখন প্রথম সারির লোকেরা সিজদা সেরে আত্তাহিয়্যাতে বসে পড়ে তখন দ্বিতীয় সারির লোকগুলো সিজদায় যায় এবং আত্তাহিয়্যাতে সবাই এক সঙ্গে হয়ে যায় এবং সালামও সকলেই নবী (সঃ)-এর সঙ্গে এক সাথেই ফিরায়।

'সালাতুল খাওফ' (ভয়ের নামায) রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার প্রথমে এ 'আসফান' নামক স্থানে পড়েন এবং দ্বিতীয়বার বানূ সালিমের ভূমিতে পড়েন।' এ হাদীসটি মুসনাদ-ই-আহমাদ, সুনান-ই-আবি দাঊদ এবং সুনান-ই-নাসাঈর মধ্যেও রয়েছে। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং এর 'শাহেদ'ও অনেক রয়েছে।

সহীহ বুখারীর মধ্যেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে এবং তাতে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'নবী (সঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি তাকবীর বললে তারাও তাকবীর বলে। তিনি রুকু' করলে লোকেরাও তাঁর সাথে রুকু' করে। অতঃপর তিনি সিজদা করলে তারাও তাঁর সাথে সিজদা করে। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর সাথে তারাও দাঁড়িয়ে যান যারা তাঁর সাথে সিজদা করেছিল এবং তারপরে তারা তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে থাকে। অতঃপর দ্বিতীয় দল চলে আসে তারা তাঁর সাথে রুকু' ও সিজদা করে। লোকেরা সবাই নামাযের মধ্যেই ছিল বটে, কিন্তু একে অপরকে পাহারাও দিচ্ছিল।'

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত সুলাইমান ইবনে কায়েস ইয়াসকারী (রঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'নামায 'কসর' করার হুকুম কখন অবতীর্ণ হয়েছে?' তখন তিনি বলেন,

'কুরাইশদের একটি যাত্রী দল সিরিয়া হতে আসছিল। আমরা তাদের দিকে গমন করি। আমরা 'নাখল' নামক স্থানে পৌঁছলে একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁকে বলে, 'হে মুহাম্মাদ ! আপনি কি আমাকে ভয় করেন না?' তিনি বলেনঃ 'না।' সে বলেঃ' আপনাকে আমা হতে কে বাঁচাতে পারে?' তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়ে নেবেন।' অতঃপর তিনি তরবারী বের করে তাকে ধমক দেন ও ভয় প্রদর্শন করেন। তারপর তিনি তথা হতে প্রস্থানের নির্দেশ দেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে চলতে আরম্ভ করেন। অতঃপর আযান দেয়া হয় এবং সাহাবীগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। একদল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায আদায় করছিলেন এবং অন্য দল পাহারা দিচ্ছিলেন। যে দলটি তাঁর সাথে মিলিত ছিলেন তাঁরা তাঁর সাথে দু'রাকআত পড়ে নেন। অতঃপর পিছনে সরে গিয়ে অন্য দলটির স্থানে চলে যান এবং ঐদলটি তখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে প্রথম দলটির স্থানে দাঁড়িয়ে যান। তাঁদেরকেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'রাকআত পড়িয়ে দেন এবং সালাম ফেরান। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চার রাকআত হয় এবং ঐ দু'দলের-দু'রাকআত করে হয়, আর আল্লাহ তা'আলা নামায সংক্ষেপ করার ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে রাখার হুকুম নাযিল করেন।'

মুসনাদ-ই-আহমাদের এ হাদীসেই রয়েছে যে, যে লোকটি তরবারী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল সে শত্রুগোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তার নাম ছিল গারাস ইবনে হারিস। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করেন তখন তার হাত হতে তরবারী পড়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সে তরবারী উঠিয়ে নেন। অতঃপর তাকে বলেনঃ 'এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?' সে তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ 'তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল?' সে বলেঃ 'না, তবে আমি এটা স্বীকার করছি যে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবো না এবং যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদেরও সহযোগিতা করবো না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ছেড়ে দেন। সে নিজের লোকদের নিকট গিয়ে বলে, 'আমি দুনিয়ার সর্বোত্তম লোকের নিকট হতে তোমাদের নিকট এসেছি।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, ইয়াযীদ আল ফাকীর (রঃ) হযরত জাবীর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 'সফরে যে দু'রাকআত নামায রয়েছে ওটা কি 'কসর'? তিনি উত্তরে বলেনঃ ওটা

পূর্ণ নামায। 'কসর' তো জিহাদের সময় মাত্র এক রাকআত।' অতঃপর তিনি এভাবেই 'সলাতুল খাওফ'-এরও বর্ণনা দেন। তাতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সালামের সাথে পিছনের লোকগুলোও সালাম ফেরান, আর ঐ লোকগুলোও সালাম ফেরান। তাতে উভয় অংশের সৈন্যদের সাথে এক রাকআত করে নামায পড়ার বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং সকলেরই এক রাকআত করে হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দু'রাকআত হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একটি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে নামায পড়ছিলেন এবং অন্য দল শত্রুর সম্মুখে ছিলেন। এক রাকআতের পর তাঁর পিছনের লোকগুলো ঐ দলের স্থানে চলে যান এবং তাঁরা এখানে চলে আসেন। এ হাদীসটি বহু পুস্তকে বহু সনদসহ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে। আর যে হাদীসটি হযরত সালিম (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন তাতে এও রয়েছে যে, পরে সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে নিজে নিজে এক রাকআত করে আদায় করে নেন। ঐ হাদীসটিরও বহু সনদ ও বহু শব্দ রয়েছে। হাফিয আবূ বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) এ সমস্তই জমা করেছেন এবং ঐ রকমই ইবনে জারীরও (রঃ) জমা করেছেন। এটা আমরা ইন্‌শাআল্লাহ কিতাবুল আহকামিল কাবীরে লিখবো।

কারও কারও মতে ভয়ের নামাযে অস্ত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ বাধ্যাতামূলক। কেননা, আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলো দ্বারা এটাই বুঝা যায়। ইমাম শাফিঈরও (রঃ) এটাই উক্তি। এ আয়াতেরই পরবর্তী বাক্য এ উক্তির অনুকূলে রয়েছে। তথায় বলা হয়েছে-'যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ কর তবে এতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।'

তারপর বলা হচ্ছে-'তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে গ্রহণ কর।' অর্থাৎ এমন প্রস্তুত থাক যে, সময় আসলেই যেন বিনা কষ্ট ও অসুবিধেতেই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হতে পার। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১০৩। অনন্তর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর তখন দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট এবং এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন

١٠٣- فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَنْتُمْ

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

তোমরা নিরাপদ হও তখন নামায প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই নামায বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন–'সলাতুল খাওফ' বা ভয়ের সময়ের নামাযের পর তোমরা খুব বেশী করে আল্লাহ তা'আলা যিকির করবে, যদিও তাঁর যিকিরের নির্দেশ এবং ওর গুরুত্ব অন্য নামাযের পরেও এমন কি সব সময়ের জন্যেই রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে এজন্যেই বর্ণনা করেছেন যে, এখানে তিনি বান্দাহকে খুব বড় অবকাশ দান করেছেন। তিনি নামায হালকা করে দিয়েছেন। তাছাড়া নামাযের অবস্থায় এদিক ওদিকে সরে যাওয়া এবং যাতায়াত করা উপযোগীতা অনুযায়ী বৈধ করেছেন। যেমন তিনি মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলো সম্পর্কে বলেছেন–

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা ঐ গুলোর ব্যাপারে তোমাদের নাফসের উপর অত্যাচার করো না।' (৯ঃ ৩৬) যদিও অন্যান্য মাসেও অত্যাচার নিষিদ্ধ তথাপি এ পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে ওর থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সব সময়ই আল্লাহ তা'আলার যিকির করতে থাক এবং যখন শান্তি এসে যাবে, কোন ভয় ও সন্ত্রাস থাকবে না তখন নিয়মিতভাবে বিনয়ের সাথে নামাযের রুকনগুলো শরীয়ত মুতাবিক আদায় কর। এ নামায তোমাদের উপর নির্ধারিত সময়েই ফরযে আইন করে দেয়া হয়েছে।

হজ্বের সময় যেমন নির্ধারিত রয়েছে, তদ্রূপ নামাযের সময়ও নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম সময়ের পরে দ্বিতীয় সময় এবং দ্বিতীয় সময়ের পরে তৃতীয় সময়।

١٠٤- وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ

১০৪। এবং সেই সম্প্রদায়ের অনুসরণ শৈথিল্য করো না যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তবে তারাও তোমাদের

فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝	অনুরূপ কষ্ট ভোগ করেছে; এবং তৎসহ আল্লাহ হতে তোমাদের যে ভরসা আছে, তাদের সে ভরসা নেই; এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

এরপর বলা হয়েছে যে, তোমরা শত্রুদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। চাতুরীর সাথে গোপনীয় জায়গায় বসে থেকে তাদের খবরাখরব নিতে থাকো। তোমরা যদি নিহত বা আহত হও অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাক তবে তোমাদের শত্রুগণও তো এরূপ হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকেই নিম্নের শব্দগুলোর দ্বারাও বর্ণনা করা হয়েছেঃ

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ

অর্থাৎ 'তোমাদেরকে যদি কষ্ট পৌঁছে থাকে তবে ঐরূপ কষ্ট তো ঐ সম্প্রদায়কেও স্পর্শ করেছিল।' (৩ঃ ১৪০) তাহলে বিপদ ও কষ্টে পতিত হওয়ার ব্যাপারে তোমরা ও কাফিরেরা সমান। তবে হ্যাঁ, তোমাদের এবং ওদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা ঐসব আশা করে থাকো যেসব আশা তারা করে না। তোমরা এর পুণ্য ও প্রতিদানও পাবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হবে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এর অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর অঙ্গীকার টলতে পারে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের তুলনায় তোমাদের মধ্যেই তো বেশী কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যোগ থাকা উচিত। তোমাদের অন্তরেই খুব বেশী জিহাদের উদ্যম থাকা দরকার। পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত, ছড়ানো এবং সুউচ্চ করার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সদা-সর্বদা শিহরণ ও উত্তেজনা জেগে উঠা উচিত। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ভাগ্যে লিখে দেন, যা কিছু ফায়সালা করেন, যত কিছু চালু করেন, যে শরীয়ত তিনি নির্ধারণ করেন এবং যে কাজই করেন সব কিছুর ব্যাপারেই তিনি মহাজ্ঞানী ও চরম বিজ্ঞানময়। সর্বাবস্থাতেই তিনি মহা প্রশংসিত।

١٠٥- اِنَّآ اَنزَلنَآ اِلَيكَ الكِتٰبَ بِالحَقِّ لِتَحكُمَ بَينَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُن لِّلخَآئِنِينَ خَصِيمًا

১০৫। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদেরকে আদেশ প্রদান কর–যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না ।

١٠٦- وَّاستَغفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

১০৬। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

١٠٧- وَلَا تُجَادِل عَنِ الَّذِينَ يَختَانُونَ اَنفُسَهُم اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا

১০৭। এবং যারা স্বীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে ভালবাসেন না।

١٠٨- يَستَخفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَستَخفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُم اِذ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرضٰى مِنَ القَولِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعمَلُونَ مُحِيطًا

১০৮। তারা মানব হতে আত্মগোপন করে, কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করতে পারে না; এবং তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন– যখন তারা রজনীতে তাঁর অপ্রিয় বাক্যে পরামর্শ করে; এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

১০৯। সাবধান– তোমরাই ঐ লোক, যারা ওদের পক্ষ হতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহর সাথে বির্তক করবে এবং কে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে?

١٠٩- هَانْتُمْ هٰؤُلَاۤءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন–'হে নবী (সঃ)! আমি তোমার উপর যে কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছি তার আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সবই সত্য। ওর খবর সত্য এবং ওর নির্দেশ সত্য।' তারপরে বলা হচ্ছে–'যেন তুমি জনগণের মধ্যে ঐ ন্যায় বিচার করতে পার যা আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন।'

কোন কোন নীতিশাস্ত্রবিদ এর দ্বারা দলীল নিয়েছেন যে, নবী (সঃ)-কে ইজতিহাদ দ্বারা ফায়সালা করার অধিকার দেয়া হয়েছিল। এর দলীল ঐ হাদীসটিও বটে যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দরজার উপর বিবাদে লিপ্ত দু'ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনে বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, আমি একজন মানুষ। যা শুনি সে অনুযায়ী ফায়সালা করে থাকি। খুব সম্ভব যে, এক ব্যক্তি খুব যুক্তিবাদী এবং বাকপটু, আমি তার কথা সঠিক মনে করে হয়তো তার অনুকূলেই মীমাংসা করে দেবো, কিন্তু যার অনুকূলে মীমাংসা করবো সে হয়তো প্রকৃত হকদার নয়। সে যেন এটা বুঝে নেয় যে, ওটা তার জন্যে জাহান্নামের আগুনের একটি খণ্ড। এখন তার অধিকার রয়েছে যে, হয় সে তা গ্রহণ করবে, না হয় ছেড়ে দেবে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, দু'জন আনসারী একটা উত্তরাধিকারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মামলা নিয়ে উপস্থিত হন। তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের নিকট উপরোক্ত হাদীসটিই বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ "কেউ যেন আমার ফায়সালার উপর ভিত্তি করে তার ভাই-এর সামান্য হকও গ্রহণ না করে। যদি এরূপ করে তবে কিয়ামতের দিন সে স্বীয় স্কন্ধে জাহান্নামের আগুন বুঝিয়ে নিয়ে আসবে।" তখন

ঐ দু'জন মনীষী ক্রন্দনে ফেটে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বলেনঃ "আমার নিজের হকও আমি আমার ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁদেরকে বলেনঃ "তোমরা যখন একথাই বলছো তখন যাও এবং তোমাদের বিবেচনায় যতদূর সম্ভব হয় ঠিকভাবে অংশ ফেলে দাও। তারপর নির্বাচনের গুটিকা নিক্ষেপ করতঃ নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় ভ্রাতার অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত হক ক্ষমা করে দাও।"

সূনান-ই-আবি দাঊদের মধ্যেও এ হাদীসটি রয়েছে। তাতে এ শব্দগুলোও রয়েছেঃ "আমি তোমাদের মধ্যে স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ঐ সব বিষয়ে ফায়সালা করে থাকি যেসব বিষয়ে কোন অহী অবতীর্ণ হয় না।"

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে রয়েছে যে, আনসারদের একটি দল এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তথায় এক ব্যক্তির একটি বর্ম চুরি হয়ে যায়। লোকটি ধারণা করেন যে, তা'মা ইব্‌নে উবাইরিক বর্মটি চুরি করেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে ঘটনাটি পেশ করা হয়। চোরটি ঐ বর্ম এক ব্যক্তির ঘরে তার অজান্তে ফেলে দেয় এবং স্বীয় গোত্রীয় লোকদেরকে বলেঃ "আমি বর্মটি অমুকের ঘরে ফেলে দিয়েছি। তোমরা তার নিকটে তা পাবে।" তার গোত্রীয় লোকগুলো তখন নবী (সঃ)-এর নিকট গমন করে বলে, "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমাদের সঙ্গী তো চোর নয় বরং চোর হচ্ছে অমুক ব্যক্তি। আমরা অনুসন্ধান নিয়ে জেনেছি যে, বর্মটি তার ঘরেই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আপনি জন সম্মুখে আমাদের সঙ্গীটির নির্দোষিতা ঘোষণা করতঃ তাকে রক্ষা করুন। নচেৎ ভয় আছে যে, সে ধ্বংস হয়ে যায় না কি!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন দাঁড়িয়ে জনগণের সামনে তাকে দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করেন। তখন উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। আর যে লোকগুলো মিথ্যা গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসেছিল তাদের ব্যাপারে يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ হতে দুটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِاحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

অর্থাৎ 'যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, তৎপর ওর অপবাদ কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, তবে সে নিজেই সেই অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।' এর দ্বারাও এ লোকগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চোর এবং চোরের পক্ষ হতে বিতর্ককারীদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ বর্ণনাটি গারীব ও দুর্বল।

কোন কোন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি বানূ উবাইরিকের চোরের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এ ঘটনাটি জামিউত তিরমিযীর কিতাবুত তাফসীরের মধ্যে হযরত কাতাদাহ্ ইবনে নোমান (রাঃ)-এর ভাষায় সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত আছে। হযরত কাতাদাহ্ ইব্নে নোমান (রাঃ) বলেনঃ 'আমার গোত্রের মধ্যে বাশার, বাশীর ও মুবাশশার নামক তিনজন লোক ছিল যাদেরকে বানূ উবাইরিক বলা হতো। বাশীর ছিল একজন মুনাফিক। সে কবিতা রচনা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণের দুর্নাম করতো। অতঃপর সে কোন একজন আরবীর দিকে ঐ কবিতার সম্বন্ধ লাগিয়ে দিয়ে বেশ আগ্রহ সহকারে পাঠ করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, এ খাবীসই হচ্ছে এ কবিতাগুলোর রচয়িতা। এ লোকগুলো অজ্ঞতার যুগ হতেই ছিল দরিদ্র ও অভাবী। মদীনার লোকদের সাধারণ খাবার ছিল যব ও খেজুর। তবে ধনী লোকেরা সিরিয়া হতে আগত যাত্রীদের নিকট হতে ময়দা ক্রয় করতো যা তারা নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিতো। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা সাধারণতঃ যব ও খেজুরই ভক্ষণ করতো। আমার চাচা রিফাআ' ইব্নে যায়েদও (রাঃ) সিরিয়া হতে আগত যাত্রীদলের নিকট হতে এক বোঝা ময়দা ক্রয় করেন এবং তা তাঁর এক কক্ষে রেখে দেন যেখানে অস্ত্র শস্ত্র, লৌহবর্ম এবং তরবারী ইত্যাদিও রক্ষিত ছিল। রাত্রে চোরেরা নীচ দিয়ে সিঁদ কেটে ময়দাও বের করে নেয় এবং অস্ত্র-শস্ত্রগুলোও উঠিয়ে নেয়। সকালে আমার চাচা আমার নিকট এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। তখন আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারি যে, আজ রাত্রে বানূ উবাইরিকের ঘরে আগুন জ্বলছিল এবং তারা কিছু খাদ্য রান্না করছিল। আমাদেরকে বলা হয়ঃ 'সম্ভবতঃ আপনাদের বাড়ী হতেই তারা খাদ্য চুরি করে এনেছিল।' এর পূর্বে আমরা যখন আমাদের পরিবারের লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন ঐ গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে বলেছিল, 'তোমাদের চোর হচ্ছে লাবীদ ইব্নে সহল।' আমরা জানতাম যে, একাজ লাবীদের নয়, সে ছিল একজন বিশ্বস্ত খাঁটি মুসলমান। হযরত লাবীদ (রাঃ) এ সংবাদ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তরবারী নিয়ে বানূ উবাইরিকের নিকট এসে বলেনঃ 'তোমরা আমার চুরি সাব্যস্ত কর, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করে দেবো।' তখন তারা তাঁর নির্দোষিতা স্বীকার করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমরা পূর্ণ তদন্তের পর বুঝতে পারি যে, বানূ উবাইরিকই চুরি করেছে। আমার চাচা আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে তুমি তাঁকে

সংবাদটা দিয়ে এসো।' আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি এবং একথাও বলি যে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্রগুলো আদায় করে দিন। খাদ্য ফিরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ 'আচ্ছা, আমি তদন্ত করে দেখছি।'

বানূ উবাইরিকের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তাঁরা হযরত উসায়েদ ইব্নে উরওয়া (রাঃ) নামক এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করে। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতো জুলুম হচ্ছে, বানূ উবাইরিক তো সৎ ও ইসলামপন্থী লোক। তাদের উপর কাতাদাহ্ ইব্নে নোমান (রাঃ) ও তাঁর চাচা চুরির অপবাদ দিচ্ছেন!' অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বলেনঃ 'তুমি তো এটা ভাল কাজ করছো না যে, দ্বীনদার ও ভাল লোকদের উপর চুরির অপবাদ দিচ্ছ, অথচ তোমার নিকট কোন প্রমাণও নেই।' আমি নিরুত্তর হয়ে চলে আসি এবং মনে মনে খুব লজ্জিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। আমার ধারণা হয় যে, ঐ মাল সম্বন্ধে যদি নীরব থাকতাম এবং নবী (সঃ)-এর সঙ্গে কোন আলোচনাই না করতাম তাহলেই ভাল হতো। এমন সময় আমার চাচা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি করে আসলে?' আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। শুনে তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি।' তিনি চলে যাওয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। সুতরাং خَآئِنِيْنَ দ্বারা বানূ উবারিককেই বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ)-কে তিনি যে কথা বলেছিলেন তার জন্যে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয় এবং এ কথাও বলা হয় যে, এলোকগুলো যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ হতে فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا পর্যন্ত এবং وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ হতে اِثْمًا مُّبِيْنًا পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। এগুলো হযরত লাবীদ (রাঃ)-এর ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। কেননা, বানূ উবাইরিক তাঁর উপর চুরির অপবাদ দিয়েছিল, অথচ তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানূ উবাইরিকের নিকট হতে আমাদের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো আদায় করে দেন। আমি ঐগুলো নিয়ে আমার চাচার নিকট গমন করি। তিনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে, চোখেও কম দেখতেন। তিনি আমাকে বলেন, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এ অস্ত্রগুলো তুমি আল্লাহ তা'আলার নামে দান করে দাও।' এতদিন পর্যন্ত

আমার চাচার প্রতি আমার কিছুটা বদ ধারণা ছিল যে, তিনি অন্তরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেননি। কিন্তু এ ঘটনাটি আমার অন্তর হতে এ কু-ধারণা দূর করে দেয়। তখন আমি তাঁকে খাঁটি মুসলমানরূপে স্বীকার করে নেই। বাশীর এ আয়াতগুলো শুনে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়ে যায় এবং সালাফা বিনতে সাদ ইব্‌নে সুমিয়্যার নিকটে অবস্থান করে। তারই ব্যাপারে وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ হতে فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

হযরত হাসসান (রাঃ) স্বীয় কবিতার মাধ্যমে বাশীরের এ জঘন্য কার্যের নিন্দে করেন। এ কবিতাগুলো শুনে সালাফা নাম্নী স্ত্রীলোকটি খুবই লজ্জিতা হয় এবং বাশীরের সমস্ত আসবাবপত্র মস্তকে বহন করে নিয়ে গিয়ে 'আবতাহ্' নামক মাঠে নিক্ষেপ করে এবং তাকে বলে, তুমি কোন মঙ্গল নিয়ে আমার নিকট আসনি, বরং হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-এর কবিতাগুলো নিয়ে এসেছো। আমি তোমাকে আমার নিকট স্থান দেবো না। এ বর্ণনা বহু কিতাবে বহু সনদে দীর্ঘাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ মুনাফিকদের জ্ঞানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের মন্দ কার্যাবলী জনগণের নিকট গোপন করছে বটে কিন্তু এতে লাভ কি? তারা সেটা আল্লাহ্ তা'আলা হতে গোপন করতে পারবে না। অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন—'মানলাম যে, এভাবে তোমাদের কার্যকলাপ গোপন করতঃ তোমরা পৃথিবীর বিচারকদের নিকট হতে বেঁচে গেলে, কেননা তারা বাহ্যিকের উপর ফায়সালা দিয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা সেই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে কি উত্তর দেবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই জানেন? তথায় তোমরা তোমাদের মিথ্যা দাবীকে সত্যরূপে প্রমাণ করার জন্যে কাকে উকিল করে পাঠাবে? মোটকথা সে দিন তোমাদের কোন কৌশলই ফলদায়ক হবে না।'

১১০। এবং যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় প্রাপ্ত হবে।

١١٠- وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১১১। এবং যে কেউ পাপ অর্জন করে, বস্তুতঃ সে স্বীয় আত্মার প্রতিই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

١١١- وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১১২। আর যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, তৎপরে ওটা নিরপরাধের প্রতি আরোপ করে, তবে সে নিজেই সে অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।

١١٢- وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْۗـــَٔةً اَوْ اِثْمًـا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۗــًٔا فَـقَـدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ ع

১১৩। আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তবে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রান্ত করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, এবং তারা নিজেদেরকে ছাড়া বিপদগামী করেনি আর তারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারবে না; এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; এবং তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।

١١٣- وَلَوْ لَا فَـضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْـمَتُـهٗ لَهَـمَّتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۭ وَمَــا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُســـَهُمْ وَمَــا يَضُـرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۭ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۭ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, কেউ কোন পাপকার্য সম্পাদনের পর তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা

দয়া করে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ পাক তাকে স্বীয় অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার ছোট ও বড় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। যদিও সে পাপ আকাশ, যমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয়।

বানী ইসরাঈলের মধ্য যখন কেউ কোন পাপ করতো তখন তার দরজার উপর কুদরতী অক্ষরে ওর কাফ্ফারা লিখা হয়ে যেতো। সে কাফ্ফারা তাকে আদায় করতে হতো। তাদের কাপড়ে প্রস্রাব লেগে গেলে তাদের উপর ঐ পরিমাণ কাপড় কেটে নেয়ার নির্দেশ ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতের উপর এ সহজ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, ঐ কাপড় পানি দ্বারা ধৌত করলেই পবিত্র হয়ে যাবে এবং পাপের জন্য তাওবা করলেই তা মাফ হয়ে যাবে।

একটি স্ত্রীলোক হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মুগাফ্ফালকে একটি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ফত্ওয়া জিজ্ঞেস করে যে ব্যভিচার করেছিল এবং ওর ফলে একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছিল, তাকে সে হত্যা করে ফেলেছে। হযরত মুগাফফাল (রাঃ) তখন বলেন যে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। তখন স্ত্রীলোকটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। হযরত মুগাফফাল তখন তাকে ডেকে وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْۤءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়ে দেন। অর্থাৎ 'যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করার পর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় প্রাপ্ত হবে।' তখন স্ত্রীলোকটি চোখের অশ্রু মুছে ফেলে এবং তথা হতে ফিরে যায়।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে মুসলমান কোন পাপ করার পর অযু করে দু'রাকআত নামায আদায় করতঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করে থাকেন। অতঃপর তিনি وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً الخ (৩ঃ ১৩৫)-এ আয়াতটি পাঠ করেন।' আমরা 'মুসনাদ-ই-আবূ বকর'-এ এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি এবং কিছু বর্ণনা সূরাঃ আলে ইমরানের তাফসীরে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবূ দ্দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি মাঝে মাঝে মজলিস হতে উঠে নিজের কোন কাজের জন্য যেতেন এবং ফিরে আসার ইচ্ছে থাকলে জুতা বা কাপড় কিছু না কিছু অবশ্যই ছেড়ে যেতেন।

একদা তিনি স্বীয় জুতা রেখে এক বরতন পানি নিয়ে গমন করেন। আমিও তাঁর পিছনে চলতে থাকি। কিছু দূর গিয়ে তিনি হাজত পুরো না করেই ফিরে আসেন এবং বলেনঃ 'আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার নিকট একজন আগন্তুক এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে এ পয়গাম দিয়ে গেলেন যে, وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কোন দুষ্কার্য করে বা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় রূপে প্রাপ্ত হবে। আমি আমার সাহাবীগণকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্যে রাস্তা হতেই ফিরে আসছি।' কেননা এর পূর্বে مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ অর্থাৎ 'যে খারাপ কাজ করবে তাকে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।'(৪ঃ ১২৩) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ফলে ওটা সাহাবীগণের নিকট খুব কঠিন বলে মনে হয়েছিল। আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও কি আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন? তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ।' আমি দ্বিতীয়বার এ কথাই বলি। তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ। তৃতীয়বারও ঐ কথাই আমি বলি। তখন তিনি বলেনঃ 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। যদিও আবুদ্দারদার নাক ধূলায় ধূসরিত হয়।' এরপর যখনই হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখনই স্বীয় নাকের উপর হাত মেরে বলতেন। হাদীসটির ইসনাদ দুর্বল এবং এটা গারীবও বটে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– যে কেউ পাপ অর্জন করে সে নিজের উপরই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ "কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।" (৬ঃ ১৬৫) অর্থাৎ একে অপরের কোন উপকার করতে পারবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তার কর্মের ফল অন্য কেউ ভোগ করবে না। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ 'তিনি মহাজ্ঞানী; বিজ্ঞানময়।' তাঁর জ্ঞান, তাঁর নিপুণতা, তাঁর ন্যায়নীতি এবং তাঁর করুণা এর উল্টো যে, একের পাপের কারণে তিনি অপরকে ধরবেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন– যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, তৎপর নিরপরাধের প্রতি দোষারোপ করে, সে নিজেই সেই অপরাধ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে। যেমন বানূ উবাইরিক হযরত লাবিদ ইব্নে সহল (রাঃ)-এর

নাম করেছিল– যে ঘটনাটি এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অথবা এর দ্বারা যায়েদ ইব্নে সামীনকে বুঝানো হয়েছে, যেমন এটা কোন কোন মুফাস্সীরের ধারণা যে, ঐ ইয়াহূদীর গোত্র একজন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর চুরির অপবাদ দিয়েছিল, অথচ স্বয়ং তাদের লোকই ছিল বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী। আয়াতটি শান-ই-নযূল হিসেবে বিশিষ্ট হলেও হুকুমের দিক দিয়ে এটা সাধারণ, যে কেউই এ কাজ করবে সেই আল্লাহ তা'আলার শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এর পরবর্তী وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ -এ আয়াতের সম্পর্কও এ ঘটনার সঙ্গেই রয়েছে। অর্থাৎ উসাইদ ইব্নে উরওয়া এবং তার সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে বানূ উবাইরিকের চোরকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রকৃত রহস্য হতে সরিয়ে দেয়ার সমস্ত কার্যপ্রণালীই শেষ করে ফেলেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ হচ্ছেন তাঁর প্রকৃত রক্ষক। তাই তিনি স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে এ বিপজ্জনক অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতি করার দোষ হতে বাঁচিয়ে নেন এবং প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করে দেন।

এখানে 'কিতাব' শব্দ দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে এবং حِكْمَت শব্দ দ্বারা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা জানতেন না, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেন। তাই তিনি বলেন, وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ অর্থাৎ 'তিনি তোমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন যা তুমি জানতে না।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ (৪২ঃ ৫২) হতে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ (২৮ঃ ৮৬) এজন্যে এখানেও বলেছেন– وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا অর্থাৎ 'তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা রয়েছে।'

১১৪। সাধারণ লোকের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না, হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি এরূপ যে দান অথবা কোন সৎ কাজ কিংবা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি

١١٤- لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ط

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○

করে দেবার উৎসাহ প্রদান করে, এবং যে আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্যে ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করবো।

১১৫- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○

১১৫। আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তবে সে যাতে অভিনিবিষ্ট- আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করবো ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।

জনগণের অধিকাংশ কথাই অমঙ্গলজনক হয়। তবে কতক লোক এমনও আছে যে, তারা মানুষকে দান খয়রাত করার, সৎকার্য সাধনের এবং পরস্পর মিলেমিশে থাকার উৎসাহ দিয়ে থাকে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ রয়েছে, হযরত যায়েদ ইব্‌নে হুনায়েশ (রঃ) বলেন, 'হযরত সুফইয়ান সাওয়ারী (রঃ) রোগ শয্যায় শায়িত হলে আমরা তাঁকে দেখতে যাই। আমাদের সঙ্গে হযরত সাঈদ ইব্‌নে হাস্‌সানও (রঃ) ছিলেন। হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) হযরত সাঈদ (রঃ)-কে বলেন, 'হে সাঈদ (রাঃ)! আপনি উম্মে সালেহ্ হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তা আজকে আবার বর্ণনা করুন।' হযরত সাঈদ ইব্‌নে হাস্‌সান (রঃ) বর্ণনা করতঃ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মানুষের সমস্ত কথাই তার জন্যে অমঙ্গল আনয়ন করে, তবে যদি সে আল্লাহর, যিকির, মানুষকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে (তবে সেটা মঙ্গলজনক)'। তখন হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন, 'এ বিষয়টিই

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا। -এ আয়াতে রয়েছে। لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ الخ -(৭৮ঃ ৩৮) -এ আয়াতেও রয়েছে এবং وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ -লা ইয়াতাকাল্লামূন الخ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ الخ (১০৩ঃ ১-২) -এ আয়াতেও রয়েছে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ 'জনগণের মধ্যে মিলজুল এবং সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে বা এদিক হতে ওদিকে এ প্রকারের আলাপ আলোচনা করে সে মিথ্যাবাদী নয়।' হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রাঃ) বলেন, 'তিন জায়গায় আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এরূপ কথা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। (১) যুদ্ধে, (২) জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং (৩) স্বামীর এরূপ কথা বলা স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর এরূপ কথা বলা স্বামীকে।' উম্মে কুলসুমের (রাঃ) রিওয়ায়েতে রাসূল (সঃ) হিজরাতকারীগণ এবং বাইআত গ্রহণকারীগণকে বলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলে দেবনা যা নামায এবং রোযা অপেক্ষাও উত্তম?' সাহাবীগণ বলেন, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি বলুন।' তখন তিনি বলেন ঃ 'জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা এবং তাদের পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া।' (সুনান-ই-আবি দাঊদ ইত্যাদি)

মুসনাদ-ই-বায্যাযে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ আইউব (রাঃ)-কে বলেনঃ 'এসো, আমি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দেই। লোকেরা যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন তুমি তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও, যখন একজন অপরজন হতে সরে থাকে তখন তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দাও।'

আল্লাহ তা'আলার বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্যে ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করবো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শরীয়তের বিপরীত পথে চলে, শরীয়ত হয় এক দিকে এবং তার পথ হয় অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক দিকে চলার নির্দেশ দেন এবং সে অন্যদিকে চলে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সে দলীল প্রমাণাদি দেখেছে। তথাপি সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতঃ মুসলমানদের সরল ও পরিষ্কার পথ হতে সরে পড়েছে, সুতরাং আমিও তাকে ঐ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দেব। ঐ খারাপ পথই তখন তার নিকট ভাল বলে মনে হবে, অতঃপর সে জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছে যাবে।

মুসলমানদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করা। কিন্তু কখনও হয় তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্পষ্ট কথারই উল্টো হয়, আবার কখনও কখনও ঐ জিনিসের বিপরীত হয় যার উপর মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মত সবাই একমত রয়েছে। তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুল হতে রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে বহু হাদীসও রয়েছে এবং উসূলের হাদীসগুলোতে আমরা ওর বিরাট অংশ বর্ণনাও করেছি।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) চিন্তা ও গবেষণার পর এ আয়াত হতেই উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই এ ব্যাপারে উত্তম ও দৃঢ়তার জিনিস। তবে অন্য কয়েকজন ইমাম এ যুক্তিকে কঠিন ও আয়াত হতে দূরে বলেছেন। মোটকথা যারা মুমিনদের পথ হতে সরে পড়ে তাদের রজ্জুকে আল্লাহ তা'আলা ঢিল দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেনঃ

فَذَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ 'তুমি আমাকে ও যে এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাকে ছেড়ে দাও, সত্বরই আমি এমনভাবে ধরবো যে, সে জানতেই পারবে না।' (৬৮ঃ ৪৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

অর্থাৎ 'যখন তারা বাঁকা হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।' (৬১ঃ ৫) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ 'আমি তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণে ছেড়ে দিচ্ছি, তন্মধ্যে তারা অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল জাহান্নামই হবে'। (৬ঃ১১০) যেমন এক জায়গায় রয়েছে–

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ

অর্থাৎ "একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে এবং তাদের দোসরদেরকে।" (৩৭ঃ ২২) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا-

অর্থাৎ 'আগুন দেখে অত্যাচারীরা জেনে নেবে যে, তাদেরকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে এবং তারা পলায়নের কোন স্থান পাবে না।' (১৮ঃ ৫৩)

١١٦- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে থাকেন; এবং যে আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন করে তবে সে নিশ্চয়ই সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।

١١٧- اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ○ لا

১১৭। তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে নারী প্রতিমাপুঞ্জকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না।

١١٨- لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○ لا

১১৮। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং সে বলেছিল যে, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করবো।

١١٩- وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ○ ط

১১৯। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করবো এবং তাদেরকে আদেশ করবো–যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করবো–যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে এবং যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১২০-يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○

১২০। তিনি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন ও আশ্বাস দান করেন এবং শয়তান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না।

১২১-اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○

১২১। তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং তথা হতে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

১২২-وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

১২২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকার্য করে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্যপরায়ণ?

এ সূরার প্রথম দিকে আমরা اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ -এ আয়াতটির তাফসীর করেছি এবং তথায় এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হাদীসগুলোও বর্ণনা করেছি। জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বলতেনঃ 'কুরআন কারীমের অন্য কোন আয়াত আমার নিকট এ আয়াত অপেক্ষা প্রিয় নেই। দুনিয়া ও আখিরাত মুশরিকদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ছে। তারা নিজেদের জীবনকে ও উভয় জগতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ মুশরিকরা নারীদের পূজারী।

মুসনাদ-ই- ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক প্রতিমার সাথে একটি মহিলা জ্বিন রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, اِنَاثًا শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূর্তি। এটা অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণেরও উক্তি।

হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে পূজা করতো এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার মেয়ে বলে বিশ্বাস করতো ও বলতোঃ 'তাদের ইবাদত দ্বারা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ।' তারা নারীদের আকারে ফেরেশতাদের ছবি প্রতিষ্ঠিত করতো। অতঃপর অন্ধভাবে তাদের ইবাদত করতো এবং বলতো যে, এগুলো হচ্ছে ফেরেশতাদের ছবি, তারা আল্লাহর কন্যা। এ তাফসীর أَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى (৫৩ঃ ১৯) -এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ মিলে যায়। তথায় তাদের মূর্তিগুলোর নাম নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'তাদের কি সুন্দর বিচার যে, ছেলেগুলো হচ্ছে তাদের এবং মেয়েগুলো আমার!' আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহর দাস ফেরেশতাদেরকে মহিলা মনে করে নিয়েছে।' (৪৩ঃ ১৯) আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا

অর্থাৎ 'তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থাপন করেছে।' (৩৭ঃ১৫৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, اِنَاثًا -এর অর্থ হচ্ছে মৃত। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, আত্মাহীন প্রত্যেক জিনিসই اِنَاثٌ, সেটা শুষ্ক কাঠই হোক বা পাথরই হোক। কিন্তু এ উক্তি দুর্বল।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানেরই পূজারী। কেননা, সে-ই তাকে এ পথে চালিত করেছে এবং আসলে তাকেই সে মানছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ

অর্থাৎ 'হে আদম সন্তান ! আমি কি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করবে না'? (৩৬ঃ ৬০) এ কারণেই কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ স্পষ্টভাবে বলে দেবেনঃ 'আমাদেরকে ইবাদত করার দাবীদারেরা প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরই ইবাদত করতো, তাদের অধিকাংশই তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।' শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা হতে দূর করে দিয়েছিলেন। তাই সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক বান্দাকে সে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে। হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন– অর্থাৎ প্রতি

হাজারে নয়শ নিরানব্বই জনকে সে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকবে যে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সে বলেছিল, 'আমি মানুষকে সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট করবো, তাকে আমি এমন আশা দিতে থাকবো যে, সে তাওবা করা ছেড়ে দেবে, স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং মরণকে ভুলে যাবে। ফলে সে আখেরাত হতে বহু দূরে সরে পড়বে। তাদের দ্বারা আমি জন্তুর কান কাটিয়ে নিয়ে ছিদ্র করিয়ে দেবো এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকবো। আল্লাহর তৈরী করা আকৃতি নষ্ট করার কার্যে তাদের উৎসাহিত করবো। যেমন অণ্ডকোষ কর্তিত করা। একটি হাদীসে এটার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চেহারার উপর উল্কী করা এবং উল্কী করিয়ে নেয়া এও একটি অর্থ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে এবং যে এরূপ উল্কী করিয়ে নেয় তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে।

সহীহ সনদে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করতঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যারা উল্কী করে ও করিয়ে নেয়, কপালের চুল তুলে ও তুলিয়ে নেয় এবং দাঁতে বিস্তৃতি সাধন করে, তাদের উপর অভিসম্পাত রয়েছে। আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করবো না কেন যাদের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) অভিসম্পাত করেছেন এবং যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে?' অতঃপর তিনি وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -এ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।'(৫৯ঃ ৭) কোন কোন ব্যাখ্যাদাতার মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহর দিনকে পরিবর্তিত করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর একমুখী ধর্মের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখ, এটা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি যার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই।' (৩০ঃ ৩০) এ পরের বাক্যটিকে যখন আদেশবাচক ক্রিয়া অর্থে নেয়া হবে তখন এ তাফসীর ঠিকই হবে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রকৃতিকে পরিবর্তন করো না। মানুষকে তিনি যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন ওর উপরেই থাকতে দাও।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির উপরই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াহূদী করে, খ্রীষ্টান করে বা মাজুসী করে। যেমন ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে থাকে কিন্তু মানুষেরাই তার কান ইত্যাদি কেটে নিয়ে তাকে দোষযুক্ত করে থাকে।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আইয়ায ইব্‌নে হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি আমার বান্দাকে এক মুখী দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান এসে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর আমি আমার বৈধকে তাদের উপর অবৈধ করেছি।'

শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে, যে ক্ষতির আর পূরণ নেই। কেননা, শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে রয়েছে, শয়তান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার মুক্তি ও মঙ্গল ঐ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামতের দিন শয়তান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে, 'আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য ছিল। আর আমি তো ওয়াদা ভঙ্গকারী। তোমাদের উপর আমার কোন জোর ছিল না। আমার আহ্বান শুনামাত্রই তোমরা নির্বোধের মত কেন তাতে সাড়া দিয়েছিলে? এখন আমাকে ভর্ৎসনা করছো কেন? বরং তোমরা নিজেকেই ভর্ৎসনা কর।' শয়তানের অঙ্গীকারকে সঠিক জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহান্নামেই পৌঁছে যাবে, যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব।

ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন–'যে আমাকে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং শরীরের দ্বারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে, আমার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে, আমি যা নিষেধ করেছি সেটা হতে বিরত থাকে, তাকে আমি আমার নিয়ামত দান করবো এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো। ঐ জান্নাতের নদীগুলো তাদের ইচ্ছেমত বইতে থাকবে, সেখানে না আছে ধ্বংস না আছে মৃত্যু এবং না আছে কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। আল্লাহ তা'আলার এ অঙ্গীকার অটল ও সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি ছাড়া কেউ পালনকর্তাও নেই।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলতেনঃ 'সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রদর্শিত পথ। আর সমস্ত কাজের মধ্যে জঘন্যতম কাজ হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিস আনয়ন করা এবং প্রত্যেক এ নতুন জিনিসই হচ্ছে বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে।'

১২৩। না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে এবং না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কাউকেও বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবে না।

١٢٣- لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১২৪। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকার্য করে এবং সে বিশ্বাসীও হয় তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খর্জুর কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।

١٢٤- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

১২৫। আর যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে ও সৎকার্য করে এবং ইবরাহীমের সুদৃঢ় ভাবে ধর্মের অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

١٢٥- وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

১২৬। এবং নভোমণ্ডলে যা কিছু ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই জন্যে এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিবেষ্টনকারী।

١٢٦- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ۟ع

হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন, 'আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, আহ্লে কিতাব ও মুসলমানদের মধ্যে তর্ক হয়– আহলে কিতাব এই বলে মুসলমানদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিল যে, তাদের নবী (আঃ) মুসলমানদের নবী (সঃ)-এর পূর্বে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং তাদের কিতাবও মুসলমানদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। অপরপক্ষে মুসলমানেরা বলছিল যে, তাদের নবী (সঃ) সর্বশেষ নবী এবং তাদের কিতাবও পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের ফায়সালাকারী। সে সময় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়।

হযরত মুহাজিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরবের লোকেরা বলেছিল, 'আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা হবে না এবং আমাদের শাস্তিও হবে না।' ইয়াহূদীরা বলেছিল, 'জান্নাতে শুধুমাত্র আমরাই যাবো।' খ্রীষ্টানেরাও অনুরূপ কথা বলেছিল। আর তারা এ কথাও বলেছিল যে, তাদেরকে শুধু কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, শুধু মুখের কথা ও দাবীর দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয় না। বরং ঈমানদার হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার অন্তর পরিষ্কার হয়, আমল তার সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল তার হাতে থাকে। হে মুশরিকের দল! তোমাদের মনের বাসনা ও অসার দাবীর কোন মূল্য নেই এবং আহলে কিতাবের উচ্চাকাঙ্খা এবং বড় বড় বুলিও মুক্তির মাপকাঠি নয়। বরং মুক্তির মাপকাঠি হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও রাসূলগণের আনুগত্য স্বীকার। মন্দ কার্যকারীদের সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে, যার কারণে তাদেরকে তাদের মন্দ কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে না? বরং কিয়ামতের দিন ভাল-মন্দ যে যা করেছে তিল পরিমাণ হলেও তার চোখের সামনে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

এ আয়াতটি সাহাবীগণের সামনে খুবই কঠিন ঠেকেছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অণুপরিমাণ কার্যেরও যখন

প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তি কিরূপে পাওয়া যাবে?' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'প্রত্যেক মন্দ কার্যকারী দুনিয়াতেই প্রতিদান পাবে।'

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রাঃ) স্বীয় গোলামকে বলেনঃ 'সাবধান! যেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-কে শূলী দেয়া হয়েছে সেখান দিয়ে গমন করো না।' কিন্তু গোলাম তাঁর এ কথা ভুলে যায় এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রাঃ)-এর দৃষ্টি হযরত ইবনে যুবায়েরের উপর নিপতিত হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! যতটুকু আমার জানা আছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি রোযাদার, নামাযী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্তকারী ছিলে। আমি আশা রাখি যে, যেটুকু মন্দকাজ তোমার দ্বারা সাধিত হয়েছে তার প্রতিশোধ দুনিয়াতেই হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আর শাস্তি দেবেন না।' অতঃপর তিনি হযরত মুজাহিদ (রঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ) হতে আমি শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ 'যে ব্যক্তি মন্দকার্য করে তার প্রতিদান সে দুনিয়াতেই পেয়ে যায়।'

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে শূলে দেখে বলেন, 'হে আবূ হাবীব! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন। আমি তোমার পিতার মুখেই এ হাদীসটি শুনেছি।'

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর বিদ্যামানতায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন তখন তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেক আমলের যখন প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তিপ্রাপ্তি খুব কঠিন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ 'হে আবূ বকর (রাঃ)! জেনে রেখ যে, তোমার সঙ্গীদেরকে অর্থাৎ মুমিনদেরকে তো দুনিয়াতেই তাদের কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে এবং ঐ বিপদসমূহের কারণেই তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন তোমরা পবিত্র হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, তবে অন্য লোক যারা রয়েছে তাদের পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।' এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাকারী মূসা ইব্‌নে উবাইদাহ দুর্বল এবং অপর বর্ণনাকারী মাওলা ইব্‌নে সিবা অজ্ঞাত। বহু পন্থায় এর মর্মকথা বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ

আয়াতটি আমাদের উপর খুব ভারী বোধ হচ্ছে।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মুমিনের এ প্রতিদান ওটাই যা দুনিয়াতেই তার উপর বিপদ-আপদের আকারে আপতিত হয়।' আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ 'এমন কি একজন মুমিন হয় তো তার জামার পকেটে কিছু টাকা রাখলো, তারপর প্রয়োজনের সময় ক্ষণিকের জন্যে সে সেই টাকা পেলো না, এরপর আবার পকেটে হাত দিতেই টাকা বেরিয়ে আসে। এই যে কিছুক্ষণ সে টাকাটা পেলো না যার দরুন মনে কিছুটা কষ্ট পেলো, এর ফলেও তার পাপ মার্জনা করা হয় এবং এটাও তার মন্দ কার্যের প্রতিদান হয়ে যায়। দুনিয়ার এসব বিপদ তাকে এমন খাঁটি ও পবিত্র করে দেয় যে, কিয়ামতের কোন বোঝা তার উপরে থাকে না। যেমন সোনা আগুনে দিলে খাঁটি হয়ে বেরিয়ে আসে, তদ্রূপ সেও দুনিয়ায় পাক সাফ হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করে।' তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ 'মুমিনকে প্রত্যেক জিনিসেই পুণ্য দেয়া হয়, এমনকি মৃত্যুর যন্ত্রণায়ও পুণ্য দেয়া হয়।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যখন বান্দার পাপ খুব বেশী হয়ে যায় এবং সে পাপসমূহ দূর করার মত অধিক সৎ আমল থাকে না তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর কোন দুঃখ নাযিল করেন যার ফলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'

হযরত সাঈদ ইব্নে মানসূর (রঃ) বলেন যে, যখন উপরোক্ত আয়াতটি সাহাবীগণের উপর ভারী বোধ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ 'তোমরা ঠিকভাবে এবং মিলেমিশে থাক, মুসলমানের প্রত্যেক বিপদই হচ্ছে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এমনকি কাঁটা লাগলেও (ঐ কারণে গুনাহ মাফ হয়ে থাকে)।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সাহাবীগণ রোদন করছিলেন এবং তাঁরা খুবই চিন্তান্বিত ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে এ কথা বলেছিলেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা আমাদের এ রোগে কি পাবো?' তিনি বলেনঃ 'এর ফলে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।' একথা শুনে হযরত কা'ব ইব্নে আজরা (রাঃ) প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! মৃত্যু পর্যন্ত যেন জ্বর আমা হতে পৃথক না হয়। কিন্তু যেন আমি হজ্ব, উমরা, জিহাদ এবং জামাআতে নামায পড়া হতে বঞ্চিত না হই।' তাঁর এ প্রার্থনা গৃহীত হয়, তাঁর শরীরে হাত লাগালে জ্বর অনুভূত হতো। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'প্রত্যেকে মন্দ কার্যেরই কি প্রতিদান দেয়া হবে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ হ্যাঁ, ঐ রকমই এবং অতটুকুই কিন্তু প্রত্যেক সৎ কার্যের প্রতিদান দশগুণ করে দেয়া হয়। সুতরাং সে ধ্বংস হয়ে গেল যার এক দশ হতে বেড়ে গেল (অর্থাৎ পাপের প্রতিদান সমান সমান এবং পুণ্যের প্রতিদান দশগুণ হওয়া সত্ত্বেও পাপ বেশী থেকে গেল)'। (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ -এর দ্বারা কাফিরকে বুঝান হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَ هَلْ نُجْزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ

অর্থাৎ 'আমি একমাত্র কাফিরদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি। (৩৪ঃ১৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত সাঈদ ইব্নে যুবাইর (রাঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কার্যের ভাবার্থ হচ্ছে শিরক। এরপর বলা হচ্ছে–'এ ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।' হ্যাঁ, যদি সে তাওবা করে তাহলে সেটা অন্য কথা।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ সঠিক কথা এই যে, প্রত্যেক মন্দ কাজই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা জানা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মন্দকার্যের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ কার্যের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মন্দকাজের শাস্তি হয়তো দুনিয়াতেই দেয়া হয় এবং এটাই বান্দার জন্যে উত্তম, অথবা পরকালে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে উভয় জগতে নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমাদেরকে যেন তিনি ধরপাকড় ও অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করেন।

সৎকার্যাবলী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে থাকেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা তা গ্রহণ করে থাকেন। কোন নর বা নারীর সৎকার্য তিনি নষ্ট করেন না। তবে শর্ত এই যে, হতে হবে মুসলমান। এ সৎলোকদেরকে তিনি স্বীয় জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন। তাদের পুণ্য তিনি মোটেই কম হতে দেবেন না। نَقِيْرٌ বলা হয় খেজুরের আঁটির উপরিভাগের পাতলা আঁশকে। فَتِيْلٌ বলা হয় খেজুরের আঁটির

মধ্যস্থলের হালকা ছালকে। এ দু'টো থাকে খেজুরের আঁটির মধ্যে। আর قِطْمِيْر বলা হয় ঐ আঁটির উপরের আবরণকে। কুরআন কারীমের মধ্যে এরূপ স্থলে এ তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–ওর চেয়ে উত্তম ধর্মের লোক আর কে হতে পারে যে স্বীয় আনন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে? ঈমানদারী ও সৎ নিয়তে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সে সৎকর্মশীলও হয়। অর্থাৎ সে শরীয়তের অনুসারী, সত্যধর্ম ও সুপথের পথিক এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসের উপর আমলকারী।

প্রত্যেক ভাল কাজ গ্রহণীয় হওয়ার জন্যে এ দু'টি শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ আন্তরিকতা ও অহী অনুযায়ী হওয়া। خُلُوْص বা আন্তরিকতার ভাবার্থ এই যে, উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। আর সঠিক হওয়ার অর্থ এই যে, সেটা হবে শরীয়ত অনুযায়ী। সুতরাং বাহির তো কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হওয়ার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায়। আর ভেতর সুসজ্জিত হয় সৎ নিয়তের দ্বারা। যদি এ দু'টির মধ্যে মাত্র একটি না থাকে তবে আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আন্তরিকতা না থাকলে কপটতা চলে আসে। তখন মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদেরকে দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই সেই অবস্থায় আমল গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ না হলে পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা একত্রিত হয়ে যায়, ফলে তখনও আমল গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হয় না। যেহেতু মুমিনের আমল লোক দেখানো হতে এবং শরীয়তের বিপরীত হওয়া থেকে মুক্ত হয় সেহেতু তার কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ হয়ে থাকে। ঐ কাজই আল্লাহ পাক ভালবাসেন এবং সে জন্যেই তা মোচনের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেন–'তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুদৃঢ় ধর্মের অনুকরণ করে থাকে।' অর্থাৎ তারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তাঁর পদাংক অনুসরণ করবেন তাঁদের সকলের ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ

অর্থাৎ 'ইবরাহীমের বেশী নিকটতম তারাই যারা তার অনুসারী এবং এ নবী (সঃ)।' (৩ঃ ৬৮) আর এক আয়াতে রয়েছে–

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থাৎ 'হে নবী (সঃ)! আমি তোমার নিকট অহী করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্গত ছিল না।' (১৬ঃ ১২৩)

حَنِيفٌ বলা হয় স্বেচ্ছায় শির্ক হতে অসন্তোষ প্রকাশকারীকে ও পূর্ণভাবে সত্যের দিকে মন সংযোগকারীকে, যাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিতে পারে না এবং দূরকারী দূর করতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্যে এবং তৎপ্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহর বন্ধু। অর্থাৎ বান্দা উন্নতি করতে করতে যে উচ্চতম পদ সোপান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে সোপান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। বন্ধুত্বের দরজা অপেক্ষা বড় দরজা আর নেই। এটা হচ্ছে প্রেমের উচ্চতম স্থান। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এর কারণ ছিল তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى অর্থাৎ 'সেই ইবরাহীম যে পুরোপুরি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছিল।' (৫৩ঃ ৩৭) অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী সন্তুষ্টচিত্তে পালন করেছিলেন। কখনও তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি। তাঁর ইবাদতে তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কোন কিছু তাঁকে তাঁর ইবাদত হতে বিরত রাখতে পারেনি।

আর একটি আয়াতে আছে وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে কতগুলো কথা দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন সে ঐগুলো পূর্ণ করে।' (২ঃ ১২৪) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেন–

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ 'ইবরাহীম (আঃ) ছিল একাগ্রচিত্তে আল্লাহর নির্দেশাবলী পালনকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' (১৬ঃ ১২০)

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আমর ইব্‌নে মাইমুন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মু'আয (রাঃ) ইয়ামনে ফজরের নামাযে যখন وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا -এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন একটি লোক বলেন–

لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ اُمِّ اِبْرٰهِيْمَ

অর্থাৎ 'হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মায়ের চক্ষু ঠাণ্ডা হলো।'

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) 'খালীলুল্লাহ' উপাধি হওয়ার কারণ এই যে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি মিসরে বা মুসিলে তাঁর এক বন্ধুর নিকট হতে কিছু খাদ্য-শস্য আনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। কিন্তু তথায় কিছু না পেয়ে শূন্য হস্তে ফিরে আসছিলেন। স্বীয় গ্রামের নিকটবর্তী হলে তাঁর খেয়াল হয় যে, এ বালুর ঢিবি হতে কিছু বালু বস্তায় ভর্তি করা হোক এবং এটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে পরিবারকে কিছুটা সান্ত্বনা দেয়া যাবে। এভাবে তিনি বস্তায় বালু ভরে নেন এবং সোয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে বাড়ী মুখে রওয়ানা হন। মহান আল্লাহর কুদরতে সে বালু প্রকৃত আটা হয়ে যায়। তিনি বাড়ীতে পৌঁছে বস্তা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর পরিবারের লোকেরা বস্তা খুলে দেখে যে, সেটা উত্তম আটায় পূর্ণ রয়েছে। আটা খামীর করে রুটি পাকান হয়। তিনি জাগ্রত হয়ে পরিবারের লোককে আনন্দিত দেখতে পান এবং রুটিও প্রস্তুত দেখেন। তখন তিনি বিস্মিতভাবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'যে আটা দিয়ে তোমরা রুটি তৈরী করলে তা পেলে কোথায়?' তারা উত্তরে বলেঃ 'আপনি তো আপনার বন্ধুর নিকট হতে নিয়ে এসেছেন।' এখন তিনি ব্যাপারটা বুঝে ফেলেন এবং তাদেরকে বলেনঃ 'হ্যাঁ, এটা আমি আমার বন্ধু মহান সম্মানিত আল্লাহর নিকট হতে এনেছি।' সুতরাং আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। আর তাঁকে খালীলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেন? কিন্তু এ ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। খুব বেশী বললে এটাই বলা যাবে যে, এটা বানী ইসরাঈলের বর্ণনা, যাকে আমরা সত্যও বলতে পারি না এবং মিথ্যাও বলতে পারি না। তাঁকে আল্লাহর বন্ধু বলার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা ছিল। আর ছিল তাঁর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য। তিনি স্বীয় ইবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। নবীও (সঃ) তাঁর বিদায় ভাষণে বলেছিলেনঃ 'হে জনমণ্ডলী! দুনিয়াবাসীদের মধ্যে যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী হতাম তবে আবূ বকর ইবনে আবূ কুহাফা (রাঃ)-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (আমি) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তদ্রূপ তিনি আমাকেও তাঁর বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।'

হযরত আবূ বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিল। কেউ বলছিলেনঃ 'চমকপ্রদ কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।' অন্য একজন বলেনঃ 'এর চেয়েও বড় মেহেরবানী এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তিনি স্বয়ং কথা বলেছেন এবং তাঁর কালিমুল্লাহ বানিয়েছেন।' অপর একজন বলেনঃ 'হযরত ঈসা (আঃ) তো হচ্ছেন আল্লাহর রূহ এবং তাঁর কালেমা।' আর একজন বলেনঃ 'হযরত আদম (আঃ) হচ্ছেন সাফীউল্লাহ এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাইরে এসে বলেনঃ 'আমি তোমাদের কথা শুনেছি। নিশ্চয়ই তোমাদের কথা সত্য। হযরত ইবরাহীম (আঃ) হচ্ছেন খালীলুল্লাহ, হযরত মূসা (আঃ) হচ্ছেন কালীমুল্লাহ, হযরত ঈসা (আঃ) হচ্ছেন রূহুল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ এবং হযরত আদম (আঃ) হচ্ছেন সাফীউল্লাহ। এ রকমই হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বটে। জেনে রেখো আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, এটা কিন্তু অহংকার হিসেবে নয়। আমি বলছি যে, আমি হাবীবুল্লাহ। আমি হচ্ছি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। আমিই প্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাতকারী। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন এবং আমাকেও ওর ভেতরে প্রবিষ্ট করবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে দরিদ্র মুমিন লোকেরা। কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশী সম্মানিত হবো আমিই। এটা গৌরবের বশবর্তী হয়ে বলছি না, বরং ঘটনা অবহিত করার জন্য তোমাদেরকে বলছি।' এ সনদে এ হাদীসটি গারীব বটে, কিন্তু এর সত্যতার কতক প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ 'তোমরা কি এতে বিস্ময় বোধ করছো যে, বন্ধুত্ব ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে, কালাম ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্যে এবং দর্শন ছিল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর জন্যে। (মুসতাদরিক-ই-হাকীম) এ রকমই বর্ণনা হযরত আনাস ইব্নে মালিক (রাঃ) হতে এবং আরও বহু সাহাবী ও তাবেঈ হতেও বর্ণিত আছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু গুরুজন হতেও বর্ণিত আছে।

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি অতিথিদেরকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন। একদিন তিনি

অতিথির খোঁজে বের হন। কিন্তু কোন অতিথি না পেয়ে ফিরে আসেন। বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন যে, একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! আপনাকে আমার বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দিল কে?' লোকটি উত্তরে বলেনঃ 'এ বাড়ীর প্রকৃত মালিক আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ 'আপনি কে?' তিনি বলেনঃ 'আমি মৃত্যুর ফেরেশতা, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দার নিকট এজন্যে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, আমি যেন তাঁকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দেই।' এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে বলেনঃ 'তাহলে আমাকে বলুন তো, সে মহা পুরুষ কে? আল্লাহর শপথ! তিনি এ দুনিয়ার কোন দূর প্রান্তে থাকলেও আমি গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবো এবং আমার অবশিষ্ট জীবন তাঁর পদচুম্বনে কাটিয়ে দেবো।' এটা শুনে মৃত্যুর ফেরেশতা বলেনঃ 'ঐ ব্যক্তি আপনিই।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেনঃ 'সত্যিই কি আমি?' ফেরেশতা বলেনঃ 'হ্যাঁ, আপনিই'। হযরত ইবরাহীম (আঃ) পুনরায় ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'তাহলে আপনি এ কথাও বলুন তো, কিসের উপর ভিত্তি করে এবং কোন কার্যের বিনিময়ে তিনি আমাকে বন্ধু হিসেবে মনোনীত করেছেন?' ফেরেশতা উত্তরে বলেনঃ 'কারণ এই যে, আপনি সকলকে দিতে থাকেন, কিন্তু আপনি কারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না।'

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন হতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে 'খালীলুল্লাহ' এ বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করেন তখন হতে তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় এতো বেশী জমে উঠেছিল যে, তাঁর অন্তরের কম্পনের শব্দ দূর হতে এমনিভাবেই শুনা যেতো যেমনিভাবে মহাশূন্যে পাখীর উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনা যায়।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্বন্ধেও এসেছে যে, যে সময় আল্লাহ তা'আলার ভয় তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতো তখন তাঁর কান্নার শব্দ, যা তিনি দমন করে রাখতেন, দূরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী লোকেরা এমনিভাবেই শুনতে পেতো যেমনিভাবে কোন হাঁড়ির মধ্যে পানি টগবগ করে ফুটলে তা শুনা যায়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অধিকারে রয়েছে এবং সবাই তাঁর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ আছে। সবই তাঁর সৃষ্ট। তথায় তিনি যখন যা করার ইচ্ছে করেন, বিনা বাধা-বিপত্তিতে তাই করে থাকেন। কারও সাথে পরামর্শ করার তাঁর প্রয়োজন হয় না। এমন কেউ

নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছে হতে ফিরিয়ে দিতে পারে। কেউ তাঁর আদেশের সামনে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াতে পারে না। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায় বিচারক, মহা বিজ্ঞানময়, সূক্ষ্মদর্শী ও পরম দয়ালু। তিনি এক। কারও মুখাপেক্ষী তিনি নন। কোন লুক্কায়িত জিনিস, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস এবং বহু দূরের জিনিস তাঁর নিকট গুপ্ত নেই। যা কিছু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তার সবই তাঁর নিকট প্রকাশমান।

১২৭। এবং তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করেছে; তুমি বল- আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন এবং পিতৃহীনা নারীদের সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রন্থ হতে পাঠ করা হয়েছে যে, তাদের জন্যে যা বিধিবদ্ধ হয়েছে তা তোমরা প্রদান কর না এবং তাদেরকে বিয়ে করতে বাসনা কর; এবং শিশুগণের মধ্যে দুর্বলদের ও পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, এবং তোমরা যে সৎকার্য কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তদ্বিষয়ে খুব জানেন।

١٢٧- وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتٰمَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ○

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, এ আয়াতে ঐ লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে কোন পিতৃহীনা বালিকাকে লালন-পালন করে যার অভিভাবক উত্তরাধিকারী সে নিজেই এবং সে তার মালে অংশীদার হয়ে গেছে। এখন সে ঐ মেয়েটিকে নিজে বিয়ে করার ইচ্ছে করে বলে তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা প্রদান করে। এরূপ লোকের সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন জনগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐ পিতৃহীন মেয়েদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করে তখন আল্লাহ তা'আলা وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الخ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَٰبِ -এ আয়াতে যা বলা হয়েছে এর দ্বারা وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَٰمَىٰ الخ (৪ঃ ৩)-এ প্রথম আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে।' হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, পিতৃহীনা মেয়েদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীগণ যখন ঐ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেতো এবং তারা সুন্দরী না হতো তখন তারা তাদেরকে বিয়ে করা হতে বিরত থাকতো। আর তাদের মাল-ধন বেশী থাকলে এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতো। কিন্তু তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকতো না বলে ঐ অবস্থাতেও তাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য কম দিতো। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, পিতৃহীনা বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া ছাড়া বিয়ে করার অনুমতি নেই। উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ পিতৃহীনা বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্যে বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, ঐ মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই মোহর তাকেও দিতে হবে। যদি তা না দেয় তবে তার উচিত যে, সে যেন তাকে বিয়ে না করে।

এ সূরার প্রথমকার এ বিষয়ের আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কখনও এমনও হয় যে, এ পিতৃহীনা বালিকার সেই অভিভাবক যার সাথে তার বিবাহ বৈধ, সে যে কোন কারণেই হোক তাকে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু সে ভয় করে যে, যদি অন্য জায়গায় মেয়েটির বিয়ে দেয়া হয় তবে তার যে মালে তার অংশ রয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে, এ জন্যে সে মেয়েটিকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা দেয়। এ আয়াতে এ জঘন্য কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

এও বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে এ প্রথা ছিল—পিতৃহীনা বালিকার অভিভাবক যখন মেয়েটিকে তার অভিভাবকত্বে নিয়ে নিতো তখন সে তার উপরে একটা কাপড় ফেলে দিতো। তখন আর তাকে বিয়ে করার কারও কোন ক্ষমতা থাকতো না। এখন যদি সে সুশ্রী হতো তবে সে তাকে বিয়ে করে নিতো এবং তার মালও গলাধঃকরণ করতো। আর যদি সে বিশ্রী হতো, কিন্তু তার বহু মাল থাকতো তবে সে তাকে নিজেও বিয়ে করতো না এবং অন্য জায়গায় বিয়ে

করতেও তাকে বাধা দিতো। ফলে মেয়েটি ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতো এবং ঐ লোকটি তার মাল হস্তগত করতো। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কাজে চরমভাবে বাধা দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এর সাথে সাথে এটাও বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতা যুগের লোকেরা ছোট ছেলেদেরকে এবং বড় মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করতো। কুরআন কারীমে এ কু-প্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়েছে। প্রত্যেককেই অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ছেলে এবং মেয়ে ছোটই হোক বা বড়ই হোক তাদেরকে অংশ প্রদান কর তবে মেয়েকে অর্ধেক ও ছেলেকে পূর্ণ দাও'। অর্থাৎ একটি ছেলেকে দু'টি মেয়ের সমান অংশ প্রদান কর। আর পিতৃহীনা মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে–'যখন তোমরা সৌন্দর্য ও মালের অধিকারিণী পিতৃহীনা মেয়েদেরকে নিজেই বিয়ে করবে তখন যাদের মাল ও সৌন্দর্য কম আছে তাদেরকেও বিয়ে কর।'

তারপর বলা হচ্ছে–তোমাদের সমুদয় কার্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন। সুতরাং তোমাদের ভাল কাজ এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে ভাল প্রতিদান গ্রহণ করা উচিত।

١٢٨- وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

১২৮। যদি কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তারা পরস্পর কোন সুমীমাংসায় সম্মিলিত হলে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর; এবং জীবগণের সম্মুখে প্রলোভন বিদ্যামান রয়েছে এবং যদি তোমরা সৎ ব্যবহার কর ও সংযমী হও তবে তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ।

১২৯। তোমরা কখনও স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না যদিও তোমরা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরজনকে ঝুলান অবস্থায় রেখো না এবং যদি তোমরা সম্মিলিত ও সংযমী হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়।

١٢٩- وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১৩০। এবং যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য হতে তাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করবেন এবং আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

١٣٠- وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর অবস্থাসমূহ এবং তাদের নির্দেশাবলীর নির্দেশ দিচ্ছেন। স্বামীরা কখনও কখনও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তারা কখনও স্ত্রীদেরকে চায়, আবার কখনও পৃথক করে দেয়। সুতরাং যখন স্ত্রী তার স্বামীর অসন্তুষ্টির মনোভাব বুঝতে পারবে তখন যদি সে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তবে তা সে করতে পারে। যেমন সে তার খাদ্য ও বস্ত্র ছেড়ে দেয় বা রাত্রি যাপনের হক ছেড়ে দেয় তবে উভয়ের জন্যে এটা বৈধ। অতঃপর ওরই প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিই উত্তম।

হযরত সাওদা বিনতে যামআ' (রাঃ) যখন খুবই বৃদ্ধা হয়ে যান এবং বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছে রাখেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ 'আমি আমার পালার হক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিয়ে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা স্বীকার করে নেন এবং এর উপরেই সন্ধি হয়ে যায়।

সুনান-ই-আবি দাঊদে রয়েছে যে, ঐ ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'স্বামী-স্ত্রী কোন কথার উপর একমত হলে তা বৈধ।' তিনি আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন যাঁদের মধ্যে আটজনকে তিনি পালা (রাত্রি যাপনের পালা) বন্টন করে দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাওদা (রাঃ)-এর (রাত্রি যাপনের) পালার দিনটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রদান করতেন। হযরত উরওয়া (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, হযরত সাওদা (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে যখন বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছে করেছেন তখন তিনি চিন্তা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর গাঢ় ভালবাসা রয়েছে। কাজেই যদি তিনি (সাওদা রাঃ) তাঁর (রাত্রি যাপনের) পালা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দিয়ে দেন তবে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্মত হয়ে যাবেন এতে বিস্ময়ের কি আছে? এবং তিনি তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী হয়েই থেকে যাবেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমস্ত স্ত্রীকে সমান অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। সাধারণতঃ প্রত্যহ তিনি সকল স্ত্রীর নিকটে যেতেন, পার্শ্বে বসতেন, গল্প করতেন, কিন্তু স্পর্শ করতেন না। অবশেষে যাঁর পালা থাকতো তাঁর ওখানেই রাত্রি যাপন করতেন।' তারপরে তিনি হযরত সাওদা (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন, যা উপরে বর্ণিত হলো। (সুনান-ই-আবি দাঊদ)

মুজাম-ই-আবুল আব্বাসের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাওদা (রাঃ)-এর নিকট তালাকের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলেন। হুযুর তথায় আগমন করলে হযরত সাওদা (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ 'যে আল্লাহ আপনার উপর স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় মাখলুকের মধ্যে আপনাকে স্বীয় মনোনীত বান্দা করেছেন তাঁর শপথ! আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিন। আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে। পুরুষের প্রতি আমার আর কোন আসক্তি নেই। কিন্তু আমার বাসনা এই যে, আমাকে যেন কিয়ামতের দিন আপনার স্ত্রীদের মধ্যে উঠান হয়।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) এতে সম্মত হন এবং তাঁকে ফিরিয়ে নেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার পালার দিন ও রাত্রি আপনার প্রিয় পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দান করে দিলাম।

সহীহ্ বুখারী শরীফে রয়েছেঃ এর ভাবার্থ এই যে, কোন বৃদ্ধা স্ত্রী হয়তো তার স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালবাসে না বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন সে তাকে বলেঃ 'আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে পৃথক করো না।'

এ আয়াতটি দু'জনকেই এ কাজের অনুমতি দিচ্ছে। ঐ সময়েও এ অবস্থা যখন কারো দু'টি স্ত্রী থাকবে এবং একটিকে সে তার বার্ধক্যের কারণে বা সে বিশ্রী হওয়ার কারণে তার সাথে ভালবাসা রাখবে না এবং ফলে তাকে তালাক দিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করবে, কিন্তু ঐ স্ত্রী যে কোন কারণেই তার ঐ স্বামীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইবে ও পৃথক হয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করবে তখন তার এ অধিকার থাকবে যে, তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেবে এবং স্বামী তাতে সম্মত হয়ে তাকে তালাক দেয়া হতে বিরত থাকবে।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত উমার (রাঃ)-কে একটি প্রশ্ন করে। হযরত উমার (রাঃ) সেটা অপছন্দ করেন এবং তাকে চাবুক মেরে দেন। এরপর আর একটি লোক এ আয়াত সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, এটা জিজ্ঞাস্য বিষয়ই বটে। এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঐ অবস্থা যেমন একটি লোকের একটি স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু সে বৃদ্ধা হয়ে গেছে। তার আর ছেলে মেয়ে হয় না। তখন তার স্বামী একটি যুবতী নারীকে বিয়ে করে। এখন এ বৃদ্ধা স্ত্রী এবং তাঁর স্বামী যে কোন জিনিসের উপর একমত হয়ে গেলে সেটা বৈধ।

হযরত আলী (রাঃ) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেনঃ "এর দ্বারা ঐ স্ত্রীকে বুঝান হয়েছে, যে তার বার্ধক্যের কারণে বা বিশ্রী হওয়ার কারণে অথবা দুশ্চরিত্রতার কারণে কিংবা অপরিচ্ছন্নতার কারণে তার স্বামীর নিকট দৃষ্টিকটু হয়ে গেছে, কিন্তু সে কামনা করে যে, তার স্বামী যেন তালাক না দেয়। এ অবস্থায় যদি সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে তার স্বামীর সাথে সন্ধি করে নেয় তবে তা করতে পারে।"

পূর্ববর্তী মনীষীগণ ও ইমামগণ হতে বরাবরই এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। এমনকি প্রায় সবাই এর উপর একমত এবং আমার ধারণায় তো এর বিরোধী কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ ইব্নে মুসলিম (রাঃ)-এর কন্যা হযরত রাফে' ইব্নে খুদায়েজ (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে বা অন্য কোন কারণে তার প্রতি তাঁর স্বামীর আকর্ষণ ছিল না। এমনকি তিনি তাঁকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করেন। তখন তিনি স্বীয় স্বামীকে বলেনঃ "আমাকে তালাক না দিয়ে বরং আপনি আমার নিকট যা চাইবেন আমি তাই দিতে সম্মত রয়েছি।" সে সময় وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতদ্বয়ে ঐ স্ত্রীলোকটির বর্ণনা রয়েছে যার উপর তার স্বামীর মন চটে গেছে। তার স্বামীর উচিত যে, সে যেন তার ঐ স্ত্রীকে বলে দেয়–"তুমি ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দেবো। আর যদি তুমি আমার স্ত্রী হয়েই থাকতে চাও তবে আমি মাল বন্টনে এবং পালা বন্টনে তোমার উপর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে প্রাধান্য দেবো।" তখন ঐ স্ত্রীর যে কোন একটিকে মেনে নেয়ার অধিকার রয়েছে। সে যদি দ্বিতীয় কথাটি মেনে নেয় তবে তাকে রাত্রি যাপনের পালা না দেয়া স্বামীর জন্যে বৈধ।

আর যে মোহর ইত্যাদি সে স্বামীর জন্যে ছেড়ে দিয়েছে সেটা নিজস্ব সম্পদ রূপে গ্রহণ করাও তার স্বামীর জন্য বৈধ।

হযরত রাফে' ইব্নে খুদায়েজ আনসারী (রাঃ)-এর স্ত্রী যখন বৃদ্ধা হয়ে যান তখন তিনি এক নব যুবতীকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি ঐ নব বিবাহিতা স্ত্রীকে পূর্বের স্ত্রীর উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁর পূর্ব স্ত্রী তালাক যাচ্ঞা করেন। হযরত রাফে' (রাঃ) তাকে তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে তাকে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু এবারেও ঐ একই অবস্থা হয় যে তিনি যুবতী স্ত্রীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পূর্ব স্ত্রী আবার তালাক প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে এবারও তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়ে নেন। এবারও অনুরূপ অবস্থাই ঘটে। অতঃপর ঐ স্ত্রী কসম দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাঁর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে বলেনঃ "চিন্তা করে দেখো, এটা কিন্তু শেষ তালাক। যদি তুমি চাও তবে আমি তালাক দিয়ে দেই, নতুবা এ অবস্থায় থাকাই স্বীকার করে নাও।" সুতরাং তিনি স্বীয় অধিকার ছেড়ে দিয়ে ঐভাবেই বাস করতে থাকেন। (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) অর্থাৎ সন্ধি কল্যাণকর-এর একটি অর্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছেঃ স্বামীর তার স্ত্রীকে এ অধিকার দেয়া–সে ইচ্ছে করলে ঐভাবেই থাকবে যে, সে অন্য স্ত্রীর সমান অধিকার লাভ করবে না বা তালাক গ্রহণ করবে। এটা ওর চেয়ে উত্তম যে, সে তার স্ত্রীকে কিছু না বলেই অন্য স্ত্রীকে তার উপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম ভাবার্থ হচ্ছে

এই যে, স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেবে এবং ফলে স্বামী তাকে তালাক দেবে না, বরং পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। এটা তালাক দেয়া ও নেয়া অপেক্ষা উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত সাওদা বিনতে জামাআ' (রাঃ)-কে স্বীয় স্ত্রী রূপেই রেখে দেন এবং তিনি তাঁর হক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দান করে দেন। তার এ কার্যের মধ্যে তাঁর উম্মতের জন্যে সুন্দর নমুনা রয়েছে যে, মনোমালিন্যের অবস্থাতেও তালাকের প্রশ্ন উঠবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নিকট বিচ্ছেদ হতে সন্ধি উত্তম সেহেতু বলেছেন যে, সন্ধিই কল্যাণকর। এমন কি সুনান-ই-ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের অনুগ্রহ ও তাকওয়া প্রদর্শন করা অর্থাৎ স্ত্রীর অন্যায়কে ক্ষমা এবং তাকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার পূর্ণ প্রাপ্য দিয়ে দেয়া এবং পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা খুবই উত্তম কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা খুব ভালই জানেন। আর এর বিনিময়ে দেবেন তিনি উত্তম প্রতিদান।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–তোমরা যদিও কামনা কর যে, তোমাদের কয়েকটি স্ত্রীর মধ্যে সর্বপ্রকারের ন্যায় ও সমতা বজায় রাখবে, তবুও তোমরা তা পারবে না। কেননা, তোমরা হয়তো একটি একটি করে রাত্রির পালা করে দিতে পার, কিন্তু প্রেম, চাহিদা, সঙ্গম ইত্যাদির সমতা কি রূপে রক্ষা করবে?

ইবনে মুলাইকা (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এজন্যেই হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্যে সঠিকভাবে সমতা রক্ষা করে চলতেন। তথাপি তিনি আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ প্রার্থনা করতেনঃ "হে প্রভূ! এটা ঐ বন্টন যা আমার অধিকারে রয়েছে। এখন যেটা আমার অধিকারের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক, সে ব্যাপারে আপনি তিরস্কার করবেন না।" (সুনান-ই-আবি দাউদ) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, অন্য সনদে এটা মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে এবং ওটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– একদিকে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে পড়ো না যার ফলে অপর স্ত্রী দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কেননা সে সময় তার

স্বামী থেকেও না থাকা হবে। তুমি তার থেকে সরে থাকবে অথচ সে তোমার পত্নীত্বের বন্ধনেই আবদ্ধা থাকবে। না তুমি তাকে তালাক দেবে যে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে, না তুমি তার সে হক আদায় করবে যে হক প্রত্যেক স্ত্রীর তার স্বামীর উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যার দু'টি স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু একজনের দিকেই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের অর্ধাংশ গোশ্‌ত খসে পড়বে।" (মুসনাদ-ই-আহমাদ ইত্যাদি) ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি মারফূ' পন্থায় হাম্মামের হাদীস ছাড়া জানা যায় না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—তোমরা যদি তোমাদের কার্যের সংশোধন করে নাও এবং যতদূর তোমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও সমতা রক্ষা কর ও সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চল তবে যদি কোন সময় কারও দিকে কিছু আসক্ত হয়েই পড়, সেটা তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, যদি স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েই যায় তবে আল্লাহ তা'আলা একজনকে অপরজন হতে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। স্বামীকে তিনি এ স্ত্রী অপেক্ষা ভাল স্ত্রী দান করবেন এবং স্ত্রীকেও তিনি এ স্বামী অপেক্ষা ভাল স্বামী দান করবেন।

আল্লাহর অনুগ্রহ বড়ই প্রশস্ত, তিনি খুবই অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানময়ও বটে। তাঁর সমস্ত কাজ এবং সমস্ত শরীয়ত পূর্ণ জ্ঞান ও নৈপুণ্যে ভরপুর।

১৩১। নভোমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই জন্যে; এবং নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছিল– আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে চরম আদেশ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং যদি অবিশ্বাস কর তবে নিশ্চয়ই

١٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ○

নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; এবং আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।

١٣٢- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

১৩২। এবং আকাশসমূহে যা কিছু রয়েছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

١٣٣- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ○

১৩৩। যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে হে লোক সকল! তোমাদেরকে বিগত করে অন্যদেরকে আনয়ন করবেন এবং আল্লাহ এর উপর শক্তিমান।

١٣٤- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○ ع

১৩৪। যে ইহলোকের প্রতিদান আকাঙ্খা করে তবে আল্লাহর নিকট ইহলোক ও পরলোকের প্রতিদান রয়েছে; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী পরিদর্শক।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র অধিকারী তিনিই। তিনি বলেন–যে নির্দেশাবলী তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তাঁর একত্বে বিশ্বাস করবে, তাঁর ইবাদত করবে এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, এ নির্দেশাবলীই তোমাদের পূর্বে আহ্‌লে কিতাবকেও দেয়া হয়েছিল। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে তাঁর কি ক্ষতি করতে পারবে? তিনি তো একাই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যেমন হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় গোত্রের লোককে বলেছিলেনঃ যদি তোমরা ও সারা

জগতের লোক আল্লাহকে অস্বীকার কর তবুও তিনি তোমাদের হতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসার যোগ্য। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন–

فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ -

অর্থাৎ 'তারা অস্বীকার করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহ তাদের হতে অমুখাপেক্ষী হয়েছিলেন, তিনি বড়ই অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসিত।' (৬৪ঃ৬)

বলা হচ্ছে–তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের মালিক ও তিনি প্রত্যেকের সমস্ত কার্যের উপর সাক্ষী। কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। তিনি এ ক্ষমতাও রাখেন যে, তোমরা যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ কর তবে তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য মাখলুক আনয়ন করবেন।

যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

অর্থাৎ 'যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন যারা তোমাদের মত হবে না।' (৪৭ঃ ৩৮)পূর্ব যুগের কোন একজন মনীষী বলেনঃ 'তোমরা এ আয়াতটি সম্বন্ধে গবেষণা কর যে, পাপী বান্দারা আল্লাহ তা'আলার নিকট কত তুচ্ছ?'

এ আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ কাজ মোটেই কঠিন নয়! অতঃপর তিনি বলেন–হে ঐ ব্যক্তি! যার মনোবাসনা ও চেষ্টা একমাত্র দুনিয়ার জন্যে সে যেন জেনে নেয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল আল্লাহ তা'আলার অধিকারেই রয়েছে। সুতরাং যখন তুমি তাঁর নিকট দু'টোই যাচ্ঞা করবে তখন তিনি তোমাদেরকে দু'টোই দান করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং পরিতৃপ্ত করবেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ* وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ* اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا

অর্থাৎ 'মানুষের মধ্যে এমনও রয়েছে যে বলে– হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আপনি দুনিয়া দান করুন, তাদের জন্য পরকালের কোনই অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যে বলে– হে আমাদের প্রভু!

আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান করুন এবং পরকালেও মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। এদের জন্যে ঐ অংশ রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে।' (২ঃ ২০০-২০২) আর এক আয়াতে আছে–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি পরকালের ক্ষেত্রের আকাঙ্খা করে আমি তার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে দেবো।' (৪২ঃ ২০) অন্য স্থানে রয়েছে–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দুনিয়া যাচ্ঞা করে, তখন আমি যাকে চাই ও যত চাই দুনিয়ায় প্রদান করে থাকি।' (১৭ঃ ১৮)

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا -এ আয়াতের ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিকরা দুনিয়া অনুসন্ধানে ঈমান কবূল করেছিল, তারা দুনিয়া পেয়ে যায় বটে, অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধলব্ধ মালে অংশীদার হয়ে যায়, কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট যা তৈরী রয়েছে তা সেখানে তারা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি ও তথাকার বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। সুতরাং উক্ত ইমাম সাহেবের মতে এ আয়াতটি مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا (১১ঃ ১৫) -এ আয়াতটির মতই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ আয়াতের অর্থ তো বাহ্যতঃ এটাই, কিন্ত প্রথম আয়াতটিকেও এ অর্থে নেয়ার ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ আয়াতের শব্দগুলো তো স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান আল্লাহর হাতেই রয়েছে, কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন তার জীবনটা একটি জিনিসের অনুসন্ধানেই শেষ করে না দেয়। বরং সে যেন দু'টো জিনিসই লাভ করার জন্যে সচেষ্ট হয়।

বলা হচ্ছে–যে তোমাদেরকে দুনিয়া দিচ্ছেন, আখিরাতের অধিকারীও তিনিই। এটা বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় যে, তোমরা তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে নেবে এবং অধিক প্রদানকারীর নিকট অল্প যাচ্ঞা করবে। না, না বরং তোমরা ইহকাল ও পরকালের বড় বড় কাজ ও উত্তম উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা কর। স্বীয় লক্ষ্যস্থল শুধু দুনিয়াকে বানিয়ে নিও না, বরং উচ্চাকাঙ্খার দ্বারা দৃষ্টি প্রসারিত করতঃ উভয় জগতে শান্তি লাভের চেষ্টা কর। মনে রেখ যে, উভয় জগতেরই মালিক তিনিই। প্রত্যেক লাভ ও ক্ষতি তাঁরই হাতে রয়েছে। এমন কেউ নেই

যে, তাঁর অংশীদার হতে পারে কিংবা তাঁর কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তিনিই বন্টন করেছেন। ধন ভাণ্ডারের চাবিগুলো তিনি স্বীয় হস্তে রেখেছেন। তিনি প্রত্যেক হকদারকেই চেনেন এবং যে যার হকদার তিনি তাকে তাই পৌঁছিয়ে থাকেন। তোমাদের তো এটা চিন্তা করা উচিত যে, যিনি তোমাদেরকে দেখবার শুনবার ক্ষমতা দান করেছেন, তাঁর দর্শন ও শ্রবণ কেমন হতে পারে।

১৩৫। হে মুমিনগণ! তোমারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাতা হও- এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদি সে সম্পদশালী বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহই তাদের জন্যে যথেষ্ট; অতএব, সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, এবং যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর বা পশ্চাৎপদ হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন।

١٣٥- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেটা থেকে যেন এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক সরে না পড়ে। এরূপ যেন না হয় যে তারা কারও ভয়ে, কোন লোভে, কারও তোষামোদে, কারও প্রতি দয়া দেখিয়ে এবং কারও সুপারিশে ইনসাফকে ছেড়ে দেয়। তারা সম্মিলিতভাবে যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। এ ব্যাপারে যেন তারা একে অপরের সহযোগিতা করতঃ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় বিচার কায়েম করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে- وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর'। (৬৫ঃ ২) সাক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হলেই তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক, ন্যায় ভিত্তিক ও সত্য। তাতে থাকবে না কোন পরিবর্তন ও গোপন করার প্রবণতা। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَوْ عَلَىٰٓ اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমরা স্পষ্ট ও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও তা তোমাদের নিজেদের প্রতিকূল হয়। তোমরা সত্য কথা বলা হতে বিরত হয়ো না এবং বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগত দাসদের মুক্তির বহু উপায় বের করে থাকেন। তোমাদের মুক্তি যে মিথ্যা সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে এমন কোন কথা নয়।

তারপর বলা হচ্ছে- اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ যদিও সত্য সাক্ষ্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তথাপি তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান হতে হাত মুখ ফিরিয়ে নিও না। কেননা, সত্য প্রত্যেকের উপর বিচারক। সাক্ষ্য প্রদানের সময় ধনীর প্রতি কোন লক্ষ্য রেখো না বা গরীবের উপরও দয়া প্রদর্শন করো না। তাদের মঙ্গলের বিবেচনা তোমাদের অপেক্ষা তাঁরই বেশী রয়েছে। তোমরা সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্যই প্রদান কর। চিন্তা করো, কারও ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করো না, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কারও প্রতি শত্রুতা করতঃ ন্যায় ও সাম্য হাত ছাড়া করো না। সদা-সর্বদা ন্যায়ের উপর অটল থাক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অন্যায় করতে উত্তেজিত না করে, তোমরা সুবিচার করতে থাক, এটাই হচ্ছে মুত্তাকী হওয়ার খুবই নিকটবর্তী।" (৫ঃ ৮)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহা (রাঃ)-কে যখন খাইবারবাসীদের ক্ষেত্র ও শস্য পরিমাপের জন্যে প্রেরণ করেন তখন খাইবারবাসী তাঁকে এ জন্যে ঘুষ প্রদান করতে চায় যে, তিনি যেন পরিমাণ কম বলেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহর শপথ! সমস্ত মাখলুকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, পক্ষান্তরে তোমরা আমার নিকট কুকুর ও শূকর হতেও জঘন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রেমে পড়ে বা তোমাদের শত্রুতাকে সামনে রেখে আমি যে সুবিচার হতে সরে পড়বো ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করবো,

এটা সম্ভব নয়।” একথা শুনে তারা বলে, “এর দ্বারাই তো আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।” এ পূর্ণ হাদীসটি সূরা-ই-মায়েদার তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন–তোমরা যদি সাক্ষ্যে পরিবর্তন আনয়ন কর, মিথ্যা কথা দ্বারা কার্য সাধন কর, প্রকৃত ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্য দান কর, জিহ্বা বাঁকা করে পেঁচযুক্ত কথা বলে ঘটনা কম-বেশী কর, কিছু গোপন কর ও কিছু প্রকাশ কর তবে জেনে রেখো যে সর্বজ্ঞ মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলার সামনে কোন কৌশলে কাজ দেবে না। সেখানে গিয়ে এর প্রতিদান পাবে এবং শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেনঃ 'সর্বোত্তম সাক্ষী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে জিজ্ঞাসার পূর্বেই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে।'

১৩৬। হে মুমিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যে কেউ আল্লাহ, তদীয় ফেরেশতাসমূহ, তাঁর কিতাবসমূহ তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।

١٣٦- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرَسُوْلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ঈমানের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। সমস্ত আদেশ ও নিষেধ, সমস্ত শরীয়ত এবং ঈমানের সমুদয় শাখাকে যেন মেনে নেয়। এতে তাহসীলে হাসিল নেই, বরং রয়েছে তাকমীলে কামেল। অর্থাৎ যদি তারা ঈমান এনে থাকে তবে তার উপরেই যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে তবে তিনি তাদেরকে

আরও যত কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন ঐ সব কিছুর উপর যেন বিশ্বাস রাখে। প্রত্যেক মুসলমানের اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন"-এ প্রার্থনার ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ওর উপরেই আমাদেরকে অটল রাখুন এবং আমাদের হিদায়াতকে দিনের পর দিন বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে স্বীয় সত্তার উপর এবং স্বীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।' (৫৭ঃ ২৮)

وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন এবং وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। কুরআন কারীমের জন্য 'নায্যালা' এবং অন্যান্য কিতাবের জন্যে 'আন্যালা' ক্রিয়া ব্যবহার করার কারণ এই যে, কুরআন কারীম মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিতাবসমূহ সমস্তই একই সাথে অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–যে কেউ আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ হিদায়াতের পথ হতে সরে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের সুপথ প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত।

১৩৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে তৎপর অবিশ্বাসী হয়, পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে অবিশ্বাস করে, অনন্তর অবিশ্বাসে পরিবর্ধিত হয়, তবে আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না।

١٣٧- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۝

١٣٨- بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

১৩৮। কপটদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

١٣٩- الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

১৩৯। যারা মুমিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।

١٤٠- وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

১৪০। এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের গ্রন্থ মধ্যে অবতারণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তার প্রতি উপহাস করতে শ্রবণ কর, তখন তাদের সাথে উপবেশন করো না–যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে, অন্যথা তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

ইরশাদ হচ্ছে–'যে ঈমান আনয়নের পর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, অতঃপর আবার মুমিন হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যায়, তারপর কুফরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে, তার প্রার্থনা গৃহীত হবে না, তার

ক্ষমার ও মুক্তির কোন আশা নেই এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা সরল সঠিক পথে আনয়ন করবেন না।' হযরত আলী (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে বলতেনঃ ধর্মত্যাগীকে তিনবার বলা হবে- 'তাওবা করে নাও?' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-এ মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, শেষে তাদের অন্তরে মোহর লেগে যায়। তাই, তারা মুনিমদের ছেড়ে কাফিরদেকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। এদিকে বাহ্যতঃ মুমিনদের সাথে মিলেমিশে থাকে আর ওদিকে কাফিরদের নিকট বসে তাদের সামনে মুমিনদের সম্পর্কে উপহাসমূলক কথা বলে বেশ আনন্দ উপভোগ করে। তাদেরকে বলে-'আমরা মুসলমানদেরকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি। আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের সামনে পেশ করতঃ তাতে তাদের অকৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-'তোমরা চাও যে, কাফিরদের নিকট যেন তোমাদের সম্মান লাভ হয়। কিন্তু তোমাদের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তারা তোমাদের সাথে প্রতারণা করছে। জেনে রেখো যে, সম্মানের মালিক হচ্ছেন এক এবং অংশীবিহীন আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন, সম্মান দান করেন।' যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

অর্থাৎ 'যে সম্মান যাঞ্ছা করে তবে সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্যে।' (৩৫ঃ১০) আর একটি আয়াতে রয়েছে-

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ 'সম্মান আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসূলের জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।' (৬৩ঃ ৮) ভাবার্থ এই যে, হে মুনাফিকের দল! যদি তোমরা প্রকৃত সম্মান পেতে চাও তবে আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে মিলিত হও, তাঁর ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় এবং তাঁর নিকট সম্মান যাঞ্ছা কর তাহলেই তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ রাইহানা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি অহংকারের বশবর্তী হয়ে স্বীয় মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বীয় বংশের সংযোগ তার কাফির বাপ-দাদার সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং নবম পর্যন্ত পৌছে যায়, সেও তাদের সঙ্গে দশম জাহান্নামী।' এরপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বলেন-'আমি যখন

তোমাদেরকে নিষেধ করেছি যে, যে মজলিসে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ওগুলোকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তোমরা সে মজলিসে বসো না। এরপরেও তোমরা ঐ রূপ মজলিসে অংশগ্রহণ কর তবে তোমাদেরকেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে এবং তাদের পাপে তোমরাও অংশীদার হবে।' যেমন একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'যে দস্তরখানায় মদ্যপান করা হচ্ছে তার উপর কোন এমন এক ব্যক্তির উপবেশন করা উচিত নয়, যে আল্লাহর উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে থাকে।' এ আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা-ই-আনআমের এ আয়াতটি—

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

অর্থাৎ 'যখন তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা আমার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে বিতর্ক করছে, তখন তুমি তাদের দিক হতে বিমুখ হও।' (৬ঃ ৬৮)

হযরত মুকাতিল ইব্নে হিব্বান (রঃ) বলেনঃ এ আয়াতের اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ -এ ঘোষণাটি আল্লাহ তা'আলার وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ -এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'মুত্তাকীদের উপর তাদের (মুনাফিকদের) হিসেবের কোন বোঝা নেই, কিন্তু রয়েছে শুধু উপদেশ যে হয় তো তারা বেঁচে যাবে।' (৬ঃ ৬৯)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন—'আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।' অর্থাৎ যেমন এ মুনাফিকেরা এখানে ঐ কাফিরদের কুফরীতে অংশীদার রয়েছে, তেমনই কিয়ামতের দিন চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে, কয়েদখানার লৌহ শৃংখলে, গরম পানি ও রক্ত-পুঁজ পানে তাদের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের সকলকেই একই সাথে চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হবে।

১৪১। যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহ হতে জয়লাভ কর তবে তারা বলে— আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? এবং যদি ওটা

١٤١- الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ

لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে তবে বলে– আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? অনন্তর আল্লাহ উত্থান দিবসে তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন; এবং কখনও আল্লাহ মুমিনদের প্রতিপক্ষে কাফিররেদকে বিজয়ী করবেন না।

এখানে মুনাফিকদের মন্দ অন্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সব সময় মুসলমানদের ধ্বংস ও অবনতির অনুসন্ধানে লেগে থাকে। কোন জিহাদে মুসলমানদের বিজয় লাভ ঘটলে তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের বন্ধুরূপে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট এসে বলেঃ 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' পক্ষান্তরে যদি কোন কোন সময় মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে জয়যুক্ত করেন তবে তারা তাদের দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে বলেঃ 'আমরা তো গোপনে তোমাদেরকেই সাহায্য করেছি এবং সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছি। এটা ছিল আমাদের একটা কৌশল যার বলে আজ তোমরা বিজয় লাভ করলে।' এটা হচ্ছে তাদের কাজ যে, তারা দু'নৌকায় পা দিয়ে থাকে। যদিও তারা তাদের এ কৌশলকে নিজেদের পক্ষে গৌরবের কারণ মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বেঈমানির পরিচায়ক। কাঁচা রং কয়দিন থাকবে? গাজরের বাঁশী কয়দিন বাজবে? কাগজের নৌকাই বা কয়দিন চলবে? এমনই সময় আসছে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হবে। স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে তারা আফসোস করবে। স্বীয় লজ্জাজনক কাজের কারণে কেঁদে কেঁদে চক্ষু ভাসাবে। তারা আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সমস্ত মঙ্গল হতে নিরাশ হয়ে যাবে। সেদিন তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। তাদের গোপনীয়তা সেদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। সমস্ত রহস্য সেদিন উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। তাদের জঘন্য কাজ অত্যন্ত ভয়াবহ আকারে সামনে এসে হাযির হবে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আল্লাহ তা'আলা কখনও মুমিনদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেন না।' এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ বাক্যটিকে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে মিলিয়ে পাঠ করেন। ভাবার্থ ছিল এই যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেন না। এও বর্ণিত আছে যে, سَبِيل শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে প্রমাণ। কিন্তু তথাপিও এর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য হওয়াতেও কোন অসুবিধে নেই। অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা এখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন সময় আনয়ন করবেন যখন কাফিররা মুসলমানদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়ার মত শক্তি অর্জন করতে পারবে। পৃথিবীতে কোন সময় হয়তো তারা বিজয়ী হয়ে যায় সেটা অন্য কথা। কিন্তু পরিণামে জয় মুসলমানদেরই দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনগণকে ইহলৌকিক জগতে অবশ্যই সাহায্য করবো।' (৪০ঃ ৫১) এ অর্থের মধ্যে একটা সৌন্দর্য এই রয়েছে যে, মুনাফিকরা ঐ সময়ে আগমনের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে সময়ে তারা মুসলমানদের ধ্বংস কামনা করছিল। তাতে তাদেরকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে তিনি মুসলমানদের উপর এমনভাবে বিজয়ী করবেন না, যার ফলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তারা যে ভয়ে মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যভাবে মিশতে পারছিল না সেই ভয়কেও তিনি দূর করে দিয়ে বলেন যে, মুসলমানেরা যে ভূ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এটা যেন তারা মনে না করে। এ ভাবার্থকেই তিনি فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ الخ (৫ঃ ৫২)-এ আয়াতে পরিষ্কার করেছেন।

উপরোক্ত আয়াত-ই-কারীমা দ্বারা উলামা-ই-কিরাম যুক্তি নিয়েছেন যে, মুসলমান দাসকে কাফিরদের হাতে বিক্রী করা বৈধ নয়। কেননা, ঐ অবস্থায় কাফিরদেকে মুসলমানের উপর বিজয়ী করে দেয়া হয় এবং এতে মুসলমানের হীনতা প্রকাশ পায়। যাঁরা একে জায়েয রেখেছেন তাঁরা তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার উপর হতে স্বীয় অধিকার নষ্ট করে দেয়।

١٤٢- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৪২। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেকে ঐ প্রতারণা প্রত্যর্পণ করছেন; এবং যখন তারা নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হয় তখন লোকদেরকে দেখাবার জন্যে আলস্যভরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

١٤٣- مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

১৪৩। যারা এর মধ্যে সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান রয়েছে তারা এদিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন বস্তুতঃ তুমি তার জন্যে কোনই পথ পাবে না।

সূরা-ই-বাকারার প্রথমেও يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (২ঃ ৯) -এ আয়াতটির তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এখানেও বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এ নির্বোধ মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করতে রয়েছে, অথচ তিনি তাদের অন্তরের সমস্ত কথা সম্যক অবগত রয়েছেন। স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ মুনাফিকরা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়ায় চলছে এবং মুসলমানদের মধ্যে চলছে, তদ্রূপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপেও চলবে। যেমন কুরআন পাকে রয়েছে—কিয়ামতের দিনেও এরা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে শপথ করে বলবে যে, তারা সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেমন আজ তারা তোমাদের সামনে শপথ করে বলছে। কিন্তু সেই সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সামনে তাদের এ বাজে শপথে কোনই কাজ দেবে না। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে প্রতারণা প্রত্যার্পণকারী। তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তাই তারা আজ বেড়ে চলেছে ও ফুলে উঠেছে এবং এটাকে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক মনে করেছে।

কিয়ামতের দিনেও তাদের অবস্থা এমনই হবে। তারা মুসলমানদের আলোকের উপর নির্ভর করে থাকবে। মুসলমানেরা সামনে এগিয়ে যাবে। এ মুনাফিকরা তখন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে-'তোমরা থাম, আমরা তোমাদের আলোকের সাহায্যে চলতে থাকি।' মুসলমানেরা তখন উত্তর দেবে-'তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলো অনুসন্ধান কর।' তারা পিছনে ফিরবে এমন সময় তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। মুসলমানদের দিকে থাকবে করুণা এবং তাদের দিকে থাকবে দুঃখ ও বেদনা।

হাদীস শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি শুনাবে আল্লাহ তা'আলা সেটা শুনিয়ে দেবেন এবং যে রিয়াকারী করবে আল্লাহ তা'আলা সেটা দেখিয়ে দেবেন। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ঐ মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও হবে যাদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ লোকের সামনে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেবেন। ফেরেশতাগণ তখন তাদেরকে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ পাক আমাদেকে ওটা হতে রক্ষা করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-'যখন তারা নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হয় তখন তারা শৈথিল্যের সাথে দণ্ডায়মান হয়।' অর্থাৎ নামাযের মত উত্তম ইবাদত তারা একাগ্রচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করে না। কেননা সত্য নিয়ত, উত্তম আমল, প্রকৃত ঈমান এবং সত্য বিশ্বাস তাদের মধ্যে মোটেই নেই। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) পরিশ্রান্ত দেহে ছট্‌ফট করা অবস্থায় নামায পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন এবং বলতেনঃ 'মানুষের উচিত যে, সে যেন পূর্ণ আগ্রহ ও একাগ্রতার সাথে নামাযে দণ্ডায়মান হয় এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার কথার উপর আল্লাহর কান রয়েছে। তিনি তার আকাঙ্খা পুরো করার জন্যে সদা প্রস্তুত রয়েছেন। এ তো হলো মুনাফিকদের বাহ্যিক অবস্থা যে তারা পরিশ্রান্ত দেহে ও সংকীর্ণ অন্তরে বেগার পরিশোধের নামাযের জন্যে আগমন করে। আর তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, আন্তরিকতা হতে বহু দূরে রয়েছে। তারা প্রভুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। তারা শুধু মানুষের মধ্যে নামাযী রূপে পরিচিত হবার জন্যে এবং নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নামায পড়ে থাকে। তাহলে এ অস্থিরচিত্ত মানুষেরা নামাযে কি পাবে? এ কারণেই তারা ঐ নামাযে অনুপস্থিত থাকে যে নামাযে মানুষ একে অপরকে দেখতে কম পায়। যেমন ইশা ও ফজরের নামায।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী নামায হচ্ছে ইশা ও ফজরের নামায। যদি তারা এ নামাযের ফযীলতের কথা অন্তরে বিশ্বাস করতো তবে জানুর ভরে চলে হলেও অবশ্যই এ নামাযে হাযির হতো। কাজেই আমি তখন ইচ্ছে করি যে, তাকবীর বলিয়ে দিয়ে কাউকে ইমামতির স্থানে দাঁড় করতঃ নামায আরম্ভ করিয়ে দেই, অতঃপর আমি গিয়ে লোকদেরকে বলি যে তারা যেন জ্বালানী কাষ্ঠ নিয়ে এসে ঐ লোকদের বাড়ীর চতুর্দিকে রেখে দিয়ে আগুন জ্বালিযে দেয় এবং তাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেয় যারা জামাআতে হাজির হয় না।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আল্লাহর শপথ! যদি তাদের একটি চর্বিযুক্ত অস্থি বা দু'টি উত্তম (পশ্বাদির) খুর পাওয়ার আশা থাকতো তবে তারা দৌড়ে চলে আসতো। কিন্তু তাদের নিকট আখিরাতের এবং আল্লাহ প্রদত্ত পুণ্যের ওর সমানও মর্যাদা নেই। বাড়ীতে যেসব স্ত্রীলোক ও শিশু অবস্থান করে তাদের খেয়াল যদি আমার না থাকতো তবে অবশ্যই আমি তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিতাম।'

মুসনাদ-ই-আবি ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি লোকদের উপস্থিতির সময় তো নামাযকে সুন্দরভাবে থেমে থেমে আদায় করে কিন্তু যখন কেউ থাকে না তখন যেন-তেনভাবে পড়ে নেয়, সে ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে।'

আল্লাহর তা'আলা বলেন–'তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।' অর্থাৎ নামাযে তাদের মোটেই মন বসে না। তারা যে কথা বলে তা নিজেই বুঝে না বরং তারা উদাসীনভাবে নামায পড়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ওটা মুনাফিকের নামায যে ব্যক্তি বসে বসে সূর্যের দিকে তাকাতে রয়েছে, অবশেষে ওটা অস্তমিত হতে চলেছে এবং শয়তানের শৃংগদ্বয়ের মধ্যে হয়ে গেছে সে সময় সে উঠে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি চার রাকআত নামায আদায় করে নেয় যার মধ্যে আল্লাহর যিকির নামেমাত্র করে থাকে।' (সহীহ মুসলিম ইত্যাদি) এ মুনাফিক সদা স্তম্ভিত ও হতভম্ব অবস্থায় কালাতিপাত করে। ঈমান ও কুফরীর মধ্যে তাদের মন অস্থির থাকে। তারা না স্পষ্টভাবে মুসলমানদের সঙ্গী, না সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের সাথী। কখনও ঈমানের জ্যোতি অন্তরে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। আবার কখনও কুফরীর অন্ধকার তাদের উপর জয়যুক্ত হলে তারা ঈমান হতে দূরে সরে পড়ে। না তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের দিকে রয়েছে, না ইয়াহূদীদের পক্ষে রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'মুনাফিকের অবস্থা হচ্ছে দু'টি পালের মধ্যস্থিত ছাগলের অবস্থার ন্যায় যা ভ্যা-ভ্যা করতে করতে কখনও এ পালের দিকে দৌড় দেয় এবং কখনও ঐপালের দিকে দৌড় দেয়। সে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি যে, এর পিছনে যাবে কি ওর পিছনে যাবে।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ অর্থের হাদীসটি হযরত উবায়েদ ইব্‌নে উমায়ের (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার (রাঃ)-এর উপস্থিতিতে শব্দের কিছু হেরফের করে বর্ণনা করলে তিনি নিজ কানে শুনা শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করতঃ বলেন যে, সেরূপ নয়, বরং প্রকৃত হাদীস হচ্ছে এরূপ।' এতে হযরত উবায়েদ ইব্‌নে উমায়ের (রাঃ) অসন্তুষ্ট হন।

'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, মুমিন, কাফির এবং মুনাফিকের উপমা হচ্ছে ঐ তিনটি লোকের ন্যায় যারা একটি নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছে। একজন তীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, দ্বিতীয়জন নদী অতিক্রম করতঃ গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে এবং তৃতীয় ব্যক্তি নদীতে নেমে পড়েছে। যখন সে নদীর মধ্যস্থলে পৌঁছেছে তখন এ তীরের লোকটি তাকে ডাক দিয়ে বলছে– 'ধ্বংস হতে কোথায় চলেছো এ তীরে ফিরে এসো।' আবার ঐ তীরের লোকটি তাকে ডাক দিয়ে বলছে–'এ তীরে চলে এসো, মুক্তি পেয়ে যাবে এবং আমার মত গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে, অর্ধেক পথতো অতিক্রম করেই ফেলেছো।' এখন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একবার এদিকে দেখে এবং একবার ওদিকে দেখে। এ দোদুল্যমান অবস্থায় সে রয়েছে এমন সময় একটি বিরাট তরঙ্গ এসে তাকে ভাসিয়ে নেয় এবং অবশেষে সে নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারিয়ে ফেলে। অতএব নদী অতিক্রমকারী হচ্ছে মুসলমান, তীরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হচ্ছে কাফির এবং ডুবে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, মুনাফিকের উপমা হচ্ছে ঐ ছাগলটির ন্যায় যে একটি সবুজ শ্যামল পাহাড়ের উপর গুটিকয়েক ছাগল দেখে তথায় আসে এবং শুঁকে চলে যায়। তারপরে আর একটি পাহাড়ের উপর উঠে এবং শুঁকে চলে আসে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন, তার পথ প্রদর্শক আর কে আছে?' আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে তাদের জঘন্য কার্যের কারণে সঠিক পথ হতে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। এখন আর কেউ তাকে সঠিক পথের উপর আনতেও পারবে না এবং তার মুক্তির ব্যবস্থাও করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছের বিপরীত কাজ কেউ করতে পারবে না। তিনি সকলেরই শাসনকর্তা। তাঁর উপর কারও শাসন ক্ষমতা নেই।

١٤٤- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

১৪৪। হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

١٤٥- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○

১৪৫। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত এবং তুমি কখনও তাদের জন্যে সাহায্যকারী পাবে না।

١٤٦- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

১৪৬। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও আল্লাহর ধর্মে বিশুদ্ধ হয়, ফলতঃ তারাই মুমিনদের সঙ্গী এবং অচিরে আল্লাহ মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।

١٤٧- مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৭। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? এবং আল্লাহ গুণগ্রাহী মহাজ্ঞানী।

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখতে, তাদের সাথে সর্বদা উঠাবসা করতে, মুসলমানদের গুপ্তকথা তাদের নিকট প্রকাশ করতে এবং তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নিষেধ করছেন। অন্য আয়াতে আছে–

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

অর্থাৎ 'মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন মঙ্গলের অধিকারী নয়। হ্যাঁ, তবে যদি আত্মরক্ষার জন্যে বাহ্যিক ভালবাসা রাখ সেটা অন্য কথা এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ হতে ভয় প্রদর্শন করছেন।' (৩ঃ ২৮) অর্থাৎ তোমরা যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে তোমাদের তাঁর হতে ভীত হওয়া উচিত। 'মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে' হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই এরূপ ইবাদতের মধ্যে سُلْطَان শব্দ রয়েছে তথায় তার ভাবার্থ হচ্ছে দলীল। অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর তবে তোমাদের ঐ কাজ তোমাদের উপর ঐ বিষয়ের দলীল হয়ে যাবে যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। পূর্বযুগীয় কয়েকজন মুফাস্‌সির এ আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণাম বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের কঠিন কুফরীর কারণে জাহান্নামের একেবারে নিম্নস্তরে প্রবেশ করবে। دَرْكٌ শব্দটি হচ্ছে دَرَجَةٌ শব্দের বিপরীত। জান্নাতের দরজা রয়েছে একটির উপর আরেকটি। পক্ষান্তরে জাহান্নামের 'দারক' রয়েছে একটির নীচে অপরটি। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, মুনাফিকদেরকে আগুনের বাক্সে পুরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা ওর মধ্যে জ্বলতে পুড়তে থাকবে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্সটি হবে লোহার, যাতে আগুন দেয়া মাত্রই আগুন হয়ে যাবে এবং তার চার দিক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। কেউ এমন হবে না যে তাকে কোন প্রকারের সাহায্য করতে পারে বা তাকে জাহান্নাম হতে বের করতে পারে অথবা শাস্তি কিছু কম করাতে পারে। তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যারা তাওবা করবে, লজ্জিত হবে এবং ঐ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অতঃপর সংশোধিত হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৎকার্য সম্পাদন করবে, রিয়াকে আন্তরিকতার সাথে পরিহার করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে, তিনি তাদের তাওবা কবূল করবেন, তাদেরকে খাঁটি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং উত্তম পুণ্যের

অধিকারী করবেন। মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমরা তোমাদের দ্বীনকে খাঁটি কর তবে অল্প আমলই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে।'

এরপর ইরশাদ হচ্ছে—'আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন বেনিয়ায, তিনি বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে চান না। হ্যাঁ, তবে যদি সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পাপ কার্য করতে থাকে তবে অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে।' তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন—'যদি তোমরা তোমাদের আমল সুন্দর করে নাও এবং আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন কর তবে কোন কারণ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। তিনিতো ছোট ছোট পুণ্যের বেশ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তাকে সম্মান দিয়ে থাকেন। তিনি পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। কার আমল যে খাঁটি ও গ্রহণযোগ্য তা তিনি ভালই জানেন। কার অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং কার অন্তর যে ঈমান শূন্য তিনি সেটাও জানেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। **(পঞ্চম পারা সমাপ্ত)**

১৪৮। আল্লাহ কারো অত্যাচারিত হওয়া ব্যতীত অপ্রিয় বাক্য প্রকাশ করা ভালবাসেন না; এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

١٤٨- لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

১৪৯। যদি তোমরা সৎকার্য প্রকাশ কর বা গোপন কর কিংবা অসদ্বিষয় ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাদানকারী, সর্বশক্তিমান।

١٤٩- اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, কোন মুসলমানের জন্য বদ দু'আ করা বৈধ নয়। তবে যার উপর অত্যাচার করা হবে সে অত্যাচারীর জন্যে বদ দু'আ করতে পারে। কিন্তু সেও যদি ধৈর্যধারণ করে তবে ফযীলত তাতেই রয়েছে। সুনান-ই-আবি দাউদে রয়েছে যে, হযরত

আয়েশা (রাঃ)-এর কোন জিনিস চুরি যায়। তখন তিনি চোরের জন্যে বদ দু'আ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা শুনে বলেনঃ 'তার বোঝা হালকা করছো কেন?' হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, তার জন্যে বদ দু'আ করা উচিত নয়, বরং নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উচিতঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِ وَاسْتَخْرِجْ حَقِّىْ مِنْهُ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার উপর সাহায্য করুন এবং তার নিকট হতে আমার প্রাপ্য বের করে দিন।' এ মনীষী হতেই বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারীর জন্যে বদ দু'আ করার অনুমতি যদিও অত্যাচারিত ব্যক্তির রয়েছে, কিন্তু সেটা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হযরত আবদুল করিম ইব্‌নে মালিক জাযারী (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, যে ব্যক্তি গালি দেবে অর্থাৎ মন্দ বলবে তাকে মন্দ বলা যাবে, কিন্তু কেউ অপবাদ দিলে তাকে অপবাদ দেয়া যাবে না। অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ

অর্থাৎ 'যে অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারী হতে তার অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের উপর কোন জবাবদিহী নেই'। (৪২ঃ ৪১) সুনান-ই-আবি দাউদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'দু'জন গালিদাতা যা বলে ওর শাস্তি তার উপর রয়েছে যে প্রথমে গালি দিয়েছে যে পর্যন্ত না অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে।'

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ 'যদি কোন ব্যক্তি কারও নিকট অতিথি হিসেবে আগমন করে এবং অতিথি সেবক তার আতিথেয়তার হক আদায় না করে তবে অতিথি সেবকের দুর্নাম করতে পারে যে পর্যন্ত না সে জিয়াফতের হক আদায় করে।' সুনান-ই-আবি দাউদ, সুনান-ই-ইবনে মাজা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে থাকেন। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, তথাকার লোক আমাদের মেহমানদারী করে না। এতে আপনার অভিমত কি?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁদেরকে বলেনঃ 'যখন তোমরা কোন সম্প্রদায়ের নিকট গমন করবে তখন যদি তারা মেহমানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তোমরা তা কবূল করবে। আর যদি তারা তা না করে তবে তোমরা তাদের সাধ্য অনুপাতে তাদের নিকট হতে অতিথির উপযুক্ত প্রাপ্য আদায় করবে।'

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে মুসলমান কোন এক লোকের বাড়ীতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়, রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ তারা তার আতিথ্যের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, সে সময় প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হবে ঐ ব্যক্তির মাল হতে ও ক্ষেত হতে ঐ রাত্রির মেহমানদারীর জিনিস আদায় করে দিয়ে অতিথিকে সাহায্য করা।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'জিয়াফতের রাত্রি প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। যদি কোন মুসাফির সকাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকে, তবে এটা ঐ মেজবানের দায়িত্বে কর্জ রূপে থাকবে, এখন সে তা আদায় করুক বা ছেড়ে দিক।' এসব হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আহমাদ ইব্‌নে হাম্বল প্রমুখ মনীষীর মাযহাব এই যে, নিমন্ত্রণ ওয়াজিব।

সুনান-ই-আবি দাউদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার প্রতিবেশী আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ 'তুমি এক কাজ কর, তোমার বাড়ীর সমস্ত আসবাবপত্র বাইরে এনে রেখে দাও।' লোকটি ঐ কাজই করে এবং সমস্ত আসবাবপত্র রাস্তার উপর রেখে বসে পড়ে। রাস্তা দিয়ে যেই গমন করে সেই তাকে জিজ্ঞেস করে—ব্যাপার কি? সে বলে, 'আমার প্রতিবেশী আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি অধৈর্য হয়ে এখানে চলে এসেছি।' সবাই তখন তার প্রতিবেশীকে ভাল-মন্দ বলতে থাকে। কেউ বলে যে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ বর্ষিত হোক। কেউ বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করুন, তার প্রতিবেশী যখন এভাবে অপমানিত হওয়ার কথা জানতে পারে, তখন সে অনুরোধ করে তাকে বাড়ী নিয়ে যায় এবং বলে—'আল্লাহর শপথ! এখন আর মৃত্যু পর্যন্ত আপনার প্রতি কোন অত্যাচার করবো না।'

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—'হে লোক সকল! যদি তোমরা কোন সৎ কার্য প্রকাশ কর বা গোপন কর, কিংবা তোমার উপর কেউ হয়তো অত্যাচার করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা কর তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার জন্যে রয়েছে বড় পুণ্য ও মহা প্রতিদান। তিনি নিজেও ক্ষমাকারী এবং বান্দার মধ্যেও তিনি এ অভ্যাস পছন্দ করেন। প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। কেউ বলেন—

سُبْحَانَكَ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যে, আপনি জানা সত্ত্বেও সহনশীলতা প্রদর্শন করছেন।' আবার কেউ কেউ বলেন–

سُبْحَانَكَ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

অর্থাৎ 'হে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমকারী প্রভু! সমস্ত পবিত্রতা আপনার সত্তার জন্যই উপযুক্ত।'

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, সাদকা ও খায়রাতের কারণে কারও মাল কমে যায় না। ক্ষমা ও মাফ করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা সম্মান বৃদ্ধি করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন।

١٥٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ ○

১৫০। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছে করে এবং বলে যে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি, এবং তারা এ মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছে করে।

١٥١- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

১৫১। ওরাই প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী, এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৫২। এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না-আল্লাহ তাদেরকেই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

١٥٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

এ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে যে, মাত্র একজন নবীকেও যে মানে না সেও কাফির। ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নবীকেই মানতো। খ্রীষ্টানেরা শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ছাড়া সমস্ত নবীকেই বিশ্বাস করতো। সামেরীরা হযরত ইউশা' (আঃ)-এর পরে অন্য কোন নবী (আঃ)-কে স্বীকার করতো না। হযরত ইউশা (আঃ) হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর খলীফা ছিলেন। মাজুসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নবী যারাদাশ্‌তকে স্বীকার করতো! কিন্তু তারা যখন তাঁর শরীয়তকে অস্বীকার করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শরীয়তকে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন। সুতরাং এ লোকগুলো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করতো অর্থাৎ কোন নবীকে মানতো ও কোন নবীকে মানতো না, তা যে, আল্লাহ প্রদত্ত দলীলের উপর ভিত্তি করে তা নয়। বরং শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা, অত্যন্ত গোঁড়ামি এবং পূর্ব পুরুষের কথার উপর অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই তারা এরূপ করতো। এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি মাত্র একজন নবীকে মানে না সে আল্লাহ তা'আলার নিকট সমস্ত নবীকেই অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা নিঃসন্দেহেই কাফির। প্রকৃতপক্ষে 'শারঈ' ঈমান তাদের কারও উপরেই নেই, বরং রয়েছে শুধু গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির ঈমান। আর এরূপ ঈমান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এ কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। কেননা, যাঁদের উপর ঈমান না এনে তাঁদের মর্যাদার হানি করেছে তার প্রতিফল এটাই যে, তাদেরকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যে তাদের উপর ঈমান আনছে না তা তাদের চিন্তা-শক্তির অভাবের কারণেই হোক

বা সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর ইহলৌকিক কোন স্বার্থের কারণেই হোক, যেমন ইয়াহূদী আলেমদের রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে এ অভ্যাস ছিল যে, তারা একমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত করেন এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্যে অপমানকর শাস্তি।

অতঃপর মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতের প্রশংসা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সমস্ত নবীকেই বিশ্বাস করে এবং তাঁদের মধ্যে কোন ভিন্নতা সৃষ্টি করে না। আল্লাহ তা'আলার শেষ গ্রন্থ কুরআন কারীমের উপর ঈমান এনে অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবকেও তারা বিশ্বাস করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ (২ঃ ২৮৫)-এ আয়াতে বলেছেন। এরপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাদেরকে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়নের কারণে সত্বরই প্রতিদান প্রদান করবেন। তারা যদি কোন পাপকার্যও করে বসে তবুও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৫৩। আহলে কিতাব তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল কর-পরন্তু তারা মূসাকে এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর প্রশ্ন করেছিল, বরং তারা বলেছিল যে, আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর; অনন্তর তাদের অবাধ্যতার জন্যে বিদ্যুৎ তাদেরকে আক্রমণ করেছিল, তৎপর তাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসবার পর তারা গো-বৎস

١٥٣- يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاۤءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰۤى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ

فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

গ্রহণ করেছিল কিন্তু ওটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম, এবং মূসাকে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছিলাম।

١٥٤- وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

১৫৪। এবং আমি তাদের প্রতিশ্রুতির জন্যে তাদের উপর তূরপর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম যে, "সিজদা" করতে করতে ঘরে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, শনিবারের সীমা অতিক্রম করো না এবং তাদের নিকট কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম।

ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিল– হযরত মূসা (আঃ) যেমন তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এনেছিলেন, তদ্রূপ আপনিও পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ন করুন। এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল–আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ন করুন যাতে আপনাকে নবীরূপে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকে। এরূপ প্রশ্ন তারা বিদ্রূপ, অবাধ্যতা এবং কুফরীর উদ্দেশ্যেই করেছিল। যেমন মক্কাবাসীও তাঁকে অনুরূপ এক প্রশ্ন করেছিল যা সূরা-ই-সুবহানে উল্লিখিত আছে। তারা বলেছিল–'যে পর্যন্ত আরব ভূমির উপর আপনি নদী প্রবাহিত করে তাকে সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পরিণত না করবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না'।

সুতরাং আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–তাদের এ অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের কারণে আপনি মোটেই দুঃখিত হবেন না। তাদের এটা পুরাতন অভ্যাস। তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে এর চেয়েও জঘন্যতর প্রশ্ন করেছিল। তারা তাঁকে বলেছিল–আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। এ অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে

হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ তাদের উপর পতিত হয়েছিল। যেমন সূরা-ই-বাকারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তথায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "এবং যখন তোমরা বলেছিলে-হে মূসা, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবো না। তখন বিদ্যুৎ তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল ও তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। তৎপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছিলাম-যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (২ঃ ৫৫-৫৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন-'বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার পরেও তারা গো বৎসের পূজো আরম্ভ করে দেয়।' মিসরে তাদের শত্রু ফিরআউনের হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবিলায় ডুবে মরা, তার সমস্ত সৈন্যের দুর্ভাগ্যের মৃত্যুবরণ করা, তাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে যাওয়া, এ সবগুলোই তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। তথাপি সেখান হতে কিছু দূর গিয়েই তারা মূর্তি পূজকদেরকে মূর্তিপূজো করতে দেখে স্বীয় নবী (আঃ)-কে বলে-'আমাদের জন্যও এরূপ একটি মা'বূদ বানিয়ে দাও।' এর পূর্ণ বিবরণ সূরা-ই-আ'রাফ এবং সূরা-ই-ত্বাহার মধ্যেও রয়েছে।

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের তাওবা কবূল হওয়ার পন্থা এই বলে দেয়া হয় যে, যারা গো-বৎসের পূজো করেনি তারা পূজোকারীদেরকে হত্যা করবে। যখন হত্যাকার্য আরম্ভ হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক তাদের তাওবা কবূল করলেন এবং মৃতদেরকেও জীবিত করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন-ওটাকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং এ মহা পাপকেও আমি মাফ করেছি। আর হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছি।

যখন তারা তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য করতে অস্বীকার করে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর তূর পাহাড়কে সমুচ্চ করেন এবং তাদেরকে বলেন-'তোমরা এখন আমার আহকাম মানবে কি-না বল? নতুবা এ পর্বতকে আমি তোমাদের

উপর নিক্ষেপ করবো।' তখন তারা সবাই সিজদায় পড়ে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে এবং নির্দেশাবলী মেনে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের অন্তরে এত ভয় হয়েছিল যে, সিজদার মধ্যেও তারা আড় চোখে উপরের দিকে দেখে যে, না জানি পর্বত তাদের উপর পড়ে যায় এবং তারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যায়। অতঃপর পর্বত সরিয়ে দেয়া হয়।

এরপর তাদের অন্য অবাধ্যতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কথা ও কাজ দু'টোই পরিবর্তন করেছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল–'তোমরা সিজদা করতে করতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজায় প্রবেশ কর এবং حِطَّةٌ বল।' অর্থাৎ তোমরা বল হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পাপ মার্জনা করুন। আমরা আপনার পথে জিহাদ করা হতে বিরত রয়েছি, যার শাস্তি স্বরূপ আমরা 'তিহ' প্রান্তরে হতবুদ্ধি হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু এখানেও তাদের হঠকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। তারা হাঁটুর ভরে চলতে চলতে বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজায় পৌঁছে এবং حِنْطَةٌ فِىْ شَعْرَةٍ বলে। অর্থাৎ 'আমাদেরকে চুলের মধ্যে' গম দান করুন'। তাদের আরও দুষ্টামি এই যে, শনিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওর বিরুদ্ধাচরণেও তারা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কৌশল করে পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন সূরা-ই-আ'রাফের وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ (৭ঃ ১৬৩) -এ আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

একটি হাদীসেও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের নিকট বিশেষ করে শনিবারের মর্যাদা রক্ষার উপর অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এ পূর্ণ হাদীসটি সূরা-ই-সুবহানের وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ (১৭ঃ ১০১)-এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

১৫৫। কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণ হত্যা এবং তাদের উক্তির দরুন যে,

১৫৫– فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

আমাদের অন্তরসমূহ আবৃত; হ্যাঁ- তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওর উপর মোহর অঙ্কিত করেছেন, এ কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করে না।

١٥٦- وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ○

১৫৬। এবং তাদের অবিশ্বাস ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্যে।

١٥٧- وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ○

১৫৭। এবং আল্লাহ প্রেরিত মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি একথা বলার জন্যে; এবং তারা তাকে হত্যা করেনি ও তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি, এবং তাদেরকেই সংশয়াবিষ্ট করা হয়েছিল; এবং নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্য তারাই তদ্‌বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনায় অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তারা প্রকৃতপক্ষে তাকে হত্যা করেনি।

١٥٨- بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৫৮। পরন্তু আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।

১৫৯। এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিবসে সে তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে।

١٥٩- وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ

আহলে কিতাবের ঐ পাপসমূহের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার করুণা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অভিশপ্ত জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ অর্থাৎ হুজ্জত, দলীল এবং নবীদের মুজিযাকে অস্বীকার করে। তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তারা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে। আল্লাহ পাকের রাসূলগণের একটি বিরাট দল তাদের হাতে নিহত হন।.চতুর্থ এই যে, তারা বলে– আমাদের অন্তর গিলাফের অর্থাৎ পর্দার মধ্যে রয়েছে। যেমন মুশরিকরা বলেছিলঃ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ

অর্থাৎ তারা বলেছিল– "হে নবী (সঃ)! আপনি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করছেন তা হতে আমাদের অন্তর পর্দার মধ্যে রয়েছে।"(৪১ঃ ৫) আবার এও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'আমাদের অন্তর হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যার পাত্র। সেই পাত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে।'

সূরা-ই-বাকারার মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথাকে খণ্ডন করে বলেনঃ এটা নয় বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। প্রথম তাফসীরের ভিত্তিতে ভাবার্থ হবে– তারা ওযর পেশ করে বলেছিল, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা পড়ে গেছে বলে আমরা নবী (আঃ)-এর কথাগুলো মনে রাখতে পারি না। তখন আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন–'এরূপ নয়, বরং তোমাদের কুফরীর কারণে তোমাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে।' দ্বিতীয় তাফসীরের ভিত্তিতে তো ভাবার্থ সবদিক দিয়েই স্পষ্ট। সূরা-ই-বাকারার তাফসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পরিণাম হিসেবে বলা হয়েছে যে, এখন তাদের অন্তর কুফরী, অবাধ্যতা এবং ঈমানের স্বল্পতার উপরেই থাকবে।

অতঃপর তাদের পঞ্চম বড় অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সতীসাধ্বী নারী হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর উপরও ব্যভিচারের জঘন্যতম অপবাদ দেয় এবং তারা একথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি যে, এ ব্যভিচারের মাধ্যমেই হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ আবার আর এক পা অগ্রসর হয়ে বলে যে, এ ব্যভিচার ঋতু অবস্থায় হয়েছিল। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তাঁর গৃহীত বান্দাও তাদের কু-কথা হতে রক্ষা পাননি। তাদের ষষ্ঠ অপরাধ এই যে, তারা বিদ্রূপ করে এবং গৌরব বোধ করে বলেছিল, 'আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছি।' যেমন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপহাস করে বলেছিল–"হে ঐ ব্যক্তি! যার উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তো পাগল।"

পূর্ণ ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বড় বড় মুজিযা প্রদান করেন, যেমন জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরী করে তার ভিতর ফুঁক দিয়ে তাকে জীবন্ত পাখি করে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। তখন ইয়াহূদীরা অত্যন্ত কুপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায় ও সর্ব প্রকারের কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। তারা তাঁর জীবন দুর্বিসহ করে তুলে। কোন গ্রামে কদিন ধরে নিরাপদে অবস্থানও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। সারা জীবন তিনি মায়ের সঙ্গে জঙ্গলে ও প্রান্তরে ভ্রমণের অবস্থায় কাটিয়ে দেন। সে অবস্থাতেও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। সে যুগের দামেস্কের বাদশাহর নিকট তিনি গমন করেন। সে বাদশাহ ছিল তারকা পূজক। সে সময় ঐ মাযহাবের লোককে 'ইউনান' বলা হতো। ইয়াহূদীরা এখানে এসে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে। তারা বলে, 'এ লোকটি বড়ই বিবাদী। সে জনগণকে বিপথে চালিত করছে। প্রত্যহ নতুন নতুন গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে ও শান্তি ভঙ্গ করছে। সে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে।'

বাদশাহ বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত স্বীয় শাসনকর্তার নিকট নির্দেশনামা প্রেরণ করে যে, সে যেন হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতার করতঃ শূলে চড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মস্তকোপরি কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং এভাবে জনগণকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করে। বাদশাহর এ নির্দেশনামা পাঠ করে ঐ শাসনকর্তা ইয়াহূদীদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ঘরটি অবরোধ করে যেখানে হযরত

ঈসা (আঃ) অবস্থান করছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বারোজন বা তেরোজন অথবা খুব বেশী হলে সতেরোজন লোক ছিল। শুক্রবার আসরের পর তারা ঐ ঘরটি অবরোধ করে এবং শনিবারের রাত পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী থাকে। যখন ঈসা (আঃ) অনুভব করেন যে, এখন হয় তারাই জোর করে ঘরে প্রবেশ করতঃ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে, না হয় তাঁকেই বাইরে যেতে হবে। তাই তিনি স্বীয় সহচরদেরকে বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কে এটা পছন্দ করবে যে, তার উপর আমার সদৃশ আনয়ন করা হবে অর্থাৎ তার আকার আমার আকারের মত হয়ে যাবে, অতঃপর সে তাদের হাতে গ্রেফতার হবে এবং আল্লাহ পাক আমাকে মুক্তি দেবেন? আমি তার জন্যে জান্নাতের জামিন হচ্ছি।" এ কথা শুনে এক নব্য যুবক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "আমি এতে সম্মত আছি।" কিন্তু ঈসা (আঃ) তাঁকে এর যোগ্য মনে না করে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও একথাই বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনিই প্রস্তুত হয়ে যান। তখন হযরত ঈসাও (আঃ) মেনে নেন এবং দেখতে না দেখতেই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাঁর আকার পরিবর্তিত হয়, আর মনে হয় যে, তিনিই হযরত ঈসা (আঃ)। সে সময় ছাদের এক দিকে একটি ছিদ্র প্রকাশিত হয় এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা ছেয়ে যায়। ঐ অবস্থাতেই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ

অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে গ্রহণকারী এবং আমার নিকট উত্তোলনকারী।' (৩ঃ ৫৫)

হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর এ লোকগুলো ঘর হতে বেরিয়ে আসে। যে মহান সাহাবীকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকারবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তাঁকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ইয়াহূদীদের দলটি ধরে নেয় এবং রাতারাতিই তাঁকে শূলের উপর চড়িয়ে দিয়ে তাঁর মাথার উপর কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয়। তখন ইয়াহূদীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করে ফেলেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খ্রীষ্টানদের একটি নির্বোধ দলও ইয়াহূদীদের সুরে সুর মিলিয়ে দেয়। শুধুমাত্র যারা হযরত ঈসা (আ)-এর সঙ্গে ঐ ঘরে উপস্থিত ছিল এবং যারা নিশ্চিতরূপে জানতো যে, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর ইনি হচ্ছেন অমুক ব্যক্তি যিনি প্রতারণায় তাঁর স্থানে শহীদ হয়েছেন, তারা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত খ্রীষ্টানই

ইয়াহূদীদের মতই আলাপ আলোচনা করতে থাকে। এমন কি তারা একথাও বানিয়ে নেয় যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মারইয়াম (আঃ) শূলের নীচে বসে ক্রন্দন করছিলেন। তারা একথাও বলে যে, হযরত মারইয়াম (আঃ) সে সময় স্বীয় পুত্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের উপর পরীক্ষা যা তাঁর পূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ অপপ্রচারকে প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করেন এবং স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও বড় মর্যাদাসম্পন্ন নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর পবিত্র ও সত্য কালামে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে না কেউ হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে, না তাকে শূলে দিয়েছে। বরং যে ব্যক্তির আকার তাঁরই আকারের ন্যায় করে দেয়া হয়েছিল তাঁকেই তারা হযরত ঈসা (আঃ) মনে করে শূলে দিয়েছিল।"যেসব ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে তারা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট না আছে কোন দলীল, না তাদের আছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তাদের এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নেই। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এরই সাথে আবার বলে দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা রূহুল্লাহ (আঃ)-কে কেউ যে হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত স্বরূপ কথা। বরং প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নিতে ইচ্ছে করেন তখন তিনি বাড়িতে আসেন। সে সময় ঘরে বারোজন সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর চুল হতে পানির ফোঁটা ঝরে ঝরে পড়ছিলো। তিনি তাঁর সহচরদেরকে বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু বারো বার আমার সঙ্গে কুফরী করবে।' অতঃপর তিনি বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে পছন্দ করে যে, আমার মত তার আকার করে দেয়া হবে এবং আমার স্থলে তাকে হত্যা করা হবে এবং জান্নাতে সে আমার বন্ধু হবে।'

এ বর্ণনায় এও আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেউ কেউ তাঁর সাথে বারো বার কুফরী করে। অতঃপর তাদের তিনটি দল হয়ে যায়। (১) ইয়াকুবিয়্যাহ, (২) নাসতুরিয়াহ এবং (৩) মুসলমান। ইয়াকুবিয়্যাহ

তো বলতে থাকে–'স্বয়ং আল্লাহ আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। যতোদিন থাকার তাঁর ইচ্ছে ছিল ততোদিন ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠে গেছেন।' নাসতুরিয়্যাহ বলে–'আল্লাহর পুত্র আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে কিছুকাল আমাদের মধ্যে রাখার পর তিনি তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।' মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তাদের মধ্যে ছিলেন। যতোদিন রাখার ইচ্ছা ততোদিন তাদের মধ্যে রেখেছেন। অতঃপর নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

পূর্ববর্তী দু'দলের প্রভাব খুব বেশী হয় এবং তারা তৃতীয় সত্য ও ভাল দলটিকে পিষ্ট ও দলিত করতে থাকে। সুতরাং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করতঃ ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। এর ইসনাদ সম্পূর্ণ সঠিক এবং সুনান-ই-নাসাঈতে হযরত আবূ মু'আবিয়া (রঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে পূর্বযুগীয় বহু মনীষীরও এটা উক্তি রয়েছে। হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, সে সময় শাহী সৈন্য ও ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর আক্রমণ চালায় ও তাঁকে অবরোধ করে। সে সময় তাঁর সঙ্গে তাঁর সতেরোজন সহচর ছিলেন। ঐ লোকগুলো দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দেখে যে সমস্ত লোকই হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকার বিশিষ্ট। ওরা তখন তাঁদেরকে বলেঃ 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রকৃত ঈসা তাঁকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর, নতুবা তোমাদের সকলকেই হত্যা করে ফেলবো।'

তখন হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে জান্নাতে আমার বন্ধু হতে ইচ্ছে করে এবং তার বিনিময়ে আমার স্থলে শূলে চড়া স্বীকার করে নেয়।" একথা শুনে একজন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান এবং বলেনঃ "আমিই ঈসা।" সুতরাং ধর্মের শত্রুরা তাঁকে গ্রেফতার করতঃ হত্যা করে শূলে চড়িয়ে দেয় এবং প্রফুল্লচিত্তে বলে, "আমরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছি।" অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয়নি, বরং তারা প্রতারিত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা সেই সময় স্বীয় নবী (আঃ)-কে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অন্তরে এ বিশ্বাস জাগ্রত করেন যে, তাঁকে দুনিয়া হতে ফিরে আসতে হবে তখন সেটা তাঁর নিকট খুবই কঠিন ঠেকে এবং মৃত্যুর ভয়ে তিনি

অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তাই তিনি স্বীয় সহচরগণকে জিয়াফত দান করেন। খানা তৈরী করেন এবং সকলকে বলে দেন-'আজ রাতে তোমরা সবাই আমার বাড়ীতে অবশ্যই আসবে, তোমাদের সাথে আমার জরুরী কথা আছে।' তাঁর সহচরগণ উপস্থিত হলে তিনি স্বহস্তে তাদেরকে ভোজন করান। সমস্ত কাজ-কর্ম তিনি নিজেই করতে থাকেন। তাঁদের খাওয়া শেষ হলে তিনি স্বহস্তে তাঁদের হাত ধৌত করিয়ে দেন এবং নিজের কাপড় দিয়ে তাঁদের হাত মুছিয়ে দেন। এটা তাঁর সাহাবীদের নিকট ভাল মনে হয় না। তখন তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ "আজকে যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কাজে বাধা দান করে তবে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমিও তার নই এবং সেও আমার নয়।" একথা শুনে তাঁরা নীরব হয়ে যান।

অতঃপর যখন তিনি ঐ সম্মানজনক কাজ হতে অবসর গ্রহণ করেন তখন সহচরগণকে সম্বোধন করে বলেনঃ "দেখ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, তথাপি আমি স্বহস্তে তোমাদের খিদমত করেছি যেন তোমরা আমার এ সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যাও। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন নিজেকে স্বীয় মুসলমান ভাই হতে উত্তম মনে না করে। বরং বড়রা যেন ছোটদের সেবা করে যেমন স্বয়ং আমি তোমাদের খিদমত করলাম। যাক, তোমাদের সঙ্গে আমার বিশেষ এক কাজ ছিল যার জন্যে আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। তা হচ্ছে এই যে, তোমরা আজ রাতে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমার জন্যে প্রার্থনা কর যেন আমার প্রভু আমার মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দেন।"

অতএব, তাঁরা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিনয় প্রকাশের সময়ের পূর্বেই তাঁদেরকে ঘুম এমনভাবে চেপে বসে যে, তাঁদের মুখ দিয়ে একটি শব্দ বের হওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি তাদেরকে জাগ্রত করতে থাকেন ও বলেনঃ "তোমাদের হলো কি যে এক রাতও তোমরা জেগে থাকতে পারছো না?" সকলেই তখন উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (আঃ)! আমরা নিজেরাই তো হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি যে, এটা হচ্ছে কি? এক রাতই নয়, বরং ক্রমাগত ক'রাত জেগে থাকারও আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই জানেন আজ আমাদেরকে ঘুম ঘিরে নেয়ার কারণ কি? প্রার্থনা ও আমাদের মধ্যে কোন 'কুদরতী' বাধার সৃষ্টি হয়েছে।" তখন তিনি বলেনঃ "তাহলে রাখাল থাকবে না এবং ছাগলগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।"

মোটকথা, তিনি ইশারা-ইঙ্গিতে স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করতে থাকেন। তারপরে তিনি বলেনঃ "দেখ, তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি সকালে মোরগ ডাক দেয়ার পূর্বে আমার সাথে তিনবার কুফরী করবে এবং তোমাদের মধ্যে একটি লোক গুটিকয়েক রৌপ্য-মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করতঃ আমার মূল্য ভক্ষণ করবে।" তখন এ লোকগুলো এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে এদিক ওদিক চলে যান। ইয়াহূদীরা তাদের অনুসন্ধানে লেগে ছিল। তারা শামঊন নামে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একজন সহচরকে চিনে নিয়ে ধরে ফেলে এবং বলে যে, এও তার একজন সঙ্গী। কিন্তু শামঊন বলে–এটা ভুল কথা, আমি তাঁর সঙ্গী নই। তারা তার কথা বিশ্বাস করে তাকে ছেড়ে দেয়। কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে সে অন্য দলের হাতে ধরা পড়ে যায় এবং সেখানে ঐভাবেই অস্বীকার করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। এমন সময় মোরগ ডাক দেয়। তখন সে অনুতাপ করতে থাকে এবং অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে।

সকালে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একজন সহচর ইয়াহূদীদের নিকটে গিয়ে বলেঃ "আমি যদি তোমাদেরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঠিকানা বলে দেই তবে তোমরা আমাকে কি দেবে?" তারা বলেঃ "ত্রিশটি রৌপ্য-মুদ্রা দেবো।" সুতরাং সে সেই মুদ্রা গ্রহণ করে ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঠিকানা তাদেরকে বলে দেয়। তখন তারা তাঁকে গ্রেফতার করে নেয় এবং রশি দ্বারা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ও বিদ্রূপ করে বলে–"আপনিতো মৃতকে জীবিত করতেন, জ্বিনদেরকে তাড়িয়ে দিতেন, পাগলকে ভাল করতেন। কিন্তু এখন ব্যাপার কি যে, নিজেকেই বাঁচাতে পারছেন না? রজ্জুকেই ছিঁড়ে ফেলতে পারছেন না? ধিক আপনাকে।" এসব কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল এবং তাঁর দিকে কন্টক নিক্ষেপ করছিল। এরূপ নির্দয়ভাবে টেনে এনে যখন শূলের কাঠের নিকট নিয়ে আসে এবং শূলের উপর চড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে করে সে সময় আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন এবং তারা তাঁরই আকারের সাদৃশ্যযুক্ত একজন লোককে শূলের উপর উঠিয়ে দেয়।

অতঃপর সাতদিন পরে হযরত মারইয়াম (আঃ) এবং যে স্ত্রীলোকটিকে হযরত ঈসা (আঃ) জ্বিন হতে রক্ষা করেছিলেন তথায় আগমন করেন ও ক্রন্দন করতে থাকেন। তখন হযরত ঈসা (আঃ) তথায় আগমন করতঃ বলেনঃ "আপনারা কাঁদছেন কেন? আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আমার নিকট তাদের কষ্ট পৌঁছেনি। বরং তাদেরকে সংশয়াবিষ্ট

করা হয়েছে। আমার সহচরদেরকে সংবাদ দিন যে, তারা যেন অমুক স্থানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।" ঐ শুভ সংবাদ পেয়ে এ এগারজন লোক সবাই তথায় উপস্থিত হন। যে সহচর তাঁকে বিক্রি করেছিল, তাকে তথায় দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। তিনি বলেনঃ 'যদি সে তাওবা করতো তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল করতেন।'

অতঃপর তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ "যে শিশুটি তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, তার নাম ইয়াহ্ইয়া। সে এখন তোমাদের সঙ্গী। জেনে রেখো, সকালে তোমাদের ভাষা পরিবর্তন করে দেয়া হবে। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের ভাষা বলতে পারবে। সুতরাং তাদের উচিত যে তারা যেন স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে তাদের নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছে দেয় এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করে।" এ ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইবনে ইসহাক (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, বানী ইসরাঈলের যে বাদশাহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্যে স্বীয় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিল তার নাম ছিল দাউদ। সে সময় হযরত ঈসা (আঃ) অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তিই স্বীয় মৃত্যুতে এত বেশী উদ্বিগ্ন ও হা-হুতাশকারী নেই যে হা-হুতাশ তিনি সে সময় করেছিলেন। এমন কি তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! কারও মাধ্যমে যদি আপনি আমার মৃত্যুকে সরিয়ে দেন তবে খুবই ভাল হয়।" তাঁর এত ভয় হয় যে, ভয়ের কারণে তাঁর শরীর দিয়ে রক্ত ফুটে বের হয়। সে সময় সে ঘরে তাঁর সাথে তাঁর বারোজন সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলোঃ (১) ফারতুস, (২) ইয়াকুবাস, (৩) অয়লা ওয়ানাখ্স (ইয়াকূবের ভাই), (৪) আনদ্রা ইয়াস, (৫) ফাইলাসা ইবনে ইয়ালামা, (৬) মুনতা, (৭) তূমাস, (৮) ইয়াকূব ইবনে হালকা, (৯) নাদ, (১০) আসীস, (১১) কাতাবিয়া এবং (১২) লাইউদাসরাক রিয়াইউতা। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁরা ছিলেন তেরোজন। আর একজনের নাম ছিল সারজাস। তিনিই হযরত ঈসা (আঃ)-এর শুভ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্থলে শূলবিদ্ধ হতে সম্মত হয়েছিলেন।

যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অবশিষ্ট লোক ইয়াহূদীদের হাতে বন্দী হন তখন তাঁদেরকে গণনা করা হলে দেখা যায় যে, একজন কম হচ্ছেন। তখন তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ঐদলটি যখন হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সহচরদের উপর আক্রমণ চালায় ও তাঁদেরকে

গ্রেফতার করার ইচ্ছে করে তখন তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে চিনতে পারেনি। সে সময় লাইউদাসরাকরিয়াইউতা ইয়াহূদীদের নিকট হতে ত্রিশটি রৌপ্য-মুদ্রা গ্রহণ করতঃ তাদেরকে বলেছিল, আমি সর্বপ্রথমে যাচ্ছি। গিয়ে যে লোকটিকে আমি চুম্বন দান করবো, তোমরা বুঝে নেবে, উনিই হযরত ঈসা (আঃ)।

অতঃপর যখন এ লোকটি ভেতরে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নিয়ে ছিলেন এবং হযরত সারজাসকে তাঁর আকার বিশিষ্ট করে দেয়া হয়। ঐ লোকটি গিয়ে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকেই চুম্বন দেয়। সুতরাং হযরত সারজাসকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পাপকার্য সাধনের পর সে বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং স্বীয় গলদেশে রশি লাগিয়ে ফাঁসির উপর ঝুলে যায়। এভাবে সে খ্রীষ্টানদের মধ্যে অভিশপ্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। কেউ কেউ বলেন যে, তার নাম লাইউদাসরাকরিয়াইউতা। যখনই সে হযরত ঈসা (আঃ)-কে চিনিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ঐ ঘরে প্রবেশ করে তখনই হযরত ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং স্বয়ং তারই আকার হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হয়ে যায়। কাজেই লোকেরা তাকেই ধরে নেয়। সে বহুবার চীৎকার করে বলে– আমি হযরত ঈসা (আঃ) নই। আমি তো তোমাদের সঙ্গী। আমিইতো হযরত ঈসা (আঃ)-কে চিনিয়েছিলাম। কিন্তু তা শুনবে কে? শেষে তাকেই শূলে বিদ্ধ করা হয়। এখন আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকারের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত শূলবিদ্ধ ব্যক্তি মুমিন সারজাস ছিলেন, না মুনাফিক সহচর লাইউদাসরাকরিয়াইউতা ছিল। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাদৃশ্য যার উপর আনয়ন করা হয়েছিল তাকেই ইয়াহূদীরা শূলবিদ্ধ করেছিল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হযরত ঈসার আকারের সাদৃশ্য তাঁর সমস্ত সঙ্গীর উপরই আনয়ন করা হয়েছিল।

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী হবেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে,'এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি আছে। প্রথমতঃ এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ যখন তিনি দাজ্জালকে হত্যা করার জন্যে দ্বিতীয়বার ভূপৃষ্ঠে

আগমন করবেন তখন সমস্ত মাযহাব উঠে যাবে। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সুদৃঢ় ধর্ম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে مَوْتِهٖ -এর ভাবার্থ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু। হযরত আবূ মালিক (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন তখন সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, বিশেষ করে ইয়াহূদী একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে নাজাসী এবং তাঁর সঙ্গী। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর শপথ! হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত বিদ্যমান রয়েছেন। যখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করবেন তখন একজনও এমন আহলে কিতাব অবশিষ্ট থাকেব না যে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তাঁকে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাঁকে পুনরায় পৃথিবীতে এ হিসেবে প্রেরণ করবেন যে, ভালমন্দ সবাই তাঁর উপরে ঈমান আনয়ন করবে। হযরত কাতাদাহ (রঃ), হযরত আবদুর রহমান (রঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরগণের সিদ্ধান্ত এটা এবং এটাই সঠিক উক্তি। এ তাফসীর হচ্ছে সম্পূর্ণ সঠিক তাফসীর।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। কেননা, মৃত্যুর সময় সত্য ও মিথ্যা প্রত্যেকের উপর প্রকাশিত হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক আহলে কিতাব এ নশ্বর জগত হতে বিদায় গ্রহণের সময় হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন কিতাবী মারা যায় না যে পর্যন্ত না সে হযরত ঈসা (আঃ) -এর উপর ঈমান আনয়ন করে। হযরত মুজাহিদেরও (রাঃ) এটাই উক্তি। এমন কি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তা এতদূর পর্যন্ত বর্ণিত আছে যে, যদি কোন আহলে কিতাবের গর্দান তরবারী দ্বারা উড়িয়ে দেয়া হয় তথাপি তার আত্মা বের হয় না যে পর্যন্ত না সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনে এবং এটা বলে দেয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল। হযরত উবাই (রাঃ)–এর পঠনে قَبْلَ مَوْتِهِمْ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'মনে করুন কেউ হয়তো দেয়াল হতে পড়ে মারা গেল। তখন সে কি করে ঈমান আনতে পারে?'

তিনি উত্তরে বলেনঃ "সে ঐ মধ্যবর্তী দূরত্বের মধ্যেই ঈমান আনতে পারে।" ইকরামা (রঃ), মুহম্মদ ইব্নে সীরিন (রঃ), যহ্হাক (রঃ), জুয়াইবির (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

তৃতীয় উক্তি এই যে, আহলে কিতাবের মধ্যে কেউ এমন নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে হযরত মুহম্মাদ (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ইকরামা (রঃ) একথাই বলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ এসব উক্তির মধ্যে অধিকতর সঠিক উক্তি হচ্ছে প্রথম উক্তিটিই। তা এই যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) যখন আকাশ হতে অবতরণ করবেন, কোন আহলে কিতাবই ঐ সময় তাঁর উপর ঈমান আনা ছাড়া থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর এই উক্তিটিই সঠিকতম উক্তি। কেননা, এখানকার আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহূদীদের "আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছি ও শূলে দিয়েছি" এ দাবীর অসারতা প্রমাণিত করা।

সহীহ মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে দেবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং তিনি জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন না। তিনি ঘোষণা করবেন– 'হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় তরবারীর সম্মুখীন হও।' সুতরাং এ আয়াতে সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবেন। একজনও এমন থাকবে না যে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকবে বা কাউকে বিরত রাখবে। অতএব, যাঁকে এ পথভ্রষ্ট ইয়াহূদ ও নির্বোধ খ্রীষ্টানেরা মৃত মনে করে থাকে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তাঁকে শূলবিদ্ধ করা হয়েছিল, তারা তাঁর প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং যে কাজ তারা তাঁর সামনে করেছে বা করবে, তিনি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে তার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। অর্থাৎ তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পূর্বের জীবনে তাদেরকে তিনি যেসব কাজ করতে দেখেছেন এবং দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে অবতরণের পর সেই শেষ জীবনে তারা তাঁর সামনে যা কিছু করবে, কিয়ামতের দিন ঐ সমস্তই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠবে এবং তিনি আল্লাহ পাকের সামনে ওগুলো পেশ করবেন। হ্যাঁ, তবে এ আয়াতের তাফসীরে অন্য যে দু'টি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, ঘটনা হিসেবে সে দু'টোও সম্পূর্ণ সত্য। মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যাওয়ার পর আখেরাতের অবস্থা তার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি

সত্যকে সত্যরূপেই অনুধাবন করে থাকে। কিন্তু সে সময়ের ঈমান তার কোন উপকারে আসে না। এ সূরারই প্রথমদিকে রয়েছে–

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ

অর্থাৎ "যারা অসৎ কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে–আমি এখন তাওবা করলাম, তার তাওবা গৃহীত হবে না।" (৪ঃ ১৮) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْاۤ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

অর্থাৎ "যখন তারা আমার শাস্তি অবলোকন করে তখন বলে–আমি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।" (৪০ঃ ৮৪) তাদেরও সেই ঈমানে কোন উপকার হবে না।

অতএব এ দু'টি আয়াতকে সামনে রেখে আমরা বলি যে, ইমাম ইবনে জারীর শেষের উক্তি দু'টিকে যে খণ্ডন করেছেন, এটা তিনি ঠিক করেননি। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, এ আয়াতের তাফসীরে যদি এ উক্তিদ্বয়কে সঠিক মেনে নেয়া হয় তবে সেই ইয়াহূদী বা খ্রীষ্টানদের আত্মীয়-স্বজন তার উত্তরাধিকারী না হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা, সে তো তখন হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ঈমান এনে মারা গেল, অথচ তার উত্তরাধিকারীগণ হচ্ছে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান। আর মুসলমানের উত্তরাধিকারী কাফিরগণ হতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি যে, এটা ঐ সময় প্রযোজ্য যখন সে এমন সময়ে ঈমান আনবে যে সময়ের ঈমান আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হয়। কিন্তু সে সময়ের ঈমান আনয়ন নয় যা একেবারে বৃথা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, দেয়াল হতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী, হিংস্র জন্তুর মুখে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি এবং তরবারির আঘাতে নিহত ব্যক্তিও বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে।

আর এটা স্পষ্টকথা যে, এরূপ অবস্থায় ঈমান আনয়ন মোটেই কোন উপকারে আসতে পারে না, যেমন কুরআন কারীমে উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আমার ধারণায় তো এ কথা খুব পরিষ্কার যে, এ আয়াতের তাফসীরের পরবর্তী উক্তিদ্বয়কেও

বিশ্বাসযোগ্যরূপে মেনে নিতে কোনই অসুবিধে নেই। ও দু'টোও স্ব-স্ব স্থানে ঠিকই আছে। কিন্তু হ্যাঁ, আয়াতের প্রকাশ্য ভাবার্থতো সেটাই যা প্রথম উক্তি। তাহলে ভাবার্থ এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পৃথবীতে অবতরণ করবেন এবং ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান উভয় জাতিকেই মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করবেন। আর যে 'ইফরাত' ও 'তাফরীত' [১] তারা করেছিল তাকেও তিনি বাতিল বলবেন। একদিকে রয়েছে অভিশপ্ত ইয়াহূদী দল যারা তাঁকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা হতে বহু নীচে নামিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর সম্পর্কে এমন জঘন্য উক্তি করেছিল যে, যা শুনতে ভাল মানুষ ঘৃণাবোধ করেন। অপরদিকে ছিল খ্রীষ্টান জাতি, যারা তাঁর মর্যাদা এত বেশী বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, যা তাঁর মধ্যে ছিল না তাই তারা তাঁর মধ্যে আনয়ন করেছিল এবং তাঁকে নবুওয়াতের পর্যায় হতে প্রভুত্বের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। যা হতে মহান আল্লাহর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

এখন ঐ সব হাদীসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) শেষ যুগে কিয়ামতের পূর্বে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং অংশীবিহীন এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান করবেন। ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ 'সহীহের' كِتَابُ ذِكْرِ الْاَنْبِيَاءِ -এর মধ্যে এ হাদীসটি এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ! অতিসত্বরই তোমাদের মধ্যে ইবনে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে দেবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করতে কেউ সম্মত হবে না। একটি সিজদা করে নেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হতে প্রিয়তর হবে।' অতঃপর হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'তোমরা ইচ্ছে করলে وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -এ আয়াতটি পাঠ কর।

অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর (ঈসা আঃ -এর উপর) অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে কিয়ামতের দিন তাদের উপর সাক্ষী হবে। সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। অন্য সনদে এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, তাতে এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সে সময় সিজদাহ শুধু বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যেই

১. খুবই বাড়িয়ে দেয়াকে 'ইফরাত' এবং খুবই নীচে নামিয়ে দেয়াকে 'তাফরীত' বলে।

হবে।' তারপর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ 'তোমরা ইচ্ছে করলে পাঠ কর–

وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ 'হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে।' অতঃপর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদের হাদীসে রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) 'ফাজ্জেরাওহা' প্রান্তরে হজ্বের উপর বা উমরার উপর অথবা হজ্ব ও উমরা দু'টোর উপরই লাব্বায়েক বলবেন। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমাদের অন্য হাদীসে রয়েছে যে, হযরত ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে নিশ্চিহ্ন করবেন, নামায জামাআতের সঙ্গে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার পথে সম্পদ এত বেশী প্রদান করা হবে যে, কোন গ্রহণকারী পাওয়া যাবে না। তিনি খাজনা ছেড়ে দেবেন, রওহায় গমন করবেন এবং তথা হতে হজ্ব বা উমরা পালন করবেন অথবা একই সাথে দু'টোই করবেন।

অতঃপর হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাট করেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র হযরত হানযালা (রঃ)-এর ধারণা এই যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইন্তিকালের পূর্বে আহলে কিতাব তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।" হযরত হানযালা (রঃ) বলেনঃ "আমার জানা নেই যে, এগুলো হাদীসেরই শব্দ, না হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর নিজের কথা।" সহীহ বুখারীর মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতেই হবে?"

সুনান-ই-আবি দাঊদ, মুসনাদ-ই-আহমাদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ নবীগণ (আঃ) সবাই বৈমাত্রেয় ভাই, তাঁদের মা বিভিন্ন বটে, কিন্তু ধর্ম একই। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বেশী নিকটবর্তী আমিই। কেননা, তাঁর ও আমার মধ্যে কোন নবী নেই। তিনি অবতীর্ণ হবেন, তোমরা তাঁকে চিনে নাও। তিনি হবেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট ও শ্বেত রক্তিম বর্ণের। তিনি দু'টি

মিসরীয় কাপড় পরিহিত থাকবেন। তাঁর মস্তক হতে পানির ফোঁটা ঝরে ঝরে পড়বে যদিও পানিতে সিক্ত হবেন না। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন না এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তাঁর যুগে সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু ইসলাম ধর্মই থাকবে। তাঁর যুগে আল্লাহ আ'আলা মাসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর সারা জগতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। এমনকি কৃষ্ণ সর্প উটের সঙ্গে, চিতা ব্যাঘ্র গাভীর সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ছাগলের সঙ্গে চরে বেড়াবে। শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে। তারা তাদের কোন ক্ষতি করবে না। তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং মুসলমানেরা তার জানাযার নামায পড়াবে।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরের এ বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইসলামের জন্যে লোকের সঙ্গে জিহাদ করবেন। এ হাদীসের একটি অংশ সহীহ বুখারীর মধ্যেও রয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়া ও আখিরাতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বেশী নিকটবর্তী আমিই।" সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত রোমকগণ 'আ'মাক' বা 'দাবিকে' অবতরণ না করবে এবং তাদের মোকাবিলায় মদীনা হতে মুসলিম সেনাবাহিনী গমন না করবে। সে সময় ঐ মুসলমানেরা সারা দুনিয়ার লোকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র হবে।

যখন তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে তখন রোমকগণ তাদেরকে বলবে- 'আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইনে। আমাদের মধ্য হতে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে তোমাদের নিকট চলে এসেছে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। তোমরা তাদের মধ্য হতে সরে যাও।' তখন মুসলমানেরা বলবে- আল্লাহর শপথ! এটা কখনও হতে পারে না যে, আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করে দেবো। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। ঐ মুসলিম সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। তাদের তাওবা আল্লাহ তা'আলা কখনও গ্রহণ করবেন না। এক তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে উত্তম শহীদ। কিন্তু শেষ তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর জয়লাভ করবে। এরপর তারা আর কোন হাঙ্গামায় পতিত হবে না।

তারা (মুসলমানেরা) কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। তারা যায়তুন বৃক্ষের উপর নিজেদের তরবারী ঝুলিয়ে রেখে যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করতে থাকবে। এমন সময় শয়তান চীৎকার করে বলবেঃ "তোমাদের সন্তানদের মধ্য দাজ্জাল এসে গেছে।" তারা এ মিথ্যা কথাকে সত্য মনে করে এখান হতে বেরিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যূহ ঠিক করতে থাকবে? এমন সময় অন্যদিকে নামাযের ইকামত হবে এবং হযরত ঈসা ইব্নে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইমামতি করবেন। শত্রু বাহিনী যখন মুসলমানদেরকে দেখবে তখন তারা গলে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে ছেড়েও দেন তবুও তারা গলে গলেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় বর্শার রক্ত তাদেরকে দেখাবেন।

মুসনাদ-ই-আহমাদ,ও সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মিরাজের রাত্রে আমি হররত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তারা পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ 'এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।' হযরত মূসা (আঃ)-ও এরূপই বলেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ "এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও নেই। হ্যাঁ, তবে আমার প্রভু আমার নিকট যে অঙ্গীকার করেছেন তা এই যে, দাজ্জাল বের হবে। দু'টি দল তার সঙ্গী হবে। সে আমাকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমনভাবে সীসা গলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দেবেন। এমন কি পাথর ও গাছ বলবে–হে মুসলমান! এখানে আমার পিছনে একটি কাফির আছে, তাকে হত্যা কর। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করবেন এবং মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজ নিজ গ্রাম ও শহরে ফিরে যাবে। তারপরে ইয়াজুয ও মাজুয বের হবে এবং চতুর্দিক হতে তারা আক্রমণ চালাবে। সমস্ত শহরকে তারা ধ্বংস করবে। যেসব স্থান তারা অতিক্রম করবে ঐ সবই ধ্বংস করে দেবে। যে পানির পার্শ্ব দিয়ে তারা গমন করবে তার সবই পান করে নেবে। লোকেরা পুনরায় আমার নিকট ফিরে আসবে। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবো। তিনি তখন তাদের সকলকেই একই সাথে ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু তাদের মৃত দেহের দুর্গন্ধে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। অতঃপর

এত বেশী বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, ঐ সমস্ত মৃতদেহকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। সে সময় কিয়ামতের সংঘটন এত নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর অবস্থা হয়ে থাকে যে, সকালে হবে কি সন্ধ্যায় হবে বা দিনে হবে কি রাত্রে হবে তা তার বাড়ীর লোকেরা জানতে পারে না।"

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে, হযরত আবূ নাযরা (রাঃ) বলেনঃ "আমরা জুমআর দিন হযরত উসমান ইব্‌নে আবূল আস (রাঃ)-এর নিকট আগমন করি, আমার লিখিত কুরআন কারীমকে তাঁর পঠনের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়াই আমার তাঁর নিকট আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। জুমআর নামাযের সময় হলে তিনি আমাদেরকে বলেনঃ "গোলস করুন।" তারপর তিনি সুগন্ধি নিয়ে আসেন। আমরা সুগন্ধি মেখে মসজিদে হাযির হই এবং একটি লোকের পার্শ্বে বসে পড়ি। এ লোকটি দাজ্জালের হাদীস বর্ণনা করছিলেন। অতঃপর হযরত উসমান ইব্‌নে আবূল আস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের তিনটি শহর হবে, একটি হবে দু'টি সমুদ্রের মিলিত হওয়ার জায়গায়, দ্বিতীয়টি হবে হীরায় এবং তৃতীয়টি হবে সিরিয়ায়।

তারপর মানুষ তিনটি সন্ত্রাসের সম্মুখীন হবে। অতঃপর দাজ্জাল বহির্গত হবে। তারা প্রথম শহরটিতে যাবে। তথাকার লোক তিন অংশে বিভক্ত হবে। এক অংশ বলবে– আমরা তাদের মোকাবিলা করবো এবং কি সংঘটিত হয় তা দেখবো। দ্বিতীয় দলটি গ্রামের লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে এবং তৃতীয় দল তাদের নিকটবর্তী শহরে চলে যাবে। দাজ্জালের সঙ্গে সত্তর হাজার লোক থাকবে। তাদের মাথায় মুকুট থাকবে। তাদের অধিকাংশই হবে ইয়াহূদী ও স্ত্রীলোক। এখানকার মুসলমানগণ একটি ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হবে।

তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মাঠে চরতে গিয়েছিল ঐগুলোও ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের বিপদ খুব বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটময় হয়ে পড়বে। এমনকি তারা তাদের কামানের তারগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেতে থাকবে। এরূপ সংকটময় অবস্থায় সমুদ্রের মধ্য হতে তাদের কানে শব্দ আসবে– হে লোক সকল! তোমাদের জন্যে সাহায্য এসে গেছে। এ শব্দ শুনে লোকগুলো খুব খুশী হবে। কেননা, তারা বুঝতে পারবে যে, এটা কোন পরিতৃপ্ত ব্যক্তির কথা।

ঠিক ফজরের নামাযের সময় ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। মুসলমাদের আমীর তাঁকে বলবেন– 'হে রূহুল্লাহ (আঃ)! আগে বাড়ুন এবং

নামায পড়িয়ে দিন।' কিন্তু তিনি বলবেনঃ 'এ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক কিছু সংখ্যক লোকের আমীর রয়েছে। সুতরাং এ দলের আমীরই তাদের নামাযের ইমাম হবে।' অতএব, তাদের আমীরই ইমাম হয়ে নামায পড়াবেন। নামায শেষ করেই হযরত ঈসা (আঃ) বর্শা হাতে নিয়ে মাসীহ দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। দাজ্জাল তাঁকে দেখামাত্রই সীসার মত গলতে থাকবে। তিনি তার বক্ষে আঘাত করবেন। ঐ আঘাতেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গীরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। কিন্তু কোন স্থানেই তারা নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না। এমনকি তারা যদি কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তবে সেই গাছও বলবে-'হে মুমিন! একটি কাফির আমার নিকট লুকিয়ে রয়েছে।' এ কথা পাথরও বলবে।

সুনান-ই-ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এক ভাষণের কম বেশী অংশ দাজ্জালের ঘটনা বর্ণনায় এবং সে দাজ্জাল হতে ভয় প্রদর্শনেই কাটিয়ে দেন। সে ভাষণে তিনি একথাও বলেনঃ দুনিয়ার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এর অপেক্ষা বড় হাঙ্গামা আর নেই। সমস্ত নবী (আঃ) নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত। সে নিশ্চিতরূপে তোমাদের মধ্যেই আসবে। যদি আমার জীবদ্দশায় সে এসে পড়ে তবে তো আমি তাকে বাধা দান করবো। আর যদি আমার পরে আসে তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আক্রমণ হতে নিজেকে বাঁচাতে হবে। আমি আল্লাহ তা'আলাকেই প্রত্যেক মুসলমানের অভিভাবক করে যাচ্ছি। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে বের হবে। সে ডান ও বামে খুব ঘুরা-ফেরা করবে। হে জনমণ্ডলী ও হে আল্লাহর বান্দাগণ! দেখ, তোমরা অটল থাকবে। জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে তার এমন পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছি যা অন্য কোন নবী স্বীয় উম্মতকে জানিয়ে যাননি। সে প্রথমতঃ দাবী করবে-'আমি নবী।' সুতরাং তোমরা স্মরণ রেখো যে, আমার পরে কোন নবী নেই। অতঃপর এর চেয়েও বেড়ে গিয়ে বলবে-'আমি আল্লাহ'। অতএব তথায় তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহকে এই চোখে কেউ দেখতে পারে না। মৃত্যুর পর তথায় তাঁর দর্শন লাভ ঘটতে পারে। আরও স্মরণ রেখো যে, সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে এবং তোমাদের প্রভু এক চক্ষু বিশিষ্ট নন। তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফির' লিখিত থাকবে যা প্রত্যেক শিক্ষিত অশিক্ষিত মোটকথা প্রত্যেক ঈমানদারই পড়তে পারবে।

তার সাথে আগুন থাকবে ও বাগান থাকবে। তার আগুন হবে আসলে জান্নাত এবং বাগানটি হবে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম। তোমাদের মধ্যে যাকে সে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সূরা-ই-কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। ঐ আগুন তার জন্যে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর নমরূদের আগুন শান্তিদায়ক হয়েছিল। তার এক হাঙ্গামা এও হবে যে, সে এক বেদুঈনকে বলবে–'আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করতে পারি তবে কি তুমি আমাকে প্রভু বলে স্বীকার করবে?' এমন সময়ে দু'জন শয়তান তার পিতা-মাতার আকারে প্রকাশিত হবে এবং তাকে বলবে–'বৎস! এটাই তোমার প্রভু। সুতরাং তাকে মেনে নাও।'

তার আর একটা ফিৎনা এও হবে যে, তাকে একটি লোকের উপর জয়যুক্ত করা হবে। সে তাকে করাত দ্বারা ফেড়ে দু'টুকরো করে দেবে। তারপর সে জনগণকে বলবেঃ আমার এ বান্দাকে তোমরা দেখ, এখন আমি তাকে জীবিত করবো। কিন্তু সে পুনরায় এ কথাই বলবে যে, তার প্রভু আমি ছাড়া অন্য কেউ। অতঃপর এ দু' দুর্বৃত্ত তাকে উঠা-বসা করাবে এবং বলবেঃ 'তোমার প্রভু কে?' সে উত্তরে বলবেঃ 'আমার প্রভু আল্লাহ্ এবং তুমি তার শত্রু দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! এখন তো আমার পূর্বাপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস হয়েছে।' অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ 'এ মুমিন ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর জান্নাতের অধিকারী হবে।' হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এ হাদীসটি শুনে আমাদের ধারণা হয় যে, এ লোকটি হযরত উমার ইব্নে খাত্তাবই (রাঃ) হবেন, তাঁর শাহাদাত লাভ পর্যন্ত আমাদের ধারণা এটাই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ তার একটি হাঙ্গামা এও হবে যে, সে আকাশকে পানি বর্ষণ করার নির্দেশ দেবে এবং আকাশ হতে পানি বর্ষিত হবে। সে যমীনকে ফসল উৎপাদন করার নির্দেশ দেবে এবং যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হবে।

তার আর একটি ফিৎনা এও হবে যে, সে একটি গোত্রের নিকট যাবে এবং তারা তাকে বিশ্বাস করবে না। সে সময়ই তাদের সমস্ত জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর সে অন্য গোত্রের নিকট যাবে। তৎক্ষণাৎ তার হুকুমে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং যমীনে ফলস উৎপাদিত হবে। তাদের গৃহপালিত পশু পূর্বাপেক্ষা বেশী মোটা-তাজা ও দুগ্ধবতী হয়ে যাবে। তারা মক্কা ও মদীনা

ছাড়া যমীনের সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। যে যখন মদীনামুখী হবে তখন সারা পথে সে তরবারীধারী ফেরেশতাগণকে দেখতে পাবে। সে তখন 'সানতার' শেষ প্রান্তে 'যারীবে আহমারের' নিকট থেমে যাবে। অতঃপর মদীনায় তিনটি ভূমিকম্প হবে। ফলে মদীনায় যত মুনাফিক নর ও নারী থাকবে সবাই মদীনা হতে বেরিয়ে গিয়ে দাজ্জালের সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে যাবে। এভাবে মদীনা নিজের মধ্য হতে অপবিত্র লোকদেরকে দূর করে দেবে যেমন লোহার ভাটা লোহার মরিচা দূর করে থাকে। সেদিনের নাম হবে 'ইয়াওমুল খালাস' (মুক্তির দিন)।

হযরত উম্মে শুরায়েক (রাঃ) রাসূলুরলাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেদিন আরববাসী কোথায় থাকবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'প্রথমতঃ তারা থাকবেই খুব কম এবং তাদের অধিকাংশই থাকবে বাইতুল মুকাদ্দাসে। তাদের ইমাম হবে একজন সৎ ব্যক্তি। সে ফজরের নামায পড়াতে থাকবে এমন সময় হযরত ঈসা ইব্নে মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। ঐ ইমাম তখন পিছনে সরতে থাকবে যেন ঈসা (আঃ) ইমামতি করেন। কিন্তু তিনি তার স্কন্ধে হাত রেখে বলবেনঃ "তুমি সামনে এগিয়ে নামায পড়িয়ে দাও, ইকামত তোমার জন্যেই দেয়া হয়েছে।" সুতরাং তাদের ইমামই নামায পড়িয়ে দেবে। নামায শেষে তিনি বলবেনঃ 'দরজা খুলে দাও।' দরজা খুলে দেয়া হবে। এদিকে দাজ্জাল সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে হাযির হবে। তাদের মস্তকে মুকুট থাকবে এবং তাদের তরবারীর উপর সোনা থাকবে। দাজ্জাল তাঁকে দেখে এমনভাবে গলতে থাকবে যেমনভাবে পানিতে লবণ গলে থাকে। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালাতে শুরু করবে। কিন্তু তিনি বলবেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তুমি আমার হাতেই একটা মার খাবে, সুতরাং ওটা হতে রক্ষা পেতে পার না।' অতএব, তিনি তাকে পূর্ব দরজা লুদ-এর নিকট ধরে নেবেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করে ফেলবেন। তখন ইয়াহূদীরা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করবে। কিন্তু তারা কোথাও মাথা লুকানোর জায়গা পাবে না। প্রত্যেক পাথর, বৃক্ষ, দেয়াল ও জীবজন্তু বলতে থাকবেঃ "হে মুসলমান! এখানে ইয়াহূদী রয়েছে। এসে তাকে হত্যা কর।" তবে বাবলা গাছ হচ্ছে ইয়াহূদীদের গাছ। সে কিন্তু বলবে না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। বছর হবে অর্ধ বছরের মত, বছর হবে মাসের মত, মাস হবে জুম'আর মত এবং শেষ দিনগুলো হবে 'শারারার' মত। তোমাদের কোন লোক সকালে শহরের একটি দরজা হতে চলতে আরম্ভ করে দ্বিতীয় দরজায় পৌঁছতে পারবে না। এমন সময়েই সন্ধ্যা হবে যাবে।" জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ ছোট দিনগুলোতে আমরা কিভাবে নামায আদায় করবো?" তিনি বলেনঃ "তোমরা এ দীর্ঘ দিনগুলোতে যেমনভাবে অনুমান করে নামায পড়ছো, তখনও সেভাবেই অনুমান করে নামায পড়বে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তারপর হযরত ঈসা (আঃ) আমার উম্মতের মধ্যে শাসনকর্তা হবেন, ন্যায়পরায়ণ হবেন, ইমাম হবেন এবং ন্যায় বিচারক হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে দেবেন। তিনি সাদকা গ্রহণ করবেন না। সুতরাং ছাগল ও উটের উপর কোন চেষ্টা করা হবে না। হিংসা বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয়া হবে। শিশু স্বীয় অঙ্গুলি সাপের মুখে প্রবেশ করাবে। কিন্তু ওটা তার কোন ক্ষতি করবে না। ছেলেরা সিংহের সাথে খেলা করবে, অথচ তাদের কোন বিপদ ঘটবে না। নেকড়ে বাঘ ছাগলের সঙ্গে এমন গলায় গলায় মিলে থাকবে যে, যেন সে পাহারাদার কুকুর। সমগ্র জগৎ ইসলাম ও ন্যায়নীতিতে এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যেমনভাবে বর্তন পানিতে পরিপূর্ণ হয়। সকলের একই 'কালেমা' হয়ে যাবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। কুরাইশ স্বীয় রাজ্য ছিনিয়ে নেবে। পৃথিবী সাদা চাঁদির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হযরত আদম (আঃ)-এর বরকতময় যুগের ন্যায় ফসল উৎপাদিত হবে। একটা দলের পরিতৃপ্তির জন্যে এক গুচ্ছ আঙ্গুরই যথেষ্ট হবে। এক একটি ডালিম ফল এত বড় হবে যে, একটি দল একটি ডালিম খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। বলদ এরূপ মূল্যে পাওয়া যাবে' (অর্থাৎ বলদের মূল্য খুব বেশী হবে) এবং ঘোড়া কতগুলো দিরহামের বিনিময়েই পাওয়া যাবে।"

জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঘোড়ার মূল্য হ্রাস পাওয়ার কারণ কি?" তিনি বলেনঃ "কেননা, যুদ্ধে ওর সোয়ারী মোটেই নেয়া হবে না।" তাঁরা প্রশ্ন করেনঃ "বলদের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি?" তিনি বলেনঃ "কেননা, সমগ্র পৃথিবীতে কৃষিকার্য শুরু হয়ে যাবে।" দাজ্জাল প্রকাশিত

হওয়ার তিন বছর পূর্বেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। প্রথম বছরে বৃষ্টির এক তৃতীয়াংশ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপরে ভূমির উৎপাদনেরও এক তৃতীয়াংশ কমে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় বছরে আকাশকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, সে যেন বৃষ্টি দুই তৃতীয়াংশ বন্ধ রাখে এবং এ নির্দেশ ভূমিকেও দেয়া হবে যে, সে যেন উৎপাদনের দুই তৃতীয়াংশ কম করে। তৃতীয় বছর আকাশ হতে বৃষ্টির এক ফোঁটাও বর্ষিত হবে না। অনুরূপভাবে ভূমিতে একটি চারাগাছও জন্ম নেবে না। সমস্ত জীবজন্তু এ দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে রক্ষা করবেন সেই রক্ষা পাবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'তাহলে সে সময় মানুষ কিরূপে জীবিত থাকবে?' তিনি বলেনঃ "সে সময় তাদের খাদ্যের স্থলবর্তী হবে তাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করা, সুবহানাল্লাহ পাঠ করা এবং আলহামদুল্লিাহ বলা।" ইমাম ইবনে মাজা (রঃ) বলেন, আমার উস্তাদ তাঁর উস্তাদ হতে শুনেছেন, তিনি বলতেনঃ "এ হাদীসটি এ যোগ্যতা রাখে যে, শিশুদের শিক্ষক শিশুদেরকেও এটা শিক্ষা দেবেন, এমনকি লিখিয়ে দেবেন, যেন তাদেরও এটা স্মরণ থাকে।" এ হাদীসটি এ সম্বন্ধে গারীব বটে, কিন্তু এর কোন কোন অংশের প্রমাণ স্বরূপ অন্য হাদীসও রয়েছে। এ হাদীসের মতই একটি হাদীস হযরত নাওয়াস ইব্‌নে সামআন (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা ওটাও এখানে বর্ণনা করছি।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত নাওয়াস ইবনে শামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সকালে দাজ্জালের বর্ণনা দেন এবং এমনভাবে তাকে উঁচু ও নীচু করেন যে, আমাদের মনে হয় না জানি সে মদীনার খেজুরের বাগানেই বিদ্যমান রয়েছে। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট ফিরে আসলে আমাদের চেহারা দেখে আমাদের মনের অবস্থা বুঝে নেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ "ব্যাপার কি?" তখন আমরা তা বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ "তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও আর একটা বেশী ভয় রয়েছে। আমার বিদ্যমানতায় যদি সে বের হয় তবে আমি তাকে বুঝে নেবো। কিন্তু যদি আমার পরে সে বের হয় তবে প্রত্যেক মুসলমানকেই তাকে বাধা দিতে হবে। আমি মহান আল্লাহকেই প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়েছি। জেনে রেখো, সে যুবক হবে, টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এটুকু বুঝে নাও যে, সে দেখতে অনেকটা আবদুল উয্যা ইব্‌নে কাতনের মত হবে। তোমাদের যে তাকে দেখবে সে যেন সূরা-ই-কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে সিরিয়া ও

ইরাকের মধ্যবর্তী প্রান্ত হতে বের হবে এবং ডানে-বামে ঘুরে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা (ঈমানের উপরে) খুব অটল থাকবে।" আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কতদিন অবস্থান করবে। তিনি বললেনঃ "চল্লিশ দিন। এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক দিন হবে এক মাসের সমান, একদিন হবে এক জুমআর সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর মত হবে।"

অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করি, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিনে কি একদিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? তিনি বলেনঃ 'না, বরং তোমরা অনুমান করে নেবে।' আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের চলন গতি কিরূপ দ্রুত হবে? তিনি বলেনঃ মেঘ যেমন বাতাসে তাড়িত হয়ে চলতে থাকে। সে একটি গোত্রকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তাকে মেনে নেবে। তখন তাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যমীন হতে ফলস উৎপাদিত হবে এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মোটা তাজা হয়ে যাবে ও খুব বেশী দুধ দেবে। সে আর এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে। তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও অস্বীকার করবে। সে সেখান হতে ফিরে আসবে। তখন তাদের হাতে মাল-ধন কিছুই থাকবে না। সে অনুর্বর ভূমির উপর দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেবে, "হে যমীন! তোমার ধনাগারকে বের করে দাও।" তখন যমীনের মধ্য হতে ধন-ভাণ্ডার বেরিয়ে আসবে।

সে তখন মৌমাছির মত ঐ ধনের পিছনে পিছনে ফিরতে থাকবে। সে একজন নব্য যুবককে আহ্বান করবে এবং তাকে হত্যা করতঃ দু'টুকরো করে এতদূরে নিক্ষেপ করবে যতো দূরে একটি তীর চলে থাকে। তারপরে তাকে ডাক দেবে এবং সে তখন জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে তার নিকট চলে আসবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি দু'টি চাদর পরিহিত হয়ে দু'জন ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে দামেস্কের পূর্বদিকের সাদা স্তম্ভের নিকট অবতরণ করবেন। যখন তিনি মস্তক ঝুঁকাবেন তখন তাঁর মস্তক হতে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পানি ঝরে পড়বে এবং যখন তিনি মস্তক উত্তোলন করবেন তখন ঐ ফোঁটাগুলো মুক্তার মত গড়িয়ে পড়বে। যে কাফির পর্যন্ত তাঁর শ্বাস পৌছবে, সে মরে যাবে এবং তাঁর শ্বাস ঐ পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত দৃষ্টি পৌছে থাকে।

তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং 'লুদ' নামক স্থানে তাকে ধরে ফেলে সেখানেই হত্যা করবেন। তারপরে তিনি ঐ লোকদের নিকট আসবেন যারা এ হাঙ্গামায় রক্ষা পেয়ে যাবে। তিনি তাদের চেহারায় হাত ফিরিয়ে দেবেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট অহী আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলবেন–'আমি আমার এমন বান্দাহদেরকে প্রেরণ করেছি যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউই করতে পারবে না। তুমি আমার এ বিশিষ্ট বান্দাহদেরকে তূর পর্বতের নিকট নিয়ে যাও।' তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হবে এবং তারা চতুর্দিক হতে লাফাতে লাফাতে চলে আসবে। তাদের প্রথম দলটি 'বাহীরা-ই-তাবারিয়ায়' আসবে এবং ওর সমস্ত পানি পান করে নেবে। তাদের পর পরই যখন অন্য দলটি আসবে তখন তারা ওটাকে এমন শুষ্ক অবস্থায় পাবে যে, তারা বলবে, সম্ভবতঃ এখানে কোন সময় পানি ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ তথায় এমনভাবে অবরুদ্ধ থাকবেন যে, একটি বলদের মাথাও তাঁদের নিকট এমন পছন্দনীয় মনে হবে যেমন আজ তোমাদের নিকট একশটি স্বর্ণমুদ্রা পছন্দনীয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় শত্রুদেরকে গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত করবেন। ফলে তারা সবাই একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় সঙ্গীগণসহ যমীনে অবতরণ করবেন। কিন্তু যমীনে অর্ধহাত পরিমাণ জায়গাও এমন পাবেন না যা তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ হতে শূন্য থাকবে। পুনরায় তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাবেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উটের ঘাড়ের মত এক প্রকার পাখি পাঠিয়ে দেবেন। ঐ পাখিগুলো তাদের সমস্ত মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছেমত জায়গায় নিক্ষেপ করবে। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ফলে সমস্ত যমীন হাতের তালুর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর যমীনকে শস্য এবং ফল উৎপাদনের ও বরকত ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হবে। সেদিন একটি ডালিম ফল এক দল লোকের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তারা সবাই ওর ছালের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারবে। একটি উষ্ট্রীর দুগ্ধ একটি গোটা সম্প্রদায়ের লোকও পান করে শেষ করতে পারবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এক মৃদু ও নির্মল বায়ু প্রবাহিত করবেন যা সমস্ত ঈমানদার নর ও নারীর বগলের নিম্নদেশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাণ বায়ুও নির্গত হয়ে যাবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরা বেঁচে থাকবে।

তারা গাধার মত পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকবে। তাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। মুসনাদ-ই-আহমাদের মধ্যেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ওটা আমরা ইনশাআল্লাহ (সূরা-ই-আম্বিয়ার) حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ (২১ঃ ৯৬) -এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করবো।

সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমার (রাঃ)-এর নিকট বললেনঃ "আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি বলে থাকেন–কিয়ামত অমুক অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এটা কি ব্যাপার? তিনি তখন 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর বললেনঃ "আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, এখন তোমাকে কোন হাদীস শুনাবো না। আমি তো একথা বলেছিলাম যে, কিছুকাল পরে তোমরা বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে, যেমন বায়তুল্লাহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং এই হবে, এই হবে ইত্যাদি।" অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দাজ্জাল বের হবে এবং আমার উম্মতের মধ্যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমার জানা নেই যে, সেটা চল্লিশ মাস হবে অথবা চল্লিশ বছর হবে।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তাঁর আকৃতি হযরত উরওয়া ইব্নে মাসঊদ (রাঃ)-এর মত। তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন। তারপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন মিলে মিশে থাকবে যে, দু'জনের মধ্যে মোটেই কোন শত্রুতা থাকবে না। অতঃপর সিরিয়ার দিক হতে একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে, যা সমস্ত ঈমানদারের মৃত্যু ঘটিয়ে দেবে। যার অন্তরে অণুপরিমাণও সততা বা ঈমান থাকবে, সে পর্বতের গুহায় অবস্থান করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরাই বেঁচে থাকবে, যারা পাখীর ন্যায় হালকা হবে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হবে। ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি তাদের থাকবে না। শয়তান মানুষের রূপ ধরে তাদের নিকট আগমন করতঃ তাদেরকে মূর্তি পূজার দিকে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু তাদের এ অবস্থা সত্ত্বেও তাদের জন্যে আহার্যের দরজা খোলা থাকবে এবং জীবন খুবই শান্তিতে অতিবাহিত হবে। তারপর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। ওর ফলে মানুষ পতিত হ'তে থাকবে। একটি লোক যে তার উষ্ট্রগুলোকে পানি পান করাবার জন্যে তাদের চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে সেই সর্বপ্রথম শিঙ্গার শব্দ শুনতে পাবে। এর ফলে সে এবং অন্য সমস্ত লোক অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

মোটকথা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা হবে শিশিরের বা ছায়ার মত। তার ফলে দ্বিতীয়বার দেহ সৃষ্টি হবে। তারপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সবাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে-"হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে চল।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ অর্থাৎ '(হে ফেরেশতাগণ) তাদেরকে থামিয়ে দাও, নিশ্চয়ই তারা (প্রশ্ন) জিজ্ঞাসিত হবে।' (৩৭ঃ ২৪) এরপর বলা হবে-'জাহান্নামের অংশ বের করে নাও।' জিজ্ঞেস করা হবে-'কতোর মধ্য হতে কতো জনকে?' উত্তরে বলা হবে-'প্রতি হাজারে ন'শ নিরানব্বই জনকে'। (আল্লাহ) বলবেন-'এটা এমন দিন যা ছেলেদেরকে বুড়ো করে দেবে এবং এটা এমন দিন যাতে পায়ের গোছা খুলে যাবে।' মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত হারেস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ ইবনে মারইয়াম (আঃ) 'বাব-ই-লুদের' নিকট কিংবা 'লুদের' পার্শ্বে মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জামেউত তিরমিযীর মধ্যে বাব-ই-লুদ রয়েছে এবং এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। এর পরে ইমাম তিরিমিযী (রঃ) আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-এর নাম নিয়েছেন যে, তাঁদের হতেও এ অধ্যায়ের হাদীসগুলো বর্ণিত আছে, যেগুলোর মধ্যে দাজ্জালের হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাতে নিহত হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। শুধুমাত্র দাজ্জালের বর্ণনার হাদীসগুলোই তো অসংখ্য রয়েছে, যেগুলো একত্রিত করা খুবই কঠিন।

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, আরাফা হতে আসার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের এক মজলিসের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। সে সময় তথায় কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি তখন বলেনঃ "যে পর্যন্ত দশটি ব্যাপার সংঘটিত না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। (১) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। (২) ধূয়া নির্গত হওয়া। (৩) 'দাব্বাতুল আরযের' বের হওয়া। (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটা। (৫) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব। (৭) যমীনের তিন জায়গা ধ্বসে যাওয়া। (৭ক) পূর্বে (৮খ) পশ্চিমে (৯গ) আরব উপদ্বীপে এবং (১০) আদন হতে একটা আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করবে। ওটা (আগুন) রাত্রিও তাদের সাথে অতিবাহিত করবে। যখন দুপুরের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে তখনও এ আগুন তাদের সঙ্গেই থাকবে।"

উক্ত হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম ও সুনানের মধ্যে রয়েছে। হযরত হুযাইফা ইবনে উসায়েদ গিফারী (রাঃ) হতেও মাওকুফ রূপে বর্ণিত আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ মুতাওয়াতির হাদীসগুলো যা হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ), হযরত আবূ উমামা (রাঃ), হযরত লাওয়াস ইবনে সামাআন (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হযরত মাজমা' ইবনে জারিয়া (রাঃ), হযরত আবূ শুরাইহা (রাঃ) এবং হযরত হুযাইফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) (আকাশ হতে) অবতরণ করবেন। সাথে সাথে কিভাবে, কোথায় এবং কোন্ সময় তাঁর অবতরণ ঘটবে তাতে এটাও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ ফজরের নামাযের ইকামতের সময় সিরিয়ার দামেস্ক শহরের পূর্বদিকের স্তম্ভের উপর তিনি অবতরণ করবেন।

সেই যুগে অর্থাৎ ৭৪১ হিঃ সালে 'জামে' উমভী'র স্তম্ভটি সাদা পাথরে মজবুত করে বানানো হয়েছে। কেননা, ওটা আগুনে দগ্ধীভূত হয়েছিল, যে আগুন সম্ভবতঃ অভিশপ্ত খ্রীষ্টানেরাই লাগিয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কি আছে যে, এটাই হয়তো সেই স্তম্ভ যার উপর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং শূকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জিযিয়া কর উঠিয়ে দেবেন ও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন না। যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সংবাদ দিয়েছেন ও তাকে সাব্যস্ত করেছেন। এটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে এবং মানুষ যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসরণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। যেমন কুরআন কারীমে উক্ত হয়েছে وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ (৪৩ঃ ৬১) এবং একটি পঠনে لَعَلَمٌ লা'আলামুন রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ কিয়ামতের (কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার) একটি বড় নিদর্শন। কেননা, তিনি দাজ্জালের আগমনের পর আগমন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

যেমন সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধকের তিনি ব্যবস্থা রাখেননি। তাঁর সময়েই ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আর বরকতে

ধ্বংস করবেন। ইয়াজুজ ও মাজুজের বের হওয়ার সংবাদ কালাম পাকের মধ্যেও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ.وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط

অর্থাৎ 'যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভুমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে; ।'(২১ঃ ৯৬-৯৭) অর্থাৎ তাদের বের হওয়াও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি প্রমাণ।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষণঃ পূর্ব বর্ণিত দু'টি হাদীসেও তাঁর বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মিরাজের রাত্রে আমি হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি মধ্যম দেহ ও পরিষ্কার চুল বিশিষ্ট, যেমন শানূআহ্ গোত্রের লোক হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। তিনি লাল বর্ণের এবং মধ্যম দেহ বিশিষ্ট। মনে হচ্ছিল যে, যেন তিনি সবেমাত্র গোসল খানা হতে বের হয়ে এলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কেও আমি দেখেছি। তিনি একেবারে আমার মতই ছিলেন।

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত ঈসা (আঃ) রক্তিম বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল এবং চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) গোধূম বর্ণ, মোটা দেহ এবং সোজা চুল বিশিষ্ট ছিলেন–যেমন যিতের লোক হয়ে থাকে।" অনুরূপভাবে তিনি দাজ্জালের শরীরিক গঠনও বর্ণনা করেছেন যে, তার ডান চক্ষু কানা হবে যেন ওটা ফুলা আঙ্গুর। তিনি বলেনঃ কা'বা শরীফের নিকটে আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে যে, একজন খুবই গোধূম বর্ণের লোক, যাঁর মাথার চুল তাঁর দু'কাঁধ পর্যন্ত লটকে ছিল এবং চুল ছিল পরিপাটি। তাঁর মস্তক হতে পানির ফোঁটা ঝরে ঝরে পড়ছিল। তিনি দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করি– ইনি কে? তখনই আমাকে বলা হয়–'ইনি হচ্ছেন হযরত মাসীহ ইবনে মারইয়াম (আঃ)।' তাঁর পিছনে আমি আর একটি লোককে দেখতে পাই যার ডান চক্ষুটি কানা ছিল। ইবনে কাতানের সঙ্গে সে অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত ছিল।

তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। সেও দু'ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে তাওয়াফ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করি–এটা কে? বলা হয়– 'মাসীহ্ দাজ্জাল।'

সহীহ্ বুখারী শরীফের আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ঈসা (অঃ)-কে লাল বর্ণের বলেননি, বরং গোধূম বর্ণের বলেছেন।' পরে উপরে বর্ণিত পূর্ণ হাদীসটি রয়েছে। হযরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, ইবনে কাতান খুযাআহ্ গোত্রের একটি লোক ছিল। সে অজ্ঞতার যুগে মারা গিয়েছিল। পূর্বে ঐ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, হযরত মাসীহ (আঃ) দুনিয়ায় অবতীর্ণ হওয়ার পর এখানে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মারা যাবেন এবং মুসলমানেরা তাঁর জানাযার নামায পড়বে।

তবে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, তিনি এখানে সাত বছর অবস্থান করবেন। তাহলে খুব সম্ভব, যে হাদীসে চল্লিশ বছর অবস্থানের কথা রয়েছে তা ঐ সময় সহই হবে যা তিনি তাঁর আকাশে উঠে যাওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছিলেন। যে সময় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল সে সময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। পরে এসে তিনি পৃথিবীতে সাত বছর অবস্থান করবেন। তাহলে পূর্ণ চল্লিশ বছর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই সব চেয়ে ভাল জানেন। (ইবনে আসাকের)

কেউ কেউ বলেন যে, যখন তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছিল দেড় বছর। কিন্তু এটা একেবারেই বাজে কথা। তবে হাফিয আবুল কাসিম (রঃ) স্বীয় ইতিহাসে পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষী হতে এটাও এনেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কক্ষে তাঁর সাথেই সমাধিস্থ হবেন। সুতরাং এ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'উত্থান দিবসে সে তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে।' অর্থাৎ এ কথার তিনি সাক্ষ্য দান করবেন যে, তিনি আল্লাহর রিসালাত তাঁদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরাঃ মায়েদার শেষ দিকে বলেনঃ وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ হতে الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। (৫ঃ ১১৬-১১৮) পর্যন্ত।

১৬০- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۙ○

১৬০। আমি ইয়াহূদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্যে যে সমস্ত পবিত্র বস্তুও বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করতো।

١٦١- وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৬১। এবং তারা সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করতো এবং তারা অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করতো এবং আমি তাদের মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

١٦٢- لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۧ○ ع

১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসীগণের মধ্যে যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমরা পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি বিশ্বস স্থাপন করে এবং যারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাদেরকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রাদন করবো।

এ আয়াতের দু'টি ভাবার্থ হতে পারে। একটি তো এই যে, এটা 'হুরমতে কাদরী' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এটা লিখেই রেখেছিলেন যে, এ লোকগুলো স্বীয় গ্রন্থকে পরিবর্তিত করবে এবং বৈধ জিনিসকে নিজেদের উপর অবৈধ করে নেবে। ওটা শুধুমাত্র তাদের কঠোরতার কারণেই ছিল। দ্বিতীয় ভাবার্থ এই যে, এটা ছিল 'শারঈ হুরমাত' অর্থাৎ তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে কতক জিনিস তাদের উপর হালাল ছিল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাদের কিছু অপরাধের কারণে হারাম করে দেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ط

অর্থাৎ "প্রত্যেক খাদ্যই বানী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল। কিন্তু তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিল তাই তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল" (৩ঃ ৯৩) এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈলের উপর সমস্ত খাদ্যই বৈধ ছিল। কিন্তু হযরত ইসরাঈল (আঃ) নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করেছিলেন। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দু'টো জিনিস হারাম করে দেয়া হয়। যেমন সূরা-ই আনআমে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ج وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ـ

অর্থাৎ "এবং ইয়াহূদীদের জন্যে আমি সমস্ত খুর বিশিষ্ট পশু অবৈধ করেছিলাম এবং ছাগ, গরু ও ওদের চর্বি যা পৃষ্ঠে ও অন্ত্রে সংযুক্ত অথবা অস্থিতে সংলিপ্ত—তদ্ব্যতীত তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম; এভাবে আমি তাদের অবাধ্যতার জন্যে তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করেছিলাম এবং নিশ্চয়ই আমি সত্যপরায়ণ।" (৬ঃ ১৪৬)

সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি, নিজে আল্লাহ তা'আলার পথ হতে সরে যাওয়া ও অপরকে সরিয়ে দেয়া, যা তাদের চিরন্তন অভ্যাস ছিল, রাসূলগণকে হত্যা করা, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করতঃ সুদ ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে অপরের মাল আত্মসাৎ করা, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর

এমন কতগুলো জিনিস হারাম করেন যেগুলো তাদের জন্যে হালাল ছিল। ঐসব কাফিরদের জন্যে তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা কুরআন কারীম ও পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। এ বাক্যটির তাফসীর সূরা-ই-আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), হযরত সা'লাবা ইবনে সাঈদ (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) এবং হযরত উসায়েদ ইবনে উবায়েদ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অগ্রবর্তী وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ বাক্যটি সমস্ত ইমামের 'মাসহাফে' ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মাসহাফে এরূপই আছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সহীফায় وَالْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ রয়েছে। প্রথম পঠনটিই বিশুদ্ধ। যাঁরা বলেন যে, এটা লিখার ভুল, তাঁরা ভুল বলেছেন। কেউ কেউ তো বলেন যে, এর نَصَبِي حَالَتْ হচ্ছে مَدَحْ -এর কারণে, যেমন وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ (২ঃ ১৭৭)এ আয়াতে হয়েছে। তাছাড়া আরবাসীর কথা-বার্তায় এবং কবিতায়ও এ নিয়ম বরাবর চালু রয়েছে।

আবার কেউ বলেন যে, بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (২ঃ ৪)-এ বাক্যের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওগুলোর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করার উপরও তাদের বিশ্বাস রয়েছে। অর্থাৎ তারা নামাযের অপরিহার্যতা ও সত্যতা স্বীকার করে। কিংবা এর ভাবার্থ হচ্ছে ফেরেশতা। অর্থাৎ তাদের কুরআন কারীমের উপর, অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর এবং ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এতে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সবেচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তারা যাকাত প্রদান করে থাকে'। অর্থাৎ মালের বা জীবনের যাকাত দিয়ে থাকে। ভাবার্থ দু'টোও হতে পারে। আর তারা একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদতের যোগ্য মনে করে থাকে এবং তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, সেদিন প্রত্যেক ভাল-মন্দ কার্যের প্রতিদান দেয়া হবে। এ প্রকারের লোককেই আমি মহা প্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত প্রদান করবো।

١٦٣- اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ
اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ
بَعْدِهٖ ج وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ
وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۚ ○

১৬৩। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি–যেরূপ আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনূস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাঊদকে যবুর প্রদান করেছিলাম।

١٦٤- وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ
مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ ○

১৬৪। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট পূর্বে বহু রাসূলের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সহিত প্রত্যক্ষ বাক্যে কথা বলেছেন।

١٦٥- رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ
عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৬৫। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন বিরোধ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাকীন ও আদী ইবনে যায়েদ বলেছিল, 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমরা স্বীকার করি না যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেছেন'। তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কারাযী (রঃ) বলেন যে, যখন (يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ) হতে (وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا) (৪ঃ ১৫৩-১৫৬) পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং ইয়াহূদীদের দুষ্কার্যাবলী তাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন তারা স্পষ্টভাবে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর নিজের কোন কালাম অবতীর্ণই করেননি, না মূসা (আঃ)-এর উপর, না ঈসা (আঃ)-এর উপর, না অন্য কোন নবীর উপর। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। কিন্তু এ উক্তিটি সন্দেহযুক্ত। কেননা, সূরা-ই-আনআ'মের এ আয়াতটি 'মাক্কী'। আর সূরা-ই-নিসার উপরোক্ত আয়াতটি 'মাদানী' যা তাদের 'আপনি আকাশ হতে কোন কিতাব আনয়ন করুন' এ কথার খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়। তাদের এ কথার উত্তরে বলা হয় যে, তারা হযরত মূসাকে এর চেয়েও বড় প্রশ্ন করেছিল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দোষগুলো বর্ণনা করেন এবং তাদের পূর্বের ও বর্তমানের জঘন্য কার্যাবলী প্রকাশ করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন যেমন প্রত্যাদেশ করেছিলেন তিনি অন্যান্য নবীদের উপর। 'যাবুর' ঐ আসমানী কিতাবের নাম যা হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। ঐ নবীদের ঘটনা আমরা ইন্‌শাআল্লাহ সূরা-ই-কাসাসে বর্ণনা করবো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এ আয়াত অর্থাৎ মাক্কী সূরার আয়াতের পূর্বে বহু নবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং বহু নবীর ঘটনা বর্ণিত হয়নি। যে নবীগণের নাম কুরআন কারীমের মধ্যে এসেছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

হযরত আদম (আঃ), হযরত ইদরীস (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত হযরত হূদ (আঃ), হযরত সালিহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকূব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত আইয়ূব (আঃ), হযরত শু'আইব (আঃ),

হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারূন (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত দাঊদ (আঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত ইয়াসাআ (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে হযরত যুলকিফল (আঃ) এবং সর্বশেষ ও নবীগণের নেতা হযরত মুহাম্মাদ মোস্তাফা (সঃ)।

বহু নবী এমনও রয়েছেন যাঁদের নাম কুরআন কারীমে উল্লিখিত হয়নি। এ কারণেই রাসূল ও নবীগণের সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ হাদীস হচ্ছে হযরত আবূ যার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি। হাদীসটি তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নবী কতজন? তিনি বলেনঃ "এক লক্ষ চব্বিশ হাজার।" হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূল কতজন? তিনি বলেনঃ "তিনশ তেরোজন। বড় একটি দল।" পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, সর্বপ্রথম কে? তিনি বলেনঃ "হযরত আদম (আঃ)।" তিনি বলেন, তিনি কি রাসূল ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাঁর মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দেন এবং ঠিকঠাক করে দেন।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে আবূ যার (রাঃ)! চারজন হচ্ছেন সূরইয়ানী। (১) হযরত আদম (আঃ), (২) হযরত শীষ (আঃ), (৩) হযরত নূহ্ (আঃ) এবং (৪) হযরত খানুখ (আঃ) যাঁর প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে ইদরীস (আঃ)। তিনিই সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেন। আর চারজন হচ্ছেন আরবী। (১) হযরত হূদ (আঃ), (২) হযরত সালিহ্ (আঃ), (৩) হযরত শু'আইব (আঃ) এবং (৪) তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)। হে আবূ যার (রাঃ)! বানী ইসরাঈলের প্রথম নবী হচ্ছেন হযরত মূসা (আঃ) এবং শেষ নবী হচ্ছেন হযরত ঈসা (আঃ)। সমস্ত নবীর মধ্যে প্রথম নবী হচ্ছেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী হচ্ছেন তোমাদের নবী (সঃ)"। এ সুদীর্ঘ হাদীসটি হাফিয আবূ হাতিম (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আল আনওয়া ওয়াত্তাফাসীমে' বর্ণনা করেছেন যার উপর তিনি বিশুদ্ধতার চিহ্ন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ইমাম আবূ ফারাজ ইবনে জাওযী ওটাকে সম্পূর্ণরূপে কল্পিত বলেছেন। ইবরাহীম ইবনে হাসিম ওর একজন বর্ণনাকারীকে কল্পনাকারী রূপে সন্দেহ করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, খণ্ডনকারী ইমামগণের মধ্যে অনেকেই এ হাদীসের কারণে

তার সমালোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আর এ হাদীসটি অন্য সনদে হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। কিন্তু ওতে মাআন ইবনে রিফাআহ্ দুর্বল, আলী ইবনে ইয়াযিদও দুর্বল এবং কাসিম ইবনে আবদুর রহমানও দুর্বল।

আবূ ইয়ালা (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী পাঠিয়েছেন। চার হাজার পাঠিয়েছেন বানী ইসরাঈলের নিকট এবং চার হাজার পাঠিয়েছেন অবশিষ্ট অন্যান্য লোকদের উপর"। এ হাদীসটিও দুর্বল। এতে যাইদী এবং তার শিক্ষক রুকাশী দু'জনই দুর্বল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবূ ইয়ালার আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার ভাই আট হাজার নবী অতীত হয়েছেন। তাঁদের পরে হযরত ঈসা (আঃ) এসেছেন এবং তাঁর পরে আমি এসেছি।" অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি আট হাজার নবীর পরে এসেছি, তাঁদের মধ্যে চার হাজার ছিলেন বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত।' এ হাদীসটি এ সনদে তো গারীব বটেই কিন্তু এর সমস্ত বর্ণনাকারী সুপরিচিত। শুধুমাত্র আহমাদ ইবনে তারিকের সততা বা দৌর্বল্য সম্পর্কে আমার অজানা রয়েছে।

নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসটিও এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ আমি মসজিদে প্রবেশ করি। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) একাকী মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমিও তাঁর পার্শ্বে বসে পড়ি এবং বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি আমাকে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 'হ্যাঁ, নামায উত্তম কাজ। তাই, হয় তুমি নামায বেশী করে পড় না হয় কম করে পড়।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ আমল উত্তম? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ মুমিন উত্তম। তিনি বলেনঃ "সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি।" আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সর্বোত্তম মুসলমান কে? তিনি বলেনঃ "যার কথা ও হাত হতে মানুষ নিরাপদে থাকে।" আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ হিজরত উত্তম? তিনি বলেন ঃ 'মন্দকে পরিত্যাগ করা।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বলেনঃ 'যে গোলামের মূল্য বেশী ও তার

মনিবের নিকট বেশী পছন্দীয়।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন্ সাদকা সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ 'অল্প মালের অধিকারী ব্যক্তির চেষ্টা করা ও গোপনে দরিদ্রকে দান করা।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কুরআন কারীমের মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত কোন্‌টি? তিনি বলেনঃ "আয়তুল কুরসী।"

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'হে আবূ যার (রাঃ)! সাতটি আকাশ কুরসীর তুলনায় ঐরূপ যেরূপ কোন মরুপ্রান্তরে একটি বৃত্ত এবং কুরসীর উপর আরশের মর্যাদা ঐরূপ যেরূপ প্রশস্ত প্রান্তরের মর্যাদা বৃত্তের উপর।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নবী কতজন? তিনি বলেনঃ 'এক লক্ষ চব্বিশ হাজার।' আমি বলি, তাদের মধ্যে রাসূল কতজন? তিনি বলেনঃ 'তিনশ জন, বড় পবিত্র দল।' আমি জিজ্ঞেস করি, সর্বপ্রথম কে? তিনি বলেনঃ 'হযরত আদম (আঃ)।' আমি বলি, তিনিও কি রাসূল ছিলেন? তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বহস্তে সৃষ্টি করতঃ ওঁর মধ্যে রূহ্ ফুঁকে দেন এবং তাঁকে ঠিকঠাক করেন।'

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'জেনে রেখো যে, চারজন হচ্ছেন সুরইয়ানী। (১) হযরত আদম (আঃ), (২) হযরত শীষ (আঃ), (৩) হরত খানুখ (আঃ) তিনিই হচ্ছেন হযরত ইদরীস (আঃ), যিনি সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন এবং (৪) হযরত নূহ (আঃ)। আর চারজন হচ্ছেন আরবী। (১) হযরত হূদ (আঃ), (২) হযরত শু'আইব (আঃ), (৩) হযরত সালিহ (আঃ) এবং (৪) তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। সর্বপ্রথম রাসূল হচ্ছেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা কতখানা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? তিনি বলেনঃ 'একশ চারখানা। হযরত শীষ (আঃ)-এর উপর পঞ্চাশ খানা সহীফা, হযরত খানুখ (আঃ)-এর উপর তিনখানা সহীফা, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর দশখানা সহীফা, হযরত মূসা (আঃ) -এর উপর তাওরাতের পূর্বে দশখানা সাহীফা ও তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল, ও ফুরকান নাযিল করেন।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাহীফায় কি ছিল? তিনি বলেনঃ ওর সম্পূর্ণটাই ছিল নিম্নরূপ-

'হে বিজয়ী বাদশাহ! আমি তোমাকে দুনিয়া জমা করার জন্যে পাঠাইনি, বরং এ জন্যে পাঠিয়েছি যে, তুমি অত্যাচারিতের প্রার্থনা আমার সামনে হতে সরিয়ে দেবে। যদি তা আমার নিকট পৌঁছে যায় তবে আমি তা প্রত্যাখ্যান

করবো না।' তাতে নিম্নরূপ দৃষ্টান্তও ছিল– জ্ঞানীর এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে, সে যেন তার সময় কয়েক ভাগে ভাগ করে। একটি অংশে সে নিজের জীবনের হিসেব গ্রহণ করবে। এক অংশে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করবে, একাংশে সে পানাহারের চিন্তা করবে। জ্ঞানীর নিজেকে তিনটি জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিসে লিপ্ত রাখা উচিত নয়। প্রথম হচ্ছে পরকালের পাথেয়, দ্বিতীয় হচ্ছে জীবিকা লাভ এবং তৃতীয় হচ্ছে বৈধ জিনিসে আনন্দ ও মজা উপভোগ। জ্ঞানীর উচিত যে, সে যেন নিজের সময়কে দেখতে থাকে, স্বীয় কার্যে লেগে থাকে এবং স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখে। যে ব্যক্তি স্বীয় কথাকে তার কাজের সঙ্গে মিলাতে থাকে সে খুব কম কথা বলবে। তোমরা শুধু ঐ কথাই বল, যাতে তোমাদের উপকার হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হযরত মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি বলেনঃ "ওটা শুধু উপদেশে পরিপূর্ণ। যেমন আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখে বিস্মিত হই যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে অথচ আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকে। ভাগ্যের উপর বিশ্বাস রাখে অথচ হায় হায় করে। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব অবলোকন করে অথচ নিশ্চিন্ত থাকে। কিয়ামতের দিন যে হিসাব দিতে হবে এটা জানে অথচ আমল করে না"। আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থসমূহে যা কিছু ছিল ওগুলোর মধ্যে আমাদের গ্রন্থেও কিছু রয়েছে কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, হে আবূ যার! দেখ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى * بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا * وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى * اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى * صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى *

অর্থাৎ 'মুক্তি পেয়েছে ঐ ব্যক্তি যে পবিত্র হয়েছে। আর তার প্রভুর নাম স্মরণ করতঃ নামায পড়েছে। বরং তোমরা ইহলৌকিক জীবনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছ, অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী সাহীফাগুলোতে রয়েছে। রয়েছে ইবরাহীম ও মূসার সাহীফায়।' (৮৭:১৪-১৯)

আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেনঃ "আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করতে থাক। এটাই হচ্ছে তোমার কার্যের প্রধান অংশ।" আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'কুরআন পাঠ ও আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাক।

এটা তোমার জন্যে আকাশসমূহে যিকিরের এবং পৃথিবীতে আলোকের কারণ হবে।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও বলুন। তিনি বলেনঃ "সাবধান! অতিরিক্তি হাসি হতে বিরত হও। এর ফলে অন্তর মরে যায় এবং চেহারার ঔজ্জ্বল্য দূর হয়ে যায়।" আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ "জিহাদে লিপ্ত থাক, আমার উম্মতের জন্যে এটাই হচ্ছে সংসার ত্যাগ।" আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেনঃ 'উত্তম কথা বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রেখো। এতে শয়তান পলায়ন করে এবং ধর্মীয় কাজে বিশেষ সহায়তা লাভ হয়।'

আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'তোমা অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দিকে দেখ, তোমা অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের লোকদের দিকে দেখো না। এতে তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও বলুন! তিনি বলেনঃ 'দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা রেখো এবং তাদের সাথে উঠাবসা কর। এতে আল্লাহ তা'আলার করুণা তোমার কাছে খুব বড় বলে মনে হবে।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'আত্মীয়দের সাথে মিলিত থাক যদিও তারা মিলিত না হয়।' আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আরও কিছু বলুন। তিনি বলেনঃ 'সত্য কথা বলতে থাক যদিও তা কারও কাছে তিক্ত বলে মনে হয়।' আমি তাঁর নিকট আরও উপদেশ যাচ্ঞা করি। তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করো না।' আমি বলি, আরও বলুন। তিনি বলেনঃ 'নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য কর। অন্যের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হতে বিরত থাক।'

অতঃপর তিনি আমার বক্ষে হাত রেখে বলেনঃ 'হে আবূ যার (রাঃ)! তদবীরের মত কোন বুদ্ধিমত্তা নেই, হারাম হতে বিরত থাকার মত কোন তাকওয়া নেই এবং উত্তম চরিত্রের মত কোন বংশ নেই।' মুসনাদ-ই-আহমাদেও এ হাদীসটি কিছু কম-বেশীর সাথে বর্ণিত আছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) জনগণকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'খারেজীগণও কি দাজ্জালকে স্বীকার করে?' উত্তর আসেঃ 'না।' তিনি তখন বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'আমি এক হাজার বরং তার চেয়েও বেশী নবীর শেষে এসেছি। প্রত্যেক নবী (আঃ) নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে তার এমন কতগুলো

নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যেগুলো অন্যান্য নবীদের নিকট বর্ণনা করেননি। জেনে রেখো যে, সে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে এবং প্রভু এরূপ হতে পারেন না। তার ডান চক্ষু কানা হবে ও উপর দিকে উঠে থাকবে যেমন চুনকামকৃত কোন পরিষ্কার দেয়ালে কোন ফুটা জায়গা থাকে। তার বাম চক্ষুটি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় হবে। সে সমস্ত ভাষায় কথা বলবে। তার নিকট সবুজ শ্যামল জান্নাতের ছবি থাকবে যেখানে পানি প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তার নিকট জাহান্নামেরও ছবি থাকবে। তথায় কালো ধুঁয়া দেখা যাবে।'

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি এক লক্ষ বরং তার চেয়েও বেশী নবী (আঃ)-এর শেষে আগমন করেছি। আল্লাহ তা'আলা যত নবী পাঠিয়েছেন প্রত্যেকেই স্বীয় গোত্রকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন।" তারপরে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'এবং আল্লাহ প্রত্যক্ষ বাক্যে মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন।' এটা তাঁর একটা বিশেষ গুণ যে, তিনি কালীমুল্লাহ ছিলেন। একটি লোক হযরত আবূ বকর ইবনে আয়্যাশ (রঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ 'একটি লোক এ বাক্যটিকে وَكَلَّمَ اللّٰهَ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا এরূপ পড়ে থাকে। অর্থাৎ মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন।' একথা শুনে হযরত আবূ বকর ইবনে আয়্যাশ (রঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ 'কোন কাফির এভাবে পড়ে থাকবে। আমি হযরত আ'মাশ (রঃ) হতে, তিনি ইয়াহইয়া (রঃ) হতে, তিনি আবদুর রহমান (রঃ) হতে, তিনি হযরত আলী (রাঃ) হতে এবং হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا এরূপই পড়েছেন।' মোটকথা ঐ লোকটির অর্থ ও শব্দের পরিবর্তন করে দেয়া দেখে তিনি এরূপ রাগান্বিত হন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটা কোন মুতাযেলীই হবে। কেননা, মুতাযেলীদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা না হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলছেন না অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন। কোন একজন মুতাযেলী কোন একজন মনীষীর নিকট এসে এ আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করলে তিনি তাকে মন্দ বলেন। অতঃপর তাকে বলেনঃ "তাহলে তুমি وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ অর্থাৎ 'এবং যখন মূসা আমার প্রতিশ্রুত সময়ে আগমন করে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেন'(৭ঃ ১৪৩)-এ আয়াতটিকে কিভাবে অস্বীকার করবে"? ভাবার্থ এই যে, এখানে এ ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন চলবে না।

'তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই'-এর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেন তখন তিনি একটি কৃষ্ণ বর্ণের পিপীলিকার অন্ধকার রাত্রে কোন পরিষ্কার পাথরের উপর চলাও দেখতে পেতেন।" এ হাদীসটি দুর্বল এবং এর ইসনাদও সহীহ নয়। কিন্তু এটা যদি সহীহ 'মাওকুফ' হিসেবে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর উক্তি রূপে প্রমাণিত হয় তবে খুব ভাল কথা। 'মুসতাদরিক-ই-হাকিম' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেন তখন তিনি পশমের চাদর, পায়জামা এবং যবাইহীন গাধার চামড়ার জুতো পরিহিত ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তিন দিনে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কথা বলেন যেগুলোর সবই ছিল উপদেশ। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-এর কর্ণে মানুষের কথা প্রবেশ করেনি। কেননা তখন তাঁর কর্ণে ঐ পবিত্র কালামই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এর ইসনাদও দুর্বল। তাছাড়া এতে ইনকিতা রয়েছে। তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে একটি হাদীস রয়েছে যে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেনঃ 'তূর দিবসে' আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যে কথা বলেছিলেন ওর বিশেষণ ঐদিনের কথার বিশেষণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল যে দিন তিনি তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। তখন হযরত মূসা (আঃ) এর রহস্য জানতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মূসা! এ পর্যন্ত তো আমি দশ হাজার ভাষার সমান ক্ষমতায় কথা বলেছি। অথচ আমার সমস্ত ভাষায় কথা বলারই ক্ষমতা রয়েছে, এমন কি এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা রয়েছে।"

বানী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রভুর কালামের বিশেষণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'আমি তো কিছুই বলতে পারি না।' তখন তারা বলেঃ "আচ্ছা, কিছু সাদৃশ্য বর্ণনা করুন।" তিনি বলেনঃ "তোমরা তো বজ্রের শব্দ শুনে থাকবে। ওটা অনেকটা ঐরূপ ছিল কিন্তু বেশী ছিল না।" এর একজন বর্ণনাকারী রুকাশী খুবই দুর্বল। হযরত কা'ব (রঃ) বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যখন কথা বলেন তখন তিনি সমস্ত ভাষাতেই কথা বলেন। স্বীয় কথার মধ্যে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাককে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে আমার প্রভু! এটাই কি আপনার কথা?' তিনি বলেনঃ 'না। তুমি আমার কথা সহ্য করতে পারবে না।' হযরত মূসা (আঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে

আমার প্রভু! আপনার মাখলুকের কারও কথার সঙ্গে আপনার কথার সাদৃশ্য আছে কি?' আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ভয়ংকর বজ্রধ্বনি ছাড়া আর কিছুরই সাদৃশ্য নেই।' এ বর্ণনাটিও 'মাওকুফ' এবং এটা স্পষ্ট কথা যে, হযরত কা'ব (রঃ) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হতে বর্ণনা করতেন, যেসব কিতাবে বানী ইসরাঈলের সত্য-মিথ্যা সব ঘটনাই থাকতো।

এরপর বলা হচ্ছে– তারা এমন রাসূল যারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকারকারীদেরকে ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে থাকে এবং তাঁর আদেশ অমান্যকারীদের ও তাঁর রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা যে স্বীয় গ্রন্থরাজি অবতীর্ণ করেছেন ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তা এ জন্যে যে, যেন কারও কোন প্রমাণ এবং ওযর অবশিষ্ট না থাকে।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى

অর্থাৎ 'যদি আমি এর পূর্বেই তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে তারা অবশ্যই বলতো–হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের নিকট রাসূল পাঠাননি কেন? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহকে মেনে নিতাম।' (২০ঃ ১৩৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলার মত মর্যাদা বোধ আর কারও নেই। এ জন্যেই তিনি সমস্ত মন্দকে হারাম করেছেন তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক এবং এমনও কেউ নেই যার কাছে প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশী পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন। এমনও কেউ নেই যার নিকট ওযর আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয়। এ জন্যেই তিনি নবীগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন।" অন্য বর্ণনায় নিম্নের শব্দগুলোও রয়েছে– "এ কারণেই তিনি রাসূল পাঠিয়েছেন ও গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ করেছেন।"

১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য দান করছেন, এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য প্রদান করছে; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট।

١٦٦- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

১৬৭। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করছে, অবশ্যই তারা সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।

١٦٧- إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১৬৮। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেন না।

١٦٨- إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ○

১৬৯। জাহান্নামের পথ ব্যতীত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।

١٦٩- إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

১৭০। হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হতে সত্যসহ রাসূল আগমন করেছেন, অতএব বিশ্বাস স্থাপন কর–তোমাদের

١٧٠- يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِنْ

تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তবে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহর এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাঁর নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এজন্যেই এখানে বলা হচ্ছে-'হে নবী (সঃ)! গুটিকতক লোক তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে বটে কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছেন।' আল্লাহ তা'আলা বলেন-আল্লাহ তোমার উপর কুরআন মাজীদ ও ফুরকান-ই-হামীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার কাছে বাতিল টিকতে পারে না। এর মধ্যে ঐ সমুদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যার উপর তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, ফুরকান, আল্লাহর সন্তুষ্টির ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গুণাবলী। যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অবহিত না করা পর্যন্ত কোন রাসূল বা কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাও জানতে পারেন না! যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ

অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছে করেন তদ্ব্যতীত কেউই তার অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই ধারণা করতে পারে না। (২ঃ ২৫৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে-

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا

অর্থাৎ "তারা তাঁর জ্ঞান আবেষ্টনীর মধ্যে আনতে পারে না।"

হযরত আতা ইবনে সায়েব (রঃ) যখন হযরত আবূ আবদুর রহমান (রঃ)-এর নিকট কুরআন কারীম পাঠ শেষ করেন তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ "যে আমলে তোমার চেয়ে বেড়ে যাবে সে ছাড়া আজ তোমার চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই।" অতঃপর তিনি (انزله بعلمه)-এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর সাক্ষ্যের সাথে সাথে ফেরেশ্তাগণেরও সাক্ষ্য রয়েছে যে, যা তোমার নিকট এসেছে এবং যে অহী তোমারা উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য।

ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমার নিশ্চিত রূপে জানা রয়েছে যে, আমার রিসালাতের অবগতি তোমাদের রয়েছে।" ঐ লোকগুলো ঐ কথা অস্বীকার করে। তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যেসব লোক কুফরী করতঃ সত্যের অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এমনকি অন্য লোকদেরকেও সত্য পথে আসতে বাধা দিয়েছে তারা সঠিক পথ হতে সরে পড়েছে এবং প্রকৃত জিনিস থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তারা সুপথকে হারিয়ে ফেলেছে। এসব লোক, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে, আমার কিতাবকে অমান্য করেছে, আমার পথে আসতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, আমার নিষিদ্ধ কার্যাবলী করতে রয়েছে এবং আমার নির্দেশাবলী অমান্য করেছে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করবো না এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনও করবো না, বরং তাদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করবো। তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

হে লোক সকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তাঁর রাসূল আগমন করেছেন। তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর আনুগত্য স্বীকার কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের ঈমান আনয়নে তাঁর কোন লাভও নেই এবং তোমাদের অস্বীকার করাতে তাঁর কোন ক্ষতিও নেই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় জিনিস তাঁরই অধিকারে রয়েছে। একথাই হযরত মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেনঃ "যদি তোমরা এবং সারা জগতের সমস্ত লোকও কাফির হয়ে যায় তবুও মহান আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সারা বিশ্ব হতে অমুখাপেক্ষী; তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই জানেন কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য। তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর কথা, তাঁর কাজ, তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর বিধান সবকিছুই নিপুণতাপূর্ণ।"

১৭১। হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করো না এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলো না, নিশ্চয়ই মারইয়াম	١٧١ - يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○ (১৭১)

নন্দন ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী–যা তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা; অতএব আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনজন বলো না; নিবৃত্ত হও–তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহই মা'বূদ; তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পূতঃ, মুক্ত; নভোমণ্ডলে যা আছে ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবকে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করছেন। খ্রীষ্টানেরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছিল এবং তাঁকে নবুওয়াত হতে বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তারা তাঁর আনুগত্য ছেড়ে তাঁর ইবাদতে লেগে পড়েছিল, এমনকি অন্যান্য মনীষীর ব্যাপারেও তাদের ধারণা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের আলেমদেরকেও তারা নিষ্পাপ মনে করতে থাকে এবং এ ধারণা করে নেয় যে, ধর্মের আলেমগণ যা কিছু বলেন তা মেনে নেয়াই অপরিহার্য কর্তব্য। সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং সুপথ-ভ্রান্তির পথ পরীক্ষা করার কোন অধিকার তাদের নেই। যার বর্ণনা কুরআন কারীমের নিম্নের এ আয়াতে রয়েছে–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ "তারা তাদের আলেমদেরকে ও ধর্মযাজকদেরকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল।"(৯ঃ ৩১)

মুসনাদ-ই-আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ‘তোমরা আমাকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিও না যেমনভাবে খ্রীষ্টানেরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তো একজন দাস মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও আল্লাহর রাসূল বলবে।” এ হাদীসটি সহীহ বুখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে।

মুসনাদ-ই-আহমাদের অপর একটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! হে আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে! হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের কথার প্রতি খেয়াল রেখো। দেখ, শয়তান যেন তোমাদেরকে এদিক-ওদিক করে না দেয়। আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সঃ)। আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমি চাইনে যে, তোমরা আমাকে আমার মর্যাদা অপেক্ষা বেশী বাড়িয়ে দেবে।”

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিও না। তোমরা তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করো না। তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ওটা হতে তিনি বহু দূরে ও বহু উচ্চে রয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া কেউ মা'বূদ ও প্রভু নেই। হযরত মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে একজন দাস এবং তাঁর একজন সৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি শুধু كُنْ শব্দের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন। যে শব্দটি নিয়ে হযরত জিবরাইল (আঃ) হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর নিকট এসেছিলে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে ঐ কালেমা তাঁর মধ্যে ফুঁকে দেন। এর ফলেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। পিতা ছাড়াই একমাত্র এ কালেমার মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টি হন বলেই তাঁকে বিশেষভাবে ‘কালেমাতুল্লাহ’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে–

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ -

অথাৎ ‘হযরত মাসীহ ইবনে মারইয়াম শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল, তার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হয়েছেন, তার মাতা সত্যবাদিনী, তারা দু'জন আহার্য ভোজন করতো।’ (৫ঃ ৭৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ـ

অর্থাৎ "ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলার নিকট আদমের মতই, তাকে তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অতঃপর বলেছেন– হও, আর তেমনই হয়ে গেছে।"(৩ঃ ৫৯) কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছে–

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ـ

অর্থাৎ "যে তার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছে এবং আমি স্বীয় রূহ তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছি এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্যে নিদর্শন বানিয়েছি।" (২১ঃ ৯১) আর এক আয়াতে রয়েছে–

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

অর্থাৎ "এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম যে তার লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করেছে।" (৬৬ঃ ১২) হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

অর্থাৎ "সে (ঈসা আঃ) একজন দাস ছাড়া কিছুই নয়, আমি তাকে পুরস্কৃত করেছিলাম।" (৪৩ঃ ৫৯) সুতরাং ভাবার্থ এই নয় যে, স্বয়ং আল্লাহর কালেমাই ঈসা (আঃ) হয়ে গেছেন। বরং ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার কালেমার মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়েছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মারইয়ামের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন ও তিনি তাঁর রূহ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তার আমল যাই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।" অন্য বর্ণনায় এতটুকু বেশী রয়েছে যে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যেটি দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করবে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে যেমন হাদীসে ও কুরআনে رُوحٌ مِّنْهُ বলা হয়েছে ঐ রকমই কুরআন কারীমের একটি আয়াতে রয়েছে–

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ

অর্থাৎ "তিনি যা কিছু আকাশে ও যা কিছু যমীনে রয়েছে সমস্তই নিজের পক্ষ হতে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।" (৪৫ঃ ১৩) অর্থাৎ স্বীয় মাখলুক হতে ও নিজের রূহ হতে। رُوْحٌ مِّنْهُ -এর ভাবার্থ এটাই। সুতরাং এখানে مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض - এর জন্যে অর্থাৎ কতককে বুঝাবার জন্যে নয়, যেমন অভিশপ্ত খ্রীষ্টানদের ধারণা রয়েছে যে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর একটা অংশ ছিলেন। বরং مِنْ এখানে اِبْتِدَاء অর্থাৎ প্রারম্ভের জন্যে এসেছে। হযরত মুজাহিদ বলেন যে, رُوْحٌ مِّنْهُ -এর ভাবার্থ হচ্ছে رَسُوْلٌ مِّنْهُ অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে রাসূল।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে مُحَبَّةٌ مِّنْهُ কিন্তু বেশী স্পষ্ট হচ্ছে প্রথম উক্তিটি। অর্থাৎ তাঁকে রূহ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মাখলুক। সুতরাং তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা ঐরূপই যেরূপ বলা হয় 'নাকাতুল্লাহ' (আল্লাহর উষ্ট্রী) এবং 'বায়তুল্লাহ'। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই নিজের দিকে সম্বন্ধ লাগিয়েছেন। হাদীস শরীফে এও রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি আমার প্রভুর নিকট তাঁর ঘরে যাবো।"

তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা এ বিশ্বাস করে নাও যে, আল্লাহ এক, তিনি স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং এটাও বিশ্বাস করে নাও যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস, তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল। তোমরা 'তিন' বলো না। অর্থাৎ ঈসা (আঃ) ও মারইয়াম (আঃ)-কে আল্লাহর সাথে অংশীদার করো না। কেউ যে তাঁর অংশীদার হবে এ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। সূরা-ই-মায়েদায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ

অর্থাৎ 'যারা বলে যে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন তারা অবশ্যই কাফির হয়ে গেছে, আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই।' (৫ঃ৭৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা-ই-মায়েদার শেষে বলেছেন–

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط

অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ বললেন– হে মারইয়াম নন্দন ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে পরিত্যাগ করে তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে দুই মা'বূদরূপে গ্রহণ কর?' (৫ঃ ১১৬) হযরত ঈসা (আঃ)

ওটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবেন। খ্রীষ্টানদের নিকট এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। অযথা তারা ভ্রান্তির পথে চালিত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক মনে করছে। আবার কেউ কেউ তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র বলছে।

সত্য কথা এই যে, যদি দশজন খ্রীষ্টান একত্রিত হয় তবে তাদের খেয়াল হবে এগার রকম। সাঈদ ইবনে বাতরীক ইসকানদারী নামক খ্রীষ্টানদের একজন বড় পণ্ডিত প্রায় চারশ হিজরীতে বর্ণনা করেছে যে, কনসটান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা কুসতুনতীনের আমলে সে যুগীয় বাদশাহর নির্দেশক্রমে খ্রীষ্টানদের এক সম্মেলন হয়। তথায় তাদের দু'হাজারেরও বেশী বড় বড় পাদরী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশী মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যে, কোন বিষয়ের উপর সত্তর আশি জনের বেশী লোক একমত হতে পারেনি। দশজনের এক রকম বিশ্বাস, বিশজনের আর এক খেয়াল, চল্লিশজন অন্য কিছু বলে এবং ষাট জন অন্য দিকে যায়।

মোটকথা, হাজার হাজার লোকের মধ্যে অতিকষ্টে মাত্র তিনশ আঠারোজন লোক এক সিদ্ধান্তে একমত হয়। বাদশাহ ঐ আকীদাকেই গ্রহণ করে এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করে। তাদেরই সে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদের জন্যে গীর্জা বানিয়ে দেয়, গ্রন্থরাজি লিখিয়ে দেয় ও আইন কানুন লিপিবদ্ধ করে। ওরাই আমানত-ই-কুবরার মাসআলা বের করে যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম খেয়ানতই ছিল। ঐ লোকগুলোকে 'মালেকানিয়্যাহ' বলা হয়। দ্বিতীয় বার সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয়, তার নাম হচ্ছে 'ইয়াকুবিয়্যাহ।' অতঃপর তৃতীয় সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয় তার নাম 'নাসতুরিয়্যাহ।' এ তিনটি দল হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তিনটি উক্তি করে থাকে। (অর্থাৎ একদল তাঁকেই আল্লাহ বলে, একদল তাঁকে আল্লাহর অংশীদার বলে এবং একদল তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে)। তারা আবার একে অপরকে কাফির বলে থাকে। আর আমাদের নিকট তো তারা সবাই কাফির।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমরা এটা হতে বিরত হও এবং এ বিরত থাকাই তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। আল্লাহ্ তো এক, সন্তান হওয়া হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্তই তাঁর সৃষ্ট এবং সমস্ত কিছুই তাঁর অধিকারে রয়েছে। সকলেই তাঁর দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। তাহলে তাঁরই মাখলুকের মধ্যে কেউ তাঁর স্ত্রী এবং কেউ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? অন্য একটি আয়াতে রয়েছে–

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ

অর্থাৎ তিনি তো হচ্ছেন প্রথম আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকারী, সুতরাং কিরূপে তাঁর সন্তান হতে পারে? (৬ঃ ১০১) সূরা-ই-মারইয়ামের وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا-لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا* হতে فَرْدًا (১৯ ঃ ৮৮-৯৫) পর্যন্ত আয়াতেও বিস্তারিতভাবে এর অস্বীকৃতি রয়েছে।

১৭২। আল্লাহর সেবক হতে মাসীহ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণের কোনই সংকোচ নেই; এবং যে তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে, তিনি তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন।

১৭২- لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

১৭৩। অনন্তর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকার্য করে থাকে, তাদেকে তিনি তাদের সম্যক প্রতিদান প্রদান করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর দান করবেন;এবং যারা সংকুচিত হয় ও অহংকার করে, তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি প্রদান করবেন। এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না।

১৭৩- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

ভাবার্থ এই যে, হযরত মাসীহ (আঃ) ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাগণও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে মোটেই সংকোচবোধ করেন না এবং অহংকারও করেন না। এটা তাদের জন্যে শোভনীয়ও নয়। বরং যাঁরা যত বেশী আল্লাহ তা'আলার নৈকট লাভ করেন তাঁরা ততো বেশী পরিমাণ তাঁর ইবাদত করে থাকেন। কেউ কেউ এ আয়াত দ্বারা এ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ফেরেশতাগণ মানুষ অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এখানে مَسِيحٌ -এর উপর مَلٰئِكَةٌ শব্দের সংযোগ হয়েছে। আর اِسْتِنْكَافٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরত হওয়া এবং ফেরেশতাদের মধ্যে এ শক্তি হযরত মাসীহ (আঃ) অপেক্ষা বেশী আছে। এ জন্যে এটা বলা হয়েছে। কিন্তু বিরত হওয়ার উপর বেশী ক্ষমতাবান হওয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। এও বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে যেমন মানুষ পূজো করতো তেমন ফেরেশতাদেরকেও পূজো করতো। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মানুষকে আল্লাহর ইবাদত হতে বাধা দেননি। তারপরে ফেরেশতাদেরও এ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা যাঁদের পূজো করছে তাঁরাও স্বয়ং আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। সুতরাং তাঁদেরকে পূজো করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ তিনি তা হতে পবিত্র, বরং তারা সম্মানিত দাস।" (২১ঃ ২৬) তাই, এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং অহংকার করছে তারা একদিন তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সেদিন তাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা তারা নিজেরাই শুনে নেবে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের কার্যের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় করুণা দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই-এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ اُجُوْر তো এই যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন এবং وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ -এর ভাবার্থ এই যে,

যার জন্যে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে তার জন্যেও ঐ সব লোক সুপারিশ করবে যাদের সাথে সে দুনিয়ায় ভাল ব্যবহার করেছে। কিন্তু এর সনদ প্রমাণিত নয়। কিন্তু যদি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উক্তির উপরেই ওটা বর্ণনা করা হয় তবে ঠিকই আছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে- 'যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য হতে সরে পড়ে এবং অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না'। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ـ

অর্থাৎ "যারা আমার ইবাদত হতে অংহকার করে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (৪০ঃ ৬০) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও অহংকারের প্রতিদান এই দেয়া হবে যে, তারা ঘৃণ্য, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৭৪। হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।

১٧٤- يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ○

১৭৫। অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে সুদৃঢ় রূপে ধারণ করেছে, ফলতঃ তিনি তাদেরকে স্বীয় করুণা ও কল্যাণের দিকে প্রবিষ্ট করবেন এবং স্বীয় সরল পথে পথ-প্রদর্শন করবেন।

١٧٥- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন-আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট পূর্ণ দলীল, ওযর, আপত্তি ও সন্দেহ দূরকারী প্রমাণাদি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট জ্যোতি (কুরআন কারীম) অবতীর্ণ করেছি, যার দ্বারা সত্যের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ইবনে জুরায়েজ প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝান হয়েছে। এখন যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করবে, তাঁর উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল হবে, তাঁকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তাঁরই দাসত্ব করবে, সমস্ত কাজ তাঁকেই সমর্পণ করবে এবং এও হতে পারে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর কিতাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে তাদের উপর তিনি স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, তাদের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং তাদেরকে এমন সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন যা না কোন দিকে বাঁকা থাকবে, না কোন জায়গা সংকীর্ণ হবে। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি পৃথিবীতে সরল ও সোজা পথের উপরে থাকে এবং ইসলামের পথে থাকে। আর পরকালে থাকে জান্নাতের পথে ও শান্তির পথে। তাফসীরের প্রারম্ভে একটি পূর্ণ হাদীস অতীত হয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা রয়েছে- আল্লাহর সরল ও সোজা পথ এবং তাঁর সুদৃঢ় রজ্জু হচ্ছে কুরআন কারীম।

১৭৬। তারা তোমার নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল- আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মরে যায় এবং তার ভগ্নী থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি দু' ভগ্নী থাকে তবে

١٧٦- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا

إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

তাদের উভয়ের জন্যে পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ এবং যদি তারা ভ্রাতা-ভগ্নী পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তবে পুরুষ দু' নারীর তুল্য অংশ পাবে, আল্লাহ তোমাদের জন্যে বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও, এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

হযরত বারা' (রাঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয় সূরা-ই-বারা'আত এবং আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয় يَسْتَفْتُونَكَ-এ আয়াতটি। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "আমি রোগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে দেখতে আসেন। তিনি অযু করে সেই পানি আমার উপর নিক্ষেপ করেন, ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি তাঁকে বলি! হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমিতো 'কালালা'। আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিভাবে বন্টিত হবে? সে সময় আল্লাহ তা'আলা ফরায়েযের আয়াত অবতীর্ণ করেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এ আয়াতটিই অবতীর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'মানুষ তোমাকে জিজ্ঞেস করে অর্থাৎ 'কালালা' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে'। প্রথমে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, 'কালালা' শব্দটি اَكِيْـل শব্দ হতে নেয়া হয়েছে যা চতুর্দিক হতে মাথাকে ঘিরে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে 'কালালা' ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পৌত্র না থাকে। আবার কারও কারও উক্তি এও আছে যে, যার পুত্র না থাকে। যেমন এ আয়াতে রয়েছেঃ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর সামনে যেসব জটিল প্রশ্ন এসেছিল তন্মধ্যে এটিও ছিল একটি। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার এ আকাঙ্খা রয়ে গেল যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সব ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন

অঙ্গীকার করতেন তাহলে আমরা ঐ দিকে প্রত্যাবর্তন করতাম। ঐগুলো হচ্ছে দাদা, কালালা এবং সুদের অধ্যায়সমূহ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 'কালালা' সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করেছি অন্য কোন মাসআলা সম্বন্ধে ততো প্রশ্ন করিনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার বক্ষে স্বীয় আঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করে আমাকে বলেনঃ "তোমার জন্যে গ্রীষ্মকালের আয়াতটিই যথেষ্ট যা সূরা-ই-নিসার শেষে রয়েছে।"

অন্য হাদীসে রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে আরও বেশী করে জেনে নিতাম তবে আমার জন্যে লাল উট পাওয়া অপেক্ষাও উত্তম হতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ কথার ভাবার্থ হয়তো এই হবে যে, আয়াতটি সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। রাসূলল্লাহ (সঃ) তাঁকে বুঝবার উপায় বলে দিয়েছিলেন এবং ওতেই যথেষ্ট হবে একথা বলেছিলেন, তাই তিনি ওর অর্থ জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 'কালালা' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কি এটা বর্ণনা করেননি?" তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত আবূ বকর (রাঃ) স্বীয় ভাষণে বলেনঃ "সূরা-ই-নিসার প্রথম দিকে ফারায়েযের ব্যাপারে যে আয়াতটি রয়েছে তা পুত্র ও পিতার জন্যে, দ্বিতীয় আয়াতটি স্বামী-স্ত্রী, বৈপিত্রীয় ভাইদের জন্যে এবং যে আয়াত দ্বারা সূরা-ই-নিসাকে সমাপ্ত করা হয়েছে ওটা সহোদর ভাই-বোনদের জন্যে। আর যে আয়াত দ্বারা সূরা-ই-আনফালকে শেষ করা হয়েছে তা হচ্ছে আত্মীয়দের জন্যে যে আতীয়তার মধ্যে 'আসাবা' চালু রয়েছে"। (তাফসীর-ই-ইবনে জারীর)

অর্থের উপর কালামের বর্ণনাঃ

এ আয়াতে هَلَكَ শব্দের অর্থ হচ্ছে مَاتَ অর্থাৎ মরে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া সমস্ত জিনিসই মরণশীল।" (২৮ঃ ৮৮) অন্য আয়াতে রয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ *

অর্থাৎ "এর উপর যা রয়েছে সবই মরণশীল, শুধু তোমার প্রভুর চেহারা অবশিষ্ট থাকবে যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহা সম্মানিত।" (৫৫ঃ ২৬-২৭)

এরপর বলা হচ্ছে–'তার পুত্র নেই'। এর দ্বারা কেউ কেউ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, 'কালালার' শর্তে পিতা না হওয়া নেই বরং যার পুত্র নেই সেই 'কালালা'। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে।

কিন্তু জমহূরের উক্তিই হচ্ছে সঠিক এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) -এরও সিদ্ধান্ত এটাই যে, 'কালালা' হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার পুত্র ও পিতা নেই এবং আয়াতের পরবর্তী শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

অর্থাৎ "যদি তার ভগ্নী থাকে তবে তার জন্যে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধাংশ ।" আর যদি বোনের সঙ্গে পিতা থাকে তবে পিতা তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দেবে। সবারই মত এই যে, ঐ অবস্থায় বোন কিছুই পাবে না। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, كلالة হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার পুত্র না থাকে এবং এটা প্রকাশ্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর যদি পিতাও না থাকে এবং এটাও দলীল দ্বারাই সাব্যস্ত হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তার পর। কেননা, পিতার বিদ্যমানতায় বোন অর্ধাংশতো পায়ই না, এমন কি সে উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিতা হয়।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় যে, একটি স্ত্রী লোক মারা গেছে। তার স্বামী ও একটি সহোদরা ভগ্নী রয়েছে। তখন তিনি বলেনঃ "অর্ধেক স্বামীকে দাও অর্ধেক ভগ্নীকে দাও।" তাঁকে এর দলীল জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ অবস্থায় এ ফায়সালাই করেছিলেন"। (মুসনাদ-ই-আহমাদ)

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে, যে মৃত ব্যক্তি একটি মেয়ে ও একটি বোন ছেড়ে যায় এর ব্যাপারে তাঁদের উভয়েরই ফতওয়া ছিল এই যে, ঐ অবস্থায় বোন বঞ্চিতা হয়ে যাবে, সে কিছুই পাবে না। কেননা, কুরআন কারীমের এ আয়াতে বোনের অর্ধাংশ

পাওয়ার অবস্থা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে। আর এখানে সন্তান রয়েছে। কিন্তু জামহূর এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, ঐ অবস্থাতেই নির্ধারিত অংশ হিসেবে মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং 'আসাবা' হিসেবে বোনও অর্ধেক পাবে।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আসওয়াদ (রঃ) বলেনঃ আমাদের মধ্যে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে এ ফায়সালা করেন যে, অর্ধেক মেয়ে পাবে ও অর্ধেক ভগ্নী পাবে। সহীহ বুখারীর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর মেয়ে, পৌত্রী ও বোনের ব্যাপারে মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক দেয়ার ফতওয়া দেন, অতঃপর বলেনঃ "হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কেও একটু জিজ্ঞেস করে এসো। সম্ভবতঃ তিনি আমার মতই ফতওয়া দেবেন।" কিন্তু যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় এবং সাথে সাথে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর ফতওয়াও তাঁকে শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তিনি বলেনঃ "তাহলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং সুপথ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে আমি গণ্য হবো না। জেনে রেখো এ ব্যাপারে আমি ঐ ফায়সালাই করবো যে ফায়সালা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) করেছেন। অর্ধেক দাও মেয়েকে, এক ষষ্ঠাংশ দাও পৌত্রীকে, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে গেল এবং যা অবশিষ্ট থাকলো তা বোনকে দিয়ে দাও।" আমরা ফিরে এসে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-কে এ সংবাদ দিলে তিনি বলেনঃ "যে পর্যন্ত এ আল্লামা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন সে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট এ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসো না।"

অতঃপর বলা হচ্ছে–'এ তার উত্তরাধিকারী হবে যদি তার সন্তান না থাকে।' অর্থাৎ ভাই তার বোনের মালের উত্তরাধিকারী হবে যদি সে 'কালালা' হয় অর্থাৎ যদি তার সন্তান ও পিতা না থাকে। কেননা, পিতার বর্তমানে ভাই কোন অংশ পাবে না। হ্যাঁ, তবে যদি ভাই-এর সঙ্গে অন্য কোন নির্দিষ্ট অংশ বিশিষ্ট উত্তরাধিকারী থাকে, যেমন স্বামী বা বৈপিত্রেয় ভাই, তবে তাকে তার অংশ দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট মালের উত্তরাধিকারী ভাই হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা ফারায়েযকে ওর প্রাপকের সঙ্গে

মিলিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ঐ পুরুষলোকের জন্যে যে বেশী নিকটবর্তী।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'বোন যদি দু'টো হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।' দু'য়ের বেশী বোনেরও একই হুকুম। এখান হতেই একটি দল দুই মেয়ের হুকুম গ্রহণ করেছেন। যেমন দু'য়ের বেশী বোনের হুকুম দু'টি মেয়ের হুকুম হতে নিয়েছেন যে আয়াতের শব্দগুলো নিম্নরূপঃ

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

অর্থাৎ "যদি তারা দু'য়ের উপর স্ত্রীলোক হয় তবে সে যা ছেড়ে যাবে তা হতে তাদের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ।"

অতঃপর বলা হচ্ছে– যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে প্রত্যেক পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। 'আসাবা'রও এ হুকুমই । তারা ছেলেই হোক বা পৌত্রই হোক অথবা ভাই হোক যখন তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই থাকবে তখন দু'জন নারী যা পাবে একজন পুরুষও তাই পাবে। আল্লাহ স্বীয় ফারায়েয বর্ণনা করছেন, স্বীয় সীমা নির্ধারণ করছেন এবং স্বীয় শরীয়ত প্রকাশ করছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।' আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কার্যের পরিণাম অবগত রয়েছেন, বান্দাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। প্রাপকের প্রাপ্য কি তা তিনি খুব ভালই জানেন।

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে কোন জায়গায় যাচ্ছিলেন। তাঁরা সফরে ছিলেন। হযরত হুযাইফা (রাঃ)-এর সোয়ারীর মাথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে উবিষ্ট সাহাবীর নিকটে ছিল এবং হযরত উমার (রাঃ)-এর সোয়ারীর মাথা হযরত হুযাইফা (রাঃ)-এর সোয়ারীর দ্বিতীয় আরোহীর নিকটে ছিল। এমন সময়ে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে এটা শুনিয়ে দেন এবং হযরত হুযাইফা (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে শুনিয়ে দেন। এরপর আবার যখন হযরত উমার (রাঃ) এটা জিজ্ঞেস করেন তখন হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ আপনি অবুঝ। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেমনভাবে

শুনিয়ে ছিলেন তেমনই আমিও আপনাকে শুনিয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি এর উপর কিছুই বেশী করতে পারি না।" তাই হযরত উমার ফারূক (রাঃ) বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনি প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু আমার নিকট তা প্রকাশিত হয়নি।" কিন্তু এ বর্ণনাটি মুনকাতা'। এ বর্ণনারই অন্য সনদে আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) তার এ দ্বিতীয় বার প্রশ্ন তাঁর খিলাফতের যুগে করেছিলেন।

অন্য হাদীসে রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "কালালার উত্তরাধিকার কিভাবে বন্টিত হবে"। সে সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। কিন্তু তিনি তাতেও পূর্ণভাবে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেননি বলে স্বীয় কন্যা ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খুশীর অবস্থায় তুমি এটা জিজ্ঞেস করে নিও।" অতএব হযরত হাফসা (রাঃ) একদা এরূপ সুযোগ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ "সম্ভবতঃ তোমার পিতা তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। আমার ধারণা তিনি এটা মনে রাখতে পারবেন না।" হযরত উমার (রাঃ) একথা শুনতে পেয়ে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহই (সঃ) যখন এ কথা বলেছেন তখন আমি ওটা জানতে পারি না।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে হযরত হাফসা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঝুঁটির উপর এ আয়াতটি লিখিয়ে দেন, অতঃপর হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ "উমার (রাঃ) কি তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন? আমার ধারণা যে তিনি এটা ঠিক রাখতে পারবেন না। তাঁর জন্যে কি গ্রীষ্ম কালের ঐ আয়াতটি যথেষ্ট নয় যা সূরা-ই-নিসায় রয়েছে?" ওটা হচ্ছেঃ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ-এ আয়াতটি। তার পরে জনগণ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন তখন ঐ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় যা সূরা-ই-নিসার শেষে রয়েছে এবং ঝুঁটি নিক্ষেপ করা হয়। এ হাদীসটি মুরসাল।

একদা হযরত উমার (রাঃ) সাহাবীগণকে একত্রিত করেন এবং ঝুঁটির একটি খণ্ড নিয়ে বলেনঃ "আজ আমি এমন একটা ফায়সালা করবো যে,

পর্দানশীন নারীরাও জানতে পারবে।" ঐ সময়েই ঘর হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে এবং সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক চলে যায়। তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "মহা সম্মানিত আল্লাহর যদি এ কাজ পূর্ণ করার ইচ্ছে থাকতো তবে তিনি অবশ্যই তা পূর্ণ করিয়ে দিতেন।" এর ইসনাদ সহীহ।

মুসতাদরিক-ই-হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "যদি আমি তিনটি জিজ্ঞাস্য বিষয় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে নিতাম তবে তা আমার নিকট লালবর্ণের উট পাওয়া অপেক্ষাও পছন্দনীয় হতো। প্রথম হচ্ছে এই যে, তাঁর পরে খলীফা কে হবেন? দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, যেসব লোক যাকাতকে স্বীকার করে বটে কিন্তু বলে–আমরা আপনার নিকট আদায় করবো না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হালাল কি না? তৃতীয় হচ্ছে 'কালালা' সম্বন্ধে"। অন্য হাদীসে যাকাত আদায় না করার স্থলে সুদের মাসআলার বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "হযরত উমার (রাঃ)-এর শেষ যুগে আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ 'কথা ওটাই যা আমি বলেছি।' আমি জিজ্ঞেস করি–ওটা কি? তিনি বলেন كَلَالَةٌ তাকেই বলে যার সন্তান না থাকে।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "كَلَالَةٌ -এর ব্যাপারে আমার ও হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং কথা ছিল ওটাই যা আমি বলছিলাম।" হযরত উমার (রাঃ) সহোদর ভাইদেরকেও বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে এক তৃতীয়াংশে অংশীদার করতেন যখন তারা একত্রিত হতো। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর বিপরীত ছিলেন। তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে যে, মুসলমানদের খলীফা হযরত উমার (রাঃ) একবার দাদার উত্তরাধিকার ও 'কালালা'র ব্যাপারে এক টুকরো কাগজে কিছু লিখেছিলেন। তারপর তিনি ইসতিখারা (লক্ষণ দেখে শুভাশুভ বিচার) করেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতে থাকেনঃ "হে আমার প্রভু! আপনার জ্ঞানে যদি এতে মঙ্গল নিহিত থাকে তবে তা আপনি চালু করে দিন।"

অতঃপর যখন তাঁকে আহত করা হয় তখন তিনি ঐ কাগজ খণ্ডকে চেয়ে নিয়ে লিখা উঠিয়ে ফেলেন। জনগণ জানতে পারলো না যে, তাতে কি লিখা

ছিল। অতঃপর তিনি নিজেই বলেনঃ “আমি ওতে পিতামহ ও ‘কালালা’র কথা লিখেছিলাম এবং আমি ইসতিখারা করেছিলাম। তারপরে আমার ধারণা হয় যে, তোমরা যার উপরে ছিলে তার উপরেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেই।” তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “এ ব্যাপারে আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর বিরোধিতা করায় লজ্জাবোধ করছি।”

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর উক্তি ছিলঃ ‘কালালা’ ঐ ব্যক্তি যার পিতা ও পুত্র না থাকে। এর উপরেই রয়েছেন জমহূর-ই-সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন এবং আইম্মা-ই-দ্বীন। ইমাম চতুষ্টয় ও সপ্ত ধর্মশাস্ত্রবিদেরও এটাই মাযহাব। পবিত্র কুরআনেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ তা‘আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।” আল্লাহ তা‘আলই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ঃ
'নিসা'র তাফসীর
সমাপ্ত

সূরাঃ মায়িদাহ্ মাদানী سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াতঃ ১২০, রুকূ'ঃ ১৬) (اٰيَاتُهَا: ١٢٠، رُكُوْعَاتُهَا: ١٦)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল একটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেছেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আযরা নাম্নী উষ্ট্রীর লাগাম ধারণ করেছিলাম। তখন হঠাৎ তাঁর উপর সম্পূর্ণ সূরা মায়িদাহ্অবতীর্ণ হয়। এ সূরার ভারে তখন উষ্ট্রীর পায়ের উপরিভাগ ভেঙ্গে চুরমার হবার উপক্রম হয়। আসেম আল আইওয়াল বর্ণনা করেন যে, আমর তাঁর চাচার নিকট থেকে তাঁর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর চাচা একদা রাসূলল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর সূরা মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হয়। সূরা মায়িদাহ্র ভারে তাঁর বাহনের ঘাড় ভেঙ্গে চুরমার হবার উপক্রম হয়। আবার আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম (সঃ) যখন তাঁর বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁর উপর সূরা মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হয়, এর ফলে বাহনটি তাঁকে বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন। এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল একাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে একটু অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে সূরা 'মায়িদাহ্' ও সূরা 'আল-ফাত্হ' সর্বশেষ সূরা। এরপর ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটা একটা 'গারীব' ও 'হাসান' হাদীস। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা হলোঃ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (১১০ঃ ১)

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরিক' গ্রন্থে তিরমিযীর বর্ণনার ন্যায় আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ্ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) কেউই এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি একদা হজ্বে গমন করি। এরপর আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে

দেখা করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'হে যুবাইর (রাঃ)! তুমি কি সূরা মায়িদাহ্ পড়?' আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ "এটাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ শেষ সূরা। সুতরাং তোমরা তার মাধ্যমে যেসব বিষয় বৈধ হিসেবে পাও সেগুলোকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ কর। আর যেগুলোকে অবৈধ হিসেবে পাও সেগুলোকে অবৈধ হিসেবে গ্রহণ কর।" অতঃপর হাকিম এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু হাদীসটিকে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে স্থান দেননি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর সনদের মাধ্যমে মুআবিয়া ইবনে সালেহ হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং কিছু বেশী অংশ যোগ করেন। এ বেশী অংশটুকু নিম্নরূপঃ

যুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেনঃ "আমি একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনই তাঁর চরিত্র।" ইমাম নাসাঈও (রঃ) এ হাদীসটিকে আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দীর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ ؕ اُحِلَّتۡ لَـكُمۡ بَهِيۡمَةُ الۡاَنۡعَامِ اِلَّا مَا يُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى الصَّيۡدِ وَاَنۡتُمۡ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيۡدُ ○

পরম করুণাময় ও অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১। হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলো পালন কর। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমাদের শিকার করা জন্তুগুলো হালাল নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত হুকুম করে থাকেন।

٢- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলো, কুরবানীর পশুগুলোর গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলো এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্যে সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছে করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে করো না। আর তোমরা যখন ইহরামমুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। নেক কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

মা'আন অথবা আউফ হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "যখন তুমি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কথাটি শ্রবণ কর তখন তার জন্যে তোমার কানকে সতর্ক করে দিও। কারণ, হয়তো তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে কোন ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করছেন।" আবার যুহরী হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন তোমরা ঐ কাজ কর। কারণ, উক্ত সম্বোধনের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের

মধ্যে আল্লাহর নবীও (সঃ) আছেন। আবার খাইসুমা হতে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কুরআনে যে অবস্থায় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেই অবস্থায় পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে يَاَيُّهَا الْمَسَاكِيْنُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যায়েদ ইবনে ইসমাঈল তাঁর সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মূল রাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত। কারণ, পবিত্র কুরআনে একমাত্র হযরত আলী (রাঃ) ছাড়া অন্যান্য সকল সাহাবীকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ)-কে কুরআনের কোথাও ভর্ৎসনা করা হয়নি।" তাফসীরকারক ইবনে কাসীর মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি 'গারীব'। এ হাদীসের মধ্যে কতগুলো অশোভনীয় শব্দ রয়েছে এবং এর সনদ সম্পর্কেও মন্তব্য করার অবকাশ আছে। এ হাদীসের একজন রাবী ঈসা ইবনে রাশেদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রঃ) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি এবং হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী তাঁর হাদীস 'মুনকার'। ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত হাদীসের একজন রাবী আলী ইবনে বুজাইমা সম্পর্কে বলেন যে, যদিও তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী, কিন্তু তিনি শিয়া মতাবলম্বী। তাঁর থেকে বর্ণিত এ ধরনের হাদীসের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকায় এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, পবিত্র কুরআনে আলী (রাঃ) ছাড়া আর সকল সাহাবীকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আয়াতে সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আলাপ করার পূর্বে 'সাদকা' দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। একাধিক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন যে, একমাত্র আলী (রাঃ) ছাড়া আর কেউই এ আয়াত অনুযায়ী কাজ করেননি। আর এ সাদকা দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক পরবর্তীতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন— "তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আলোচনা করার পূর্বে সাদকা দিতে ভয় পাও? যখন তোমরা তা করনি তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

এ আয়াতের দ্বারা যে ভর্ৎসনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সে সম্পর্কেও মন্তব্যের অবকাশ আছে। কেননা, কেউ কেউ বলেছেন যে, সাদকা দেয়ার নির্দেশটি মুস্তাহাব ছিল, ওয়াজিব ছিল না। আর তাছাড়া কার্যকরী করার পূর্বেই তো আয়াতের নির্দেশকে তাদের জন্যে মওকূফ করা হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সাহাবীদের কারও নিকট থেকেই এ আয়াতের নির্দেশের বিপরীত

কোন কাজ প্রকাশ পায়নি। আর এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে হযরত আলী (রাঃ)-কে কখনই ভর্ৎসনা করা হয়নি বলে রাবী যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কেও মন্তব্যের অবকাশ আছে। কেননা, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়ে মুক্তিপণ গ্রহণের ব্যাপারে সূরা আনফালে যে আয়াতটি আছে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যারা মুক্তিপণ গ্রহণের ব্যাপারে মত দিয়েছিলেন তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এ আয়াতটি প্রযোজ্য। হযরত উমার (রাঃ) ছাড়া আর কেউই এ তিরস্কার হতে মুক্ত নন। অতএব, পূর্বাপর ঘটনা হতে বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীসটি দুর্বল। তবে আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।

মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমর ইবনে হাকামকে যখন নাজরানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন সেই চিঠিটি আমি পড়েছি। উক্ত চিঠিটি পরবর্তীকালে আবূ বকর ইবনে হাযমের নিকট ছিল। চিঠির প্রথমাংশ নিম্নরূপঃ

এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা–'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ওয়াদাগুলো পূরণ কর।' এরপর তিনি সূরা মায়িদাহ্র إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর' (৫ঃ ৪) পর্যন্ত লিখেন। আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবূ বকর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেই চিঠি যা তিনি আমর ইবনে হাযমকে দিয়েছিলেন। যখন তিনি তাঁকে ইয়ামান বাসীদেরকে জ্ঞান দান, তাঁর শিক্ষাদান এবং সাদকা আদায়ের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি এ চিঠিটি লিখে দিয়েছিলেন। উক্ত চিঠিতে তিনি তাঁকে কতগুলো উপদেশ এবং তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে কতগুলো নির্দেশ দিয়েছিলেন। চিঠির শুরুতে তিনি লিখেনঃ 'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পক্ষ হতে চিঠি।' অতঃপর তিনি সূরা মায়িদাহ্র নিম্নের আয়াত দ্বারা শুরু করেনঃ

'হে মুমিনগণ! তোমরা প্রতিজ্ঞাগুলো পূরণ কর।' যখন তিনি আমর ইবনে হাযমকে ইয়ামানে পাঠান তখন তিনি তাঁকে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন। উক্ত অঙ্গীকারনামায় তিনি তাঁকে তাঁর প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেন। কারণ আল্লাহ পরহেযগার ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ। তাফসীরকারক এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন عُقُودٌ শব্দের দ্বারা অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জাবির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে عُقُودٌ -এর অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারকগণ একমত। তিনি বলেন যে, কোন কিছুর

ব্যাপারে পরস্পরের শপথ বা অঙ্গীকারকে عُقُوْدٌ বলা হয়ে থাকে। আলী ইবনে আবূ তালহা (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, عُقُوْدٌ-এর দ্বারা عُهُوْدٌ বা অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ ঘোষণা করেছেন, যেসব বিষয় অবশ্যকরণীয় করেছেন এবং যেসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে وَلَا تَغُوزُوْا وَلَا تَنْكُثُوْا বলে সাবধান করেছেন, عهود দ্বারা সেসব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আরও কঠোর ভাষায় বলেনঃ "আল্লাহর সাথে ওয়াদা করার পর যারা উক্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং তিনি যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে.........তাদের জন্যে জঘন্য আবাসস্থল রয়েছে।" আবার যহ্হাক (রঃ) اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ পাক যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ করেছেন এবং তাঁর কিতাব ও নবী (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হতে তিনি বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলো করার ওয়াদা নিয়েছেন عُقُوْدٌ দ্বারা সেগুলোকে বুঝায়। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) عُقُوْدٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, عُقُوْدٌ দ্বারা ছয়টি বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। (ক) আল্লাহর সাথে ওয়াদা, (খ) শপথ করা, চুক্তি করা, (গ) অংশীদারী সংক্রান্ত ওয়াদা, (ঘ) ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ওয়াদা, (ঙ) বিবাহ্ বন্ধন এবং (চ) কসম খাওয়া। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) বলেন যে, عُقُوْدٌ বলতে পাঁচটি বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। ওগুলোর একটি হচ্ছে অজ্ঞতার যুগে কৃত চুক্তিনামা। আর অন্যটি হচ্ছে অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উক্ত স্থানে অবস্থানকালেও উক্ত বস্তু গ্রহণ করা বা না করার কোন ইখতিয়ার ক্রেতা বা বিক্রেতার থাকে না। এ মতে যারা বিশ্বাসী তারা اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ দ্বারা তাঁদের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এ আয়াতটি উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায়ও চুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত ও অবশ্যপালনীয় করার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায়ও বস্তু গ্রহণ করা না করার ইখতিয়ারকে অস্বীকার করে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর মত। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে গৃহীত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্বপর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার বস্তু গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার আছে।" সহীহ বুখারীতে অন্যভাবেও হাদীসটি এসেছে। তা নিম্নরূপঃ

"যখন দু'জন লোক ক্রয়-বিক্রয় করে তখন বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্বপর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বস্তুটি গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার আছে।" তাফসীরকারক ইবনে কাসীর (রঃ) মন্তব্য করেন যে, এ হাদীসটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের পরেও উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায় বস্তুটি গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ারকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে প্রকাশ্য দলীল। উক্ত ইখতিয়ারের প্রশ্নটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে আসে। অতএব এই ইখতিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হওয়াকে অস্বীকার করে না, বরং চুক্তিকে আইনগতভাবে কার্যকরী করে। অতএব চুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা।

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, চতুষ্পদ জন্তু বলতে এখানে উট, গরু ও বকরীকে বুঝানো হয়েছে। আবুল হাসান, কাতাদা এবং আরও অনেকের এটাই মত। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আরবদের ভাষা অনুযায়ী চতুষ্পদ জন্তু বলতে এটাই বুঝানো হয়। ইবনে উমার (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যবেহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে ঐ মৃত বাচ্চার গোশ্ত খাওয়া মুবাহ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের সুনান গ্রন্থসমূহে বহু হাদীস এসেছে। যেমন আবূ দাউদ (রঃ), তিরমিযী (রঃ) এবং ইবনে মাজাহ (রঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা উট, গাভী এবং বকরী যবেহ করি। ওগুলোর পেটের মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চা পাই। আমরা কি তা ফেলে দেবো, না ভক্ষণ করবো? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা ইচ্ছে করলে তা খেতে পার। কেননা, তার মাকে যবেহ করাই হচ্ছে তাকেও যবেহ করা।" ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি 'হাসান' হাদীস। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মাকে যবেহ করাই হচ্ছে বাচ্চাকেও যবেহ করা।" এ হাদীসটিকে ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) একাই তাঁর হাদীস গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ আলী ইবনে আবি তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু, রক্ত এবং শূকরের মাংসকে বুঝানো হয়েছে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু এবং যে পশুকে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই

এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তবে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (৫ঃ৩)-এ আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ "তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে , মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, গলা টিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু"। যদিও এগুলো চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত তবুও উল্লিখিত কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এ জন্যে আল্লাহ বলেছেনঃ "তবে তোমরা যেগুলোকে যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ সেগুলো হালাল এবং যেগুলোকে মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে সেগুলোও হারাম।" অর্থাৎ উক্ত পশুগুলোকে এজন্যে হারাম করা হয়েছে যে, তাদেরকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না এবং হালাল পশুর সাথে আর যুক্ত করা যাবে না। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "তোমদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো হারাম।" অর্থাৎ এসব পশুর মধ্য হতে বিশেষ অবস্থায় কোন কোন পশুর হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত অতিসত্বর তোমাদের উপর অবতীর্ণ হবে।

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ কোন কোন ব্যাকরণবিদের মতে এ বাক্যটি حَالٌ হওয়ার কারণে হালাতে নাসাবীতে আছে। আন'আম বলতে উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং হরিণ, গাভী, গাধা প্রভৃতি বন্য পশুকে বুঝানো হয়। আর গৃহপালিত হালাল পশুগুলোর মধ্যে উক্ত পশুগুলোকে এবং বন্য হালাল পশুগুলোর মধ্য হতে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা পশুগুলোকে হারাম বলে পৃথক করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–আমরা তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করেছি। তবে জন্তুগুলো হতে যেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেগুলো হালাল নয়। আর এ নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যেই প্রযোজ্য যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হারাম বলে গ্রহণ করেছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেনঃ "তবে যে মৃতপ্রায় অথচ অন্যায়কারী ও সীমালংঘনকারী নয়, তার জন্যে অবৈধ জানোয়ার খাওয়া হালাল। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। অর্থাৎ উক্ত আয়াতের ন্যায় এখানেও আল্লাহ বলেনঃ আমরা যেভাবে সর্বাবস্থায় চতুষ্পদ জন্তুকে হালাল করেছি, ঠিক সেভাবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হারাম মনে কর। কারণ আল্লাহ পাকই এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি যা করা বা না করার নির্দেশ দেন সেগুলোর সবকিছুই হিকমতে পরিপূর্ণ। এজন্যেই তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত হুকুম করেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, شَعَآئِرَ শব্দের দ্বারা হজ্বের নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়েছে। আর মুজাহিদ বলেন যে, এর দ্বারা সাফা, মারওয়া, কুরবানীর পশু ও উটকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ পাক যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তুগুলোকে হালাল মনে করো না। এ জন্যে আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ "নিষিদ্ধ মাসগুলোকেও তোমরা অবমাননা করো না।" অর্থাৎ মাসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তোমরা এ মাসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার মত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার কর। যেমন অল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ হে নবী (সঃ)! তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল- ঐ মাসে যুদ্ধ করা বড় গুনাহ্। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র আরও বলেছেনঃ "আল্লাহ্র নিকট মাসের সংখ্যা ১২টি।" সহীহ্ বুখারীতে আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছিলেনঃ "আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিন আল্লাহ্ যামানাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছিলেন এখন তা সেরূপে ফিরে এসেছে। ১২ মাসে একটি বছর হয়। এর মধ্যে ৪টি মাস নিষিদ্ধ। তার মধ্যে ৩টি মাস পরস্পর সংযুক্ত। যেমন যুলকাদা, যুলহাজ্ব এবং মুহাররম। আর অন্যটি হলো মুজার গোত্র কর্তৃক কথিত রজব মাস। এ মাসটি জমাদিউস্সানী এবং শা'বান মাসের মাঝখানে অবস্থিত।" এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ মাসগুলোর এ জাতীয় সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ "তোমরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করো না।" মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, আবদুল করীম ইবনে মালিক আলজায্রী এবং ইবনে জারীরও এ মতই পোষণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, আয়াতটির নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে এবং উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলোতে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করা এখন বৈধ। কুরআনের নিম্নের আয়াতটি তাদের দলীলঃ

"যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।" এর অর্থ এই যে, মাসগুলোর অতীত সম্মান যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন তোমরা কাফিরদের সাথে সব সময় জিহাদ করতে থাক। এটা এখন তোমাদের জন্যে বৈধ হয়ে গেল। পবিত্র কুরআন এরপর আর কোন মাসকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। ইমাম আবূ জাফর এ পর্যায়ে আলেমদের ইজমার উল্লেখ করে বলেন যে, আল্লাহ্ পাক যে

কোন সময় এবং যে কোন মাসে জিহাদ করা বৈধ রেখেছেন। তিনি আলেমদের আর একটি ইজমার উল্লেখ করে বলেছেন যে, যদি কোন মুশরিক হারাম শরীফের যাবতীয় বৃক্ষের ছাল দ্বারা নিজেকে আবৃত করে এবং পূর্ব থেকে কোন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা প্রদান না করে থাকে তবে সে নিরাপত্তা পাবে না। এ বিষয়টি এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণন করা সম্ভব নয়।

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ অর্থাৎ তোমরা কা'বা গৃহের দিকে কুরবানীর পশু পাঠানো হতে বিরত থেকো না। কারণ এতে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কালাদা (চেইন) পরানো হতে বিরত থেকো না। কারণ এর দ্বারা এ পশুগুলোকে অন্যান্য পশু হতে পৃথক করা হয়। আর এর দ্বারা এটাও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলো কুরবানীর উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহে পাঠানো হয়েছে। ফলে মানুষ এ পশুগুলোর ক্ষতি করা হতে বিরত থাকে। আর পশুগুলোকে দেখে অন্যান্যরা এ জাতীয় পশু কুরবানী পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাকে তার অনুসরণকারীর অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়। অথচ অনুসরণকারীর পুরস্কার কোন অংশেই কম করা হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের সময় যুলহুলাইফাতে রাত্রি যাপন করেন। এ যুলহুলাইফাকে ওয়াদিউল আকীকও বলা হয়। অতঃপর তিনি সকাল বেলা তাঁর ৯ জন স্ত্রীর নিকট গমন করেন এবং গোসল শেষে খোশবু ব্যবহার করেন ও দু'রাকআত নফল নামায আদায় করেন। অতঃপর কুরবানীর পশুর চুটি ক্ষত করেন এবং ওর গলায় কালাদা (চেইন) পরান। এরপর হজ্ব এবং উমরার জন্যে তিনি ইহরাম বাঁধেন। তাঁর কুরবানীর পশুর সংখ্যা ছিল ষাটটির অধিক। তাদের গায়ের রং ও শারীরিক গঠন ছিল অতি উত্তম। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তবে সেটা তার অন্তরের তাকওয়া প্রকাশ করে।" কেউ কেউ সম্মান প্রদর্শন শব্দটির দ্বারা কুরবানীর পশুকে উত্তম স্থানে রাখা, ভাল খাওয়ানো এবং তাকে মোটা তাজা করানোর প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে কুরবানীর পশুর চোখ ও কানকে ভালভাবে লক্ষ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেনঃ وَلَا الْقَلَائِدَ দ্বারা জাহেলিয়া যুগের লোকদের মত কালাদা ব্যবহার করাকে হালাল মনে করো না। কারণ জাহেলিয়া যুগে হারাম শরীফের বাইরে বসবাসকারী

আরবরা যখন নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত অন্য মাসে তাদের গৃহ হতে বের হতো তখন তারা তাদের গলায় কালাদা স্বরূপ পশম ও চুল ব্যবহার করতো। আর হারাম শরীফের মুশরিক অধিবাসীগণ যখন তাদের গৃহ হতে বের হতো তখন তারা তাদের গলায় কালাদা স্বরূপ হারাম শরীফের গাছের ছাল ব্যবহার করতো। এর ফলে লোকেরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করতো। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা মায়িদাহ্র দু'টি আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে। একটি কালাদার আয়াত, আর অপরটি হচ্ছে– فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (৫ঃ ৪২)-এ আয়াতটি। ইবনে আউফ (রঃ) বলেনঃ আমি হাসান (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম– সূরা মায়িদাহ্র কি কোন অংশ মানসূখ বা রহিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ "না।" আতা (রঃ) বলেন যে, হারাম শরীফের অধিবাসীগণ বৃক্ষের ছাল দ্বারা কালাদা ব্যবহার করতো। ওটা দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ করতো, ফলে আল্লাহ পাক হারাম শরীফের বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মুতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ এ মত পোষণ করেন।

وَلَا آمِّينَ .... وَرِضْوَانًا-এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে যারা রওয়ানা হয় তাদের সাথে যুদ্ধ করা হালাল মনে করো না। কারণ, ঐ ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শত্রু হতে নিরাপত্তা লাভ করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়, তোমরা তাকে বাধা দিও না, বিরত রেখো না এবং কোন প্রকার কুৎসা রটনা করো না। কাতাদা, মুজাহিদ, আতা প্রমুখ মুফাস্সিরদের মতে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণের অর্থ ব্যবসা করা। পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী আয়াত لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ (২ঃ ১৯৮) দ্বারাও ব্যবসাকে বুঝানো হয়েছে। আর رِضْوَانًا শব্দের ব্যাখ্যায়-ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হজ্বে গমনকারী ব্যক্তিগণ হজ্বের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন। ইকরামা ও ইবনে জারীর প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এ আয়াতটি হাতিম ইবনে হিন্দ আল বাকরীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একদা সে মদীনার একটি চারণভূমি লুণ্ঠন করে এবং পরবর্তী বছর সে বায়তুল্লাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে বাধা দেয়ার মনস্থ করলে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। ইবনে জারীর আলেমদের ইজমার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোন মুশরিক ব্যক্তিকে যদি কোন মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান করা না হয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। যদিও সে বায়তুল্লাহ বা বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কেননা, উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ

মুশরিকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নাফরমানী, শিরক ও কুফরী করার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হয় তাকেও বাধা দেয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর আর কখনও কা'বা গৃহের নিকটবর্তী না হয়।" এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) নবম হিজরীতে যখন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে আমীরুল হজ্ব হিসেবে পাঠান তখন হযরত আলী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান এবং তাঁকে এ ঘোষণা করতে নির্দেশ দেন যে, মুসলমান ও মুশরিক একে অপর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এ বছরের পর যেন কোন মুশরিক হজ্ব করতে না আসে এবং কোন ব্যক্তি যেন উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, প্রথমে ঈমানদার ও মুশরিকগণ একত্রে হজ্ব করতো এবং আল্লাহ্ পাক কাফিরদেরকে বাধা প্রদান না করতে ঈমানদারদের প্রতি নির্দেশ দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (৯ঃ ২৮)-এ আয়াত দ্বারা কাফিরদেরকে হজ্ব করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ্ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ "যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে একমাত্র তারাই আল্লাহর ঘরকে আবাদ করবে।" অতএব উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা মুশরিকদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাতাদা বর্ণনা করেন যে, وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ -এ আয়াতটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। অজ্ঞতার যুগে যখন কোন ব্যক্তি হজ্বের উদ্দেশ্যে তার গৃহ হতে বের হতো তখন সে বৃক্ষের ছাল দ্বারা কালাদা পরিধান করতো। ফলে কেউ তাকে কষ্ট দিতো না। আবার ঘরে ফেরার সময় চুলের তৈরী কালাদা পরিধান করতো। এর ফলে কোন লোক তাকে কষ্ট দিতো না। ঐ সময় মুশরিকদেরকে হজ্ব করতে নিষেধ করা হতো না। আর মুসলমানদেরকে নিষিদ্ধ মাসসমূহে এবং কা'বা গৃহের আশে পাশে যুদ্ধ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতের নির্দেশকে আল্লাহর অপর আয়াত فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (৯ঃ ৫) দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে। ইবনে জারীর এ মত পোষণ করেন যে, وَلَا الْقَلَائِدَ দ্বারা 'যদি মুশরিকরা হারামের বৃক্ষের ছাল দ্বারা কালাদা ব্যবহার করে তবে তোমরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান কর'– এটাই বুঝানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এ জন্যেই যে ব্যক্তি এ নির্দেশের অবমাননা করতো আরবরা তাকে সর্বদাই লজ্জা দিতো। তিনি এ পর্যায়ে হত্যাকারীদের প্রতি একজন কবির ব্যাঙ্গোক্তির উল্লেখ করেছেন।

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, যখন তোমরা তোমাদের ইহরাম খুলে ফেল এবং মুক্ত হয়ে যাও তখন তোমাদের জন্যে পূর্বে ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল এখন তা হালাল করা হলো। অর্থাৎ এখন শিকার করা হালাল। হালাল হওয়ার এ নির্দেশটি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর আবার বৈধ ঘোষিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সঠিক মত এই যে, কোন বস্তু অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর বৈধ ঘোষিত হলে তা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বাবস্থা (বৈধতা) ফিরে পাবে। সুতরাং পূর্বে যা ওয়াজিব ছিল পরে তা ওয়াজিব হবে, মুস্তাহাব মুস্তাহাব হবে এবং মুবাহ মুবাহ হবে। কারও মতে নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের জন্যে এবং কারও মতে শুধু মুবাহ কাজের জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু এ উভয় মতেরই বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট আয়াত রয়েছে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি সেটাই সঠিক মত। আর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন উসুলবিদও এ মত পোষণ করেন।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ... ... الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যে জাতি তোমাদেরকে হুদায়বিয়ার বছর কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিয়েছিল, তোমরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম লংঘন করো না, বরং আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে প্রত্যেকের সাথে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন কর। আর পবিত্র কুরআনের আর একটি আয়াতও এ অর্থ বহন করে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে, বরং তোমরা ন্যায় বিচার কর। আর এটাই তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী।' অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের হিংসা-বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে। কারণ, যে ন্যায় বিচার করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, ওটা যে কোন অবস্থায়ই প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করে তবে তোমার উচিত হবে তার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করা। ন্যায়-নীতির উপরই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত। ইবনে আবি হাতিম যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মুশরিকগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হুদায়বিয়া প্রান্তরে কষ্টকর অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলীয় একদল মুশরিক কা'বা ঘর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

এমতাবস্থায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ "আমরা এ লোকগুলোকে কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেবো যেমন তাদের সাথীরা আমাদেরকে বাধা দিয়েছে।" তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। এখানে شَنَاٰنُ শব্দ দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষকে বুঝানো হয়েছে। এটাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের মত। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, কোন কোন আরব شَنَاٰنُ -এর نকে حَرْكَتْ-এর পরিবর্তে جَزْمْ দিয়ে পড়েছেন এবং আরবী কবিতায়ও এ জাতীয় পঠনের রীতি দেখা যায়। অবশ্য কোন ক্বারী এভাবে পড়েছেন কি-না তা আমাদের জানা নেই।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ .... وَالْعُدْوَانِ আল্লাহ পাক এ আয়াতের দ্বারা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে উত্তম কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কাজ পরিহার করে নৈকট্য ও পরহেযগারী অর্জন করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ, পাপ কাজ এবং অবৈধ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে নিষেধ করছেন। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ যে কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পরিহার করাকেই পাপ কাজ বলা হয় এবং عُدْوَان বা সীমালংঘন করার দ্বারা ধৈর্যের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা এবং নিজের ও অন্যের ব্যাপারে অবশ্যকরণীয় কাজের সীমালংঘন করাকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর যদিও সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয়।" তখন কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো আমরা বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে কি করে আমরা সাহায্য করবো?" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা প্রদান কর ও নিষেধ কর। আর এটাই তাকে সাহায্য করা হবে।" ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সেই ব্যক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তি হতে অধিক প্রতিদান পাবে যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না। এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে অন্য একটি সনদেও এসেছে। ইমাম তিরযিমীও (রঃ) হাদীসটিকে অন্য আর একটি সনদে তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। আবূ বকর আল বাযযার তাঁর হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে সৎকাজের প্রতি পথ-প্রদর্শন করে সে সৎকর্মকারীর ন্যায়

প্রতিদান পাবে।” ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসের অনুরূপ আর একটি সহীহ্ হাদীস আছে। তা হচ্ছে– “যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথে আহ্বান করে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সৎপথ যত ব্যক্তি অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতিদানের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। অথচ এ ব্যাপারে সৎপথ অনুসরণকারীদের প্রতিদান কমানো হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ অসৎ পথ যত লোক অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের অনুরূপ পাপ প্রদান করা হবে। অথচ এ ব্যাপারে অসৎ পথ অনুসরণকারীদের পাপ কোন অংশে কমানো হবে না।” ইমাম তিবরানী আবুল হাসান ইবনে সাখার হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে চলাফেরা করে, অথচ সে জানে যে, ঐ ব্যক্তি একজন অত্যাচারী, তাহলে সে ইসলাম হতে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হবে।”

৩। তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শুকর-মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কণ্ঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে; তবে যা তোমরা যবেহ্ দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসব কাজ পাপ। আজ কাফিরেরা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করনা; শুধু আমাকেই ভয় করো।

٣- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا
ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ
فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

دِيۡنَكُمۡ وَاَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِىۡ وَرَضِيۡتُ لَـكُمُ الۡاِسۡلَامَ دِيۡنًا‌ؕ فَمَنِ اضۡطُرَّ فِىۡ مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثۡمٍ‌ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ○

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

আল্লাহ পাক উল্লিখিত আয়াতে যে সমস্ত বস্তু খাওয়া অবৈধ তার বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত ঐ জানোয়ারকে বলা হয়, যে জানোয়ার যবেহ অথবা শিকার ব্যতীত নিজেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত পশু খাওয়া এ জন্যেই নিষিদ্ধ যে, তাতে শরীর ও দ্বীনের জন্যে ক্ষতিকর রক্ত থেকে যায়। তবে মৃত মাছ খাওয়া হালাল। কারণ মুআত্তায়ে মালিক, মুসনাদে শাফিঈ, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাউদ, জামেউত তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ ইবনে খুযাইমা এবং সহীহ ইবনে হাব্বানে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন যে, ওর পানি পবিত্র এবং ওর মধ্যেকার মৃত হালাল। এ সম্পর্কীয় একটি হাদীস সামনে রয়েছে।

اَلدَّمُ শব্দ দ্বারা প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ اَوۡ دَمًا مَّسۡفُوۡحًا (৬ঃ ১৪৬)-এর দ্বারাও প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। এটাই আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ)-এর মত। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাসকে প্লীহা ও কলিজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেনঃ "তোমরা তা খাও।" তখন লোকেরা বললোঃ 'ওটা তো রক্ত।' তিনি বললেনঃ "তোমাদের উপর শুধুমাত্র প্রবাহিত রক্তকেই হারাম করা হয়েছে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'শুধু প্রবাহিত রক্তকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।' ইমাম শাফিঈ (রঃ) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

"আমাদের জন্যে দু'টি মৃত জন্তু ও দু'প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দু'টি হলো মাছ ও ফড়িং এবং দু'প্রকার রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা।" এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ্, দারেকুতনী এবং বায়হাকীতেও বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে আসলামের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আবদুর রহমান একজন দুর্বল রাবী। হাফিয বায়হাকী বলেন যে, এ হাদীসটিকে ইসমাঈল ইবনে ইদরীস এবং আবদুল্লাহও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ দু'জনও দুর্বল রাবী। তবে তাদের দুর্বলতার মধ্যে কিছু কম বেশী আছে। সুলাইমান ইবনে বিলালও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী তবুও কারও কারও মতে এটি একটি মওকুফ হাদীস। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)। হাফিয আবূ জার আরাযীর মতে এ হাদীসটি মওকুফ হওয়া সঠিক। ইবনে আবি হাতিম সুদ্দী ইবনে আজলান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আহ্বান করার জন্যে প্রেরণ করেন এবং ইসলামের আহ্বানগুলো তাদের নিকট ব্যক্ত করার নির্দেশ দেন। আমি তাদের মধ্যে আমার কাজ করছিলাম। হঠাৎ একদিন তারা আমার নিকট এক পেয়ালা রক্ত নিয়ে উপস্থিত হলো এবং তারা সবাই মিলে ঐ রক্ত পান করার জন্যে প্রস্তুতি নিলো। তারা আমাকেও ঐ রক্ত পান করার জন্যে অনুরোধ করলো। তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের জন্যে আফসোস! আমি তোমাদের কাছে এমন এক ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি যিনি তোমাদের জন্য এ রক্তকে হারাম করেছেন। তখন তারা সকলে আমাকে সেই হুকুমটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন আমি তাদেরকে এ আয়াতটি পড়ে শুনালাম। হাফিয আবূ বকর তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সুদ্দী বলেন, আমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকি। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। একদিন আমি তাদেরকে আমাকে এক গ্লাস পানি পান করাতে বলি। কারণ আমি সে সময় অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তখন তারা বললোঃ "না, আমরা তোমাকে মৃত্যু পর্যন্তও পানি পান করাবো না।" আমি তখন চিন্তিত অবস্থায় ভীষণ গরমের মধ্যে উত্তপ্ত পাথরের উপর 'আবা' মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমন্ত অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি অতি সুন্দর একটি কাঁচের পেয়ালায় উত্তম সুমিষ্ট পানীয় নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হলো এবং আমাকে পেয়ালাটি দিলো। আমি তখন তা হতে পান করলাম এবং সাথে সাথেই জেগে

উঠলাম। জেগে দেখলাম যে, আমার কোন পিপাসা নেই, বরং এরপর আজ পর্যন্ত আমি কখনও পিপাসার্ত হইনি। হাকিম তাঁর মুসতাদরিক গ্রন্থে এ অংশটি বেশী বর্ণনা করেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন, এরপর আমি আমার সম্প্রদায়ের লোককে বলাবলি করতে শুনলামঃ "তোমাদের নিকট তোমাদের সম্প্রদায় হতে একজন সর্দার এসেছেন; অথচ তোমরা তাঁকে এক ঢোক পানিও প্রদান করলে না!" এরপর তারা আমার নিকট পানীয় দ্রব্য নিয়ে আসলো। তখন আমি বললাম, এখন আমার এর প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ আমাকে খাইয়েছেন এবং পানও করিয়েছেন। আমি তাদেরকে আমার খাবারপূর্ণ পেট দেখালাম। তারপর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো। কবি আ'শা তাঁর কবিতায় কত সুন্দরই না বর্ণনা করেছেনঃ "এবং তুমি কখনও ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে মৃত জন্তুর নিকট যেওনা এবং পশুর শরীরে আঘাত করে তা হতে নির্গত রক্ত পান করার উদ্দেশ্যে ধারাল অস্ত্র গ্রহণ করো না। আর তোমরা পূজার বেদীর উপর স্থাপিত কোন জন্তুকে খেওনা, মূর্তিপূজা করো না, বরং আল্লাহর ইবাদত কর।" কাসীদার এ অংশটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ তাফসীরকারক এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, গৃহপালিত এবং বন্য শূকর উভয়ই হারাম। শূকরের মাংস বলতে চর্বি এবং তার অন্যান্য অংশকে বুঝায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, لَحْمٌ শব্দের দ্বারা মাংসকে বুঝানো হয়। শূকরের চর্বি বা অন্যান্য অংশ কি করে গ্রহণ করা যেতে পারে? এর উত্তরে যাহেরী সম্প্রদায় বলেন যে, কুরআন মাজীদের অন্য একটি আয়াতে আছে–

اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ (৬ ঃ ১৪৬)

এখানে فَاِنَّهٗ-এর 'ہٗ'-এর দ্বারা خِنْزِيْر কে বুঝানো হয়েছে। আর خِنْزِيْر বলতে তার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই বুঝায়। কিন্তু এটা আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী সঠিক নয়। কারণ, আরবীতে ضَمِيْر বা সর্বনাম সব সময়ই مُضَاف-এর দিকে ফিরে, কখনও مُضَافُ اِلَيْهِ-এর দিকে না। আর এখানে مُضَاف হলো لَحْم শব্দটি। আসলে এর সঠিক উত্তর হলো এই যে, لَحْمٌ বা গোশ্ত বলতে আরবরা উক্ত জন্তুর প্রতিটি অঙ্গকেই গ্রহণ করে থাকে। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি খেলায় অংশগ্রহণ করে সে যেন তার হস্তকে শূকরের গোশ্ত ও তার রক্তে রঞ্জিত করলো।" এখানে শূকরের গোশ্ত ও রক্ত স্পর্শ করার প্রতি ঘৃণা পোষণ

করা হয়েছে। অতএব ওটা ভক্ষণ করা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ। এ হাদীস শূকরের গোশ্ত ও রক্তসহ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবৈধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ পাক মদ, মৃত, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়ঃ মৃতের চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কারণ মানুষ তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, চামড়াতে মালিশ করে এবং প্রদীপ জ্বালায়। তিনি উত্তরে বললেনঃ "ওগুলোও হারাম।" সহীহ বুখারীতে আবূ সুফিয়ানের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একদা রোম সম্রাট আবূ সুফিয়ানের নিকট জানতে চেয়েছিলেন –রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কোন্ কোন্ বিষয়ে নিষেধ করেছেন? তদুত্তরে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে মৃত ও রক্ত খেতে নিষেধ করেছেন।'

وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, এর দ্বারা যে জন্তুকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করা হয় তাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবকে তাঁর মহান নামের উপর যবেহ্ করা ওয়াজিব করেছেন। অতএব যখন তাঁর নির্দেশকে লংঘন করে মূর্তি বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের নামে যবেহ্ করা হয় তখন তা হারাম হবে। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত। তবে যদি কোন পশু যবেহ্ করার সময় ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ পড়া না হয় তবে উক্ত পশু হারাম বা হালাল হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে সূরা আন-আমের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে আবি হাতিম আবূ তোফাইল হতে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাঁর উপর চারটি বস্তু হারাম করা হয়েছিল। সেগুলো হলো মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গিত পশু। এ চারটি বস্তুকে কখনও হালাল করা হয়নি। বরং আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার পর হতেই এগুলো হারাম ছিল। ইসরাঈলীদের পাপের কারণে আল্লাহ পাক তাদের জন্যে কিছু কিছু হালাল বস্তুকে হারাম করে দিয়েছিলেন। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে হযরত আদম (আঃ)-এর যুগের ন্যায় নির্দেশ আসে এবং উল্লিখিত চারটি বস্তু ছাড়া সবকিছুই হালাল হয়ে যায়। কিন্তু তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে।

হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি 'গারীব'। ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেন যে, বানূ রেবা গোত্রের ইবনে ওয়ায়েল নামে এক ব্যক্তি এবং ফারাজদাকের পিতা গালিব উভয়েই একশটি করে উটের পা কাটার জন্যে বাজি

ধরে। কুফা শহরের উপকণ্ঠে একটি ঝর্ণার ধারে তারা তাদের উটগুলোর পা কাটা শুরু করে। তখন জনসাধারণ তাদের গাধা ও খচ্চরের পিঠে চড়ে উটের গোশ্ত নেয়ার জন্যে তথায় গমন করে। এ দেখে হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়ে বলতে শুরু করেনঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ উটগুলোর গোশ্ত খেওনা। কেননা, এগুলোকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।" হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটিও একটি 'গারীব' হাদীস। তবে আবূ দাউদের সুনানে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা এ হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরব বেদুঈনদের মত পরস্পর বাজি রেখে উটের পা কাটতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) আরও বলেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর এ হাদীসটিকে একটি 'মওকুফ' হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। ইমাম আবূ দাউদ ইকরামা হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খাবার খেতে নিষেধ করেছেন।

وَالْمُنْخَنِقَةُ –এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে যে জন্তুকে গলাটিপে মারা হয় অথবা যে জন্তু আকস্মিকভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাকে مُنْخَنِقَةٌ বলা হয়। যেমন কোন পশুকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলে ছুটাছুটি করার ফলে গলায় দড়ির ফাঁস লেগে যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তবে তা খাওয়া হারাম। আর الْمَوْقُوْذَةُ শব্দের দ্বারা ঐ মৃত জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যাকে ভারী অথচ ধারাল নয় এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে মারা হয়েছে। যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে জন্তুকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে মারা হয় তাকে مَوْقُوْذَةٌ বলা হয়। কাতাদা বলেন যে, জাহেলি যুগের লোকেরা লাঠি দ্বারা আঘাত করে পশু মেরে খেতো। হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এক পার্শ্বে ধারাল এবং অপর পার্শ্বে ধারহীন এ জাতীয় এক প্রকার প্রশস্ত অস্ত্র দ্বারা শিকার করি। এ শিকার খাওয়া কি জায়েয?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "যদি ওটা ধারাল পার্শ্ব দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে তা খাওয়া জায়েয। আর যদি ওটা ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায় তবে তা অপবিত্র এবং তা খাওয়া জায়েয নয়।"এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ধারহীন

অস্ত্র এবং ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শিকার করা জন্তুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি ধারাল অংশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া জায়েয করেছেন এবং ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়া নাজায়েয করেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত। তবে যদি ক্ষত না করে শুধু অস্ত্রের ভারত্বের দ্বারা কোন জন্তু নিহত হয় তবে তা হারাম বা হালাল হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ইমাম শাফিঈ উভয় মতই পোষণ করেন। তাঁর এক মতানুযায়ী উল্লিখিত হাদীসের আলোকে এ জন্তুটি হালাল নয়। অন্য মতানুযায়ী কুকুর দ্বারা শিকার করা জন্তু খাওয়া যেহেতু হালাল, সেহেতু ভারী অস্ত্র দ্বারা শিকার করা জন্তুকে খাওয়াও হালাল। এ বিষয়টি নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ

যদি শিকারী কুকুরকে শিকারের জন্যে পাঠানো হয় এবং সে ক্ষত না করে ভারত্বের দ্বারা অথবা আঘাতের দ্বারা তাকে হত্যা করে তবে তা হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপার আলেমদের দু'টি মত আছে। এক মতানুসারে তা খাওয়া হালাল। কারণ কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে– "কুকুর তোমাদের জন্যে যা শিকার করে আনে তোমরা তা খাও।" এ আয়াতটি ক্ষত করা বা না করা উভয় ধরনের শিকারকেই বুঝিয়েছে। ঠিক একইভাবে আদি ইবনে হাতিমের হাদীসেও এ জাতীয় নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এটা ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর মত। ইমাম নববী ও ইমাম রাফেয়ী প্রমুখ আলেমগণও ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর এ মতকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। তাফসীরকারক ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর كِتَابُ الْأُمِّ -এবং مُخْتَصَرُ নামক গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর কথা হতে এ জাতীয় নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত বুঝায় না। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থবোধক। তাঁর অনুসারীগণ এ ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন এবং উভয় দলই তাঁর বক্তব্যকে নিজ নিজ দলের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য আল্লাহ পাকই এ বিষয়ে সম্যক অবগত। তবে তাঁর এ বক্তব্যে উক্ত পশু হালাল হওয়ার প্রতি অতি সামান্য ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। আসলে এ জাতীয় পশু হালাল না হারাম এ প্রসঙ্গে তিনি খোলাখুলি কোন মন্তব্য করেননি। ইবনে সাব্বাগ হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনানুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ জাতীয় পশু হালাল। ইমাম আবূ জাফর ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারসী (রাঃ), আবূ হুরাইরা (রাঃ), সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ইবনে উমার (রাঃ)-এর মতে এ জাতীয় পশু হালাল। কিন্তু হাদীসের

সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি গারীব। কারণ তাঁদের পক্ষ হতে এ জাতীয় কোন প্রকাশ্য বক্তব্য নেই। ইবনে কাসীর ইবনে জারীরের এ রিওয়ায়াত সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন।

শিকারী কুকুর কর্তৃক ভার বা আঘাত দ্বারা নিহত পশু খাওয়া হালাল কি হারাম এ ব্যাপারে আলেমদের দ্বিতীয় মত হলো এই যে, ঐ পশু খাওয়া হালাল নয়। আর এটাই ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর আর একটি মত। ইমাম মুযানীও তাঁর এ মতকে সমর্থন করেন। ইবনে সাব্বাগও ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর এ দ্বিতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ জাতীয় পশু হালাল নয়। আর এটাই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মত। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মতে এ মতটি সঠিক হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ এটাই ইসলামী আইনের নীতিমালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইবনে সাব্বাগ এ মতের পক্ষে রাফে ইবনে খুদাইজের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাফে ইবনে খুদাইজ (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হবো। তখন কাছে কোন ছুরি থাকবে না। আমরা কি বাঁশের ধারাল অংশ দ্বারা কোন শিকারকে যবেহ করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যে অস্ত্র রক্ত প্রবাহিত করে এবং যে জন্তুকে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তোমরা তা খেতে পার।" এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, যদিও এ হাদীসটি একটি বিশেষ কারণে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও অধিকাংশ উসুলবিদ ও আইনবিদ হাদীসটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একদা মধুর তৈরী নাবীজ জাতীয় পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "যে সমস্ত পানীয় মানুষের মধ্যে মাতলামি এনে দেয় সেগুলো হারাম।" এ হাদীটি সম্পর্কে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খাস করে মধুর তৈরী পানীয় সম্পর্কেই এ মন্তব্য করেছেন। ঠিক এমনিভাবে উল্লিখিত হাদীসটিতে যদিও একটি বিশেষ যবেহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তথাপি এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন একটি মন্তব্য করেন যা উক্ত বিশেষ যবেহ্ এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য যবেহ্‌কে শামিল করে। কারণ আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সংক্ষিপ্ত অথচ

ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্য রাখার ক্ষমতা দান করেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যদি শিকারী কুকুর আঘাত বা তার ভারত্বের দ্বারা কোন পশুকে হত্যা করে অথচ এতে রক্ত প্রবাহিত না হয় তাহলে উক্ত পশু খাওয়া হালাল নয়। কারণ উপরোক্ত হাদীসে যে অবস্থায় পশুকে হালাল করা হয়েছে তার বিপরীত অবস্থায় তা নিশ্চয়ই হারাম হবে। এ হাদীস হতে কুকুরের শিকার করা পশু সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যবেহ্ করার অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁকে যবেহ করা পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়নি। এজন্যে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্য এক হাদীসে দাঁত ও নখের দ্বারা কোন পশু যবেহ করতে নিষেধ করেছেন। আর এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, দাঁত হাড়ের অনুরূপ এবং নখ দ্বারা অমুসলিম হাবসীরা যবেহ্ করতো। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে দু'টি বস্তু দ্বারা পশু যবেহ করতে নিষেধ করেছেন সে বস্তু দু'টো যবেহের অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ওটা নিশ্চয়ই যবেহকৃত পশুর প্রতি কোন ইঙ্গিত বহন করে না। অতএব পূর্ববর্তী হাদীসে কুকুরের শিকার পশু সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই। ইবনে কাসীর (রঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যে জন্তু আল্লাহর নামে যবেহ করা হয় তা খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে সেই অস্ত্র দ্বারাই তোমরা পশুকে যবেহ কর'– একথা বলেননি। অতএব এ হাদীসটি হতে একই সাথে দু'টি নির্দেশ পাওয়া যায়। একটি অস্ত্র সম্পর্কিত এবং অপরটি যবেহ্কৃত পশু সম্পর্কিত। অর্থাৎ পশুকে এমন অস্ত্র দ্বারা যবেহ করতে হবে যা রক্ত প্রবাহিত করে। কিন্তু তা দাঁত বা হাড় হওয়া চলবে না। উল্লিখিত হাদীস হতে কুকুরের শিকার সম্পর্কে ইমাম মুযানী এভাবে দলীল গ্রহণ করে থাকেন যে, হাদীসটিতে তীর দ্বারা শিকার করা পশু সম্পর্কে বলা হয়েছে–'যদি অস্ত্রের ধারহীন অংশের আঘাত দ্বারা শিকার করা পশু মারা যায় তবে তা খেয়ো না। আর যদি ধারাল অংশের আঘাতে মারা যায় তবে তা খাও।' কিন্তু কুকুর সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ সাধারণ মন্তব্যকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কারণ দু'টি ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারা শিকার করা হলেও নির্দেশটি শিকার করা পশু সম্পর্কিত। যেমন পবিত্র কুরআনে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে একটি মুমিন গেলাম আযাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'যেহার' সম্পর্কিত নির্দেশে শুধু গোলাম আযাদ করার কথাই বলা হয়েছে। এখানে যদিও এক জায়গায় মুমিন গোলামের কথা বলা হয়েছে এবং অন্য জায়গায় শুধু

গোলামের কথা বলা হয়েছে, তবুও উভয় ক্ষেত্রেই মুমিন গোলাম আযাদ করার অর্থই গ্রহণ করতে হবে। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মতে ইমাম মুযানীর এ মতটি সঠিক। বিশেষভাবে যাঁরা এ মতবাদের মূলনীতিকে গ্রহণ করেন তাঁদের জন্যে এ যুক্তিটি উত্তম বলে মনে হবে। সুতরাং যাঁরা এর বিরোধিতা করে থাকেন তাঁদের পক্ষে এ ব্যাপারে সঠিক ও যুক্তিসম্মত মত পেশ করা উচিত। ইবনে কাসীর (রঃ) ইমাম মুযানীর (রঃ) পক্ষে বলেনঃ আমরা জানি যে, হাদীসে এসেছে–'অস্ত্রের ধারহীন অংশের আঘাত দ্বারা মৃত শিকার খাওয়া হালাল নয়।' এ হাদীসের উপর কিয়াস করেও আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কুকুর তার ভারত্বের দ্বারা কোন শিকারকে হত্যা করলে তা খাওয়া হালাল হবে না। কারণ এ দু'টোই শিকারের অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লিখিত আয়াতটিতে مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (৫ঃ ৪) কুকুরের শিকার সম্পর্কে একটি সাধারণ নির্দেশ আছে। এখানে কোন শর্তের পশুর উল্লেখ করা হয়নি। আমরা কিয়াসের দ্বারা কুকুরের শিকারের প্রতি বিশেষ শর্ত আরোপ করছি। কারণ, এ জাতীয় অবস্থায় সাধারণ নির্দেশের পরিবর্তে কিয়াসের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এটাই চার ইমাম এবং অধিকাংশ আলেমের মত। ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মতেও এটা উত্তম মতবাদ। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (৫ঃ ৪) আয়াতটিতে একটি সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু উপরে আলোচিত মৃত শিকার শিং বা এ জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত অথবা দম বন্ধ হয়ে বা এ জাতীয় অন্য কোনভাবে মৃত জন্তু নির্দেশিত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তবে যে কোন অবস্থায় فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ (৫ঃ ৪) নির্দেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ শরীয়ত এ আয়াতের নির্দেশকে শিকারের ব্যাপারেই গ্রহণ করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আদি ইবনে হাতিম (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ 'যদি শিকার তীরের ধারহীন অংশের আঘাতে মারা যায় তবে তা অপবিত্র। কাজেই তোমরা তা খেয়ো না।' ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ আমাদের জানামতে এমন কোন আলেম নেই যিনি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য করে একথা বলেছেন যে, শুধু অস্ত্রের ধারহীন অংশ দ্বারা শিকার করা জন্তুই শিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শিং- এর আঘাতে মৃত জন্তু শিকারের নির্দেশের আওতায় পড়ে না। সুতরাং আলোচ্য মৃত শিকারকে যদি হালাল বলা হয় তবে এর দ্বারা সমস্ত আলেমের ইজমার বিরোধিতা করা হবে। অথচ ইজমার বিরোধিতা করা কারো মতেই জায়েয নয়, বরং অধিকাংশ আলেম এ ধরনের কাজকেই বিধি বহির্ভূত বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (৫ঃ ৪) -এ আয়াতটি আলেমদের ইজমা অনুযায়ী সাধারণ নির্দেশ বহন করে না। বরং এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র ঐ ধরনের জন্তুকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল। সুতরাং এর সাধারণ নির্দেশ হতে হারাম জন্তুগুলো বাদ পড়ে যায়। কেননা, শরীয়তের সাধারণ নির্দেশের দু'টি স্তর আছে, একটিতে সীমা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং অন্যটিতে কোন সীমা নির্ধারণ করা থাকে না। আর এ জাতীয় সাধারণ নির্দেশের বেলায় সীমা নির্ধারিত নির্দেশকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। অন্য আর একটি মতে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের শিকার মৃত জন্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ ধরনের শিকারের মধ্যে রক্ত ও যাবতীয় রস ওর ভেতরেই থেকে যায়। আর মৃত জন্তুও এ কারণেই হারাম হয়ে থাকে। সুতরাং কিয়াস অনুযায়ী উপরোক্ত শিকারও হালাল নয়। অন্য আর একটি মত এই যে, পবিত্র কুরআনের حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ আয়াতটি হারাম জন্তুর বর্ণনায় একটি 'মুহকাম' আয়াত। এর কোন হুকুম অন্য কোন আয়াতের হুকুম দ্বারা বাতিল হয় না। ঠিক এমনিভাবেই পবিত্র কুরআনের يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ (৫ঃ ৪)-এ আয়াতটি হালাল জন্তুর বর্ণনায় একটি মুহকাম আয়াত। মূলতঃ এ ধরনের আয়াতের নির্দেশের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আর এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে রয়েছে। যেমন তীর দ্বারা শিকার করা জন্তু সম্পর্কিত হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ হাদীসে যে জন্তু হালাল সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারাল অংশ দ্বারা যা শিকার করা হয় তা হালাল। কারণ তা পবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে যে জন্তু হারাম সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারহীন অংশ দ্বারা যে জন্তুকে শিকার করা হয়েছে তা হারাম। কারণ তা অপবিত্র। আর এটা অপবিত্র বস্তু হারাম সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশের একটি অঙ্গও বটে। অতএব কুকুর যে শিকারকে ক্ষত করে মেরে ফেলে তা হালাল সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। আর কুকুর যে শিকারকে আঘাতে বা ভারের দ্বারা মেরেছে তা শিং বা ঐ জাতীয় বস্তু দ্বারা মৃত জন্তু সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা হালাল নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুকুরের শিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কেন নির্দেশ দেয়া হয়নি? যেমন যদি কুকুর শিকারকে ক্ষত করে মেরে ফেলে তবে তা হালাল। আর যদি ক্ষত না করে মেরে ফেলে তবে তা হালাল নয়। তাফসীরকারক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ভার বা আঘাতের দ্বারা শিকারকে মেরে ফেলার উদাহরণ বিরল।

কারণ কুকুর সাধারণতঃ নখ বা থাবা অথবা এ দু'টো দ্বারাই শিকারকে হত্যা করে থাকে। সুতরাং কুকুরের শিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম দেয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। অথবা যদি কুকুর ভার বা আঘাতের দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তবে এর হুকুম ঐ ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট। কারণ সে জানে যে, এর হুকুম মৃতজন্তু, দম আটকিয়ে মৃতজন্তু, প্রহারে মৃতজন্তু, পতনে মৃতজন্তু এবং শিং-এর আঘাতে মৃতজন্তুর হুকুমেরই মত। তবে শিকারী কোন কোন সময় তীর বা ধারহীন অস্ত্রকে مِعْرَاضٌ ভুল বশতঃ বা খেলাচ্ছলে শিকারের গায়ে ঠিকমত লাগাতে পারে না। বরং অধিকাংশ সময়েই ঠিকভাবে শিকারের গায়ে লাগাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। শিকার ক্ষত না হয়ে অস্ত্রের চাপ বা আঘাতের ফলে মারা যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এ দু'ব্যাপারে বিস্তারিত হুকুম দান করেছেন। অবশ্য আল্লাহই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন। ঠিক এমনিভাবে কুকুর তার অভ্যাস বশতঃ কখনো কখনো শিকারকৃত জন্তুকে খেয়ে ফেলে। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ "যদি কুকুর শিকারকে খেয়ে ফেলে তবে তোমরা তা খেয়ো না। কারণ আমি ভয় করি যে, কুকুর তার নিজের জন্যেই ঐ জন্তুকে রেখে দিয়েছে।" হাদীসের এ বর্ণনাটি সঠিক। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থে হাদীসটি স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে কুকুরের শিকার সম্পর্কে এ নির্দেশটিকে কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশ হতে পৃথক করে বলা হয়েছে যে, কুকুর যদি তার শিকারের কোন অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা হালাল নয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাসান (রঃ), শা'বী (রঃ) এবং নাখঈরও (রঃ) এ অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ অভিমতও এটাই। ইবনে জারীর (রঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আলী (রাঃ), সাঈদ (রঃ), সালমান (রঃ), আবূ হুরাইরা (রাঃ), ইবনে উমার (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কুকুরের শিকার খাওয়া যাবে যদিও সে শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে। এমন কি সাঈদ (রঃ), সালমান (রঃ), আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও অন্যান্যদের মতে যদি কুকুর শিকারের এক টুকরা গোশ্ত ব্যতীত সবটুকু খেয়ে ফেলে তবুও ঐ গোশ্তের টুকরাটি খাওয়া যাবে। ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর পূর্ব মতও এটাই। ইমাম শাফিঈ (রঃ) তাঁর পরবর্তী নতুন অভিমতে কুকুরের শিকার সম্পর্কিত দু'টি অভিমতের প্রতিই

ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আবূ মনসুর ইবনে সাব্বাগ ও অন্যান্য শাফিঈ মতাবলম্বী ইমামগণ ইমাম শাফিঈ (রঃ) হতে তাঁর এ অভিমত বর্ণনা করেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) উত্তম ও জোরালো সনদ দ্বারা আবূ সা'লাবা আল খুশানী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলেছেনঃ "যদি তুমি কুকুরকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করে থাক তবে তুমি শিকারকে খাও, যদিও কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে এবং তোমার হস্ত তোমার প্রতি যা ফিরিয়ে দেয় তা খাও।" ইমাম নাসাঈ (রঃ) এ হাদীসটি আমর ইবনে শোআইবের সনদের দ্বারা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

আবূ সা'লাবা নামক এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলঃ "হে আল্লাহর রাসূল!......." ইমাম নাসাঈ (রঃ) হাদীসটির পরবর্তী অংশটুকু আবূ দাঊদ (রঃ)-এর রিওয়ায়াতের মতই বর্ণনা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর (রঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন কোন লোক তার কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং কুকুর শিকারকৃত জন্তুর কিছু অংশ খেয়ে নেয় তবে বাকী অংশ সে খেতে পারে।" ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ হাদীসটিকে হযরত সালমান (রাঃ) হতে 'মাওকুফ' হাদীস বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অধিকাংশ আলেম কুকুরের শিকার সম্পর্কিত নির্দেশের ক্ষেত্রে আদি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন এবং আবূ সা'লাবা প্রমুখের বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কোন কোন আলেম আবূ সা'লাবা বর্ণিত হাদীসকে এ অর্থে গ্রহণ করেছেন যে, কুকুর শিকার করার পর যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মালিকের অপেক্ষা করার পর ক্ষুধার তাড়নায় বা এ জাতীয় কোন কারণে শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে বাকী অংশটুকু খেতে কোন দোষ নেই। কেননা, এ অবস্থায় এ আশংকা করা যায় না যে, কুকুর শিকারকে তার নিজের জন্যেই গ্রহণ করেছে। তবে কুকুর যদি শিকার করা মাত্রই তা ভক্ষণ করতে শুরু করে তবে এ অবস্থায় বুঝা যাবে যে, সে শিকারকে তার নিজের জন্যেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে মহান আল্লাহই সম্যক অবগত।

শিকারী পাখী সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, এর শিকারের হুকুমও কুকুরের শিকারের ন্যায়। অধিকাংশ আলেমের মতে যদি শিকারী পাখী শিকার করে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা খাওয়া হারাম। কিন্তু অপর একদল আলেমের মতে তা খাওয়া হারাম নয়। শাফিঈ মতাবলম্বী ইমাম মুযানী

পাখীর শিকার সম্পর্কে এ অভিমত পোষণ করেন যে, শিকারী পাখী যদি শিকার করার পর শিকারের কোন অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা খাওয়া হারাম নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর মতও এটাই। তাঁরা এর কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, কুকুরকে যেমন মারপিট করে শিকার করা শিক্ষা দেয়া যায়, পাখীকে সেরূপভাবে শিকার করা শিখানো যায় না। আর তা ছাড়া শিকার খাওয়া ব্যতীত পাখীকে শিকার করা শিক্ষা দেয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এটা ধর্তব্য নয়। এ ছাড়া কুকুরের শিকার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু পাখীর শিকার সম্পর্কে শরীয়তে কোন নির্দেশ আসেনি। শেখ আবূ আলী তাঁর 'ইফসাহ্' গ্রন্থে লিখেছেনঃ যেহেতু আমরা শিকারী কুকুর কর্তৃক শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলার পরে ঐ শিকারকে হারাম বলে গণ্য করি, সেহেতু শিকারী পাখী কর্তৃক শিকারের কিছু অংশ খাওয়া হলে উক্ত শিকার হারাম হওয়ার ব্যাপারে দু'টি দিক রয়েছে। কিন্তু কাযী আবূ তাইয়্যেব আবূ আলী কর্তৃক এ বিশ্লেষণকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, ইমাম শাফিঈ (রঃ) কুকুরের ও পাখীর শিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহই সম্যক জ্ঞান রাখেন।

اَلْمُتَرَدِّيَةُ ঐ মৃত জন্তুকে বলা হয় যা পাহাড় বা কোন উঁচু স্থান হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের জন্তু খাওয়া হালাল নয়। আলী ইবনে আবি তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مُتَرَدِّيَةٌ ঐ জন্তুকে বলা হয়, যে পাহাড় হতে পড়ে মারা যায়। কাতাদার মতে এটা ঐ ধরনের জন্তু যা কূপে পড়ে মারা যায়। সুদ্দী বলেন যে, যে জন্তু পাহাড় হতে পড়ে অথবা কূপে পড়ে মারা যায় তাকেই مُتَرَدِّيَةٌ বলা হয়।

اَلنَّطِيْحَةُ ঐ জন্তুকে বলা হয় যা অন্য জন্তুর শিং-এর আঘাতে মারা যায়। যদি ওটা শিং দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তা হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং ঐ আঘাত যদি যবেহ করার স্থানেও লাগে তবুও ঐ ধরনের জন্তু খাওয়া হারাম। আরবী ভাষায় نَطِيْحَةٌ শব্দটি مَنْطُوْحَةٌ অর্থাৎ اِسْم مَفْعُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় এ ধরনের শব্দ অধিকাংশ সময় 'ة' ব্যতীতই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা عَيْنٌ كَحِيْلٌ অর্থাৎ সুরমা লাগান চোখ এবং كَفٌّ خَضِيْبٌ অর্থাৎ খেযাব লাগান হস্ততালু। আরবী ভাষায় এটা কখনও عَيْنٌ كَحِيْلَةٌ এবং كَفٌّ خَضِيْبَةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু উক্ত আয়াতের শব্দগুলোতে ' ة ' ব্যবহৃত হওয়া

সম্পর্কে কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন যে, উক্ত শব্দগুলো اِسْمٌ-এর স্থানে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ওর শেষে تَانِيْث -এর ة ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরবরা বলে থাকে طَرِيْقَةٌ طَوِيْلَةٌ কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন যে, উক্ত শব্দগুলোতে تَاء تَانِيْث এ জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে যাতে দেখা মাত্রই বুঝা যায় যে, এ শব্দগুলো مُؤَنَّث বা স্ত্রীলিঙ্গ। ত عَيْنٌ كَحِيْلٌ ও كَفٌّ خَضِيْبٌ-এর বেলায় প্রথম দৃষ্টেই ওটা مُؤَنَّث বলে মনে হয়।

وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ -এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ বা কুকুর যে জন্তুকে আক্রমণ করে এবং ওর কিছু অংশ খেয়ে ফেলার কারণে ওটা মারা যায় তা খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং উক্ত আঘাত জন্তু যবেহ্ করার স্থানে লাগে তবুও আলেমদের ইজমা অনুযায়ী উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল নয়। যদি হিংস্র জন্তু ছাগল, উট, গরু বা এ জাতীয় কোন জন্তুকে মেরে কিছু অংশ খেয়ে ফেলতো তবুও অজ্ঞতার যুগের লোকেরা উক্ত জন্তুর বাকী অংশ খেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক মুমিনদের জন্যে ওটা হারাম করে দেন।

اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ অর্থাৎ দম আটকিয়ে পড়া, প্রহারে আহত, পতনে ও শিং-এর আঘাতে এবং জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তুকে যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় ও তাকে যবেহ করা যায় তবে তা খাওয়া হালাল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ "যদি এ ধরনের জন্তুগুলোকে তোমরা প্রাণ থাকা অবস্থায় যবেহ করতে সক্ষম হও তবে তোমরা সেগুলো খাও। কারণ ওগুলো পবিত্র।" সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং সুদ্দীও (রঃ) এ অভিমত পোষণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি এ ধরনের জন্তুগুলোকে যবেহ করার পর ওগুলো লেজ, পাখা ও চোখ নাড়ে তবে সেগুলো খাওয়া হালাল। ইবনে জারীর (রঃ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিং-এর আঘাতে মৃতপ্রায় জন্তুকে হাত বা পা নাড়া অবস্থায় পাও তবে ওকে যবেহ করে খাও। তাঊস, হাসান, কাতাদা, উবাইদ ইবনে উমাইর, যহ্হাক এবং আরও অনেকের মতে যদি যবেহ করার পর জন্তু তার কোন অংশকে নাড়ে এবং যবেহ্ করার পরও বুঝা যায় যে, ওর প্রাণ আছে তবে তা খাওয়া হালাল। এটাই অধিকাংশ ফিকাহবিদের মত। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলও (রঃ) এ অভিমতই পোষণ করেন। ইবনে ওয়াহ্হাব (রঃ) বলেন যে, একদা ইমাম মালিক (রঃ)-কে এমন বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করা হয়, যাকে কোন হিংস্র জন্তু আঘাত করার ফলে নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে পড়ে। তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমার মতে ওকে যবেহ করার প্রয়োজন নেই।" আশহাব বলেন যে, ইমাম মালিক (রঃ)-কে আরও জিজ্ঞেস করা হয়, যদি হিংস্র জন্তু কোন বকরীকে আঘাত করে তার পিঠকে ভেঙ্গে দেয় তবে ওটা মারা যাওয়ার পূর্বে কি ওকে যবেহ করা যাবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'যদি আঘাত ওর গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে আমার মতে ওটা খাওয়া ঠিক নয়। তবে যদি ওর দেহের কোন একাংশে আঘাত লেগে থাকে তাহলে আমার মতে ওটা খেতে কোন অসুবিধা নেই।' তাঁকে আরো প্রশ্ন করা হয়, কোন হিংস্র জন্তু যদি বকরীর উপর লাফিয়ে পড়ে তার পিঠ ভেঙ্গে ফেলে তবে ওটা খাওয়া কি হালাল? তিনি জবাবে বলেনঃ 'আমার মতে ওটা খাওয়া ঠিক নয়। কারণ এত বড় আঘাতের পরে ওটা জীবিত থাকতে পারে না।' তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়, যদি হিংস্র জন্তু উক্ত বকরীর পেটকে চিরে ফেলে অথচ ওর নাড়ি ভুড়ি বের না হয় তবে কি ওটা খাওয়া হালাল হবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ 'আমার মতে ওটা খাওয়া যাবে না।' আর এটাই ইমাম মালিক (রঃ)-এর মাযহাবপন্থীদের মত। ইবনে কাসীর (রঃ) ইমাম মালিক (রঃ)-এর উল্লিখিত মতামত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, উক্ত আয়াতটি একটি সাধারণ নির্দেশ বহন করে। ইমাম মালিক (রঃ) এ সাধারণ নির্দেশ হতে যে বিশেষ নির্দেশগুলো বের করেছেন। এর পক্ষে বিশেষ দলীল প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য আল্লাহ্ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রাফে ইবনে খুদাইজ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হবো। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে যদি কোন ছুরি না থাকে তবে বাঁশের ধারাল অংশ দ্বারা আমরা যবেহ করতে পারব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ যদি রক্ত প্রবাহিত করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তবে তোমরা ঐ জন্তু খাও। কিন্তু দাঁত না নখ দ্বারা কোন জন্তু যবেহ করা যাবে না। আর এর কারণ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এই বলি যে, দাঁত হচ্ছে হাড় স্বরূপ, আর নখ হচ্ছে আবিসিনিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র। দারেকুতনী (রঃ) যে হাদীসকে মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। হযরত উমার (রাঃ) হতে যে মওকুফ হাদীসটি বর্ণিত আছে ওটাই অধিক বিশুদ্ধ। হাদীসটি নিম্নরূপঃ 'কণ্ঠ ও লুব্বা যবেহ্ করার প্রকৃত স্থান এবং তোমরা প্রাণ বের হওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া করো না'।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ কণ্ঠ ও লুব্বার মধ্যে যবেহ করাই কি সঠিক? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ 'তার রানে আঘাত করলেও তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে।' সনদের দিক থেকে এটা একটা বিশুদ্ধ হাদীস। তবে হাদীসের নির্দেশটি ঐ বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যখন জন্তুটির কণ্ঠ বা লুব্বাতে যবেহ করা সম্ভবপর হবে না।

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ মুজাহিদ এবং ইবনে জুরাইদ বলেন যে, কা'বা শরীফের এলাকায় অবস্থিত একটি পাথরকে نُصُبٌ বলা হয়। ইবনে জুরাইদ আরও বলেন যে, সেখানে ৩৬০টি পূজার বেদী ছিল। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এ বেদীগুলোর নিকটে পশু বলি দিত এবং তারা পবিত্র কা'বা গৃহের নিকটবর্তী বেদীগুলোতে বলি দেয়া পশুগুলোর রক্ত ছিটিয়ে দিতো। তারা উক্ত পশুগুলোর গোশ্ত বেদীতে রেখে দিতো। আরও অনেক তাফসীরকারকও এ বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীর বলি দেয়া পশুগুলোকে খাওয়া হারাম করে দেন। এমনকি পূজার বেদীর উপর বলিদানকৃত পশুগুলোকে হত্যা করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও তা খাওয়া হারাম। কারণ এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এ জাতীয় শিরককে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। আর এটা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহ করা জন্তুর হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে।

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তীরের সাহায্যে অংশ বণ্টন করাও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। اَزْلَامٌ শব্দের একবচন زُلَمٌ যুলাম শব্দটি। কখনো কখনো একে যালামও পড়া হয়। অজ্ঞতার যুগে আরবরা এ তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ধারণ করতো। সেখানে তিনটি তীর থাকতো। একটিতে লিখা থাকতো اِفْعَلْ বা কর। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকতো لَاتَفْعَلْ বা করো না। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতো না। কারো কারো বর্ণনানুযায়ী প্রথমটিতে লিখা থাকতো اَمَرَنِىْ رَبِّىْ অর্থাৎ আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকতো نَهَانِىْ رَبِّىْ অর্থাৎ আমার প্রভু আমাকে নিষেধ করেছেন। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতো না। যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-সংকোচ আসতো তখন তারা এ তীর নিক্ষেপ করতো। যদি নির্দেশসূচক তীরটি উঠতো তখন তারা ঐ কাজটি করতো।

নিষেধসূচক তীরটি উঠলে তারা ঐ কাজটি থেকে বিরত থাকতো। আর শূন্য তীরটি উঠলে তারা পুনরায় তীর নিক্ষেপ করতো। اِسْتِقْسَامٌ শব্দটি আরবী ভাষায় তীরের দ্বারা অংশ অন্বেষণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটাই আবূ জাফর ইবনে জারীরের অভিমত। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, اَزْلَامٌ এমন ধরনের তীরকে বলা হতো যদ্দ্বারা তারা তাদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান বসরী এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকেও এই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্যদের মতে কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হুবল। ওটা পবিত্র কা'বা গৃহের ভেতরের কূপের মধ্যে পোঁতা ছিল। কা'বা শরীফের জন্যে যে সমস্ত উপঢৌকন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসতো তা উক্ত কূপে সংরক্ষিত রাখা হতো। হুবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হতো, এ তীরগুলোতে কিছু লিখা থাকতো। তাদের বিভিন্ন কাজে যখন দ্বিধা-সংকোচের সৃষ্টি হতো তখন তারা এ তীরগুলো নিক্ষেপ করতো এবং তীরের নির্দেশানুযায়ী কাজ করতো। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন তখন তিনি তথায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পূর্ণ মূর্তি দেখতে পান। তাদের দু'হাতে তীর রাখা ছিল। নবী করীম (সঃ) তখন বলেনঃ "আল্লাহ তাদেরকে (অজ্ঞতা যুগের আরবদেরকে) ধ্বংস করুন! কারণ তারা জানতো যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কখনও ভাগ্য নির্ধারণে এ তীর ব্যবহার করতেন না।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবূ বকর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের জন্যে রওয়ানা হন তখন সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জা'শাম তাদেরকে ধরে জীবিতাবস্থায় মক্কায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সুরাকা বলেন যে, তিনি তাঁরেদকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবেন কি না তা বের হওয়ার পূর্বেই তীর নিক্ষেপ করে জানবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা গেল যে, তীর টানার ফলে তাঁর অপছন্দনীয় বস্তুটি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাঁদের ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না। এরপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও তীর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর অপছন্দনীয় বস্তুটি প্রকাশ পেতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁদের অন্বেষণে বের হন। অবশ্য তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে মিরদুওয়াই হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করে এবং কোন বিশেষ ঘটনাকে অশুভ মনে করে সফর হতে বিরত

থাকে, সে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।' হযরত মুজাহিদ (রহঃ) اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ-এর ব্যাখ্যায় আরও বলেন যে, اَزْلَامٌ বলতে আরবদের জুয়াখেলার তীর এবং পারস্য ও রোমবাসীদের كَعَاب-কে বুঝানো হতো। তাফসীরকারক বলেন যে, মুজাহিদের এ মত সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আরবরা তীর দ্বারা জুয়া খেলতো এবং ইস্তাখারা করতো। আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানেন।

মহান আল্লাহ তীর এবং জুয়াখেলা এ দু'টিকে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। যেমন এ সূরার শেষাংশে আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা ওটা বর্জন কর। যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বাধা দিতে চায়। তবুও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" ঠিক এমনিভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা জঘন্যতা, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং একটি শিরকী কাজ। আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় তখন যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের বাঞ্ছিত কাজের জন্যে ইসতাখারা করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের কাজের জন্যে মঙ্গল কামনা করে। মুসনাদে আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সুনান গ্রন্থসমূহে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে যাবতীয় কাজে পবিত্র কুরআনের শিখানোর মত করে ইসতাখারা করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যখন তোমাদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়বে তখন তোমরা দু'রাকআত নফল নামায পড়ে নিয়ে নিম্নের দু'আটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ (تسمیه باسمه) خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ ـ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّلِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ ـ

অনুবাদঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে মঙ্গল কামনা করছি এবং আপনার ক্ষমতার ওসিলায় আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি। আপনার নিকট আপনার মহান দান যাচ্ঞা করছি। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম। আপনি জানেন আর আমি কিছুই জানি না। আপনি অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, এ কাজে (কাজের নাম বলতে হবে) আমার দ্বীন, দুনিয়া, ইহজীবন ও পরজীবন অথবা বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্যে কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে, তবে আপনি তা আমার জন্যে নির্ধারিত করে দিন এবং সহজ করে দিন, অতঃপর তাতে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! যদি আপনি জানেন যে, আমার এ কাজে আমার দ্বীন, দুনিয়া, ইহজীবন ও পরজীবনে কোন অমঙ্গল রয়েছে, তবে আমাকে তা হতে বিরত রাখুন এবং উক্ত কাজকেও আমা হতে দূরে রাখুন। আর যে কাজে আমার জন্যে মঙ্গল রয়েছে তা আমার জন্যে নির্ধারিত করে দিন এবং ঐ কাজে আমার সন্তুষ্টি দান করুন।” উক্ত দু'আয় বর্ণিত শব্দগুলো মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ “হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এ হাদীসটি একটি হাসান সহীহ এবং গারীব হাদীস। এ হাদীসটিকে আমরা শুধু আবুল মাওয়ালীর সনদের মাধ্যমে পাই।”

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ ... دِيْنِكُمْ আলী ইবনে আবি তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিররা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা তোমাদের ধর্মের সাথে তাদের ধর্মকে মিশিয়ে দেয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। আতা ইবনে আবি রাবাহ, সুদ্দী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান হতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। আয়াতের এ অর্থ বহনকারী একটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আরব উপদ্বীপের নামাযীগণ শয়তানের পূজা করবে, শয়তান এটা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে সে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকবে।” উক্ত আয়াতটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, মক্কার মুশরিকগণ মুসলমানদের মত রূপ ধারণ করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কারণ, ইসলামের নির্দেশাবলী এ দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্যেই তো আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ধৈর্য ধারণ করে, কাফিরদের বিরোধিতায় দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ

ছাড়া আর কাউকেও ভয় না করে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেছেনঃ “কাফিরগণ কর্তৃক তোমাদের বিরোধিতা করা হলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং তোমরা আমাকে ভয় কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো, তাদের উপর বিজয় দান করবো এবং তোমাদেরকে হিফাজত করবো যেন তারা তোমাদের ক্ষতি করতে না পারে। আর সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবো।”

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

এটা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি আল্লাহর মহান দান। কারণ, তিনি এ উম্মতের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার ফলে তারা অন্য বিধানের মুখাপেক্ষী নয়। এমনিভাবে তিনি তাদের নবী (সঃ)-কে ‘খাতামুন্নাবিয়্যীন’ বা সর্বশেষ নবী করেছেন এবং অন্য কোন নবীর মুখাপেক্ষী করেননি। আর তাদের নবীকে সমগ্র মানব জাতির ও বিশ্ববাসীর নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি যে বস্তুকে হালাল করেছেন সেটাই হালাল এবং যেই বস্তুকে হারাম করেছেন সেটাই হারাম। তিনি যে দ্বীনকে প্রবর্তন করেছেন ওটাই একমাত্র দ্বীন এবং তিনি যে সংবাদ প্রদান করেছেন ওটা ন্যায় ও সত্য তাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা বা বৈপরিত্য নেই। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ “(হে নবী!) তুমি যে সমস্ত সংবাদ দিয়েছ সেগুলো সত্য এবং যে সমস্ত আদেশ ও নিষেধ করেছ সেগুলো ন্যায় নীতি ভিত্তিক।” আল্লাহ এ উম্মতের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এজন্যেই তিনি বলেছেনঃ “আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছি এবং তোমাদের জন্যে আমার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছি। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছি।” সুতরাং তোমরা ওটাকে তোমাদের নিজেদের জন্যে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও। কেননা, ওটা সেই দ্বীন যাকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। আর এ দ্বীনসহ তিনি তাঁর সম্মানিত রাসূলদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসূল (সঃ)-কে পাঠিয়েছেন। এ দ্বীনসহ তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে অবতীর্ণ করেছেন। হযরত আলী ইবনে তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, দ্বীনের দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাঁর নবী ও মুমিনদেরকে এ আয়াতের দ্বারা এ সংবাদ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছেন। সুতরাং তাঁরা আর কখনও

এর চেয়ে অধিক বস্তুর মুখাপেক্ষী হবে না। আর আল্লাহ যখন এ দ্বীনকে একবার পরিপূর্ণতা দান করেছেন তখন তিনি আর কখনও তাকে অসম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবেন না। আল্লাহ একবার যখন ওর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তখন আর কখনও ওর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আসবাত সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হালাল এবং হারাম সম্পর্কিত আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তনের পরই ইন্তেকাল করেন। আসমা বিনতে উমাইস বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হজ্ব করেছিলাম। যখন আমরা সফরের অবস্থায় ছিলাম তখন একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় একটু নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বাহনটি তখন অহীর ভার সহ্য করতে না পারায় বসে পড়ে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীরের উপর আমার চাদরটি বিছিয়ে দিলাম।" ইবনে জারীর এবং আরও অনেকের মতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আরাফাত দিবসের ৮১ দিন পরে ইন্তেকাল করেন। ইবনে জারীর আনতারার উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন যে, উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ছিল হজ্বে আকবরের দিন। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত উমার (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমরা এ দ্বীন সম্পর্কে আরও বেশী কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এটা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখন তা অবনতির দিকে যেতে পারে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তুমি সত্য কথাই বলেছো।" এ হাদীসের অর্থের স্বপক্ষে অন্য একটি সহীহ হাদীস এসেছে, হাদীসটি নিম্নরূপঃ

"ইসলাম স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্বরই তা স্বল্প সংখ্যার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব এ স্বল্প সংখ্যক লোকের জন্যে সুসংবাদ।" ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তারিক ইবনে শিহাব হতে বর্ণনা করেন যে, একজন ইয়াহূদী হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থে একটি আয়াত আছে, তা যদি ইয়াহূদীদের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে একটি ঈদের দিন হিসেবে গণ্য করতাম।" তখন হযরত উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আয়াতটি কি?" উত্তরে ইয়াহূদী বলেঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ ..... الْاِسْلَامَ دِيْنًا -এ আয়াতটি। হযরত উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! যে দিনে ও যে সময়ে উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আমি উক্ত দিন ও সময় সম্পর্কে অবগত আছি। ওটা ছিল আরাফার দিন শুক্রবার সন্ধ্যার সময়।" ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের কিতাবুত্ তাফসীরে এ হাদীসটি তারিক হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, ইয়াহূদীগণ হযরত উমার (রাঃ) বললোঃ "আপনারা আপনাদের পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকেন যে, যদি ঐ আয়াতটি আমাদের ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা ঐ দিনকেই ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম।" তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছি। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন কোথায় ছিলেন সেটাও জানি। উক্ত দিনটি ছিল আরাফার দিন এবং আল্লাহর শপথ! আমিও সে সময় আরাফায় ছিলাম।" সুফিয়ান বলেনঃ "আরাফার দিনটি শুক্রবার ছিল কি-না এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে।" ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ সুফিয়ান যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন যে, শুক্রবারের কথাটি হাদীসের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কি-না, তবে এটা হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর অসতর্কতা। কারণ, তিনি সন্দেহ করেছেন যে, তাঁর শায়েখ তাঁকে শুক্রবারের কথা বলেছেন কি বলেননি। আর যদি তাঁর এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে থাকে যে, বিদায় হজ্বের বছর আরাফায় অবস্থান শুক্রবার দিন হয়েছিল কি-না? তবে আমার ধারণায় এ সন্দেহ সুফিয়ান সওরী কর্তৃক হতে পারে না। কারণ, এটা এমন একটি জানা ও প্রসিদ্ধ ঘটনা যাতে 'মাগাযী' ও 'সিয়র' লেখক এবং ফকীহ্গণ একমত। এ ব্যাপারে এতো অধিকসংখ্যক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। অবশ্য আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বহু সনদের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'ব (রঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেনঃ "যদি অন্য কোন উম্মতের উপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হতো তবে তারা ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে একটি ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতো এবং সেই দিনে তারা সকলেই একত্রিত হতো।" তখন হযরত উমার (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ওটা কোন্ আয়াত?"

তিনি উত্তরে বললেনঃ ...اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ-এ আয়াতটি। তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন ও সময় সম্পর্কে জানি। ওটা ছিল জুম'আ ও আরাফার দিন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, এ দু'দিনই আমাদের ঈদের দিন।" ইবনে জারীর (রঃ) আম্মারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ..اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন একজন ইয়াহূদী তাঁকে বলেনঃ "যদি এ আয়াতটি আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো তবে আমরা ওর অবতীর্ণ হওয়ার দিনকেই ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম।" উত্তরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "ওটা দু'টি ঈদের দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি ঈদের দিন এবং অপরটি জুম'আর দিন।" হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর আরাফার দিন সন্ধ্যার সময় অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। আমর ইবনে কায়েস আস্‌সাকুনী বলেন যে, তিনি মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ পূর্ণ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনেন। অতঃপর মুআবিয়া (রাঃ) বলেনঃ "এ আয়াতটি আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সঃ) সে সময় মাওকাফে অবস্থান করছিলেন। ইবনে জারীর (রঃ), ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) এবং তিবরানী (রঃ) তাঁদের সনদের মাধ্যমে হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার দিন তিনি মক্কা হতে হিজরত করেন, সোমবার দিন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন এবং সোমবার দিন তিনি বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ সোমবার দিন সূরা মায়িদাহ্ তথা ... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং সোমবারের যিকরের (ইবাদতের) অধিক মূল্য দেয়া হয়েছে। ইবনে কাসীর (রঃ) এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি 'গারীব' হাদীস এবং এর সনদ দুর্বল। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবার দিন তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছে, সোমবার দিন তিনি মক্কা হতে মদীনার দিকে হিজরত করেছেন এবং সোমবার দিন হাজরে আসওয়াদকে স্থাপন করা হয়েছে। তাফসীরকারক বলেনঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর এ বর্ণনায় সোমবার দিন সূরা মায়েদাহ অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ নেই। আল্লাহ্ পাক এ বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইবনে কাসীর (রঃ) আরও বলেনঃ সম্ভবতঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতে চেয়েছিলেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন তিন প্রকারের ঈদের দিন ছিল। কিন্তু বর্ণনাকারী ভুল বশতঃ اِثْنَيْنِ শব্দের দ্বারা সোমবারের অর্থ করেছেন। আল্লাহই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় সম্পর্কে আরও দু'টি অভিমত রয়েছে। একটি অভিমত হলো এই যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিন কারও জানা নেই। ইবনে জারীর এ অভিমতের স্বপক্ষে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। আর একটি মতানুযায়ী বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিদায় হজ্বের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জারীর এ হাদীসটি তাঁর সনদের মাধ্যমে রাবী ইবনে আসাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ ইবনে মিরদুওয়াই তাঁর সনদের মাধ্যমে আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর গাদিরে জুমের দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "আমি যার নেতা আলীও তার নেতা।" ইবনে মিরদুওয়াই এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় দেখা যায় যে, ঐদিনটি ছিল ১৮ই যিলহজ্ব। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের দিন। ইবনে কাসীর (রঃ) উপরোক্ত মতগুলোর কোনটিই শুদ্ধ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। বরং সঠিক ও সন্দেহাতীত অভিমত এই যে, আয়াতটি আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে। আর সেদিন ছিল জুম'আর দিন। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ), আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), ইসলামের প্রথম বাদশাহ্ মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ), কুরআনের ভাষ্যকার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আরাফার দিনটি ছিল জুম'আর দিন। শা'বী, কাতাদাহ্ ইবনে দিমাআহ্, শাহর ইবনে হাওশাব এবং বহু ইমাম ও আলেমেরও অভিমত এটাই। ইবনে জারীর তাবারীও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - অর্থাৎ আল্লাহ যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন, প্রয়োজনের তাকিদে যদি কোন লোক ওগুলো খেতে বাধ্য হয় তবে সেগুলো খেতে পারে। আল্লাহ এ ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কেননা, আল্লাহ জানেন যে, সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে

হারাম বস্তুকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। ইবনে হিব্বানের সহীহ গ্রন্থে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে যে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন তা পালন করাকে তিনি ঐরকম পছন্দ করেন যেমন তিনি তাঁর অবাধ্য না হওয়াকে পছন্দ করে থাকেন।

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর মুসনাদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতিকে গ্রহণ করলো না সে যেন আরাফার পাহাড় সমূহের সমান গুনাহ্ করলো। এজন্যেই ফিকাহ্বিদগণের মতে কখনও মৃত জন্তু খাওয়া ওয়াজিব এবং ওটা ঐ সময়, যখন হালাল বস্তু পাওয়া যায় না, আর ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। আবার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও মৃত জন্তু খাওয়া মুস্তাহাব এবং কখনও মুবাহ্। অবশ্য প্রয়োজনের তাকিদে হারাম বস্তু কি পরিমাণ গ্রহণ করা যাবে এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে যে পরিমাণ খেলে জান বাঁচে তার বেশী নয়। কারও মতে পেট ভরেও খাওয়া যাবে। আবার কারো কারো মতে পেট ভরে খাওয়াও যাবে এবং ভবিষ্যতের জন্যে রেখেও দেয়া যাবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আহকাম সম্পর্কিত কিতাবে পাওয়া যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় বিব্রত হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় মৃত জন্তু পেলে বা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার পেলে সে কি মৃত জন্তু বা শিকারকৃত জন্তু খেয়ে নেবে না অন্যের খাদ্য তার বিনানুমতিতেই খেয়ে নেবে এবং পরে মালিককে সেই পরিমাণ খাদ্য দিয়ে দেবে, এ ব্যাপারে আলেমদের দু'ধরনের অভিমত রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) হতে দু'ধরনের অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ সাধারণ লোকের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৃতজন্তু হালাল হওয়ার জন্যে তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ শর্ত ঠিক নয়, বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত খেতে বাধ্য ও মজবুর হয়ে পড়বে তখনই তার জন্যে তা খাওয়া জায়েয। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে আবূ ওয়াকিদ আল লায়সী হতে বর্ণনা করেন যে, একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমরা কখনও কখনও এমন স্থানে উপস্থিত হই সেখানে আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্যে মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "যখন তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় কোন খাদ্য

বা তরিতরকারী না পাও তখন তোমরা তা (মৃত জন্তু) খেতে পার।" হাদীসে উল্লিখিত সনদটি ইমাম আহমাদ একাই তাঁর গ্রন্থে এনেছেন। অবশ্য সনদটি সহীহ। কারণ, ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) সনদ সহীহ হওয়ার জন্যে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তা উক্ত শর্তগুলো পূরণ করে। এ হাদীসটি ইবনে জারীরও তাঁর সনদের মাধ্যমে ইমাম আওযায়ী হতে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে "মুরসাল" সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, যে সনদে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ থাকে না তাকে মুরসাল সনদ বলে। ইবনে জারীর তাঁর সনদের মাধ্যমে ইবনে আউন হতে বর্ণনা করেন, আমি হাসানের নিকট সামুরার কিতাব দেখতে পাই এবং তাঁর সম্মুখে ওটা পাঠ করি। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, সকাল বা সন্ধ্যায় খাদ্য পাওয়া না গেলে ঐ অবস্থাকে ক্ষুধার চরম অবস্থা বলে বিবেচনা করা যাবে। (আর এ অবস্থায় মৃত জন্তু খাওয়া যেতে পারে।) হাসান বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ কোন অবস্থায় হারাম বস্তু খাওয়া যায়? তিনি উত্তরে বলেনঃ "যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে দুধ অথবা অন্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে না পার তখন হারাম বস্তু (মৃত জন্তু) খেতে পার।" অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হালাল ও হারাম বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। উত্তরে তিনি বলেনঃ "তোমার জন্যে পবিত্র বস্তু খাওয়া হালাল এবং অপবিত্র বস্তু খাওয়া হারাম। তবে যদি তুমি কখনো কোন খাদ্য খেতে বাধ্য হও তাহলে হালাল বা হারাম বিবেচনা না করে খেতে পার। কিন্তু যে অবস্থায় তুমি তা পরিহার করে চলতে পার সে অবস্থায় তা খাওয়া হারাম।" ঐ ব্যক্তি তখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করলো, উক্ত অনন্যোপায় অবস্থাটা কি? যে অবস্থায় আমার জন্যে হারাম খাওয়া সিদ্ধ এবং ঐ অবস্থাই বা কি, যে অবস্থা আমাকে হারাম বস্তু খাওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখবে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "ঐ অবস্থাকে অনন্যোপায় অবস্থা বলা হয়, যে অবস্থায় তুমি কোন হালাল বস্তু না পাও অথচ তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলো হারাম বস্তু হিসেবে পেয়ে থাক। ঐ সময় তুমি ওগুলো দ্বারা প্রয়োজনমত তোমার পরিবার পরিজনকে খাওয়াও। তবে যখন ওগুলো পরিহার করে চলার অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন সেগুলো খাওয়া বন্ধ কর। আর অনুকূল অবস্থা বলতে ঐ অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থায় তুমি তোমার পরিজনকে শুধুমাত্র রাতের বেলায় সামান্য পরিমাণ পানীয় বস্তু দিতে পার। এ অবস্থায় তুমি হারাম বস্তু পরিহার কর। কারণ এটা তোমার জন্যে অনুকূল অবস্থা। তাই এ অবস্থায় কোন হারাম খাওয়া জায়েয নয়।" ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে নুয়ায়ী আল-আমেরীর মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে

তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্যে মৃত জন্তু খাওয়া হালাল? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমাদের খাদ্য কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ আমরা সকালে এক পেয়ালা এবং বিকালে এক পেয়ালা দুধ পান করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এ অবস্থাকে ক্ষুধার্ত অবস্থা বলা যায়।" তিনি এ অবস্থায় তাঁদেরকে মৃত জন্তু খেতে অনুমতি দেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) এ হাদীসটিকে একাই তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তারা সকাল ও বিকাল বেলায় যা খেতো তা তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিলনা বলেই তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে মৃতজন্তু খেতে অনুমতি দিয়েছেন। ফিকাহ্বিদদের একটি দল এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করে বলেন যে, এ জাতীয় লোকদের জন্যে পেট ভরেও হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয। শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্যে খাওয়া যেতে পারে, এরূপ শর্ত তাঁরা আরোপ করেননি। অবশ্য আল্লাহই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) তাঁর সনদের মাধ্যমে সামুরা হতে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, একটি লোক তাঁর পরিবার পরিজনসহ হাররা নামক স্থানে অবতরণ করে। তথায় এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রীকে হারিয়েছিল। সে এ লোকটিকে বললোঃ 'যদি তুমি আমার হারানো উটটি পাও তবে তোমার কাছে রেখে দিও।' এরপর সে উষ্ট্রীটি পেল এবং বহু খোঁজাখুজির পরেও মালিকের কোন সন্ধান পেলো না। ইত্যবসরে এ উষ্ট্রীটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তখন তার স্ত্রী তাকে বললোঃ 'তুমি উষ্ট্রীটিকে যবেহ কর।' কিন্তু সে যবেহ করতে অস্বীকার করলো এবং পরে উষ্ট্রীটি মারা গেল। মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী তাকে উষ্ট্রীটির চামড়া ছাড়াতে এবং ওর গোশত ও চর্বি শুকিয়ে নিতে বললো, যেন তারা তা খেতে পারে। তখন সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস না করে তা করতে অস্বীকার করলো। এর পর সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার কাছে কি এ পরিমাণ খাদ্য আছে যে, ওর ফলে তুমি এ মৃত উষ্ট্রীর গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পার?" উত্তরে লোকটি বললোঃ 'না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে তা খেতে অনুমতি দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এরপর উষ্ট্রীর মালিক ফিরে আসে এবং লোকটি তাকে সমস্ত খবর খুলে বলে। উষ্ট্রীর মালিক তাকে বলে, 'তুমি প্রথমেই কেন উষ্ট্রীকে যবেহ করে খাওনি?' সে উত্তরে বলেঃ 'আমি তোমার সামনে লজ্জিত হবো বলেই যবেহ করিনি।' এ হাদীসটিও ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) একাই বর্ণনা করেছেন। এ

হাদীসের আলোকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের অপর একটি দল দলীল গ্রহণ করেন যে, এ প্রকার লোকদের জন্যে হারাম বস্তু পেট ভরে খাওয়া, প্রয়োজনবোধে কিছু সময়ের জন্যে সঞ্চিত করা উভয়ই জায়েয। তবে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত না হয় তার জন্যেই এ প্রকারের হারাম বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ মহান আল্লাহ সূরা মায়িদাহর এ আয়াতে শুধুমাত্র পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে হারাম বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু সীমালংঘনকারীদের জন্যেও যে তা ভক্ষণ করা হারাম তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন সূরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

"যারা অনন্যোপায় অবস্থায় অন্যায়কারী, কিন্তু সীমালংঘনকারী নয় তাদের কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" এ আয়াত হতে ফিকাহ্‌বিদগণের একটি দল প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, যে ব্যক্তি সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, সে সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শরীয়তের শিথিলতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, পাপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে শিথিলতা প্রযোজ্য নয়। তবে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে–তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বল–পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত পশুপক্ষীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলোকে শিকারের জন্য পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

٤- يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে শরীর বা দ্বীন অথবা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর ও অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন। তবে প্রয়োজনবোধে আবার ঐগুলোকে হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেছেনঃ "আল্লাহ তোমাদের জন্যে বিশদভাবে হারাম বস্তুগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে যদি তোমরা অনন্যোপায় হয়ে পড় তবে ঐগুলো খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল।" এরপর মহান আল্লাহ কোন্ কোন্ বস্তু হালাল সে সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পবিত্র বস্তুগুলোকে তাঁর উম্মতের জন্যে হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্যে হারাম করেছেন। ইবনে আবি হাতিম তাঁর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একদা তাই গোত্রের আলী ইবনে হাতিম নামক একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ মৃতজন্তুকে হারাম করেছেন। এখন আমাদের জন্যে কোন বস্তুগুলো হালাল?" তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাঈদ বলেন যে, যবেহ্কৃত জন্তুকেই তাইয়েব বলা হয়। একদা ইমাম যুহরীকে "ওষুধ হিসেবে প্রস্রাব পান করা জায়েয কি না"-এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "ওটা পবিত্র নয়?" ইবনে আবি হাতিম এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে ওয়াহ্হাব বলেন যে, মানুষ যে সমস্ত পশু খায় না সেগুলো বেচা-কেনা করা জায়েয কি না সে সম্পর্কে একদা ইমাম মালিক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন যে, ওগুলোর বিক্রয়লব্ধ অর্থ পবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ কুকুর, চিতাবাঘ, বাজপাখী প্রভৃতি শিকারী জানোয়ার তোমাদের জন্যে যা শিকার করে আনে সেটাও তোমাদের জন্যে হালাল। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ এবং ইমামের এটাই অভিমত। আলী ইবনে আবি তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, শিকারী পশু বলতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, বাজপাখী এবং অন্যান্য পশুকে বুঝানো হয়। এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, খায়সামা, তাউস, মুজাহিদ, মাকহুল এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর হতেও এ ধরনের বর্ণনা এসেছে। হাসান হতে বর্ণিত আছে যে, বাজ ও 'সাকার' পাখী দু'টিও جَوَارِحُ -এর অন্তর্ভুক্ত। আলী ইবনে হুসাইন হতেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। মুজাহিদের মতে যে কোন ধরনের পাখীর শিকার খাওয়া মাকরূহ। তাঁর এ মতের স্বপক্ষে তিনি وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ -এ আয়াতটি

উল্লেখ করেন। সাঈদ ইবনে যুবাইর হতেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে জারীর এ মতটি যহ্হাক এবং সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর তাঁর সনদের মাধ্যমে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বাজ এবং অন্যান্য শিকারী পাখীর শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় তবে তা যবেহ করে খাওয়া হালাল, অন্যথায় তা হালাল নয়। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ অধিকাংশ আলেমের মতে শিকারী পাখীর শিকার শিকারী কুকুরের শিকারের ন্যায় খাওয়া হালাল। কারণ, শিকারী কুকুর যেমন শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে, অনুরূপভাবে পাখীও শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে। সুতরাং পাখী এবং কুকুরের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। এটাই ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্যদের অভিমত। ইবনে জারীরও এ মতকেই সমর্থন করেন। তাঁরা এ মতের স্বপক্ষে আদী ইবনে হাতিমের হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। আদী ইবনে হাতিম বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বাজ পাখীর শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেনঃ "যদি সে তোমার জন্যে শিকার করে নিয়ে আসে তবে তুমি তা খেতে পার।" ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর মতে কাল কুকুর দ্বারা শিকার করা জায়েয় নয়। তিনি প্রমাণ হিসেবে সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিনটি জিনিস নামায ভঙ্গ করে থাকে। গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর।" বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ লাল কুকুর হতে কালো কুকুরকে পার্থক্য করার কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ "কালো।" অন্য আর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করার জন্যে আদেশ দেন। পরে তিনি আবার বলেনঃ "সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই। শুধু কালো কুকুরগুলোকে তোমরা হত্যা কর।" جَوَارِحُ শব্দটি جَرْحٌ ধাতু হতে উদ্ভূত। جَرْحٌ -এর অর্থ হলো অর্জন করা। যেহেতু শিকারী জন্তুগুলো মালিকের জন্যে শিকারকে অর্জন করে নিয়ে আসে, সেহেতু এ জন্তুগুলোকে جَوَارِحُ বলা হয়ে থাকে। আর আরবের অধিবাসীরা এ কথাটি ঐ সময় বলে যে সময় কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্যে ভাল কিছু অর্জন করে নিয়ে আসে। ঠিক এমনিভাবে তারা বলে থাকে "فُلَانٌ لَا جَارِحَ لَهُ" অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির কোন অর্জনকারী নেই। পবিত্র কুরআনেও جَرْحٌ শব্দটি অর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ "তোমরা

দিবাভাগে ভাল বা মন্দ যাই কর, আল্লাহ তা সম্যক অবগত আছেন।"(৬ঃ ৬০) এ আয়াতের শানে নযূল প্রসঙ্গে ইবনে আবি হাতিম বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

আবূ রাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তখন বহু কুকুরকে হত্যা করা হলো। ফলে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যেগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো দ্বারা আমাদের কি ধরনের উপকার বৈধ?" তিনি তাঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে চুপ থাকলেন। তখন পবিত্র কুরআনের يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যখন কোন লোক তার কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠায় এবং পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করে, এমতাবস্থায় যদি কুকুর শিকার করে মালিকের জন্যে রেখে দেয় এবং তা না খায় তবে উক্ত শিকার খাওয়া যাবে।" ইবনে জারীর তাঁর সনদের মাধ্যমে আবূ রাফে' হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ভেতরে আসলেন না তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে আল্লাহর দূত! আমাদের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও কেন আপনি ভেতরে প্রবেশ করছেন না?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "যেই ঘরে কুকুর থাকে সেই ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ রাফে' (রাঃ)-কে মদীনার সকল প্রকার কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আবূ রাফে' বলেনঃ "আমি তখন সকল প্রকার কুকুরকে হত্যা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি এক বৃদ্ধা মহিলার একটি কুকুরকে হত্যা করতে উদ্যত হলাম। কুকুরটি তখন মহিলাটির নিকট গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে আশ্রয় প্রার্থনা করলো। এ দেখে আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। আমি তখন কুকুরটিকে হত্যা করা হতে বিরত থাকলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে এসে ব্যাপারটি বললাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে পুনরায় কুকুরটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। সুতরাং আমি ওকে হত্যা করি। সাহাবায়ে কিরাম তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যে জন্তুগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, ওগুলো দ্বারা আমরা কোন উপকার লাভ করতে পারি কি?"ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। হাকিম এ হাদীসটিকে তাঁর مُسْتَدْرَك গ্রন্থে স্থান

দিয়েছেন এবং হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এটি একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটিকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দেননি।

ইবনে জারীর ইকরামা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ রাফে' (রাঃ)-কে কুকুর হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি তখন কুকুর হত্যা করতে করতে মদীনার উঁচু এলাকায় উপস্থিত হন। সে সময় আসিল ইবনে আদী (রাঃ), সা'দ ইবনে খুসাইমা (রাঃ) এবং ওয়াইম ইবনে সায়েদা (রাঃ) নামক সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেনঃ "আমরা এ জন্তুগুলো হতে কি ধরনের উপকার গ্রহণ করতে পারি?" তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাকিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরজীও এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কুকুর হত্যা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

مُكَلِّبِيْنَ এটা عَلَّمْتُمْ - এর ضَمِيْر হতে حَال হয়েছে। এ অবস্থায় এটা বাক্যের কর্তার অবস্থা বর্ণনা করে। এটা جَوَارِحٌ -এরও حَال হতে পারে। এ অবস্থায় এটা বাক্যের কর্মের অবস্থা বর্ণনা করে। আর্থাৎ যে সমস্ত শিকারী পশুকে তোমরা শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ, আর তারা তাদের থাবা এবং নখ দ্বারা শিকার করে, তাদের শিকার তোমরা খেতে পারবে। সুতরাং এ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিকারী জন্তু যদি তার আঘাতের দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তবে তা খাওয়া জায়েয হবে না। এটা ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর দু'টি উক্তির একটি। একদল আলেমও এ অভিমত পোষণ করেন।

تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ জন্তু তখনই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে যখন তার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি গুণ পাওয়া যাবে। (ক) যখন তাকে শিকারের জন্যে পাঠানো হয় তখন সে ছুটে যায়, (খ) যখন তাকে ডাকা হয় তখন সাথে সাথে ফিরে আসে এবং (গ) শিকার করার পর ওটা সে নিজে ভক্ষণ না করে তার মালিকের জন্যে রেখে দেয়। আর আল্লাহ এজন্যেই বলেনঃ "শিকারী জন্তুগুলো তোমাদের জন্যে যা রেখে দেয় তা তোমরা খাও এবং শিকারী পশুগুলোকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর।" অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তবে ওর শিকার খাওয়া হালাল, যদিও সে শিকার করার পর ওকে হত্যা করে ফেলে। এ ব্যাপারে সকল আলেমই একমত। এ আয়াত শিকার সম্পর্কে যে

নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে, হাদীসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবূ ইবনে হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাতিম, (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের জন্যে পাঠাই এবং ঐ সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং ওকে শিকারের জন্যে পাঠাবার সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে থাক তবে ওটা তোমার জন্যে যা শিকার করে আনবে তা তুমি খেতে পার, যদিও কুকুর ওকে মেরেও ফেলে। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই জরুরী যে, ওটা শিকারের সময় অন্য কুকুর যেন ওর সাথে মিলিত না হয়। কেননা, তুমি তোমার কুকুরটিকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়েছো বটে, কিন্তু অন্য কুকুরটিকে তো বিস্মিল্লাহ বলে ছাড়া হয়নি।"

আমি বললাম, আমি ধারাল খড়ি দ্বারা শিকার করে থাকি। তিনি বললেনঃ "যদি ওটা তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে আহত করে তবে তুমি খেতে পার। কিন্তু যদি ভোতা দিক দিয়ে আহত করে তবে খেয়ো না। কেননা, ওকে ঝাপটা দিয়ে মারা হয়েছে।" অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে–যখন তুমি তোমার কুকুরটিকে ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর যদি ওটা শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমার নিকট পৌঁছার সময় ঐ শিকার জীবিত থাকে তবে ওকে যবেহ্ করবে। আর যদি কুকুরটাই ওকে মেরে ফেলে এবং তার থেকে কিছুই ভক্ষণ না করে তবে ওটাও তুমি খেতে পার। কেননা, কুকুরের ওটাকে শিকার করাই হচ্ছে ওকে যবেহ করা। আর এক বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দগুলোও রয়েছে– যদি ওটা ওকে ভক্ষণ করে তাহলে তুমি ওটা খেয়ো না। কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, কুকুরটি শিকারটিকে নিজের জন্যেই তো ধরে রাখেনি? এটাই জমহূরের দলীল। আর প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর সহীহ্ মাযহাবও এটাই যে, কুকুর যখন শিকারকে খেয়ে নেবে তখন ওটা সাধারণভাবেই হারাম হয়ে যাবে। এতে কোন ব্যাখ্যা নেই, যেমন হাদীসে রয়েছে। হ্যাঁ, তবে পূর্ববর্তী গুরুজনদের একটি দলের উক্তিও এটাই যে, ওটা সাধারণভাবেই হালাল। তাঁদের দলীল হচ্ছে নিম্নরূপঃ হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেনঃ তুমি (ঐ শিকার) খেতে পার, যদিও কুকুরটি ওর এক তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলে। হযরত সাঈদ ইবনে আবি আক্কাস (রাঃ) বলেনঃ কুকুর যদি দুই তৃতীয়াংশও খেয়ে ফেলে তবুও তুমি ওটা খেতে পার। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর এটাই নির্দেশ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "যখন তুমি বিসমিল্লাহ বলে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরটিকে শিকারের জন্যে ছেড়ে

দেবে তখন ওটা যে জন্তুটিকে তোমার জন্যে ধরে রাখবে, তুমি ওটা খাবে, কুকুরটি ওটা থেকে কিছু খেয়ে থাকুক বা না থাকুক।" হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। হযরত আতা' (রঃ) এবং হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। যুহরী (রঃ) রাবীআ'হ (রঃ)-এবং মালিক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) স্বীয় প্রথম উক্তিতে এ দিকেই গেছেন এবং নতুন উক্তিতেও ঐ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত ইবনে জারীর (রঃ)-এর একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন কোন লোক শিকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় কুকুরটিকে প্রেরণ করে, অতঃপর শিকারকে এমন অবস্থায় পায় যে, কুকুরটি ওকে খেয়ে ফেলেছে তখন যা অবশিষ্ট রয়েছে সে তা খেতে পারে।" এ হাদীসের সনদে ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে এবং বর্ণনাকারী সাঈদ (রঃ)-এর হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে শ্রবণ জানা যায়নি। আর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ওকে মারফূ' করেন না, বরং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর উক্তি নকল করেন মাত্র। এ উক্তিটি সঠিক বটে, কিন্তু এ অর্থেরই অন্যান্য মারফূ' হাদীসও বর্ণিত আছে। সুনানে আবি দাউদে হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সা'লাবা (রাঃ) নামক একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর রয়েছে। ওর শিকার সম্পর্কে ফতওয়া কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ 'ওটা যে জন্তু তোমার জন্যে ধরে আনে তা তোমার জন্যে হালাল।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ যবেহ করতে পারি বা না পারি, সর্বাবস্থাতেই কি (হালাল)? এবং কুকুরটি তা খেয়ে থাকে তবুও কি (হালাল)? তিনি জবাবে বললেনঃ 'হ্যাঁ, যদি খেয়ে থাকে তবুও (হালাল)।' তিনি আর একটি প্রশ্ন করলেনঃ আমি আমার তীর ও কামান দ্বারা শিকার করবো, এ ব্যাপারে ফতওয়া কি? তিনি জবাব দিলেনঃ "এমনকি যদি তুমি দেখতেও না পাও এবং অনুসন্ধানের পর পাওয়া যায় তবুও, যদি না তাতে অন্য কারও তীরের চিহ্ন থাকে।" তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করলেনঃ প্রয়োজনবোধে অগ্নিপূজকদের বরতন ব্যবহার করা আমাদের জন্যে কিরূপ? তিনি উত্তরে বললেনঃ "তুমি ওটা ধুয়ে নাও। অতঃপর তুমি তাতে খেতে ও পান করতে পার।" হাদীসটি সুনানে নাসাঈর মধ্যে রয়েছে। সুনানে আবি দাউদের দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছেঃ "যখন তুমি স্বীয় কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে পাঠাও তখন তুমি ওর শিকারকে খেতে পার, যদিও কুকুর তা থেকে কিছু খেয়েও নেয়। আর তোমার হাত যে শিকারকে

তোমার জন্যে নিয়ে আসে ওটাও তুমি খেতে পার।" এ দু'টি হাদীসের সনদ খুবই মজবুত ও উত্তম। অন্য হাদীসে আছে–তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যে শিকার তোমার জন্যে ধরে আনে, তুমি ওটা খেয়ে নাও। হযরত আদী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ যদি কুকুর তা থেকে কিছু খেয়ে নেয় তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, তবুও।" এসব আছার ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, শিকারী কুকুর শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেললেও বাকী অংশ কুকুরের প্রভু খেতে পারে। এসব হচ্ছে ঐসব লোকের দলীল, যাঁরা কুকুর ইত্যাদির ভক্ষণকৃত শিকারকে হারাম বলেন না। এ দু'টি দলের (যাঁরা সরাসরি হারাম বলেন বা হালাল বলেন) মাঝামাঝি আর একটি দল রয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, যদি কুকুর শিকার ধরার পর পরই তা খেয়ে ফেলে তবে বাকী অংশ হারাম। কিন্তু যদি শিকার ধরার পর স্বীয় প্রভুর জন্যে অপেক্ষা করে এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও প্রভুকে না পায়, তারপর ক্ষুধার তাড়নায় তা খেয়ে ফেলে তবে অবশিষ্ট অংশ হালাল। প্রথম কথাটির উপর প্রযোজ্য হয় হযরত আদী (রাঃ) সম্বলিত হাদীস। দ্বিতীয় কথাটির উপর প্রযোজ্য হযরত আবূ সা'লাবা (রাঃ) সম্বলিত হাদীস। এ দু'টি মতভেদ অতি উত্তম এবং এর দ্বারা দু'টি বিশুদ্ধ হাদীস একত্রিত হচ্ছে। উস্তাদ আবুল মায়ালী জুয়াইনী (রাঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'নিহায়া'র মধ্যে এ আশা করেছেন যে, যদি কেউ এর মধ্যে এ ব্যাখ্যা করে নেয়। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যে, জনগণই এর ব্যাখ্যা করে নিয়েছে। এ মাসআলায় চতুর্থাংশের মত এই যে, কুকুরের ভক্ষিত শিকার হারাম, যেমন নাকি হযরত আদী (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে। আর বাজ পাখীর ভক্ষিত শিকার হারাম নয়, কেননা সে তো খাবারের মাধ্যমেই শিক্ষা অর্জন করে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি পাখী স্বীয় মনিবের কাছে ফিরে আসে এবং শিকারকে হত্যা না করে, অতঃপর সে যদি পাখায় খামচা দেয় অথবা গোস্ত খায় তবে তুমি তা খেয়ে নাও। ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী ও হাম্মাদ ইবনে সুলাইমানও এ কথা বলেন। তাঁদের দলীল হযরত ইবনে আবূ হাতিমের বর্ণনা করা এ হাদীস যে, হযরত আদী (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমরা কুকুর এবং বাজের দ্বারা শিকার করে থাকি। এটা কি আমাদের জন্যে হালাল? তিনি (সঃ) বলেনঃ "যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী জন্তু তোমাদের জন্যে শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমরা ওকে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম করে থাক, তোমরা ঐ শিকার খেয়ে নাও।" তিনি পুনরায় বললেনঃ "তুমি যে কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়েছো, সে যে জন্তুকে ধরে রাখবে, তুমি তা খাও।" (আদী রাঃ বলেনঃ) আমি বললামঃ সে যদি ওকে মেরে ফেলে তবুও কি? তিনি উত্তর

দিলেনঃ "মেরে ফেলে তবুও। তবে শর্ত এই যে, যেন খেয়ে না থাকে।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ যদি ঐ কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও মিলিত হয়ে যায় তাহলে? তিনি জবাবে বললেনঃ "তাহলে তা তুমি খেয়ো না যে পর্যন্ত না তোমার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, তোমার কুকুরই ওকে শিকার করেছে।" আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ মানুষ তীর দ্বারা শিকার করে থাকে। ওর মধ্যে কোনটা হালাল? তিনি উত্তর দিলেনঃ "যে তীর আহত করে এবং তুমি ওটা ছাড়বার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে থাকো, ঐ শিকার তুমি খেতে পার।" প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের বেলায় না খাওয়ার শর্ত আরোপ করলেন, কিন্তু বাজ পাখীর বেলায় সেই শর্ত আরোপ করলেন না। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সাব্যস্ত হয়ে গেল। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ তোমাদের জন্তুগুলো যে হালাল জন্তুগুলো শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ঐ শিকারী জন্তুগুলোকে ছাড়বার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। যেমন হযরত আদী (রাঃ) ও হযরত সা'লাবা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। এজন্যেই ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ এ শর্ত গুরুত্বের সাথে আরোপ করেছেন যে, শিকারের জন্যে শিকারী জন্তুকে ছাড়বার সময় এবং তীর ছাড়বার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ অবশ্যই উচ্চারণ করতে হবে। জমহূরের প্রসিদ্ধ মাযহাব এটাই যে, এ আয়াত ও হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় অল্লাহর নাম নেয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্যে প্রেরণের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে নাও। তবে ভুলে গেলে কোন দোষ নেই।"কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা। যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমার ইবনে আবূ সালমা (রাঃ)-এর পালিতা মেয়েকে বলেছিলেনঃ 'আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাও।' সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এমন লোকেরা আমাদের নিকট গোশ্‌ত নিয়ে আসে যারা নওমুসলিম, তারা (জন্তু যবেহ্ করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে কি করে না তা আমাদের জানা নেই। আমরা সেই গোশ্‌ত খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা খেয়ে নাও।' মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ছয়জন সাহাবীর সাথে খানা খাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন বেদুঈন এসে তা হতে দু'গ্রাস খেয়ে নেয়। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ

"যদি লোকটি বিস্‌মিল্লাহ বলতো তবে এ খাদ্য তোমাদের সকলের জন্যেই যথেষ্ট হতো। তোমাদের কেউ যখন খানা খেতে বসবে তখন সে যেন বিস্‌মিল্লাহ বলে নেয়। যদি প্রথমে (বিস্‌মিল্লাহ বলতে) ভুলে যায়। তবে যখন স্মরণ হবে তখন যেন বলে بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ আল্লাহর নামে শুরু করছি এর প্রথমের জন্য ও শেষের জন্য।" এ হাদীসটিই মুনকাতা সনদে সুনানে ইবনে মাজার মধ্যেও রয়েছে। অন্য সনদে এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদ, জামেউত তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ এবং মুসনাদে আহমাদের মধ্যে রয়েছে। ইমাম তিরিমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ্ বলেছেন। জাবির ইবনে সাবীহ (রঃ) বলেনঃ 'আমি (একবার) হযরত মুসনা ইবনে আবদুর রহমান খুযাঈর সাথে (ওয়াসিত নামক জায়গা)-এর সফরে বের হই। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি খাদ্য খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলতেন এবং শেষ গ্রাসের সময় بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ বলতেন। তিনি আমাকে বললেন যে, খালিদ ইবনে উমাইয়া ইবনে মাখশা (রাঃ) নামক সাহাবী বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আহারের সময় বিসমিল্লাহ বলে না তার সাথে শয়তান খেতে থাকে। অতঃপর যখন সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তখন তার (শয়তানের) বমি হয়ে যায় এবং যতটা সে খেয়েছে তার সবই বেরিয়ে পড়ে।" (মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি) ইবনে মুঈন (রঃ) এবং নাসাঈ (রঃ) এ হাদীসের বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলেন বটে, কিন্তু আবূ ফাতহ ইযদী (রঃ) বলেন যে, এ বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ আমরা যখন নবী (সঃ)-এর সাথে আহারে বসতাম তখন খাদ্যে তাঁর হাত দেয়ার পূর্বে আমরা হাত দিতাম না। (একদা) আমরা তাঁর সাথে আহার করছিলাম, এমন সময় একটি মেয়ে পড়তে পড়তে আসলো, কেউ যেন তাকে ধাক্কা দিচ্ছিল। এসেই সে মুখে গ্রাস উঠিয়ে দিতে চাইলো কিন্তু নবী (সঃ) তার হাত ধরে নিলেন। এরপর এভাবেই একজন বেদুঈন আসলো এবং এসেই পাত্রে হাত দিতে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তারও হাতটি ধরে ফেললেন এবং বললেনঃ "যখন কোন খাদ্যের উপর বিসমিল্লাহ বলা হয় না তখন শয়তান ঐ খাদ্যকে নিজের জন্যে হালাল করে নেয়। সে আমাদের সাথে খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে এ মেয়েটির সাথে এসেছে, এমতাবস্থায় আমি তার হাত ধরে ফেলেছি। তারপর সে এ বেদুঈনের সাথে এসেছে। আমি তার হাতও ধরে ফেলেছি। যার হাতে আমর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ দু'জনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে রয়েছে।" [১]

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে নাসাঈতে রয়েছে।

সহীহ মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ মানুষ যখন বাড়ীতে প্রবেশের সময় ও খাদ্য খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তখন শয়তান (তার অধীনস্থদেরকে) বলে—"তোমাদের জন্যে না আছে রাত্রি কাটানোর জায়গা এবং না আছে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা।" আর যখন বাড়ীতে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না তখন শয়তান বলে—"তোমরা রাত্রি কাটানোর এবং রাত্রির আহারের জায়গা পেয়ে গেছো।" মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে অভিযোগের সুরে বললোঃ আমরা খাদ্য খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না, (এর কারণ কি)। তিনি উত্তরে বললেনঃ "সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খেয়ে থাক। তোমরা সবাই মিলিতভাবে খানা খাও এবং বিসমিল্লাহ বল। এতে আল্লাহ তোমাদের জন্যে (খাদ্যে) বরকত দান করবেন।"

৫। আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুগুলো হালাল রাখা হয়েছে, আর আহলে কিতাবের যবেহকৃত জীবও তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের যবেহকৃত জীবও তাদের জন্যে হালাল। আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী সাধ্বী নারীরাও (তোমরা জন্যে হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মহর) প্রদান কর, এরূপে যে, তোমাদের (তাদেরকে) পত্নীরূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর

٥- اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ
وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْ
هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ
مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ

عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ٥

না গোপন প্রণয় কর; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হালাল ও হারামের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সমুদয় পবিত্র বস্তু হালাল। তারপর তিনি ইয়াহূদ ও নাসারাদের যবেহকৃত জীবগুলোর বৈধতার বর্ণনা দিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবূ উমামাহ (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে যুবাইর (রঃ), ইকরামা (রঃ), আতা' (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মাকহূল (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), মুকাতিল (রঃ) এবং ইবনে হাইয়ানও (রঃ) একথাই বলেন যে, এখানে এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের স্বহস্তে যবেহকৃত জানোয়ার। এটা খাওয়া মুসলমানদের জন্যে হালাল। কেননা, তারাও গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করাকে নাজায়েয মনে করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয় না। যদিও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অমূলক, যা থেকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। সহীহ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটি মশক প্রাপ্ত হই। আমি ওটাকে নিজের অধিকারে নিয়ে নিই এবং বলি, আজ আমি কাউকেও এর অংশ দেবো না। তারপর এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। হঠাৎ দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মুচকি হাসছেন। এ হাদীসটি দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে সে, গনীমতের মধ্য হতে পানাহারের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টনের পূর্বেও নিয়ে নেয়া জায়েয। এ দলীল এ হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিন মাযহাবের ফকীহগণ মালেকীদের সামনে এ সনদ পেশ করে বলেছেনঃ তোমরা যে বলে থাক, আহলে কিতাবের নিকট যে খাদ্য হালাল সেই খাদ্য আমাদের নিকটও হালাল– এটা ভুল। দেখো, ইয়াহূদীরা চর্বিকে তাদের জন্যে হারাম মনে করে থাকে, অথচ মুসলমান ওটা গ্রহণ করছে। কিন্তু তাদের এ কথা বলা ঠিক নয়। কেননা, ওটা ছিল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, ওটা ছিল এমন চর্বি যা ইয়াহূদীরাও তাদের জন্যে হালাল মনে করে থাকে। অর্থাৎ পিঠের চর্বি, নাড়ি সংলগ্ন চর্বি এবং হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি। এর

চেয়ে আরও বেশী প্রমাণযুক্ত ঐ দলীলটি যাতে রয়েছে যে, খায়বারবাসী সদ্য ভাজা একটি ছাগী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপঢৌকন দিয়েছিল যার একটি কাঁধে তারা বিষ মিশ্রিত করেছিল। কেননা, তাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাঁদের গোশ্ত পছন্দ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ গোশ্ত মুখে দিয়ে দাঁত দ্বারা কাটা মাত্রই আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঐ কাঁধ বলে উঠলোঃ "আমাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।" তিনি তৎক্ষণাৎ ওটা থুথু করে ফেলে দিলেন। ওর ক্রিয়া তাঁর সামনের দাঁতে রয়েও গেল। আহারে তাঁর সাথে হযরত বাসার ইবনে মারূরও (রাঃ) ছিলেন। ঐ বিষক্রিয়াতেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। এর প্রতিশোধ হিসেবে বিষ মিশ্রিতকারিণী মহিলাটিকেও হত্যা করা হলো, যার নাম ছিল যয়নব। এটা প্রমাণরূপে স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং সঙ্গীগণসহ ঐ গোশ্ত ভক্ষণের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং তারা যে চর্বিকে হারাম মনে করতো তা তারা বের করে ফেলেছে কি-না সেটাও তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন না। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, একজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দাওয়াত দেয় এবং তাঁর সামনে যবের রুটি এবং পুরাতন শুষ্ক চর্বি হাযির করে। হযরত মাকহূল (রঃ) বলেন যে, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া না হবে ওটা খাওয়া হারাম করার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর দয়া পরবশ হয়ে তা মানসূখ বা রহিত করতঃ আহলে কিতাবের যবেহ্কৃত জন্তু তাদের জন্যে হালাল করে দেন। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, আহ্লে কিতাবের যবেহকৃত জন্তু তাদের জন্যে হালাল করার দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় না যে, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হবে না সেটাও হালাল হবে। কেননা, তাদের মধ্যে মুশরিকও ছিল, যারা যবেহ্ করার সময় আল্লাহর নাম নিতো না, এমনকি তাদের গোশ্ত ভক্ষণ যবেহর উপরই নির্ভরশীল ছিল না। বরং তারা মৃত জন্তুরও গোশ্ত ভক্ষণ করতো। কিন্তু আহলে কিতাব এদের বিপরীত এবং এদের মত আরও কয়েকটি সম্প্রদায় রয়েছে। যেমন সামেরাহ্, সায়েবাহ এবং ইবরাহীম (আঃ) ও শীষ (আঃ) প্রমুখ পয়গম্বরদের ধর্মের দাবীদার। যেমন আলেমদের দু'টি উক্তির মধ্যে একটি উক্তি রয়েছে। আর আরবের খ্রীষ্টান যেমন বানূ তাগলিব, তানূখ, বাহ্রা, জুযাম, লাখম, আমেলা এবং তাদের ন্যায় আরও। জমহূরের মতে এদের হাতে যবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া চলবে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা বানূ তাগলিবের হাতে যবেহকৃত জানোয়ারের গোশ্ত ভক্ষণ করো না। কেননা, তারা তো শুধুমাত্র মদ্যপান ছাড়া খ্রীষ্টানদের নিকট হতে আর কিছুই গ্রহণ করেনি।"

তবে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে বানূ তাগলিবের খ্রীষ্টানদের হাতে যবেহকৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণে কোন দোষ নেই। এখন বাকি থাকলো মাজুসীদের ব্যাপারটা, তাদেরকে খ্রীষ্টানদের সাথে মিলিয়ে দিয়ে তাদের অনুগামী করতঃ তাদের নিকট জিযিয়া আদায় করা হলেও তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা এবং তাদের যবেহ্কৃত জীবের গোশ্ত ভক্ষণ করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, তবে ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর সঙ্গী সাথীদের অনুসারী আবূ সঊর ইবরাহীম ইবনে খালিদ কালবী এর বিপরীত মত পোষণ করেন। যখন তিনি এ কথা বলেন এবং জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়ে তখন ফকীহ্গণ এ কথার ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তো একথাও বলে ফেলেন যে, এ মাসআলায় তিনি নিজের নামের মতই বটে অর্থাৎ বলদের পিতা। আবূ সাউর একটি সাধারণ হাদীসকে সামনে রেখে একথা বলে দিয়েছেন যে, হাদীসে রয়েছেঃ "তোমরা মাজুসীদের সাথে আহ্লে কিতাবের ন্যায় ব্যবহার কর।" কিন্তু প্রথমতঃ এ বর্ণনা তো এ শব্দগুলো দ্বারা সাব্যস্তই নয়। দ্বিতীয়তঃ এ বর্ণনাটি 'মুরসাল'। হ্যাঁ, তবে সহীহ বুখারীতে শুধু এটুকু তো অবশ্যই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরের মাজুসীদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছিলেন। এসব ছাড়া আমরা বলি যে, আবূ সাউরের পেশকৃত হাদীসকে যদি আমরা মেনেও নেই তথাপি আমরা বলতে পারি যে, এর 'উমুম' দ্বারাও এ আয়াতের মাফহূম-মুখালিফের দলীলের মাধ্যমে আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যবেহ্কৃত জন্তু আমাদের জন্যে হারাম সাব্যস্ত হচ্ছে।

এরপর বলা হচ্ছে–তোমাদের (মুসলমানদের) যবেহ্কৃত জীব তাদের (আহ্লে কিতাবদের) জন্যে হালাল। অর্থাৎ হে মুসলমানরা! তোমরা আহ্লে কিতাবদেরকে তোমাদের যবেহকৃত জীবের গোশ্ত খাওয়াতে পার। এটা এ আমরের খবর নয় যে, তাদের ধর্মে তাদের জন্যে তোমাদের যবেহ্কৃত প্রাণী হালাল। হ্যাঁ, তবে খুব বেশী বলা গেলে এটুকুই বলা যেতে পারেঃ এটা এ কথারই খবর হবে– তাদেরকেও তাদের কিতাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে জীবকে আল্লাহ্র নামে যবেহ্ করা হয়েছে তা তারা খেতে পারে। এ ব্যাপারে এটা সাধারণ কথা যে, যবেহ্কারী তাদের ধর্মের অনুসারীই হোক বা অন্য কেউ হোক। কিন্তু প্রথম উক্তিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সুন্দর অর্থাৎ তোমাদের জন্যে অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা আহ্লে কিতাবদেরকে তোমাদের যবেহ্কৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণ করাও, যেমন তোমরা তাদের যবেহকৃত জন্তুর

গোশ্ত খেতে পার। এটা যেন অদল বদলের হিসেবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকে নিজের বিশেষ জামা দ্বারা কাফন পরিয়েছিলেন। কোন কোন গুরুজন যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে নিজের জামাটি প্রদান করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিনিময়ে তার কাফনের জন্যে স্বীয় জামাটি প্রদান করেছিলেন। হ্যাঁ, তবে একটি হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা মুমিন ছাড়া আর কারও সাথে উঠা বসা করো না এবং মুত্তাকীদের ছাড়া আর কাউকেও নিজেদের খাদ্য খেতে দিও না।" এ হাদীসটিকে এ অদল বদলের বিপরীত মনে করা ঠিক হবে না। কেননা, হতে পারে যে, মুস্তাহাব হিসেবে এ হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ঘোষিত হচ্ছে–সতী সাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এটা অবতরণিকা হিসেবে বলা হয়েছে। এ জন্যেই এর পরই বলা হচ্ছে–তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের সতী সাধ্বী নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। এ উক্তিও রয়েছে যে, مُحْصَنٰتُ -এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বাধীনা নারীগণ। অর্থাৎ দাসী যেন না হয়। এ উক্তিটি হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত। মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তির শব্দগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

مُحْصَنٰتُ -এর ভাবার্থ হচ্ছে حَرَائِر বা স্বাধীনা নারীগণ। ভাবার্থ যখন এটা হবে যে, দাসীরা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তখন এ অর্থও নেয়া যেতে পারে যে, সতী সাধ্বী নারীগণকে বিয়ে করা হালাল। কেননা, তার থেকে এ শব্দগুলো দ্বারাই অন্য একটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। জমহূরও এ কথা বলেন। আর এটাই সঠিকতমও বটে। এটা না হলে যিম্মীয়া এবং অসতী নারীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিগড়ে যাবে এবং তার "শুধু পেট ভর্তি ও খারাপ পরিমাপ"–এ প্রবাদ বাক্যের নায়কে পরিণত হবে। সুতরাং এটাই সঠিক মনে হচ্ছে যে, এখানে مُحْصَنٰتُ -এর ভাবার্থ হবে ঐ সব নারী যারা সতী সাধ্বী ও ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে مُحْصَنٰتُ -এর সাথে غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ (৪:২৫) শব্দগুলো রয়েছে। আলেম ও

মুফাস্সিরগণের মধ্যেএ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, আহ্লে কিতাবদের স্বাধীনা ও দাসী সকল সতী সাধ্বী নারীই কি এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত? তাফসীরে ইবনে জারীরের মধ্যে পূর্ববর্তী গুরুজনদের একটি দলের উক্তি নকল করা হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, مُحْصَنٰتٌ -এর অর্থ হচ্ছে সতী সাধ্বী। একটি উক্তি এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যিম্মীয়া নারীগণ, স্বাধীনা নারীগণ নয়। এর দলীল হিসেবে–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর।" (৯ঃ ২৯)-এ আয়াতটি পেশ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা নাজায়েয মনে করতেন এবং বলতেনঃ তারা বলে যে তাদের প্রভু হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ), এর চেয়ে বড় শিরক আর কি হতে পারে? আর তারা যখন মুশরিক রূপে পরিগণিত হলো তখন কুরআন কারীমের وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ (অর্থাৎ "মুশরিকা নারীগণ যে পর্যন্ত ঈমান না আনে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।" (২ঃ ২২১)-এ আয়াতটি উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুশরিকদেরকে বিয়ে না করার হুকুম নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর যখন আহ্লে কিতাবের সতী সাধ্বীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তাদেরকে বিয়ে করেন। সাহাবীদের একটি দল এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতঃ খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করেন এবং এটাকে কোন অপরাধমূলক কাজ মনে করেননি। তাহলে এটা যেন সূরায়ে বাকারায় নিষেধযুক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে অন্য আয়াত একে বিশিষ্ট করে দিয়েছেন। এটা ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন মেনে নেয়া হবে যে, নিষেধযুক্ত আয়াতের মধ্যে এটাও শামিল ছিল। নচেৎ এ দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্ব নেই। কেননা, আরও বহু আয়াতে আহ্লে কিতাবদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ (৩ঃ ২০) আয়াত দু'টিতে তাদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে– তোমরা তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মহর প্রদান কর। অর্থাৎ যেহেতু তারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেহেতু তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য মহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), আমির শা'বী (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর ফতওয়া এই যে, যদি কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে করে এবং সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে যে মহর প্রদান করেছে তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে। (তাফসীরে ইবনে জারীর)

বলা হচ্ছে–তোমরা তাদেরকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। সুতরাং নারীদের জন্যে যেমন পবিত্রতা ও সতীত্বের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তেমনই পুরুষদের জন্যেও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে, তারা যেন না প্রকাশ্য ব্যভিচারী হয়, না এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে এবং না বিশেষ সম্পর্কের কারণে হারাম কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুরায়ে নিসার মধ্যে এরূপই নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদও (রঃ) এদিকেই গেছেন যে, ব্যভিচারিণী নারীর সাথে তাওবা করার পূর্বে কোন সৎ লোকের বিবাহ কখনও জায়েয নয়। আর তাঁর নিকট পুরুষদের ব্যাপারেও এ হুকুমই প্রযোজ্য যে, কোন ব্যভিচারী পুরুষের সাথে কোন সতী সাধ্বী নারীর বিবাহ জায়েয নয় যে পর্যন্ত না সে খাঁটি অন্তরে তাওবা করে এবং জঘন্য কাজ থেকে বিরত হয়। তাঁর দলীল হিসেবে একটি হাদীসও রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, ব্যভিচারী লোক চাবুক দ্বারা প্রহৃত হওয়ার পর একমাত্র তার মত নারীকেই বিয়ে করতে পারে। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার ফারূক (রাঃ) একবার বলেনঃ "কোন মুসলমান যদি ব্যভিচার করে তবে আমি চাই যে, কোন সতী সাধ্বী মুসলমান নারীর সাথে তার বিয়ে কখনও হতে দেবো না।" হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! শিরকের পাপ তো এর চেয়ে অনেক বড় তথাপি মুশরিকদের তাওবাও তো কবূল হয়ে থাকে।"

এ মাসআলাকে আমারা اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً (২৪ঃ ৩)-এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে–কাফিরদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٦- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৬। হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (নামাযের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ কর এবং পা গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল; কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন যে, মানুষের যখন অযু থাকবে না সে সময় তার জন্যে অযুর নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। একটি দল বলেন যে, যখন তোমরা দণ্ডায়মান হও অর্থ হচ্ছে–যখন তোমরা ঘুম থেকে জাগরিত হও। এ দু'টি উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই। অন্যান্য মনীষীরা বলেন যে, আয়াত তো সাধারণ, সুতরাং তা নিজের সাধারণত্বের উপরই থাকবে। কিন্তু যার অযু থাকবে না তার

জন্যে অযুর নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে প্রযোজ্য হবে। আর যার অযু থাকবে তার জন্যে অযুর নির্দেশ হবে মুস্তাহাব হিসেবে। একটি দলের ধারণা এই যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযুর নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করতেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অযু করে মোজার উপর মাসেহ্ করেছিলেন এবং ঐ একই অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন। এটা দেখে হযরত উমার (রাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা ইতিপূর্বে কখনও করেননি। তখন তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, আমি ভুলে এরূপ করিনি, ববং জেনে শুনে ইচ্ছে করেই করেছি।" সুনানে ইবনে মাজা ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে যে, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এক অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়তেন। তবে প্রস্রাব করলে বা অযু ভেঙ্গে গেলে নতুনভাবে অযু করতেন এবং অযুরই অবশিষ্ট পানি দ্বারা মোজার উপর মাসেহ করতেন। এটা দেখে হযরত ফযল ইবনে বাশীর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ এটা কি আপনি নিজের মতানুযায়ী করেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ না, আমি নবী (সঃ)-কে এরূপ করত দেখেছি। মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করতেন, অযু নষ্ট হোক বা না হোক। এটা দেখে তাঁর পুত্র হযরত উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় এর সনদ কি? উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা, যিনি এমন লোকের পুত্র ছিলেন যাঁকে ফেরেশ্তাগণ গোসল দিয়েছিলেন। বর্ণনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অযু থাক বা নষ্ট হয়ে যাক। কিন্তু এটা তাঁর জন্যে কষ্টকর হলে প্রত্যেক নামাযে অযু করার পবিরর্তে মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়। হ্যাঁ, তবে অযু ভেঙ্গে গেলে নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করা জরুরী। এটাকে সামনে রেখে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর খেয়াল হয় যে, তাঁর তো শক্তি রয়েছে, এজন্যে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সেই অবস্থাই থাকে। এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রাঃ)। কিন্তু যেহেতু তিনি স্পষ্টভাবে حَدَّثَنَا বলেছেন সেহেতু 'তাদলীস' এর ভয়ও দূর হয়ে গেল। তবে ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় এ শব্দগুলো নেই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর এই কাজ এবং তাঁর এতে সদা লেগে থাকা এটাই প্রমাণ করে যে, এটা অবশ্যই মুস্তাহাব এবং জমহূরের এটাই মাযহাব। তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, খলীফাগণ প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু করতেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু করতেন এবং দলীল হিসেবে এ আয়াতটি পাঠ করতেন। একদা তিনি যোহরের নামায আদায় করে জনসমাবেশে উপস্থিত হন। অতঃপর তাঁর নিকট পানি আনা হলে তিনি মুখ ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও পা মাসেহ করেন। এরপর বলেনঃ "এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির অযু যার অযু রয়েছে।" একবার তিনি হালকাভাবে অযু করে একথাই বলেছিলেন। হযরত উমার ফারূক (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সুনানে আবি দাঊদ তায়ালেসীর মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, অযু থাকা অবস্থায় অযু করা বাড়াবাড়ি। তবে প্রথমতঃ সনদের দিক দিয়ে এ উক্তিটি খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ এটা ঐ ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য যে একে ওয়াজিব মনে করে। আর যে ব্যক্তি একে মুস্তাহাব মনে করে পালন করে সে তো হাদীসের উপরই আমলকারী। সহীহ বুখারী, সুনান প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে অযু করতেন। একজন আনসারী এ কথা শুনে হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ আপনারা কি করতেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমরা অযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত একই অযুতে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করতাম।" তাফসীরে ইবনে জারীরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অযু থাকতে অযু করে তার জন্যে দশটি পুণ্য লিখা হয়। জামেউত তিরমিযী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের মধ্যেও এ বর্ণনা রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে দুর্বল বলেছেন। একটি দল বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, অন্য কোন কাজের সময় অযু করা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র নামাযের জন্যেই অযু ওয়াজিব। এ নির্দেশ এ জন্যেই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু ভেঙ্গে যাওয়ার পর নতুনভাবে অযু না করা পর্যন্ত কোন কাজ করতেন না। এটাই ছিল তাঁর নীতি। হাদীসে ইবনে আবি হাতিম প্রভৃতির মধ্যে একটি দুর্বল বর্ণনা রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রস্রাবের ইচ্ছে করতেন তখন আমরা তাঁকে কিছু বললে তিনি উত্তর দিতেন না এবং সালাম দিলে সালামের জবাবও দিতেন না। অবশেষে রুখসাতের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুনানে আবি দাঊদের মধ্যে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পায়খানা হতে বের হন এবং তাঁর সামনে খাদ্য হাযির করা হয়। আমরা তাঁকে বললাম—আপনার নির্দেশ

হলে অযুর পানি নিয়ে আসি। তখন তিনি বললেনঃ “যখন আমি নামাযের মধ্যে দাঁড়াই তখনই শুধু আমার প্রতি অযুর নির্দেশ রয়েছে।” ইমাম তিরমিযী (রঃ) একে হাসান বলেছেন। অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, নবী (সঃ) বলেনঃ “আমাকে এমন খুব কম নামাযই পড়তে হয় যাতে আমি অযু করে থাকি।” ‘যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াও তখন অযু করে নাও’ –আয়াতের এ শব্দগুলো দ্বারা উলামায়ে কিরামের একটি দল দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অযুতে নিয়ত ওয়াজিব। কালামুল্লাহর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা নামাযের জন্যে অযু করে নাও। যেমন আরবের লোকেরা বলে থাকে, যখন তোমরা আমীরকে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও অর্থাৎ আমীরের জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে– “আমলের পরিণাম নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে শুধু ওটাই রয়েছে যার সে নিয়ত করেছে। অযুতে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। কেননা, একটি খুবই বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি অযুতে বিসমিল্লাহ বললো না তার অযু হলো না।” এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, অযুর পানির বরতনে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে হাত ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব। আর যখন কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তার জন্যে তো এ ব্যাপারে খুবই তাগীদ রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন যেন সে তার হাত তিনবার ধুয়ে নেয়ার পূর্বে বরতনে প্রবেশ না করায়, কেননা তোমাদের কেউই জানেনা যে, রাত্রে তার হাতটি কোথায় ছিল।” মুখমণ্ডলের সীমা দৈর্ঘে সাধারণতঃ মাথার চুল গজাবার যেটা জায়গা সেখান থেকে নিয়ে দাড়ির হাড় ও থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কান থেকে নিয়ে অপর কান পর্যন্ত। কপালের দু’দিকে চুল গজিয়ে ওঠার জায়গাটা মাথার অন্তর্ভুক্ত কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আর দাড়ির লটকে থাকা চুল ধৌত করা মুখমণ্ডল ধৌত করার ফরযিয়াতের অন্তর্ভুক্ত কি না এ ব্যাপার দু’টি উক্তি রয়েছে। এক তো এই যে, ওর উপর পানি বইয়ে দেয়া ওয়াজিব। কেননা, মুখমণ্ডল সামনে করার সময় ওটাও সামনে হয়ে থাকে। একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে দাড়ি ঢেকে রাখা অবস্থায় দেখে বলেনঃ “ওটা খুলে ফেল, কেননা ওটা মুখমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত।” হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ আরবাসীদেরও অভ্যাস এই যে, ছেলেদের যখন দাড়ি গজিয়ে ওঠে তখন তারা বলে طَلَعَ وَجْهُهُ (অর্থাৎ

তার চেহারা প্রকাশ পেয়েছে)। সুতরাং বুঝা গেল যে, আরববাসী দাড়িকেও মুখের অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকে। দাড়ি ঘন হলে ওটা খিলাল করাও মুস্তাহাব। হযরত উসমান (রাঃ)-এর অযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় তিনবার দাড়ি খিলাল করেছেন এবং বলেছেনঃ "তোমরা আমাকে যেভাবে অযু করতে দেখলে ঠিক সেভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অযু করতে দেখেছি।" (জামেউত তিরমিযী ইত্যাদি) এ রিওয়ায়াতকে ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) হাসান বলেছেন। সুনানে আবি দাউদে হযরত হাসান ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করার সময় এক অঞ্জলী পানি নিয়ে থুতনির নীচে দিতেন এবং দাড়ি মুবারক খিলাল করতেন ও বলতেনঃ "আমাকে আমার মহিমান্বিত প্রভু এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন।" ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, দাড়ি খিলাল করা হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং একে ছেড়ে দেয়ার রুখসত হযরত ইবনে উমার (রাঃ), হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ), হযরত নাখঈ (রঃ) এবং তাবেঈগণের একটি জামআত হতে বর্ণিত রয়েছে। সিহাহ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন অযু করতে বসতেন তখন তিনি কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। এ দু'টো কাজ অযু ও গোসলে ওয়াজিব কি মুস্তাহাব এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর মাযহাবে এটা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ) এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে সুনানের ঐ সহীহ হাদীসটি যাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাড়াতাড়ি নামায আদায়কারী লোকটিকে বলেছিলেনঃ "তুমি সেভাবে অযু কর যেভাবে আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।" ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব এই যে, এই দু'টো কাজ গোসলে ওয়াজিব, অযুতে ওয়াজিব নয়। ইমাম আহমাদ (রঃ) হতে একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব কিন্তু কুলি করা মুস্তাহাব। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অযু করবে সে যেন নাকে পানি দেয়।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে– "তোমাদের কেউ যখন অযু করবে তখন সে যেন তার নাকের দু'টি ছিদ্রে পানি প্রবেশ করিয়ে দেয়, তারপরে যেন নাক ঝাড়ে।" অর্থাৎ যেন নাকের ছিদ্রে ভালভাবে পানি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে উত্তম রূপে নাক পরিষ্কার করে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অযু করতে বসে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা দ্বারা কুলি করলেন ও নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত ধুলেন। এরপর আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। এরপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা ডান পায়ে ঢেলে দিলেন এবং পা ধৌত করলেন। অতঃপর আর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধুয়ে ফেললেন। এরপর বললেনঃ “এভাবেই আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে অযু করতে দেখেছি।” إِلَى الْمَرَافِقِ -এর অর্থ হচ্ছে- مَعَ الْمَرَافِقِ অর্থাৎ কনুইসহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের মালসহ তাদের (ইয়াতীমদের) মাল ভক্ষণ করো না, নিশ্চয়ই এটা গুরুতর পাপ।' তদ্রূপ এখানেও অর্থ হবে তোমরা হাতকে কনুই পর্যন্ত নয় বরং কনুইসহ ধৌত কর। ইমাম দারেকুতনী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করার সময় স্বীয় কনুইদ্বয়ের উপর পানি বইয়ে দিতেন। কিন্তু এ হাদীসের দু'জন বর্ণনাকারীর সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অযু কারীর জন্যে এটা উত্তম যে, সে যেন অযুতে কনুই-এর সাথে বাহুকেও ধুয়ে নেয়। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আমার উম্মত অযুর চিহ্নের কারণে উজ্জ্বল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় আগমন করবে। সুতরাং তোমাদের কারও সম্ভব হলে সে যেন তার ঔজ্জ্বল্যের দূরত্ব বাড়িয়ে নেয়।” সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আমার বন্ধু (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– মুমিনকে ঐ স্থান পর্যন্ত অলংকার পরানো হবে যে স্থান পর্যন্ত তার অযুর পানি পৌঁছবে।

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ -এর মধ্যে بَ অক্ষরটি اِلْصَاق বা মিলিয়ে দেয়ার জন্যে হওয়াই সুস্পষ্ট। কিন্তু এটা تَبْعِيْض বা কিছু অংশের জন্যে হওয়ার মধ্যে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে। কোন কোন মূলনীতি বিশারদ বলেন যে, যেহেতু আয়াত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সেহেতু সুন্নাহ এর ব্যাখ্যা যা দিয়েছে সেটাই কর্তব্য এবং সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েদ ইবনে 'আসিম (রাঃ) নামক সাহাবীকে একটি লোক বলেনঃ আপনি অযু করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানি চাইলেন এবং হাত দু'টি দু'বার করে ধুলেন,

তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর চেহারা ধৌত করলেন। তারপর কনুইসহ হাত দু'টি দু'বার ধুলেন। অতঃপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন, মাথার প্রথম অংশ থেকে শুরু করে গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে এখান পর্যন্ত ফিরিয়ে আনলেন। তারপর পা দু'টি ধৌত করলেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অযুর নিয়ম হযরত আলী (রাঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে। সুনানে আবি দাউদে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এবং হযরত মিকদাদ (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত রয়েছে। এ হাদীসগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয হওয়ার দলীল। হযরত ইমাম মালিক (রঃ) এবং হযরত আহমাদ (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। আর এটাই মাযহাব ঐ সব গুরুজনেরও যারা আয়াতকে সংক্ষিপ্ত বলে মেনে থাকেন এবং হাদীসকে এর ব্যাখ্যাকারী মনে করে থাকেন। হানাফীদের ধারণা এই যে, মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয যা হচ্ছে মাথার প্রথম অংশ। আমাদের সাথী বলেন যে, ফরয শুধু ঐ টুকু যার উপর মাসেহর প্রয়োগ হয়ে থাকে। তার কোন সীমা নির্ধারিত নেই। মাথার কতক চুলের উপর মাসেহ হলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। এ দু'দলের দলীল হচ্ছে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি। তিনি বলেনঃ (একবার সফরে) রাসূলুল্লাহ (সঃ) পেছনে রয়ে যান এবং আমিও তাঁর সাথে পেছনে থেকে যাই। যখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করে ফেলেন তখন আমার নিকট পানি চান। আমি লোটা (পানি পাত্র) নিয়ে আসি। তিনি হাতের কব্জি দু'টি ধুলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর কব্জি হতে কাপড় সরিয়ে ফেললেন এবং কপালের সাথে মিলে থাকা চুল ও পাগড়ির উপর মাসেহ করলেন। (সহীহ মুসলিম) ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ এর উত্তর দেন যে, তিনি মাথার প্রথম অংশের উপর মাসেহ করে অবশিষ্ট মাসেহ পাগড়ির উপর পুরো করেন। এর বহু দৃষ্টান্ত হাদীসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বরাবরই পাগড়ির উপর ও মাথার উপর মাসেহ করতেন। সুতরাং এটাই উত্তম এবং এটা কোনক্রমেই প্রমাণ করে না যে, মাথার কিছু অংশের উপর বা শুধুমাত্র কপালের চুলের উপর মাসেহ করতে হবে, আর এর পূর্ণতা পাগড়ির উপর হবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবার মাথার উপর মাসেহ তিনবার হবে কি একবারই হবে এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর মতে মাসেহ তিনবার করতে হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মাসেহ একবারই করতে

হবে। তাঁদের দলীল এই যে, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) অযু করতে বসে দু'হাতের উপর তিনবার পানি ঢালেন ও হাত দু'টি তিনবার ধৌত করেন, তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনবার হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত। তারপর মাথা মাসেহ করেন। এরপর তিনবার করে পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমার এ অযুর মত অযু করে শুদ্ধ অন্তরে দু'রাকআত নামায আদায় করে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলম) সুনানে আবি দাঊদের মধ্যে এ রিওয়ায়াতেই মাথা মাসেহ করার সাথে সাথে এ শব্দও রয়েছে যে, তিনি মাথা একবার মাসেহ করেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকেও এরূপই বর্ণিত আছে। আর যাঁরা মাথা মাসেহকেও তিনবার করার কথা বলেন তাঁরা ঐ হাদীস থেকে দলীল নিয়েছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার করে অযুর অঙ্গগুলো ধুয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি অযু করেন। তারপর এরূপই রিওয়ায়াত রয়েছে এবং তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার উল্লেখ নেই। আর তাতে আছে যে, অতঃপর তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেন এবং তিনবার স্বীয় পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এভাবেই অযু করতে দেখেছি।" তিনি আরও বলেনঃ "যে ব্যক্তি এরূপভাবে অযু করে, তার জন্যে এটাই যথেষ্ট।" কিন্তু হাদীস গ্রন্থে যে হাদীসগুলো হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে সেগুলো দ্বারা মাথা মাসেহ একবার করাই সাব্যস্ত হচ্ছে।

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-এর لَامْ কে وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ-এর উপর عَطْف করে نَصَبْ পড়া হয়েছে এবং এভাবে ধৌত করার দিকে ফিরোনো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরূপভাবেই পাঠ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এটাই করতেন। হযরত উরওয়া (রঃ), হযরত আতা' (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত হাসান (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইবরাহীম (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ), হযরত যুহরী (রঃ) এবং হযরত ইবরাহীম তাইমীরও (রঃ) এটাই উক্তি। আর সুস্পষ্ট কথা এটাই যে, পা ধুতেই হবে। পূর্ববর্তী গুরুজনদেরও এটাই নির্দেশ যে, পা ধুতেই হবে। এখান থেকেই জমহূর এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অযুতে তরতীব ওয়াজিব। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি অযুতে তরতীব বা ক্রমান্বয়ে করাকে শর্ত মনে করতেন না। তাঁর মতে যদি কেউ প্রথমে পা ধুয়ে

নেয়, এরপর মাথা মাসেহ করে, তারপর হাত ধৌত করে, অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করে তবুও জায়েয হবে। কেননা, আয়াতে এ অঙ্গগুলোকে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَاؤ -এর دَلَالَتْ কখনও তরতীবের উপর হয় না। জমহূর এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেন। একটি এই যে, بَ অক্ষরটি তরতীবের উপর دَلَالَتْ করে। আয়াতের শব্দগুলোতে নামায আদায়কারীকে মুখমণ্ডল ধৌত করার নির্দেশ فَاغْسِلُوْا শব্দ দ্বারা হচ্ছে। তাহলে কমপক্ষে মুখমণ্ডলকে প্রথম ধৌত করা তো শব্দগুলো দ্বারাই সাব্যস্ত হচ্ছে। এখন এর পরের অঙ্গগুলোতে তরতীব ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। এটা বিবেক বিরুদ্ধও নয়। অতঃপর فَ অক্ষরটি যা تَعْقِيْبُ বা অনুসরণের জন্যে আসে এবং যা تَرْتِيْبُ বা ক্রমান্বয়ের দাবীদার, যখন একটির উপর এসেছে তখন একটির তরতীব মেনে নিয়ে অন্যটির তরতীব কেউ অস্বীকার করে না, বরং হয়তো বা সবকটির তরতীব স্বীকারকারী হয়, নয় তো কোন একটিরও তরতীব স্বীকারকারী হয় না। সুতরাং এ আয়াতটি নিশ্চিতরূপে তাঁদের উপর দলীল হচ্ছে যাঁরা মোটেই তরতীব স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, واؤ অক্ষরটি তরতীবের উপর دَلَالَتْ করে না এটাও আমরা স্বীকার করি না। বরং ওটা তরতীবের উপর دَلَالَتْ করে। যেমন ব্যাকরণবিদগণের একটি দলের এবং ফিকাহশাস্ত্রবিদদের কারও কারও মাযহাব এটাই। তাছাড়া এ বিষয়টিও চিন্তা ভাবনার যোগ্য যে, আভিধানিক অর্থে এটা তরতীবের উপর دلالت করে না এটা যদি মেনে নেয়াও হয়, তথাপি শরীয়তের অর্থে যে জিনিসগুলোতে তরতীব হতে পারে সেগুলোতে এর دَلَالَتْ তরতীবের উপর হয়ে থাকে। সহীহ্ মুসলিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে সাফার দরজা হতে বের হন, তখন اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (২ঃ ১৫৮)-এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেনঃ "আমি সেখান থেকেই শুরু করবো যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা প্রথম দিয়েছেন।" সুতরাং তিনি সাফা থেকে দৌড় শুরু করেন। সুনানে নাসাঈতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশও বর্ণিত আছে– "তোমরা সেখান থেকেই শুরু কর যেখান থেকে আল্লাহ্ শুরু করেছেন।" এর ইসনাদও বিশুদ্ধ এবং এতে আমর বা নির্দেশ রয়েছে। অতএব জানা গেল যে, যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে তাকে পূর্বে করা এবং যার বর্ণনা পরে হয়েছে তাকে পরে করা ওয়াজিব। সুতরাং সুস্পষ্টরূপে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এরূপ স্থলে শরীয়তের দিক দিয়ে তরতীব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তৃতীয় দল উত্তরে বলেন যে, হাত কনুইসহ ধৌত করার হুকুম এবং পা ধৌত করার হুকুমের মধ্যভাগে মাথা মাসেহ করার হুকুম বর্ণনা করা এ কথারই স্পষ্ট দলীল যে, তরতীবকে বাকী রাখাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। নতুবা নায্মে কালাম বা কথার ছন্দ উলট পালট করা হতো না। এর প্রথম উত্তর এটাও যে, সুনানে আবি দাঊদ ইত্যাদির মধ্যে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযুর অঙ্গগুলো একবার একবার করে ধৌত করেন। অতঃপর বলেনঃ "এটাই হচ্ছে অযু যা ছাড়া আল্লাহ নামায কবূল করেন না।" এখন অবস্থা হলো দু'টি, হয় ঐ অযুতে তরতীব ছিল, নয় তো ছিল না। যদি বলা হয় যে, নবী (সঃ)-এর ঐ অযু তরতীবসহ ছিল অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে একটি অঙ্গের পর আর এক অঙ্গ ছিল তাহলে বুঝতে হবে যে, যে অযুতে আগা পিছা হবে এবং সঠিকভাবে তরতীব থাকবে না সেই অযুতে নামায গ্রহণীয় হবে না। তাহলে জানতে হবে যে, অযুতে তরতীব ওয়াজীব ও ফরয। আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, ঐ অযুতে তরবীত ছিল না, বরং এলোমেলো ছিল, যেমন পা ধুয়েছিলেন, তারপর কুলি করেছিলেন, এর পর মাসেহ করেছিলেন, তাঁরপর মুখ ধুয়েছিলেন ইত্যাদি, তাহলে তরতীব না করাই ওয়াজিব হয়ে যাবে! অথচ এরূপ মত পোষণকারী উম্মতের মধ্যে একজনও নেই। অতএব, সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, অযুতে তরতীব ফরয। আয়াতের এ অংশের একটি কিরআত ওয়া আরজুলিকুম অর্থাৎ لَامِ কে যের দিয়েও রয়েছে। আর এটা থেকেই শী'আ সম্প্রদায় এ দলীল গ্রহণ করেছে যে, পায়ের উপর মাসেহ্ করা ওয়াজিব। কেননা, তাদের নিকট এর عطف বা সংযোগ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ -এর উপর হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজন হতেও এরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। যার ফলে পা মাসেহ্ করার কল্পনা জেগে ওঠে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন–মূসা ইবনে আনাস জনসমাবেশে হযরত আনাস (রাঃ)-কে বলেন যে, হাজ্জায আহ্ওয়ায নামক স্থানে ভাষণ দিতে গিয়ে তাহারাত ও অযুর আহ্কামের ব্যাপারে বলেছেনঃ "তোমরা মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ্ কর এবং পা ধুয়ে ফেল। সাধারণতঃ পায়েই ধূলা ময়লা লেগে যায়। সুতরাং পায়ের তলা, উপরিভাগ ও গোড়ালিকে উত্তমরূপে ধৌত কর।" তখন হযরত আনাস (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী এবং হাজ্জায মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلِكُمْ -

হযরত আনাস (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি পায়ের মাসেহ করতেন তখন পা সম্পূর্ণরূপে ভিজিয়ে দিতেন। অথচ তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে

যে, কুরআন কারীমে পায়ের উপর মাসেহ করার হুকুম রয়েছে। হ্যাঁ, তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত হচ্ছে পা ধৌত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অযুতে দু'টো অঙ্গ ধুতে হয় এবং দু'টো অঙ্গ মাসেহ করতে হয়। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটিতে পায়ের উপর মাসেহ করার বর্ণনা রয়েছে। ইবনে উমার (রাঃ), আলকামাহ (রঃ), আবূ জাফর (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রঃ) এবং এক রিওয়ায়াতে হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত জাবির ইবনে যায়েদ (রঃ) এবং আর এক রিওয়ায়াতে হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। হযরত ইকরামা (রাঃ) পায়ের উপর মাসেহ করতেন। শা'বী (রঃ) বলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে মাসেহ্র হুকুম নাযিল হয়েছে। তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত আছে– "তোমরা কি দেখছো না যে, যে অঙ্গগুলোর উপর ধোয়ার নির্দেশ ছিল, ঐগুলোর উপর তো তায়াম্মুমের সময় মাসেহ করার হুকুম রয়েছে। আর যেগুলোর উপর মাসেহ করার হুকুম ছিল, তায়াম্মুমের সময় ওগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে।" হযরত আমির (রাঃ)-কে কেউ বললেনঃ "লোকেরা বলছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) পা ধোয়ার হুকুম নিয়ে এসেছেন।" হযরত আমির (রাঃ) একথা শুনে বললেনঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) মাসেহ করার হুকুম নিয়ে নাযিল হয়েছিলেন।" সুতরাং এসব আছার সম্পূর্ণরূপেই গারীব এবং ঐ বিষয়ের উপর মাহমুল যে, এখানে মাসেহ্র ভাবার্থ হচ্ছে ঐ গুরুজনদের হালকাভাবে ধৌতকরণ। কেননা, সুন্নাত দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত আছে যে, পা ধৌত করা ওয়াজিব। স্মরণ রাখতে হবে যে, যেরের কিরআতটি হয় তো ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও সৌষ্ঠবের জন্যেই হবে। যেমন আরবদের কথায় আছে– جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ এবং আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে– عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ (৭৬ঃ ২১) আরবদের ভাষায় এটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ কারণে উভয় শব্দকে একই إِعْرَاب দিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। হযরত ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর একটি কারণ এও বর্ণনা করেছেন যে, এ হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন পায়ে মোজা থাকবে। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে মাসেহ্র অর্থ হচ্ছে হালকাভাবে ধৌত করা, যেমন কতক রিওয়ায়াতে সুন্নাত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে। মোটকথা পা ধোয়া ফরয, এটা ছাড়া অযুই হবে না, আয়াতেও এটাই আছে এবং হাদীসেও তাই আছে। যেগুলো আমরা পেশ করছি ইনশাআল্লাহ।

হাদীসে বায়হাকীতে রয়েছে, একদা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) যোহরের নামায আদায় করার পর বসে থাকেন এবং আসর পর্যন্ত জনগণের কাজ কামে লিপ্ত থাকেন। তারপর পানি আনিয়ে নেন এবং অঞ্জলি দ্বারা মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা ও পদদ্বয় মাসেহ করেন এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করে নেন। অতঃপর বলেনঃ "লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে অপছন্দনীয় মনে করে। অথচ আমি যা করলাম তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করতে দেখেছি।"এরপর তিনি বলেনঃ "এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির অযু যার অযু রয়েছে।" (সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম) শী'আদের মধ্যে যারা পায়ের মাসেহ মোজার মাসেহ্র মত বলেছেন তাঁরা অবশ্যই ভুল করেছেন এবং জনগণকে ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। তদ্রূপ তাঁরাও ভুল করেছেন যাঁরা মাসেহ করা ও ধৌত করা দু'টোকেই জায়েয বলেছেন। আবার যাঁরা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করেছেন যে, তিনি হাদীসসমূহের উপর ভিত্তি করে পা ধোয়া এবং আয়াতে কুরআনীর উপর ভিত্তি করে পায়ের উপর মাসেহ করাকে ফরয বলেছেন তাঁদের তাহ্কীক বা বিশ্লেষণও ঠিক নয়। তাফসীরে ইবনে জারীর আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর কথার ব্যাখ্যা এই যে, পা দু'টিকে রগড়ানো ওয়াজিব। কিন্তু অন্য অঙ্গগুলোর ব্যাপারে এটা ওয়াজিব নয়। কেননা, পা দ্বারা মাটিতে চলাফেরা করতে হয়। কাজেই পায়ে ময়লা মাটি ভরে যায়। তাই পা ধোয়া জরুরী, যাতে পায়ে কিছু লেগে থাকলে ধোয়ার ফলে তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ রগড়ানোর জন্যে তিনি মাসেহ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আর এতেই কতক লোকের মনে সন্দেহ জেগে ওঠে এবং তাঁরা বুঝে নেন যে, তিনি ধৌত করা ও মাসেহ করাকে এভাবে জমা করে দিয়েছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর কোন অর্থই হয় না। মাসেহ তো ধৌত করারই অন্তর্ভুক্ত, তা আগেই হোক বা পরেই হোক। সুতরাং আসলে ইমাম সাহেবের ইচ্ছা ওটাই যা আমি উল্লেখ করলাম। আর একে না বুঝে অধিকাংশ ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদ ওটা মুশকিল জেনেছেন। আমি খুব চিন্তা ভাবনা করলে আমার কাছে এটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইমাম সাহেব উভয় কিরআতকে একত্রিত করারই পন্থা খুঁজছিলেন। সুতরাং তিনি যেরের কিরআত অর্থাৎ মাসেহকে তো মাহমুল করেছেন دَلْكٌ বা ভালভাবে রগড়িয়ে পরিষ্কার করার উপর আর যবরের কিরআত তো غَسْلٌ বা ধৌত করার উপর আছেই। সুতরাং তিনি ধৌত করা ও রগড়ানো উভয়কেই ওয়াজিব বলেছেন, যাতে যের ও যবর উভয় কিরআতের উপর একই সাথে আমল হয়ে যায়। এখন পা ধৌত করা জরুরী হওয়া সম্পর্কে যে হাদীসগুলো এসেছে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে-

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ), আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং হযরত মিকদাদ ইবনে মাদীকারব (রাঃ)-এর বর্ণনাগুলো ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করার সময় স্বীয় পদদ্বয় একবার, দু'বার বা তিনবার ধুয়েছেন। হযরত আমর ইবনে শুআইব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করেছেন এবং স্বীয় পা দু'টি ধুয়েছেন। তারপর বলেছেনঃ "এটা হচ্ছে অযু, যা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা নামায কবূল করেন না।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি আগমন করেন তখন আমরা তাড়াতাড়ি অযু করছিলাম। আমরা তাড়াহুড়া করে আমাদের পাগুলো স্পর্শ করা শুরু করে দেই। সেই সময় তিনি খুবই উচ্চৈঃস্বরে বললেনঃ "অযু পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর। আগুনে পায়ের গোড়ালির অমঙ্গল রয়েছে।" অন্য একটি হাদীসে আছে–"আগুনে পায়ের গোড়ালির ও পায়ের তলার অমঙ্গল রয়েছে।"[১] আর একটি হাদীসে রয়েছেঃ "আগুনের কারণে পায়ের গিটের অমঙ্গল রয়েছে।"[২] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোকের পায়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আগুনের কারণে পায়ের গোড়ালির জন্যে অমঙ্গল রয়েছে।" ইবনে জারীর (রঃ) হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সম্প্রদায়কে নামায পড়তে দেখেন যাদের একজনের পায়ের গোড়ালির এক দিরহাম পরিমাণ জায়গায় বা নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, তখন তিনি বলেনঃ "আগুনের কারণে গোড়ালির জন্যে অমঙ্গল রয়েছে।" বর্ণনাকারী বলেন যে, এরপর মসজিদে ইতর ভদ্র এমন কেউ থাকতো না যে ঘুরে ফিরে নিজের গোড়ালির দিকে চেয়ে দেখতো না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন একটি লোককে নামায পড়তে দেখেন যার পায়ের গোড়ালির এক দিরহাম পরিমাণ চামড়া শুষ্ক ছিল। এ দেখে তিনি উক্ত রূপ মন্তব্য করেন। তখন অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, কারও যদি

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) ও ইমাম হাকিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মুসনাদে রয়েছে।

সামান্য পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থেকে যেতো তবে সে পুনরায় শুরু থেকে অযু করতো। সুতরাং এই হাদীসসমূহ দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পা ধৌত করা ফরয। যদি মাসেহ করা ফরয হতো তবে সামান্য পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থাকায় আল্লাহর নবী (সঃ) জাহান্নামের আগুনের ভয় প্রদর্শন করতেন না। কেননা, মাসেহর সময় পায়ের সব জায়গায় হাত পৌঁছানোই হয় না, বরং মোজার উপর যেভাবে মাসেহ করা হয় সেভাবেই পায়ের উপর মাসেহ করা হয়। এ কথাটাই ইবনে জারীর (রঃ), শী'আদের মোকাবিলায় পেশ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে অযু করতে দেখতে পান যার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি, বরং শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি ফিরে যাও এবং ভালভাবে অযু করে এসো।" ইমাম বায়হাকীও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হযরত খালিদ ইবনে মি'দান (রঃ)-এর মাধ্যমে নবী (সঃ)-এর কোন একজন স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) এমন একজন লোককে দেখতে পান যার পায়ের গোড়ালির উপরিভাগের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল, সেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে পুনরায় অযু করার নির্দেশ দেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি صَلٰوة বা নামায শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ ইসনাদটি উত্তম, মজবুত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত উসমান (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অযুর যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তাতে এও রয়েছে যে, তিনি অঙ্গুলিগুলোর খিলালও করেছিলেন। সুনান গ্রন্থগুলোতে রয়েছে যে, হযরত সাবরা' (রাঃ) রাসূল্লাহ (সঃ)-কে অযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "অযু পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে কর, অঙ্গুলিগুলোর মধ্যে খিলাল কর এবং নাকে উত্তমরূপে পানি দাও। তবে যদি রোযার অবস্থায় থাক তাহলে অন্য কথা।"

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে, তিনি হযরত আমর ইবনে আবসা' (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আমর ইবনে আবসা') বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে অযু সম্পর্কে সংবাদ দিন! তিনি বললেনঃ "যে ব্যক্তি অযুর পানি নিয়ে কুলি করে ও নাকে পানি দেয়, পানির সাথে সাথে ও নাক ঝাড়ার সাথে সাথে তার মুখ ও নাকের ছিদ্র হতে পাপরাশি ঝরে পড়ে। তারপর আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যখন

সে মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন দাড়ির ধার ও দাড়ির চুল হতে পানি ঝরে পড়ার সাথে সাথে তার মুখের পাপরাশি ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে কনুইসহ হাত দু'টি ধৌত করে তখন তার অঙ্গুলির দিক থেকে পাপরাশি ঝরে পড়ে। এর পর যখন সে মাথা মাসেহ্ করে তখন তার চুলের ধার দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তার মাথার পাপরাশি ঝরে পড়ে। তারপর যখন সে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পা দু'টি গোড়ালিসহ ধৌত করে তখন পায়ের অঙ্গুলি দিয়ে পানি টপ টপ করে পড়ার সাথে সাথেই তার পায়ের পাপরাশি দূর হয়ে যায়। অতঃপর যখন সে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণ বর্ণান করতঃ দু'রাকআত নামায আদায় করে তখন সে পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যে, যেন সে আজকেই জন্মগ্রহণ করলো।" এটা শুনে হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আবসা (রাঃ)-কে বললেনঃ আপনি কি বলছেন তা খুব চিন্তা করে দেখুন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে আপনি এরূপই শুনেছেন তো? এ সব কিছুই কি মানুষ একই স্থানে লাভ করে থাকে। হযরত আমর (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "দেখুন আবূ উমামা! আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার অস্থিগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করায় আমার লাভ কি? একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, আমি এটা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মুখে সাতবার বরং তার চেয়েও অধিকবার শুনেছি।" এ হাদীসের ইসনাদ সম্পূর্ণরূপেই বিশুদ্ধ। সহীহ মুসলিমের অন্য সনদযুক্ত হাদীসে রয়েছেঃ "তারপর সে স্বীয় পদদ্বয় ধৌত করে যেমনভাবে ধৌত করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।" সুতরাং জানা গেলো যে, কুরআন কারীমের হুকুম হচ্ছে পা ধুয়ে নেয়া। আবূ ইসহাক সাবীঈ হযরত হারিসের মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ "স্বীয় পদদ্বয় গোড়ালির উপর পর্যন্ত ধৌত কর যেমন তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যে রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বীয় পদদ্বয় জুতার মধ্যেই ভিজিয়ে নেয়া হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ওর ভাবার্থ হচ্ছে জুতার মধ্যে হালকাভাবে ধুয়ে নেয়া। আর চটি জুতা পায়ে থাকলে এভাবে পা ধোয়া যেতে পারে। মোটকথা এ হাদীসও পা ধোয়ার দলীল। অবশ্য এর দ্বারা সংশয়ে পতিত লোকদের খণ্ডন হয়ে থাকে যারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনিভাবে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সম্প্রদায়ের ময়লা ও খড়কুটা ফেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। তারপর পানি চেয়ে নিয়ে অযু করেন এবং স্বীয় স্যাণ্ডেলের উপর মাসেহ করেন। কিন্তু এ

হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে এবং তাতে রয়েছে যে, তিনি স্বীয় মোজার উপর মাসেহ করেন। এগুলো এভাবে একত্রিত করা যেতে পারে যে, তাঁর পায়ে মোজা ছিল এবং মোজার উপর স্যাণ্ডেল ছিল। ঐ দু'টোর উপর তিনি মাসেহ করেছিলেন। এ হাদীসেরও ভাবার্থ এটাই হবে। মুসনাদে আহমাদে আউস ইবনে আবি আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "আমি দেখতে ছিলাম এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) অযু করেন এবং স্বীয় স্যাণ্ডেলের উপর মাসেহ করেন। তারপর নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হন।" এ রিওয়ায়াতটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে এবং তাতে তাঁর খড়কুটোর উপর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, তারপর অযু করা এবং স্যাণ্ডেলদ্বয় ও পদদ্বয়ের উপর মাসেহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হাদীসটি এনেছেন, অতঃপর বলেছেনঃ "এটা মাহমুল হচ্ছে ওর উপর যে, ঐ সময় তাঁর প্রথম অযু ছিল।" কোন মুসলমান এটা কিরূপে মেনে নিতে পারে যে, আল্লাহর ফরয ও তাঁর নবী (সঃ)-এর সুন্নাতের মধ্যে বৈপরীত্ব দেখা দেবে। আল্লাহ এক কথা বলবেন এবং নবী (সঃ) অন্য কিছু করবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চিরস্থায়ী কাজ হিসেবে অযুতে পা ধৌতকরণ দ্বারা এর ফরয হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে। আর আয়াতের সহীহ মতলবও এটাই। যার কান পর্যন্ত এ দলীলগুলো পৌঁছে যাবে, তার উপর আল্লাহর হুজ্জত পূর্ণ হয়ে যাবে। যবরের কিরআত দ্বারা পা ধৌত করা এবং যেরের কিরআতও এরই উপর মাহমুল হওয়ার ফলে ওটা যে ফরয তা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী তো একথাও বলেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা মোজার উপর মাসেহ মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। যদিও হযরত আলী (রাঃ) হতেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, কিন্তু ওর ইসনাদ বিশুদ্ধ নয়, বরং স্বয়ং তাঁর থেকেই বিশুদ্ধতার সাথে এর বিপরীত সাব্যস্ত হয়েছে। আর যাঁরই কথা এটা হোক না কেন, তার এ ধারণাই ঠিক নয়। কেননা, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মোজার উপর মাসেহ করা সাব্যস্ত আছে। মুসনাদে আহমাদে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "সূরায়ে মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পরই আমি মুসলমান হই। আমার ইসলাম গ্রহণের পরে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, হযরত জারীর (রাঃ) প্রস্রাব করেন, তারপর অযু করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনি এরূপ করে

থাকেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি।" হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, জনগণের কাছে এ হাদীসটি খুবই ভাল লাগতো। কেননা, হযরত জারীরের ইসলাম গ্রহণই সূরায়ে মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা ছিল। আহকামের বড় বড় কিতাবগুলোতে ধারাবাহিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা ও কাজের দ্বারা মোজার উপর মাসেহ সাব্যস্ত রয়েছে। এখন মাসেহর জন্যে মুদ্দত বা সময়ের দৈর্ঘ্য আছে কি নেই তা আলোচনার জায়গা এটা নয়। আহকামের কিতাবগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। রাফেযীগণ এতেও মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণ নেই, আছে শুধু অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি। স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় সহীহ মুসলিমে এটা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু রাফেযীরা তা মানে না। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত দ্বারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের নিকাহে মুতআর নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয়েছে, তথাপি শী'আরা ওটাকে বৈধ বলেছে। ঠিক তদ্রূপ এ আয়াতে কারীমা পদদ্বয় ধৌত করার উপর স্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করছে এবং এই কাজটিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারাবাহিক হাদীসসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে, তথাপি শী'আ সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করছে। প্রকৃতপক্ষে এ মাসায়েলের ব্যাপারে তাদের হাত দলীল-প্রমাণ হতে সম্পূর্ণ শূন্য। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। অনুরূপভাবে এ লোকগুলো পায়ের গিঁঠদ্বয়ের ব্যাপারেও আয়াতের ও পূর্ববর্তী গুরুজনদের বিরোধিতা করেছে। তারা বলে যে ওটা পায়ের পিঠের উপর রয়েছে। সুতরাং তাদের নিকট প্রত্যেক পায়ে একটি মাত্র গিঁঠ রয়েছে। আর জমহূরের নিকট গিঁঠের ঐ হাড়গুলো যা পায়ের গোছা ও পায়ের মধ্যভাগে রয়েছে ঐগুলো হচ্ছে (كَعْبَيْنِ)। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর ফরমান এই যে, যে (كَعْبَيْنِ)-এর আলোচনা এখানে হয়েছে ওটা গিঁঠের ঐ হাড় দু'টি যা দু'দিকেই প্রকাশমান রয়েছে, তা একই পায়ে দু'টি গিঁঠ। এটা জনগণের মধ্যেও সুপরিচিত। আর হাদীসের পথ নির্দেশও এর উপরই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) অযু করার সময় ডান পা (كَعْبَيْنِ) বা গিঁঠ দু'টিসহ ধৌত করেন। তারপর বাম পাটিও এভাবেই ধৌত করেন। সহীহ ইবনে খুযাইমা এবং সুনানে আবি দাঊদের মধ্যে রয়েছে, বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! হয় তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা করে

নাও, নয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করে দেবেন।" হাদীসের বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেনঃ তখন থেকে এই অবস্থা দাঁড়ালো যে, প্রতিটি লোক তার পার্শ্ববর্তী লোকের গিঁঠের সাথে গিঁঠ, জানুর সাথে জানু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাখতো। এ বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, (كَعْبَيْنِ) ঐ হাড়ের নাম নয় যা পায়ের পিঠের দিকে রয়েছে। কেননা, পাশাপাশি দাঁড়ানো দু'টি লোকের পক্ষে ওটা মিলানো সম্ভব নয়। বরং ওটা ঐ দু'টি উত্থিত হওয়া হাড় যা পায়ের গোছার শেষ ভাগে রয়েছে। আহলে সুন্নাতের মাযহাব এটাই । ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ইয়াহ্ইয়া ইবনে হারিস তাইমী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ "যায়েদের যে শী'আ সঙ্গীটিকে হত্যা করা হয়েছিল তাকে আমি দেখেছি। তার গিঁঠটি পায়ের পিঠের উপর পেয়েছি। এটা ছিল তার কুদরতী শাস্তি, যা তার মৃত্যুর পরে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সত্যের বিরোধিতা ও সত্য গোপন করার প্রতিফল দেয়া হয়েছে।"

এরপর তায়াম্মুমের নিয়মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে নিসায় হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আয়াতে তায়াম্মুমের শানে নযূলও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে আমীরুল মুমিনীন ইমাম বুখারী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নে দেয়া হলোঃ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার গলার হারটি বায়দা নামক স্থানে পড়ে যায়। আমরা মদীনায় প্রবেশকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সওয়ারীটি থামিয়ে দেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রাঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে তিরস্কারের সুরে বলেনঃ "তুমি হার হারিয়ে দিয়ে লোকদেরকে থামিয়ে দিয়েছো?" এ কথা বলে তিনি আমাকে প্রহার করতে শুরু করেন যার ফলে আমার কষ্টবোধ হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে আমি নড়াচড়া করা হতে বিরত থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে ওঠেন এবং ইতিমধ্যে ফজরের নামাযের সময় হয়ে যায়। সুতরাং তিনি পানি খোঁজ করেন। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। সেই সময় এ পূর্ণ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন হযরত উসাইদ

ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলে ওঠেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)-এর বংশধর, আল্লাহ জনগণের জন্যে তোমাদেরকে কল্যাণময় বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা তাদের জন্যে পুরোপুরি কল্যাণময় হয়ে গেলে।"[১]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ও অসুবিধায় ফেলতে চান না। এজন্যেই তিনি দ্বীনকে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন, কঠিন ও মুশকিল করেননি। হুকুমতো ছিল এই যে, তোমরা পানি দ্বারা অযু করবে। কিন্তু যদি পানি পাওয়া না যায় কিংবা তোমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড় তবে তোমাদেকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হলো। বাকী হুকুমের জন্যে আহকামের কিতাবগুলো দ্রষ্টব্য।

ইরশাদ হচ্ছে–বরং আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অর্থাৎ তাঁর প্রশস্ত আহকাম, কোমলতা, দয়া, সহজকরণ এবং অবকাশ দানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অযুর পরে আল্লাহর রাসূল (সঃ) একটি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তা যেন এ আয়াতেরই আওতাভুক্ত রয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, সুনান এবং সহীহ মুসলিমে হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমরা পালাক্রমে উট চরাতাম। আমি আমার পালার দিন রাত্রে ইশার সময় আগমন করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে জনগণকে কিছু বলতে রয়েছেন। আমি যখন পৌঁছে গেলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনতে পেলামঃ "যে মুসলমান ভালভাবে অযু করে আন্তরিকতার সাথে দু'রাকআত নামায পড়বে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব।" এ কথা শুনে আমি বললাম, বাঃ বাঃ! এটা তো খুবই ভাল কথা। আমার এ কথা শুনে আমার সামনে উপবিষ্ট একজন সাথী বললেনঃ "এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে কথাটি বলেছিলেন তা এর চেয়েও অধিক উত্তম।" আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করে বুঝলাম যে, তিনি হচ্ছেন হযরত উমার ফারূক (রাঃ)। আমাকে তিনি বললেন, তুমি তো এখনই আসলে। তোমার আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ)

১. সুইউতী (রঃ) বলেনঃ হাদীসটি এটাই প্রমাণ করছে যে, আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদের উপর অযু ওয়াজিব ছিল। এ কারণেই পানিশূন্য জায়গায় অবতরণ করাকে তাঁরা খুবই বড় করে দেখেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন যে, আয়াতের প্রথম অংশ অযু ফরয হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর বাকী অংশ তায়াম্মুমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তবে প্রথমটি বেশী ঠিক, কেননা মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সাথে সাথে অযুও ফরয করা হয়। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মদীনায়।

বলেছিলেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর বলে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা-ই খুলে যায়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন কোন মুসলমান বা মুমিন অযু করতে বসে, অতঃপর তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে তার চক্ষুদ্বয়ের সমুদয় পাপ ঝরে পড়ে। অনুরূপভাবে হাত ধোয়ার সময় হাতের সমুদয় পাপ এবং এভাবেই পা ধোয়ার সময় পায়ের সমুদয় পাপ পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে সাথে ঝরে পড়ে। অবশেষে সে পাপসমূহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যায়।" ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি"অযু করার সময় যখন হাত দু'টি ধৌত করে তখন হাত হতে পাপরাশি বিদূরিত হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন মুখমণ্ডল হতে পাপসমূহ দূর হয়ে যায়। যখন মাথা মাসেহ করে তখন মাথার গুনাহ দূরীভূত হয়। যখন পা ধুয়ে নেয় তখন পা হতে পাপরাশি ঝরে পড়ে।" অন্য সনদে মাসেহ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হয়, তার কান হতে, চোখ হতে, হাত হতে এবং পা হতে সমস্ত গুনাহ ঝড়ে পড়ে।" সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অযু হচ্ছে অর্ধেক ঈমান। 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলার কারণে পুণ্যের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে ফেলে। রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ এবং সাদকা হচ্ছে দলীল স্বরূপ। কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। প্রত্যেক লোক সকালে উঠেই স্বীয় প্রাণকে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। অতঃপর সে ওকে মুক্ত করে দেয় অথবা ধ্বংস করে ফেলে।" সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হারাম মালের সাদকা আল্লাহ কবূল করেন না এবং অযু ছাড়া নামাযও কবূল করেন না।"

৭- وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

৭। আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে– আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্নিহিত কথাগুলোরও পূর্ণ খবর রাখেন।

৮- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৮। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবে না, তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয়কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

৯- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ○

৯। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্যে ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।

১০। পক্ষান্তরে যারা কুফরি করেছে এবং আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা জেনেছে, তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী।

١٠- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

১১। হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় এ চিন্তায় ছিল যে, তোমাদের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের হাতকে তোমাদের দিক থেকে থামিয়ে দিয়েছেন, এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

١١- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ ع

এ বিরাট ধর্ম এবং এ মহান রাসূল (সঃ)-কে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের উপর যে ইহসান করেছেন সেটাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকার জন্যে তাদেরকে হিদায়াত করেছেন, যে অঙ্গীকার মুসলমানরা করেছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) অনুগত হবে, তাঁকে সর্ব প্রকারের সাহায্য করবে, দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, নিজেরা তা কবূল করবে এবং অপরের নিকটও তা পৌঁছিয়ে দেবে। ইসলাম গ্রহণের সময় প্রতিটি মুমিন স্বীয় বায়আতে উক্ত জিনিসগুলো স্বীকার করতো। সাহাবায়ে কিরাম নিম্নলিখিত ভাষায় বলেছিলেনঃ "আমরা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করছি যে, আমরা শুনতে থাকবো, মানতে থাকবো। আমাদের মনের চাহিদা হোক বা না-ই হোক অথবা অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হোক না কেন। কোন যোগ্য লোকের নিকট থেকে আমরা কোন কাজ ছিনিয়ে নেবো না।"

ইরশাদ হচ্ছে–তোমরা ঈমান আনছো না কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছেন! আর তিনি তোমাদের নিকট অঙ্গীকারও নিয়েছেন, যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়। এটাও

বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে ইয়াহূদীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে– তোমরা তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারের কথা দিয়েছো, এরপরেও তাঁকে মান্য না করার কি অর্থ হতে পারে? একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের হবার পর আল্লাহ তা'আলা বানূ আদমের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন– আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সবাই স্বীকারোক্তি করেছিল–হ্যাঁ, আমরা এর উপর সাক্ষী থাকলাম। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। সুদ্দী (রঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) একে পছন্দনীয় বলেছেন। সর্বাবস্থায় মানুষের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তিনি অন্তরের ও বক্ষের গোপনীয় কথাও পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন।

ঘোষিত হচ্ছে–হে মুমনিগণ! লোকদেরকে দেখাবার জন্যে নয়, বরং আল্লাহর জন্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ইনসাফের সাথে সঠিক সাক্ষী হয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে একটি দান দিয়ে রেখেছিলেন। তখন আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেনঃ 'আমি এ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারি না যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এর উপর সাক্ষী বানানো হয়।' এ কথা শুনে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমার অনান্য সন্তানদেরকেও কি এরূপ দান দিয়ে রেখেছো?" আমার পিতা উত্তরে বললেনঃ 'না।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম কর। যাও, আমি কোন অত্যাচারের উপর সাক্ষী হতে পারি না।" আমার পিতা তখন ঐ দান আমার নিকট হতে ফিরিয়ে নেন।

ইরশাদ হচ্ছে– কোন সম্পদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদল ও ইনসাফের পথ থেকে সরিয়ে না দেয়।[১] বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, তোমাদের ইনসাফের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। এটাই হচ্ছে তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। এখানে فِعْل ঐ مَصْدَر-এর উপর دَلَالَتْ করেছে যার দিকে ضَمِيْر টি ফিরেছে। এ নযীর কুরআন মাজীদে আরও রয়েছে। আরবদের কথাতেও এর ব্যবহার দেখা যায়। কুরআন কারীমের এক জায়গায় রয়েছে–

১. এখানে 'কওম' দ্বারা ইয়াহূদকে বুঝানো হয়েছে। তারা নবী (সঃ)-কে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল। যেমন ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আর সুহাইলী বলেন যে, এখানে 'কওম' দ্বারা গাওরাস ইবনে হারিস গাতফানীকে বুঝানো হয়েছে।

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যদি কোন বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর, “আর সে সময় তোমাদেরকে বলা হয়– ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্র থাকার কারণ হবে।”(২৪ঃ ২৮) সুতরাং এখানেও هُوَ -এর ضَمِيْر -এর مَرْجَع উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু فِعْل -এর دَلَالَتْ বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ ফিরে যাওয়া। অনুরূপভাবে আয়াতেও এ دَلَالَتْ অর্থাৎ ‘ইনসাফ করা’ বিদ্যমান রয়েছে। এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, এখানে اَقْرَبُ শব্দটি اِسْم تَفْضِيْل -এর রূপ। এটা এমন জায়গায় রয়েছে যে অন্যদিকে আর কিছুই নেই। যেমনঃ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا(২৫ঃ ২৪)-এ আয়াতটিতে রয়েছে। আর যেমন এক মহিলার হযরত উমার (রাঃ)-কে اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এ কথা বলা।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের আমল সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ভাল ও মন্দের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি মুমিনদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে মহান পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত দান করার অঙ্গীকার করেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এ রহমত একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই লাভ করবে, কিন্তু এ রহমতের প্রতি মনোযোগ দেয়ার কারণ হবে তাদের আমল। অতএব, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকারের প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ এবং সব কিছুই তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র। জ্ঞান ও ইনসাফের দাবী তো এটাই যে, মুমিন ও সৎ লোকদেরকে জান্নাত দেয়া হোক এবং কাফির ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হোক। সুতরাং হবেও তাই।

তারপর আল্লাহ পাক নিজের আর একটি নিয়ামতের কথা মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে নবী (সঃ) একটি মনযিলে অবতরণ করেন। জনগণ ছায়াযুক্ত বৃক্ষারাজির খোঁজে বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হাতিয়ার একটি গাছে লটকিয়ে রাখেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁর তরবারীখানা হাতে টেনে নিয়ে বলে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে কে বাঁচাতে পারে? উত্তরে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “মহামহিমান্বিত আল্লাহ (আমাকে বাঁচাবেন) ।” সে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় এ উত্তরই দিলেন। বেদুঈন তৃতীয়বার বললো, “আপনাকে আমা থেকে রক্ষা করবে কে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা বলার সাথে সাথে বেদুঈনের হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে ডাক দিলেন। তাঁরা এসে গেলে তিনি তাঁদের কাছে বেদুঈনের ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। সে তখনও তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি তার কোন প্রতিশোধ নিলেন না। কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, কতগুলো লোক প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তারাই ঐ বেদুঈনকে গুপ্তঘাতক হিসেবে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ করে দেন। সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঐ বেদুঈনের নাম ছিল গাওরাস ইবনে হারিস। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাদেরকে দাওয়াত করে। কিন্তু মহান আল্লাহ এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জানিয়ে দেন। সুতরাং তারা বেঁচে যান। একথাও বলা হয়েছে যে, কা'ব ইবনে আশরাফ এবং তার ইয়াহূদী সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কষ্ট দিতে চেয়েছিল। এটা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন নবী (সঃ) আমেরী লোকদের দিয়াত গ্রহণের জন্যে তাদের নিকট গিয়েছিলেন। ঐ সময় দুষ্টেরা আমর ইবনে জাহাশ ইবনে কা'বকে উত্তেজিত করতঃ বলেছিল– “আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে আলোচনায় লিপ্ত করিয়ে রাখবো, এ সুযোগে তুমি উপর থেকে তাঁর উপর পাথর ফেলে দিয়ে তাঁকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দেবে।” কিন্তু মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে পথেই তাদের দুষ্টামির কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণসহ সেখান হতে ফিরে আসেন। এ আয়াতে ঐ ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে–মুমিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। বিপদ আপদ থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে বানূ নাযীরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং কতক লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

١٢- وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ
إِسْرَائِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ
عَشَرَ نَقِيْبًا ۖ وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ
مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ
وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ
وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ○

১২। আর আল্লাহ্ বানী ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য হতে বারোজন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ বলেছিলেন–আমি তোমাদের সাথে রয়েছি; যদি তোমরা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক। এবং আমার রাসূলদের উপর ঈমান আনতে থাক ও তাদেরকে সাহায্য করতে থাক এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের থেকে মোচন করে দেবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবো যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়লো।

١٣- فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ
لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهٖ ۙ
وَنَسُوْا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ

১৩। বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুনই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম, তারা কালাম (তাওরাত)-কে ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয়, এবং তাদেরকে যা কিছু

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে হারাতে বসেছে, আর আগামীতেও (অবিরত) তাদের কোন না কোন খিয়ানতের সংবাদ তোমার নিকট আসতে থাকবে, তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত, অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাক এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

١٤- وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

১৪। আর যারা বলে-আমরা নাসারা, আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক বড় অংশ হারাতে বসেছে, সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দেবেন।

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে অঙ্গীকার পুরো করা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নিয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখন এ আয়াতগুলোতে তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের নিকট হতে গ্রহণকৃত অঙ্গীকারের হাকীকত ও অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারপর

তারা যখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দেয় তখন তাদের পরিণাম কি হলো তা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বিরত রাখছেন। তাদের বারোজন সর্দার ছিল অর্থাৎ গোত্রের বারোজন চৌধুরী ছিল যারা তাদের নিকট বায়আত গ্রহণ করতো যে, তারা যেন আল্লাহর এ রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে। হযরত মূসা (আঃ) যখন অবাধ্যদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে গমন করেন তখন তিনি প্রত্যেক গোত্রের নেতা হতে একজন করে সর্দার নির্বাচন করে যান। (১) আদবীল গোত্রের নেতা ছিল শামুন ইবনে আকওয়ান, (২) শামউনের চৌধুরী ছিল শাফাত ইবনে জাদ্দী, (৩) ইয়াহূদার নেতা ছিল কালিব ইবনে ইউফনা, (৪) ফীখাইলের নেতা ছিল ইবনে ইউসুফ, (৫) ইফরাঈমের সর্দার ছিল ইউশা ইবনে নূন, (৬) বিন ইয়ামীন গোত্রের চৌধুরী ছিল কিতাতামী ইবনে ওয়াফুন, (৭) যাবুলূনের সর্দার ছিল জাদ্দী ইবনে শূরী, (৮) মিনশারীর নেতা ছিল হাদ্দী ইবনে সূফী, (৯) দান আমলাসিলের সর্দার ছিল ইবনে হামল, (১০) আশা গোত্রের সর্দার ছিল সাতুর, (১১) নাফতালীর সর্দার ছিল বাহর, (১২) ইয়াখারার গোত্রের নেতা ছিল লাবিল। তাওরাতের ৪র্থ খণ্ডে বানূ ইসরাঈলের গোত্রগুলোর সর্দারদের নাম উল্লিখিত রয়েছে। ঐ নামগুলো এবং এ নামগুলোর মধ্যে কিছু গরমিল দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বর্তমান তাওরাতের নামগুলো নিম্নরূপঃ

(১) বানূ আদবীল গোত্রের নেতা সুফী ইবনে সাদুন, (২) বানূ শামউনের সর্দার শামওয়াল ইবনে সূর, (৩) বানূ ইয়াহূদার সর্দার হাশূর ইবনে উমাইয়াযার, (৪) বানূ ইয়াসখারের নেতা শাল ইবনে সাউন, (৫) বানূ যাবুলূর নেতা আলাইয়াব ইবনে হালূব, (৬) বানূ ফারাইয়ামের সর্দার মিনশা ইবনে গামছুর, (৭) বানূ মিনশার নেতা হামইয়াঈল, (৮) বানূ বিন ইয়ামীনের নেতা আবদীনা, (৯) বানূ দানের সর্দার জাইযার, (১) বানূ আশারের নেতা নাহাবিল, (১১) বানূ কানের সর্দার সায়েফ ইবনে দাওয়াবীল এবং (১২) বানূ নাফতারীর নেতা আজযা'।

এটা স্মরণীয় বিষয় যে, লাইলাতুল আকাবায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আনসারদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ করেন সে সময় তাঁদের সর্দারও বারজনই ছিলেন। আউস গোত্রের ছিলেন তিনজন। তাঁরা হলেনঃ (১) হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ), (২) হযরত সা'দ ইবনে হালীমা (রাঃ) এবং

(৩) হযরত রুফাআ ইবনে আবদুল মুগযির (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় হযরত রুফাআর (রাঃ) স্থলে হযরত আবদুল হাইসাম ইবনে তাইহান (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। বাকী নয়জন সর্দার ছিলেন খাযরাজ গোত্রের মধ্য হতে। তাঁরা হচ্ছেনঃ (১) আবূ উমামাহ আসআদ ইবনে যারারাহ (রাঃ), (২) সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ), (৩) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ), (৪) রাফি ইবনে মালিক ইবনে আজলান (রাঃ), (৫) বারা ইবনে মারূর (রাঃ), (৬) উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ), (৭) সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ), (৮) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) এবং (৯) মুনযির ইবনে আমর ইবনে খামরাস (রাঃ) । এ সর্দারগণ নিজ নিজ কওমের পক্ষ থেকে শেষ নবী (সঃ)-এর হাতে শ্রবণ করার ও মান্য করার বায়আত গ্রহণ করেন। হযরত মাসরূক (রাঃ) বলেনঃ আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর পাশে বসেছিলাম। তিনি সে সময় আমাদেরকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন –এ উম্মতের ক'জন খলীফা হবেন এ কথা কি আপনারা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ যখন থেকে আমি ইরাকে এসেছি, আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে এটা জিজ্ঞেস করেননি। এ সম্বন্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "বারোজন হবে। বানী ইসরাঈলের দলপতিদেরও এ সংখ্যাই ছিল।"

সনদের দিক দিয়ে এ হাদীসটি গারীব বটে, কিন্তু হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারাও সাব্যস্ত হয়েছে। হযরত জাবির ইবনে সামরা (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– "মানুষের কাজ চলতে থাকবে যে পর্যন্ত তাদের অলী বারোজন হবে।" তারপর নবী (সঃ) একটি কথা বলেন যা আমি শুনতে পাইনি। আমি তখন অন্যকে জিজ্ঞেস করি–নবী (সঃ) এখন কি বললেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ "তারা সব কুরাইশ হবে।" সহীহ মুসলিমে এ শব্দই রয়েছে। এ হাদীসের ভাবার্থ এই যে, বারোজন সৎ খলীফা হবেন যাঁরা হক প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং লোকদের মধ্যে আদল ও ইনসাফ কায়েম করবেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা সবাই পর্যাক্রমেই হবেন। তাঁদের মধ্যে চারজন খলীফা তো পর্যাক্রমেই হয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ হযতর আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)। এ চারজন খলীফার খিলাফত নবুওয়াতের তরীকা অনুযায়ীই ছিল। ঐ বারোজন খলীফার মধ্যে পঞ্চম হচ্ছেন

উমার ইবনে আবদুল আযীয। বানূ আব্বাসের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ খলীফা ছিলেন। কিয়ামতের পূর্বে এ বারো সংখ্যা পূর্ণ হওয়া অবশ্যই জরুরী। তাঁদের মধ্য হতেই একজন হচ্ছেন ইমাম মাহ্দী (রঃ), যাঁর সুসংবাদ হাদীসে এসেছে। নবী (সঃ)-এর নামে তাঁর নাম হবে এবং নবী (সঃ)-এর পিতার নামে তাঁর পিতার নাম হবে। তিনি ভূ-পৃষ্ঠকে আদল ও ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন। অথচ তাঁর পূর্বে পৃথিবী অত্যাচার ও অনাচারে ভরপুর থাকবে। কিন্তু শী'আ সম্প্রদায় যে ইমামের জন্যে অপেক্ষমান রয়েছে তিনি সেই ইমাম নন। শী'আদের ঐ ইমামের আসলে তো কোন অস্তিত্বই নেই। এটা তো শুধু তাদের ধারণা ও কল্পনা মাত্র। এ হাদীস শী'আদের বারো ফিরকার ইমামদেরকে বুঝায় না।

এ হাদীসকেই ঐ বারোজন ইমামের উপর মাহ্মুল করাও শী'আদের ঐ ফিরকার বানানো কথা মাত্র। এটা তো তাদের অজ্ঞতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতাই প্রমাণ করে। তাওরাতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর শুভ সংবাদের সাথে সাথে লিখিত আছে যে, তাঁর বংশের মধ্যে বারোজন মহান ব্যক্তি হবেন। এর দ্বারাও মুসলমানদের এ বারোজন কুরায়েশী বাদশাহকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যেসব ইয়াহূদী মুসলমান হয়েছিল তারা ছিল অন্য। তারা নিজেদের ইসলামে কাঁচা ছিল এবং সাথে সাথে মূর্খও ছিল। তারা হয় তো শী'আদের কানে এটা ফুঁকে দিয়েছিল এবং এর ফলেই তারা মনে করে নিয়েছিল যে, এর দ্বারা বারোজন ইমামকে বুঝানো হয়েছে। নতুবা হাদীসে তো পরিষ্কারভাবে এর উল্টোই বিদ্যমান রয়েছে।

এখন ঐ আহাদ ও অঙ্গীকারের আলোচনা করা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের নিকট গ্রহণ করেছিলেন। সেই অঙ্গীকার এই যে, তারা নামায পড়বে, যাকাত দেবে, আল্লাহর রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করবে, তাদের সাহায্য সহানুভূতি করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেদের মাল খরচ করবে। তারা যদি এ সব কিছু পালন করে তবে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাদের সাথে থাকবে, তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে। আর তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হবে এবং তাদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তারা যদি এ অঙ্গীকারের পরও তা থেকে ফিরে যায় এবং ওগুলো পালন না করে তবে অবশ্যই তারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সুতরাং হলোও তা-ই। তারা অঙ্গীকার ভেঙ্গে দিলো

এবং ওয়াদা খেলাফ করলো। তখন তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হলো, তারা হিদায়াত থেকে দূরে সরে পড়লো, তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, তারা ওয়াজ-নসীহতে মোটেই উপকৃত হলো না, তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিগ্ড়ে গেল, আল্লাহর কথাকে তারা হেরফের করতে লাগলো এবং ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে লাগলো। কালামুল্লাহর প্রকৃত ভাবার্থ যা হবে তা পরিবর্তন করে দিয়ে অন্য ভাবার্থ বুঝতে ও বুঝাতে লাগলো এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ঐসব মাসআলা বর্ণনা করতে লাগলো যা আল্লাহ্ বলেননি। অবশেষে আল্লাহর কিতাব তাদের হাত থেকে ছুটে গেল এবং তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-আমল হয়ে গেল, আর তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতে লাগলো। দ্বীনের আসল আমল যখন তাদের হাত থেকে ছুটে গেল তখন ফুরূঈ আমল কিরূপে কবূল হতে পারে? আমল ছুটে যাওয়ার কারণে না অন্তর ঠিক থাকলো, না স্বভাব ভাল থাকলো, না আন্তরিকতা রইলো। প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে নিজেদের নীতিতে অভ্যাস বানিয়ে নিলো। আর তারা নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের বিরোধিতা করতে লাগলো।

নবী (সঃ)-কে বলা হচ্ছে– তুমি তাদেকে ক্ষমা ও মার্জনা করতে থাক। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উত্তম হবে। হযরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি তোমার সাথে আল্লাহর নাফরমানীমূলক ব্যবহার করে, তুমি তাকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান কর।" এতে যৌক্তিকতা ও পরিণামদর্শিতা এই রয়েছে যে, ফলে সে হয় তো ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত নসীব করবেন।

ইরশাদ হচ্ছে–আল্লাহ্ সৎকর্মশীদের ভালবাসেন। অর্থাৎ যারা অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করতঃ তার সাথে সৎ ব্যবহার করে, এরূপ লোককে আল্লাহ খুবই ভালবাসেন। কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

ঘোষণ করা হচ্ছে–খ্রীষ্টানদের নিকট থেকেও আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তারা আমার প্রেরিত রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনবে, তাঁকে সাহায্য করবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে। কিন্তু ইয়াহূদীদের মত তারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। তারা আজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল অপর দলকে কাফির ও অভিশপ্ত বলছে এবং নিজেদের উপাসনালয়েও আসতে দেয় না। মালেকিয়্যাহ দল ইয়াকুবিয়্যাহ দলকে খোলাখুলিভাবে কাফির বলছে। এরূপ সমস্ত দলই করতে রয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দেবেন। এ কথা দ্বারা খ্রীষ্টানদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা মহান আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করা হবে। আল্লাহ তো হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। আর তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউই নেই।

১৫। হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে, তোমরা কিতাবের যেসব বিষয় গোপন কর তন্মধ্য হতে বহু বিষয় সে তোমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে, আর বহু বিষয় (প্রকাশ করা) বর্জন করে, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব (কুরআন)।

١٥- يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝

১৬। তা দ্বারা আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে, এবং তিনি তাদেরকে নিজ তাওফীকে ও করুণায় (কুফরীর) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল (সঠিক) পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

١٦- يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে হিদায়াত ও দ্বীনে হকসহ সমস্ত মাখ্লুকের নিকট পাঠিয়েছেন। মুজিযা ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাঁকে দান করেছেন। যে কথাগুলো ইয়াহূদ ও নাসারাগণ বদলিয়ে দিয়েছিল, ভুল ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ বানিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল, কিতাবুল্লাহর যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকূল ছিল তা তারা গোপন করে দিয়েছিল। ঐ সব কিছুই এ রাসূল (সঃ) প্রকাশ করে দেন। তবে যেগুলো বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই সেগুলো তিনি বর্ণনা করেন না। মুসতাদরিকে হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি রজম বা ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার মাসআলাকে অস্বীকার করলো সে অজ্ঞতা বশতঃ কুরআন কারীমকে অস্বীকার করলো। কেননা,এ আয়াতে ঐ রজমকেই গোপন করার উল্লেখ রয়েছে। [১]

এরপর মহান আল্লাহ কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন যে, তিনিই তাঁর প্রিয় নবী (সঃ)-এর উপর তাঁর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সত্য সন্ধানীদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেয়, লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ কিতাবের কারণে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ লাভ করা এবং তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া খুবই সহজ। এটা ভ্রান্তিকে বিদূরিতকারী এবং হিদায়াতকে প্রকাশকারী।

১৭। অবশ্যই তারা কাফির যারা বলে- নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মাসীহ ইবনু মারইয়াম, তুমি (হে মুহাম্মাদ সঃ)! বল, তাহলে যদি আল্লাহ মাসীহ ইবনু মারইয়ামকে ও তার মাকে

١٧- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا

১. ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, ইয়াহূদীরা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে রজম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে বললেনঃ 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত কে?' তারা ইঙ্গিতে ইবনে সুরিয়াকে দেখালো। তখন তিনি তাকে সেই আল্লাহর কসম দিলেন যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন এবং বানী ইসরাঈলের উপর তূর পাহাড় ও অঙ্গীকার তুলে ধরেছিলেন। তখন সে বললোঃ "যখন আমাদের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো তখন ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে একশ চাবুক মারার ও মাথা মুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর রজমের বিধান জারী করেন। সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

إِنْ أَرَادَ أَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সবকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তবে এরূপ কে আছে যে তাদেরকে আল্লাহ হতে একটুও রক্ষা করতে পারে? আল্লাহর জন্যেই প্রভুত্ব নির্দিষ্ট রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুর উপর; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৮- وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ أَبْنٰٓؤُا اللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

১৮। ইয়াহূদী ও নাসারাগণ বলে—আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র, তুমি বলে দাও, আচ্ছা তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের দরুন কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র। তিনি যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, আর আল্লাহর প্রভুত্ব রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও; আর সবকে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা খ্রীষ্টানদের কুফরের কথা বর্ণনা করছেন যে, তারা আল্লাহরই সৃষ্টকে তাঁরই মর্যাদা প্রদান করছে। অথচ আল্লাহ শিরক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্ত বস্তুই তাঁর অনুগত এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। সবকিছুরই উপরই তাঁর আধিপত্য রয়েছে। এমন কেউ নেই যে তাঁকে তাঁর ইচ্ছে থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি তিনি মাসীহ (আঃ)-কে, তাঁর মাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সৃষ্টজীবকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তবুও কারও শক্তি নেই যে, তাঁর সামনে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে বাধা প্রদান করে। সমস্ত প্রাণী ও সৃষ্ট বস্তুর উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। সকলের মালিক ও অধিকর্তা তিনিই। তিনি যা চান তা-ই করেন। কোন জিনিসই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নেই। কেউই তাঁর কাজের কোন হিসাব নিতে পারে না। তাঁর রাজত্ব ও সাম্রাজ্য খুবই প্রশস্ত। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুবই উচ্চ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি মহাকারিগর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই ভাঙ্গেন ও গড়েন। তাঁর শক্তির কোন সীমা নেই।

খ্রীষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান উভয়েরই দাবীকে খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, তারা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা) ও প্রিয় পাত্র। তারা নবীদের পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজেদের কিতাব থেকে নকল করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈল (আঃ)-কে বলেছিলেনঃ اَنْتَ اِبْنِىْ بِكْرِىْ অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভাবার্থ বদলিয়ে দিয়ে বলে–তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তাঁর পুত্র ও প্রিয়পাত্র হলাম। অথচ তাদেরই মধ্যে যারা ছিল জ্ঞানী ও বিবেচক তারাও তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিল যে, এ শব্দগুলো দ্বারা হযরত ইসরাঈল (আঃ)-এর শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর দ্বারা তাঁর আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ অর্থেরই আয়াত খ্রীষ্টানেরা নিজেদের কিতাব থেকে নকল করেছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى اَبِىْ وَ اَبِيْكُمْ، يَعْنِىْ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ-এর দ্বারাও প্রকৃত পিতাকে বুঝায় না, বরং তাদের পরিভাষায় আল্লাহর জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হতো। অতএব, এর ভাবার্থ হবে–আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর নিকট যাচ্ছি। আর এর দ্বারা এটাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে এ আয়াতে যে সম্পর্ক হযরত ঈসা (আঃ)-এর রয়েছে ঐ সম্পর্কই তাঁর সমস্ত উম্মতের দিকেও রয়েছে। কিন্তু এ

লোকগুলো নিজেদের ভুল আকীদায় আল্লাহর সাথে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যে সম্পর্ক স্থাপন করতো, নিজেদের ব্যাপারে তা মনে করতো না। সুতরাং এ শব্দ শুধুমাত্র সম্মান ও মর্যাদার জন্যেই ছিল, অন্য কিছুর জন্যে ছিল না।

আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তর দিচ্ছেন–যদি এটা ঠিকই হয় তবে তোমাদের কুফ্র ও মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন কেন? কোন একজন সুফী একজন ফিকাহ্শাস্ত্রবিদকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কুরআন মাজীদের মধ্যে কোন জায়গায় এটাও কি আছে যে, বন্ধু স্বীয় বন্ধুকে শাস্তি দেন না? তিনি এর কোন উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। সুফী তখন এ আয়াতটিই পাঠ করলেন। এই উক্তিটি খুবই উত্তম। আর এরই দলীল হচ্ছে মুসনাদের এ হাদীসটি যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে পথ চলছিলেন। একটি ছোট ছেলে পথে খেলা করছিল। তার মা যখন দেখলো যে, একটি বিরাট দল ঐ পথ দিয়েই আসছেন তখন সে ভয় পেয়ে গেল যে, না জানি তাঁরা তার ছেলেকে পদতলে পিষ্ট করে ফেলবেন। তাই সে "আমার ছেলে আমার ছেলে" বলতে বলতে দৌড়িয়ে আসলো এবং অতি তাড়াতাড়ি তার ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিলো। এই দেখে সাহাবীগণ বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ মহিলাটি তো তার প্রিয় ছেলেটিকে কখনও আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "ঠিক কথাই বটে। আল্লাহ তা'আলাও কখনও তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবেন না।"

ইয়াহূদীদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ অন্যান্য মানুষের মত তোমারও মানুষই বটে। অন্যান্য লোকদের উপর তোমাদের কোনই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর মহা বিচারক এবং তিনিই হচ্ছেন তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালাকারী; তিনি যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। তাঁর কোন হুকুমকেই কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। তিনি সত্বরই বান্দাদের কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণকারী। যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের সমুদয় মখলুক তাঁরই অধিকারে রয়েছে। সবকিছুরই প্রভু তিনিই। সমস্তই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই বান্দাদের ফায়সালা করবেন। তিনি অত্যাচারী নন, তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি পুণ্যবানদেরকে শান্তি এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। নো'মান ইবনে আ'সা, বাহ্র ইবনে উমার, শাস ইবনে আদী প্রমুখ ইয়াহূদীদের বড় বড় আলেমগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাদেরকে অনেক বুঝালেন। শেষ পর্যন্ত

তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখালেন। তখন তারা বললো, “জনাব! আপনি আমাদেরকে কিসের ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা তো আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র।” খ্রীষ্টানেরাও এ কথা বলতো, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তারা পরস্পরের মধ্যে বানিয়ে সানিয়ে এ কথাটিও ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইসরাঈল (আঃ)-এর নিকট প্রত্যাদেশ করেছিলেন—তোমার প্রথম পুত্রটি আমার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। তার সন্তানরা চল্লিশদিন পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। এ সময়ের মধ্যে আগুন তাদেরকে পবিত্র করে দেবে এবং তাদের গুনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেবে। তারপর একজন ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবেনঃ “ইসরাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে যারই খৎনা করা আছে সে যেন বেরিয়ে আসে।” কুরআন কারীমে তাদের যে উক্তিটি বর্ণিত আছে তার অর্থ এটাই যে, তারা বলেঃ “আমাদেরকে গণনাকৃত কয়েকটি দিন মাত্র জাহান্নামে থাকতে হবে।”[১]

১৯- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ع

১৯। হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট আমার রাসূল (মুহাম্মাদ সঃ) এসে পৌঁছেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম) বলে দিচ্ছে, যে সময় রাসূলদের আগমনের সূত্র (দীর্ঘকাল) বন্ধ ছিল, যেন তোমরা (কিয়ামতের দিন) এরূপ বলে না বস যে আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেনি; (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ আমি তোমাদের সকলের নিকট স্বীয় রাসূল (সঃ) পাঠিয়েছি, যে শেষ নবী, যার পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না। দেখো, হযরত ঈসা (আঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন রাসূলের আগমন ঘটেনি। এ সুদীর্ঘ সময়ের পরে এ নবী আগমন করেছে। কেউ কেউ বলেন যে, এ দীর্ঘ সময় ছিল ছ'শ বছর। কারও কারও মতে ওটা ছিল সাড়ে পাঁচশ বছর। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তা ছিল পাঁচশ চল্লিশ বছর। অন্য কারও মতে তা ছিল চারশ বছর এবং আরও ত্রিশ বছরের কিছু বেশী। ইবনে আসাকির (রঃ) শা'বী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ "হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া এবং আমাদের নবী (সঃ)-এর মদীনায় হিজরত করার মাঝে ৯৩৩ বছরের ব্যবধান ছিল।" কিন্তু সঠিক উক্তি হচ্ছে প্রথমটিই অর্থাৎ ছ'শ ত্রিশ বছর। এ দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যেতে পারে যে, প্রথম উক্তি সূর্য মাস হিসেবে এবং দ্বিতীয় উক্তি চান্দ্র মাস হিসেবে। এ গণনায় প্রতি তিনশ বছরে আট বছরের ব্যবধান হয়ে যাবে। এ জন্যেই আহলে কাহাফের ঘটনায় রয়েছে—

وَلَبِثُوا فِى كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

অর্থাৎ "তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করে এবং আরও নয় বছর বাড়িয়ে দেয়।" (১৮ঃ ২৫) সুতরাং সূর্য হিসেবে তাদের গর্তে অবস্থানের সময়কাল আহলে কিতাবের যা জানা ছিল তা ছিল তিনশ বছর। তার সাথে ন'বছর বাড়িয়ে দিয়ে চন্দ্র হিসেবে পূর্ণ হয়ে গেল। এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, বানী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ) হতে নিয়ে সাধারণভাবে বানী আদমের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আসেননি। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অন্যান্য লোকদের তুলানায় ঈসা (আঃ)-এর সাথে আমার সম্পর্ক বেশী রয়েছে। কেননা, আমার ও তাঁর মাঝে কোন নবী নেই।" ঐ হাদীস দ্বারা এসব লোকের ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা মনে করে যে, এ দুই মর্যাদা সম্পন্ন নবীর মাঝে আরও একজন নবী ছিলেন। যার নাম খালিদ ইবনে সিনান। যেমন কাযাঈ প্রমুখ লোক বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, শেষ নবী আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) দুনিয়ার বুকে ঐ সময় আগমন করেছেন যে সময় রাসূলগণের শিক্ষা লোপ পেয়েছিল, তাঁদের পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, দুনিয়া তাওহীদ বা একত্ববাদকে ভুলে গিয়েছিল, স্থানে স্থানে মাখলুকের পূজা শুরু হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও

মূর্তিপূজা চলছিল, আল্লাহর দ্বীন বদলে গিয়েছিল, দ্বীনের আলোর উপর কুফরীর অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল, দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আদল ও ইনসাফ এমনকি মনুষ্যত্ব পর্যন্ত দুনিয়া হতে মুছে গিয়েছিল, মূর্খতা ও অজ্ঞতার শাসন চালু হয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় কতক লোক ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেউ ছিল না। অতএব জানা গেল যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বেশী ছিল এবং তিনি যে প্রেরিতত্বের কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা কোন সাধারণ প্রেরিতত্ব ছিল না।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আইয়ায ইবনে হাম্মাদুল মাজেশেঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) একদা খুৎবায় বলেনঃ আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যা জান না তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। আল্লাহ আমাকে আজই জানিয়ে দিয়েছেন—আমি আমার বান্দাদেরকে যা কিছু দান করেছি তার সবই তাদের জন্যে হালাল করেছি। আমি আমার সকল বান্দাকেই একত্ববাদীরূপে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের কাছে এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং আমার হালালকৃত বস্তু তাদের উপর হারাম করে দেয়। আর সে তাদেরকে বলে যে, তারা যেন কোন দলীল না থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং সমস্ত আরব ও আজমকে অপছন্দ করেছেন, শুধু বানী ইসরাঈদের কতক লোককে নয় যারা তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারপর তিনি আমাকে বলেছেনঃ আমি তোমাকে এজন্যেই নবী করে প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করবো এবং তোমারই কারণে অন্যদেরকেও পরীক্ষা করে নেবো। আমি তোমার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানিতে ধুয়ে ফেলতে পারবে না, যাকে তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করে থাক। অতঃপর আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেই। আমি তখন বললাম—হে আল্লাহ! এরা তো আমার মাথায় আঘাত করে রুটির মত করে দেবে। তখন আমার প্রভু আমাকে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বের করে দাও যেমন তারা তোমাকে বের করে দিয়েছে। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তোমাকে সাহায্য করা হবে। তুমি তাদের উপর খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। তুমি তাদের মোকাবিলায় সেনাবাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার উপর আরও পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করবো। তুমি অনুগতদেরকে নিয়ে অবাধ্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

জান্নাতী লোক তিন প্রকারের। (১) ন্যায়পরায়ণ, সৎ ব্যবহাকারী ও দান খয়রাতকারী বাদশাহ। (২) দয়ালু ব্যক্তি, যিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও মুসলমানের সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করে থাকেন। (৩) ঐ ব্যক্তি, যিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও হারাম থেকে বেঁচে থাকেন, অথচ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। আর জাহান্নামী লোক পাঁচ প্রকারের। (১) ঐ দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর লোক, যার কোন ধর্ম নেই। সে অধীনস্থ লোক এবং তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও মালধন নেই। (২) ঐ খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যার দাঁত ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসের উপরও লেগে থাকে এবং সে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের প্রতি খিয়ানত করতেও ছাড়ে না। (৩) এসব লোক, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় জনগণকে তাদের পরিবার ও মালধনে ধোঁকা দিয়ে থাকে। (৪) কৃপণ অথবা (বর্ণনাকরীর সন্দেহ) মিথ্যাবাদী। (৫) অকথ্য ভাষা প্রয়োগকারী। এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতেও রয়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রেরণের সময় ভূ-পৃষ্ঠে কোন সত্য ধর্ম বিদ্যমান ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্ত পথ থেকে বের করে আলো ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরীয়ত দান করেন, যাতে তাদের ওযর পেশ করার কোন অবকাশ না থাকে এবং তারা একথা বলার সুযোগ না পায় যে, তাদের কাছে কোন নবী-রাসূল আগমন করেননি এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেননি ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শন করেননি। সুতরাং ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত নবী (সঃ)-কে সারা বিশ্বের হিদায়াতের জন্যে প্রেরণ করেন। আমাদের মহান প্রভু তাঁর বাধ্য ও অনুগত বান্দাদেরকে জান্নাতী শান্তি প্রদানে এবং অবাধ্য বান্দাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদানে পূর্ণভাবে সক্ষম।

২০। আর যখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো- হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন, এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কাউকেও দান করেননি।

٢٠- وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২১। হে আমার সম্প্রদায়! এ পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٢١- يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

২২। তারা বললো–হে মূসা (আঃ)! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোক রয়েছে; অতএব, তারা যে পর্যন্ত সেখান হতে বের হয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনও প্রবেশ করবো না। হ্যাঁ যদি তারা সেখান হতে বেরিয়ে যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা যেতে প্রস্তুত আছি।

٢٢- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○

২৩। সেই দু'ব্যক্তি, যারা (আল্লাহকে) ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (এবং) যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বললো–তোমরা তাদের উপর (আক্রমণ চালিয়ে নগরের) দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে; এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

٢٣- قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

٢٤- قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا
لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا
فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ
فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

২৪। তারা বললো– হে মূসা ! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবো না যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে, অতএব, আপনি ও আপনার প্রভু (আল্লাহ্) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকবো।

٢٥- قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا
نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

২৫। মূসা বললো–হে আমার প্রভু! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাই-এর উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

٢٦- قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى
الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ ○ ع

২৬। তিনি (আল্লাহ্) বললেন– (তা হলে মীমাংসা এই যে) এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এদের হস্তগত হবে না, এরূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে মাথা কোটে ফিরতে থাকবে; সুতরাং তুমি এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে (একটুও) বিষণ্ন হয়ো না।

হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ঐ নিয়ামতের একথা স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই মধ্য হতে একের পর এক নবী পাঠাতে রয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পর হতে আজ পর্যন্ত তাঁরই বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত রয়েছে। এসব নবী তোমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে রয়েছেন।

এ ক্রমপরম্পরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর শেষ হয়েছে। অতঃপর নবী ও রাসূলদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে পরিপূর্ণ নবুওয়াত দান করা হয়। তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনিই ছিলেন সমস্ত নবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। হে আমার কওম! তোমরা আরও স্মরণ কর যে, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে বাদশাহ বানিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে খাদেম, স্ত্রী এবং ঘরবাড়ী দান করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে কোন লোকের স্ত্রী, খাদেম ও ঘরবাড়ী থাকলেই তাকে বাদশাহ বলা হতো। ইবনে জারীর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে একটি লোক জিজ্ঞেস্ করেনঃ "আমি কি মুহাজির দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত নই।" তিনি (আবদুল্লাহ) উত্তরে বলেনঃ "তোমার কি স্ত্রী রয়েছে?" তিনি বলেনঃ 'হ্যাঁ'। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার কি ঘরবাড়ী রয়েছে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ"; তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "তাহলে তো তুমি ধনীদেরই অন্তর্ভুক্ত।" লোকটি তখন বললেনঃ "আমার খাদেমও রয়েছে।" এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ "তুমি তাহলে বাদশাহদেরই অন্তর্ভুক্ত।" হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, যার সওয়ারী, খাদেম ও ঘরবাড়ী রয়েছে সেই বাদশাহ। কাতাদার (রঃ) উক্তি এই যে, প্রথম প্রথম বানী ইসরাঈলের মধ্যেই খাদেমদের প্রচলন হয়েছিল। একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যার কাছে খাদেম, সওয়ারী ও স্ত্রী থাকতো তাকেই বাদশাহ বলা হতো। আর একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, যার ঘরবাড়ী ও খাদেম রয়েছে সে বাদশাহ। এ হাদীসটি 'মুরসাল' ও 'গারীব'। একটি হাদীসে আছে– "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় সকাল করলো যে, তার শরীর সুস্থ, তার প্রাণে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং সারাদিনের জন্যে যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ খাবারও তার কাছে রয়েছে, সে যেন সারা দুনিয়াকেই পেয়ে বসেছে।" সেই সময় যে ইউনানী, কিবতী ইত্যাদি ছিল তাদের চেয়ে এদেরকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আয়াতে রয়েছে– আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা

দিয়েছিলাম। যখন বানী ইসরাঈল মুশরিকদের দেখাদেখি হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ বানাতে বললো তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে উত্তরে বলেছিলেনঃ "তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা দান করেছেন।" এর ভাবার্থ সব জায়গায় একই যে, আল্লাহ্ পাক বানী ইসরাঈলকে সেই যুগের সমস্ত মানুষের উপর ফযীলত দান করেছিলেন। কেননা, এটাতো প্রমাণিত বিষয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদী তাদের অপেক্ষা সবদিক দিয়েই উত্তম। কেননা, স্বয়ং কুরআন কারীমে ঘোষণা করা হচ্ছে- كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ (৩ঃ ১১০) এবং অন্য জায়গায় বলা হয়েছে- وَجَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (২ঃ ১২৪)

একথাও বলা হয়েছে যে, এ ফযীলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকেও বানী ইসরাঈলদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন 'মান' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য অবতরণ করা, মেঘ দ্বারা ছায়া দান করা ইত্যাদি, যা ছিল সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের উক্তি ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- তাদেরকে সেই সময়ের লোকদের উপর ফযীলত দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের দাদা হযরত ইয়াকূব (আঃ)- এর যুগে বায়তুল মুকাদ্দাস প্রকৃতপক্ষে তাদেরই দখলে ছিল এবং যখন তারা সপরিবারে মিসরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট চলে গিয়েছিল তখন তথায় আমালেকা জাতি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাদের হাত পা ছিল অত্যন্ত শক্ত। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় তোমাদের দখলে এনে দেবেন।" কিন্তু বানী ইসরাঈল ভীরুতা প্রদর্শন করতঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা অমান্য করলো। এরই শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে 'তীহ' ময়দানে উদ্বিগ্ন অবস্থায় অবস্থান করতে হলো। مُقَدَّسَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, اَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ দ্বারা তূর পর্বত ও ওর চার পাশের ভূমিকে বুঝানো হয়েছে এবং ওটাকে 'ঈলিয়া' বলা হয়। একটি বর্ণনায় اَرِيْحَاءُ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা, اَرِيْحَاءُ কে জয় করা উদ্দেশ্যও ছিল না এবং ওটা তাদের পথের উপরেও ছিল না। কারণ, ফিরাউনের ধ্বংস সাধনের পর তারা মিসর শহর থেকেই আসছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পথে ভ্রমণ করছিল। এটা হতে পারে যে, ওটা ঐ বিখ্যাত শহরই হবে যা তূর পর্বতের দিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল।

'যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন'-এর ভাবার্থ এই যে, বানী ইসরাঈলকে বলা হচ্ছে– তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইসরাঈল (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছিলেন যে, ঐ পুণ্যভূমি তিনি তাঁর পরবর্তী মুমিন সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করবেন। সুতরাং হে বানী ইসরাঈল! তোমরা যখন ওটাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছ তখন তোমরা ধর্মত্যাগী হয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে পড়ো না, নতুবা তোমরা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে।

তারা তখন উত্তরে হযরত মূসা (আঃ)-কে বললোঃ আপনি আমাদেরকে যে শহরে যেতে বলছেন এবং যে শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, তারা যে খুব শক্তিশালী বীর পুরুষ তা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং আমরা তাদের সাথে মোকাবিলা করতে পারবো না। আর যে পর্যন্ত তারা ঐ শহরে বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত আমরা ওর মধ্যে প্রবেশ করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম থাকবো। তবে যদি তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা তথায় প্রবেশ করবো। এটা ছাড়া আপনার নির্দেশ পালন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ)'আরীহা'র নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি বারোজন গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। বানী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্র থেকে তিনি একজন করে গুপ্তচর গ্রহণ করলেন। অতঃপর সঠিক সংবাদ আনয়নের জন্যে তাদেরকে আরীহায় প্রেরণ করলেন। এ লোকগুলো তথায় গিয়ে তাদের মোটা দেহ ও শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলো। তারা সবাই একটা বাগানে অবস্থান করছিল। ঘটনাক্রমে বাগানের মালিক ফল পাড়ার জন্যে তথায় আগমন করলো। সে ফল পেড়ে নিয়ে ফলের সাথে সাথে ঐগুলোকেও গাঁঠরির মধ্যে ভরে নিলো এবং বাদশাহর সামনে হাযির হয়ে ফলের গাঁঠরি খুলে ফেললো। গাঁঠরির মধ্যে এরা সবাই ছিল। বাদশাহ তাদেরকে বললেনঃ "এখন তো আমাদের শক্তি অনুমান করতে পেরেছো। আমি তোমাদেরকে হত্যা করছি না। যাও, তোমাদের লোকদের কাছে ফিরে আমাদের সম্পর্কে অবহিত কর।" সুতরাং তারা ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো, যার ফলে বানী ইসরাঈল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু এ হাদীসটির ইসনাদ ঠিক নয়।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, তাদের মধ্যে একটি লোক ঐ বারোজন লোককে ধরে ফেললো এবং স্বীয় চাদরের গাঁঠরিতে তাদেরকে বেঁধে ফেললো এবং শহরে নিয়ে গিয়ে জনগণের সামনে তাদেরকে নিক্ষেপ করলো। তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ "তোমরা কোথাকার লোক?" তারা উত্তরে বললোঃ "আমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কওমের লোক। আপনাদের খবরাখবর নেয়ার জন্যে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।" তারা এমন একটি আঙ্গুর তাদেরকে প্রদান করলো যা একটি লোকের জন্যে যথেষ্ট ছিল। আর তারা তাদেরকে বললোঃ "যাও, তোমরা তোমাদের লোকদেরকে বলে দাও যে, এটা হচ্ছে তাদের ফল।" তারা ফিরে গিয়ে স্বীয় কওমের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে ঐ শহরে প্রবেশ করার ও শহরবাসীদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলো–আপনি ও আপনার প্রভু গমন করুন, অতঃপর যুদ্ধ করুন, আমরা এখান হতে নড়ছি না।

হযরত আনাস (রাঃ) একটি বাঁশ মেপে নেন যার দৈর্ঘ ছিল পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন হাত। অতঃপর তিনি ওটা গেড়ে দিয়ে বলেনঃ "ঐ আমালীকদের দেহ এ পরিমাণ লম্বা ছিল।" মুফাসসিরগণ অনেক ইসরাঈলী রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, ঐ লোকগুলোর এ পরিমাণ শক্তি ছিল, তারা এ পরিমাণ মোটা ছিল এবং এতোটা লম্বা ছিল। আওজ ইবনে আনাক ইবনে হযরত আদম (আঃ) তাদেরই মধ্যে একজন ছিল যার দেহ ছিল তিন হাজার তিনশ তেত্রিশ গজ লম্বা এবং দেহের প্রস্থ ছিল তিন গজ। কিন্তু এসব একেবারেই বাজে কথা এবং এ কথা উল্লেখ করাই লজ্জাজনক ব্যাপার। এগুলো সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে ষাট হাত লম্বা করে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর আজ পর্যন্ত মখলুকের দেহের দৈর্ঘ হ্রাস পেতে আছে। এই ইসরাঈলী রিওয়ায়াতগুলোতে এও রয়েছে যে, আওজ ইবনে আনাক কাফির ও জারজ ছিল। সে হযরত নূহ (আঃ)-এর তুফানের সময় বিদ্যামান ছিল। সে নূহ (আঃ)-এর সাথে নৌকায় উঠেনি। তথাপি পানি তার জানু পর্যন্ত পৌঁছেনি। এটাও একেবারে ভিত্তিহীন, বাজে ও মিথ্যা কথা। কুরআন কারীমের এটা সম্পূর্ণ উল্টো। কুরআন মাজীদে হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রার্থনার উল্লেখ আছে। তিনি প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ "হে আমার প্রভু! ভূ-পৃষ্ঠে একজন কাফিরও যেন রক্ষা না পায়।" প্রার্থনা কবূলও হয়েছিল। আর হয়েছিলও তা-ই। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে– "আমি নূহ (আঃ)-কে এবং তার

নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করেছিলাম এবং সমস্ত কাফিরকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।” স্বয়ং কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে– “যাদের উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে তারা ছাড়া আজকের দিন কেউই রক্ষা পাবে না।” বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, স্বয়ং নূহ (আঃ)-এর ছেলেও ঈমানদার ছিল না বলে রক্ষা পায়নি, অথচ কাফির ও জারজ সন্তান আওজ ইবনে আনাক বেঁচে গেল। এটা আকল ও নাকল উভয়েরই বিপরীত। বরং আওজ ইবনে আনাক বলে যে কোন লোক ছিল এটাই তো আমরা বিশ্বাস করি না। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

বানী ইসরাঈল যখন তাদের নবীকে মানলো না বরং বেআদবী করলো, তখন যে দু'ব্যক্তির উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছিল তাঁরা তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তাঁদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল যে, বানী ইসরাঈলের শয়তানীর কারণে না জানি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। এক কিরআতে يَخَافُوْنَ শব্দের পরিবর্তে يُخَـابُـوْنَ শব্দ রয়েছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কওমের মধ্যে ঐ দু'ব্যক্তির ইজ্জত ও সম্মান ছিল। একজনের নাম ছিল হযরত ইউশা' ইবনে নূন এবং অপরজনের নাম ছিল হযরত কালিব ইবনে ইউফনা। তাঁরা দু'জন তাদেরকে বললেনঃ “যদি তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, তাঁর রাসূলের অনুগত হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং স্বয়ং তিনি তোমাদেরকে শক্তি ও সাহায্য দান করবেন। তোমরা এই শহরে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করবে। তোমরা দরজা পর্যন্ত তো চল এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, বিজয় লাভ তোমাদেরই হবে।” ঐ কাপুরুষের দল তখন তাদের প্রথম উত্তরকে আরও মজবুত করে বললোঃ “এই প্রতাপশালী কওমের বিদ্যমানতায় আমরা একটি কদমও বাড়াতে পারবো না।” হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে তাদেরকে অনেক বুঝালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে বিনয়ও প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা কোনক্রমেই মানলো না। এই অবস্থা দেখে হযরত ইউশা এবং হযরত কালিব নিজেদের কাপড় ফেড়ে ফেললেন এবং তাদেরকে অনেক ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু সেই হতভাগার দল অবাধ্যতার উপর অটল থাকলো। এমনকি এটাও বলা হয়েছে যে, তারা ঐ মহান ব্যক্তিদ্বয়কে পাথর মেরে শহীদ করে দিয়েছিল। হঠকারিতার তুফান শুরু হয়ে গেল এবং তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে অবিচল থাকলো।

হযরত মূসা (আঃ)-এর কওম বানী ইসরাঈলের এই অবস্থাকে সামনে রেখে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। মক্কার ৯০০ বা ১০০০ কাফির যখন তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গমন করলো, তখন সেই কাফেলা তো অন্য পথ ধরে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেল, কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গমনকারী কাফিররা নিজেদের শক্তির দাপটের কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্ষতি সাধন ব্যতিরেকে মক্কা ফিরে যাওয়া অপমানজনক মনে করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পদতলে পিষ্ট করার ইচ্ছায় মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এই অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে নিজেদের জান, মাল এবং স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে রেখে দিয়ে বললেনঃ "আপনিই এগুলোর মালিক। আমরা সংখ্যাও দেখতে চাই না, বিজয়ও দেখতে চাই না, বরং আমরা চাই শুধু আপনার নির্দেশের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে।" সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রাঃ) এ ধরনের বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর মুহাজির সাহাবীদের মধ্য থেকে কয়েকজন এ প্রকারের ভাষণ দিলেন। কিন্তু এর পরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে মুসলমানগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।" এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল আনসারদের আন্তরিক বাসনা অবগত হওয়া। কেননা, ওটা স্থান ছিল তাদেরই স্থান এবং তাঁরা ছিলেন মুহাজিরদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী। তখন হযরত সা'দ ইবনে মুআয্ (রাঃ) নামক আনসারী দাঁড়িয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মনে হয় আপনি আমাদের (আনসারদের) মনের ইচ্ছা জানতে চাচ্ছেন। তাহলে শুনুন! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আপনি দেখবেন যে, আমাদের মধ্যে একজনও এমন থাকবে না যে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি আগ্রহের সাথে আমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলার জন্যে নিয়ে চলুন, আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে স্থির পদে টিকে থাকি তা আপনি দেখতে পাবেন। আপনি জেনে নেবেন যে, আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে সত্য বলে জানি। আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে পড়ুন। আমাদের বীরত্ব ও ধৈর্য দেখে ইনশাআল্লাহ আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা হবে।"এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল

(সঃ) খুশী হয়ে যান এবং আনসারদের এই কথা তাঁর কাছে খুবই ভাল মনে হয় (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করেন। হযরত উমার (রাঃ) কিছু বক্তব্য পেশ করেন। তার পর আনসারগণ বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি আমাদের নিকট থেকে কিছু শুনতে চান তবে শুনুন! আমরা বানী ইসরাঈলদের মত নই যে, বলবো– আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকছি। বরং আমাদের উত্তর হচ্ছে– আপনি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে জিহাদের জন্যে চলুন। আমরা আমাদের জান ও মালসহ আপনার সাথে রয়েছি।" হযরত মিকদাদ আনসারীও (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে এ কথাই বলেছিলেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মিকদাদ (রাঃ)-এর এই কথায় খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যুদ্ধের সময় আপনি দেখে নেবেন যে, আপনার সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে আমরাই রয়েছি।" (হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন) "যদি আমি এমন সুযোগ পেতাম যাতে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে এ রকম সন্তুষ্ট করতে পারতাম (তবে কতই না ভাল হতো)।"একটি বর্ণনায় হযরত মিকদাদ (রাঃ)-এর এই উক্তিটি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে বর্ণিত আছে, যখন মুশরিকরা তাঁকে উমরার জন্যে বায়তুল্লাহর দিকে যাওয়ার পথে বাধা প্রদান করেছিল এবং কুরবানীর জন্তুও যবেহ স্থলে পৌঁছতে পারেনি। সেই সময় তিনি বলেছিলেনঃ "আমি তো আমার কুরবানীর জন্তু নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছে কুরবানী করতে চাই।" তখন হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেনঃ আমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর আসহাবের মত নই। এটা ওদের জন্যেই সম্ভব হয়েছে যে, ওরা ওদের নবীকে বলেছিল– "আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে রয়েছি।" বরং আমরা বলি– হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি চলুন, আপনার প্রতি আল্লাহর সাহায্য থাকবে এবং আমরা সবাই আপনার সাথে রয়েছি। এ কথা শুনে অন্যান্য সাহাবীগণও তাঁর কাছে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার ওয়াদা করতে শুরু করলেন। সুতরাং এই বর্ণনায় যদি হুদায়বিয়ার কথাই উল্লেখ থাকে তবে হতে পারে যে, তিনি (মিকদাদ) বদরের দিনও এ কথা বলেছিলেন এবং হুদায়বিয়ার দিনও এটা বলেছিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ কথা শুনে হযরত মূসা (আঃ)-এর তাঁর উম্মতের উপর ভীষণ রাগ হয় এবং তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানান– "হে রাব্বুল আলামীন! আমার অধিকার তো শুধু নিজের উপর এবং ভাই-এর উপর রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।" মহান আল্লাহ তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করলেন এবং বললেনঃ এরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এখান থেকে যেতে পারবে না। তারা 'তীহ্' ময়দানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কোনক্রমেই তারা এর সীমানার বাইরে যেতে পারবে না। এখানে তারা কতগুলো বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক বিষয় অবলোকন করলো। যেমন তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া দান করণ, 'মান' ও 'সালওয়া' অবতরণ, তাদের কাছে বিদ্যমান একটি পাথর হতে পানি বের হওয়া ইত্যাদি। হযরত মূসা (আঃ) ঐ পাথরকে লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্রই ওর মধ্য হতে বারোটি প্রস্রবণ বেরিয়ে পড়লো। প্রত্যেক গোত্রের দিকে একটি করে ঝরণা বয়ে যেতে লাগলো। এ ছাড়াও বানী ইসরাঈল তথায় আরও মুজিযা দেখলো। এখানে তাওরাত অবতীর্ণ হলো, আল্লাহর আহকাম নাযিল হলো ইত্যাদি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা উদ্বিগ্নভাবে ঐ ময়দানেই ঘুরাফেরা করলো এবং সেখান থেকে বের হবার কোন পথ পেলো না। হ্যাঁ, তবে তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া করা হয়েছিল এবং 'মান' ও 'সালওয়া' তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। ফুনুনের লম্বা চওড়া হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এসব বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হযরত হারূনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর কালীমুল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) ইন্তেকাল করেন। তারপর তাঁর খলীফা হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-কে নবী করা হয়। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বানী ইসরাঈলের মৃত্যু ঘটে। এমনকি বলা হয় যে, শুধুমাত্র হযরত ইউশা (আঃ) ও কালিব (আঃ) অবশিষ্ট থাকেন।

কোন কোন মুফাসসির 'সানাতান' শব্দের উপর পূর্ণভাবে وَقْف করেন এবং আরবায়ীনা সানাতান শব্দ দু'টিকে نَصَبْ -এর অবস্থা মেনে থাকেন এবং বলেন যে, এর عَامِل হচ্ছে ইয়াতীহুনা ফিল আরযে শব্দগুলো। এ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে কয়জন বানী ইসরাঈল অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে নিয়ে হযরত ইউশা (আঃ) বেরিয়ে পড়েন। অন্যান্য পাহাড় থেকেও বাকী বানী ইসরাঈল তাঁর সাথী হয়ে যায়। হযতর ইউশা (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। জুমআর দিন আসরের পরে যখন বিজয়ের সময় উপস্থিত হয় তখন শত্রুদের পাগুলো অচল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমআর দিনের মর্যাদার কারণে সে যুগে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে সেই দিন

আর যুদ্ধ করা চলতো না। এ জন্যে আল্লাহর নবী (হযরত ইউশা) বললেনঃ 'হে সূর্য! তুমিও তো আল্লাহরই দাস। আর আমি তাঁরই অধীনস্থ বান্দা। হে আল্লাহ একে আরও কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখুন।' সুতরাং আল্লাহর নির্দেশক্রমে সূর্য থেমে গেল এবং তিনি মনমত যুদ্ধ করে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে নিলেন। আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলোঃ বানী ইসরাঈলকে বলে দাও যে, তারা যেন সিজদা করা অবস্থায় এ শহরের দরজায় প্রবেশ করে এবং حِطَّةٌ (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পাপ মার্জনা করুন!) বলে। কিন্তু তারা আল্লাহর এ হুকুমকে বদলিয়ে দিলো এবং হামাগুড়ি দিয়ে চললো, আর মুখে حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ- এ শব্দগুলো উচ্চারণ করতে থাকলো। বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এটুকু বেশী রয়েছে যে, বানী ইসরাঈল এ যুদ্ধে এতো বেশী গনীমতের মাল লাভ করেছিল যা তারা ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী ওগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে আগুনের পার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু ওগুলো আগুনে পুড়লো না। তখন হযরত ইউশা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ অবশ্যই এ মাল থেকে কিছু চুরি করেছে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের নেতা যেন আমার নিকট এসে আমার হাতে হাত রাখে।" তাই করা হলো। একটি গোত্রের নেতার হাত নবীর হাতের সাথে লেগে গেলো। নবী (ইউশা আঃ) বললেনঃ 'এ খিয়ানতের জিনিস তোমার নিকট রয়েছে সুতরাং তুমি ওটা নিয়ে আসো।' সে সোনার তৈরী গরুর একটি মাথা নিয়ে আসলো যার চক্ষুগুলো ছিল ইয়াকুতের তৈরী এবং দাঁতগুলো ছিল মুক্তার তৈরী। অন্য মালের সাথে ওটিকেও যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন সমস্তই আগুনে পুড়ে গেল। ইমাম ইবনে জারীরও (রাঃ) এ উক্তিটি পছন্দ করেছেন।

আরবাঈনা সানাতান-এর عَامِل হচ্ছে فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ শব্দগুলো। বানী ইসরাঈলের এ দলটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঐ তীহের ময়দানে উদ্বিগ্নভাবে ফিরতে থাকে। তারপর মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে। পূর্ববর্তী ইয়াহূদী আলেমদের ইজমাই হচ্ছে এর দলীল যে, আউজ ইবনে আনাককে হযরত মূসাই (আঃ) হত্যা করেছিলেন। তাহলে যদি তার হত্যা আমালীকের এ যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা হতো তবে বানী ইসরাঈলের আমলীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করার কোনই কারণ থাকতো না। সুতরাং বুঝা গেল যে, এটা হচ্ছে 'তীহ' হতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরবর্তী ঘটনা।

ইয়াহূদী আলেমদের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, বালআ'ম ইবনে বাউর আমালীক সম্প্রদায়ের প্রতাপশালীদেরকে সাহায্য করেছিল এবং সে হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর বদদু'আ করেছিল। এ ঘটনাটিও ঐ ময়দান থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে ঘটেছিল। কেননা, এর পূর্বে তো প্রতাপশালীদের হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর কওম হতে ভয়ই ছিল না। ইবনে জারীর (রঃ)-এর এটাই দলীল। তিনি এ কথাও বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি ছিল দশ হাত এবং তার দেহও ছিল দশ হাত। তিনি ভূমি হতে দশ হাত লাফিয়ে গিয়ে আউজ ইবনে আনাককে ঐ লাঠি দ্বারা মেরেছিলেন যা তার পায়ের গিটে লেগেছিল এবং তাতেই সে মারা গিয়েছিল। তার দেহ দ্বারা নীল নদের সাঁকো বানানো হয়েছিল যার উপর দিয়ে বহু বছর ধরে নীলবাসী যাতায়াত করতো। নাওফ বাককালী বলেন যে, তার সিংহাসনটি তিনশ গজের ছিল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ তুমি তোমার কওম বানী ইসরাঈলের জন্যে কোন দুঃখ করো না। তারা ঐ জেলখানারই যোগ্য।

সুতরাং এ ঘটনায় ইয়াহূদীদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে এবং এতে তাদের বিরুদ্ধাচরণের ও দুষ্টামির বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহর এ শত্রুরা বিপদের সময়ও তাঁর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকছে না। তারা রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করছে না ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন তাঁর বিদ্যমানতায় তাঁর অঙ্গীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ব দিচ্ছে না। দিন রাত তারা তাঁর মুজিযা দেখতে রয়েছে এবং ফেরাউনের বিধ্বস্তি স্বচক্ষে দেখেছে, অথচ অল্প দিনও অতিবাহিত হয়নি এবং স্বয়ং সম্মানিত নবী সঙ্গে রয়েছেন, তথাপি তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতাই প্রদর্শন করছে। তারা আল্লাহ্র নবীর সাথে বে-আদবী করছে এবং স্পষ্টভাবে জবাব দিয়ে দিচ্ছে। তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের ন্যায় সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ বাদশাহকেও তার সাজ-সরঞ্জাম, লোক-লস্কর ও প্রজাসহ ডুবিয়ে মেরেছেন! তথাপি তারা সেই আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ঐ গ্রামবাসীর দিকে ধাবিত হচ্ছে না এবং তাঁর হুকুম পালন করছে না। অথচ তারা তো ফিরাউনের দশ ভাগের একভাগও ছিল না! ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে তাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পাবে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে

মনে করলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে তারা পতিত হয়েছিল। তাদেরকে শূকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল। এখানে তারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত হয়ে পারলৌকিক স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি।

٢٧- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

২৭। [হে নবী (সঃ)!] তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবীল ও কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী উপস্থিত করলো এবং তন্মধ্য হতে একজনের (হাবীলের) তো কবূল হলো এবং অপরজনের কবূল হলো না; সেই অপরজন বলতে লাগলো– আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবো; সেই প্রথম জন বললো– আল্লাহ মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন।

٢٨- لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৮। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হস্ত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবো না; আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।

٢٩- إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِينَ ۝

২৯। আমি চাই যে, (আমার দ্বারা কোন পাপ না হোক) তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও; অনন্তর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে।

٣٠- فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ۝

৩০। অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুললো, সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লো।

٣١- فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يٰوَيْلَتٰىٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَأُوٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِينَ ۝ ۚ

৩১। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যেন সে তাকে (কাবীলকে) শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগলো—আমার অবস্থার প্রতি আফসোস! আমি কি ঐ কাকের সমতুল্য হতে এবং স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ ঢেকে ফেলতে অক্ষম হয়ে গেলাম! ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো।

এ কাহিনীতে হিংসা-বিদ্বেষ, ঔদ্ধত্য ও অহংকারের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, কিভাবে আদম (আঃ)-এর দুই সহোদর পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং একজন আল্লাহর ভয়ে অত্যাচারিত অবস্থায় মারা যায় ও জান্নাতে

স্বীয় বাসস্থান বানিয়ে নেয়; আর অপরজন তার প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে বিনা কারণে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং উভয় জগতে ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! আহলে কিতাবদেরকে তুমি হযরত আদম (আঃ)-এর দু'টি সন্তানের সঠিক কাহিনী শুনিয়ে দাও।' তাদের নাম ছিল হাবীল ও কাবীল। বর্ণিত আছে, ঐ সময়টা ছিল দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থা। তাই সেই সময় একই উদরে দু'টো সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তখন একটি গর্ভের ছেলের সাথে আর একটি গর্ভের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়া হতো। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিল না, কিন্তু কাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। সুতরাং কাবীল নিজের যমজ বোনকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। হযরত আদম (আঃ) তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফায়সালা হলো যে, তারা উভয়ে যেন আল্লাহর নামে কিছু কুরবানী করে। যার কুরবানী কবূল হবে, মেয়েটির সাথে তারই বিয়ে দেয়া হবে। হাবীলের কুরবানী কবূল হয়, যার বর্ণনা কুরআন কারীমের এ আয়াতগুলোতে রয়েছে। মুফাস্সিরদের উক্তিগুলো নিম্নে দেয়া হলোঃ

হযরত আদম (আঃ)-এর ঔরসজাত সন্তানদের বিয়ের নিয়ম যা উপরে উল্লিখিত হলো তা বর্ণনা করার পর বর্ণিত আছে যে, বড় ভাই কাবীল কৃষি কাজ করতো এবং ছোট ভাই হাবীল ছাগলের মালিক ছিল। হাবীলের বোনের তুলনায় কাবীলের বোনটি ছিল অপেক্ষাকৃত সুন্দরী। তাকে বিয়ে করার জন্যে যখন হাবীলের প্রস্তাব যায়। তখন কাবীল তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে চায়। এতে হযরত আদম (আঃ) তাকে বাধা প্রদান করেন। তখন উভয়েই আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করলো যে, যার কুরবানী কবূল হবে সেই তাকে বিয়ে করবে। হযরত আদম (আঃ) সেই সময় মক্কাভূমির পথে যাত্রা শুরু করেন যে, দেখা যাক কি ঘটে? আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে বললেনঃ "ভূ-পৃষ্ঠে আমার যে ঘরটি রয়েছে তা তুমি চেনো কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "না।" আল্লাহ বললেনঃ "ওটা মক্কায় রয়েছে। তুমি সেখানে চলে যাও।" হযরত আদম (আঃ) আকাশকে বললেনঃ "তুমি কি আমার সন্তানদেরকে হিফাযত করবে?" আকাশ তা অস্বীকার করলো। তখন যমীনকে ঐ কথা বললেন। যমীনও অস্বীকৃতি জানালো। তারপর তিনি পাহাড়গুলোকে বললেন। তারাও অস্বীকার করলো। তারপর তিনি কাবীলকে ঐ কথা বললে সে বললোঃ "হ্যাঁ, আমি রক্ষক হয়ে গেলাম। আপনি ফিরে এসে দেখে নেবেন এবং খুশী হবেন।" এখন হাবীল একটি মোটাতাজা মেষ আল্লাহর নামে যবেহ করলেন এবং বড় কাবীল স্বীয় ভূমির শস্যের একটা অংশ আল্লাহর

নামে বের করলো। আগুন এসে হাবীলের নযর তো জ্বালিয়ে ফেললো, যা ছিল সে যুগে কুরবানী গৃহীত হওয়ার নিদর্শন, কিন্তু কাবীলের নযর গৃহীত হলো না। তার ভূমির শস্য যা ছিল তা-ই থাকলো। সে ওটাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার পর শিষ হতে ভালভাল দানাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। এখন কাবীলের তার বোনকে বিয়ে করার আশার গুড়ে বালি পড়ে গিয়েছিল। তাই সে তার ভাই হাবীলকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। তখন হাবীল বলেছিলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের কুরবানীই কবূল করে থাকেন। এতে আমার অপরাধ কি আছে?" একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, এ মেষটিকেই জান্নাতে পালন করা হয়েছে এবং এটা ঐ মেষ যাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রের বিনিময়ে যবেহ করেছিলেন। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হাবীল স্বীয় জানোয়ারগুলির মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় জন্তু আল্লাহর নামে খুশী মনে কুরবানী করেছিলেন। পক্ষান্তরে কাবীল স্বীয় কৃষিভূমির অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের শস্য আল্লাহর নামে বের করেছিল, সেটাও আবার খুশী মনে বের করেনি। হাবীলের দৈহিক শক্তিও কাবীল অপেক্ষা বেশী ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে স্বীয় ভ্রাতা কাবীলের অত্যাচার ও বাড়বাড়ি নীরবে সহ্য করলেন এবং ভাইয়ের উপর হাত উঠালেন না। বড় ভাইয়ের কুরবানী যখন কবূল হলো না এবং হযরত আদম (আঃ) তাকে এ কথা বললেন তখন সে তাঁকে বললোঃ "আপনি হাবীলকে ভালবাসেন বলে তার কুরবানী কবূল করবার জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, ফলে তার কুরবানী কবূল হয়েছে।" এখন সে হাবীলকে হত্যা করে ফেলার দৃঢ় সংকল্প করে বসলো। সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একদিন ঘটনাক্রমে হাবীলের বাড়ী আসতে বিলম্ব হয়। তখন হযরত আদম (আঃ) তাঁকে ডেকে আনার জন্যে কাবীলকে প্রেরণ করেন। সে তখন গুপ্তভাবে একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পথেই দু'ভাইয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। তখন কাবীল তাঁকে বলেঃ "আমি তো তোমাকে মেরে ফেলবো। কেননা, তোমার কুরবানী কবূল হয়েছে, আর আমার কুরবানী কবূল হয়নি।" তখন হাবীল বললেনঃ "আমি উত্তম ও প্রিয় জিনিস আল্লাহর নামে কুরবানী দিয়েছি, আর তুমি খারাপ ও নিকৃষ্ট জিনিস তাঁর নামে কুরবানী দিয়েছো। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরই কুরবানী কবূল করে থাকেন।"এতে সে আরও বিগড়ে গেল এবং পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। হাবীল বলতেই থাকলেনঃ "তুমি আল্লাহকে কি উত্তর দেবে? আল্লাহর কাছে তোমার এ অত্যাচারের প্রতিশোধ জঘন্যভাবে গ্রহণ করা হবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে হত্যা করো না।" কিন্তু সেই নিষ্ঠুর কাবীল নিজের ভাই হাবীলকে মেরে ফেললো।

কাবীল তার যমজ বোনকেই বিয়ে করার আরও একটা কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেঃ "আমরা দু'জন জান্নাতে জন্মগ্রহণ করেছি, আর এরা দু'জন (হাবীল ও তার যমজ বোন) পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং আমার যমজ বোনকে বিয়ে করার হক আমারই রয়েছে।" এও বর্ণিত আছে যে, কাবীল গম বের করেছিল এবং হাবীল গরু কুরবানী করেছিলেন। তখন তো কোন মিস্কীন ছিল না যে, তাকে সাদকা দেয়া যাবে। তাই এ প্রথা চালু ছিল যে, যে সাদকা দেয়া হতো, আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিতো। এটা ছিল সাদকা কবূল হওয়ার নিদর্শন। ছোট ভাই এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন বলে বড় ভাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করে বসে। তারা যে বিয়ের মতানৈক্য দূর করার উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছিল তা নয় বরং এমনিই তারা তা করেছিল। কুরআন কারীমের প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, বড় ভাই কাবীলের ছোট ভাই হাবীলের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল তার কুরবানী না হওয়া, অন্য আর কোন কারণ ছিল না। আর একটি বর্ণনায় উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর বিপরীত কথা রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, কাবীল তার যে শস্য আল্লাহর নামে নযর দিয়েছিল তা কবূল হয়েছিল। কিন্তু জানা যাচ্ছে যে, এতে বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি ঠিক নেই এবং এটা প্রসিদ্ধ বিষয়ের উল্টোও বটে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

"আল্লাহ মুত্তাকীদের আমলই কবূল করে থাকেন।" হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত থাকবে এমন সময় একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলবেনঃ "মুত্তাকীরা কোথায়?" তখন মুত্তাকীরা আল্লাহর কুদরতী ডানার নীচে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাদের থেকে কোনই পর্দাই করবেন না, বরং প্রত্যক্ষভাবে তাদেরকে দেখা দেবেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ আফীফকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "মুত্তাকী কে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "মুত্তাকী তারাই যারা শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকে এবং খাঁটি অন্তরে আল্লাহরই ইবাদত করে।" অতঃপর এসব লোক জান্নাতে চলে যাবে।

হাবীল বললেনঃ "তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হস্ত প্রসারিত কর তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াবো না। আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।" শক্তিতে তো তিনি ভাই অপেক্ষা ঊর্ধ্বে ছিলেন। তথাপি সততা, বিনয়, নম্রতা এবং তাকওয়ার কারণেই তিনি এ কথা বললেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে (একে

অপরকে হত্যা করার জন্য) তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি অপরাধী হবে কেন?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "কারণ এই যে, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার লোভ করেছিল।" ইমাম আহমাদ (রঃ) বাশার ইব্ন সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন বিদ্রোহীগণ উসমান (রাঃ)-এর বাড়ী অবরোধ করেছিলেন তখন সা'দ ইব্ন আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "অচিরেই হাঙ্গামা লেগে যাবে, সেই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দৌড়ালু অপেক্ষা উত্তম হবে।" কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যদি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছে করে (তাহলে আমি কি করব)?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সে সময় তুমি আদমের পুত্রের মত হয়ে যাও।' একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিলেন। আইউব সুখ্তইয়ানী বলেন যে, সর্বপ্রথম যিনি এ আয়াতের উপর আমল করেছিলেন তিনি হলেন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ)।

একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি জন্তুর উপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর পিছনে বসেছিলেন হযরত আবূ যার (রাঃ)। তিনি বললেনঃ "হে আবূ যার (রাঃ)! আচ্ছা বলতো, যখন মানুষ এমন দারিদ্রের সম্মুখীন হবে যে, তারা (ক্ষুধার কারণে) বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্তও যেতে পারবে না, তখন তুমি কি করবে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর যা নির্দেশ হবে তা-ই করবো।" তিনি বললেনঃ "যখন পরস্পরের মধ্যে খুনাখুনি শুরু হয়ে যাবে, এমনকি মরুভূমির পাথরও রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে, তখন কি করবে?" (হযরত আবূ যার রাঃ বলেন) আমি ঐ উত্তরই দিলাম। তিনি বললেনঃ "বাড়ীতেই অবস্থান করবে এবং দরজা বন্ধ রাখবে।" আমি বললাম, আমি যদি তাতে অংশগ্রহণ না করি তবুও কি? তিনি বললেনঃ "তুমি যাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যেই চলে যাবে এবং সেখানেই অবস্থান করবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি অস্ত্র ধারণ করবো না কেন? তিনি বললেনঃ "তাহলে তুমিও তাদের মধ্যেই শামিল হয়ে গেলে। বরং যদি কারও তরবারীর ঝলক তোমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে তবে তখনও তুমি তোমার মুখের উপর কাপড় দিয়ে দেবে যাতে সে তোমার ও তার নিজের পাপগুলো নিয়ে যায়।" হযরত রাবঈ (রঃ) বলেন, আমরা হযরত হুযাইফা (রাঃ)-এর জানাযায় হাযির ছিলাম। একজন লোক বললেনঃ আমি এঁর (হযরত হুযাইফার) মুখে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)

হতে শোনা হাদীসগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেনঃ "তোমরা যদি পরস্পর লড়াই কর তবে আমি আমার সবচেয়ে দূরের বাড়ীতে চলে যাবো এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়বো। যদি সেখানেও কেউ ঢুকে পড়ে তবে আমি তাকে বলে দেবো, তুমি তোমার ও আমার পাপরাশি তোমার মাথায় উঠিয়ে নাও। আমি হযরত আদম (আঃ)-এর দু'পুত্রের মধ্যে যিনি উত্তম ছিলেন তাঁর মতই হয়ে যাবো।"

"আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও" –এ কথা হাবীল কাবীলকে বলেছিলেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে–হে কাবীল! তুমি ইতিপূর্বে যে পাপ করেছো তা এবং এখন আমাকে হত্যা করার পাপ, এ সমস্তই নিয়ে তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে এটাই আমি চাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, আমার নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ সবগুলোই তুমি তোমার মাথায় উঠিয়ে নাও। আমি (ইবনে কাসীর) বলি যে, সম্ভবতঃ মুজাহিদ (রহঃ)-এর এ দ্বিতীয় উক্তিটি সাব্যস্ত নয়। এর উপর ভিত্তি করেই কতক লোক বলেন যে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ নিজের মাথায় বহন করবে। আর এ অর্থের একটি হাদীসও রয়েছে। কিন্তু এর কোন ভিত্তি নেই। হাফিয আবূ বকর আল বায্যায (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বিনা কারণে হত্যা (নিহত ব্যক্তির) সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়।" এ হাদীসটি উপরে বর্ণিত হাদীসের অর্থে না হলেও এটাও বিশুদ্ধ হাদীস নয়। আর এ রিওয়ায়াতের ভাবার্থ এটাও হবে যে, হত্যার কষ্টের কারণে আল্লাহ্ নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন। এখন ঐ পাপ কি হত্যাকারীর উপর এসে যাবে? এ কথাটি সাব্যস্ত নয়। তবে কতক হত্যাকারী ঐরূপও হতে পারে। কিয়ামতের মাঠে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে খুঁজতে থাকবে এবং তার অত্যাচার মোতাবেক তার পুণ্য নিতে থাকবে। পুণ্য নেয়ার পরেও যদি অত্যাচার শেষ না হয় তবে নিহত ব্যক্তির পাপ হত্যাকারীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তাহলে হতে পারে যে, নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপই কতক হত্যাকারীর মাথার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কেননা, অত্যাচারের এভাবে বদলা নেয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, হত্যা সবচেয়ে বড় অত্যাচার এবং অতি জঘন্য কাজ। আল্লাহ্ তা'আলাই সবেচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এ বাক্যের বিশুদ্ধতম অর্থ হচ্ছে– হে কাবীল! আমি চাই যে, তুমি নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ সমস্তই নিজের উপর নিয়ে নেবে। তোমার অন্যান্য পাপের সাথে এই একটি পাপও বেড়ে যাক। আমার পাপও তোমার ঘাড়ে চেপে বসুক–এ বাক্যের ভাবার্থ কখনও এটা হতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।' তাহলে এটা কিরূপে সম্ভব হবে যে, নিহত ব্যক্তির সারা জীবনের পাপ হত্যাকারীর স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়া হবে? এখন বাকী থাকছে এই কথা যে, হাবীল তাঁর ভাইকে এ কথা কেন বললেন? এর উত্তর এই যে, তিনি শেষবারের মত তাকে উপদেশ দেন এবং ভয় প্রদর্শন করেন যে, সে যেন এ কাজ থেকে বিরত থাকে, নতুবা সে পাপী হয়ে জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে। কারণ, তিনি তো তার মোকাবিলা করছেন না। সুতরাং সমস্ত পাপের বোঝা তার উপরই পড়বে এবং সেই অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে। আর অত্যাচারীদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

(এই উপদেশ সত্ত্বেও) তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃহত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলো। সুতরাং সে তাঁকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ শয়তান কাবীলকে তার ভাই এর হত্যার প্রতি উত্তেজিত করলো এবং সে স্বীয় নাফসে আম্মারার অনুসরণ করলো আর লোহা দ্বারা তাঁকে মেরে ফেললো। একটি বর্ণনায় আছে যে, হাবীল স্বীয় পশুপাল নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গিয়েছিলেন, আর এদিকে কাবীল তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ওখানে গিয়ে পৌঁছে যায়। সে একটি ভারী পাথর উঠিয়ে নিয়ে তাঁর মাথায় মেরে দেয়। ঐ সময় তিনি ঘুমিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর মত তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল বা তাঁর গলা কেটে নিয়েছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঐ শয়তানের হত্যা করার নিয়ম জানা ছিল না, তাই সে তাঁর গলা মোচড়াচ্ছিল। অতঃপর সে একটা জন্তুকে ধরে তার মাথাটি একটি পাথরের উপর রাখলো। তারপর একটি পাথর সজোরে তার মাথায় মেরে দিলো। তৎক্ষণাৎ জন্তুটি মারা গেল। এই দেখে সে তার ভাইয়ের সাথেও ঐ ব্যবহার করলো। এও বর্ণিত আছে যে, যেহেতু তখন পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি, ফলে কাবীল কখনও বা তার ভাইয়ের চক্ষুগুলো বন্ধ করতো এবং কখনও বা থাপ্পড় ঘুষি মারতো। এই দেখে অভিশপ্ত ইবলীস তার কাছে এসে বললো, "একটা পাথর নিয়ে এসো এবং তা দিয়ে তার মাথা থেতলিয়ে দাও।" সে তাই করলো। তখন সেই মালউন দৌড়িয়ে হযরত হাওয়া (আঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ "কাবীল হাবীলকে হত্যা করে

ফেলেছে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "হত্যা কিরূপে হয়?" সে উত্তরে বললোঃ "এখন সে না পানাহার করতে পারবে, না কথা বলতে এবং না নড়াচড়া করতে পারবে।" তিনি তখন বললেনঃ "সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।" সে বললোঃ "হ্যাঁ, এটাই মৃত্যু।" তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ইতিমধ্যে হযরত আদম (আঃ) এসে পড়লেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি?" কিন্তু শোকে দুঃখে তার মুখে কোন কথা সরলো না। তখন তিনি বললেনঃ "তাহলে তুমি তোমার কন্যাগণসহ হা-হুতাশ করতে থাক। আর আমিও আমার পুত্রগণ এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

কাবীল ক্ষগ্রিস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে দুনিয়া ও আখিরাত দু'টোকেই নষ্ট করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার খুনের বোঝা হযরত আদম (আঃ)-এর ঐ সন্তানের উপরই পতিত হয়। কেননা, সে-ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল।" মুজাহিদ (রহঃ)-এর উক্তি এই যে, ঐ হত্যাকারীর একটি পায়ের গোছাকে উরুর সাথে লটকানো হয়েছে এবং তার মুখটা সূর্যের দিকে করে দেয়া হয়েছে। ওর ঘুরার সাথে সাথে সেও ঘুরতে রয়েছে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে আগুন ও বরফের গর্তে থাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি সে-ই। ভূ-পৃষ্ঠে সমস্ত হত্যাকাণ্ডের জন্যে সে-ই দায়ী। ইমাম নাখঈ (রঃ) বলেন যে, সমস্ত অন্যায় খুনের বোঝা তার উপর ও শয়তানের উপর পড়ে থাকে।

তাঁকে হত্যা করে দেয়ার পর কি করতে হবে, মৃতদেহ কিভাবে ঢাকতে হবে সে ব্যাপারে তার কিছুই জানা ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা দু'টি কাক প্রেরণ করলেন যারা একে অপরের ভাই ছিল। তারা তার সামনে লড়তে লাগলো। অবশেষে একে অপরকে মেরে ফেললো। তারপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত খনন করলো এবং মৃত কাকটিকে ওর মধ্যে রেখে দিয়ে মাটি চাপিয়ে দিলো। এ দেখে কাবীলের বুদ্ধি জেগে গেল এবং সে-ও ঐরূপ করলো। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নিজে নিজেই মৃত একটি কাককে অপর একটি কাক এভাবে গর্ত খনন করে দাফন করে দিয়েছিল। এও বর্ণিত আছে যে, কাবীল এক বছর পর্যন্ত তার মৃত ভাইয়ের মৃতদেহ স্বীয় স্কন্ধে বহন করে ফিরছিল। অতঃপর কাকটিকে ঐরূপ করতে দেখে সে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলো—"হায়! আমি এ কাকটির মত কাজও করতে পারলাম না।" একথাও বর্ণিত আছে যে, সে ভাইকে মেরে ফেলার পর খুবই অনুতপ্ত হয়েছিল এবং মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে পড়েছিল। আর তা এ জন্যও ছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠে প্রথম মৃত ও প্রথম হত্যা ওটাই ছিল। তাওরাত ধারীরা বলে

যে, যখন কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করলো তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'হে কাবীল! তোমার ভাই হাবীল কোথায়?' সে উত্তরে বললোঃ 'আমি জানি না। আমি তার প্রহরী ছিলাম না।' আল্লাহ্ পাক তখন বললেনঃ "এখন তোমার ভাইয়ের রক্ত যমীন হতে আমাকে ডাক দিচ্ছে। যে যমীনের মুখ খুলে দিয়ে তুমি ওর মুখে তোমার নিষ্পাপ ভাইয়ের রক্ত ঢেলে দিয়েছ সেই ভূমি তোমাকে লানত করছে। তুমি এ যমীনে যে চাষাবাদ করবে তাতে তুমি কোন ফসল পাবে না যে পর্যন্ত না তুমি চিন্তান্বিত হবে।" সে তখন ঐ কাজই করলো।

অতঃপর সে খুব লজ্জিত হলো এবং অনুতাপ করতে থাকলো! ওটা যেন শাস্তির উপরে শাস্তি ছিল। এ কাহিনীতে মুফাস্সিরগণ এ ব্যাপারে তো একমত যে, এ দু'জন হযরত আদম (আঃ)-এর ঔরসজাত পুত্র ছিল এবং কুরআন কারীমের শব্দগুলো দ্বারা বাহ্যতঃ এটাই বুঝা যাচ্ছে। আর হাদীসেও রয়েছে যে, যমীনের বুকে যেসব হত্যাকাণ্ড চলছে তার এক অংশের বোঝা ও পাপ হযরত আদম (আঃ)-এর এ প্রথম পুত্রের উপর পড়েছে। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন যে, এ দু'জন বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুরবানী সর্বপ্রথম তাদের মধ্যেই চালু হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম আদম (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে। তাছাড়া এর ইসনাদও সঠিক নয়। একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, এ ঘটনাটি একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন এর মধ্য থেকে ভালটি গ্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।[১] এ হাদীসটি মুরসাল। কথিত আছে যে, এ আকস্মিক দুর্ঘটনায় হযরত আদম (আঃ) শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং এক বছর ধরে তাঁর মুখে হাসি ফুটেনি। অবশেষে ফেরেশতাগণ তাঁর দুঃখ দূর হওয়ার ও মুখে হাসি আসার জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করেন। হযরত আদম (আঃ) ঐ সময় শোকে ও দুঃখে এ কথাও বলেছিলেন যে, শহর ও শহরের সবকিছু বদলে গেছে, পৃথিবীর রং -এর পরিবর্তন ঘটেছে এবং ওর চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। সব জিনিসেরই রং ও স্বাদ বিদায় নিয়েছে এবং আকর্ষণীয় চেহারাগুলোর সৌন্দর্য লোপ পেয়েছে। জবাবে বলা হলো যে, ঐ মৃত ব্যক্তির সাথে এ জীবিত ব্যক্তিও যেন নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং যে

১. ইবনে জারীর (রঃ) হাসান বসরী (রঃ) হতে এটা মারফূ'রূপে তাখরীজ করেছেন।

অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল ওর বোঝা তার উপর এসে গেছে। প্রকাশ্যভাবে জানা যাচ্ছে যে, কাবীলকে তখনই কোন শাস্তি দেয়া হয়েছে। যেহেতু বলা হয়েছে যে, তার পায়ের গোছাকে তার উরুর সাথে লটকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার মুখমণ্ডল সূর্যের দিকে করে দেয়া হয়েছে। ওর সাথে সাথেই সে ঘুরতে ছিল। অর্থাৎ সূর্য যেদিকেই থাকতো সেদিকেই তার মুখখানা ঘুরে যেতো। হাদীস শরীফে এসেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যতগুলো গুনাহ এরই উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাড়াতাড়ি করে ও শাস্তি দুনিয়াতেই প্রদান করবেন এবং পরকালেও তার জন্যে ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন, ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে সমসাময়িক শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া!" কাবীলের মধ্যে এ দু'টো পাপই জমা হয়েছিল।

فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।' (২ঃ ১৫৬)

٣٢- مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

৩২। এ কারণেই আমি বানী ইসরাঈলের প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেললো; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করলো তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো; আর তাদের (বানী ইসরাঈলদের) কাছে আমার বহু রাসূল স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমা লংঘনকারী রয়ে গেছে।

৩৩। যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ান হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বের করে দেয়া হবে; এটা তো ইহলোকে তাদের জন্যে ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্যে ভীষণ শাস্তি রয়েছে।

٣٣- إِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৩৪। কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবা করে নেয়, তবে জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

٣٤- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আদমের এ ছেলের অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যার কারণে আমি বানী ইসরাঈলকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, তাদের কিতাবে লিখে দিয়েছি এবং তাদের শরঈ হুকুম করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কাউকে বিনা কারণে হত্যা করে ফেললো, না সে নিহত ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছিল, না সে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাহলে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা করে ফেললো। কেননা, আল্লাহর কাছে সমস্ত সৃষ্টজীব সমান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ লোককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলো, ওটাকে হারাম জানলো, তবে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ বাঁচালো। কেননা, সমস্ত মানুষ এভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকবে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ)-কে যখন বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলে, তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) তাঁর কাছে গিয়ে বলেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন। আমি আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণ-কারীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। আপনি লক্ষ্য করুন যে, পানি এখন মাথার

উপরে উঠে গেছে। সুতরাং এখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।" এ কথা শুনে হযরত উসমান (রাঃ) বলেনঃ "তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করার প্রতি উত্তেজিত হয়েছো যাদের মধ্যে আমিও একজন?" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "না, না।" তখন তিনি বললেনঃ "জেনে রেখো যে, তুমি যদি একজন লোককেই হত্যা কর তবে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করলে। যাও, ফিরে যাও। আমি চাই যে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, পাপকার্যে লিপ্ত না করুন।" এ কথা শুনে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ফিরে গেলেন, যুদ্ধ করলেন না। ভাবার্থ এই যে, হত্যা হচ্ছে পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করে সে সমস্ত লোকের ঘাতক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে সে যেন সমস্ত লোকেরই প্রাণ রক্ষা করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নবীকে এবং ন্যায়পরায়ণ মুসলমান বাদশাহকে হত্যাকারীর উপর সারা বিশ্বের মানুষের হত্যার পাপ বর্তিত হয়। আর নবী এবং ন্যায়পরায়ণ ইমামের বাহুকে মজবুত করা বিশ্ববাসীর জীবন রক্ষা করার শামিল। (তাফসীরে ইবনে জারীর)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেই সে জাহান্নামী হয়ে যায়। সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করলো। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কোন মুমিনকে কোন শরঈ কারণ ছাড়াই হত্যাকারী জাহান্নামী, আল্লাহর দুশমন, অভিশপ্ত এবং শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সে যদি সমস্ত লোককেও হত্যা করতো তবে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতো? যে ব্যক্তি হত্যা করা থেকে বিরত থাকলো, তার পক্ষ থেকে যেন সবারই জীবন রক্ষা পেলো। আব্দুর রহমান বলেন যে, এক হত্যার বদলেই তার খুন হালাল হয়ে গেলো। এটা নয় যে, কয়েকটি হত্যার পর সে কিসাসের যোগ্য হবে। আর যে তাকে জীবিত রাখবে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেবে, সে যেন লোকদেরকে জীবিত রাখলো। আবার এই ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মানুষের জীবন বাঁচাবে, যেমন ডুবন্ত মানুষকে উঠিয়ে নেবে, আগুনে পড়ে যাচ্ছে এমন লোককে আগুন থেকে রক্ষা করবে এবং কাউকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নেবে ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হচ্ছে–মানুষকে অন্যায় খুন থেকে বিরত রাখা, তাদেরকে মানুষের কল্যাণ কামনা, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। হযরত হাসান বসরী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "বানী ইসরাঈল যেমন এ হুকুমের আওতাভুক্ত ছিল তদ্রূপ আমরাও কি এ হুকুমেরই

আওতাভুক্ত?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বানী ইসরাঈলের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা কোনক্রমেই মর্যাদাপূর্ণ নয়।" সুতরাং একটি লোককে বিনা কারণে হত্যা করা সকলকে হত্যা করার শামিল এবং একটি লোকের জীবন রক্ষা করার পুণ্য সমস্ত লোকের জীবন রক্ষা করার পুণ্যের সমান। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন কাজ বাতলিয়ে দিন যা আমার জীবনকে সুখময় করে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে হামযা (রাঃ)! কারও জীবন রক্ষা করা আপনার নিকট পছন্দনীয় কাজ, না কাউকে মেরে ফেলা পছন্দনীয় কাজ?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "কারও জীবন রক্ষা করাই আমার নিকট পছন্দনীয় কাজ।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তাহলে আপনি এ কাজেই লেগে থাকুন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ বানী ইসরাঈলের কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তবু এর পরেও তাদের মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমালংঘনকারী রয়ে গেছে। যেমন ইয়াহূদী বানূ কুরাইযা ও বানূ নাযীর আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতো এবং নিহত ব্যক্তির মুক্তিপণ আদায় করতো। তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে আয়াত নাযিল করা হয়– তোমাদের নিকট এই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তোমরা তোমাদের লোকদেরকে হত্যা করবে না এবং তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে না। কিন্তু এই মজবুত আহাদ ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও তোমরা তার উল্টো করেছো। যদিও মুক্তিপণ আদায় করেছো, কিন্তু তাদেরকে দেশ হতে বের করে দেয়াও তো হারাম ছিল। এর কি অর্থ হতে পারে যে, তোমরা কোন কোন হুকুম মানবে এবং কোন কোনটা মানবে না? এরূপ লোকদের শাস্তি তো এটাই যে, তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম থেকে উদাসীন নন।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِیْنَ یُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَیَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ یُّقَتَّلُوْٓا اَوْ یُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ -

এ আয়াতে مُحَارِبَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ করা এবং হুকুমের বিপরীত করা। এর ভাবার্থ হচ্ছে কুফরী করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করা। এমনকি পূর্ববর্তী অনেক মনীষী, যাঁদের মধ্যে

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবও (রঃ) রয়েছেন, বলেন যে, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা অধিকার করে নেয়াও হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেনঃ যখন কাউকে কোন কাজের অলী বানিয়ে দেয়া হয় তখন সে ফাসাদ ও অশান্তি ছড়িয়ে দেয় এবং চাষাবাদের ভূমি ও মানবজাতিকে ধ্বংস করে ফেলে, আর আল্লাহ ফাসাদকে ভালবাসেন না। এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা, এতে এটাও আছে যে, যখন এরূপ লোক এ কাজগুলো করার পর মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবা করে নেয় তবে তার কোন জবাবদিহি নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলমান এমন কাজ করে এবং পলায়ন করে কাফিরদের নিকট চলে যায় তবে শরঈ হদ থেকে মুক্ত হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যদি মুসলমানদের হাতে পড়ে যাওয়ার পূর্বে তাওবা করে নেয় তবে তার কৃতকর্মের দরুন যে হুকুম তার উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে তা টলতে পারে না। হযরত উবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আহলে কিতাবের একটা দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু তারা তা ভঙ্গ করে এবং গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্বাধীনতা দেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে তাদেরকে হত্যা করতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলতে পারেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন যে, আয়াতটি হারূরিয়া খারেজীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, যে কেউই এ কাজ করবে তারই ব্যাপারে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেহেতু সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উক্কাল গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আগমন করে এবং তাঁর কাছে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করে। অতঃপর মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয় এবং তাদের পেট মোটা হয়ে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, তথায় উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করবে।" তারা বললোঃ "হ্যাঁ (আমরা যেতে চাই।)" সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেলো। তখন তারা রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতএব তাদেরকে পাকড়াও করে

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখা হয় ফলে তারা ধড়ফড় করে মৃত্যুবরণ করে। সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো উক্কাল গোত্রের ছিল কিংবা উরাইনা গোত্রের ছিল। তারা পানি চেয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। তারা চুরিও করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনয়নের পর কুফরীও করেছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা রাখালের চোখে গরম শলাকাও ভরে দিয়েছিল। সেই সময় মদীনার আবহাওয়া ভাল ছিল না। তারা 'বারসাম' নামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের পিছনে ২০ জন ঘোড় সওয়ার আনসারীকে পাঠিয়েছিলেন। একজন পদব্রজে চলছিলেন, যিনি পদচিহ্ন দেখে দেখে পথ দেখিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর সময় তারা পিপাসায় এতো কাতর হয়ে পড়েছিলো যে, মাটি চাটতে শুরু করেছিলো! তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। একদা হাজ্জাজ হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাউকে সবচেয়ে বড় ও কঠিন যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন।" তখন হযরত আনাস (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তাতে এ কথাও রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো বাহ্রাইন থেকে এসেছিল। রোগের কারণে তাদের রং হলদে বর্ণ ধারণ করেছিল। আর পেট বড় হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেছিলেনঃ "তোমরা সাদকার উটের নিকট গমন কর এবং ওগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান কর।" হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ "তারপর আমি দেখলাম যে, হাজ্জাজ এ রিওয়ায়াতকে নিজের অত্যাচারের দলীল বানিয়ে নিলো। আমি তখন খুবই লজ্জিত হলাম যে, আমি তার কাছে এ হাদীসটি কেন বর্ণনা করলাম।" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাদের মধ্যে চারজন লোক ছিল উরাইনা গোত্রের এবং তিনজন ছিল ইকাল গোত্রের। এরা যখন সুস্থ হয়ে উঠলো তখন ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ব্যভিচারীও ছিল। তারা যখন আগমন করে তখন দারিদ্রের কারণে তাদের পরনে কাপড় পর্যন্ত ছিল না। তারা হত্যা ও লুঠ করে নিজেদের শহরের দিকে যাচ্ছিল। হযরত জারীর (রাঃ) বলেনঃ তারা তাদের কওমের কাছে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিল এমতাবস্থায় আমরা তাদেরকে ধরে ফেলি। তারা পানি চাচ্ছিল, আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেনঃ "এখন তো পানির পরিবর্তে জাহান্নামের আগুন পাবে।" এ বর্ণনায় এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের চোখে শলাকা ভরে দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। এ হাদীসটি দুর্বল ও

গারীব। কিন্তু এর দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঐ ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল পাঠানো হয়ছিল তাঁদের সর্দার ছিলেন হযরত জারীর (রাঃ)। এ বর্ণনার এ অংশটি একেবারই বর্জনীয় যে, তাদের চোখে শলাকা ভরে দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। কেননা, সহীহ মুসলিমে এটা বিদ্যমান আছে যে, তারা রাখালের সাথে ঐ ব্যবহার করেছিল। সুতরাং ওটা ছিল তাদের কিসাস বা প্রতিশোধ গ্রহণ। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, ঐলোকগুলো বানূ ফাযারাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ শাস্তি আর কাউকেও দেননি। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইয়াসার নামক এক ক্রীতদাস ছিল। সে অত্যন্ত নামাযী ছিল বলে তিনি তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর স্বীয় উটের পালে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে ঐ উটগুলো দেখা শোনা করতো। তাকেই ঐ ধর্মত্যাগীরা হত্যা করে ফেলেছিল এবং তার চোখে কাঁটা গেড়ে দিয়ে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। যে সেনাবাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার করে এনেছিলেন তাদের মধ্যে একজন শক্তিশালী যুবক ছিলেন হযরত কুরয্ ইবনে ফাহরী (রাঃ)। হাফিয আবূ বকর মিরদুওয়াই (রঃ) এ বর্ণনার সমস্ত তরীকা বা পন্থাকে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। আবূ হামযাহ ইবনে আবদুল করীম (রঃ) উটের প্রস্রাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি ঐ ধর্মত্যাগীদের কাহিনী বর্ণনা করেন। তাতে এ কথাও আছে যে, ঐ লোকগুলো কপটতার সাথে ঈমান এনেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার অভিযোগ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাদের প্রতারণা, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্মত্যাগের বিষয় জানতে পারেন তখন তিনি ঘোষণা দেন যে, আল্লাহর সৈন্যগণ যেন তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পড়ে। এ ঘোষণা শোনা মাত্রই সাহাবীগণ কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা না করেই তাদের পিছনে বেরিয়ে পড়েন। তাদেকে পাঠিয়ে দেয়ার পর স্বয়ং নবী করীমও (সঃ) রওয়ানা হয়ে যান। ঐ বিদ্রোহী ও ডাকাতের দল তাদের নিরাপদ জায়গায় প্রায় পৌঁছেই গেছে, এমন সময় সাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। তাদের মধ্যে যে কয়েকজন গ্রেফতার হয় তাদেরকে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করেন। ঐ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে দেশান্তরিত করা ছিল এই যে, তাদেরকে ইসলামী হুকুমতের সীমানা থেকে বের করে দিয়ে শিক্ষামূলক শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এর পর নবী করীম (সঃ) আর কোন দিনই কোন লোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহচ্যুত করেননি, বরং তিনি তা থেকে নিষেধ করেন। জন্তুর সাথেও

এরূপ ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেউ কেউ বলেন, হত্যার পর তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ওরা বানূ সালীম গোত্রের লোক ছিল। কোন কোন মনীষী বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয়নি এবং এ আয়াত দ্বারা ওটা মানসূখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাদের মতে এ আয়াতে যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ শাস্তি দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ -এ আয়াতটি। কারও কারও মতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) "মুসলা" অর্থাৎ নাক, কান কেটে নিতে যে নিষেধ করেছেন তা দ্বারা এ শাস্তি মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু এতে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। তারপর এটাও জিজ্ঞাস্য বিষয় যে, মানসূখকারীর বিলম্বের দলীল কি? কেউ কেউ বলেন যে, এটা হচ্ছে ইসলামের হদ স্থিরীকরণের পূর্বেকার ঘটনা। কিন্তু এটাও মোটেই ঠিক নয়, বরং স্থিরীকরণের পরের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। কেননা, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)। আর তিনি সূরা মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকলেন। কিন্তু এটাও সঠিক কথা নয়। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ শব্দ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের চোখে গরম শলাকা ভরে দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আজলান বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে যে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন তা যে উচিত ছিল না এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। যাতে উচিত শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর তা হচ্ছে হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে নেয়া এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া। আর দেখা যাচ্ছে যে, এরপর আর কোনদিন কারও চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, তারা যা করেছিল তারই প্রতিফল তারা পেয়েছিল। এখন যে আয়াত নাযিল হলো তাতে এরূপ লোকদের জন্যে একটা বিশেষ হুকুম বর্ণনা করা হলো এবং তাতে চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়ার হুকুম দেয়া হলো না। এ আয়াত দ্বারা জমহূর উলামা এ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, পথ বন্ধ করে দিয়ে যুদ্ধ করা এবং শহরে যুদ্ধ করা দু'টোই সমান। কেননা, আয়াতে يَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا শব্দগুলো রয়েছে। মালিক, আলযাঈ এবং শাফিঈর (আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হোন) এটাই মাযহাব যে, বিদ্রোহীরা শহরের ভেতরেই এসব হাঙ্গামা

সৃষ্টি করুক বা শহরের বাইরেই করুক, তাদের শাস্তি এটাই। এমনকি ইমাম মালিক (রঃ) তো এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, কোন লোক অপর কোন লোককে তার বাড়ীতে এ ধরনের প্রতারণা করে হত্যা করলে তাকে ধরে আনা হবে এবং তার কাছে যেসব মাল ও আসবাবপত্র রয়েছে সবগুলোই ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর সাথে সাথে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে। সমসাময়িক ইমামই এ কাজ করবেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকেরা নয়। এমনকি যদি তারা (অভিভাবকেরা) তাকে ক্ষমা করে দিতে চায় তবুও তাদেরকে এ অধিকার দেয়া হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মাযহাব এটা নয়। তিনি বলেন, যে مُحَارِبَةٌ ঐ সময় মেনে নেয়া হবে যখন কেউ শহরের বাইরে এরূপ হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। কেননা, শহরে তো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু শহরের বাইরে এর কোনই সম্ভাবনা নেই। এ বিদ্রোহীদের যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর তরবারী উঠাবে এবং পথকে বিপজ্জনক করে তুলবে, তাকে মুসলমানদের ইমাম উল্লিখিত তিনটি শাস্তির যে কোন একটি দিতে পারেন। আরও অনেকেরই এটাই উক্তি। আর অন্যান্য আয়াতের হুকুমের মধ্যেও এ ধরনের অধিকার বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হজ্বের ইহরামের অবস্থায় কেউ শিকার করলে তাকে সেই শিকারের সমপর্যায়ের জন্তু কুরবানী করতে হয় বা মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াতে হয় কিংবা সেই বরাবর রোযা রাখতে হয়। অনুরূপভাবে রোগ বা মাথার অসুখের কারণে কেউ ইহরামের অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করালে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে রোযা, সাদকা বা কুরবানী করতে হয়। তদ্রূপ কসমের কাফ্ফারায় মধ্যমভাবে দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর বা তাদেরকে কাপড় পরানোর অথবা একটি গোলাম আযাদ করণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাহলে যেমন এখানে এ অবস্থাগুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি পছন্দ করে নেয়ার অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনই বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের শাস্তিও হচ্ছে হত্যা অথবা বিপরীতভাবে হাত-পা কেটে নেয়া কিংবা দেশ হতে বিতাড়িত করা। আর জমহূরের উক্তি এই যে, এ আয়াতটি কয়েক অবস্থার সাথে জড়িত। যখন ডাকাত হত্যা ও লুঠপাট উভয় অপরাধে অপরাধী হবে তখন সে শূলেও হত্যার যোগ্য হবে। আর যদি শুধু হত্যার দোষে দোষী হয় তবে হত্যার বদলে শুধু হত্যাই করা হবে। যদি শুধু মাল নেয় তবে উল্টোভাবে হাত-পা কেটে নিতে হবে অর্থাৎ এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা– এভাবে কেটে নিতে হবে। আর যদি পথকে ভীতিপূর্ণ করে তোলে এবং জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, এছাড়া অন্য কোন পাপে লিপ্ত না হয় তবে

শুধু তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। অধিকাংশ মনীষী ও ইমামদের মাযহাব এটাই। তারপর মনীষীদের মধ্যে এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে, তাকে শুধু শূলের উপর লটকিয়ে দিয়েই কি ছেড়ে দেয়া হবে, যাতে সে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যাবে? না বর্শা ইত্যাদি দ্বারা হত্যা করা হবে, যাতে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে? না তিন দিন পর্যন্ত শূলেই রাখা হবে, তারপর নামিয়ে নেয়া হবে? না এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে? কিন্তু এটা তাফসীরের স্থান নয় যে, আমরা ছোটখাটো মতভেদ নিয়েই পড়ে থাকব এবং প্রত্যেকেরই দলীল পেশ করব। হ্যাঁ, তবে একটি হাদীসে শাস্তির কিছু বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ওর সনদ যদি সহীহ্ হয় তাহলে তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ঐ বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বললেন ঃ "যারা মাল চুরি করবে এবং পথকে বিপজ্জনক করে তুলবে তাদের হাত চুরির বদলে কেটে নেয়া হবে, যে হত্যা করবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। আর যে হত্যা করবে, পথকে বিপজ্জনক করে তুলবে এবং ব্যভিচার করবে তাকে শূলের উপর চড়িয়ে দিবে।"

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ অথবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বের করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদেরকে অনুসন্ধান করে তাদের উপর হদ কায়েম করা হবে অথবা দারুল ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হবে, যেন তারা অন্য কোথায়ও চলে যায়। কিংবা এক শহর থেকে অন্য কোন শহরে এবং সেই শহর থেকে আর এক শহরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। অথবা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপেই বের করে দেয়া হবে। শা'বী (রঃ) তো শুধু বের করেই দিতেন। আর আতা' খোরাসানী (রঃ) বলেন যে, এক সেনাবাহিনী থেকে অন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। এমনিভাবে তাকে কয়েক বছর পর্যন্ত যেখানে সেখানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হবে। কিন্তু তাকে দারুল ইসলাম থেকে বের করা হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরগণ বলেন যে, তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। ইবনে জারীর (রঃ)-এর পছন্দনীয় কথা এই যে, তাকে তার নিজের শহর থেকে বের করে দিয়ে অন্য কোন শহরের জেলখানায় ভরে দেয়া হবে।

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ আয়াতের এ অংশটি ঐ সব লোকের পক্ষপাতিত্ব করছে যাঁরা বলেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানদের ব্যাপারে রয়েছে ঐ বিশুদ্ধ হাদীসটি যাতে আছে যে, বর্ণনাকারী হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট থেকে ঐ অঙ্গীকারই গ্রহণ করেন যা তিনি স্ত্রীলোকদের

নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তা হচ্ছে–আমরা যেন চুরি না করি, ব্যভিচারে লিপ্ত না হই, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের নাফরমানী না করি।[১] যারা এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর দায়িত্বে। আর যারা এগুলোর মধ্যে কোন একটি পাপকার্যে লিপ্ত হবে এবং ওর শাস্তিও প্রাপ্ত হবে তবে সেটাই তার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ সেটা গোপন করেন তবে তার সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁরই উপর থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ করলো, অতঃপর তাকে শাস্তি দেয়া হলো, তাহলে আল্লাহ যে তাকে পুনরায় শাস্তি দেবেন এ থেকে তাঁর আদল ও ইনসাফ বহু ঊর্ধ্বে। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ করলো, অতঃপর আল্লাহ তা ঢেকে নিলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন, তবে আল্লাহর করুণা এর বহু ঊর্ধ্বে যে, তিনি তাঁর বান্দার কোন পাপ ক্ষমা করে দেয়ার পর আবার ওর শাস্তি ফিরিয়ে আনবেন।[২] তবে এ শাস্তিপ্রাপ্তির পর যদি তাওবা ছাড়াই মারা যায় তবে পরকালের শাস্তি বাকী থেকে যাবে, যার সঠিক কল্পনা করাও এখন অসম্ভব। হ্যাঁ, তবে যদি তাওবা নসীব হয় তাহলে অন্য কথা। তারপর তাওবাকারীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার প্রকাশ ঐ অবস্থায় তো স্পষ্ট যে, এ আয়াতকে মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ মেনে নেয়া হবে। কিন্তু যে মুসলমান বিদ্রোহী হবে এবং সে অধিকারে আসার পূর্বেই যদি তাওবা করে নেয় তবে তার উপর হত্যা, শূল এবং পা কেটে নেয়া তো প্রযোজ্য হবেই না, এমনকি তার হাতও কাটা যাবে কি না এ ব্যাপারে আলেমদের দু'টি উক্তি রয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার উপর থেকে উঠে যাবে। সাহাবীদের আমলও এরই উপর রয়েছে। যেমন জারিয়া ইবনে বদর তাইমী বসরী যমীনে ফাসাদ বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এ ব্যাপারে কয়েকজন কুরাইশী হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট সুপারিশ করেন, যাঁদের মধ্যে হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফরও (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে নিরাপত্তা দান করতে অস্বীকার করেন। জারিয়া ইবনে বদর তখন সাঈদ ইবনে কায়েস

১. অর্থাৎ কেউ যেন কারও উপর মিথ্যা অপবাদ না দেয়।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), তিরমিযী (রঃ) এবং ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁকে বলেনঃ আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, অতঃপর তিনি এ আয়াতগুলো مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ পর্যন্ত পাঠ করেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "এরূপ ব্যক্তির জন্যে তো আমি নিরাপত্তা দান করবো।" হযরত সাঈদ (রাঃ) তখন বলেনঃ "সে হচ্ছে জারিয়া ইবনে বদর।" এরপর জারিয়া তাঁর প্রশংসায় কবিতাও রচনা করেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক কুফার মসজিদে কোন এক ফরয নামাযের পরে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। সে সময় তিনি কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। লোকটি এসে তাঁকে বলেঃ "হে আমীরে কুফা! আমি মুরাদ গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়েছি এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনারা আমার উপর ক্ষমতা লাভ করার পূর্বেই তাওবা করেছি। আমি এখন আপনার আশ্রয়স্থলে দাঁড়িয়েছি।" একথা শুনে হযরত আবূ মূসা আশআরী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "হে লোক সকল! এ তাওবার পরে তোমাদের কেউ যেন এর সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার না করে। যদি সে তার তাওবায় সত্যবাদী হয় তবে তো ভাল কথা, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার পাপই তাকে ধ্বংস করবে।" লোকটি কিছুকাল পর্যন্ত তো ঠিকভাবেই থাকলো। তারপর সে পুনরায় মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাও তাকে তার পাপের কারণে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো।

ইবনে জারীর (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আলী আসাদী নামক একটি লোক মানুষের পথকে বিপজ্জনক করে তোলে। সে মানুষকে হত্যা করে এবং তাদের মালধন লুঠপাট করতে থাকে। বাদশাহ, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ সদা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়। একদা সে জঙ্গলে অবস্থান করছিল এমন সময় একটি লোককে কুরআন পাঠ করতে শুনলো। লোকটি সেই সময় قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ (৩৯ঃ ৫৩)-এ আয়াতটি পাঠ করছিল। এটা শুনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং তাকে বললোঃ "হে আল্লাহর বান্দা! এ আয়াতটি পুনরায় আমাকে পাঠ করে শুনাও। লোকটি আবার তা পাঠ করলো। তখন আলী স্বীয় তরবারীখানা খাপে রেখে দিল। তৎক্ষণাৎ সে বিশুদ্ধ মনে তাওবা করলো এবং ফজরের নামাযের পূর্বেই

মদীনায় পৌঁছে গেল। তার পর গোসল করলো এবং মসজিদে নববীতে (সঃ) প্রবেশ করে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করলো। নামায শেষে লোকেরা হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর পাশে বসে পড়লো। সেও তখন তাদেরই মধ্যে একধারে বসে গেল। ফর্সা হয়ে গেলে লোকেরা তাকে দেখে চিনে ফেললো এবং তাকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হলো। সে বললোঃ "দেখুন, আমার উপর আপনাদের ক্ষমতা লাভ হওয়ার পূর্বেই আমি তাওবা করেছি এবং তাওবা করার পর আপনাদের নিকট হাযির হয়েছি। সুতরাং এখন আমার উপর আপনাদের বল প্রয়োগের কোন পথ নেই।" তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেনঃ "লোকটি সত্য কথাই বলেছে।" অতঃপর তিনি তার হাত ধরে মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মুআবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁকে বললেনঃ "এ হচ্ছে আলী আসাদী, সে তাওবা করেছে সুতরাং এর উপর আপনি কোন বল প্রয়োগ করতে পারেন না।" ফলে কেউই তার সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করলেন না। মুজাহিদের একটি দল যখন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রওয়ানা হলেন, তাঁদের সাথে এ আলী আসাদীও গেল। তাঁদের নৌকা সমুদ্রে চলছিল। তাঁদের সামনে রোমকদের কতগুলো নৌকা এসে পড়লো। তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে সে নিজেদের নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে তাদের নৌকায় গিয়ে উঠলো। তারা তার তরবারীর চমক সহ্য করতে না পেরে পালে টান দিল। আলীও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হলো। ফলে নৌকা ডুবে গেলো এবং রোমকদের সবাই ডুবে মরলো। তাদের সাথে হযরত আলী আসাদীও (রাঃ) ডুবে গিয়ে শাহাদত বরণ করলো।

৩৫। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাক, আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে।

٣٥- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৩৬। নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমাণ আরও হয় যেন তারা তা প্রদান করে

٣٦- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ

مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

কিয়ামতের শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবুও এ দ্রব্যসমূহ তাদের থেকে কবূল করা হবে না, আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٣٧- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৩৭। তারা এটা কামনা করবে যে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যায়, অথচ তারা তা থেকে কখনও বের হতে পারবে না, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

এখানে তাকওয়া ও সংযমশীলতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং সেটাও আবার আনুগত্যের সাথে মিশ্রিতভাবে। ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ পাকের নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। 'ওয়াসীলা'র অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। হযরত মুজাহিদ, হযরত আবূ ওয়ায়েল, হযরত হাসান, হযরত যায়েদ (আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সদয় হোন) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- আল্লাহ পাকের আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর মর্জি মুতাবিক আমল করে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। **ইবনে যায়েদ (রঃ) নিম্নের আয়াতটিও পাঠ করেনঃ**

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

অর্থাৎ তারা তো ওরাই যারা তাদের প্রভুর নৈকট্য অনুসন্ধান করে থাকে। (১৭ঃ ৫৭) এ ইমামগণ وَسِيْلَةَ শব্দটির যে অর্থ করেছেন তার উপর সমস্ত মুফাস্সিরেরই ইজমা রয়েছে। তাঁদের কেউ এর বিপরীত অর্থ করেননি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর উপর একটি আরবী কবিতাও পেশ করেছেন, যাতে ওয়াসীলাহ্ শব্দটি নৈকট্যের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ওয়াসীলাহ-এর অর্থ ঐ জিনিস যার দ্বারা আকাংখিত বস্তু লাভ করা যায়। ওয়াসীলাহ্ জান্নাতের ঐ উচ্চ ও মনোরম জায়গার নাম যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জায়গা এবং সেটা আরশের অতি নিকটে। সহীহ্ বুখারীতে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত

আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনে اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ। -এ দু'আটি পাঠ করে তার জন্যে কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে।" সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা আযান শুনবে তখন মুআযযিন যা বলে তোমরাও তা-ই বল, তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর, এক দরূদের বিনিময়ে তোমাদের উপর আল্লাহ দশটি রহমত নাযিল করবেন। এরপর আমার জন্যে তোমরা আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্ছা কর। ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি মনযিল যা শুধু একটি বান্দা লাভ করবে। আশা করি যে, ঐ বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা করলো তার জন্যে আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে তখন আমার জন্যে ওয়াসীলাও প্রার্থনা করবে।" তখন জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ওয়াসীলা কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উঁচু স্থান যা একটিমাত্র লোক লাভ করবে। আমি আশা করি যে, সেই লোকটি আমিই।"[১] হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমার জন্যে আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্ছা কর। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আমার জন্যে এ প্রার্থনা করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্যে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হয়ে যাবো।" অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে ওয়াসীলা অপেক্ষা বড় জায়গা আর নেই। অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রাপ্তির প্রার্থনা কর।" একটি গারীব ও মুনকার হাদীসে এতটুকু বেশীও রয়েছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ এই ওয়াসীলায় আপনার সাথে আর কে থাকবেন? উত্তরে তিনি হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করেন। আর একটি অত্যন্ত গারীব হাদীসে আছে যে, একদা হযরত আলী (রাঃ) কুফার মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেনঃ জান্নাতে দু'টি মুক্তা রয়েছে, একটি সাদা ও অপরটি হলদে। হলদেটি তো আরশের নীচে রয়েছে। আর মাকামে মাহমুদ হচ্ছে সাদা মুক্তার তৈরী, যাতে সত্তর হাজার প্রাসাদ রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি তিন মাইলের সমান। ওর দরজা, জানালা, আসন ইত্যাদি যেন একই মূলের তৈরী। ওরই নাম হচ্ছে ওয়াসীলা। ওটাই হচ্ছে মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর আহ্লে বায়তের জন্যে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তাকওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়গুলো মেনে চলার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। মুশরিক, কাফির অর্থাৎ যারা তাঁর শত্রু, যারা তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। আর এসব মুজাহিদ হচ্ছে সফলকাম। কৃতকার্যতা, সৌভাগ্য এবং মর্যাদা তাদেরই। জান্নাতের উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা এবং আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত তাদেরই জন্যে। তাদেরকে এ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যেখানে মৃত্যু ও ধ্বংস নেই, যেখানে ঘাটতি ও লোকসান নেই, যেখানে রয়েছে চির যৌবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি।

স্বীয় প্রিয়পাত্রদের উত্তম পরিণাম বর্ণনা করার পর এখন আল্লাহ পাক তাঁর শত্রুদের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন– তাদেরকে এমন কঠিন ও জঘন্য শাস্তি দেয়া হবে যে, সেই সময় যদি তারা সারা বিশ্বের অধিপতি হয়ে যায় এমনকি আরও এরই সমান হয় এবং এমতাবস্থায় সেই কঠিনতম শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে বিনিময় হিসেবে এ সবগুলো দিতেও চায় তবুও তাদের থেকে সেগুলো গ্রহণ করা হবে না। বরং যে শাস্তি তাদের উপর হবে তা হবে চিরস্থায়ী শাস্তি। তা হতে কোনক্রমেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। অন্য জায়গায় রয়েছে– জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখন পুনরায় তাদেরকে ওরই মধ্যে ফিরিয়ে আনা হবে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সাথে যখন তারা উপরে উঠে আসবে তখন তাদেরকে লোহার হাতুড় মেরে মেরে পুনরায় জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। মোটকথা তাদের সেই চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে বের হওয়া অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জাহান্নামের একটি লোককে আনয়ন করা হবে। তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে–হে আদম সন্তান! তোমার জায়গা কেমন পেয়েছো?" সে উত্তরে বলবেঃ "আমার জায়গা অত্যন্ত খারাপ পেয়েছি।" আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছ?" সে উত্তর দেবেঃ "হে আমার প্রভু! হ্যাঁ (আমি সম্মত আছি।)" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "তুমি মিথ্যা বলছো। আমি তো তোমার কাছে এর চেয়েও বহু কম চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেটাও দাওনি।" অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১] হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এক দল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।" বর্ণনাকারী

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইয়াযীদ ফকীর (রঃ) বলেনঃ আমি যখন হযরত জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا অর্থাৎ তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তা থেকে তারা বের হতে পারবে না-এ আয়াতের অর্থ কি হবে? তখন তিনি বললেনঃ এর পূর্বের আয়াতটি اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ পাঠ কর। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এরা কাফির। সুতরাং কখনও জাহান্নাম হতে বের হতে পারবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে-হযরত ইয়াযীদেরও এ বিশ্বাস ছিল যে, জাহান্নাম থেকে কেউই বের হতে পারবে না, কাজেই উপরোক্ত হাদীসটি শুনে তিনি হযরত জাবির (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমার অন্য লোকের উপর তো কোন দুঃখ নেই। আমার দুঃখ শুধু আপনাদের ন্যায় সাহাবীদের উপর যে, আপনারাও কুরআন কারীমের বিপরীত কথা বলে থাকেন? ঐ সময় আমার খুব রাগও হয়েছিল। আমার এ কথা শুনে হযরত জাবির (রাঃ)-এর সঙ্গীগণ আমাকে খুব ধমক দেন। কিন্তু হযরত জাবির (রাঃ) অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন বলে আমাকে বুঝিয়ে বললেনঃ "কুরআন কারীমে যাদের জাহান্নাম থেকে বের না হওয়ার বর্ণনা রয়েছে তারা হচ্ছে কাফির। তুমি কি কুরআন পড়নি?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ, পড়েছি। আমার সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ আছে। তখন তিনি বলেনঃ তাহলে তোমার কি কুরআনের وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ (১৭ঃ ৭৯)-এ আয়াতটি স্মরণ নেই? এ আয়াতে মাকামে মাহমুদের উল্লেখ রয়েছে। আর এটা হচ্ছে শাফাআতের জায়গা। আল্লাহ তা'আলা কতক লোককে তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং যতদিন ইচ্ছা জাহান্নামে রাখবেন। তারপর যখন ইচ্ছা তাদেরকে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। হযরত ইয়াযীদ (রঃ) বলেন-এরপর থেকে আমার ধারণা শুধরে যায়।

হযরত তলাক ইবনে হাবীব (রঃ) বলেনঃ "আমিও জাহান্নামীদের জন্যে শাফাআতের অস্বীকারকারী ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। অতঃপর আমার দাবী সাব্যস্তকরণে যেসব আয়াতে জাহান্নামে চির অবস্থানের বর্ণনা রয়েছে সেগুলো পাঠ করে শুনাই। তিনি শুনে বলেনঃ "হে তলাক! তুমি কি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাতের ইলমের বিষয়ে নিজেকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে কর? জেনে রেখো যে, যেসব আয়াত তুমি পাঠ করে শুনালে সেগুলো হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কিন্তু যারা জাহান্নাম থেকে বের

২. এটা হাফিয ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হবে তারা ঐসব লোক যারা মুশরিক নয়, তবে পাপী। পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।" হযরত জাবির (রাঃ) এসব বলার পর স্বীয় হাত দু'টি দ্বারা স্বীয় কান দু'টির দিকে ইশারা করে বলেনঃ আমি যদি আল্লাহর রাসূল (সঃ) থেকে শুনে না থাকি যে, জাহান্নামে প্রবেশের পরও মানুষকে তা থেকে বের করা হবে তবে আমার এ দু'টি (কান) বধির হয়ে যাক। আল-কুরআনের আয়াতগুলো যেমন তোমরা পড় তেমন আমিও পড়ি।[১]

৩৮। আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদের (ডান) হাত কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতবান, মহা প্রজ্ঞাময়।

٣٨- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْاۤ اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৩৯। অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করার পর (চুরি করার পর) তাওবা করে নেয় এবং আমলকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

٣٩- فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪০। তুমি কি জান যে, আল্লাহরই জন্যে রয়েছে আধিপত্য আসমান সমূহের এবং যমীনের; তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন; আর আল্লাহ সব বিষয়ের উপয় পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٤٠- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১. এ হাদীসটি ইবনে মিরদুওয়াই বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا রয়েছে। এ কিরআতটি খুবই বিরল হলেও আমল কিন্তু এর উপরই। তবে আমল এই কিরআতের কারণে নয়, বরং অন্যান্য দলীল প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। চোরের হাত কাটার নিয়ম ইসলামপূর্ব যুগেও ছিল। ইসলাম একে বিস্তারিত এবং শৃংখলিত করেছে। অনুরূপভাবে কাসামাত, দিয়াত, ফারায়েয প্রভৃতি মাসআলাও পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল বিশৃংখল ও অসম্পূর্ণভাবে। ইসলাম ঐগুলোকে ঠিকঠাক করে দিয়েছে। একটা উক্তি এটাও আছে যে, কুরাইশরা সর্বপ্রথম চুরির অপরাধে খুযাআ' গোত্রের দুওয়াইক নামক একটি লোকের হাত কেটে নিয়েছিল। সে কা'বা ঘরের গেলাফ বা আবরণ চুরি করেছিল। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, চোরেরা ওটা তার নিকট রেখে দিয়েছিল। কতক ধর্মশাস্ত্রবিদের অভিমত এই যে, চুরির বস্তুর কোন সীমা নেই। তা অল্পই হোক আর বেশীই হোক এবং সুরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করে থাক বা অরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি করে থাক, সর্বাবস্থাতেই চোরের হাত কাটা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি সাধারণ। তাহলে এ উক্তিটির ভাবার্থ এটাও হতে পারে এবং অন্যটাও হতে পারে। যাঁরা উপরোক্ত মত পোষণ করেন তাঁদের একটি দলীল হচ্ছে এ হাদীসটি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ চোরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন যে, সে সামান্য ডিম চুরি করে হাত কাটিয়ে নেয়, সে দড়ি বা রজ্জু চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়।" জমহূর উলামার অভিমত এই যে, চোরাই মালের সীমা নির্দিষ্ট আছে, যদিও সেই নির্দিষ্ট সীমার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, তিনটি খাঁটি রৌপ্যমুদ্রা বা এ পরিমাণ মূল্যের কোন জিনিস চুরি করলে হাত কাটা হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি চোরের হাত একটা ঢাল চুরি করার অপরাধে কেটে নেয়ার কথা বর্ণিত আছে। আর ওর মূল্য এ পরিমাণই ছিল। একটি চোর দরজা বা জানালার উপরিস্থিত কাঠ চুরি করেছিল। এ অপরাধে হযরত উসমান (রাঃ) তার হাত কেটে নিয়েছিলেন। ঐ কাঠটির মূল্য তিন দিরহামই ছিল। হযরত উসমান (রাঃ)-এর এ কাজটি যেন সাহাবায়ে কিরামের নীরব ইজমা'ই ছিল এবং এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হচ্ছে যে, ফল চোরের হাত কেটে নেয়া হবে। হানাফীগণ এটা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে চোরাই মাল দশ দিরহাম মূল্যের হওয়া জরুরী। ইমাম শাফিঈ (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি চোরাই মালের জন্যে কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ

স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ মূল্য বা তার চেয়ে বেশী নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা বা তার চেয়ে বেশীতে চোরের হাত কেটে নেয়া হবে।" সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা বা তার চেয়ে বেশী না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।" সুতরাং এ হাদীস স্পষ্টভাবে এ মাসআলার মীমাংসা করে দেয়। আর যে হাদীসে তিন দিরহামে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চোরের হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ বর্ণিত আছে, ওটা এর বিপরীত নয়। কেননা, ঐ সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা বারোটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা পরিমাণ মূল্যের ছিল। অতএব, মূল হচ্ছে এক চতুর্থাংশ দীনার, তিন দিরহাম নয়। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ), হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিবও (রাঃ) এ কথাই বলেন। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ), লায়েস ইবনে সা'দ আওযায়ী (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই (রঃ) এবং আবূ সাউর দাউদ ইবনে আলী যাহেরীরও (রঃ) এটাই উক্তি।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, চতুর্থাংশ দীনারই হোক বা তিন দিরহামই হোক, দু'টোই হচ্ছে চোরের হাত কেটে ফেলার নেসাব। মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এক চতুর্থাংশ দীনার মূল্যের বস্তু চুরিতে তোমরা চোরের হাত কেটে নাও, তার কম পরিমাণ মূল্যের জিনিস চুরিতে হাত কেটো না।" ঐ সময় দীনার ছিল বারো দিরহামের। সুতরাং এক চতুর্থাংশ দীনার তিন দিরহামই হয়। সুনানে নাসাঈর শব্দ হচ্ছে নিম্নরূপঃ "চোরের হাত ঢালের মূল্যের কমে কাটা হবে না।" হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ঢালের মূল্য কত? তিনি উত্তরে বলেনঃ "এক চতুর্থাংশ দীনার।" সুতরাং এ সমুদয় হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, হাত কাটার জন্যে দশ দিরহামের শর্ত করা ভুল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে যে ঢাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে নেয়া হয়েছিল ওর মূল্য ছিল দশ দিরহাম। যেমন আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ)-এর যুগে ঢালের মূল্য ছিল

দশ দিরহাম। আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা হবে না।" আর ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। হানাফীগণ বলেনঃ "ঢালের মূল্যের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। আর হুদূদের ব্যাপারে সাবধানতার উপর আমল করা উচিত এবং বেশীতেই সাবধানতা আছে। এ কারণেই আমরা চোরের হাত কাটার ব্যাপারে নেসাব নির্ধারণ করেছি দশ দিরহাম।" পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী বলেন যে, এর হদ হচ্ছে দশ দিরহাম বা এক দীনার। আলী ইবনে মাসঊদ (রঃ), ইবরাহীম নখঈ (রঃ) এবং আবূ জাফর (রঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, পাঁচ দীনার বা পঞ্চাশ দিরহামের সমান মূল্যের দ্রব্য চুরি ছাড়া পঞ্চমাংশ কেটে নেয়া হবে না। যাহেরিয়্যার মাযহাব এই যে, চুরির মাল অল্পই হোক আর বেশীই হোক, তাতে হাত কেটে নেয়া হবে। তাদেরকে জমহূর এ উত্তর দিয়েছেন যে, প্রথমতঃ তো এ প্রয়োগই মানসূখ বা রহিত। কিন্তু এ উত্তর ঠিক নয়। কেননা, রহিত করণের ইতিহাসের কোন নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ডিমের ভাবার্থ হচ্ছে লোহার ডিম এবং রজ্জুর ভাবার্থ হচ্ছে নৌকার মূল্যবান রজ্জু। তৃতীয় উত্তর এই যে, পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ চোর এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ জিনিসগুলো চুরি করতে করতে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান জিনিস চুরি করতে শুরু করে এবং এর ফলে তার হাত কেটে নেয়া হয়। আবার এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশ ঘটনার বর্ণনা হিসেবে ছিল। অজ্ঞতার যুগে ছোট ছোট জিনিস চুরি করলেও হাত কেটে নেয়া হতো। সুতরাং তিনি হয়তো আফসোস করে এবং চোরকে লজ্জা দিতে গিয়ে বলেছিলেনঃ সে কতই না লাঞ্ছিত ও বেওকুফ যে, সাধারণ জিনিসের কারণে হাতের মত এমন একটি নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্ণিত আছে যে, আবুল আলা মাআরবী যখন বাগদাদে আসে তখন সে এ ব্যাপারে বড় রকম আপত্তি করে বসে এবং তার মনে এ খেয়াল জাগে যে, তার এ আপত্তির কেউ কোন জবাব দিতে পারবে না। তাই সে এ ব্যাপারে একটি কবিতা রচনা করে। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপ–

"যদি হাত কেটে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয় তবে এর দিয়্যাত হিসাবে পাঁচশ' দেয়া হবে, আবার এই হাতকে মাত্র এক চতুর্থাংশ দীনার চুরির কারণে কেটে নেয়া হবে? এটা এমন একটি পরস্পর বিরোধী কথা যা আমার বোধগম্য হয় না,

কাজেই আমাকে নীবর থাকতে হয়, আর আমি আমার মাওলার নিকট জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” যখন তার এ উক্তির প্রসিদ্ধি লাভ ঘটলো তখন উলামায়ে কিরাম তার জবাব দিতে চাইলেন। এ দেখে সে পালিয়ে গেলো। কাযী আবদুল অহ্হাব তার এ উক্তির জবাবে বলেছিলেনঃ “যতক্ষণ পর্যন্ত হাত বিশ্বস্ত ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তা মূল্যবান ছিল এবং যখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করলো অর্থাৎ চুরি করলো তখন তার মূল্য কমে গেল।” কোন কোন মনীষী কিছু বিস্তারিতভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেনঃ এর দ্বারা শরীয়তের পূর্ণ হিকমত প্রকাশ পাচ্ছে এবং দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে কেউ যদি কারও হাত বিনা কারণে কেটে দেয় তাহলে সে জন্যে বড় রকমের ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে লোক এ জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকে। সেখানে এ হুকুমই উপযুক্ত ছিল। সামান্য জিনিস চুরি করার কারণে হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে এ ভয়ে চুরির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এটাই তো হচ্ছে প্রকৃত হিকমতের পরিচয়। যদি চুরিতেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের শর্ত লাগানো হতো তবে চুরির পথ বন্ধ হতো না। এটা কৃতকর্মেরই প্রতিফল। উচিত পন্থা এটাই যে, যে অঙ্গ দ্বারা সে অপরের ক্ষতিসাধন করেছে ঐ অঙ্গের উপরই শাস্তি হবে, যাতে তার যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয় এবং অন্যেরাও সতর্ক হয়। আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং স্বীয় আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ বিজ্ঞানময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - যে ব্যক্তি সীমালংঘন করার পর অর্থাৎ চুরি করার পর তাওবা করে নেয় এবং আমলকে সংশোধন করে নেয়, তার প্রতি আল্লাহ (রহমতের) দৃষ্টি করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি কারও মাল চুরি করার পর তা নিজের কাছেই রেখে দেয় তাহলে শুধুমাত্র তাওবা করলেই গুনাহ মাফ হবে না। যে পর্যন্ত না সেই মাল মালিককে ফিরিয়ে না দেবে অথবা ওর পূর্ণ মূল্য প্রদান করবে। জমহূর ইমামদের এটাই অভিমত। শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, যদি চুরির অপরাধে হাত কেটে নেয়া হয় এবং চোরাই মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে দুনিয়ায় ওর বদলা প্রদান করা তার উপর জরুরী নয়। ইমাম দারেকুত্নীর হাদীস গ্রন্থের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে একটি চোরকে হাযির করা হয়। লোকটি একটি চাদর চুরি করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “আমার মনে হয় তুমি চুরি করনি।”

সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি চুরি করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদেরকে বলেনঃ "তোমরা একে নিয়ে গিয়ে হাত কেটে দাও।" তার হাত কেটে নেয়া হলে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তিনি তাকে বলেনঃ তাওবা কর। সে তখন তওবা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "আল্লাহ তোমার তাওবা কবূল করেছেন।"

সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, হযরত উমার ইবনে সুমরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি চুরি করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করে নিন। আমি অমুক কাবীলার উট চুরি করেছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন সেই কাবীলার লোকদের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে জানতে চান যে, ওটা সত্য কি-না। তারা বলেঃ "আমাদের একটি উট অবশ্যই চুরি হয়েছে।" তখন তাঁর নির্দেশক্রমে হযরত উমার ইবনে সুমরা (রাঃ)-এর হাত কেটে নেয়া হয়। তিনি তখন হাতকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আমি সেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমার দেহ হতে তোমাকে পৃথক করে দিয়েছেন। তুমি আমার সমস্ত দেহকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে।"

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর যুগে একটি স্ত্রীলোক চুরি করেছিল। তখন যে লোকদের সে চুরি করেছিল তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। অতঃপর তারা বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ স্ত্রীলোকটি আমাদের চুরি করেছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "তোমরা তার হাত কেটে নাও।" তার গোত্রীয় লোকেরা পুনরায় বলেঃ "আমরা তার মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও বললেনঃ "তোমরা তার হাত কেটে নাও।" ফলে তার ডান হাত কেটে নেয়া হলো। স্ত্রীলোকটি তখন বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এতে আমার তাওবাও কি হয়ে গেল?" তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, তুমি পাপ থেকে এমন পাকসাফ হয়ে গেলে যে, যেন তুমি আজকেই জন্মগ্রহণ করলে।"তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ঐ স্ত্রীলোকটি ছিল মাখযুম গোত্রের। এ ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আছে। স্ত্রীলোকটি সম্ভ্রান্ত বংশের ছিল বলে তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে খুবই দুশ্চিন্তা দেখা দেয় এবং তারা ইচ্ছা করে যে, রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-কে তার সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করা হোক। এ ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের সময় ঘটেছিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর মাধ্যমে সুপারিশ করা হোক। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সুতরাং হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তার জন্যে সুপারিশ করেন তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগতঃস্বরে বলেনঃ "উসামা (রাঃ)! তুমি আল্লাহর হদসমূহের মধ্যে একটি হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছো?" একথা শুনে হযরত উসামা (রাঃ) অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে যান এবং বলেনঃ "আমি বড়ই অপরাধ করে ফেলেছি, দয়া করে আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর বলেনঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ স্বভাবের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো। পক্ষান্তরে কোন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর হদ জারি করতো। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও (সঃ) চুরি করে তবে তারও হাত কেটে নেবো।" অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে মহিলাটির হাত কেটে নেয়া হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "এরপর ঐ মহিলাটি বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হয়। তারপর থেকে সে কোন কাজে কামে আমার কাছে আসতো এবং তার প্রয়োজনের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তুলে ধরতাম।"

সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, একটি মহিলা লোকদের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার করতো, তারপর তা অস্বীকার করে বসতো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, মহিলাটি এভাবে অলংকার গ্রহণ করতো এবং হযরত বিলাল (রাঃ)-কে তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আহকামের কিতাবগুলোর মধ্যে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো চুরির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ পাকের জন্যই সমুদয় প্রশংসা। সমস্ত বাদশাহ্র বাদশাহ, সারা বিশ্বের প্রকৃত বাদশাহ এবং সঠিক শাসনকর্তা একমাত্র আল্লাহ, যাঁর কোন নির্দেশকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাঁর কোন ইচ্ছাকে কেউ বদলিয়ে দিতে সক্ষম নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٤١- يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ
الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ
مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا
بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ
وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ
لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ
لَمْ يَاْتُوْكَ ۗ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ
بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ
اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ
تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۗ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ
فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ
شَيْـًٔا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ
اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِى
الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৪১। হে রাসূল (সঃ)! যারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে কুফরীতে পতিত হয় (তাদের এ কর্ম) যেন তোমাকে চিন্তিত না করে, হয় তারা ঐসব লোকের মধ্য থেকেই হোক যারা নিজেদের মুখে তো (মিছামিছি) বলে– আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি, অথবা তারা সেইসব লোকের মধ্য থেকেই হোক যারা ইয়াহূদী, তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, তারা তোমার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্যে কান পেতে শোনে, যে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা তোমার নিকট আসেনি (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কালামকেও ওর স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে থাকে, তারা বলে, যদি তোমরা (তথায় গিয়ে) এ (বিকৃত) বিধান পাও তবে তো তা কবূল করবে, আর যদি এ (বিকৃত) বিধান না পাও তবে বেঁচে থাকবে; আর যার অমঙ্গল আল্লাহরই মঞ্জুর হয়, বস্তুতঃ তার জন্যে আল্লাহর সাথে তোমার কোন জোর চলতে পারে না; তারা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়; তাদের জন্যে ইহলোকে রয়েছে অপমান এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

৪২। তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে অভ্যস্ত, অতএব তারা যদি তোমার কাছে আসে, তবে হয় তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও কিংবা তাদের থেকে বিরত থাক, আর যদি তুমি তাদের থেকে বিরতই থাক তবে তাদের সাধ্য নেই যে, তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে, আর যদি তুমি মীমাংসা কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়তঃ মীমাংসা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

٤٢- سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

৪৩। আর তারা কিরূপে তোমাকে মীমাংসাকারী বানিয়ে নিচ্ছে? অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান! অতঃপর তারা এরপর (তোমার মীমাংসা হতে) ফিরে যায় আর তারা কখনও আস্থাবান নয়।

٤٣- وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৪। আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হেদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নবীরা তদনুযায়ী ইয়াহূদীদেরকে আদেশ করতো আর আল্লাহওয়ালাগণও এবং আলেমগণও, এ কারণে যে,

٤٤- اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا

اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

তাদেরকে এ কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা তা স্বীকার করেছিল; অতএব, (হে ইয়াহূদী আলেমগণ) তোমরাও মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর; আর আমার বিধানসমূহের বিনিময়ে (পার্থিব) সামান্য বস্তু গ্রহণ করো না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম না করে, তাহলে এমন লোক তো পূর্ণ কাফির।

এ আয়াতসমূহে ঐ লোকদের নিন্দে করা হচ্ছে যারা স্বীয় অভিমত, কিয়াস এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শরীয়তের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে দৌড়ে যায়। তারা মুখে শুধু ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান শূন্য। মুনাফিকদের অবস্থা তো এটাই যে, তারা মুখে খুব সাধুতা প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তর তাদের সম্পূর্ণ কপট।

ইয়াহূদীদের স্বভাবও তদ্রূপ। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু। তারা মিথ্যা ও বাজে কথা খুব মজা করে শুনে তাকে এবং অন্তরের সাথে কবূল করে থাকে। পক্ষান্তরে সত্য কথা থেকে তারা দূরে সরে থাকে, এমনকি ঘৃণাও করে। তারা নবী (সঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে মুসলমানদের গোপনীয় কথা নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তাদের পক্ষ থেকে তারা গুপ্তচরের কাজ করে। সবচেয়ে বড় দুষ্টুমি তাদের এই যে, তারা কথাকে বদলিয়ে দেয়। ভাবার্থ হবে একরূপ, কিন্তু তারা অন্য অর্থ করে জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, সেটা যদি তাদের মর্জি মোতাবেক হয় তবে তো মানবে, আর উল্টো হলে তা থেকে দূরে থাকবে। কথিত আছে যে, এ আয়াত ঐ সব ইয়াহূদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা একে অপরকে হত্যা করেছিল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করে–"চল, আমরা রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর নিকট গমন করি। যদি তিনি রক্তপণ ও জরিমানার নির্দেশ দেন তবে তো মনে নেবো। আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ দেন তবে মানবো না।” কিন্তু সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, তারা এক ব্যভিচারিণী মহিলাকে নিয়ে এসেছিল। তাদের কিতাব তাওরাতে তো এ হুকুমই ছিল যে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী বিবাহিত বা বিবাহিতা হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করে দিতে হবে। কিন্তু তারা ওটাকে বদলিয়ে দিয়েছিল এবং একশ চাবুক মেরে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং গাধায় উল্টো করে সওয়ার করিয়ে লাঞ্ছিত করতো। আর এরূপ শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিতো। নবী (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর তাদের কোন একজন ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হয়ে গ্রেফতার হয়। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ “চল, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি তিনি আমাদের শাস্তি দানের মতই শাস্তির নির্দেশ দেন তবে আমরা তা মেনে নেবো এবং আল্লাহর কাছেও এটা আমাদের জন্যে সনদ হয়ে যাবে। আর যদি রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দেন তবে তা মানবো না।” সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে বললোঃ “আমাদের এক মহিলা ব্যভিচার করেছে। তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন?” তিনি বললেনঃ ‘তোমাদের তাওরাতে কি নির্দেশ রয়েছে?’ তারা বললোঃ “আমরা তাকে লাঞ্ছিত করি এবং চাবুক মেরে ছেড়ে দেই।” এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বললেনঃ “তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ রয়েছে, তাওরাত নিয়ে এসো দেখি।” তারা তাওরাত খুলে দিল বটে, কিন্তু রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বাপর সমস্ত পড়ে শুনালো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সব কিছু বুঝে ফেললেন এবং তাদেরকে বললেন, হাত সরিয়ে নাও। হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতে হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করে দেয়া হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাটিকে পাথর থেকে বাঁচাবার জন্যে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা বলেছিল, ‘আমরা তো তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে এবং কিছু মারপিট করে ছেড়ে দেই।’ অতঃপর রজমের আয়াত প্রকাশ হওয়ার পর তারা বলে, ‘রয়েছে তো এ হুকুমই কিন্তু আমরা তা

গোপন করে রেখেছিলাম।' যে পাঠ করেছিল সে-ই রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়েছিল। যখন তার হাত সরিয়ে ফেলা হলো তখন রজমের আয়াত প্রকাশ হয়ে পড়লো। এ দু'জনকে রজমকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ইয়াহূদীরা লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ডেকে নিয়েছিল। তারা তাঁকে তাদের শিক্ষাগারে গদির উপর বসিয়েছিল। তাদের যে লোকটি তাওরাত পাঠ করেছিল সে তাওরাতের বড় পণ্ডিত ছিল। আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কসম দিয়ে বলেছিলেনঃ 'তোমরা তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর কি শাস্তি দেখেছ?' তারা উপরোক্ত উত্তরই দিয়েছিল। কিন্তু একটি যুবক কিছুই না বলে নীরবে দাঁড়িয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় কসম দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন এবং উত্তর চাইলেন। সে বললো, "আপনি যখন এমন কসমই দিলেন তখন আমি মিথ্যা কথা বলবো না। বাস্তবিক তাওরাতে এ প্রকারের অপরাধীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যাই রয়েছে।" তিনি বললেনঃ "আচ্ছা তাহলে এটাও সত্যি করে বল যে, তোমরা সর্বপ্রথম এ রজমকে কার উপর থেকে উঠিয়ে দিয়েছ?" সে উত্তরে বললো, জনাব! আমাদের বাদশাহর কোন এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় আত্মীয় ব্যভিচার করে। তার পদমর্যাদা এবং বাদশাহী প্রভাবের ফলে তাকে রজম করা হয়নি। তারপর এক সাধারণ লোক ব্যভিচার করে। তাকে রজম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তার গোত্রের সমস্ত লোক প্রতিবাদ করে বলে, পূর্ববর্তী লোকটিকেও রজম করতে হবে, না হলে একেও ছেড়ে দিতে হবে। তখন আমরা সবাই মিলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, এ ধরনের কোন শাস্তি নির্ধারণ করা হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাওরাতের হুকুমকেই জারী করেন। এ ব্যাপারেই اِنَّا اَنْزَلْنَا আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহও (সঃ) ঐ আহকাম জারীকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবি দাঊদ)

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, ইয়াহূদীরা একটি লোককে চুনকালি মাখাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা তাকে চাবুকও মারছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলে, "এ লোকটি ব্যভিচার করেছে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন–"তোমাদের বিধানে কি ব্যভিচারের শাস্তি এটাই?" তারা উত্তর দিলো, হ্যাঁ। তিনি তখন তাদের এক আলেমকে ডাকলেন এবং তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সে বললো, "আপনি

যদি আমাকে এরূপ কসম না দিতেন তবে আমি কখনও বলতাম না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের বিধানে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যাই বটে। কিন্তু আমীরুল উমারা ও সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে এ পাপকার্য খুব বেশী ছড়িয়ে পড়লে তাদেরকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া আমরা সমীচীন মনে করলাম না। তাই তাদেরকে তো ছেড়ে দিতাম। আর আল্লাহর নির্দেশও যাতে বৃথা না যায় তজ্জন্যে দরিদ্র ও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করে দিতাম। তারপর আমরা পরামর্শ করলাম যে, এমন এক শাস্তি নির্ধারণ করা যাক যা ধনী-গরীব, ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশেষে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে চাবুক মারা হবে।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ 'তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করে ফেল।' সুতরাং তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলা হয়। সেই সময় তিনি বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি প্রথম ঐ ব্যক্তি যে আপনার একটি মৃত হুকুমকে জীবিত করলো।" তখন يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَايَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ হতে وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এ ইয়াহূদীদেরই সম্পর্কে অন্য আয়াতে রয়েছে– 'আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম অনুযায়ী যারা মীমাংসা করে না তারা অত্যাচারী।' অন্য আয়াতে ফাসিক শব্দ রয়েছে। (সহীহ মুসলিম ইত্যাদি) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ব্যভিচারের ঘটনাটি ফিদকে ঘটেছিল। সেখানকার ইয়াহূদীরা মদীনার ইয়াহূদীদের নিকট একজন আলেমকে পাঠিয়ে ব্যভিচারের শাস্তি জানতে চেয়েছিল। তথাকার যে আলেমটি মদীনায় এসেছিল তার নাম ছিল ইবনে সূরিয়া। তার চক্ষু টেরা ছিল। তার সাথে আর একজন আলেমও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে কসম দিলে তারা দু'জনই তা কবূল করেছিল। তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ "আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর কসম দিচ্ছি যিনি বানী ইসরাঈলের জন্যে পানিতে রাস্তা করে দিয়েছিলেন, তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া করেছিলেন, তাদেরকে ফিরাউন থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের উপর 'মান' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলেন।" এ কসমে তারা চমকে ওঠে এবং পরস্পর বলাবলি করে, 'এটাতো বড়ই কঠিন কসম। এরূপ স্থলে মিথ্যে বলা মোটেই ঠিক হবে না।' তাই তারা বললো, জনাব! তাওরাতে রয়েছে যে, খারাপ নযরে দেখাও যেনাতুল্য, গলায় গলায় মিলনও যেনার মত এবং চুম্বন দেয়াও যেনাতুল্য। যদি এর উপর চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, তারা পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে

প্রবেশ করতে ও বের হতে দেখেছে, যেমন শলাকা সুরমাদানীর ভেতর যাতায়াত করে, তবে রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ মাসআলা তো এটাই। অতঃপর তিনি উক্ত যেনাকার পুরুষ ও নারীকে রজম করে দেয়ার নির্দেশ দেন। সেই সময় فَاِنْ جَاءُوْكَ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সুনানে আবি দাউদ ইত্যাদি) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, যে দু'জন আলেমকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে আনয়ন করা হয়েছিল, তারা ছিল সূরিয়ার দুইপুত্র। এ বর্ণনায় ইয়াহূদীদের হদ পরিত্যাগ করার কারণ তাদের পক্ষ থেকে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে– আমাদের মধ্যে যখন সালতানাত বা রাজত্ব রইলো না তখন আমরা আমাদের লোকদেরকে হত্যা করা সমীচীন মনে করলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাক্ষীদেরকে ডাকিয়ে নিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তারা বলে, আমরা তাদের দু'জনকে এ কু-কাজ করতে স্পষ্টভাবে দেখেছি, যেমনভাবে শলাকা সুরমাদানীর ভেতর প্রবেশ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ইত্যাদি চেয়ে পাঠানো এবং তাদের আলেমদেরকে ডেকে পাঠানো তাদেরকে দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে ছিল না এবং উদ্দেশ্য এটাও ছিল না যে, তারা ওটা মানবার মুকাল্লাফই নয়, বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশই অবশ্য পালনীয়। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ তাঁর সত্যতা প্রকাশ। তা এই যে, তাওরাতেও যে এ নির্দেশই রয়েছে তা তিনি অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। আর প্রকাশ পেলও তা-ই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে লজ্জিত করা যে, তারা প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তাদেরকে স্বীকার করতেই হলো এবং দুনিয়ায় এটা প্রকাশ পেয়ে গেলো যে, তারা আল্লাহর বিধানকে গোপনকারী এবং নিজেদের মত ও কিয়াসের উপর আমলকারী। তাছাড়া উদ্দেশ্য এও ছিল যে, ঐ ইয়াহূদীরা সরল মনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেনি যে, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে। বরং তাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, যদি তিনিও তাদের ইজমা' মোতাবেক নির্দেশ দেন তবে তারা মেনে নেবে, নচেৎ কিছুতেই মানবে না। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন যে, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার সুপথ প্রাপ্তি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের অপবিত্র অন্তরকে পবিত্র করার আল্লাহর ইচ্ছাই নেই। তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

বলা হচ্ছে–তারা মিথ্যা কথা কান লাগিয়ে শুনতে এবং হারাম বস্তু অর্থাৎ সুদ খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং কিরূপে তাদের অপবিত্র অন্তর পবিত্র হবে? আর তাদের দু'আই বা আল্লাহ কি করে শুনবেন? হে নবী (সঃ)! যদি তারা তোমার কাছে

মীমাংসার জন্যে আসে তবে তাদের ফায়সালা করা না করার তোমার অধিকার রয়েছে। তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তথাপি তারা তোমার কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কেননা, তাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ। কোন গুরুজন বলেন যে, এ আয়াতটি وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ-(৫ঃ ৪৯)-এ আয়াতটি দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে–হে নবী (সঃ)! যদি তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর তবে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করো, যদিও এরা নিজেরা অত্যাচারী এবং আদল ও ইনসাফ থেকে বহু দূরে রয়েছে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

অতঃপর ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তরের কলুষতা এবং বিরুদ্ধাচরণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, একদিকে তো তারা আল্লাহ পাকের এ কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছে যার আনুগত্য স্বীকার ও সত্যতার কথা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা ঐ দিকে ঝুঁকে পড়েছে যাকে তারা নিজেরাও মানে না এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার সেখানেও তাদের নিয়ত ভাল নয়। কারণ তাদের উদ্দেশ্য এই যে, যদি সেখানে গিয়ে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক হুকুম পায় তবে তো তা মেনে নেবে, নতুবা ছেড়ে দেবে। তাই, আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তারা কি করে তোমার হুকুম মানতে পারে? তারা তো তাওরাতকেও ছেড়ে দিয়েছে। তাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে, এটা তো তারাও স্বীকার করেছে, অথচ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তারপর এ তাওরাতের প্রশংসা করা হচ্ছে যা তিনি স্বীয় মনোনীত রাসূল হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। ওর মধ্যে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর হুকুমবাহী নবীগণ ওর মাধ্যমেই ফায়সালা করে থাকেন এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে ওরই আহকাম জারী করেন। তাঁরা ওর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে বেঁচে থাকেন এবং আল্লাহওয়ালা লোকেরাও এ নীতির উপর থাকেন। কেননা, এ পবিত্র গ্রন্থ তাঁদেরকে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং ওটা প্রকাশ করে দেয়া ও ওর উপর আমল করার তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁরা ওর উপর সাক্ষী ছিলেন।

ঘোষিত হচ্ছে–এখন তোমাদের উচিত যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। তোমরা প্রতি মুহূর্তে এবং পদে পদে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং তাঁর আয়াতগুলোকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে

না। জেনে রেখো যে, আল্লাহর নাযিলকৃত অহী মোতাবেক যারা ফায়সালা করে না তারা কাফির। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণিত হচ্ছে। এ আয়াতগুলোর আরও একটি শানে নযূল নিম্নরূপঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে এ লোকদেরকে কাফির, দ্বিতীয় আয়াতে যালিম এবং তৃতীয় আয়াতে ফাসিক বলা হয়েছে। ব্যাপার এই যে, ইয়াহূদীদের দু'টি দল ছিল। একটি বানূ নাযীর এবং অপরটি বানূ কুরাইযা। প্রথমটি ছিল সবল এবং দ্বিতীটি ছিল দুর্বল। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ কথার উপর সন্ধি হয়েছিল যে, সবল দলটির কোন লোক যদি দুর্বল দলটির কোন লোককে হত্যা করে তবে তাকে পঞ্চাশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বল দলটির কোন লোক সবল দলটির কোন লোককে হত্যা করে তবে তাকে একশ ওয়াসাক রক্তপণ আদায় করতে হবে। এ প্রথাই তাদের মধ্যে চলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের পর এরূপ এক ঘটনা ঘটে যে, দুর্বল ইয়াহূদীদের এক ব্যক্তি সবল ইয়াহূদীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন এদের পক্ষ থেকে এক লোক ওদের কাছে গিয়ে বলে, 'এখন একশ' ওয়াসাক আদায় কর।' তারা উত্তরে বলে, "এটা তো প্রকাশ্যভাবে অন্যায় আচরণ। আমরা তো সবাই একই গোত্রের, একই ধর্মের, একই বংশের এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ পাবো কম আর তোমরা পাবে বেশী! এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিলে। আমরা বাধ্য ও অপরাগ হয়ে তোমাদের এ অন্যায় সহ্য করে আসছিলাম। কিন্তু এখন যেহেতু এখানে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ লোক এসে গেছেন সেহেতু আমরা তোমাদেরকে সেই পরিমাণ রক্তপণই প্রদান করবো যে পরিমাণ তোমরা আমাদেকে প্রদান করে থাক।" এ নিয়ে চতুর্দিকে গোলমান শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এর মীমাংসাকারী নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু সবল লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো তখন তাদের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক তাদেরকে বললো, তোমরা এ আশা করো না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যায়ের আদেশ প্রদান করবেন। এটাতো স্পষ্ট বাড়াবাড়ি যে, আমরা দেবো অর্ধেক এবং নেবো পুরোপুরি! আর বাস্তবিকই এ লোকগুলো অপারগ হয়েই এটা মেনে নিয়েছিল। এক্ষণে যখন তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে মীমাংসাকারী নির্বাচন করলে তখন অবশ্যই তোমাদের হক মারা যাবে। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো,

গোপনে কোন লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দাও। তিনি কি ফায়সালার করবেন তা সে জেনে আসুক। সেটা যদি আমাদের অনুকূলে হয় তবে তো ভাল কথা। আমরা তাদের নিকট থেকে আমাদের হক আদায় করে নেবো। আর যদি ওটা আমাদের প্রতিকূলে হয় তবে আমাদের পৃথক থাকাই বাঞ্ছণীয় হবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা মদীনার কয়েকজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলো। তারা তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে তাদের কু-মতলব সম্পর্কে অবহিত করলেন। (সুনানে আবি দাঊদ)

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, বানূ নাযীর গোত্র পুরোপুরি রক্তপণ গ্রহণ করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উভয় গোত্রকে রক্তপণ সমান সমান দেয়ার ফায়সালা করলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, বানূ কুরাইযার কোন লোক বানূ নাযীরের কোন লোককে হত্যা করলে তার কিসাস নেয়া হতো। পক্ষান্তরে বানূ নাযীরের কোন লোক বানূ কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করলে কিসাসের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, বরং রক্তপণ ছিল একশ ওয়াসাক। এটা খুবই সম্ভব যে. এদিকে এ ঘটনা ঘটে এবং ঐদিকে ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে যায়। আর দু'টো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। হ্যাঁ, তবে আরও একটি কথা রয়েছে, যদ্দ্বারা এ দ্বিতীয় শানে নযূলটির প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এরপরেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۔

(অর্থাৎ আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রূপ অন্যান্য) বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে; অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে এটা তার জন্যে (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে তবে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম।) আল্লাহ পাকই সবচেয়ে বেশী জানেন।

অতঃপর যারা আল্লাহর শরীয়ত এবং তাঁর অবতারিত অহী অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। এ আয়াতটি মুফাস্‌সিরদের উক্তি অনুযায়ী শানে নযূল হিসেবে আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও হুকুমের দিক দিয়ে এটা সমস্ত লোকের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এটা বানূ ইসরাঈলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল বটে; কিন্তু এ উম্মতেরও এটাই হুকুম। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ঘুষ খেয়ে কোন শরঈ মাসআলার ব্যাপারে উল্টো ফতওয়া দেয়া কুফরী। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যদি ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর অহীর বিপরীত ফতওয়া দেয়, জানা সত্ত্বেও তার উল্টো করে তবে সে কাফির। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অস্বীকার করবে তার হুকুম এটাই। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করলো না বটে, কিন্তু তা মোতাবেক বললো না, সে যালিম ও ফাসিক। সে আহলে কিতাবই হোক বা আর কেউ হোক। শা'বী (রঃ) বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত ফতওয়া দেবে সে কাফির, ইয়াহূদীদের মধ্যে দেবে সে যালিম এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে দেবে সে ফাসিক। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার কুফরী হচ্ছে এ আয়াতের সঙ্গে। তাঊস (রাঃ) বলেন যে, তার কুফরী ঐ ব্যক্তির কুফরীর মত নয় যে আল্লাহ, রাসূল (সঃ), কুরআন এবং ফেরেশতাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। আতা' (রঃ) বলেন যে, কুফরীর মধ্যে যেমন কম বেশী আছে তেমনই যুলম ও ফিসকের মধ্যেও কম বেশী আছে। এ কুফরীর কারণে সে মিল্লাতে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা যে দিকে যাচ্ছ এর দ্বারা ঐ কুফরী উদ্দেশ্য নয়।"

৪৫। আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রূপ অন্যান্য) বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে; অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়

٤٥- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ

تصدق بِهٖ فهو كفارة له ومن لم يحكم بِمـــا انزل الله فاولئك هم الظلمون ○

তবে এটা তার জন্যে (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে তবে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম।

ইয়াহূদীদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় যে হুকুমগুলো ছিল তারা তো খোলাখুলিভাবে তারও বিরোধিতা করছে এবং দুষ্টামি করে ও বেপরওয়া ভাব দেখিয়ে সেগুলোও পরিত্যাগ করছে। ইয়াহূদ বানূ নাযীরকে ইয়াহূদ বানূ কুরাইযার বিনিময়ে হত্যা করছে, কিন্তু ইয়াহূদ বানূ কুরাইযাকে ইয়াহূদ বানূ নাযীরের বিনিময়ে হত্যা করছে না। অনুরূপভাবে তারা বিবাহিত ব্যভিচারীর রজমের হুকুমকে বদলিয়ে দিয়েছে এবং মারপিট করে ছেড়ে দিচ্ছে। এজন্যই সেখানে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আর এখানে ইনসাফ না করার কারণে তাদেরকে যালিম বলা হয়েছে। সুনানে আবি দাঊদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর وَالْعَيْنُ পড়াও বর্ণিত আছে। উলামায়ে কিরাম বলেনঃ "পূর্ববর্তী যে শরীয়তকে আমাদের সামনে আলোচনা পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা মানসূখ বা রহিত করা হয়নি ওটা আমাদের জন্যও শরীয়ত। যেমন উপরোক্ত এ সমস্ত হুকুম আহকাম আমাদের শরীয়তেও একইভাবে প্রযোজ্য।" ইমাম নববী (রঃ) বলেন যে, মাসআলায় তিনটি পন্থা বা নীতি বর্ণিত রয়েছে। প্রথম তো ওটাই যা বর্ণনা করা হলো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তৃতীয়টি হচ্ছে এই যে, শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শরীয়ত জারী ও বাকী রয়েছে। অন্য কোন শরীয়ত অবশিষ্ট নেই।

এ আয়াতটি সাধারণ বলে এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়েও পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। কেননা, এখানে نَفْس শব্দ রয়েছে. যদ্দ্বারা নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝাচ্ছে। তাছাড়া সুনানে নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমর ইবনে হাযাম (রাঃ)-কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়ে পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, মুসলমানদের রক্ত পরস্পরের মধ্যে সমান। কোন কোন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, কোন পুরুষ লোক যদি কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে তবে তার বিনিময়ে পুরুষ লোকটিকে হত্যা করা হবে না,

বরং তার নিকট থেকে রক্তপণ আদায় করতে হবে। এটা কিন্তু জমহূর উলামার বিপরীত কথা। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, যিম্মী কাফিরের হত্যার বিনিময়েও মুসলমানকে হত্যা করা হবে এবং গোলামের হত্যার বিনিময়ে আযাদ ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু এ মাযহাব জমহূরের বিপরীত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কাফিরের হত্যার বিনিময়ে মুলমানকে হত্যা করা হবে না। আর পূর্ববর্তী মনীষীদের বহু নমুনা এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে যে, তারা আযাদ ব্যক্তি হতে গোলাম হত্যার কিসাস গ্রহণ করতেন না। আর গোলামের হত্যার বিনিময়ে আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না। এ ব্যাপারে কতগুলো হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলো বিশুদ্ধতায় পৌঁছেনি। ইমাম শাফিঈ (রঃ) তো বলেছেন যে, এ মাসআলা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর উক্তির বাতিল হওয়া সাব্যস্ত হয় না যে পর্যন্ত না এ আয়াতের সাধারণত্বকে নির্দিষ্ট করণের কোন যবরদস্ত ও স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত হয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)-এর ফুফু হযরত রাবী (রঃ) একটি দাসীর একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন জনগণ তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু সে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'কিসাস নেয়া হবে।' তখন হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাঁর কি সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ! হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে।" তখন হযরত আনাস (রাঃ) বললেনঃ না, না, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাঁর দাঁত কখনও ভেঙ্গে ফেলা হবে না। বস্তুতঃ হলোও তাই। দাসীটির কওম সম্মত হয়ে গেল এবং কিসাস ছেড়ে দিলো, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমাই করে দিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "অবশ্যই আল্লাহর কতক বান্দা এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপর কোন কিছুর কসম করলে তিনি তা পুরো করেই ছাড়েন।"

দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রথমে তারা ক্ষমাও করেনি এবং দিয়্যাতও মঞ্জুর করেনি। সুনানে নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, একটি গরীব জামাআতের গোলাম কোন এক ধনী জামাআতের গোলামের কান কেটে দেয়। ঐ লোকগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে আরয করেঃ আমরা দরিদ্র লোক, আমাদের কাছে মালধন নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর কোন

জরিমানা করেননি। হতে পারে যে, গোলামটি হয়তো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, কিংবা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের পক্ষ থেকে দিয়্যাত প্রদান করেছিলেন। আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি তাদেরকে সুপারিশ করে তাদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যা করা হবে, কেউ কারও চক্ষু উঠিয়ে নিলে তারও চক্ষু উঠিয়ে নেয়া হবে, কেউ কারও নাক কেটে নিলে তারও নাক কেটে নেয়া হবে, কেউ কারও দাঁত ভেঙ্গে দিলে তারও দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং যখমেরও বদলা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে আযাদ মুসলমান সবাই সমান। নারী ও পুরুষের একই হুকুম, যখন তারা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ করবে। তাতে গোলামেরাও পরস্পরের মধ্যে সমান। তাদের পুরুষ লোকেরাও সমান এবং স্ত্রীলোকেরাও সমান।

নীতিমালাঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কর্তন কখনও জোড়ার উপর হয়ে থাকে। এতে কিসাস ওয়াজিব হয়। যেমন হাত, পা, হাতের তালু ইত্যাদি। কিন্তু যে ক্ষত জোড়ের উপর হয় না, বরং অস্থির উপর হয় সে সম্পর্কে ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, উরু এবং উরুর ন্যায় অন্য অঙ্গ ছাড়া অস্থিতেও ওয়াজিব। কেননা, ওটা ভয় ও বিপদের জায়গা। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের মাযহাব এই যে, দাঁত ছাড়া কোন অস্থিতে কিসাস ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর নিকট কোন অস্থির উপর সাধারণভাবে কিসাস ওয়াজিব নয়। হযরত উমার ফারূক (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। আতা' (রঃ), শা'বী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), যুহরী (রঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং উমার ইবনে আবদুল আযীযও (রঃ) এ কথাই বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এবং লায়েস ইবনে সাদও (রঃ) এদিকেই গিয়েছেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) হতেও এ উক্তিটিই বেশী প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর দলীল হচ্ছে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রাবী (রাঃ) হতে দাঁতের কিসাস গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রিওয়ায়াত দ্বারা এ মাযহাব সাব্যস্ত হচ্ছে না। কেননা, তাতে এ শব্দগুলো রয়েছে যে, তিনি তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন। আর হতে পারে যে, দাঁত না ভেঙ্গেই ঝরে পড়েছিল। এ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। তাঁর দলীলের পূর্ণ অংশ ওটাই যা সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে। তা এই যে, একটি লোক অপর একটি লোকের বাহুতে কনুইর নীচে তালোয়ার মেরেছিল, যার ফলে তার হাতের কব্জি কেটে গিয়েছিল। এ মুকদ্দমা নবী (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি দিয়্যাত আদায়ের নির্দেশ দেন। তখন লোকটি বলেঃ

হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কিসাস চাই। তিনি বললেনঃ "তুমি দিয়্যাত গ্রহণ কর। আল্লাহ তোমাকে তাতে বরকত দান করবেন।" তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন না। কিন্তু এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। এর একজন বর্ণনাকারী হাশাম ইবনে উকলী আবারী দুর্বল। তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না। আর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছে গেরান ইবনে জারিয়া আরাবী, সেও দুর্বল। অতঃপর তাঁরা বলেন যে, যখম ভাল ও ঠিক হয়ে যাওয়ার পূর্বে ওর কিসাস নেয়া জায়েয নয়। আর যদি ভাল হওয়ার পূর্বেই কিসাস নিয়ে নেয়, তারপর যখম বেড়ে যায় তবে আবার বদলা নেয়া যাবে না। এর দলীল হচ্ছে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটি। তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক অন্য একটি লোকের জানুতে আঘাত করে। সে তখন নবী (সঃ) এর নিকট হাযির হয়ে বলেঃ 'আমাকে কিসাস নিয়ে দিন।' তিনি বললেনঃ 'যখম ভাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' সে আবার এসে বললোঃ 'আমাকে কিসাস নিয়ে দিন।' তিনি তখন কিসাস নিয়ে দিলেন। এরপর লোকটি আবার নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেছি।' তখন তিনি বললেনঃ "আমি তো তোমাকে (যখম ভাল হওয়ার পূর্বে কিসাস নিতে) নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা মেনে নাওনি। এখন তোমার এ খোঁড়ামির কোন বদলা নেই।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখম ভাল হওয়ার পূর্বে কাউকে তার প্রতিপক্ষের নিকট হতে কিসাস গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

মাসআলাঃ কেউ যদি অন্যকে যখম করে এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হয়, অতঃপর সে ঐ যখমেই মারা যায় তবে বিবাদীর উপর আর কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমহূর সাহাবা এবং তাবেঈনের এটাই উক্তি। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর উক্তি এই যে, তার মাল থেকেই তার উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। আতা' (রঃ) বলেন যে, তার পিতা-মাতার পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজনদের উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এবং নাখঈ (রঃ) বলেন যে, বিবাদীর উপর হতে ঐ যখম পরিমাণ তো উঠে যাবে, আর বাকীটা তারই মাল থেকে ওয়াজিব হবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেবে, ওটা ঐ যখমকারীর জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে এবং যাকে যখম করা হয়েছে তার জন্যে সওয়াব বা পুণ্যের কারণ হবে, যা আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে। কেউ

কেউ এটাও বলেছেন যে, ঐ কাফ্ফারা হবে যখমকৃত ব্যক্তির জন্যে অর্থাৎ তার ঐ যখম পরিমাণ গুনাহ্ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। একটি মারফূ' হাদীসে এসেছে যে, ওটা যদি দিয়্যাতের এক চতুর্থাংশ বরাবর জিনিস হয় এবং তা সে ক্ষমা করে দেয় তবে তার গুনাহ্র এক চতুর্থাংশ মাফ হয়ে যাবে। যদি এক তৃতীয়াংশের সমান হয় তবে এক তৃতীয়াংশ গুনাহ্ মাফ হবে। যদি অর্ধাংশের সমান হয় তবে অর্ধাংশ গুনাহ্ মাফ হবে। আর যদি পুরো দিয়্যাতের সমান হয় তবে তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) আবূ সফর (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একজন কুরাইশী একজন আনসারীকে সজোরে ধাক্কা দেন। ফলে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট এ মুকদ্দমা নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুআবিয়া (রাঃ) ঐ বাদীকে বলেন, বিবাদীর ব্যাপারে তোমাকে অধিকার দেয়া হলো, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। ঐ সময় হযরত আবূ দারদা (রাঃ) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি–কেউ যদি কোন মুসলমানের দেহের উপর কোন কষ্ট দেয়, অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।" একথা শুনে ঐ আনসারী বললেনঃ "আপনি কি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মুখে এ কথা শুনেছেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমার কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।" তখন আনসারী বললেনঃ "আমি আমার বিবাদীকে মাফ করে দিলাম।" হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এ কথা শুনে খুবই খুশী হলেন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। (তাফসীরে ইবনে জারীর) জামেউত তিরমিযীতেও এ হাদীসটি রয়েছে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী একে গারীব বলেছেন। বর্ণনাকারী আবূ সফরের হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে শ্রবণ সাব্যস্ত নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, বিবাদী তিনগুণ দিয়্যাত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতেও সম্মত হচ্ছিলেন না। তাতে হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপ রয়েছে–

"যে ব্যক্তি রক্ত বা তদপেক্ষা কমকে মাফ করে দেবে, ওটা তার জন্যে তার জীবন থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।" মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তির দেহে যদি কারও দ্বারা কোন যখম হয় এবং সে তাকে মাফ করে দেয় তবে আল্লাহ তার সেই পরিমাণ গুনাহ্ মাফ করে দেন।" মুসনাদে আহমাদে নিম্নের হাদীসটিও রয়েছে–

"যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা যালিম।" পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরীর মধ্যে কম বেশী আছে, যুলুমেরও কম বেশী আছে এবং ফিসকের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে।

৪৬। আর আমি তাদের পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এ অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম যে, সে তার পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের সমর্থন করেছিল, এবং আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত ছিল এবং আলো ছিল, আর এটা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করতো, এবং এটা সম্পূর্ণরূপে মুত্তাকীদের জন্যে হিদায়াত ও নসীহত ছিল।

٤٦- وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৭। আহ্‌লে ইঞ্জীলের উচিত যে, আল্লাহ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম প্রদান করে না, তবে তো এরূপ লোকই পূর্ণ নাফরমান।

٤٧- وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

এখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি ঈসা (আঃ)-কে বানী ইসরাঈলের শেষ নবী করে পাঠিয়েছিলাম। সে তাওরাতকে বিশ্বাস করতো এবং ওর নির্দেশ অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়সালা করতো। আমি তাকে স্বীয় কিতাব ইঞ্জীল প্রদান করেছিলাম। তাতে সত্যের হিদায়াত ছিল, আর ছিল কাঠিন্য ও জটিলতার ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর অনুকরণ। তবে কতগুলো মাসআলার তাতে স্পষ্ট ফায়সালা ছিল, যেগুলোতে ইয়াহূদীরা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। যেমন

কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ "আমি এমন কতগুলো জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করবো যেগুলোতোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছিল।" এ জন্যেই আলেমদের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, ইঞ্জীল তাওরাতের কতক হুকুম মানসূখ করে দিয়েছে। ইঞ্জীল দ্বারা পুণ্যবান লোকেরা হেদায়াত, ওয়ায ও উপদেশ লাভ করতো এবং এর ফলে তারা পুণ্য লাভের প্রতি আগ্রহী হতো অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতো। 'অল য়্যাহ্কুম আহ্লুল ইঞ্জীলে' এখানে 'আহ্লাল ইঞ্জীলে'ও পড়া হয়েছে। এ অবস্থায় وَلِيَحْكُمْ শব্দটি كَيْ -এর অর্থে হবে। তখন ভাবার্থ হবে–আমি ঈসা (আঃ)-কে ইঞ্জীল এ জন্যেই প্রদান করেছি যে, যেন সে তার যুগের তার অনুসারীদেরকে ওটা অনুযায়ীই পরিচালিত করে। আর যদি মাশহূর কিরআত وَلْيَحْكُمْ অনুযায়ী لَام -কে আমরের لَام মনে করা হয় তবে তখন অর্থ হবে– তাদের উচিত যে, তারা ইঞ্জীলের সমস্ত আহকামের উপর ঈমান আনে এবং ওটা অনুযায়ী ফায়সালা করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ অর্থাৎ " বল হে আহলে কিতাব! যে পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত না হবে সে পর্যন্ত তোমরা কিছুরই উপর নও। (৫ঃ ৬৮) আর এক জায়গায় আছে– اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ অর্থাৎ "যারা এ রাসূল, নবী উম্মী (সঃ)-এর অনুসরণ করে যাঁর গুণাবলী তারা তাদেরই নিকট গচ্ছিত কিতাব তাওরাতে পেয়ে থাকে তারাই সফলকাম।" (৭ঃ ১৫৭) যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী (সঃ)-এর নির্দেশমত ফায়সালা করে না তারা আল্লাহর আনুগত্য হতে বেরিয়ে পড়েছে, সত্যকে পরিত্যাগ করেছে, বাতিলের উপর আমল করেছে। আয়াতটির গতি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে যে, এটা খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর পূর্বে এ বর্ণনা দেয়াও হয়েছে।

৪৮। আর আমি এ কিতাব (কুরআন)-কে তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতাগুণে বিভূষিত, (এবং) ওর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সব কিতাবের সংরক্ষকও; অতএব, তুমি তাদের পাস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এ

٤٨-وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ

أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَّمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتٰكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ إِلَى
اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ○

কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করো, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছো, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করো না, তোমাদের প্রত্যেক (সম্প্রদায়) -এর জন্যে আমি নির্দিষ্ট শরীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। এই কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যাতে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।

٤٩- وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ

৪৯। আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এ প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না, এবং তাদের দিক থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহর প্রেরিত কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত

أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُونَ ○

করতে না পারে; অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে দৃঢ়বিশ্বাস রেখো, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে।

৫০-أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوقِنُونَ ○

৫০। তবে কি তারা অজ্ঞতা যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে কে উত্তম হবে?

তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর এখন কুরআন কারীমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক বলছেন–আমি এ কুরআনকে হক ও সত্যতার সাথে নাযিল করেছি। নিশ্চিতরূপে এটা এক আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এবং এটা তাঁরই কালাম বা কথা। এটা পূর্ববর্তী সমুদয় কিতাবের সত্যতা স্বীকার করছে এবং ঐসব কিতাবেও এর প্রশংসা ও গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। আর ঐ কিতাবগুলোর মধ্যে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, এ পবিত্র ও সর্বশেষ কিতাবটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানী লোক এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং একে মেনে চলে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا* وَّيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا*

অর্থাৎ "ইতিপূর্বে যাদেরকে ইল্ম বা জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাদের সামনে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন থুতনির ভরে তারা সিজদায় পড়ে যায় এবং মুখে স্বীকারোক্তি করে–আমাদের প্রভু মহান ও পবিত্র, আমাদের প্রভুর ওয়াদা সত্য এবং তা সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েই গেছে।" (১৭ঃ ১০৭-১০৮)

অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছিলেন, সবগুলোই সত্যে পরিণত হয়েছে এবং সমস্ত নবীর মাথার মুকুট সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এসেই গেছেন। আর এ কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর আমানতদার। অর্থাৎ এতে যা কিছু রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে

সেগুলোই ছিল। এখন যদি কেউ বিপরীত বলে যে, পূর্ববর্তী অমুক কিতাবে এটা ছিল, তবে সেটা ভুল। এ কুরআন ঐসব কিতাবের সত্যসাক্ষী এবং ঐগুলোকে আবেষ্টনকারী। যেসব মঙ্গলময় ও কল্যাণকর বিষয় ঐ সব কিতাবে মিলিতভাবে ছিল ঐ সমুদয়ই এককভাবে এ সর্বশেষ কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যেই এটা সবগুলোর উপর হাকিম ও অগ্রগণ্য। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার উপর রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেনঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ "এ উপদেশপূর্ণ কিতাব আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর হিফাযতকারী।" (১৫ঃ৯) কেউ কেউ বলেছেন যে, এর ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হচ্ছেন এ কিতাবের উপর আমানতদার। বাস্তবিকপক্ষেতো এ উক্তিটি সঠিক, কিন্তু এ তাফসীর করা ঠিক হয়নি। বরং আরবী ভাষার দিক দিয়ে এটা চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। সঠিক তাফসীর প্রথমটিই বটে। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে এ উক্তিটি নকল করে বলেছেন যে, এটা বহু দূরের কথা, বরং এটা মোটেই ঠিক নয়। কেননা مُهَيْمِن শব্দের عطف বা সংযোগ مُصَدِّق শব্দের উপর রয়েছে। সুতরাং مُصَدِّق শব্দটি যার صِفَتْ ছিল এটাও ঐ জিনিসেরই صِفَت বা বিশেষণ হবে। যদি হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর অর্থ সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তবে عِبَارَت সংযোগ ছাড়াই হওয়া উচিত ছিল।

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! সুতরাং তুমি এ সবের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশাবলী ছড়িয়ে দাও, আরব হোক বা আযম হোক, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক। 'আল্লাহর নাযিলকৃত'-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অহী। হয় সেটা এ কিতাবের আকারেই হোক, না হয় আল্লাহ তা'আলা যে পূর্ববর্তী আহকাম তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাই হোক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতের পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করা ও না করার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অহী মোতাবেক ফায়সালা করা জরুরী। তাঁকে বলা হচ্ছে–হে নবী (সঃ)! এ দুর্ভাগা অজ্ঞরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে আহকাম তৈরী করে নিয়েছে এবং ওর কারণে আল্লাহর কিতাবকে যে পরিবর্তন করে ফেলেছে, কোনক্রমেই তুমি তাদের প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে সত্যকে ছেড়ে বসো না। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি রাস্তা এবং পন্থা তৈরী করে দিয়েছি।

কোন কিছুর সূচনা করাকে شِرْعَةٌ বলা হয়। আভিধানিক অর্থে প্রকাশ্য ও সহজ পথকে مِنْهَاجٌ বলে। সুতরাং এ দু'টি শব্দের এ তাফসীরই বেশী যুক্তিসঙ্গত হবে

যে, পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়ত যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল তার সবগুলোই তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য ছোট খাটো হুকুমের ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য ছিল। যেমন সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমরা সব নবীর দল পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সবারই দ্বীন এক।" প্রত্যেক নবীকে তাওহীদসহ পাঠানো হতো এবং প্রত্যেক আসমানী কিতাবে তাওহীদের বর্ণনা, ওটাকেই সাব্যস্ত করণ এবং ওরই দিকে আহ্বান থাকতো। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে- "তোমার পূর্বে আমি যত রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তাদের এ অহী করেছিলাম–আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।"

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে এ নির্দেশই দিয়েছিলাম–তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগুত বা শয়তানের ইবাদত থেকে বিরত থাকবে।" হ্যাঁ, তবে আহকামের বিভিন্নতা অবশ্যই ছিল। কোন একটি জিনিস কোন এক যুগে হারাম ছিল, পরে তা হালাল হয়ে যায়। কিংবা এর বিপরীত, অর্থাৎ কোন যুগে হালাল ছিল, পরে তা হারাম হয়ে যায়। অথবা, কোন এক হুকুম কোন সময় হালাকা ছিল, পরে তা ভারী হয়ে যায়। কিংবা এর বিপরীত। আর এটাও আবার ছিল হিকমত, মুসলিহাত এবং আল্লাহর দলীল প্রমাণের সাথে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন তাওরাত একটি শরীয়ত, ইঞ্জীল একটি শরীয়ত এবং কুরআন একটি পৃথক শরীয়ত। এটার কারণ হচ্ছে এই যে, যেন প্রত্যেক যুগের বাধ্য ও অবাধ্য বান্দাদের মধ্যে পরীক্ষা হয়ে যায়। অবশ্য সর্বযুগে তাওহীদ একই রূপ ছিল। আর এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে–হে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মত! আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমার এ কিতাবকে (কুরআনকে) শরীয়ত ও তরীকা বানিয়েছি। তোমাদের সবারই এর অনুকরণ করা উচিত। এ অবস্থায় جَعَلْنَا-এর পরে ه সর্বনাম উহ্য মেনে নিতে হবে। সুতরাং উত্তম উদ্দেশ্য লাভের মাধ্যম ও পন্থা একমাত্র কুরআন, আর কিছুই নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি প্রথমটিই বটে। এর এটাও একটা দলীল যে, এর পরে রয়েছে- "যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন।" অতএব জানা গেল যে, পূর্ব সম্বোধন শুধু এ উম্মতকেই নয়, বরং এর সম্বোধন হচ্ছে সকল উম্মতের প্রতিই। আর এতে আল্লাহ তা'আলার খুব বড় ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে যে, যদি তিনি চাইতেন তবে সমস্ত লোককে একই শরীয়ত ও একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন, কোন সময়ও কোন প্রকার পরিবর্তন আসতো না। কিন্তু মহান

প্রভুর পরিপূর্ণ হিকমত ও কলাকৌশলের চাহিদা এই যে, তিনি পৃথক শরীয়ত নির্ধারণ করবেন, একের পর অন্য নবী প্রেরণ করবেন, কোন নবীর হুকুমকে পরবর্তী নবীর মাধ্যমে বদলিয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দ্বীন মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। তাঁকে সারা বিশ্বের জন্যে সর্বশেষ নবী করে পাঠানো হয়।

ঘোষিত হচ্ছে–এ বিভিন্ন শরীয়ত দেয়া হয়েছে শুধু তোমাদের পরীক্ষার জন্যে, যেন তিনি তোমাদের বাধ্য ও অনুগত লোকদেরকে পুরস্কার এবং অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেন। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি যেন ঐ জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ কিতাব। অতএব, তোমাদের উচিত মঙ্গল ও পুণ্যের দিকে দৌড়িয়ে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর শরীয়ত মেনে চলতে আগ্রহী হওয়া এবং সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর মনে প্রাণে আনুগত্য করা। হে লোক সকল! তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল আল্লাহরই কাছে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মতভেদের মধ্যে প্রকৃত মত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিতদের তিনি পুরস্কৃত করবেন এবং মিথ্যা ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিরুদ্ধবাদী ও প্রবৃত্তিপূজারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। যারা হককে মানা তো দূরের কথা, বরং হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই উত্তম।

অতঃপর প্রথম কথার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে এবং ওর বিপরীত থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে–হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি যেন এ বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী, মিথ্যাবাদী, কাফির ইয়াহূদীর কথার ফাঁদে পড়ে আল্লাহর কোন হুকুম থেকে এদিক ওদিক চলে না যাও। যদি তারা তোমার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে জেনে রেখো যে, তাদের কলংকময় কার্যাবলীর কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই নেমে আসবে। এজন্যই ভাল কাজের তাওফীক তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ফাসেক অর্থাৎ হকের আনুগত্য হতে বাইরে, আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী এবং হিদায়াত হতে দূরে। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন–

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তুমি লোভ করে চাইলেও অধিকাংশ লোক মুমিন নয়।"(১২ঃ ১০৩) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "তুমি যদি পৃথিবীবাসীর অধিকাংশের কথা মেনে চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে।" (৬ঃ ১১৭)

ইয়াহূদীদের কয়েকজন বড় বড় নেতা এবং আলেম আপোষে এক মিটিং করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয় এবং বলেঃ "আপনি জানেন যে, আমরা যদি আপনাকে মেনে নেই তবে সমস্ত ইয়াহূদী আপনার নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেবে। আর আমরা আপনাকে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। আপনি শুধু এটুকু করেন যে, আমাদের মধ্যে এবং আমাদের কওমের মধ্যে একটা বিবাদ আছে, আপনি আমাদের মতানুযায়ী এর মীমাংসা করে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা অস্বীকার করলেন। ঐ সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এরপর মহান আল্লাহ ঐ লোকগুলো কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছেনঃ যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দূরে সরে থাকে যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরে আছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং ঐসব হুকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা লোকেরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। যেমন আহলে জাহেলিয়াত ও আহলে দলালাত (গুমরাহ সম্প্রদায়) নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক হুকুম আহকাম জারী করতো এবং যেমন তাতারীগণ রাষ্ট্রীয় কাজ কারবারে চেঙ্গিজ খানি হুকুমের অনুসরণ করতো, যা আল-ইয়াসিক তৈরী করে দিয়েছিল। ওটা ছিল বহু সম্মিলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শরীয়ত ও মাযহাব হতে ছেঁটে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহূদিয়াত, নাসরানিয়াত, ইসলামিয়াত ইত্যাদি সমস্ত আহকামের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা শুধুমাত্র জ্ঞান, মত ও সূক্ষ্ম চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে প্রবৃত্তিরও সংযোগ ছিল। সুতরাং ঐ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট আমলের যোগ্য বিবেচিত হতো এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে দিলো। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। যে পর্যন্ত তারা ঐসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন হুকুম গ্রহণ না করে।

তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ তবে কি তারা অজ্ঞানতার যুগের মীমাংসা কামনা করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে হবে?

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও হুকুম বেশী ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারে না। ঈমানদার ও পূর্ণ বিশ্বাসীগণ খুব ভাল করেই জানে যে, এ আহকামুল হাকিমীন, আরহামুর রাহিমীনের চেয়ে বেশী উত্তম, স্বচ্ছ, সহজ ও পবিত্র আহ্কাম, মাসায়েল এবং কাওয়ায়েদ আর কারও হতে পারে না। মা তার ছেলের প্রতি যতটা পরবশ হতে পারে তার চেয়েও বেশী তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের উপর মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিরাট শক্তি এবং ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারী। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া কোন ফতওয়া দেয় ওটাকে জাহেলিয়াতের হুকুম বলা হবে। হযরত তাঊস (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "আমি কি আমার সন্তানদের কাউকে বেশী এবং কাউকে কম দিতে পারি?" তখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। তিবরানী (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সবেচেয়ে বড় শত্রু যে ইসলামে অজ্ঞতা যুগের নিয়ম-কানুন ও চাল-চলন অনুসন্ধান করে এবং বিনা কারণে কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।" এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে এবং তাতে কিছুটা বেশী আছে।

৫১। হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী কওমকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

٥١- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫২। এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, তাদেকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা

٥٢- فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ

نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ○

বলে–আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব আশা যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলমানদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুক্কায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে।

৫৩– وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ○

৫৩। আর মুসলমানরা বলবে– আরে! এরাই না কি তারা! যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করতো যে আমরা তোমাদের সাথেই আছি; এদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হয়ে গেল, ফলে তারা অকৃতকার্য রইলো।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শত্রু ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন– তারা কখনও তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। কেননা, তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে। হ্যাঁ, তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু বটে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন করেছিলেন এবং এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উৎবা বলেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা এ থেকে বেঁচে থাকো যে, তোমরা নিজেরা জানতেই পারবে না, অথচ আল্লাহর কাছে ইয়াহূদী ও নাসারা বলে পরিগণিত হয়ে যাবে।" বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বুঝে গেলাম যে, এ আয়াতের ভাবার্থই তার উদ্দেশ্য।

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা গোপনীয়ভাবে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ভালবাসা স্থাপন করে থাকে এবং অজুহাত পেশ করে বলে–এরা যদি মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যায় তবে না জানি আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ জন্যই তাদের সাথে মিল রাখছি। কারও মন চটিয়ে আমাদের লাভ কি? আল্লাহ্ পাক বলেন–খুব সম্ভব, আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে স্পষ্ট বিজয় দান করবেন। মক্কাও তাদের হাতে বিজিত হবে এবং শাসনকর্তা তারাই হবে। আল্লাহ তাদেরই পায়ের নীচে হুকুমত নিক্ষেপ করবেন অথবা ইয়াহূদী নাসারাদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতঃ তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করার নির্দেশ তিনি মুসলমানদেরকে প্রদান করবেন। সুতরাং আজ যেসব মুনাফিক গোপনীয়ভাবে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে এবং নেচে কুদে বেড়াচ্ছে, সেদিন এ চালাকির জন্যে তাদেরকে রক্তাশ্রু বহাতে হবে। তাদের পর্দা সেদিন খুলে যাবে। ঐ সময় মুসলমানরা তাদের এ চক্রান্তের উপর বিস্ময়বোধ করবে এবং বলবেঃ আরে! এরা কি ওরাই, যারা আমাদেরকে শপথ করে করে বলতো যে, তারা অমাদের সাথেই আছে! তারা যা কিছু করেছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেল। وَيَقُوْلُ তো হচ্ছে জমহূরের কিরআত। وَلَوْ ছাড়াও একটি কিরআত রয়েছে। মদীনাবাসীর কিরআত এটাই। ইয়াকুলু হচ্ছে মুবতাদা এবং এর অন্য কিরআত ইয়াকুলা আছে। তাহলে এটা ফাআসা এর উপর আত্ফ হবে। এটা যেন ওয়া আঁইয়াকুলা ছিল। মদীনাবাসীর মতে এই আয়াতগুলোর শানে নযূল এই যে, উহুদ যুদ্ধের পর একটি লোক বলে– "আমি এ ইয়াহূদীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি, যাতে সুযোগ আসলে আমি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি।" অপর একটি লোক বললোঃ "আমি অমুক খ্রীষ্টানের নিকট গমনাগমন করে থাকি এবং তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আমি তাকে সাহায্য করবো।" তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, লুবাবাহ ইবনে মুনযিরের ব্যাপারে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যখন নবী (সঃ) তাঁকে বানূ কুরাইযার নিকট প্রেরণ করেন তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন? তখন তিনি স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করেন অর্থাৎ তিনি ইঙ্গিতে বলেনঃ "তিনি তোমাদের সকলকে হত্যা করবেন।"

একটি বর্ণনায় আছে যে, এ আয়াতগুলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-কে বলেনঃ বহু ইয়াহূদীর সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু তাদের সবারই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দিলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বন্ধুত্বই আমার জন্যে যথেষ্ট। তখন ঐ মুনাফিক (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) বললোঃ আগা-পিছা চিন্তা করা আমার অভ্যাস। আমার দ্বারা এটা হতে পারে না। বলা যায় না কোন সময় কি হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "হে আবদুল্লাহ! তুমি উবাদা (রাঃ) হতে খুবই নিম্নস্তরে নেমে গেছ।" ঐ সময় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, বদর যুদ্ধে যখন মুশকিরদের পরাজয় ঘটে তখন কতক মুসলমান তাদের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ইয়াহূদীদেরকে বললেনঃ "তোমাদের পরিণামও এরূপই হবে। সুতরাং এর পূর্বেই তোমরা সত্য ধর্ম (ইসলাম) কবূল করে নাও।" উত্তরে তারা বললোঃ "যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কতক কুরাইশের উপর জয়লাভ করে অহংকারে মেতে ওঠো না। যদি আমাদের সাথে যুদ্ধের পালা পড়ে তবে যুদ্ধ কাকে বলে তা জেনে নেবে।" সেই সময় হযরত উবাদা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মধ্যে ঐ কথোপকথন হয় যা উপরে বর্ণিত হলো।

যখন ইয়াহূদীদের এ গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বাঁধে এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে মুসলমানরা জয়লাভ করেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে থাকেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বন্ধুদের ব্যাপারে আমার উপর অনুগ্রহ করুন। এ লোকগুলো খাযরায গোত্রের সঙ্গী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বললো। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে তখন তাঁর অঞ্চল ধরে লটকে গেল। তিনি রাগতঃ স্বরে বললেনঃ "ছেড়ে দাও।" সে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! না, আমি ছাড়বো না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাদের দল খুবই বড় এবং আজ পর্যন্ত তারা আমার পক্ষ অবলম্বন করে আসছে। আর একদিনেই তারা ধ্বংসের ঘাটে অবতরণ করছে! আমার তো খুব ভয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে হয় তো আমাদেরকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।" অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যাও, ঐ সব কিছু তোমারই জন্যে অবধারিত।" অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন বানূ কাইনুকার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করান, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। কিন্তু হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) তাদের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষে সুপারিশ

করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন। তখন 'হুমুল গালেবুনা' পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দেখতে যান এবং বলেনঃ "আমি তো তোমাকে বারবার ঐ ইয়াহূদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছিলাম।" তখন সে বললোঃ "সা'দ ইবনে যারারা' (রাঃ) তো তাদের সাথে শত্রুতা করতেন, তথাপি তিনি তো মারা গেছেন।"

٥٤- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۡ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৫৪। হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, তবে (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভাল বাসবেন, তারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, বস্তুতঃ আল্লাহ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।

٥٥- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○

৫৫। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনরা– যারা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে, এ অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে।

৫৬। আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে এবং মুমিনদের সাথে, তবে (তারা আল্লাহর দলভুক্ত হলো এবং) নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই বিজয়ী।

٥٦- وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি কেউ এ পবিত্র দ্বীন ত্যাগ করে, তবে সে ইসলামের একটুও ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তাদের পরিবর্তে এমন লোকদেরকে এ সত্য ধর্মের খিদমতে লাগিয়ে দেবেন যারা সবদিক দিয়েই এদের চেয়ে উত্তম হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ (৪ঃ ১৩৩) অন্য এক জায়গায় রয়েছে- وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ (১৪ঃ ১৯) এসব আয়াতের ভাবার্থ ওটাই যা বর্ণনা করা হলো। হককে ছেড়ে দিয়ে বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়াকে اِرْتِدَاد বলা হয়। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি কুরাইশ নেতৃবর্গের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে যেসব লোক ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিল তাদের হুকুম এ আয়াতে রয়েছে। তাদের পরিবর্তে যে কওমকে আনয়নের ওয়াদা করা হচ্ছে, তার হচ্ছে আহ্লে কাদেসিয়া বা কওমে সাবা অথবা আহ্লে ইয়ামান, যারা কিন্দাহ ও সুক্ গোত্রের লোক। একটি খুবই গারীব মারফূ' হাদীসেও শেষোক্ত কথাটি বর্ণিত আছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ "তারা এ লোকটির কওমের লোক।"

ঐ পূর্ণ ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা তাদের বন্ধুদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি) খুবই কোমল ও নম্র হবে, কিন্তু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ "তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত কোমল ও দয়ালু।" (৪৯ঃ ২৯) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি ضَحُوْك ও قَتَّال ছিলেন। অর্থাৎ তিনি বন্ধুদের সামনে ছিলেন

হাসিমুখ ও প্রফুল্ল চেহারা বিশিষ্ট, আর শত্রুদের সামনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সংগ্রামী বীর পুরুষ। মুসলমানরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, ভীরুতা প্রকাশ করে না এবং বিলাসপ্রিয় হয় না। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করতে গিয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ভাল কাজের হুকুম করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি কাজে তারা সদা নিমগ্ন থাকে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ "আমার বন্ধু (হযরত মুহাম্মাদ সঃ) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে উঠাবসা করা। (২) (পার্থিব বিষয়ে) নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে নযর না দেয়া। (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখা যদিও ঐ আত্মীয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। (৪) কারও কাছে কিছু না চাওয়া। (৫) তিক্ত হলেও সত্য কথা বলা। (৬) আল্লাহর ব্যাপার (ধর্মীয় কাজে) কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করা। (৭) অধিকাংশ সময় لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ- এ কালেমাটি পাঠ করা, কেননা এটা আরশের কোষাগার।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ "আমি পাঁচবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেছি এবং তিনি আমাকে সাতটি কাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে বলেছেন। আর আমি সাতবার নিজের উপর আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেছি যে, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে মোটেই গ্রাহ্য করবো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার আমাকে ডেকে বলেনঃ "জান্নাতের বিনিময়ে তুমি আমার হাতে দীক্ষা গ্রহণ করবে কি?" আমি তা স্বীকার করে আমার হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম। তখন তিনি শর্ত দিলেনঃ "তুমি কারও কাছে কিছুই চাইবে না।" আমি বললামঃ বেশ, ঠিক আছে। তিনি বললেনঃ "যদি চাবুকও হয়, অর্থাৎ ওটাও যদি পড়ে যায় তবে স্বয়ং সওয়ারী থেকে নেমে তা উঠিয়ে নেবে।"

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লোকের ভয়ে তোমাদের কেউ যেন সত্য ও ন্যায্য কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। জেনে রেখো যে, না কেউ মৃত্যুকে এগিয়ে আনতে পারে, না কেউ রিয্‌ককে দূর করতে পারে।" ইমাম আহমাদ (রঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখার পর নিজেকে দুর্বল মনে করে নীরব থেকো

না, নতুবা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। সেই সময় মানুষ উত্তর দিতে গিয়ে বলবেঃ আমি মানুষের ভয়ে নীরব ছিলাম। তখন মহান আল্লাহ বলবেনঃ "আমি এরই বেশী হকদার ছিলাম যে, তুমি আমাকেই ভয় করতে।" এটাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাকে এ প্রশ্নও করবেন ঃ 'তুমি শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখে বাধা দাওনি কেন?' অতঃপর আল্লাহ পাক নিজেই এর উত্তর চাইবেন। তখন সে বলবেঃ "হে আমার প্রভু! আমি আপনার উপর ভরসা করেছিলাম এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম।" (সুনানে ইবনে মাজাহ) অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে–"মুমিনের জন্যে এটা উচিত নয় যে, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিভাবে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে? তিনি উত্তরে বললেনঃ "ঐ বিপদ সে নিজের উপর উঠিয়ে নেবে যা বহন করার শক্তি তার নেই।"

ইরশাদ হচ্ছে–এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের এ গুণাবলী আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। এর তাওফীক তাঁরই পক্ষ থেকে এসে থাকে। তাঁর অনুগ্রহ খুবই প্রশস্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী। এ বড় নিয়ামতের হকদার কে তা তিনিই খুব ভাল জানেন।

ঘোষিত হচ্ছে– তোমাদের বন্ধু কাফেররা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহর সাথে, তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে এবং মুমিনদের সাথে। মুমিন তো তারাই যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে যে, তারা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে যা ইসলামের একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং যাকাত প্রদান করে যা আল্লাহর দুর্বল ও মিসকীন বান্দাদের হক। শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কতক লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, ওটা يُؤْتُـــوْنَ الزَّكٰـوةَ (২ঃ ৩) থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ তারা রুকুর অবস্থায় যাকাত প্রদান করে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা। কেননা, যদি এটা মেনে নেয়া হয় তবে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, রুকুর অবস্থায় যাকাত দেয়া উত্তম। অথচ কোন আলেমই একথা বলেন না। সন্দেহ পোষণকারীরা এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত আলী (রাঃ) নামাযে রুকুর অবস্থায় ছিলেন, এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে যায়। তখন তিনি ঐ অবস্থাতেই তাঁর আংটিটি খুলে তাকে দিয়ে দেন। হযরত সুদ্দী (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি সমস্ত মুসলমানের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। হযরত উৎবার উক্তি অনুযায়ী وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা সমস্ত মুসলমান ও হযরত আলী (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। একটি মারফূ' হাদীসেও আংটির ঘটনাটি রয়েছে এবং কোন কোন তাফসীরকারকও এ তাফসীর

করেছেন। সনদ কিন্তু একটিরও সঠিক নয়। একটিরও বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, ঘটনাটি মোটেই সঠিক নয়। সঠিক ওটাই যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এ আয়াতগুলো হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় ইয়াহূদীদের বন্ধুত্বকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণেই আয়াতগুলোর শেষে ঘোষণা করা হয়েছে–যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে আল্লাহর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীই জয়যুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ .... هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন- আমি ও আমার রাসূলগণই জয়যুক্ত থাকবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তাদেরকে তুমি এরূপ পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন হয়, এরা তো ওরাই যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করেছেন এবং স্বীয় রূহ জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করবেন যেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে, তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীই সফলকাম হবে।" (৫৮ঃ ২১-২২) অতএব, যে কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তাকে দুনিয়াতেও সাহায্য করা হবে এবং পরকালেও সে সফলকাম হবে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন।

٥٧- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৫৭। হে মুমিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, যাদের অবস্থা এই যে, তারা তোমাদের ধর্মকে হাসি ও তামাশার বস্তু করে রেখেছে–তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

৫৮। আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে (আযান দ্বারা) আহ্বান কর, তখন তারা ওর সাথে হাসি ও তামাশা করে, এর কারণ এই যে, তারা এরূপ লোক, যারা মোটেই জ্ঞান রাখে না।

৫৮- وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মনে অমুসলিমদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়ে বলছেন– তোমরা কি এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, যারা তোমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে হাসি তামাশা করছে? مِن শব্দটি بَيَان جِنْس -এর জন্যে এসেছে, যেমন اَلْاَوْثَان–এর মধ্যে। কেউ কেউ অল কুফ্ফারে পড়েছেন এবং عَطْف করেছেন। আবার কেউ কেউ অল কুফ্ফারা পড়েছেন এবং لَاتَتَّخِذُوْا–এর مَعْمُوْل বানিয়েছেন। তখন تَقْدِير عِبَارَت হবে অলাল কুফ্ফারা আউলিয়ায়া এরূপ। এখানে كُفَّار দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে ওয়া মিনাল্লাযিনা আশরাকু এরূপ রয়েছে।

ঘোষিত হচ্ছে–যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আল্লাহকে ভয় কর। এরা তো তোমাদের দ্বীনের সাথে, আল্লাহর সাথে এবং শরীয়তের সাথে শত্রুতা করছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ-

অর্থাৎ "মুসলমানদের উচিত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা মুসলমানদের (বন্ধুত্ব) অতিক্রম করে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখার কোন হিসেবে নয়, অবশ্য এমন অবস্থায় (বাহ্যিক বন্ধুত্বের অনুমতি আছে) যখন তোমরা তাদের থেকে কোন প্রকার আংশকা কর, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন, আর আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে।" (৩ঃ ২৮) অনুরূপভাবে আহলে কিতাবের এ কাফিররাও এবং মুশরিকরাও এ সময়েও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে যখন তোমরা নামাযের জন্যে আযান দাও। অথচ এটাই আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত। কিন্তু

এ নির্বোধরা এটুকুও জানে না। তাই তারা শয়তানের অনুসারী। আর শয়তানের অবস্থা এই যে, আযান শোনামাত্রই সে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু বের করতঃ লেজ গুটিয়ে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়ে থেমে যায় যেখানে আযানের শব্দ পৌঁছে না। তারপর আবার আসে এবং তাকবীর শুনে পালিয়ে যায়। তাকবীর দেয়া শেষ হলেই সে পুনরায় এসে পড়ে এবং নামাযীকে বিভ্রান্ত করার কাজে লেগে যায়। তাকে সে এদিক ওদিকের বিস্মরণ হয়ে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনকি কত রাকআত নামায হয়েছে তাও তার আর স্মরণ থাকে না। যখন এরূপ অবস্থা ঘটবে দু'টো সহূ সিজদা করতে হবে। (সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম) ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে আযানের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করেন।

মদীনায় একজন খ্রীষ্টান ছিল। আযানে যখন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" শুনতো তখন সে বলতোঃ "এই মিথ্যাবাদী জ্বলে পুড়ে যাক।" একদা রাত্রে তার চাকরাণী ঘরে আগুন নিয়ে আসে। কোন পতঙ্গ উড়ে আসে, ফলে তার ঘরে আগুন লেগে যায় এবং ঐ ব্যক্তি ও তার ঘরবাড়ী পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়।

মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বিলাল (রাঃ)-কে কা'বা ঘরে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। নিকটেই আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব, আত্তাব ইবনে উসায়েদ এবং হারিস ইবনে হিশাম বসে ছিল। আত্তাব তো আযান শুনে বলেই ফেললোঃ "আমার পিতার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে যে, তিনি এ ক্রোধ উদ্রেককারী শব্দ শোনার পূর্বেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন।" হারিস বললোঃ "আমি যদি একে সত্য জানতাম তবে তো মেনেই নিতাম।" আবূ সুফিয়ান বললোঃ "ভয়ে তো আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হচ্ছে না, না জানি এ কংকরগুলো তাঁকে এ খবর জানিয়ে দেয়।" তাদের কথাগুলো বলা শেষ হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের কাছে এসে পড়েন এবং তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা এই সময় এই এই কথা বলেছো।" তাঁর এ কথা শোনামাত্রই আত্তাব এবং হারিস তো বলেই ফেলেঃ "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল! এখানে তো চতুর্থ কেউ ছিল না। তাহলে আমরা ধারণা করতে পারতাম যে, সেই হয়তো গিয়ে আপনকে এসব কথা বলে দিয়েছে।" (সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাজরীয্ যখন সিরিয়ার সফরে বের হন তখন যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আবূ মাহযুরাকে বলেন, যাঁর ক্রোড়ে তিনি পিতৃহীন হিসেবে লালিত পালিত হয়েছিলেন—"তথাকার লোকেরা অবশ্যই আমাকে আপনার

আযানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সুতরাং আপনি আপনার আযান সম্পর্কীয় ঘটনাগুলো আমার নিকট বর্ণনা করুর।" তখন আবূ মাহ্যুরা (রাঃ) বলেনঃ তাহলে শুন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হুনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। সেই সময় আমরা পথে এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। নামাযের সময় হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুআয্যিন আযান দেন। আমরা তখন আযানের সাথে সাথে হাসি তামাসা শুরু করি (অর্থাৎ বিদ্রূপ করে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে থাকি)। কেমন করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কর্ণকুহরে আমাদের শব্দগুলো পৌঁছে যায়। তখন একজন সৈনিক এসে আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের মধ্যে কার শব্দ সবচেয়ে উচ্চ ছিল?" সবাই তখন আমার দিকে ইশারা করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সবকে ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আমাকেই ধরে রাখেন এবং বলেনঃ "দাঁড়িয়ে আযান বল।" আল্লাহর কসম! সেই সময় আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আদেশ মান্য করা অপেক্ষা অপ্রীতিকর বিষয় আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু কি করি? আমি নিরুপায় ছিলাম। সুতরাং দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি স্বয়ং আমাকে আযান শিখাতে থাকেন এবং আমি তা বলতে থাকি। (অতঃপর তিনি পূর্ণভাবে আযানের বাক্যগুলো বলেন) আযান দেয়া শেষ হলে তিনি আমাকে একটি থলে দেন, যার মধ্যে কিছু চাঁদি বা রৌপ্য ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর পবিত্র হাতখানা আমার মাথায় রাখেন এবং তা পিঠ পর্যন্ত নিয়ে যান। তারপর তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তোমার ভেতরে ও তোমার উপরে বরকত দান করুন।" আল্লাহর কসম! তখন তো আমার অন্তর হতে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর শত্রুতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং ওর স্থলে অন্তরে ঐরূপই মুহব্বত সৃষ্টি হয়। আমি অনুরোধ জানিয়ে বলিঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। আমাকে মক্কার মুআয্যিন বানিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ "আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করলাম।" আমি মক্কা চলে গেলাম এবং তথাকার শাসনকর্তা হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নির্দেশক্রমে মুআয্যিন পদে নিযুক্ত হয়ে গেলাম। হযরত আবূ মাহ্যুরা (রাঃ)-এর নাম ছিল সুমরা ইবনে মুগীরা ইবনে লাওযান। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চারজন মুআয্যিনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি বহুদিন পর্যন্ত মক্কাবাসীদের মুআয্যিন ছিলেন।[১]

১. ইমাম আহমাদ (রঃ) এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এবং সুনানে আরবাআর সংকলকগণ এটা তাখরীজ করেছেন।

৫৯ - قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৫৯। তুমি বলে দাও-হে আহ্লে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দূষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ঈমান (এর গণ্ডী) হতে বহির্ভূত।

৬০ - قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○

৬০। তুমি বলে দাও-আমি কি তোমাদেরকে এরূপ পন্থা বলে দেব, যা প্রতিদান প্রাপ্তি হিসাবে ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ বলে জান) আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা ঐসব লোকের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন ও যাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন এবং তারা শয়তানের পূজা করেছে; এরূপ লোক (যাদের কথা বর্ণিত হলো, পরকালে) বাসস্থান হিসেবে ও (যা তারা প্রতিদান হিসেবে) পাবে খুবই মন্দ এবং (ইহকালেও) সরল পথ হতে বহুদূরে।

٦١- وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○

৬১। আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে-আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফ্‌রই নিয়ে এসেছিল এবং তারা কুফরই নিয়ে চলে গেছে; এবং আল্লাহ তো খুব ভাল জানেন যা তারা গোপন রাখে।

٦٢- وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬২। আর তুমি তাদের মধ্যে এমন লোক দেখেছো, যারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পাপ, যুলুম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে, বাস্তবিকই তাদের এ কাজ মন্দ।

٦٣- لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

৬৩। তাদেরকে আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ পাপের কথা হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছে না? বাস্তবিকই তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়।

নির্দেশ হচ্ছে-হে মুমিনগণ! যেসব আহ্‌লে কিতাব তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও উপহাস করছে তাদেরকে বল-তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছো তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং এটা কোন ঈর্ষার কারণ নয় এবং কোন নিন্দারও কারণ নয়। এটা اِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ হয়েছে। অন্য আয়াতের আছে- وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মাল দিয়ে ধনী করে দিয়েছেন।" (৯ঃ ৭৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে-'ইবনে জামীল ওরই বদলা নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন।'

তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক, অর্থাৎ, সোজা-সরল পথ থেকে তোমরা সরে পড়েছো।[১] তোমরা আমাদের সম্পর্কে যে ধারণা করছো, তাহলে এসো, তোমাদেরকে বলি যে, আল্লাহর নিকট প্রতিফল প্রাপক হিসেবে কে অধিক নিকৃষ্ট! আর এরূপ তোমরাই বটে। কেননা, এরূপ অভ্যাস তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, যাদের উপর তিনি এতো রাগান্বিত হয়েছেন যে, এরপর আর সন্তুষ্ট হওয়ার নয় এবং যাদের কোন কোন দলের আকার বিকৃত করতঃ তাদেরকে তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন। তারা তো তোমরাই। সূরায়ে বাকারায় এর পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- এখন যেসব বানর ও শূকর রয়েছে এগুলো কি ওরাই? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ "যে কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাদের বংশধর কেউ থাকে না। (অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন)। তাদের পূর্বেও শূকর ও বানর ছিল।" এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতেও রয়েছে। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, জিনদের একটি কওমকে সর্প বানিয়ে দেয়া হয়েছিল, যেমন (ইয়াহূদীদের একটি কওমকে) বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব। তাদের মধ্য হতেই কোন কোন দলকে গায়রুল্লাহর পূজারী বানিয়ে দেয়া হয়। এক কিরআতে إِضَافَتُ -এর সাথে তাগুতে যেরও রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিমার গোলাম বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। হযরত বুরাইদাহ আসলামী (রাঃ) এটাকে আবেদুত্ তাগুতে পড়তেন। আবূ জাফর কারী হতে আওবেদাত্ ত্বাগুতু -এ পঠনও বর্ণিত আছে। এতে অর্থের দূরত্ব এসে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দূরত্বও নয়। ভাবার্থ এই যে, তোমরা ওরাই

---

১. লুবাব গ্রন্থে রয়েছে যে, একদল ইয়াহূদী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে-আপনি কোন কোন রাসূলের উপর ঈমান এনেছেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর, ইসমাঈল (আঃ)-এর উপর, ইয়াকূব (আঃ)-এর উপর, তাঁর সন্তানদের উপর এবং যা দেয়া হয়েছিল, মূসা (আঃ)-কে ও ঈসা (আঃ)-কে এবং যা দেয়া হয়েছিল অন্যান্য নবীদেরকে তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে।" যখন তিনি ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করলেন তখন তাঁরা নবুওয়াতকে অস্বীকার করলো এবং বললো ঃ 'আমরা ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনি না এবং যে তাঁর উপর ঈমান এনেছে তাঁর উপরও না।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

যাদের মধ্যে তাগুতের পূজা করা হয়েছে। মোটকথা, আহলে কিতাবকে দোষারোপ করে বলা হচ্ছে– তোমরা তো আমাদেরকে দোষারূপ করছো, অথচ আমরা একত্ববাদী। আমরা শুধু এক আল্লাহকে মেনে থাকি। আর তোমরা তো হচ্ছ ওরাই যে, তোমাদের মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ কারণেই শেষে বলা হয়েছে–এ লোকেরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ের। তারা সীরাতে মুসতাকীম থেকে বহুদূরে। তারা ভুল ও বিভ্রান্তির পথে রয়েছে। এখানে اِسْم تَفْضِيْل ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এতো অধিক পথভ্রষ্ট আর কেউই হতে পারে না। যেমনঃ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا (২৫ঃ ২৪)-এ আয়াতে রয়েছে।

অতঃপর মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে জানিয়ে দিয়ে বলেছেনঃ বাহ্যিকভাবে তো মুমিনদের সামনে তারা ঈমান প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু তাদের ভেতর কুফরীতে পরিপূর্ণ। তারা তোমার কাছে কুফরীর অবস্থাতেই আগমন করে এবং যখন ফিরে যায় তখন কুফরীর অবস্থাতেই ফিরে যায়। তোমার কথা ও উপদেশ তাদের উপর মোটেই ক্রিয়াশীল হয় না। ভেতরের এ কলুষতা দ্বারা কি উপকার তারা লাভ করবে? যাঁর কাছে তাদের কাজ, তিনি আলেমুল গায়েব। অদৃশ্যের সমস্ত খবরই তো তিনি জানেন। তাদের অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদেরকে এর পূর্ণ ফল ভোগ করতে হবে।

হে নবী (সঃ)! তুমি তো স্বচক্ষে দেখছো যে, তারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে কিভাবে পাপ, যুলুম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে! তাদের কৃতকর্মগুলো অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তাদের অলী উল্লাহরা অর্থাৎ আবেদ ও আলেমরা তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখছে না কেন? প্রকৃতপক্ষে ঐসব আলেম ও পীরের কাজগুলোও খারাপ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলেম ও ফকীর দরবেশদের ধমকের জন্যে এর চেয়ে বেশী কঠিন আয়াত কুরআন কারীমে আর একটিও নেই। হযরত যহ্হাক (রঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। একদা হযরত আলী (রাঃ) এক খুৎবায় আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেনঃ "হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকতো এবং তাদের আলেমরা ও আল্লাহওয়ালারা সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকতো। যখন এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হলো তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। সুতরাং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই তোমাদের উপর

অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। বিশ্বাস রেখো যে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না তোমাদের রিয্ক বা খাদ্য কমাবে, না তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে। সুনানে আবি দাঊদে হযরত জাবীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি–"যে কওমের মধ্যে কোন লোক অবাধ্যতার কাজ করে এবং ঐ কওমের লোকগুলো বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তাহলে আল্লাহ সবারই উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন।" সুনানে ইবনে মাজাতেও এ বর্ণনাটি রয়েছে।

৬৪। আর ইয়াহূদীরা বললো– আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে; তাদেরই হাত বন্ধ এবং তাদের এ উক্তির দরুন তারা রহমত হতে বিদূরিত হয়েছে, বরং তাঁর (আল্লাহর) তো উভয় হাত উন্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন; আর যে বিষয় তোমার নিকট তোমার প্রভুর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা নিক্ষেপ করেছি কিয়ামত পর্যন্ত; যখনই (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন; এবং তারা ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়, আর আল্লাহ অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালবাসেন না।

٦٤- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوطَتٰنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۤءُ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

٦٥-وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

৬৫। আর এ আহলে কিতাবগণ (ইয়াহূদী ও নাসারা) যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে শান্তির উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম।

٦٦-وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۤءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○ ع

৬৬। আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের প্রভুর পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর যথারীতি আমলকারী হতো, তবে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করতো, তাদের একদল তো সরল পথের পথিক; আর তাদের অধিকাংশই এরূপ যে তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।

অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের একটি জঘন্য উক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মহান আল্লাহকে কৃপণ বলতো। তারাই আল্লাহ পাককে দরিদ্রও বলতো। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সেই অপবিত্র উক্তির বহু উর্ধ্বে। সুতরাং "আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে আছে"– এটার ভাবার্থ তাদের নিকট এই ছিল না যে, তাঁর হাত বন্ধন মুক্ত রয়েছে। বরং এর দ্বারা তারা তাঁর কৃপণতা বুঝাতে চেয়েছিল। এ বাকরীতিই কুরআন কারীমের অন্য জায়গাতেও রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا۔

অর্থাৎ "স্বীয় হাতকে নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না এবং সীমা থেকে বেশীও বিস্তার করো না, নচেৎ লজ্জিত হয়ে বসে পড়তে হবে।" (১৭ঃ২৯) সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ কৃপণতা থেকে এবং অযথা ও অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকতে বললেন। অতএব, ইয়াহূদীদেরও "হাত বন্ধন মুক্ত রয়েছে"-এ কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ফাখাস নামক ইয়াহূদী এ কথা বলেছিল। ঐ অভিশপ্ত ইয়াহূদীদেরই "আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী"-এ উক্তিও ছিল। ফলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাকে প্রহার করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহূদীদের শাস ইবনে কায়েস নামক একটি লোক বলেছিলঃ "নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কৃপণ, তিনি খরচ বা দান করেন না।"[১] তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, কৃপণ, লাঞ্ছিত এবং কাপুরুষ হচ্ছে তারা নিজেরাই। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-"তারা যদি বাদশাহ হয়ে যায় তবে কাউকেও কিছুই দেবে না।" বরং তারা তো অন্যদের নিয়ামত দেখে জ্বলে পুড়ে মরে। তারা লাঞ্ছিত লোক, বরং আল্লাহর হাত খোলা রয়েছে, তিনি অনেক কিছু খরচ করতে রয়েছেন, তাঁর ফসলও অনুগ্রহ প্রশস্ত, তাঁর দান সাধারণ। সব জিনিসের ভাণ্ডার তাঁরই হাতে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব দিনরাত সব জায়গায় তাঁরই মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَاٰتٰـكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ـ

অর্থাৎ "তোমরা যা চেয়েছো তাই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না, নিশ্চয়ই মানুষ অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।" (১৪ঃ ৩৪) মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত পরিপূর্ণ। রাত দিনের খরচ তাঁর ধনভাণ্ডারকে কমায় না। শুরু হতে আজ পর্যন্ত যত কিছু তিনি স্বীয় মাখলুককে দান করেছেন তা তাঁর ধনভাণ্ডারকে একটুও হ্রাস করেনি। প্রথমে তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর অপর হাতে 'দান' অথবা অধিকার রয়েছে। ওটাই উঁচু করে এবং নীচু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তোমরা আমার পথে খরচ কর, আমিও তোমাদেরকে দান করবো।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি রয়েছে।

---

১. তিবরানী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন যে, এ উক্তিকারী ছিল শাস ইবনে কায়েস। আর আবুশ শায়েখ তাখরীজ করেছেন যে, এ উক্তিকারীর নাম হচ্ছে ফানহাস।

ঘোষণা করা হচ্ছে–হে নবী (সঃ)! তোমার কাছে আল্লাহর নিয়ামত যত বৃদ্ধি পাবে, এ শয়তানদের কুফর ও হিংসা-বিদ্বেষ ততো বেড়ে যাবে। অনুরূপভাবে যেমন মুমিনদের ঈমান, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে তেমনই এসব ইয়াহূদী ও মুশরিকদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে–

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ -

অর্থাৎ "মুমিনদের জন্যে এটা তো হিদায়াত ও প্রতিষেধক এবং বেঈমানরা এর থেকে অন্ধ ও বধির, এদেরই দূর দূরান্ত থেকে ডাক দেয়া হচ্ছে।"(৪১ঃ ৪৪) আর একটি আয়াতে আছে–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا -

অর্থাৎ "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা মুমিনদের জন্যে প্রতিষেধক ও করুণা এবং এর দ্বারা অত্যাচারীদের ক্ষতিই বেড়ে যায়।" (১৭ঃ ৮২)

ইরশাদ হচ্ছে– তাদের পরস্পরের অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরীভাব কিয়ামত পর্যন্ত মিটবে না। তারা একে অপরের রক্ত পিপাসু। হক ও সত্যের উপর তাদের একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তারা নিজেদেরই ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তারা মাঝে মাঝে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রতিবারেই তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তাদের চক্রান্ত তাদেরই উপর প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহর শত্রু। কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

মহান আল্লাহ বলছেন–যদি এ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, আর হারাম ও হালাল মেনে চলতো, তবে আমি তাদের কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম ও তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবিষ্ট করতাম এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করতাম।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনকে মেনে নিতো, কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে মেনে নিলে কুরআনকে মেনে নেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে; কারণ ঐ দু'টি কিতাবের সঠিক শিক্ষা এটাই যে, কুরআন

সত্য। কুরআনের ও শেষ নবী (সঃ)-এর সত্যতার স্বীকারোক্তি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে রয়েছে, সুতরাং যদি তারা এ কিতাবাগুলোকে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মেনে নিতো, তবে ওগুলো তাদেরকে ইসলামের পথ দেখাতো, যে ইসলামের প্রচার নবী (সঃ) করেছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়ার সুখ শান্তিও প্রদান করতেন। আকাশ থেকে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ফলে যমীন হতে সফল উৎপাদিত হতো। তখন উপর ও নীচের অর্থাৎ আসমান ও যমীনের বরকত তাদেরকে দান করা হতো। যেমন তিনি বলেছেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ "গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি অবশ্যই তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকত নাযিল করতাম" (৭ঃ৯৬) আর এক জায়গায় আছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

অর্থাৎ "মানুষের অসৎ কর্মের কারণে স্থলে ও পানিতে অশান্তি ও বিশৃংখলা প্রকাশিত হয়েছে।" (৩০ঃ ৪১) অর্থ এটাও হতে পারে, বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে আমি তাদেরকে প্রচুর ও বরকতপূর্ণ রিয্ক বা খাদ্য দান করতাম। কেউ কেউ এ বাক্যের ভাবার্থ এও বর্ণনা করেছেন যে, ঐ লোকগুলো এরূপ করলে ভাল হয়ে যেতো। কিন্তু এ উক্তিটি পূর্ববর্তী গুরুজনদের উক্তির বিপরীত। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ জায়গায় একটি হাদীস এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'এটা খুবই নিকটে যে, ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে।' একথা শুনে হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রাঃ) আরয করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরূপে হতে পারে যে, ইলম উঠে যাবে? অথচ আমরা নিজেরা কুরআন পড়েছি এবং আমাদের সন্তানদেরকে তা শিখিয়েছি। তিনি তখন বলেনঃ "আফসোস! আমি তো তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করতাম! তুমি কি দেখছো না যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদের হাতেও তো তাওরাত ও ইঞ্জীল রয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা তাদের কি উপকার হয়েছে? তারা তো আল্লাহর আহকাম পরিত্যাগ করেছে।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন একটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'এটা ইলম উঠে যাওয়ার সময় ঘটবে।' তখন হযরত ইবনে লাবীদ (রাঃ) বলেনঃ ইলম কিরূপে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়েছি এবং আমাদের

সন্তানদেরকে তা শিখিয়েছি। তারা আবার তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এটা চালু থাকবে। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছিলেন তা উপরে বর্ণিত হলো।

ইরশাদ হচ্ছে—তাদের মধ্যে একটি দল সরল-সঠিক পথের পথিকও রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কার্যকলাপ অতি জঘন্য। যেমন এক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ -

অর্থাৎ "মূসার কওমের মধ্যে একটি দল হকের হিদায়াত গ্রহণকারী এবং ওর মাধ্যমই আদল ও ইনসাফকারীও ছিল।" (৭ঃ ১৫৯) হযরত ঈসা (আঃ)-এর কওমের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ

অর্থাৎ "তাদের মধ্যকার ঈমানদার লোকদেরকে আমি তাদের পুণ্যের পুরস্কার দান করেছিলাম।" (৫৭ঃ ২৭) এটা মনে রাখার বিষয় যে, আহলে কিতাবের জন্যে মধ্যম শ্রেণীকে উত্তম শ্রেণী বলা হলো। আর উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে এ মর্যাদা হচ্ছে দ্বিতীয় একটি মর্যাদা, যার উপর তৃতীয় একটি মর্যাদার স্তরও রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ -

অর্থাৎ "অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী আমার কতক বান্দাকে বানিয়েছি, যাদের মধ্যে কতিপয় বান্দা তো নিজেদের নফ্সের উপর যুলুমকারী, কতিপয় বান্দা মধ্যমপন্থী এবং কতক বান্দা আল্লাহর হুকুমে পুণ্য অর্জনে অগ্রগামী। এটাই বড় অনুগ্রহ।" (৩৫ঃ ৩২) সুতরাং এ উম্মতের তিন প্রকারের লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা সাহাবীদের সামনে বলেনঃ "মূসা (আঃ)-এর উম্মতের একাত্তরটি দল হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হবে জান্নাতী, বাকী সত্তরটি দল হবে জাহান্নামী। ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের বাহাত্তরটি দল হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হবে জান্নাতী এবং বাকী একাত্তরটি হবে জাহান্নামী। আমার উম্মত এ দু'জনের চেয়ে বেড়ে যাবে। তাদেরও একটি দল জান্নাতী হবে এবং বাকী বাহাত্তরটি দল জাহান্নামী হবে।" জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ 'ঐ দলটি কারা?'

তিনি উত্তরে বললেনঃ 'জামাআত, জামাআত।' ইয়াকূব ইবনে ইয়াযীদ বলেন যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন কুরআন কারীমের وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا এবং وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ (৭ঃ ১৮১) -এ আয়াতগুলোও পাঠ করতেন এবং বলতেন যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ শব্দে এবং এ সনদে হাদীসটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল। সত্তরের উপর দলগুলোর হাদীসটি বহু সনদে বর্ণিত আছে, যা আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করেছি।

৬৭। হে রাসূল (সঃ)! যা কিছু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছিয়ে দাও; আর যদি এরূপ না কর, (যেন) তুমি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌঁছাওনি; আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে সংরক্ষিত রাখবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

٦٧- يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

মহান আল্লাহ এখানে স্বীয় নবী (সঃ)-কে 'রাসূল' -এ প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলছেন—তুমি মানুষের কাছে আমার সমস্ত আহকাম পৌঁছিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ (সঃ) করলেনও তাই। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করেছেন, সে মিথ্যা বলেছে।' এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে আছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ যদি মুহাম্মাদ (সঃ) কুরআনের কোন অংশ গোপন করতেন তবে তিনি অবশ্যই وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ (৩৩ঃ ৩৭)-এ আয়াতটিই গোপন করতেন। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেঃ "লোকদের মধ্যে এ আলোচনা চলছে যে, আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন কতগুলো

কথা বলেছেন যা তিনি অন্য লোকদের নিকট প্রকাশ করেননি?" তখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এরূপ কোন বিশিষ্ট জিনিসের উত্তরাধিকারী করেননি।" এ হাদীসের ইসনাদ খুবই উত্তম। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, একটি লোক হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনাদের কাছে কি কুরআন ছাড়া অন্য অহীও আছে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "যে আল্লাহ শস্য উৎপন্ন করেছেন এবং জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তাঁর শপথ! না, শুধু এ বুদ্ধি ও বিবেক, যা তিনি কোন লোককে কুরআনের ব্যাপারে দিয়েছেন এবং যা কিছু এই সহীফায় রয়েছে (এছাড়া আর কিছুই নেই)।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করেনঃ 'সহীফায় কি আছে?' উত্তরে তিনি বলেনঃ "এর মধ্যে দিয়্যাতের মাসআলা ও বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার আহকাম রয়েছে এবং এ বিধান রয়েছে যে, কাফিরকে হত্যা করার কারণে কিসাস হিসেবে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।"

সহীহ বুখারীতে হযরত যুহরী (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে রিসালাত, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মেনে নেয়া।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত উম্মতই এর সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমানত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং যেটা সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল তাতে সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ হাজ্বাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্বের খুৎবায় সমস্ত সাহাবী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহর বাণী সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূল্লাহ (সঃ) তাঁর এ ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "তোমরা আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তাহলে বল তো তোমরা কি উত্তর দেবে?" সবাই সমস্বরে বললেনঃ "আমরা সাক্ষ্য দান করছি যে, আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের হক পুরোপুরি আদায় করেছেন এবং পূর্ণভাবে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।" তিনি তখন স্বীয় হস্ত ও মস্তক আকাশ পানে উত্তোলন করতঃ জনগণের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি?" মুসনাদে আহমাদে এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ ভাষণে জনগণকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'হে লোক সকল! এটা কোন্ দিন?' সবাই উত্তরে বললেনঃ 'মর্যাদা সম্পন্ন দিন।' তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ 'এটা কোন্ শহর?' সবাই জবাবে বললেনঃ 'সম্মানিত শহর।' পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ 'এটা

কোন্ মাস?’ সবাই বললেনঃ ‘মর্যাদা সম্পন্ন মাস।’ তখন তিনি বললেনঃ “সুতরাং তোমাদের মাল, তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ইজ্জত ও আবরুর একে অপরের কাছে এ রকমই মর্যাদা রয়েছে যেমন এ দিনের, এ শহরের এবং এ মাসের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।” বারবার তিনি এর পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর তিনি স্বীয় অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেনঃ ‘হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি?’ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! এটা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অসিয়ত ছিল।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “দেখো! তোমাদের প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এটা পৌঁছে দেয়। দেখো! তোমরা আমার পরে যেন কাফের হয়ে যেয়ো না এবং একে অপরকে হত্যা করো না।” ইমাম বুখারীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে–হে নবী (সঃ)! তুমি যদি আমার হুকুম আমার বান্দা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে না দাও তবে তুমি রিসালাতের হক আদায় করলে না। তারপর এর যা শাস্তি তা তো স্পষ্ট। যদি তুমি একটি আয়াতও গোপন কর তবে তুমি রিসালাত ভেঙ্গে দিলে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন “যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দাও”-এ হুকুম নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি তো একা, আর এই সব কিছু মিলে আমার উপর ভারী হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমি কিভাবে এটা পালন করতে পারি!” তখন এ দ্বিতীয় বাক্যটি অবতীর্ণ হয়ঃ ‘তুমি যদি এটা পালন না কর তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।’

তারপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাকে লোকদের থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী আমি। তুমি নির্ভয় থাক, কেউই তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের প্রহরী রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগেই ছিলেন। তাঁর ঘুম হচ্ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘যদি আজ রাত্রে আমার কোন হৃদয়বান সাহাবী আমাকে পাহারা দিতো!’ তিনি একথা বলতেই আছেন, হঠাৎ আমার কানে অস্ত্রের শব্দ আসলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘কে?’ উত্তর আসলোঃ ‘আমি সা’দ ইবনে মালিক (রাঃ)।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘কেন আসলে?’ তিনি উত্তরে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি।”

এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। (সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এটা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। এ আয়াতটি নাযিল হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁবূ হতে মাথা বের করে দিয়ে প্রহরীদেরকে বললেনঃ "তোমরা চলে যাও, আমি আমার প্রভুর আশ্রয়ে এসে গেছি। সুতরাং এখন তোমাদের পাহারা দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই।" আর একটি বর্ণনায় আছে যে, অবূ তালিব সদা রাসূলুল্লাহর সাথে কোন না কোন লোক রাখতেনই। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ "চাচাজান! এখন আর আমার সাথে কোন লোক পাঠাবার প্রয়োজন নেই। আমি মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে এসে গেছি।" কিন্তু এ রিওয়ায়াতটি গারীব ও মুনকার। এটাতো মক্কার ঘটনা, আর এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে কোনই সন্দেহ নেই, মহান আল্লাহ মক্কাতেই স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে পূর্ণভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। চুতর্দিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চুল পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি। রিসালাতের প্রথম ভাগে তাঁর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ হতে থাকে। কেননা, আবূ তালিব ছিলেন কুরাইশদের এক প্রভাবশালী নেতা। আল্লাহ তাঁর অন্তরে স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছিলেন। এ ভালবাসা ছিল প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক ভালবাসা, শরীয়তগত ভালবাসা নয়। আবূ তালিবের এ ভালবাসা যদি শরীয়তগত হতো তবে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাথে তাঁকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মদীনার আনসাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি শরীয়তগত মুহব্বত পয়দা করে দেন এবং তিনি তাঁদের কাছেই চলে যান। তখন মুশরিকরা ও ইয়াহূদীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসে দ্রুত এগিয়ে আসে। কিন্তু বারবার অকৃতকার্য হওয়ার ফলে তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়। অনুরূপভাবে তাদের গোপন ষড়যন্ত্রও আল্লাহর ফযল ও করমে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক দিকে তারা তাঁর উপর যাদু করে, অপরদিকে সূরা 'নাস' ও 'ফালাক' অবতীর্ণ হয় এবং যাদুক্রিয়া নষ্ট করে দেয়া হয়। একদিকে তারা শত চেষ্টা করে ছাগীর কাঁধে বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দাওয়াত করতঃ তাঁর সামনে পেশ করে, অন্য দিকে আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে ঐ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন এবং তারা বিফল মনোরথ হয়। এ ধরনের আরও বহু ঘটনা তাঁর জীবনে পরিলক্ষিত হয়।

তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছায়াদার বৃক্ষের নীচে দুপুরে নিদ্রা গিয়েছিলেন। এরূপ ছায়াদার বৃক্ষ সাহাবীগণ অভ্যাসগতভাবে প্রতি মনযিলে খুঁজে খুঁজে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখতেন। হঠাৎ এক বেদুঈন তথায় এসে যায়। বৃক্ষের শাখায় ঝুলন্ত তাঁর তরবারীখানা নামিয়ে সে তা খাপ থেকে বের করলো এবং বললোঃ 'বলতো কে এখন তোমাকে রক্ষা করবে?' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ 'আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন।' তখনই বেদুঈনের হাত কেঁপে উঠলো এবং তরবারীখানা তার হাত থেকে পড়ে গেল। আর তার মাথাটি গাছে সজোরে আঘাত প্রাপ্ত হলো। ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানূ আনমার গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন, সে সময় তিনি যাতুর রিকা নামক খেজুরের বাগানে একটি কূপে পা লটকিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় বানূ নাজ্জার গোত্রের ওয়ারিস নামক একটি লোক বলে ওঠেঃ 'দেখ, আমি এখনই মুহাম্মাদকে হত্যা করছি।' লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ কিরূপে? সে উত্তরে বললোঃ 'আমি কোন বাহানা করে তাঁর তরবারীখানা নিয়ে নেবো। তারপর ঐ তরবারী দ্বারাই তাঁর জীবন শেষ করবো।' একথা বলে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো এবং এ কথা সে কথা বলার পর তাঁর তরবারীটা দেখতে চাইলো। তিনি তো তাকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু ওটা হাতে নেয়া মাত্রই সে এতো কাঁপতে শুরু করলো যে, শেষ পর্যন্ত তরবারী হাতে রাখতে পারলো না, তার হাত থেকে পড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "তোমার ও তোমার কুমতলবের মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হয়েছিলেন।" ঐ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হুয়াইরিস ইবনে হারিসেরও ঐরূপই একটি ঘটনা প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস এই ছিল যে, সফরে তাঁরা যেখানে বিশ্রামের জন্যে থামতেন সেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে ঘন ছায়াযুক্ত একটি বড় গাছ রেখে দিতেন। তিনি সেই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতেন। একদা তিনি এ ধরনের একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর তরবারীখানা ঐ গাছেই লটকান ছিল। এমন সময় একটি লোক এসে পড়ে এবং তরবারীখানা হাতে নিয়ে বলেঃ 'এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'আল্লাহ্ বাঁচাবেন। তুমি তরবারী রেখে দাও।'

তখন সে এতো আতংকিত হয়ে পড়ে যে, তাকে হুকুম পালন করতেই হয়। সে তরবারী তাঁর সামনে রেখে দেয়। সে সময় মাহান আল্লাহ اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ-এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

সাহাবায়ে কিরাম একটি লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ধরে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে বলেনঃ 'এ লোকটি আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।' তখন লোকটি কাঁপতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বলেনঃ 'তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইলেও আল্লাহ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন না।'

ইরশাদ হচ্ছে–তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু প্রচার করে দেয়া। হিদায়াত করার হাত আল্লাহর। তিনি কাফিরদেরকে হিদায়াত করবেন না। তুমি পৌঁছিয়ে দাও। হিসাব গ্রহণকারী হচ্ছেন আল্লাহ।

৬৮। তুমি বলে দাও– হে আহলে কিতাব! তোমরা কোন পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার পূর্ণ পাবন্দী করবে; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়, অতএব, তুমি এ কাফিরদের জন্যে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

٦٨- قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَیْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৯। এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলমান, ইয়াহূদী, সাবেঈ এবং নাসারাদের মধ্যে যে

٦٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎকার্য করে, তবে এরূপ লোকদের জন্যে শেষ দিবসে না কোন প্রকার ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানরা কোন ধর্মের উপরই নেই যে পর্যন্ত তারা নিজ নিজ কিতাবের উপর এবং আল্লাহ্ পাকের এ কিতাব অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান না আনবে। কিন্তু তাদের অবস্থাতো এই যে, যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের বিরোধিতা ও কুফর বাড়তে থাকে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি এ কাফিরদের প্রতি দুঃখ ও আফসোস করে তোমার জীবনকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।

খ্রীষ্টান ও মাজুসীদের বেদ্বীন দলকে সাবেঈ বলা হয়। আর শুধুমাত্র মাজুসীদেরকেও সাবেঈ বলা হয়। এটা মাজুসীদের মত ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যকার একটি **দল** ছিল। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তারা যবূর পাঠ করতো। তারা গায়ের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো এবং ফেরেশতাদের পূজা করতো। অহাব (রঃ) বলেন যে, সাবেঈরা আল্লাহকে চিনতো। নিজেদের শরীয়ত অনুযায়ী তারা আমল করতো। তাদের মধ্যে কুফরের উৎপত্তি হয়নি। তারা ইরাক সংলগ্ন ভূমিতে বসবাস করতো। তাদেরকে ইয়ালূসা বলা হতো। তারা নবীদেরকে মানতো। প্রতি বছর তারা ত্রিশটি রোযা রাখতো এবং ইয়ামনের দিকে মুখ করে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তো। এছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। পূর্ববর্তী দু'টি বাক্যের পরে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে বলে رَفْع -এর সাথে عَطْف করা হয়েছে। এদের সবারই সম্পর্কে আল্লাহর পাক বলেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভকারী এবং নির্ভয় হবে ওরাই যারা আল্লাহ্ উপর এবং কিয়ামতের উপর সত্য ঈমান রাখে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। আর এটা সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত এই শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না হবে, যাকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং যারা এ সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই পরবর্তী জীবনের বিপদ আপদ থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে। আর দুনিয়ায় ছেড়ে যাওয়া লোভনীয় জিনিসের জন্যে তাদের কোনই দুঃখ ও আফসোস থাকবে না। সূরায়ে বাকারার তাফসীরে এ বাক্যের বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

٧٠-لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۗ ○

৭০। আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নবী আগমন করতো এমন কোন বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হতো না, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতো এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলতো।

٧١-وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

৭১। আর তারা এ ধারণাই করেছিল যে, কোন শাস্তিই হবে না, এতে আরও অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় হয়ে গেল, অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি করলেন; তবুও তারা অন্ধ ও বধিরই রইলো- তাদের অনেকে; বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের (এই) কার্যকলাপ খুবই প্রত্যক্ষ করেন।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদের নিকট ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাহর আহকামের উপর আমল করবে এবং অহীর অনুসরণ করবে। কিন্তু তারা ঐ ওয়াদা ভেঙ্গে দেয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে লেগে পড়ে! আল্লাহর কিতাবের যে কথা তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পায় তা মেনে নেয় এবং যা তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে হয় তা পরিত্যাগ করে। শুধু এটুকুই নয়, বরং তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং বহু রাসূলকে হত্যা করে ফেলে। কেননা, তাঁরা তাদের কাছে যে আহকাম নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের মতের বিপরীত ছিল।

এতবড় পাপ করার পরেও তারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং মনে করে নেয় যে, তাদের কোনই শাস্তি হবে না। কিন্তু তাদের ভীষণ আধ্যাত্মিক শাস্তি হয়। অর্থাৎ

তাদেরকে হক অনুধাবন করা থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হয় এবং অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়া হয়। না তারা 'হক'কে শুনতে পায়, না 'হিদায়াত'কে দেখতে পায়। কিন্তু তবুও আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। আর এর পরেও তাদের অধিকাংশই ঐ রূপই থেকে যায়, অর্থাৎ তারা হক দর্শন থেকে অন্ধ এবং হক শ্রবণ থেকে বধির। আল্লাহ্ তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। কাজেই কে কিসের যোগ্য তা তিনি ভালই জানেন।

৭২। নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে, যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ তিনি তো মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম; অথচ মাসীহ্ নিজেই বলেছিল– হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, তবে আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।

٧٢- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

৭৩। নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে– আল্লাহ্ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বূদের) এক, অথচ এক মা'বূদ ভিন্ন অন্য কোনই (হক) মা'বূদ নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফির থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

٧٣- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

٧٤-افَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

৭৪। এর পরও কি তারা আল্লাহর সমীপে তাওবা করে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না? অথচ আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

٧٥-مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ○

৭৫। মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন তাপসী মহিলা ছিল; তারা উভয়ে খাদ্য ভক্ষণ করতো, লক্ষ্য কর! আমি কিরূপে তাদের নিকট প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি, আবার লক্ষ্য কর! তারা উল্টো কোন্ দিকে যাচ্ছে।

এখানে খ্রীষ্টানদের দলগুলোর অর্থাৎ মালেকিয়্যাহ, ইয়াকুবিয়্যাহ এবং নাসতুরিয়্যাহদের কুফরের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মাসীহকেই (আঃ) প্রভু বলে মেনে থাকে। আল্লাহ তাদের এ উক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক ও পবিত্র। মাসীহ (আঃ) তো আল্লাহর গোলাম ছিলেন। পার্থিব জগতে পা রেখে দোলনাতেই তাঁর মুখের প্রথম কথা ছিলঃ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর গোলাম বা দাস। (১৯ঃ ৩০) "আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র"-এ কথা তো তিনি বলেননি! বরং তিনি স্বীয় দাসত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি বলেছিলেনঃ 'আমার এবং তোমাদের সকলের প্রভু একমাত্র আল্লাহ। তাঁরই ইবাদত কর। সরল ও সঠিক পথ এটাই।' যৌবনের পরবর্তী বয়সেও বলেছিলেনঃ "তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর। যারা তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদত করে তাদের জন্যে জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম ওয়াজিব।" যেমন কুরআন পাকের অন্য আয়াতে রয়েছে– "আল্লাহ শিরকের গুনাহ কখনও মাফ করেন না।" জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি

চাইবে তখন তারা এ উত্তরই দেবে যে, এ দু'টি জিনিস আল্লাহ কাফিরদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষকদের দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, শুধু মুমিন ও মুসলমানরাই জান্নাতে যাবে। সূরায়ে নিসার إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ (৪ঃ ১১৬)-এ আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটিও বর্ণনা করা হয়েছে যাতে রয়েছে যে, পাপের তিনটি শ্রেণী রয়েছে। এ তিন শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে ওটা যা আল্লাহ তা'আলা কখনও ক্ষমা করবেন না। সেই পাপটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। হযরত মাসীহ্ (আঃ) স্বীয় কওমের মধ্যে এ ওয়ায করেছিলেন যে, এরূপ অন্যায়কারী মুশ্রিকদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

এখন ঐ লোকদের কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহকে তিন মা'বূদের মধ্যে এক মা'বূদ মনে করতো। ইয়াহূদীরা হযরত উযায়ের (আঃ)-কে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) এবং আল্লাহকে তিন মা'বূদে মধ্যে এক মা'বূদ মনে করতো। কিন্তু এ আয়াতটি শুধু খ্রীষ্টানদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। তারা পিতা, পুত্র এবং তাঁর সেই কালিমাকে মা'বূদ মানতো যা পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের দিকে ছিল। অতঃপর এ তিনকে নির্ধারিত করার ব্যাপারেও খুব বড় রকমের মতানৈক্য ছিল এবং প্রত্যেক দল একে অপরকে কাফির বলতো। সত্য কথা এই যে, তারা সবাই কাফির ছিল। তারা হযরত মাসীহ (আঃ)-কে, তাঁর মাকে এবং আল্লাহকে মিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ মানতো। এ সূরার শেষে এরই বর্ণনা রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলবেন– 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে–তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ বলে স্বীকার কর?' তিনি তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবেন এবং নিজের না জানার কথা ও নিরপরাধ হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন। সবচেয়ে বেশী প্রকাশ্য উক্তি হচ্ছে এটাই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রকৃতপক্ষে ইবাদতের যোগ্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মা'বূদ তিনিই। যদি এরা কুফরীপূর্ণ উক্তি থেকে বিরত না থাকে তবে নিশ্চিতরূপে এরা ধ্বংসাত্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে।

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা, স্নেহ ও ভালবাসার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদের এতো কঠিন অপরাধ ও এতো ভীষণ নির্লজ্জতা ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও তাদেরকে স্বীয় রহমতের দাওয়াত দিচ্ছেন এবং বলছেনঃ এখনও যদি তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হও তবে তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে আমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবো।

হযরত মাসীহ (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই ছিলেন। তাঁর মত রাসূল তাঁর পূর্বেও অতীত হয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ অর্থাৎ 'সে একজন গোলামই ছিল।' (৪৩ঃ ৫৯) তবে তিনি তাঁর উপর স্বীয় রহমত নাযিল করেছিলেন এবং বানী ইসরাঈলের জন্যে তাঁর একটি নির্দেশ বানিয়েছিলেন। তাঁর মা মুমিনা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেননা, এটা হচ্ছে বিশেষণ বা গুণ বর্ণনার স্থান। সুতরাং তিনি যে গুণের অধিকারিণী ছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যদি তিনি নবুওয়াতের অধিকারিণী হতেন তবে এ স্থলে ওটার বর্ণনা দেয়া খুবই জরুরী ছিল। ইবনে হায্ম (রঃ) প্রমুখ মনীষীর ধারণা এই যে, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মা হযরত মূসা (আঃ)-এর মা এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মা নবী ছিলেন এবং তাঁরা এর দলীল দিতে গিয়ে বলেন, ফেরেশতাগণ হযরত সারা (আঃ) এবং হযরত মারইয়াম (আঃ)-কে সম্বোধন করেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলেছেন। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ

অর্থাৎ 'আমি মূসার মায়ের কাছে অহী পাঠিয়েছিলাম–তুমি তাকে দুধ পান করাও।' (২৮ঃ ৭) কিন্তু জমহূরের মাযহাব এর উল্টো। তাঁরা বলেন যে, নবুওয়াত পুরুষ লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। যেমন কুরআন পাকে আছে-

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বে আমি গ্রামবাসীদের মধ্য হতে পুরুষ লোকদেরকেই রিসালাত দান করেছিলাম।'(২১ঃ ৭) আবুল হাসান আশআরী (রঃ) তো এর উপর ইজমা হওয়ার কথা নকল করেছেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে–মাতা ও পুত্র উভয়ে পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, যা ভেতরে যাবে তা বেরিয়ে আসবে। অর্থাৎ তাদের প্রস্রাব পায়খানাও হতো। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তাঁরা অন্যদের মত বান্দাই ছিলেন। খোদায়ী গুণ তাঁদের মধ্যে ছিল না। দেখো তো! আমি কিভাবে খোলাখুলি তাদের সামনে আমার দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি! আবার লক্ষ্য কর যে, এতো দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ফিরছে! কেমন ভ্রষ্ট মাযহাবের উপর তারা রয়েছে! কেমন জঘন্য ও দলীল প্রমাণহীন উক্তি তারা করছে!

٧٦-قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৭৬। তুমি বলে দাও–তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদত কর যা না তোমাদের কোন অপকার করবার ক্ষমতা রাখে, আর না কোন উপকার করবার; অথচ আল্লাহই সব শোনেন, সব জানেন।

٧٧-قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ○ ع

৭৭। তুমি বল–হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করো না, এবং ঐসব লোকের (ভিত্তিহীন) কল্পনার উপর চলো না যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরও বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুতঃ তারা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

এখানে আল্লাহকে ছেড়ে বাতিল মা'বূদগুলোর ইবাদত করতে নিষেধ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে বলছেন– এসব লোককে বলে দাও–যারা তোমাদের কোন ক্ষতি করার এবং উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখে না, তাদের তোমরা কেন পূজা করছো? যিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছুর খবর রাখেন, সেই আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যাদের শুনবার, দেখবার এবং উপকার ও অপকার করবার কোনই ক্ষমতা নেই, তাদের অনুসরণ করা কতই না নির্বুদ্ধিতার কাজ! হে আহলে কিতাব! তোমরা হক ও সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেয়ো না। যার যতটুকু সম্মান করার নির্দেশ রয়েছে তার ততটুকুই সম্মান কর। মানুষের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ নবুওয়াত দান করেছেন তাদেরকে নবুওয়াতের মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়ো না। যেমন তোমরা মাসীহ (আঃ)-এর ব্যাপার ভুল করছো। এর একমাত্র কারণ এটাই যে, তোমরা তোমাদের পীর, মুরশিদ, উস্তাদ এবং ইমামদের পিছনে লেগে পড়েছো। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট

এবং অনুসারীদেরকেও করেছে পথভ্রষ্ট। বহু দিন হতে সরল ও ন্যায়ের পথকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ভ্রান্তি ও বিদআতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে একটি লোক ধর্মের খুবই পাবন্দ ছিল। কিছুদিন পর শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। সে তাকে বলে, "আগের লোকেরা যা করে গেছে তুমিও তো তাই করছো। এতে কি হবে? এর দ্বারা না জনগণের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা লাভ হবে, না তোমার কোন খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। বরং একটা নতুন কিছু আবিষ্কার কর এবং জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দাও। তাহলে দেখতে পাবে যে, তোমার খ্যাতি কিরূপে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কিভাবে স্থানে স্থানে তোমার সম্পর্কে আলোচনা চলছে।" সুতরাং সে তার কথা মত তা-ই করলো। তার ঐ বিদআতগুলো জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং বহু যুগ পর্যন্ত লোকেরা তার অন্ধ অনুকরণ করতে থাকলো। এখন হতে সে খুবই লজ্জিত হলো এবং সালতানাত ও রাজত্ব পরিত্যাগ করলো। তারপর নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিলেন-"তুমি যদি শুধু আমারই ব্যাপারে ভুল ও অপরাধ করতে তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিতাম। কিন্তু তুমি সাধারণ লোকের আমল নষ্ট করে দিয়েছো এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ভ্রান্তির পথে লাগিয়ে দিয়েছো। সেই পথে চলতে চলতে তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের পাপের বোঝা তোমার উপর থেকে কিরূপে সরতে পারে? সুতরাং তোমার তাওবা কবূল করা হবে না।" এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

۷۸- لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

৭৮। বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর লা'নত করা হয়েছিল দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এ লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল তারা আদেশের বিরোধিতা করেছিল এবং সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল।

۷۹- كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

৭৯। যে অন্যায় কাজ তারা করেছিল, তা হতে নিবৃত্ত হচ্ছিল না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।

৮০। তুমি তাদের (ইয়াহুদীদের) মধ্যে অনেক লোককে দেখবে যে, তারা বন্ধুত্ব করছে কাফিরদের সাথে; যে কাজ তারা ভবিষ্যতের জন্যে করেছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ, যেহেতু আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ফলতঃ তারা আযাবে চিরকাল থাকবে।

٨٠- تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

৮১। আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো এবং নবীর (মূসার আঃ) প্রতি এবং ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা তার নিকট প্রেরিত হয়েছিল, তবে তাদেকে (মুশরিকদেরকে) কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

٨١- وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

ইরশাদ হচ্ছে যে, বানী ইসরাঈলের কাফিররা প্রাচীন অভিশপ্ত। হযরত দাউদ (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর যুগে তারা অভিশপ্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল আল্লাহর অবাধ্য এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যাচারী ছিল। তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর, কুরআন প্রভৃতি সমস্ত কিতাবই তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করে আসছে। তারা নিজেদের যুগেও একে অপরকে খারাপ কাজ করতে দেখেছে, কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। হারাম কাজগুলো তাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে চলতো এবং কেউ কাউকেও নিষেধ করতো না। এ ছিল তাদের জঘন্য কাজ।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যখন পাপ কাজ শুরু হয় তখন তাদের আলেমরা তাদেরকে বাধা দেয়। কিন্তু যখন দেখে যে, তারা মানলো না তখন তারা তাদেরকে পৃথক না করে তাদের সাথেই উঠাবসা করতে থাকে। আল্লাহ্ তখন একে অপরের প্রতি

হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেন এবং হযরত দাঊদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর বদ দু'আর মাধ্যমে তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করেন। কেননা, তারা অবাধ্য ও অত্যাচারী ছিল।" এটা বর্ণনা করার সময় নবী (সঃ) বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এ কথা বলার পর সোজা হয়ে বসে গিয়ে বলেনঃ "না, না। আল্লাহর কসম! তোমাদের অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমরা জনগণকে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বাধা প্রদান করবে এবং তাদেরকে শরীয়তের পাবন্দ বানিয়ে নেবে।"

সুনানে আবি দাঊদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বানী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম বদভ্যাস এই ঢুকেছিল যে, কোন লোক অপর কোন লোককে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করতে দেখলে তাকে বাধা প্রদান করতো। তাকে সে বলতোঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং এ খারাপ কাজ পরিত্যাগ কর, এটা হারাম। কিন্তু পরদিন যখন সে তা ছাড়তো না তখন সে তার থেকে পৃথক হয়ে যেতো না। বরং একই সাথে পানাহার করতো এবং একই সাথে উঠাবাস করতো। এ কারণে সবারই অন্তরে সংকীর্ণতা এসে যায়।" তারপর তিনি পূর্ণ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! তোমাদের উপর ফরয হচ্ছে এই যে, তোমরা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে এবং তাকে হকের উপর আসতে বাধ্য করবে।" জামেউত তিরমিযী এবং সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে। সুনানে আবি দাঊদ ইত্যাদির মধ্যে এ হাদীসের শেষাংশে এ কথাও আছে–তোমরা যদি এটা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের অন্তরও একে অপরের সাথে মেরে দেবেন এবং তোমাদের উপরও তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন, যেমন এদের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

এ সম্পর্কীয় আরও হাদীস রয়েছে। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি তো لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ (৫ঃ ৬৩)-এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ (৫ঃ ১০৫)-এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত আবূ সা'লাবা (রাঃ)-এর হাদীসগুলো আসবে ইনশাআল্লাহ। মুসনাদে আহমাদ ও জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হয় তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের উপর স্বীয় পক্ষ থেকে শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা তিনি কবূল করবেন না।" সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ

(সঃ) বলেছেন– "তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক এমন সময় আসার পূর্বে যে, তোমরা দু'আ করবে, কিন্তু তা কবূল করা হবে না।" সহীহ হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "তোমাদের কেউ কাউকে শরীয়ত গর্হিত কাজ করতে দেখলে তাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা তার উপর ফরয। যদি এটার ক্ষমতা তার না থাকে তবে তার উচিত যে, সে যেন তাকে কথা দ্বারা বাধা দেয়। যদি ওটারও ক্ষমতা তার না থাকে তবে তার উচিত তাকে অন্তরে ঘৃণা করা, এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "বিশিষ্ট লোকদের পাপের কারণে আল্লাহ সাধারণ লোকদেরকে শাস্তি দেন না, কিন্তু ঐ সময় দিয়ে থাকেন যখন তাদের মধ্যে কু-কাজ ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদেরকে বাধা প্রদান করে না। ঐ সময় আল্লাহ বিশিষ্ট ও সাধারণ সমস্ত লোককেই স্বীয় শাস্তি দ্বারা ঘিরে নেন।"[২]

নবী (সঃ) বলেছেন– "যে জায়গায় পাপ ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যদি ঐ শরীয়ত বিরোধী কাজে অসন্তুষ্ট হয় (আর একটি বর্ণনায় আছে যে, যদি ঐ কাজে বাধা দেয়) তবে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যারা সেখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু ঐ শরীয়ত বিরোধী কার্যে তারা সন্তুষ্ট হয়, তবে তারা যেন ঐ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত আছে।"[৩] সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "লোকদের ওযর যে পর্যন্ত লুপ্ত না হবে সে পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবে না।" হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুৎবা দিতে গিয়ে বলেনঃ "সাবধান! কাউকে যেন লোকদের ভয় সত্য কথা বলা থেকে বিরত না রাখে।" এ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমরা তো এরূপ স্থলে মানুষের ভয়কে স্বীকার করে থাকি। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ।'[৪] সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, জামরায়ে সানিয়ার নিকট রাসূলুল্লাহ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. হাদীসগুলো ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(সঃ)-এর কাছে একটি লোক এসে জিজ্ঞেস করলো– 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! উত্তম জিহাদ কি?' তিনি নীরব থাকলেন, তারপর তিনি জামরায়ে উকবাকে কংকর মারার পর যখন সওয়ারীর উপর আরোহণের উদ্দেশ্যে রেকাবে পা রাখলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'প্রশ্নকারী কোথায়?' লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমি হাযির আছি। তিনি তখন বললেনঃ "অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলে দেয়া (হচ্ছে উত্তম জিহাদ)।" সুনানে ইবনে মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'তোমাদের কারও নিজের অসম্মান কর উচিত নয়।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেনঃ তা এরূপে যে, সে শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখবে এবং কিছুই বলবে না। কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ 'অমুক স্থলে তুমি নীরব ছিলে কেন?' সে উত্তর বলবেঃ 'মানুষের ভয়ে।' তখন আল্লাহর তা'আলা বলবেন– 'আমি এর সবচেয়ে বড় হকদার ছিলাম যে, তুমি আমাকেই ভয় করতে।' অন্য বর্ণনায় আছে যে, তালকীনে হুজ্জতের উপর সে বলবেঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার উপর আশা ভরসা রেখেছিলাম এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'মুসলমানদের নিজেকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিরূপে? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'ঐ বিপদ আপদকে মাথা পেতে নেয়া যা বরদাশত করার ক্ষমতা তার নেই।' সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা কখন ছেড়ে দেয়া হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'ঐ সময় ছেড়ে দিতে হবে যখন তোমাদের মধ্যে ঐ জিনিসই প্রকাশ পেয়ে যাবে যা পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল।' আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ 'ওটা কি জিনিস?' তিনি উত্তর দিলেনঃ 'রাজত্ব ইতর লোকদের মধ্যে চলে যাওয়া, বড় লোকদের মধ্যে ব্যভিচারী এসে পড়া, ছোট লোকদের মধ্যে ইলম এসে যাওয়া।' হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন যে, ইতর ও ছোট লোকদের মধ্যে এসে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ফাসেক ও পাপাচারদের মধ্যে ইলমের আগমন ঘটা। এ হাদীসের সাক্ষী আবূ সা'লাবা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা لَا يَضُرُّكُمْ (৫ঃ ১০৫)-এ আয়াতের তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইরশাদ হচ্ছে–অধিকাংশ মুনাফিককে তুমি দেখবে যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। তাদের এ কার্যের কারণে অর্থাৎ মুসলমানদের বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে তারা তাদের জন্যে বড় যখীরা জমা করে রেখেছে। এরই প্রতিশোধ হিসেবে তাদের অন্তরে নেফাক বা

কপটতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এরই উপর ভিত্তি করেই তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাক। কেননা, এতে ছয়টি অকল্যাণ রয়েছে। তিনটি দুনিয়াতে ও তিনটি আখিরাতে। দুনিয়ার তিনটি অকল্যাণ হচ্ছে– (১) এর ফলে ইযযত, সম্মান ও সৌন্দর্য লোপ পায়, (২) এর ফলে দারিদ্র এসে পড়ে এবং (৩) এর কারণে আয়ূ কমে যায়। আর আখিরাতের তিনটি অকল্যাণ হচ্ছে– (১) আল্লাহর গযব, (২) হিসাবে কাঠিন্য এবং (৩) জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান।" তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতের শেষ বাক্যটি পাঠ করেন। এ হাদীসটি দুর্বল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যদি এ লোকগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর এবং কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান আনতো তবে কখনও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতো না ও খাঁটি মুসলমানের সাথে শত্রুতা করতো না। প্রকৃত ব্যাপারে এই যে, তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক'। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য হতে সরে পড়েছে এবং তাঁর অহী ও পাক কালামের আয়াতগুলোর বিরোধী হয়ে গেছে।

৮২- لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا
نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ
قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৮২। তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুসলমানদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে এ ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকে, আর তন্মধ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐসব লোককে পাবে, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু জ্ঞানপিপাসু আলেম এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে, আর এই কারণে যে, তারা অহংকারী নয়।

এ আয়াতটি এবং পরবর্তী চারটি আয়াত নাজ্জাসী এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তাঁদের সামনে হাবসা বা আবিসিনিয়া রাজ্যে

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) কুরআন মাজীদ পাঠ করেন তখন তাদের চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে, এমন কি তাঁদের দাড়ি ভিজে যায়। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়। আর হযরত জাফর (রাঃ)-এর এ ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। এটাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো ঐ প্রতিনিধির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাকে বাদশাহ নাজ্জাসী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্যে এই যে, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর অবস্থান ও গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর কথাগুলো শ্রবণ করেন। যখন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর মুখ থেকে কুরআন কারীম শ্রবণ করেন তখন তাঁর অন্তর গলে যায়। তিনি খুবই ক্রন্দন করেন এবং ইসলাম কবূল করেন। ফিরে গিয়ে তিনি নাজ্জাসীর কাছে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেন। নাজ্জাসী তখন রাজ্য ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু সঠিক বর্ণনায় সাব্যস্ত হয় যে, তিনি আবিসিনিয়ায় রাজত্ব করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর দিনই নবী (সঃ) সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন এবং তাঁর গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন। কেউ কেউ তো বলেন যে, এ প্রতিনিধি দলে সাতজন আলেম ও পাঁচজন দরবেশ ছিলেন অথবা পাঁচজন আলেম ও সাতজন দরবেশ ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাঁরা মোট পাচশ জন ছিলেন। আবার বলা হয়েছে যে, তাঁদের সংখ্যা ষাটের কিছু বেশী ছিল। একটি উক্তি এও আছে যে, তাঁরা সত্তরজন ছিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আতা' (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতে যাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন হাবশের অধিবাসী। হাবশের মুহাজির মুসলমানগণ যখন তাঁদের কাছে আগমন করেন তখন তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, প্রথমে তাঁরা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যখন তারা মুসলমানদেরকে দেখতে পান ও কুরআন শ্রবণ করেন তখনই তাঁরা মুসলমান হয়ে যান। ইবনে জারীর (রঃ)-এর ফায়সালা এসব উক্তিকে সত্য বলে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন যে, এ আয়াতগুলো ঐসব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে। তাঁরা হাবশারই হোন বা অন্য কোন জায়গারই হোন। ইয়াহূদীদের মুসলমানদের সাথে যে ভীষণ শত্রুতা রয়েছে তার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে দুষ্টামি, বিরোধিতা ও অস্বীকার করার মাদ্দাহ বা মূল খুব বেশী আছে। তারা জেনে শুনে কুফরী করে থাকে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণ করে থাকে। তারা হকের মোকাবিলায় বিগড়ে যায়। হক পন্থীদের উপর তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। আলেমের সংখ্যা তাদের মধ্যে খুবই কম। আলেমদের কোন প্রভাব তাদের উপর পড়ে না। এ কারণে তারা বহু নবীকে হত্যা করেছিল। স্বয়ং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদকেও

(সঃ) তারা হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। একবার নয়, বার বার। তারা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, তাঁর উপর যাদু করে এবং তাদের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু প্রত্যেকবারই মহান আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "যখন কোন ইয়াহূদী কোন মুসলমানকে একাকী পায় তখন তার অন্তরে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পয়দা হয়ে যায়।" অন্য এক সনদেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু তা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল। তবে হ্যাঁ, মুসলমানদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐসব লোক, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে। যারা হযরত ঈসা (আঃ) -এর সত্য অনুসারী এবং ইঞ্জীলের আসল ও সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মনে মোটের উপর মুসলমান ও ইসলামের প্রতি মহব্বত আছে। এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে নম্রতা রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً

অর্থাৎ 'হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের অন্তরে আমি নম্রতা ও দয়া সৃষ্টি করেছি।' (৫৭ঃ ২৭) তাদের কিতাবে নির্দেশ আছে–যে তোমার ডান গালে থাপ্পড় মারে, তুমি তার সামনে তোমার বাম গালটিও এগিয়ে দাও। তাদের শরীয়তে যুদ্ধই নেই। এখানে তাদের বন্ধুত্বের কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে খতীব ও উপদেষ্টা রয়েছে। قِسِّيسِ-قَسٌّ-এর বহু বচন হচ্ছে قِسِّيسِينَ, এর বহু বচন قُسُوسُ ও আসে। رُهْبَانٌ শব্দটি رَاهِبٌ শব্দের বহু বচন। এটা رَهْبٌ শব্দ থেকে বের হয়েছে। রাহেব বলা হয় আবেদকে । এ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভয়। যেমন رَاكِبٌ -এর বহু বচন رُكْبَانٌ এবং فَارِسٌ-এর বহু বচন فُرْسَانٌ এসে থাকে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, কখনও কখনও رُهْبَانٌ শব্দটি এক বচনের জন্যেও এসে থাকে । এর বহু বচন رَهَابِينُ এসে থাকে। যেমন قُرْبَانٌ ও قَرَابِينُ এবং جُوْزَانٌ ও جَوَازِينُ । আবার কোন কোন সময় এর বহু বচন رَهَابِنَةٌ এসে থাকে। আরবীদের কবিতাতেও رُهْبَانٌ শব্দটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি লোক قِسِّيسِينَ ও رُهْبَانًا পড়ে, একটি লোক হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি উত্তরে বলেনঃ قِسِّيسِينَ কে খানকান ও জনহীন স্থানে ছেড়ে এসো। আমাকে তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) صِدِّيقِينَ ও رُهْبَانًا পড়িয়েছেন। (বায্যায ও ইবনে মিরদুওয়াই)

মোটকথা এখানে তাদের তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে। (১) তাদের মধ্যে আলেম বেশী থাকা, (২) তাদের মধ্যে আবেদের সংখ্যা বেশী হওয়া এবং (৩) তাদের মধ্যে নম্রতা ও ভদ্রতা থাকা।

ষষ্ঠ পারা সমাপ্ত

٨٣- وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

৮৩। আর যখন তারা তা শ্রবণ করে, যা রাসূল (সঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে, তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের চোখে অশ্রু বইতে আছে, এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তারা এরূপ বলে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুমিন হয়ে গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ সঃ ও কুরআনকে সত্য বলে) স্বীকার করে।

٨٤- وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ○

৮৪। আর আমাদের কি এমন ওযর আছে যে, আমরা ঈমান আনবো না আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে? অথচ এ আশা রাখবো যে, আমাদের পরওয়ারদিগার নেককারদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন।

٨٥- فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ○

৮৫। ফলতঃ তাদের এ উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

٨٦- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○ ع

৮৬। আর যারা কাফির হয়েছে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

আল্লাহ পাক বলছেন–যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতারিত অহী শ্রবণ করে তখন হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে। কেননা, তারা সেই ভবিষ্যত সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গেছে যা (তারা মুহাম্মাদ সঃ -এর প্রেরিতত্ব সম্পর্কীয় সংবাদ) তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে দেখেছিল। তাই তারা বলতে শুরু করে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা সাক্ষ্য দান করেছে ও ঈমান এনেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مَعَ الشّٰهِدِيْنَ দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর উম্মতকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা তাঁদের নবী (সঃ)-এর জন্যে সাক্ষ্য দান করেছিলেন যে, নবী (সঃ) প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অন্যান্য রাসূলদের জন্যেও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁরাও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন যে, تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ ঐ লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাঁরা কৃষক শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর সাথে আবিসিনিয়া হতে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাঁদেরকে কুরআন মাজীদ পাঠ করে শুনান তখন তাঁরা ঈমান আনেন। ঐ সময় তাঁদের চোখে অশ্রু দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "যখন তোমরা স্বদেশে ফিরে যাবে তখন তোমাদের পূর্ব মাযহাবে ফিরে যাবে না তো?" তাঁরা উত্তরে বলেনঃ 'আমরা আমাদের এ দ্বীন হতে কখনও ফিরে যাবো না।' মহান আল্লাহ তাঁদের উক্তিকে এভাবে নকল করেছেন–

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আমাদের এমন কি ওযর আছে যে, আমরা ঈমান আনবো না আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে এসেছে? অথচ আমরা এ আশা রাখবো যে, আমাদের প্রভু সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন।" ঐ লোকগুলো ছিলেন নাসারা যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ "আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে ঐ কিতাবের উপর যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আর আল্লাহর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে।" অন্য জায়গায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন তাদের

সামনে (কুরআন) পাঠ করা হয় তখন তারা বলে—আমরা এর উপর ঈমান এনেছি, এটা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য, আমরা তো ইতিপূর্বেই মুসলমান ছিলাম।" এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ "এ স্বীকারোক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহ প্রদান করবেন যেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। এক মুহূর্তের জন্যেও তাদেরকে সেখান থেকে সরানো হবে না, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান এটাই।" অতঃপর তিনি দুষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ 'যারা কুফরী করলো এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

٨٧- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৮৭। হে মুমিনগণ! আল্লাহ যেসব বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তন্মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

٨٨- وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৮৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল রুচিকর বস্তুগুলো ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর—যাঁর প্রতি ঈমান রাখ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বলেছিলেন— 'আমরা আমাদের পুংলিঙ্গ কর্তন করবো এবং দুনিয়ার কাম, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করবো।' নবী (সঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁদেরকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা বলেনঃ 'হ্যাঁ, আমরা এরূপই সংকল্প করেছি।' তখন নবী (সঃ) বলেনঃ "কিন্তু জেনে রেখো যে, আমি তো রোযাও রাখি এবং (কোন কোন সময়) নাও রাখি, রাত্রে নামাযও পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধও হই।

সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে না সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কয়েকজন সাহাবী তাঁর পত্নীদেরকে তাঁর গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন! তখন (সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাঁদের মধ্যে কোন একজন বলেনঃ 'আমি এখন থেকে আর কখনও গোশ্ত খাবো না।' আর একজন বলেনঃ 'আমি কখনও স্ত্রীলোকদের সাথে বিবাহিত হবো না।' অন্য একজন বললেনঃ 'আমি কখনও বিছানায় শয়ন করবো না (বরং মাটিতে শয়ন করবো)।" এসব কথা নবী (সঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি বলেনঃ "ঐ লোকদের কি হয়েছে যে, তাদের কেউ একথা বলে এবং ও কথা বলে? কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি এবং কোন কোন সময় নাও রাখি, আমি নিদ্রাও যাই এবং নামাযও পড়ি, আমি গোশ্তও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যখন গোশ্ত ভক্ষণ করি তখন স্ত্রীলোকদের প্রতি আমার কামভাব খুবই বৃদ্ধি পায়। এ জন্যে আমি নিজের উপর গোশ্ত হারাম করে ফেলেছি। তখন 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেছেন সেগুলো তোমরা নিজেদের জন্যে হারাম করো না' -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত সুফইয়ান সাওরী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমরা এক যুদ্ধে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থান করি এবং সে সময় আমাদের সাথে স্ত্রীলোক ছিল না। তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করিঃ আমরা কি খাসী হবো না (অর্থাৎ আমাদের অণ্ডকোষ কর্তন করবো না)? তিনি তখন আমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করেন এবং আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কাপড়ের বিনিময়ে কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا -এ আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু এটা নিকাহে মুত্আ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মিরদুওয়াইও বর্ণনা করেছেন।

হযরত মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা (একদা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট হাযির ছিলাম, এমন সময় (রান্নাকৃত) পশুর স্তনের গোশ্‌ত নিয়ে আসা হলো। তখন (আমরা সবাই তা খেতে শুরু করলাম, কিন্তু) একটি লোক মজলিস থেকে সরে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ কাছে এসো (এবং খাওয়াতে অংশগ্রহণ কর)। সে তখন বললোঃ 'আমি তো এটা না খাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছি।' তখন তিনি বললেনঃ 'তুমি এসে এটা খেয়ে নাও এবং শপথ ভেঙ্গে দেয়ার কাফ্‌ফারা আদায় কর।' অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) প্রমুখ আলেমদের মাযহাব এই যে, যে ব্যক্তি নিজের উপর কোন খাদ্য অথবা স্ত্রীদের ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয় তা তার উপর হারাম হয়ে যায় না এবং তার উপর কোন কাফ্‌ফারাও নেই। কেননা, আল্লাহ পাক বলেছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপর পবিত্র জিনিসগুলো হারাম করো না, যেগুলো তিনি তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন। এ কারণেই যে ব্যক্তি নিজের উপর গোশ্‌ত ভক্ষণ হারাম করে নিয়েছিল তাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশ দেননি। কিন্তু আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের উপর কোন খাদ্য বা পোশাক অথবা অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয়, তার উপর সেই কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। কেননা, যখন কোন লোক নিজের উপর কোন জিনিস পরিত্যাগ করা অপরিহার্য করে নেয়, তখন কসমের কাফ্‌ফারার মতই নিজের উপর শুধু হারাম করে নেয়ার ফলে ও অপরিহার্য না হওয়া জিনিসকে অপরিহার্য করে নেয়ার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে জবাবদিহি করা উচিত এবং এটা কাফ্‌ফারার মাধ্যমেই সম্ভব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরূপ ফতওয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ পাকের কালাম দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ "হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেস, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। (৬৬ঃ ১) এখানে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত বর্ণনা

করার পর কসমের কাফ্ফারার বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কসমের উল্লেখ না থাকলেও যদি কেউ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করে নেয় তবে কসমের কাফ্ফারার মতই তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, কয়েকজন সাহাবী, যেমন হযরত উসমান ইবনে মায্উন (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) দুনিয়া পরিত্যাগ করা, পুংলিঙ্গ কর্তন করা এবং চট পরিধান করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে জুরাইহ্ ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান ইবনে মায্উন (রাঃ), আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), ইবনে মাসঊদ (রাঃ), মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ), আবূ হুযাইফা (রাঃ)-এর ক্রীতদাস সালিম (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ সংসার ত্যাগের ইচ্ছে করে বাড়ীর মধ্যে বসে পড়লেন, স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করলেন, চট পরিধান করলেন এবং ভাল ভাল খাদ্য ও পোশাক নিজেদের উপর হারাম করে দিলেন। তাঁরা বানী ইসরাঈলের সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করতে শুরু করলেন এবং খাসী হয়ে যাওয়ার সংকল্প করলেন। এ ঐক্যমতে তাঁরা পৌঁছলেন যে, পর্যায়ক্রমে সারারাত সালাত আদায় করবেন এবং সারাদিন রোযা রাখবেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং তাঁদেরকে বলা হল ঃ আল্লাহর পবিত্র ও হালাল বস্তুগুলোকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়ো না ও সীমা অতিক্রম করনা, আমি এসব লোককে কখনই পছন্দ করি না। এগুলো মুসলিমদের নীতি নয় যে, তোমরা স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবে, ভাল খাবার, পানীয় ও পোশাক পরিত্যাগ করবে, সদা সারারাত ধরে সালাত আদায় করবে ও সারাদিন রোযা রাখবে এবং খাসী হয়ে যাবে, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ কর্তন করবে। এসব নীতি সম্পূর্ণ ভুল। অতঃপর যখন তাঁদের ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন– "তোমাদের উপর তোমাদের নফসের হক রয়েছে এবং তোমাদের চক্ষুর হক রয়েছে। তোমরা রোযা রাখবে ও (মাঝে মাঝে) রোযা ছেড়েও দিবে, (রাতে নফল) সালাত আদায় করবে এবং নিদ্রাও যাবে। আর জেনে রাখবে যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।" তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ সংকল্প হতে রক্ষা করুন এবং আপনার অবতারিত অহী অনুযায়ী চলার তাওফীক দিন।

وَلَا تَعْتَدُوْا-এর অর্থ এটাও হতে পারে–তোমরা হালাল বস্তুকে নিজেদের উপর হারাম করে দিয়ে নফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করো না। আবার এও

অর্থ হতে পারে–তোমরা হালালকে হারাম বানিয়ে নিয়ো না এবং হালাল দ্বারা উপকার লাভ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করো না। হালালকেও প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ কর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করো না। كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا অর্থাৎ "তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না।"(৭ঃ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "মুমিন ওরাই যে, যখন তারা খরচ করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং তাদের খরচ করণ এর মাঝামাঝি পন্থায় হয়ে থাকে।" আল্লাহ তা'আলা না 'ইফরাত' বা বাহুল্যের অনুমতি দিয়েছেন, না 'তাফরীত' বা অত্যল্পতার অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্যেই তিনি বলেছেন– وَلَا تَعْتَدُوا অর্থাৎ তোমরা সীমা অতিক্রম করো না।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ "তোমরা সর্বাবস্থায় হালাল ও পবিত্র জিনিস ভক্ষণ কর এবং সর্বকাজে আল্লাহকেই ভয় কর। তাঁর মর্জির অনুসরণ কর এবং বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক।

৮৯। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের কসমগুলোর মধ্যে অর্থহীন কসমের জন্যে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ কসমসমূহের জন্যে পাকড়াও করবেন, যেগুলোকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর, সুতরাং ওর কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা মধ্যম ধরনের, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরনের), কিংবা একটা গোলাম বা বাঁদী আযাদ করা, আর যে ব্যক্তি সমর্থ না হয়, তবে (একাধারে) তিনদিনের রোযা; এটা

৮৯- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا

তোমাদের কসমসমূহের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম কর (অতঃপর ভঙ্গ কর) এবং নিজেদের কসমসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখো; এরূপেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

অর্থহীন কসমের বর্ণনা সূরায়ে বাকারায় দেয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এ ধরনের কসম মানুষ তার কথা বার্তার মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে থাকে। যেমন সে বলে, আল্লাহর কসম ইত্যাদি। এটা ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর উক্তি। অন্যান্যদের উক্তি এই যে, এরূপ কসম উপহাস ও অবাধ্যতার স্থলেও হতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, দৃঢ় বিশ্বাসের সময় এরূপ করা হলেও তা অর্থহীন কসমের সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে যাবে। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এটা হচ্ছে ক্রোধের সময় বা ভুল বশতঃ কসম। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কোন খাদ্য, পানীয় বা পোষাক পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কসম খায় তবে এ দলীল অনুযায়ী তাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে কসম মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওটাই হচ্ছে অর্থহীন বা বাজে কসম।

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

অর্থাৎ তোমরা যদি কসমকে দৃঢ় করে নাও তবে সেই কসমের জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ

অর্থাৎ দৃঢ় কসম ভেঙ্গে দেয়ার কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্ত লোককে খেতে দেয়া। তাদেরকে তোমরা এমন মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দেবে যা তোমরা তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াইয়ে থাক। এ মধ্যম ধরনের খাদ্য হচ্ছে রুটি ও দুধ কিংবা রুটি ও তেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন কোন লোক নিজের পরিবারকে তার ক্ষমতার তুলনায় খারাপ খাদ্য ভক্ষণ করিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ নিজের ক্ষমতার তুলনায় ভাল খাবার খাওয়াইয়ে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন যে, সেই খাদ্য মধ্যম

ধরনের হওয়া উচিত। না খুবই ভাল, না খুবই মন্দ। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে রুটি ও গোশ্ত, রুটি ও দুধ, 'রাওগান' তেল বা সিরকাহ ইত্যাদি।[১] ইবনে জারীর (রাঃ) বলেন যে, وَسَطِ দ্বারা খাদ্যের স্বল্পতা ও আধিক্য বুঝানো হয়েছে। খাদ্যের পরিমাণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, সকাল ও সন্ধ্যা এ দু'সময়ে দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) বলেন যে, একবারই যথেষ্ট। অর্থাৎ রুটি ও গোশ্ত। আর গোশ্ত দিতে না পারলে রুটি ও রাওগান তেল বা সিরকাই যথেষ্ট হবে এবং তা পেট পুরে খাওয়াতে হবে। অন্যান্যগণ বলেন যে, দশজনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' (প্রায় সোয়া সের) গম বা খেজুর অথবা এ ধরনের কোন খাবার দিতে হবে।[২] ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, গম হলে অর্ধ সা' আর অন্য কিছু হলে এক সা' দেয়া উচিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক সা' খেজুর কাফ্ফারা হিসেবে আদায় করেছিলেন এবং লোকদেরকে তিনি এরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর খেজুর না হলে অর্ধ সা' গম দিতে হবে।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, কসমের কাফ্ফারায় নবী (সঃ)-এর সেই মুদ পরিমাণ ওয়াজিব, যে মুদ তিনি মিসকীনের জন্যে ধার্য করেছিলেন, আর তা হচ্ছে ৫৬ তোলা গম। কিন্তু তিনি তরকারীর কথা বলেননি। এখানে ইমাম শাফিঈ (রঃ) দলীল হিসেবে নবী (সঃ)-এর ঐ হুকুমকে গ্রহণ করেছেন, যে হুকুম তিনি ঐ ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন যে রমযানের রোযার অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছিল। সে হুকুম এই ছিল যে, সে যেন ৭০জন মিসকীনকে এমন পরিমাণ যন্ত্রে গম মেপে দেয় যাতে ১৫ সা' গম ধরে, যেন প্রত্যেকে এক মুদ করে গম পেতে পারে। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, গম দেবে এক মুদ অথবা অন্য জিনিস দেবে দু' মুদ।[৩] আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন।

اَوْ كِسْوَتُهُمْ ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, যদি ঐ দশজনের প্রত্যেককেই একই পরিমাণ কাপড় দেয় যার উপর পোশাকের প্রয়োগ হতে পারে তবে তা যথেষ্ট হবে। যেমন একটা জামা বা পায়জামা অথবা পাগড়ী কিংবা চাদর।

---

১. এটা ইবনে সীরীন, হাসান ও যহ্হাকের উক্তি।

২. এটা হযরত আয়েশা (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ), নাখঈ (রঃ) এবং যহহাকেরও (রঃ) উক্তি।

৩. এটা ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে মাজা (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন এবং তাঁর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেককে এ পরিমাণ কাপড় দেয়া উচিত, যে পরিমাণ কাপড় নামাযে পরিধান করা জরুরী। পুরুষ ও স্ত্রীকে শরঈ প্রয়োজন হিসেবে দিতে হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হাসান (রঃ) বলেন যে, দু'টি কাপড় দিতে হবে। সাওরী (রঃ) বলেন যে, একটি পাগড়ী দেবে যা মাথাকে ঢেকে নেয় এবং একটি চাদর দেবে যা দেহকে ঢেকে দেয়।

أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ইমাম আবূ হানাফী (রঃ) এর দ্বারা সাধারণ গোলাম অর্থ নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মতে কাফির গোলামও আযাদ করতে পারে এবং মুমিন গোলামও আযাদ করতে পারে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও অন্যান্য ফকীহগণ বলেন যে, হত্যার কাফ্ফারায় যেমন মুমিন গোলামের শর্ত রয়েছে তদ্রূপ কসমের কাফ্ফারাতেও মুমিন গোলাম হওয়া জরুরী। কেননা, কারণ পৃথক হলেও ওয়াজিব তো একই। মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সালমী (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর উপর একবার একটা গোলাম আযাদ করার দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি একটি হাবশি ক্রীতদাসী নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রীতদাসীটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'আল্লাহ কোথায়?' সে উত্তরে বলেঃ তিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ 'আমি কে?' উত্তরে দেয়, আপনি আল্লাহর রাসূল (সঃ)। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সালমী (রাঃ)-কে বললেনঃ 'এ মুমিনা, সুতরাং তুমি তাকে আযাদ করতে পার।'[১]

এখন এ তিন প্রকারের কাফ্ফারার মধ্য হতে যে প্রকারের কাফ্ফারা আদায় করা হবে তাই আদায় হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সর্বপ্রথম সহজটার কথা বলা হয়েছে। তারপর শ্রেণীগতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক দেয়ার তুলনায় খানা খাওয়ানো সহজ। অতঃপর গোলাম আযাদ করার তুলনায় পোশাক দেয়া সহজ। মোটকথা, নিম্নতম হতে উচ্চতমের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়েছে- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটির উপরেও সক্ষম হবে না, তাকে তিনটি রোযা রাখতে হবে। ইবনে জারীর (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণনা

১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে, ইমাম মালিক (রঃ) তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম শাফিঈ (রঃ) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

করেছেন যে, তাঁরা বলেছেনঃ 'যার নিকট তিনটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রাও থাকবে তাকে অবশ্যই খানা খাওয়াতে হবে, নচেৎ রোযা রাখতে হবে।' এখন এ তিনটি রোযা পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখাই যথেষ্ট কি-না এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর মতে পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিকও (রঃ) এ কথাই বলেছেন। কেননা, فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ কথাটি সাধারণ, পর্যায়ক্রমে তিনদিন রোযা রাখতে হবে– এভাবে একে বেঁধে দেয়া হয়নি। যেমন কারও যদি পর্যায়ক্রমে কয়েকটি রোযা কাযা হয় তবে পর্যায়ক্রমে ওগুলোও আদায় করা জরুরী নয়। কেননা فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (২ঃ ১৮৪) কথাটি সাধারণ। এক জায়গায় ইমাম শাফিঈ (রঃ) পর্যায়ক্রমে তিনটি রোযা ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। হানাফী ও হানাবেল সম্প্রদায়েরও এটাই উক্তি। তাঁদের দলীল এই যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর একটি কিরআতে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُّتَتَابِعَاتٍ -এরূপও রয়েছে।[১] এ কিরআতটি মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত না থাকলেও কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ তো বটে। তাছাড়া সাহাবীদের তাফসীর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় এবং এটা হাদীসে মারফূ'র হুকুমেই পড়ে।

ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ এটা হচ্ছে কসমের শরঈ কাফ্ফারা।

وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা কাফ্ফারা আদায় না করে ছেড়ে দিয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৯০। হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।

৯০- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

---

১. হযরত মুজাহিদ (রঃ) ও শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) -এর কিরআত এটাই ছিল।

৯১। শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও নামায হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা ফিরে আসবে?

٩١- اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

৯২। আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করতে থাক এবং সতর্ক থাক, আর যদি বিমুখ থাক তবে জেনে রেখো যে, আমার রাসূল (সঃ)-এর দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে (আদেশ) পৌঁছিয়ে দেয়া।

٩٢- وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

৯৩। যারা ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর তাতে কোন গুনাহ নেই যা তারা পানাহার করেছে, যখন তারা পরহেয করে এবং ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, পুনঃ পরহেয করতে থাকে এবং ঈমান রাখে, পুনঃ পরহেয করতে থাকে ও ভাল কাজ করতে থাকে; বস্তুতঃ আল্লাহ এরূপ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।

٩٣- لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ ع

এখানে আল্লাহ পাক স্বীয় মুমিন বান্দাহদেরকে মদ্য পান জুয়া খেলা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করছেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, শতরঞ্জ এক প্রকারের জুয়া। মুজাহিদ (রঃ) এবং আতা' (রঃ) বলেন যে, বাজি রেখে যে খেলা করা হয় সেটাই জুয়া। এমনকি ছেলেরা বাজি রেখে যে কড়ি খেলে সেটাও জুয়া। রাশিদ ইবনে সা'দ ও যমরা' ইবনে হাবীব অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অজ্ঞতার যুগে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই জুয়া বিশেষভাবে খেলা হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই জঘন্য খেলা খেলতে নিষেধ করেছেন। মালিক (রঃ) বলেন যে, অজ্ঞতার যুগে সাধারণভাবে এই জুয়া খেলা হতো। একটি দু'টি ছাগলের গোশত শর্ত হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হতো। যুহরী (রঃ) বলেন, জুয়া এভাবে হতো যে, মাল এবং ফলের উপর পাশা নিক্ষেপ করা হতো এবং এভাবে জুয়ার মাধ্যমে ওগুলোর উপর অধিকার লাভ করা হতো। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) বলেন যে, যা কিছু আল্লাহ ও নামাযের স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রাখে তার সবই জুয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পাশার মাধ্যমে যে খেলা করা হয় তা-ই জুয়া। অনুরূপভাবে খেলার সময় যে জিনিসকে মেরে জয়লাভ করা হয় সেটাও জুয়া। এর ভাবার্থ যেন এটাই যে, শতরঞ্জ খেলা হারাম।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি 'চওসর' খেলা করলো সে যেন শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা স্বীয় হাত রঙ্গিয়ে দিলো।'[১] মুআত্তায়ে ইমাম মালিকের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি 'চওসর' খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নাফরমানী করলো।'[২] আর শতরঞ্জ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা 'চওসর' থেকেও খারাপ এবং তিনি ওটাকে পাশা ও জুয়ার মধ্যে গণ্য করেন। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) একে মাকরূহ বলেছেন।

اَنْصَابٌ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, اَنْصَابٌ ঐ পাথরগুলোকে বলা হতো যেগুলোর উপর পশু যবাই করে মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোর নামে উৎসর্গ করতো। اَزْلَامٌ ঐ পাশাগুলোকেও বলা হতো যেগুলোকে বণ্টন করে শুভাশুভ লক্ষণ বের করা হতো। رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ - অর্থাৎ এগুলো গর্হিত বিষয়, আর এগুলো শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্টতম শয়তানী কাজ।

---

১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) বুরাইদাহ ইবনে খাসীব আসলামী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।
২. এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

فَاجْتَنِبُوْهُ -এর 'ه' সর্বনামটি رِجْسٌ শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এগুলো পরিত্যাগ কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - এ কথা দ্বারা আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে এসব কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ শয়তান তো ওটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবে না? এ কথাগুলো আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী।

মদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মদ্য তিনবার হারাম করা হয়। যখন নবী (সঃ) মদীনায় আগমন করেন সেই সময় মদীনার লোকেরা মদ্য পান করতো এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত মাল ভক্ষণ করতো। ঐ সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

তুমি বল– এই দু'জিনিসে মানুষের জন্যে সামান্য উপকার আছে বটে; কিন্তু এই উপকারের তুলনায় ক্ষতি খুবই বেশী। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টো জিনিস আমাদের উপর হারাম তো করলেন না। তিনি শুধু বললেন যে, এ দু'টো জিনিসে আমাদের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী। সুতরাং তারা মদ্যপান করতেই থাকলো। কিন্তু একদিন এমন আসলো যে, এক মুহাজির সাহাবী নেশার অবস্থায় নামাযে কুরআন মাজীদ পাঠ করতে গিয়ে ভুল ও গড়বড় করে দেন। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

'হে মুমিনগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না, যে পর্যন্ত না জানতে পার যে, তোমরা কি বলছো'। সুতরাং লোকেরা নামাযের সময় মদ্যপান পরিত্যাগ করলো বটে; কিন্তু অন্য সময় পান করতেই থাকলো। কেননা, তখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে একদিন মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন একজন লোক নামায পড়ছিল, এমন সময় পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ - এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন লোকেরা বলেঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম।' অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ "হে

আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মদ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু তারা মদ্যপান করতো এবং জুয়া খেলতো– তাদের কি হবে? কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তো এটাকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং নিষিদ্ধ করলেন।" তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হলো–যারা ঈমান এনেছিল এবং ভাল কাজ করেছিল তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পূর্বে যা কিছু ভক্ষণ করেছিল সে জন্যে তাদের উপর কোন দোষারোপ করা হবে না। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যদি তাদের জীবদ্দশায় এটা হারাম করা হতো তবে তোমরা যেমন তা ছেড়ে দিলে, তারাও তদ্রূপ ছেড়ে দিতো।"

ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হযরত উমার (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেনঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে মদ্য সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিন!' তখন সূরায়ে বাকারার يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ (৪ঃ ৪৩)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর যখন হযরত উমার (রাঃ)-কে এ আয়াত শুনানো হয় তখন তিনি পুনরায় প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে মদ্যের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করুন! তখন সূরায়ে নিসার يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন নবী (সঃ)-এর মুআযযিন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার পর উচ্চৈঃস্বরে বলে দেন যে, নেশার অবস্থায় নামায পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত উমার (রাঃ)-কে এ আয়াতটিও পড়ে শুনানো হয়। তিনি এবারেও বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্যে আরও সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিন! তখন সূরায়ে মায়িদাহ্র উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবারও হযরত উমার (রাঃ)-কে আয়াতটি পাঠ করে শুনানো হয়। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (সুতরাং তোমরা বিরত থাকবে কি?) তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেন, 'আমরা বিরত থাকলাম, আমরা বিরত থাকলাম।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) নবী (সঃ)-এর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, হে লোক সকল! মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আর পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যেটা দিয়েই মদ তৈরী করা হবে সেটাই হারাম। সেই পাঁচটি জিনিস হচ্ছেঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। خَمْرٌ বা মদ শব্দটি সাধারণ। সুতরাং যে নেশার জিনিস পান করলে জ্ঞান লোপ

পায় সেটাই মদ। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যে সময় মদ হারাম করা হয় সে সময় মদীনায় আঙ্গুরের মদ চালু ছিল না।

অপর একটি হাদীসে রয়েছে যে, আব্দুর রহমান ইবনে আ'লা বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে মদ্য বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, সাকীফ অথবা দাউদ গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হন এবং মদের একটি বড় কলস উপঢৌকন হিসেবে তাঁকে প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বলেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন, তা কি তুমি জান না?' তখন লোকটি স্বীয় গোলামকে বলেনঃ 'এটা নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে দাও।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ 'যিনি মদ হারাম করেছেন তিনি ওর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করেছেন।' তখন লোকটি তাঁর গোলামকে বললো, 'তুমি এই কলসটি শহরে নিয়ে গিয়ে উলটিয়ে ফেলে দাও।'[১]

আর একটি হাদীসে তামীম দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি মদের মটকা (মৃৎপাত্র) উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাতেন। অতঃপর মদ হারাম হয়ে যাওয়ার পর পূর্বের অভ্যাস মত তিনি মদের মটকা নিয়ে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠে বলেনঃ "ইতিমধ্যে মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে।" তিনি তখন বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমি ওটা বিক্রি করে দেবো এবং ওর মূল্য দ্বারা উপকৃত হবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ ইয়াহূদীদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। তাদের উপর গরু ও ছাগলের চর্বি হারাম করে দিয়েছিলেন, তখন তারা তা গলিয়ে 'রাওগান' (তৈল) তৈরী করতঃ বিক্রি করতো। আল্লাহ তা'আলা মদ ও ওর মূল্য সব কিছুই হারাম করেছেন।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত নাফে' ইবনে কাইসান হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা (কাইসান) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে মদের ব্যবসা করতেন। একবার তিনি ব্যবসার জন্যে সিরিয়া হতে কতগুলো মদের মটকা নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তিনি একটি মটকা নিয়ে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার জন্য খুবই উত্তম মদ নিয়ে এসেছি।' তখন তিনি বলেনঃ

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

'হে কাইসান। ইতিমধ্যে মদ তো হারাম করে দেয়া হয়েছে।' কাইসান (রাঃ) তখন জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কি এটা বিক্রি করে দেবো? তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা হারাম করা হয়েছে এবং এর মূল্যও হারাম করে দেয়া হয়েছে।" তখন কাইসান (রাঃ) মটকাগুলো নিয়ে গিয়ে পা দিয়ে উলটিয়ে ফেলে দেন এবং সমস্ত মদ বইয়ে দেন।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা (রাঃ)-এর বাড়ীতে হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত সুহাইল ইবনে বাইযা (রাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য সাথীদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। এমনকি তাদের মাতাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদের এক আগমনকারী এসে বলেনঃ "মদকে হারাম করে দেয়া হয়েছে এ খবর কি আপনারা জানেন?" তখন তাঁরা বলেন, এখনও আমরা অপেক্ষা করবো এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। অন্যান্য সাহাবীগণ বললেনঃ "হে আনাস (রাঃ)! তোমার মটকায় যা কিছু মদ অবশিষ্ট রয়েছে তা উলটিয়ে ফেলে দাও। আল্লাহর কসম! এখন আমরা আর মদ পান করবো না।" এটা ছিল খেজুর ও যবের মদ। আর সে সময় ঐ মদই চালু ছিল।[১] হযরত আনাস (রাঃ) হতে আর একটি বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন, যেদিন মদ হারাম করা হয় সেদিন আমি আবূ তালহা (রাঃ)-এর বাড়িতে লোকদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম। ঐ মদ ছিল যব ও খেজুরের তৈরী। হঠাৎ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেন। তখন কেউ বলে ওঠেন, 'বেরিয়ে দেখ তো কি ঘোষণা করা হচ্ছে?' তখন জানা গেল যে, ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন– "জেনে রেখো যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে।" ঐ সময় মদীনার অলিতে গলিতে মদ বয়ে যাচ্ছিল। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, আবূ তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, 'বেরিয়ে গিয়ে মদ বইয়ে দাও।' তখন আমি তা বইয়ে দিলাম। তখন কেউ কেউ বললেন, 'অমুক ও অমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ এই মদ তাঁদের পেটের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন–

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ যারা ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর তাতে কোন গুনাহ নেই যা তারা (পূর্বে) পানাহার করেছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,

---

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি আবূ তালহা (রাঃ), আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ), আবূ দাজানা (রাঃ), মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), সুহাইল ইবনে বাহযা (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তি মহোদয়ের কাছে মদ পরিবেশন করছিলাম এবং নেশার কারণে তাঁদের মাথাগুলো ঢলে পড়ছিল, এমন সময় আমি ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, জেনে রেখো যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্রই যাঁরা আমাদের কাছে আসছিলেন এবং যাঁরা আমাদের নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সবাই নিজ নিজ মদ বইয়ে দেন। আমরা সবাই মদের কলসগুলো ভেঙ্গে ফেলি। আমাদের কেউ কেউ অযু করেন এবং কেউ কেউ গোসলও করেন। আমরা উম্মে সুলাইমের নিকট থেকে সুগন্ধি নিয়ে ব্যবহার করি। অতঃপর আমরা মসজিদে গমন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ হতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করে শুনিয়ে দেন। একটি লোক তখন বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যারা এটা পান করা অবস্থায় মারা গেছে তাদের কি হবে? সেই সময় আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। একটি লোক হযরত কাতাদা (রাঃ)-কে' জিজ্ঞেস করেন, আপনি আপনি এটা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। একটি লোক হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন?' তিনি উত্তর দেন, হ্যাঁ, আমরা কখনও মিথ্যা বলি না এবং মিথ্যা কি তা আমরা জানি না।[১]

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'নিশ্চয় আল্লাহ মদ, জুয়া, শতরঞ্জ এবং গাবীরা গাছ হতে নিংড়ানো মদ হারাম করেছেন, আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিসই হারাম।' হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বেড়ার দিকে গমন করেন। আমি তাঁর ডান দিকে ছিলাম। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ) সামনের দিক থেকে আগমন করলেন। আমি তখন পিছনে চলে গেলাম এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর ডান দিকে হয়ে গেলেন। আর আমি তাঁর বাম দিকে গেলাম। ইতিমধ্যে হযরত উমার (রাঃ)-কে আসতে দেখা গেল। আমি তখন সরে গেলাম এবং তিনি তাঁর বাম দিকে চলে গেলেন। এখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ বেড়ার মধ্যে আসলেন যা বাড়ীর পিছনে উট

১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) ইবাদ ইবনে রাশিদ (রঃ)-এর হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন, তিনি কাতাদাহ (রাঃ) হতে এবং তিনি আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

বাঁধার জায়গা ছিল। সেখানে মদের একটি মশক দেখা গেল। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাকলেন এবং ছুরি দিয়ে ওটা কেটে ফেলতে বললেন। আমি তখন ওটা ফেড়ে ফেললাম। তারপর তিনি বললেনঃ 'মদ, মদ্যপানকারী, পরিবেশনকারী, বহনকারী, নিংড়িয়ে রস বেরকারী, তৈরিকারী এবং ওর মূল্য গ্রহণকারী সকলের উপর আল্লাহর লা'নত।'[১]

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একজন আনসারী আমাদেরকে দাওয়াত করেন। আমরা সেখানে প্রচুর মদ পান করি। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আমরা যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন আমরা পরস্পর ফখর বা গৌরব প্রকাশ করতে শুরু করি। আনসারগণ বলেন, 'আমরাই উত্তম।' আবার কুরাইশরা বলেন, 'আমরাই উত্তম।' অতঃপর এক আনসারী উটের একটা বড় হাড় নিয়ে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নাকের উপর মেরে দেন। ফলে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর নাকের হাড় ভেঙ্গে যায়। তখন إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ হতে فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের দু'টি দলকে কেন্দ্র করে মদ্য হারাম হওয়ার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। তারা প্রচুর পরিমাণে মদ পান করার ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। কারও চেহারায় আঘাত লাগে, কারও মাথা ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং কারও দাড়ি উঠিয়ে ফেলা হয়। কেউ বলেন, 'আমার অমুক সঙ্গী আমাকে আহত করেছে।' এভাবে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে পড়েন। অথচ ইতিপূর্বে তাঁদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি বিদ্যমান ছিল। কারও প্রতি কারও কোন হিংসা বিদ্বেষ ছিল না। তাঁরা বলতে শুরু করেন, 'যদি সে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হতো তবে আমাকে এভাবে আহত করতো না।' এভাবে তাদের মধ্যে শত্রুতা বেড়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ হতে فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। এরপর কতক লোক বলেনঃ কতগুলো লোক উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ তাঁদের পেটে মদ বিদ্যমান ছিল, তাঁদের কি হবে? তখন আল্লাহ পাক لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ -এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[৩]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

৩. এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জারীর (রঃ) আবূ বুরাইদাহ (রঃ) হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (তাঁর পিতা) বলেন, আমরা একটা ছোট পাহাড়ের উপর বসে মদ পান করছিলাম। আমরা তিনজন বা চারজন ছিলাম। আমাদের সামনে মদের কলস ছিল এবং মদের চক্র চলছিল। আমি উঠে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তখনই মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হলো। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গীদের নিকট আসলাম এবং তাঁদের কাছে فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করলাম। কেউ মদ পান করে ফেলেছিলেন। আবার কেউ কেউ আংশিক পান করেছিলেন এবং আংশিক পাত্রে অবশিষ্ট ছিল। পাত্র তার হাতেই ছিল। কারও মুখে মদ লেগেও ছিল। এমতাবস্থায় সবাই নিজ নিজ মদ মাটিতে বইয়ে দিলেন এবং আয়াতের শেষাংশ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ শোনামাত্রই তাঁরা বলে উঠলেন, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম।'

সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন সকালে লোকেরা মদ পান করেছিলেন এবং সেই দিনই তাঁদের অধিকাংশ শহীদ হয়েছিলেন। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রঃ) হযরত বারা' ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ বলেন, 'এটা হারাম হওয়ার পূর্বে যাঁরা এটা পান করেছিলেন (এবং ঐ অবস্থাতেই মারা গিয়েছেন) তাঁদের কি হবে?' তখন لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদে আহমাদ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ তালহা (রাঃ) তাঁর কাছে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ প্রাপ্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ 'ওটা বইয়ে দাও।' আবূ তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'ওর সিরকাহ বানিয়ে নিলে হয় না?' তিনি জবাবে বলেনঃ 'না।'

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করলো এবং তা থেকে তাওবা করলো না, পরকালে তার জন্যে তা হারাম হয়ে গেল।'[১]

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) মালিক (রাঃ)-এর হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন।

হযরত নাফে' (রাঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'নেশাযুক্ত প্রত্যেক জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি সারা জীবন ধরে মদ পান করে মারা গেলো এবং তা হতে তাওবা করলো না, সে পরকালে তা পান করতে পাবে না।'[১]

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ অনুগ্রহের খোঁটাদানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য এবং সদা মদ্যপানকারী জান্নাতে যাবে না।[২]

ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা মদ্য পান থেকে বিরত থাক, কেননা, এটাই হচ্ছে সমস্ত দুষ্কার্য ও অশ্লীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বড় 'আবেদ লোক ছিল। সে জনগণের সাহচর্যে থাকতো না। একটি পতিতা মহিলার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে সাক্ষ্য নেয়ার বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায়। সে তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে একটি শিশু ও মদের একটি কলস রয়েছে। সে তখন তাকে বলে, "আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে সাক্ষ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে ডাকিনি। বরং ডেকেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমার কাছে থেকে রাত কাটাবেন, অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করবেন কিংবা মদ পান করবেন।" তখন সে (হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ্যপানের পাপকে ছোট মনে করে) এক পেয়ালা মদ পান করে ফেলে। তারপর বলেঃ 'আমাকে আরও দাও।' শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে শিশুটিকে হত্যা করে বসে এবং মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে ফেলে। তাই তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাক। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারে না। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। তাঁর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ব্যভিচারী যে সময় ব্যভিচার করে সে সময় সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না এবং মদ্যপানকারী যখন মদ্যপান করে তখন সে মুমিন থাকে না। মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– "যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, আল্লাহ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন। ঐ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে সে কাফির হয়ে মারা যাবে। আর যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ সেই তাওবা কবূল করবেন। কিন্তু যদি সে পুনরায় এতে ফিরে যায় (অর্থাৎ পুনরায় পান করতে শুরু করে) তবে তাকে طِيْنَةُ الْخَبَالِ পান করাবার অধিকার আল্লাহর আছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! طِيْنَةُ الْخَبَالِ কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পূঁজ।'

৯৪। হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যেগুলো পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বল্লম পৌঁছতে পারবে, এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ জেনে নেবেন, কে তাঁকে না দেখে ভয় করে? সুতরাং যে ব্যক্তি এরপরও সীমা লংঘন করবে, তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

٩٤- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯৫। হে মুমিনগণ! তোমরা ইহরামের অবস্থায় বন্য শিকারকে হত্যা করো না; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক ওকে হত্যা করবে, তার উপর তখন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে, যার (আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দেবে। (অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় হয় নির্দিষ্ট চতুষ্পদ

٩٥- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

هَدْيًاۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

জন্তুই হোক; এই শর্তে যে, নেয়ায্ স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে, না হয় কাফ্ফারা (স্বরূপ নিরূপিত মূল্যের খাদ্য দ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে, অথবা এর সমপরিমাণ রোযা রাখবে, যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে; অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কর্মই করবে; আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ -এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে– আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার দুর্বল হোক বা ছোট হোক, তোমরা ইহ্রামের অবস্থায় শিকার করা থেকে বিরত থাকছো কি-না। এমনকি যদি লোকেরা চায় তবে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ পাক নিষেধ করলেন। মুজাহিদ বলেন যে, تَنَالُهٗ اَيْدِيْكُمْ দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বুঝানো হয়েছে। رِمَاحُكُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে বড় শিকার। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, মুসলমানরা যখন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলেন সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাঁদের অবস্থান স্থলে জমা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তাঁরা ইতিপূর্বে দেখেননি। সুতরাং ইহরামের অবস্থায় তাঁদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয়, যাতে আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে করছে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।'(৬৭ঃ ১২) এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে,

এরপরে যারা নাফরমানী করবে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা, সে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করলো।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ -এ নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্তু, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর মতে যেসব শিকারের মাংস হালাল নয় সেগুলো শিকার করা ইহরামের অবস্থায় জায়েয। তবে জমহূর উলামার মতে এ ধরনের শিকারও ইহরামের অবস্থায় জায়েয নয়। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করার বৈধতা সাব্যস্ত আছে, সেগুলো ছাড়া জমহূর উলামা কোন প্রাণীকেই ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারামকৃত প্রাণীগুলোর বহির্ভূত মনে করেন না। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "পাঁচটি ফাসিক (প্রাণী)-কে হালাল ও হারাম সর্বাবস্থায় হত্যা করা যায়। ঐ পাঁচটি হচ্ছে– কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়িয়ে নেয় এমন কুকুর।" ইমাম মালিক (রঃ) হযরত নাফে' (রাঃ) ও হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "পাঁচটি বিচরণকারীকে হত্যা করা মুহরিমের জন্যে কোন অপরাধমূলক কাজ নয়। সেগুলো হচ্ছে– কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং কামড়িয়ে নেয় এ ধরনের কুকুর।" আইউব (রঃ) বলেন, আমি নাফে' (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সাপের হুকুম কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'সাপকে হত্যা করার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই এবং আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদও সৃষ্টি হয়নি।' ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখ আলেমগণ কামড়িয়ে নেয় এরূপ কুকুরের সাথে নেকড়ে বাঘ, হিংস্র জন্তু এবং চিতা বাঘকেও সামিল করেছেন। কেননা, এগুলো তো কুকুর অপেক্ষাও ক্ষতিকারক। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) এবং হযরত সুফইয়ান সওরী (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক হামলাকারী হিংস্র জন্তুর হুকুম কুকুরের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। এর সমর্থন এই হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উৎবা ইবনে আবি লাহাবের উপর দু'আ করতে গিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহ! সিরিয়ায় তার উপর আপনি আপনার এক কুকুরকে কর্তৃত্ব দান করুন!" তখন যারকা' নামক স্থানে একটি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে।

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ জমহূরের উক্তি এই যে, কাফ্ফারা আদায় করার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশতঃ হত্যাকারী উভয়েই সমান। ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম দ্বারা শুধু ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু হাদীস দ্বারা ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। ভাবার্থ হলো এই যে, কুরআন কারীম দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হলো, তেমনিভাবে তার গুনাহ্গার হওয়াও সাব্যস্ত হলো। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ

অর্থাৎ "যেন সে তার পাপের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে, তবে যা অতীত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি পুনরায় সেই কাজ করবে, আল্লাহ তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।" আহকামে নববী (সঃ) এবং আহকামে আসহাব দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, ভুলবশতঃ হত্যা করার অবস্থাতেও কাফ্ফারা দিতে হবে, যেমন ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে কুরআন কারীমের নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা দিতে হয়। কেননা, যদি শিকারকে হত্যা করা হয় তবে তাকে নষ্ট করা হলো। আর যখন ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করবে তখন তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, তদ্রূপ ভুলবশতঃ নষ্ট করলেও এটাই হুকুম। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ইচ্ছাপূর্বক শিকারকারী কাফ্ফারার সাথে গুনাহগারও হয়, কিন্তু ভুলবশতঃ শিকারকারী গুনাহ্গার হয় না।

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ কেউ কেউ جَزَاءٌ শব্দটিকে مُضَاف পড়েছেন, আবার কেউ কেউ عَطْف -এর সাথে পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) فَجَزَاؤُهُ পড়েছেন। কিন্তু যেভাবেই পড়া হোক না কেন, ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমহূরের দলীল সর্বাবস্থাতেই কায়েম থাকছে যে, শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ বিনিময় ওয়াজিব হবে। যদি ওরই অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ কোন গৃহপালিত পশু পাওয়া যায় তবে ওটাই দিতে হবে, অন্যথায় ওর মূল্য দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর এতে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁর মতে শিকারকৃত জন্তুর গৃহপালিত জন্তুর সাথে সাদৃশ্য থাক বা না-ই থাক, সর্বাবস্থাতেই ওর মূল্য দিতে হবে।

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ এ কাফ্ফারার ফায়সালা করবেন মুসলমানদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, যাঁরা এ ফায়সালা করবেন যে,

সাদৃশ্যযুক্ত জন্তু শিকারের বেলায় সাদৃশ্যযুক্ত জন্তু দিতে হবে কিংবা সাদৃশ্যহীন জন্তু শিকারের বেলায় মূল্য দিতে হবে। আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য শুধু এ ব্যাপারে রয়েছে যে, ঐ দুই মীমাংসাকারীর মধ্যে একজন স্বয়ং শিকারী হতে পারেন কি -না? এই ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, স্বয়ং শিকারী মীমাংসাকারী হতে পারেন না। এটাই হচ্ছে ইমাম মালিকের মাযহাব। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, স্বয়ং শিকারী মীমাংসাকারী হতে পারেন। কেননা আয়াতটি আম বা সাধারণ। আর এটা হচ্ছে ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর মাযহাব। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) মায়মুন ইবনে মাহরান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক বেদুঈন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ "আমি ইহরামের অবস্থায় একটি শিকারকে হত্যা করেছি। সুতরাং আপনার মতে আমাকে এর কি বিনিময় দিতে হবে?" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর পাশে উপবিষ্ট হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-কে বললেন, "তোমার নিকট এর ফায়সালা কি?" বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন ঐ বেদুঈন বললোঃ "আমি এসেছি আপনার নিকট। আর আপনি হচ্ছেন মুসলমানদের খলীফা। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আর আপনি জিজ্ঞেস করছেন অন্যকে?" তখন আবূ বকর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি আপত্তি করছো কেন? আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যেন এর ফায়সালা করে।" সুতরাং আমি আমার সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করলাম। আমরা দু'জন যে ফায়সালার উপর একমত হবো, তোমাকে আমি সেই ফায়সালা শুনিয়ে দেবো।"[১] এখানে এটারই সম্ভাবনা ছিল। যেহেতু, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) যখন দেখলেন যে, বেদুঈন মূর্খ এবং দুই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মাসআলা অবহিত নয়, তাই নম্রতার সাথে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। কেননা মূর্খতার ওষুধ হচ্ছে শিক্ষাদান।

ইবনে জারীর বাজলী (রঃ) বলেন, ইহরামের অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করি। হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট আমি তা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, "তুমি দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে আস যাঁরা তোমার এ কাজের ফায়সালা করবেন।" আমি তখন আব্দুর রহমান (রাঃ) ও সা'দ (রাঃ)-কে নিয়ে আসলাম। তাঁরা দু'জন ফায়সালা করলেন যে, আমাকে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগ ফিদ্ইয়া স্বরূপ দিতে হবে।

১. ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এটা খুবই উত্তম ইসনাদ। কিন্তু মায়মূন (রাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ)-এর মধ্যে مُنْقَطِعٌ রয়েছে।

এ ব্যাপারেও আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, যদি পরবর্তী যুগেও কোন অপরাধীর মধ্যে এই অপরাধ প্রকাশ পায় তবে কি সেই সময়েরই দু'জন ফায়সালাকারীর প্রয়োজন হয়, না এরূপ মাসআলায় সাহাবীদের যে ফায়সালা ছিল ওরই আলোকে ফতওয়া দেয়া যেতে পারে? এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দিয়েছিলেন তারই অনুসরণ করতে হবে, ফায়সালাকারী দু'জন সাহাবীর ফায়সালার বৈপরীত্ব করা চলবে না। আর যেখানে সাহাবীদের কোন ফায়সালা বিদ্যমান নেই, সেখানে সেই যুগেরই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ফায়সালাকারীর ফায়সালা কার্যকরী হবে। কিন্তু ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক যুগের ফায়সালা পৃথক পৃথক হবে এবং প্রত্যেক যামানায় সেই যামানারই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ফায়সালাকারী নির্ধারণ করতে হবে, সেখানে সাহাবীদের ফায়সালা বিদ্যমান থাক আর নাই থাক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা مِنكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্য হতে' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

هَـدْيًا بَـٰلِغَ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ এ কুরবানী কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। সেখানেই ওটা জবেহ করতে হবে এবং হারাম শরীফের মিসকীনদের মধ্যে ওর গোশ্ত বন্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনই মতভেদ নেই, বরং সবাই এতে একমত।

اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا অর্থাৎ মুহরিম ব্যক্তি যদি নিহত শিকারের অনুরূপ জিনিস না পায় অথবা নিহত জন্তু এমন শ্রেণীর জন্তুই না হয় যে, গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে ওর সাদৃশ্য থাকতে পারে, তবে বিনিময়, খাদ্য খাওয়ানো এবং রোযা রাখার ব্যাপারে যে কোন একটি পালন করার ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা রয়েছে। কুরআনে কারীমে اَوْ শব্দটি ইখতিয়ারের অর্থেই এসেছে। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর এটাই উক্তি। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এরও একটি উক্তি এটাই আছে। ইমাম আহমাদ (রঃ)-এরও প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই যে, اَوْ শব্দটি ইখতিয়ারের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে। অন্য একটি উক্তি এই যে, اَوْ শব্দটি ইখতিয়ারের উদ্দেশ্যে আনা হয়নি, বরং ক্রমিক হিসেবে আনা হয়েছে। আর এর রূপ এই যে, মূল্যের সমান হলেই থেমে যেতে হবে এবং এতেই নিহত শিকারের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। এটাই ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), হাম্মাদ (রঃ) এবং ইমরাহীম (রঃ)-এর মত। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, এ মূল্য ঐ জানোয়ারের বিনিময় রূপ হবে যে, যদি ওটা বিদ্যমান থাকতো

তবে এটাই ওর মূল্য হতো। অতঃপর এ অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে সাদকা করে দিতে হবে এবং প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মুদ' অর্থাৎ ৫৬ তোলা খাবার দিতে হবে। এটা হচ্ছে ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) এবং হেজাযবাসী আলেমদের মাসআলা। আর ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ), ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, প্রত্যেক মিসকীনকে দুই 'মুদ' করে আহার্য দিতে হবে। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন যে, গম হলে এক 'মুদ' এবং অন্য কোন জিনিস হলে দুই 'মুদ' দিতে হবে। যদি এটা দিতে অপারগ হয় তবে রোযা রাখতে হবে। অর্থাৎ মিসকীনকে যে কয়েকদিন খানা খাওয়াতে হয়, ততদিন রোযা রাখতে হবে।

এখন এ খানা কোথায় খাওয়াতে হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন, এ খানা হারাম শরীফে খাওয়াতে হবে। আতা'রও এটাই উক্তি। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, যে স্থানে শিকারকে হত্যা করা হয়েছে সেখানেই বা ওরই নিকটবর্তী কোন এক স্থানে এ খানা খাওয়াতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, এ খানা খাওয়াবার জন্যে কোন স্থান নির্দিষ্ট নেই। সেটা হারাম শরীফেই হোক বা অন্য কোন জায়গাই হোক, সব জায়গাতেই খাওয়ানো চলবে।

لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ যেন সে তার দুষ্কর্মের শাস্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি তার উপর কাফ্ফারা এ জন্যেই ওয়াজিব করেছি যে, যেন সে আমার হুকুমের বিরোধিতার শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু অজ্ঞতার যুগে তার দ্বারা যা কিছু সাধিত হয়েছিল তা আমি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবো। কেননা, সে ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর এর নিষিদ্ধতা সত্ত্বেও যে আল্লাহর নাফরমানী করতঃ ওটা করে বসবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তিনি বিরুদ্ধচারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তবে অজ্ঞতার যুগে যা কিছু হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করবেন। আবার এ প্রশ্নের উত্তর না বাচক হবে যে, ইসলামের ইমাম কি এর কোন শাস্তি দিতে পারেন? অর্থাৎ ইমামের শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নেই। এ গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যকার ব্যাপার। হ্যাঁ, তবে ইমামের তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ফিদইয়া তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ এই যে,

আল্লাহ্ তা'আলা কাফ্ফারার মাধ্যমেই প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের রূপ এটাই হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুরুজনবৃন্দ এর উপর একমত যে, মুহরিম যখন শিকারকে হত্যা করে ফেললো তখন তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভুলের মধ্যে কোন পর্থক্য নেই, ভুল যতবারই হোক না কেন। ভুলবশতঃ কাজ এবং ইচ্ছাপূর্বক কাজ হুকুমের দিক দিয়ে সব সমান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুহরিমের দ্বারা যদি ভুলবশতঃ শিকারের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তবে তার উপর প্রতিবারের হত্যার সময়েই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি ইচ্ছাপূর্বক সে এই কাজ করে তবে প্রথমবারে তো তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য হবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তার দ্বারা এ কার্য সংঘটিত হলে তাকে বলা হবে– "আল্লাহ স্বয়ং তোমার এ কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।"[১]

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত, মহা বিজয়ী। কেউ তাঁকে তাঁর কাজে বাধা দিতে পারে না। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে কে এমন আছে যে, তাঁর এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? সারা জগত তাঁরই সৃষ্ট। সুতরাং এখানে হুকুম শুধু তাঁরই চলবে। বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি শাস্তি অবশ্যই দেবেন।

৯৬। তোমাদের জন্যে সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের উপভোগের জন্যে, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

٩٦- اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

---

১. শুরাইহ্ (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং হাসান বসরীও (রঃ) এ উক্তিই করেছেন। ইবনে জারীর (রঃ) প্রথম উক্তিটি পছন্দ করেছেন।

٩٧- جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

৯৭। মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণ সুদৃঢ় থাকার উপায় নির্ধারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসকেও, হারামে কুরবানীর জীবকেও এবং সেই জীবকেও যাদের গলায় নিদর্শন রয়েছে; এটা এ জন্যে যেন তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও যমীনস্থিত সব বস্তুরই খবর রাখেন, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

٩٨- اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯৮। তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিও প্রদানকারী এবং অতি ক্ষমাশীল।

٩٩- مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

৯৯। রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া মাত্র, আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর তার সবকিছুই আল্লাহ জানেন।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমাদের জন্যে সমুদ্রের তাজা বা সজীব শিকার হালাল। আর وَطَعَامُهٗ-এর ভাবার্থ হচ্ছে– যে মাছ শুকিয়ে পাথেয় তৈরী করা হয় সেটাও তোমাদের জন্যে হালাল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, صَيْدُ الْبَحْرِ দ্বারা ঐ শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র হতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর طَعَام দ্বারা সমুদ্রের ঐ মৃত শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত

অবস্থায় সমুদ্রের তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।[১] হযরত আবূ বকর (রাঃ) জনগণের সামনে খুতবা দান অবস্থায় বলেনঃ "শুধু সমুদ্রের শিকারই যে তোমাদের জন্যে হালাল তা নয়, বরং সমুদ্র হতে যা নিক্ষিপ্ত হয়, সেটাও তোমাদের উপকার লাভ ও পাথেয় হিসেবে হালাল।" ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ সমুদ্র বহু মাছকে তীরে নিক্ষেপ করে থাকে, আমরা ওগুলো খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ "তোমারা ওগুলো খেয়ো না।" অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বাড়ী ফিরে এসে কুরআন মাজীদ হাতে নেন এবং সূরা মায়িদাহ্ পাঠ করতে থাকেন وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ-এ আয়াতে এসে তিনি বলেনঃ যাও, বলে দাও–তোমরা ওটা খাও, কেননা সমুদ্রের জিনিসকে আল্লাহ পাক طَعَام বলেছেন। ইবনে জারীরও (রঃ) একথাই বলেছেন যে, طَعَامُهُ দ্বারা সমুদ্রের মৃত মৎস্যকেই বুঝানো হয়েছে।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এখানে سَيَّارَةٌ শব্দটি سَيَّارٌ শব্দের বহু বচন। ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা তো সামুদ্রিক টাট্‌কা প্রাণী শিকার করে থাকে। আর যা মরে যায় তা শুকিয়ে জমা করে রাখে। কিংবা তারা শিকার করে রেখে দেয় এবং ওটা মুসাফির ও সমুদ্রের দূরবর্তী লোকদের জন্যে পাথেয়র কাজ দেয়। জমহূর মৃত মাছ হালাল হওয়ার দলীল হিসেবে এ আয়াতটিকে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক (রঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং হযরত উবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ্ (রাঃ)-কে ঐ দলের আমীর নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের সংখ্যা ছিল তিনশ'। আমিও তাঁদের একজন ছিলাম। আমরা পথে থাকতেই আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) সকলের পাথেয় একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশক্রমে সমস্ত পাথেয় জমা করা হয়। আমাদের পাথেয় ছিল খেজুর। আমরা প্রতিদিন তা থেকে অল্প অল্প করে খেয়ে থাকি। অবশেষে ওগুলোও শেষ হয়ে আসে এবং রসদ হিসেবে আমরা শুধুমাত্র একটি করে খেজুর পেয়ে থাকি। অবশেষে আমরা মৃত প্রায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হই এবং দেখি যে, টিলার মত একটি বিরাট মাছ পড়ে রয়েছে।

১. এরূপই হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে।

সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক আঠার দিন পর্যন্ত ওটা ভক্ষণ করে। হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) ওর পাঁজরের হাড় দু'টিকে কামানের মত দাঁড় করে রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর ওর নীচ দিয়ে একজন উষ্ট্রারোহী গমন করে, তথাপি ওর উপরিভাগ স্পর্শ করতে পারেনি। এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাখরীজ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ সমুদ্র তীরে উঁচু টিলার মত কি একটা দেখা গেল। আমরা তখন সেখানে গিয়ে দেখি যে, একটি সামুদ্রিক জন্তু মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওকে আমবার বলা হয়। হযরত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) বললেনঃ "এটা তো মৃত।" তারপর তিনি বললেনঃ "মৃত হোক! আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত! আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। সুতরাং তোমরা এর গোশ্ত ভক্ষণ কর।" আমরা তথায় একমাস কাল অবস্থান করি। আমরা ছিলাম তিনশ'জন লোক। আমরা খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছিলাম। ওর চোখের মণি হতে 'রাওগান' তেল বের করে আমরা আমাদের কলসগুলো ভর্তি করেছিলাম। এতো বড় বড় টুকরা আমরা কেটেছিলাম যে, ঐগুলোকে গরু বলে মনে হচ্ছিল। ওর পাঁজরের একটি হাড় নিয়ে কামানের আকারে মাটিতে গেড়ে রেখেছিলাম। বড় বড় উট ওর মধ্য দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওর অবশিষ্ট গোশ্ত শুকিয়ে পাথেয় বানিয়েছিলাম। আমরা মদীনা পৌঁছে যখন ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করি তখন তিনি বলেনঃ "এটা ছিল ঐ আহার্য যা আল্লাহ তোমাদের জন্যেই বের করেছিলেন। তোমাদের কাছে ওর কিছু গোশ্ত আছে কি, যা আমাকে খাওয়াতে পার?" আমরা তখন তাঁর কাছে তুহ্ফা পাঠালাম এবং তিনি তা ভক্ষণ করলেন।

ইমাম মালিক (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং অল্প পানি সঙ্গে রাখতে পারি। যদি আমরা ঐ পানিতে অযু করি তবে পিপাসার্ত থেকে যাই। সুতরাং আমরা সমুদ্রের পানিতে অযু করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত (মাছও) হালাল।"[১]

কোন কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, সমস্ত সামুদ্রিক জীব খাওয়া যেতে পারে। কোন জীবই এর বহির্ভূত নয়। তবে কেউ কেউ ব্যাঙকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন এবং এটা ছাড়া সবগুলোকেই হালাল বলেছেন। কেননা, ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) এবং ইমাম

১. এ হাদীসটি ইমাম মালিক (রঃ) ও আসহাবুস্ সুনান বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

নাসাঈ (রঃ) আবূ আবদির রহমান ইবনে উসমান তাইমী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাঙকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ "তার ডাক বা শব্দ হচ্ছে আল্লাহর তাসবীহ।" অন্যান্যগণ বলেন যে, মাছ খাওয়া যাবে, কিন্তু ব্যাঙ খাওয়া যাবে না। এই দু'টো ছাড়া অন্যান্যগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। স্থলভাগের যেসব জন্তুর গোশ্ত হালাল ঐগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত সামুদ্রিক জন্তুও হালাল। পক্ষান্তরে স্থলভাগের যেসব জন্তুর গোশ্ত হালাল নয় ঐগুলোর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত সামুদ্রিক জন্তুও হালাল নয়। এসব মতভেদ হচ্ছে ইমাম শাফিই (রঃ)-এর মাযহাবের উপর ভিত্তি করে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, সমুদ্রের যে মাছ মরে যাবে সেটা খাওয়া হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ বলেছেন। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "তোমরা সমুদ্রে যা শিকার কর এবং তা জীবিত থাকার পর মারা যায় ওটা খাও। আর যে মৃত মাছকে ঢেউ বয়ে এনে তীরে ফেলে দেয় তা খেয়ো না।" আসহাবে মালিক (রঃ), শাফিঈ (রঃ) এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতে হাদীসে আমবারের মাধ্যমে এবং "সমুদ্রের পানি পবিত্র ও তার মৃতও হালাল" -এ হাদীসের মাধ্যমে জমহূর দলীল গ্রহণ করেছেন। এ জন্যে তাঁরা এরূপ মাছকেও খাওয়া জায়েয বলে থাকেন। ইমাম শাফিঈ (রঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাদের জন্যে দু'টি মৃত জন্তু ও দু'টি রক্ত হালাল। মৃত জন্তু দু'টি হচ্ছে মাছ ও ফড়িং এবং দু'টি রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।"[১]

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا অর্থাৎ ইহরামের অবস্থায় তোমাদের জন্যে স্থলচর শিকার ধরা হারাম। যদি তোমরা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ কর তবে তোমরা গুনাহ্গারও হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর যদি ভুলবশতঃ কর তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর তোমরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু ঐ শিকার খাওয়া তোমাদের জন্যে হারাম হবে। কেননা, ওটা মৃতেরই অনুরূপ। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ)-এর একটা উক্তিও এটাই যে, মুহরিম ও গায়ের মুহরিম সবারই জন্যে ওটা খাওয়া হারাম। সুতরাং যদি শিকারী ওর থেকে কিছু অংশ খেয়ে নেয় তবে কি তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, হ্যাঁ, তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আলেমদের একটি দলের

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), দারেকুতনী (রঃ) এবং বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মাযহাব এটাই। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তার উপর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। মালিক ইবনে আনাস (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। আবূ উমার ইবনে আবদুল বার (রঃ) বলেন যে, ব্যভিচারীর উপর হদ লাগাবার পূর্বে সে বারবার ব্যভিচার করে থাকলেও তো তার উপর একটি হদই ওয়াজিব হয়ে থাকে। জমহূরের মাযহাবও এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, স্বীয় শিকারের গোশ্ত খেয়ে নিয়ে তাকে মূল্য প্রদান করতে হবে, এর চেয়ে বেশী কিছু দিতে হবে না। যদি গায়ের মুহরিম শিকার করার পর মুহরিমের নিকট হাদীয়া পাঠায় তবে কারও কারও মতে ওটা মুহরিমের জন্যে সাধারণভাবেই জায়েয। সে তারই জন্যে শিকার করে থাক আর না থাক এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, গায়ের মুহরিম ব্যক্তি যে শিকার করে থাকে, মুহরিম ব্যক্তি ওর গোশ্ত খেতে পারে কি? তখন তিনি ফতওয়া দেন যে, হ্যাঁ, খেতে পারে। তারপর তিনি হযরত উমার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ওটা অবহিত করেন। তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "যদি তুমি এর বিপরীত ফতওয়া দিতে তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম।" কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ এ গোশ্ত ভক্ষণ করা মুহরিমের জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলেন। কেননা حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -এ আয়াতটি عَامٌ বা সাধারণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশ্ত ভক্ষণ পছন্দ করতেন এবং বলতেন যে, ওটা مُبْهَمٌ বা সন্দেহযুক্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا -এ কথা বলেছেন। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বাবস্থায় মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশ্ত ভক্ষণ মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন।[১] হযরত আলীও (রাঃ) সর্বাবস্থায় মুহরিমের জন্যে শিকারের গোশ্ত ভক্ষণ মাকরূহ জানতেন। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং জমহূর বলেন যে, গায়ের মুহরিম যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করে তবে মুহরিমের জন্যে তা খাওয়া জায়েয নয়। কেননা, সা'ব ইবনে জাসামাহ্ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বলেন ঃ "আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি একমাত্র এই কারণে যে, আমি ইহরামের অবস্থায় রয়েছি।"[২] এর কারণ ছিল এই যে,

১. তাউস (রঃ) ও জাবির ইবনে যায়েদও (রঃ) এরূপই মনে করতেন এবং সাওরীও ঐদিকেই গিয়েছেন।
২. এ হাদীসটি বহু শব্দে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারণায় ঐ শিকার তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল। সেই জন্যেই তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। সুতরাং যদি কোন শিকার মুহরিমের উদ্দেশ্যে করা না হয় তবে মুহরিমের জন্যে ওটা খাওয়া জায়েয হবে। কেননা, আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন। সেই সময় তিনি মুহরিম ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা মুহরিম ছিলেন। তাই তাঁরা ওটা ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকলেন। ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "তোমাদের কেউ কি শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছিল বা শিকারকে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ "না।" তখন তিনি বললেনঃ "তাহলে তোমরা খাও।" আর স্বয়ং তিনিও খেলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বহু শব্দে বর্ণিত আছে।

১০০। তুমি বলে দাও– পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে, অতএব হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেন তোমরা (পূর্ণ) সফলকাম হও।

١٠٠- قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ع

১০১। হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয়, তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর, তবে তোমাদের জন্যে প্রকাশ করে দেয়া হবে, অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু।

١٠١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

১০২। এরূপ বিষয় তোমাদের পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞেস করেছিল, অতঃপর ঐ সব বিষয়ের হক তারা আদায় করেনি।	١٠٢- قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِيْنَ ○

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি মানুষকে বলে দাও–হে মানবমণ্ডলী! অপবিত্র বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। তোমরা জেনে রেখো যে, উপকারী পবিত্র জিনিস অল্প হলেও তা সেই অধিক হারাম বস্তু হতে উত্তম যা তোমাদের ক্ষতি সাধন করে থাকে।[১] যেমন হাদীসে রয়েছেঃ "অল্প ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে।" হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সা'লাবা ইবনে হাতিব আনসারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে প্রচুর মাল দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "যে অল্প মালের তুমি শুকরিয়া আদায় করে থাক তা ঐ প্রচুর মাল হতে উত্তম যার উপর তুমি শুকরিয়া আদায় কর না।" তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِي الْاَلْبَابِ অর্থাৎ "হে জ্ঞানী লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হারাম থেকে দূরে থাক এবং হালালের উপরেই তুষ্ট থাক, তাহলে, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে।"

মহান আল্লাহ্ এরপর বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে অপকারী ও ক্ষতিকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা, যদি ঐ বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেয়া হয় তবে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে। যেমন হাদীসে এসেছে

১. ওয়াহেদী তাখরীজ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদ হারাম হওয়ার বর্ণনা দিলেন তখন একজন বেদুঈন বললোঃ "আমি মদের ব্যবসা করতাম। তা থেকে অমি কিছু পৃথক করে রেখেছি। সেটা যদি আমি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করি তবে তাতে কোন উপকার হবে কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।" তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক قُلْ لَّا يَسْتَوِي -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, যেমন 'লুবাব' গ্রন্থে রয়েছে।

যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কেউ যেন আমার কাছে কারও কোন সংবাদ নিয়ে না আসে। আমি চাই যে, আমি তোমাদের সামনে বেরিয়ে আসি এবং তোমাদের সম্পর্কে আমার অন্তর সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার থাকে।" সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা এমন এক খুতবা দেন যা আমি ওর পূর্বে কখনও শুনিনি। ঐ খুত্বায় তিনি বলেনঃ "আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী।" একথা শুনে সাহাবীগণ মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করেন। একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "আমার পিতা কে ছিলেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ অমুক। তখন لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাইরে বের হন। সে সময় ক্রোধে তাঁর চেহারা মোবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। ঐ অবস্থায় তিনি মিম্বরে উপবেশন করেন। একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন– আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে? তিনি উত্তরে বলেনঃ "জাহান্নামে।" আর একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে– আমার পিতা কে? তিনি বলেনঃ "তোমার পিতা হচ্ছে আবূ হুযাফাহ্।" তখন হযরত উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "আমরা এতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম, মুহাম্মাদ (সঃ) আমাদের নবী এবং কুরআন আমাদের ইমাম। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সবেমাত্র আমরা অজ্ঞতা ও শিরকের যুগ অতিক্রম করেছি। আমাদের মৃত বাপ-দাদারা কোথায় আছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং সেই সময় يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে (মাঝে মাঝে) কৌতুক করেও এসব কথা জিজ্ঞেস করতো। কেউ বলতোঃ "আমার পিতা কে?" আবার কেউ বলতোঃ "আমার হারানো উটনিটি কোথায় আছে?" তখন তাদেরকে এসব প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা কতই না উত্তম! তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেনঃ "তোমাদের কেউ যেন কারও কোন কথা আমার নিকট না পৌঁছায়। কারণ আমি তোমাদের সামনে সরলমনা রূপে বের হওয়া পছন্দ করি (অর্থাৎ তোমাদের কোন দোষ আমার কাছে ধরা না পড়ুক এটাই আমি ভালবাসি)।"

وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদি তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞেস কর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা

হয়েছে, তবে আল্লাহ ওটা তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে দেবেন, তখন তোমরা কি করবে? আর ওটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন عَفَا اللّٰهُ عَنۡهَا। অর্থাৎ পূর্বে তোমাদের দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। কাজেই তোমরা নতুনভাবে কোন কিছু প্রশ্ন করো না। নতুবা ঐ প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের উপর কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা নেমে আসবে। আবার ওটা হবে নিজের হাতে বিপদ ডেকে আনা। হাদীসে এসেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার প্রশ্ন করার ফলে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে গেছে এবং জনগণের উপর সংকীর্ণতা নেমে এসেছে। হ্যাঁ, তবে যদি কুরআনের কোন কথা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা তা বুঝবার প্রয়োজনীতা অনুভব কর তাহলে জিজ্ঞেস কর, আমি বর্ণনা করে দেবো। কেননা, হুকুম পালনের জন্যে তোমাদের ওটা জানবার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যদি তাঁর কিতাবে কোনটার উল্লেখ না থাকে তবে সেটা আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ঐ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে নীরব থাক, যেমন তিনি (আল্লাহ) ওটা বর্ণনা না করে নীরব রয়েছেন। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি যা বর্ণনা করিনি তা অবতীর্ণ অবস্থাতেই থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা অধিক প্রশ্ন করা ও তাদের নবীদের হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।" সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ যেগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো অতিক্রম করো না, কতগুলো জিনিস তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হালাল মনে করো না এবং তোমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে কতগুলো বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সুতরাং সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করো না।"

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ قَدۡ سَاَلَهَا قَوۡمٌ مِّنۡ قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ اَصۡبَحُوۡا بِهَا كٰفِرِيۡنَ অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ নিষেধকৃত মাসআলাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হলে তারা ওগুলোর উপর ঈমান আনেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ, তারা হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেনি, বরং বিদ্রূপ ও হঠকারিতা করেই প্রশ্ন করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন– "হে আমার কওম! তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করা হয়েছে।" তখন বানী আসাদ গোত্রের একটি লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো–হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রত্যেক বছরেই কি (হজ্ব করা ফরয করা হয়েছে)। এ কথা শুনে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভীষণ রাগান্বিত হন এবং বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি যদি হ্যাঁ বলি তবে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফরয হয়ে যাবে। আর তা যদি (প্রত্যেক বছরের জন্যেই) ওয়াজিব হয়ে যায় তবে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না এবং কুফরী করবে। সুতরাং আমি তোমাদের জন্যে যা বর্ণনা করতে ছেড়ে দেই তা তোমরা ছেড়ে দাও। যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ করি তোমরা তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাক।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ কথার সমর্থনে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "খ্রীষ্টানরা যেমন সওয়াল করেছিল তোমরা ঐ রূপ সওয়াল করা থেকে বিরত থাক। তারা খাদ্য যাচ্ঞা করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুফরী করেছিল, মায়িদাহ্ বা আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাদ্যের মর্যাদা দেয়নি। তোমরা নিজেরা প্রশ্ন না করে স্বয়ং আমার বলে দেয়ার অপেক্ষা কর। তোমাদের প্রশ্ন ছাড়াই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় কুরআনে আয়াত নাযিল হয়ে যাবে।"

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, তারা মু'জিযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতো যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বাগ-বাগিচা ও নদ-নদী যাচ্ঞা করতো এবং বলতোঃ "সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়কে আমাদের জন্যে সোনা বানিয়ে দিন।" যেমন ইয়াহূদীরা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিল– "হে মূসা (আঃ)! আমাদের উপর আকাশ হতে কিতাব অবতীর্ণ করুন।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ অর্থাৎ "যখনই আমি তাদের চাওয়া অনুযায়ী মু'জিযা পাঠিয়েছি তখন পূর্ববর্তী লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।" (১৭ঃ ৫৯) আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ "তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলে যে, যদি তাদের কাছে মু'জিযা এসে যায় তবে অবশ্যই তারা ঈমান আনবে। (হে নবী সঃ) তুমি বলে দাও যে, মু'জিযাসমূহ আল্লাহর কাছেই রয়েছে, তোমরা বুঝছনা যে, মু'জিযা তাদের কাছে আসলেও তারা ঈমান আনবে না।"

১০৩। আল্লাহ না বাহীরার প্রচলন করেছেন, না সায়েবার, না ওয়াসীলার এবং না হামীর; কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখে না।

١٠٣- مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১০৪। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর অবতারিত বিধানসমূহের দিকে আস এবং আস রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে– আমাদের জন্যে ওটাই যথেষ্ট যার উপর নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি; যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা না কোন জ্ঞান রাখতো, আর না হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল; তবুও কি (ওটা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে)?

١٠٤- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ○

ইমাম বুখারী (রঃ) ইবনে শিহাব (রঃ) ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রঃ)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, 'বাহীরা' ঐ জন্তুকে বলা হতো যার দুধ মানুষ দোহন করতো না এবং বলতো যে, এটা প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ওর দুধ কেউ পানও করতো না। 'সায়েবা' ঐ জন্তুকে বলা হতো যাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হতো। না ওর উপর কোন বোঝা চাপানো হতো, না ওকে সোয়ারী রূপে ব্যবহার করা হতো। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "আমি আমর ইবনে খুযাঈকে দেখেছি যে, তাকে পেটের ভরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সেই সর্বপ্রথম জন্তুকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল।" 'ওয়াসিলা' ঐ উষ্ট্রীকে বলা হতো যা প্রথমবার একটা নর বাচ্চা প্রসব করতো, তারপর পর্যায়ক্রমে দু'টো মাদী বাচ্চা প্রসব করতো। ঐ ধরনের উষ্ট্রীকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। আর 'হামী' ঐ ষাঁড় উটকে বলা হতো যার নসলে কয়েকটা বাচ্চা জন্মলাভ করার পর যখন ওর নসল খুব বৃদ্ধি পেতো তখন ওর দ্বারা বোঝা বহনের কাজ করা হতো না এবং ওকে সওয়ারী হিসেবেও ব্যবহার করা হতো না, বরং মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হতো। আর ওর নাম তারা 'হামী' রাখতো।

ইমাম বুখারী (রঃ) যুহরী (রঃ), উরওয়া (রঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মাধ্যম দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "আমি জাহান্নামকে দেখেছি যে, এক আগুন অন্য আগুনকে খেতে আছে, আর আমরকে ওর মধ্যে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই সর্বপ্রথম 'সায়েবা'র প্রথা চালু

করেছিল।" ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সায়েবার প্রথা চালু করেছিল এবং প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। সে হচ্ছে আবূ খুযাআ আমর ইবনে আমির। আমি তাকে পেটের ভরে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি।" আবদুর রাযযাক (রঃ) যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বপ্রথম সায়েবার প্রথা কে চালু করেছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে পরিবর্তন করেছিল তা আমি জানি।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কে?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "সে ছিল বানূ কাব গোত্রের আমর ইবনে লুহাই। আমি দেখেছি যে, তাকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তার দুর্গন্ধ অনান্য জাহান্নামবাসীদেরকে কষ্ট দিচ্ছে।" 'বাহীরা' বিদআতের আবিষ্কারক কে তাও আমি জানি।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে কে?" তিনি জবাব দিলেনঃ সে ছিল বানূ মুদলাজ গোত্রের একটি লোক। তার দু'টি উষ্ট্রী ছিল। সে ঐ উষ্ট্রী দু'টির কান কেটে দিয়েছিল। প্রথমে সে ঐ উষ্ট্রী দু'টির দুগ্ধ পান নিজের উপর হারাম করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর দুধ পান করতে শুরু করে। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। উষ্ট্রী দু'টি তাকে তাদের মুখ দ্বারা কর্তন করতে রয়েছে এবং খুর দ্বারা দলিত করতে আছে। সেই হচ্ছে লুহাই ইবনে কামআর পুত্র। সে খুযাআর নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জুরহুম গোত্রের পরে কা'বার মুতাওয়াল্লী তারাই হয়েছিল। তারাই সর্বপ্রথম দ্বীনে ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। হেজাযে তারাই প্রতিমাপূজার সূচনা করেছিল। জনগণকে প্রতিমাপূজার দিকে ও ওদের নৈকট্য লাভের দিকে আহ্বানকারী তারাই ছিল। জন্তুসমূহের ব্যাপারে অজ্ঞতার যুগে সর্বপ্রথম হেজাযে বিদআতের প্রচলনকারী ছিল তারাই। যেমন মহান আল্লাহ্ সূরায়ে আনআমে এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا

অর্থাৎ "ক্ষেতে উৎপাদিত শস্যের বা চতুষ্পদ জন্তুর মাত্র একটা অংশ তারা আল্লাহর নামে মনে করতো এবং অবশিষ্টগুলো প্রতিমার নামে মনে করতো।" (৬ঃ ১৩৭)

'বাহীরা' সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ঐ উষ্ট্রী যে পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করেছে। পঞ্চমবার সে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তাকে যবেহ করতো। অতঃপর পুরুষ লোকেরা ওর গোশ্ত ভক্ষণ করতো, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ওর গোশ্ত খেতো না। আর ওটা মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তারা ওর

কান কেটে নিতো এবং বলতো, "এটা হচ্ছে বাহীরা।" সুদ্দী (রঃ) এবং অন্যান্যগণ প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। 'সায়েবা' সম্পর্কে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটা ঐ প্রকারের বকরী যে প্রকারের সংজ্ঞা 'বাহীরা' সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, যখন ওটা ছ'বার বাচ্চা প্রসব করতো তখন পর্যন্ত ওর অবস্থা একইরূপ থাকতো। অতঃপর ওটা একটি বা দু'টি নর বাচ্চা প্রসব করতো তখন তারা ওকে যবেহ করতো এবং পুরুষ লোকেরাই শুধু ওর গোশ্ত ভক্ষণ করতো, স্ত্রীলোকেরা ভক্ষণ করতো না। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, 'সায়েবা' ঐ উষ্ট্রীকে বলা হতো যে, যখন সে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করতো তখন তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হতো। তাকে সওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হতো না, তার লোম কাটা হতো না এবং তার দুধও দোহন করা হতো না। কিন্তু অতিথি আসলে তাকে ঐ উষ্ট্রীর দুগ্ধ পান করানো যেতো। আবূ রাওক (রঃ) বলেন যে, 'সায়েবা' ঐ উষ্ট্রী বা ছাগল ইত্যাদিকে বলা হতো যে, মানুষ যখন কোন কাজে বের হতো এবং ঐ কাজ সমাধা হয়ে যেতো তখন ঐ জন্তুকে 'সায়েবা' বানানো হতো এবং মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হতো, ওর বাচ্চাগুলোকে মূর্তির নামে উৎসর্গীকৃত মনে করা হতো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, "কোন লোক যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বের হতো, কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতো, অথবা তার মালধন অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেতো, তখন সে নিজের কিছু মাল প্রতিমার নামে উৎসর্গ করতো। এই মালে বা জন্তুতে কেউ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো।

'ওয়াসীলা' সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল ঐ ছাগী, যে সাতবার বাচ্চা প্রসব করতো এবং সপ্তমবারে সে মৃত নর বাচ্চা প্রসব করলে ঐ বকরীর গোশ্তে শুধু পুরুষেরাই শরীক হতে পারতো, স্ত্রীলোকেরা শরীক হতে পারতো না। কিন্তু সপ্তমবারে ঐ বকরীটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে ওকে তারা জীবিতাবস্থাতেই রাখতো। আর একই সাথে নর ও মাদী বাচ্চা প্রসব করলে দু'টোকেই জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হতো এবং তারা বলতো–মাদীটি নরটিকেও ওয়াসীলা বানিয়ে দিয়েছে। এখন এটাও আমাদের জন্যে হারাম। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, 'ওয়াসীলা' ঐ বকরীকে বলা হতো যা পাঁচবারে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করতো অর্থাৎ প্রতিবার দু'টি করে মাদী বাচ্চা প্রসব করতো। প্রতিবারের বাচ্চাদ্বয়কে 'ওয়াসীলা' রূপে ছেড়ে দেয়া হতো। এরপর নর অথবা মাদী যে বাচ্চাই প্রসব করুক না কেন, শুধু পুরুষদেরকেই ওর হকদার মনে করা হতো, স্ত্রীদেরকে নয়। কিন্তু মৃত বাচ্চা প্রসব করলে পুরুষলোক ও স্ত্রীলোক সবাই অংশীদার হতো।

'হামী' সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোন নরের মাধ্যমে দশটি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তাকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং ওটাকেই 'হামী' বলা হতো। ওর উপর বোঝা চাপানো হতো না এবং ওর লোম কাটা হতো না। যে কোন লোকের ক্ষেতের ফসল সে খেতে পারতো এবং যে কোন প্রস্রবণ থেকে ঐ জন্তুটি পানি পান করতে পারতো। কেউই ওকে বাধা দিতো না। এ আয়াতের তাফসীরে এগুলো ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর–

وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ

এ কথার ভাবার্থ এই যে, কাফিররা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ এগুলোকে শরীয়তের কাজরূপে নির্ধারণ করেননি এবং এগুলো তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়ও নয়। এটা মুশরিকদের আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা নিজেরাই ঐগুলোকে শরীয়তের পালনীয় কাজ বলে বরণ করে নিয়েছে। আর ওটাকেই তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করেছে। অথচ ওটা কখনও তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না। বরং তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়–তোমরা আল্লাহর অহীর দিকে ও তাঁর রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে–আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, এটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা কি এটা বুঝে না যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও বাতিল ও মিথ্যা রীতিনীতির উপর থাকতে পারে? তারাও হক ও সত্য থেকে দূরে ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে? সুতরাং কিরূপে তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পার? সত্য ব্যাপার এটাই যে, একমাত্র ভ্রান্ত ও মূর্খ লোকেরাই এরূপ মন্তব্য করতে পারে।

১০৫। হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধন করার) চিন্তা কর, যখন তোমরা দ্বীনের পথে চলছো, তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই; তোমরা সবাই আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তোমরা যা কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

١٠٥- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় এবং সৎকার্য সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আর তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, দুনিয়ার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হলেও তাদের কোনই ক্ষতি হবে না। এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যখন বান্দা হারাম ও হালালের ব্যাপারে আমার নির্দেশ মেনে চলবে তখন যে যতই পথভ্রষ্ট হয়ে যাক না কেন তার কোনই ক্ষতি হবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃত ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করবেন। যার কাজ ভাল হবে তাকে ভাল বিনিময় প্রদান করা হবে এবং যার কাজ মন্দ হবে তাকে মন্দ বিনিময় দেয়া হবে। এ আয়াত দ্বারা এ দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে না যে, ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করণ জরুরী নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতটি পাঠ কর বটে, কিন্তু ওটাকে ওর নিজ স্থানে রাখছো না। আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি–'মানুষ যখন কোন পাপের কাজ দেখে, অতঃপর ওর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতঃ তার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার না হয়, তখন হতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ সাধারণভাবে শাস্তি আনয়ন করবেন (সবাই সেই শাস্তির শিকার হবে।'[১] ইমাম তিরমিযী (রঃ) আবূ উমাইয়া শা'বানী (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি আবূ সা'লাবা খুশানী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ আয়াতের কি ভাবার্থ গ্রহণ করে থাকেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ কোন আয়াত? আমি বললাম,

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا عَلَيكُمْ اَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

এ আয়াতটি। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! এ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিকেই আপনি জিজ্ঞেস করেছেন। আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ 'তোমরা নিজ নিজ পাগড়ি সামলিয়ে নেয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করণের কাজ অব্যাহত রাখো। তোমাদেরকে এ কাজ ঐ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে যে পর্যন্ত মানুষ সংকীর্ণমনা ও নিরুৎসাহী থাকে, যাকাত প্রদান না করে, কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কোন উপদেষ্টার উপদেশবাণী শ্রবণ না করে। যখন অবস্থা এরূপ হবে, এ সময় তাদের থেকে পৃথক থাকবে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), আসহাবুস্ সুনান এবং ইবনে মাজা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাদেরকে তাদের নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে। তোমাদের পরেই এমন এক যুগ আসবে যে, তাতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ব্যক্তি হাতে আগুন ধরে রাখার মত বিপদে পতিত হবে। ঐ সময় যে ব্যক্তি শুধু নিজেই ভাল কাজ করবে সে পঞ্চাশজন লোকের নেক আমলের সমান পুণ্য লাভ করবে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ আমাদের পঞ্চাশজন লোকের, না সেই দলের পঞ্চাশজন লোকের? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'না, না বরং তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন লোকের পুণ্যের সমান (সে পুণ্য লাভ করবে)।'

ইমাম রাযী (রঃ) আবুল আলিয়া (রঃ) ও হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর মাধ্যমে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ -এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট লোকেরা বসেছিল, এমন সময় কোন দু'টি লোকের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। তখন উপস্থিত জনতার মধ্য হতে একটি লোক বলেঃ আমি উঠে গিয়ে এদের দু'জনের মধ্যে (একটা সমঝোতা করে দেয়ার মানসে) ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার ব্রত পালন করবো। তার এ কথা শুনে তার পার্শ্ববর্তী একটি লোক বললোঃ তুমি স্ব-স্থানে বসে থাক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ বলেছেন। তার একথা শুনে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "তাকে বাধা দিয়ো না। এ আয়াতের উপর আমল করার স্থান এটা নয়। কুরআন যখন অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের কতগুলো আয়াত এমন রয়েছে, যেগুলোর তা'বীল আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর যুগে হয়ে গেছে। আর কতগুলো আয়াতের তা'বীল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন কার্যকরী হবে। যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মন ও অনুভূতি এক থাকবে, তোমাদের মধ্যে ভাঙ্গন না ধরবে, তোমরা একে অপরের ক্ষতি সাধন করা থেকে বিরত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে। কিন্তু যখন তোমাদের মন বিগড়ে যাবে, তোমাদের একতায় ভাঙ্গন ধরবে এবং তোমরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন তোমরা জনগণ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকবে।" এ আয়াতের এ তাফসীরই বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান (রঃ) এ আয়াতটি পাঠ করার পর বলেনঃ 'আল্লাহর জন্যে সমুদয় প্রশংসা যে, অতীত যুগেও মুনাফিক ছিল এবং বর্তমান যুগেও মুনাফিক রয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা মুনাফিকদের কাজকে সদা খারাপ মনে করে থাকে।' হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) বলেনঃ "যখন তুমি ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে তখন তুমি হিদায়াতের পথে রয়েছো বলে পথভ্রষ্ট লোকদের পথভ্রষ্টতা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।"

১০৬। হে মুমিনগণ! তোমাদের পরস্পরের (বিষয়াদির) মধ্যে দু'জন লোক ওসী থাকা সঙ্গত, যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয় (অর্থাৎ) অসিয়ত করার সময়, (এবং) এ দু'ব্যক্তি এরূপ হবে যে দ্বীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু'জন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে ওসীদ্বয়কে নামাযের (জামাআতের) পর রুখে নাও, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে–আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করবো না, যদি আত্মীয়ও হয়; আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করবো না (যদি এরূপ করি, তবে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হবো।

١٠٦- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ
اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ
اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ
مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ
مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا
مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ
ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا
لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○

১০৭। অতঃপর যদি জানা যায় যে, ওসীদ্বয় কোন পাপে জড়িত হয়ে পড়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি সে স্থানে দাঁড়াবে যে স্থানে

١٠٧- فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا
اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ
مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ

عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

ওসীদ্বয় দাঁড়িয়ে ছিল, অতঃপর উভয়ে (এরূপে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে-নিশ্চয়ই আমাদের এ শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, (যদি করি, তবে) এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

١٠٨- ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ (ع ١٤)

১০৮। এটাই এ বিষয়ে অতীব সহজ পন্থা যে তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেয়, অথবা এ ভয় করে যে, তারা শপথ গ্রহণ করার পর (পুনঃ) শপথগুলোকে ফিরানো হবে; আর আল্লাহকে ভয় কর এবং (বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে পথ দেখাবেন না।

এ আয়াতে কারীমা স্বাভাবিক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। তারকীবে নাহবীর দিক দিয়ে اِثْنَانِ শব্দটি خَبَرٌ বা বিধেয়। আর شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ বাক্যের মধ্যে مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ বাক্যটি شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ شَهَادَةُ اِثْنَانِ এরূপ ছিল। দ্বিতীয় شَهَادَةُ শব্দটি مُضَافٌ রূপে ছিল যা লোপ করা হয়েছে এবং مُضَافٌ اِلَيْهِ অর্থাৎ اِثْنَانِ শব্দটিকেই ওর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, يَشْهَدُ اِثْنَانِ এরূপ মনে করতে হবে। এ অবস্থায় ذَوَا عَدْلٍ শব্দটি اِثْنَانِ শব্দের صِفَتٌ বা বিশেষণ হবে। عَدْلَانِ مِنْكُمْ দ্বারা مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, كُمْ দ্বারা অসিয়ত কারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর مِنْ غَيْرِكُمْ দ্বারা مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ বা আহলে কিতাবদেরকে বুঝানো হয়েছে।[১] অর্থাৎ অসিয়তকারীর

---

১. এটা বলেছেন ইবনে জারীর (রঃ)।

গোত্রের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী এবং আর দু'জন সাক্ষী হবে অন্য গোত্রের মধ্য হতে। ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ -এর ভাবার্থ হচ্ছে–যখন তোমরা সফরে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমরা মুসলমানদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখবে। আর মুসলমান পাওয়া না গেলে অমুসলিম হলেও চলবে। এখানে এ কথা বের হচ্ছে যে, সফরে অসিয়তের সময় মুসলমান বিদ্যমান না থাকলে যিম্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে। শুরাইহ্ (রঃ) বলেন যে, সফর ও অসিয়তের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। আইম্মায়ে সালাসা বা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ছাড়া বাকী তিনজন ইমাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, কোন অবস্থাতেই মুসলিমের উপর অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) যিম্মীর উপর যিম্মীর সাক্ষ্য বৈধ বলেছেন।

ইমাম যুহরী (রঃ)-এর উক্তি নকল করে ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, বাসস্থানে বা সফরে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়াই সুন্নাত তরীকা। সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার শুধু মুসলমানেরই রয়েছে। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন একটি লোক মারা গিয়েছিল এবং সেখানে সে সময় কোন মুসলমান বিদ্যমান ছিল না। ওটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ঐ সময় সমস্ত শহর ছিল অমুসলিমদের দখলে এবং সব লোকই ছিল কাফির। উত্তরাধিকারের কোন নিয়ম-কানুনও তখন চালু ছিল না। ওটা অসিয়ত হিসেবে বন্টিত হতো। তারপর অসিয়ত মানসূখ হয়ে যায় এবং ফারায়েয (উত্তরাধিকারীদের অংশ) ফরয করা হয়। অতঃপর লোকেরা উত্তরাধিকারের নিয়ম-কানুনের উপর আমল করতে শুরু করে। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ দ্বারা দু'জন ওসীকে বুঝানো হয়েছে, কি দু'জন সাক্ষীকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, যদি লোক সফরে থাকে এবং তার সাথে মালধন থাকে, এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তবে মুসলমানদের মধ্যে দু'টি লোককে পেলে সে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের কাছে সমর্পণ করবে এবং দু'জন মুসলমানকে ওর উপর সাক্ষীও রাখবে। এটা ছিল ওসী নিযুক্ত করার অবস্থা। مِنْ غَيْرِكُمْ -এর ভাবার্থ এই যে, এ দু'জন মুসলমান সাক্ষী নিযুক্ত হবে। আয়াতে কারীমার পূর্ব সম্পর্ক দ্বারা এটাই প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং যদি এ দু'জন মুসলমানের সাথে তৃতীয় কোন মুসলমান উপস্থিত না থাকে তবে

অসিয়ত ও সাক্ষ্য এ বিশেষণও এ দু'জনের মধ্যেই একত্রিত হয়ে যাবে। যেমন তামীমুদ্দারী ও আদী ইবনে বিদার কাহিনীতে সত্বরই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ 'তোমরা ঐ দু'জনকে নামাযের পর রুখে নাও।' ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসর নামায বুঝানো হয়েছে। ইমাম যুহরী (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঐ দু'জন মুসলমানের মাযহাবী নামায। ভাবার্থ এই যে, এ দু'জন সাক্ষী নামাযের পর একত্রিত হবে যাতে বেশী লোকের সমাবেশে এ সাক্ষ্যদান কার্য সম্পন্ন হতে পারে। فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের সময় আল্লাহর নামে শপথ করবে। اِنِ ارْتَبْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, তারা দু'জন ভুল বর্ণনা দেবে বা খিয়ানত করবে, তবে ঐ সাক্ষীদ্বয়কে সেই সময় আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবেঃ আমরা মিথ্যা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য অর্থ উপার্জন করবো না, যদিও আমাদের এ শপথের কারণে আমাদের নিকট আত্মীয়েরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ অর্থাৎ আমরা আল্লাহর (আদিষ্ট) সাক্ষ্যকে গোপন করবো না। সাক্ষ্যদান কার্যের গুরুত্ব বুঝাবার জন্যেই সাক্ষ্যের সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে লাগানো হয়েছে।

اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ অর্থাৎ যদি আমরা সাক্ষ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন করি অথবা সম্পূর্ণরূপে তা গোপন করি তবে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا অর্থাৎ যদি ঐ দু'জন সাক্ষী ও ওসীর ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা খিয়ানত করেছে এবং মৃত ব্যক্তির মাল উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছাতে গিয়ে কিছু আত্মসাৎ করেছে তবে যাদের প্রাপ্য নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী পূর্ববর্তী স্বাক্ষীদ্বয়ের স্থানে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ যখন সঠিক সংবাদ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী দু'জন সাক্ষী খিয়ানত করেছে, তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে দু'জন অতি নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী দাঁড়িয়ে যাবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবেঃ "আমাদের সাক্ষ্য তাদের (পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয়ের) সাক্ষ্যের তুলনায় বিশুদ্ধতর। তারা দু'জন বাস্তবিকই খিয়ানত করেছে এবং এ দোষারোপ করাতে আমরা মোটেই বাড়াবাড়ি করছি না। যদি আমরা মিথ্যা অপবাদ দেই তবে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।" এটা যেন উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে শপথ। যেমন হত্যাকারীদের পক্ষ হতে বেঈমানী সাব্যস্ত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা শপথ করে থাকে। এটা আহকামের বাবুল কাসামাতে স্থিরীকৃত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী সাহম গোত্রের একটি লোক তামীমুদ্দারী ও আদী ইবনে বিদার সঙ্গে সফরে বেরিয়েছিল। অতঃপর সাহমী লোকটি এমন এক জায়গায় মৃত্যুবরণ করে যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। যখন তারা দু'জন তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে তখন সাহমীর পরিবারের লোকেরা রৌপ্য নির্মিত একটি পেয়ালা অনুপস্থিত দেখে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের দু'জনের শপথ গ্রহণ করেন। এরপর পেয়ালাটি মক্কায় পাওয়া যায়। তাদেরকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা বলেঃ "আমরা এটা তামীম ও আদীর নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছি।" তারপর সাহমীর অভিভাবকদের মধ্য হতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং শপথ করে বলেঃ "নিশ্চয়ই আমাদের দু'জনের শপথ এদের দু'জনের শপথ অপেক্ষা বেশী সত্য। নিশ্চয়ই পেয়ালাটি আমাদের সঙ্গীরই বটে।" তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১] আবূ জাফর ইবনে জারীর (রঃ) শা'বী (রঃ) হতে যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তা এ ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণ করে। ঘটনাটি এই যে, বিদেশে একজন মুসলমানের মৃত্যু ঘটে। ওসী নিযুক্ত করার মত কোন মুসলমান সেখানে ছিল না। তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত লোকটি আহলে কিতাবের মধ্য হতে দু'জন লোককে ওসী নিযুক্ত করে। ঐ লোক দু'টি কুফায় হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয় এবং মৃত লোকটির পরিত্যক্ত সম্পদ তাঁর নিকট পেশ করে। এ দেখে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেনঃ "এরূপই একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় ঘটেছিল। এখন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনা।" সুতরাং আসরের নামাযের পর লোক দু'টিকে শপথ করানো হয়। তারা শপথ করে বলেঃ "আমরা না খিয়ানত করেছি, না মিথ্যা বলছি, না কিছু আত্মসাৎ করেছি, বরং এটাই হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সম্পদ।" তখন তাদের শপথকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয় এবং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ীই হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) ফায়সালা করেন। নবী (সঃ)-এর যুগে 'এরূপই ঘটনা' দ্বারা তামীম ও আদীর ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তামীমুদ্দারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হচ্ছে নবম হিজরীর। আর আশআরী (রাঃ) সম্পর্কীয় ঘটনাটি হচ্ছে অন্য ঘটনা। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ আয়াতে নির্দেশ রয়েছে যে, মরণশয্যায় শায়িত ব্যক্তি দু'জন ওসী নিযুক্ত করবে এবং দু'জন মুসলমানকে সাক্ষী রাখবে। এটা হচ্ছে বাড়ীতে অবস্থানরত সময়ের মাসআলা।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) তাখরীজ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ـ

এ আয়াতের উপর ভিত্তি করেই একথা বলা হচ্ছে। আর সফরের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ যদি তোমরা সফরে থাক এবং সেই সময় তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, আর কোন মুসলমান সেখানে উপস্থিত না থাকে তবে সে যেন ইয়াহূদী, নাসারা যা মাজুসীদের মধ্যে হতে দু'জন লোককে ওসী নিযুক্ত করে এবং পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের নিকট সমর্পণ করে। এখন যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা ঐ ওসীদ্বয়কে স্বীকার করে নেয় তবে তো ভালোই। নচেৎ বাদশাহর কাছে মোকাদ্দমা পেশ করতে হবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে–

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ

অর্থাৎ যদি তাদের সাক্ষ্যের সত্যতায় তোমাদের সন্দেহ হয় তবে নামাযের পর তাদেরকে শপথ করিয়ে নাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন খ্রীষ্টান সাক্ষীদ্বয়কে অস্বীকার করেছিল এবং তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিল ও ধমকিয়ে ছিল। তখন আবূ মূসা (রাঃ) ঐ স্বাক্ষীদ্বয়কে আসরের নামাযের পর শপথ করিয়েছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম– তাদের কাছে আমাদের নামাযের মর্যাদা কি আছে? তাদেরকে তো তাদের নামাযের শপথ করানো উচিত। সুতরাং তারা দু'জন তাদের মাযহাবের নিময় অনুযায়ী নামায পড়ার পর শপথ করে বললোঃ "আমরা সামান্য শপথের জন্য আমাদের কসমকে বিক্রি করবো না, নতুবা আমরা পাপী হয়ে যাবো। তোমাদের সঙ্গী এ অসিয়তই করেছিল এবং এটাই তার পরিত্যক্ত সম্পদ।" শপথ করার পূর্বে ইমাম তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন– "যদি তোমরা গোপন করে রাখো বা খিয়ানত কর তবে স্বীয় কওমের নিকট তোমরা অপদস্ত হবে এবং এরপর আর কখনও তোমাদের সাক্ষ্য কবূল করা হবে না। আর তোমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে।"

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا অর্থাৎ এটাই এমন এক পন্থা যে, এতে সাক্ষী ঘটনা অনুযায়ী তার সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তার এ ভয় থাকবে যে, যদি সে ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান না করে তবে মুসলমানদের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের শপথকে বাতিল করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا

অর্থাৎ যদি জানতে পারা যায় যে, তারা অবৈধ পন্থায় সত্যকে গোপন করেছে তবে তাদের স্থলে যাদের হক নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী দাঁড়িয়ে যাবে এবং তারা শপথ করে বলবে যে, কাফিরদের শপথ বাতিল এবং তারা বাড়াবাড়ি করছে না। এখন কাফিরদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়ে মৃত ব্যক্তির অলীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। অধিকাংশ আইম্মায়ে তাবেঈন, পূর্ববর্তী গুরুজন এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখের এটাই মাযহাব।

اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ অর্থাৎ এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা আল্লাহর শপথের সম্মানার্থে এবং অপদস্ত হওয়ার ভয়ে (যে মৃতের ওয়ারিসরা তাদের কসমের মাধ্যমে তাদের কসমকে রদ করে দেবে এবং তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হবে) তারা সত্য কথাই বলবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের **সমস্ত** কাজে আল্লাহকে ভয় কর এবং وَاسْمَعُوْا অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে **চল**।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ - অর্থাৎ যারা আল্লাহর আনুগত্য ও শরীয়তের অনুসরণ হতে বেরিয়ে যায় তিনি তাদেরকে সুপথ লাভের তাওফীক দেন না।

১০৯। যেদিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন—তোমরা (উম্মতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা উত্তরে বলবে—(তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

١٠٩ - يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

নবী রাসূলদেরকে যেসব কওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল কি দেয়নি সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামতের দিন কিভাবে সম্বোধন করবেন তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন—

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ -

অর্থাৎ "যাদের কাছে রাসূলদের পাঠানো হয়েছিলো তাদেরকেও আমি জিজ্ঞেস করবো এবং রাসূলদেরকেও জিজ্ঞেস করবো।" অন্যত্র বলেনঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমার প্রভুর শপথ! আমি তাদের সকলকেই তাদের আমল সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো।"(১৫ঃ ৯২) রাসূলগণ উত্তরে বলেনঃ لَا عِلْمَ لَنَا অর্থাৎ "আমাদের কিছুই জানা নেই।" সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখেই তাঁদের এ উত্তর হবে। তাঁরা সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন বলেই তাঁদের মুখ দিয়ে কোন উত্তর বের হবে না। বরং বলে ফেলবেন– "আমাদের কিছুই জানা নেই।" অতঃপর যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, তখন নিজের কওম সম্পর্কে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবেন। কিন্তু তাদের প্রথম উক্তি এরূপই হবে– "হে আল্লাহ! আমরা তো এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না। আপনি তো আলেমুল গায়েব। আপনার মোকাবিলায় আমাদের জ্ঞান থাকতে পারে?" এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ভদ্রতা হিসেবে এটা অতি উত্তম জবাবই বটে– "আপনার ব্যাপক জ্ঞানের কাছে আমাদের জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর। পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞান আভ্যন্তরীণ সংবাদও রাখে। কেননা, আপনি হচ্ছেন 'আল্লামুল গুয়ূব' বা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং আমাদের উম্মতবর্গ কি জবাব দিয়েছিল তা আপনি ভাল জানেন। কে যে কপটতামূলক আমল করেছে এবং কে বিশ্বাসমূলক কাজ করেছে এই জ্ঞান তো আমাদের নেই, বরং আপনারই আছে।"

১১০। যখন আল্লাহ বলবেন–হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর (প্রদত্ত) হয়েছে। যখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি, (এবং) তুমি মানুষের সাথে কথা বলেছো (মায়ের) কোলে এবং প্রৌঢ় বয়সেও আর যখন আমি তোমাকে কিতাবসমূহ, জ্ঞানের কথা এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল

١١٠- اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ

وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

শিক্ষা দিয়েছি, আর যখন তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি প্রস্তুত করেছিলে, অতঃপর তুমি ওতে ফুঁৎকার দিতে, যার ফলে ওটা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেতো, আর তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী নিরাময় করে দিতে; আর যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে, আর যখন আমি বানী ইসরাঈলকে (তোমাকে হত্যা করা হতে) নিবৃত্ত রেখেছি, যখন তুমি তাদের কাছে (স্বীয় নবুওয়াতের) প্রমাণাদি নিয়ে হাযির হয়েছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল–এটা (মুজিযাসমূহ) স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

١١١- وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ اٰمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ○

১১১। আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম–আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বললো, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ সমুদয় মুজিযারূপ নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেগুলো ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর উপর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে ঈসা (আঃ)! আমি যে তোমাকে নিয়ামতগুলো প্রদান করেছি সেগুলো তুমি স্মরণ কর। আমি তোমাকে পিতা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সত্তাকে আমার ক্ষমতার পরিপূর্ণতার একটা নিদর্শন করেছি। আর তোমার মায়ের উপরও ইহসান করেছি এইভাবে যে, তোমাকে তার পবিত্রতার দলীল বানিয়েছি এবং মূর্খ ও অত্যাচারী লোকেরা তার উপর যে নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়েছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করেছি। তোমাকে আমি রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছি। আমি তোমাকে তোমার শৈশবে ও যৌবনে এমনিভাবে নবী ও আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বানিয়েছি যে, তুমি দোলনা থেকেই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছো এবং তোমার মাতার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছো, আর নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করে নিয়েছো। শৈশব ও যৌবনেও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছো। পৌঢ় বয়সে কথা বলা বিস্ময়কর নয় বটে কিন্তু দোলনা থেকে কথা কতইনা বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহ পাক তোমাকে কিতাবের তা'লীম দিয়েছেন এবং মূসা (আঃ)-এর উপর অবতারিত তাওরাতের লিখা ও পড়া শিক্ষা দিয়েছেন।

وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ অর্থাৎ তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ একটি আকৃতি তৈরী করতে এবং ফুঁৎকার দিতে। তখন তা আমারই আদেশে জীবিত পাখী হয়ে উড়তে শুরু করতো।

وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ সূরায়ে আলে ইমরানে এর উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ অর্থাৎ তুমি মৃতদেরকে ডাকতে তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে কবর হতে বেরিয়ে আসতো।

وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ...... اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ হে ঈসা (আঃ)! আমার ঐ নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যে, যখন তুমি বানী ইসরাঈলের নিকট নবুওয়াতের দলীলসহ পৌঁছলে এবং তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তোমার উপর অপবাদ দিলো, তোমাকে যাদুকর বললো এবং তোমাকে হত্যা করার ও শূলি দেয়ার চেষ্টা করলো, তখন আমি তোমাকে তাদের থেকে বাঁচিয়ে নিলাম, এরপর তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিলাম। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহর এ অনুগ্রহ

তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়ার পরের ঘটনা, কিংবা এটা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। কিন্তু ভবিষ্যতকালকে অতীত কালের রূপ দ্বারা তা'বীর করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে অতীত কালের ন্যায় ভবিষ্যত কালও নিশ্চিতরূপে অনুষ্ঠিতব্য। এসব হচ্ছে অদৃশ্যের ঘটনা, যেগুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-কে অবহিত করেছেন।

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ এটাও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর জন্যে সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে অহীর অর্থ হচ্ছে অন্তরের মধ্যে কিছু ভরে দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ

অর্থাৎ 'আমি মূসা (আঃ)-এর মায়ের কাছে অহী পাঠিয়েছিলাম–মূসা (আঃ)-কে দুধ পান করাও।' (২৮ঃ৭) এরূপ ইলহামকে সর্বসম্মতভাবে অহী বলা হয়েছে। আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا

অর্থাৎ 'আমি মৌমাছির নিকট অহী পাঠিয়েছিলাম–পাহাড়সমূহে তোমাদের ঘর তৈরী কর।' (১৬ঃ ৬৮) এভাবে হাওয়ারীদের উপর আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন, তখন তারা ইলহামকৃত হুকুম মান্য করেছিল। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ তাদের উপর ইলহাম করেছিলেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে ওটা নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ভাবার্থ এও হতে পারে–আমি তোমার মাধ্যমে তাদের কাছে অহী করেছিলাম এবং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছিলাম। তখন তারা তা কবূল করে নিয়েছিল এবং বলেছিল– وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ (হে ঈসা আঃ!) আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেলাম।

১১২। (ঐ সময়টুকু স্মরণীয়) যখন হাওয়ারীরা বললো– হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার প্রতিপালক কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ করেন? ঈসা বললো– আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

١١٢- اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

١١٣- قَالُوا نُرِيدُ اَنْ نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِينَ ○

১১৩। তারা বললো–আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

١١٤- قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ○

১১৪। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) দু‘আ করলো– হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ওটা আমাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে (বর্তমান আছে) এবং যারা পরে–সকলের জন্যে একটা আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে। আর আমাদেরকে খাদ্য প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম প্রদানকারী।

١١٥- قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِينَ ○ ع

১১৫। আল্লাহ বললেন–আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবো, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে এর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দেবো না।

এখানে 'মায়িদাহ্' বা খাবারের খাঞ্চার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ জন্যই এ সূরার নাম 'মায়িদাহ্' রাখা হয়েছে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর তাঁর ইহসানের কথা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তিনি খাবারের খাঞ্চা অবতরণের জন্যে দু'আ করেছিলেন, সেই দু'আ মহান আল্লাহ কবূল করেছিলেন। এটাও ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটা মুজিযা এবং তাঁর নবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। কোন কোন ইমাম বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনা ই ীলে বর্ণিত হয়নি এবং একমাত্র মুসলমান ছাড়া খ্রীষ্টানেরাও এ সম্পর্কে অবহিত ছিল না, মুসলমানদের মাধ্যমেই তারা অবগত হয়েছে। আল্লাহ পাকের উক্তি إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল– "হে ঈসা (আঃ)! আপনার প্রভু কি আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে পারেন?" এখানে অধিকাংশ কারী يَسْتَطِيعُ পড়েছেন (অর্থাৎ আপনার প্রভু কি এতে সক্ষম?) অন্যান্য কারীরা تَسْتَطِيعُ পড়েছেন (অর্থাৎ আপনি কি এতে সক্ষম?) مَائِدَةً খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চাকে বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় এ কথা বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যেন প্রত্যহ তাদের উপর আকাশ থেকে খানাভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করেন, যা খেয়ে তারা ইবাদতের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তখন হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন– তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং এরূপ প্রার্থনা করা থেকে বিরত হও। আহার্য চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা কর। হতে পারে যে, এ জিনিসই তোমাদের জন্যে ফিৎনা ফাসাদের কারণ হয়ে যাবে। তাঁর এ কথা শুনে হাওয়ারীরা বলেছিল– "আমরা মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন। আর আমরা যখন আকাশ হতে অবতারিত খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা দেখতে পাবো তখন আমাদের মনে পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসবে। ফলে আপনার প্রতি আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং আপনি যে আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহই থাকবে না। আর আমরা নিজেরাই সাক্ষী হয়ে যাবো যে, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা বড় নিদর্শন এবং আপনার নবুওয়াত ও সত্যতার স্পষ্ট দলীল।" তখন হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন– "হে আল্লাহ! আমাদের উপর আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন! যেন ওটা আমাদের জন্যে অর্থাৎ যারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে এবং যারা পরে আসবে, সকলের জন্যেই আনন্দের বিষয় হয়।" সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'যেদিন ওটা অবতীর্ণ হবে সে দিনকে আমরা খুশীর দিন হিসাবে মর্যাদা দেবো এবং আমাদের পরবর্তী লোকেরাও ঐ দিনকে সম্মানিত দিন মনে করবে।' হযরত সুফইয়ান

সাওরী (রঃ) বলেন যে, تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا-এর ভাবার্থ হচ্ছে- 'আমরা ঐ দিনে নামায পড়বো।' কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- 'আমাদের পরবর্তীদের জন্যে এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' হযরত সালমান ফারসী (রঃ) বলেন যে, এ কথা দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন- "যেন ওটা আমাদের সবারই জন্যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায় এবং রিসালাতের সত্যতার জন্যে সুস্পষ্ট দলীল হতে পারে। আর হে আল্লাহ! যেন ওটা আপনার পূর্ণ ক্ষমতার এবং আমার প্রার্থনা কবূল হওয়ার দলীল হিসাবে প্রকাশ পায়, যাতে জনগণ আমার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারে।"

"হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ হতে আমাদের নিকট আমাদের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই উত্তম খাদ্য প্রেরণ করুন, যেহেতু আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম আহার্য প্রদানকারী।"

তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করছি। কিন্তু সাবধান!. এর পরও যদি তোমার কওম কুফরী করে এবং অবাধ্যই থেকে যায় তবে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করবো, যে শাস্তির স্বাদ বিশ্ববাসীর কেউই কখনও গ্রহণ করেনি বা করবেও না।"

মহান আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেছেন-

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) ফিরআউনের দলবলকে কঠিনতম শাস্তির মধ্যে প্রবিষ্ট কর।' (৪০ঃ ৪৬) আর এক জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেছেন-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে অবস্থান করবে।' (৪ঃ ১৪৫) ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন- "কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে। (১) মুনাফিক, (২) খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার পরও যারা কুফরী করেছিল এবং (৩) ফিরআউনের দলবল।"

হাওয়ারীদের উপর খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেনঃ "তোমরা কি ত্রিশদিন রোযা রাখতে পার? অতঃপর তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট খাঞ্চার

জন্যে প্রার্থনা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে তা প্রদান করবেন। কেননা, আমলকারীকে মহান আল্লাহ তার আমলের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।” তারা তখন তাই করলো। অতঃপর তারা বললোঃ “হে মঙ্গলের শিক্ষাদানকারী ঈসা (আঃ)! আপনি বলে থাকেন যে, আমলকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আমলের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করে থাকেন। আপনি আমাদেরকে ত্রিশটি রোযা রাখতে বলেছিলেন, আমরা তা রেখেছি। ত্রিশদিন আমরা কারও চাকরী করলে সে আমাদেরকে খেতে দেয় বা বেতন দেয়। তাহলে এখন কি আপনার প্রভু আমাদের উপর খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করবেন?” তখন হযরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ 'তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর।' হাওয়ারীরা তখন বললোঃ 'আমরা তো শুধু আমাদের মনের প্রশান্তি চাচ্ছি এবং নিজেরা বিশ্বাস করে অন্যদের সামনেও সাক্ষী হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি।' মোটকথা, শেষ পর্যন্ত আকাশ থেকে খাদ্যের খাঞ্চা অবতীর্ণ হলো, যাতে সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি ছিল। খাঞ্চাটি তাদের সামনে এসে থেমে গেলো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোকই তা খেলো। ইবনে জারীর (রঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাওয়ারীরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে বললোঃ আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তখন ফেরেশতাগণ মায়িদাহ্ বা খাঞ্চা নিয়ে অবতীর্ণ হন। ঐ খাঞ্চায় সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি ছিল। খাঞ্চাটি তাঁরা তাদের সামনে রেখে দেন। তা থেকে তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোকই ভক্ষণ করে।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন– “যে মায়েদাহ বা খাঞ্চাটি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে রুটি ও গোশ্‌ত ছিল। তাদের উপর নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন খিয়ানত না করে এবং পরবর্তী দিনের জন্যে উঠিয়ে না রাখে। কিন্তু তারা খিয়ানত করেছিল এবং জমা করে রেখেছিল। ফলে তাদের আকৃতি বিকৃত করে দিয়ে তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়েছিল।” মায়িদাহ্ সম্পর্কীয় যতগুলো হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, উক্ত মায়িদাহ বা খানাভর্তি খাঞ্চা হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগের বানী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ওটা ছিল আল্লাহর নিকট তাঁর প্রার্থনার ফল। আর এটা আল্লাহ তা'আলার قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ-এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

কোন কোন উক্তিকারী এটাও উক্তি করেছেন যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি। হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান (রঃ) বলতেন– যখন তাদেরকে فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ -এ কথা বলা হলো তখন তারা বললোঃ 'আমাদের এর প্রয়োজন নেই।' ফলে তা আর অবতীর্ণ হলো না। কিন্তু জমহূর উলামার মতে মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হয়েছিল। ইবনে জারীরও (রঃ) এই মত পোষণ করেছেন। কেননা, মহান আল্লাহর اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ -এ উক্তি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। তাঁর ওয়াদা এবং ওয়াঈদ সত্য। আর এটা সত্য বলে অনুমিতও হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। পূর্ববর্তী গুরুজন থেকে যেসব 'খবর' ও 'আসার' বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশরা নবী (সঃ)-কে বললোঃ আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্যে সাফা পর্বতকে সোনা বানিয়ে দেন, তাহলে আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো। তিনি বললেনঃ 'সত্যি তোমরা ঈমান আনবে তো?' তারা উত্তরে বললোঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন যে, নবী (সঃ) তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানালেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে পড়লেন– "তুমি যদি চাও তবে সকালেই সাফা পর্বত সোনায় পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু এর পরও তারা ঈমান না আনলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করবো যে শাস্তি আমি বিশ্ববাসীর আর কাউকে প্রদান করবো না। আর যদি তুমি চাও যে, আমি তাদের তাওবা কবূল করতঃ তাদের উপর করুণা বর্ষণ করি, তবে আমি তাই করবো।" তখন নবী (সঃ) বললেনঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনার নিকট তাওবার কবূলিয়ত ও করুণাই কামনা করি।

১১৬। আর যখন আল্লাহ বললেন– হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে– তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ নির্ধারণ করে নাও? ঈসা নিবেদন করলো–আমিও আপনাকে পবিত্র মনে করি; আমার পক্ষে কোনক্রমেই

١١٦- وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ

لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলবার আমার কোনই অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরস্থিত কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানি না; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।

১১৭- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

১১৭। আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি এটা ব্যতীত, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক, আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম, অনন্তর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনিই তাদের সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন; আর আপনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

১১৮- إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১১৮। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ওরা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত **ঈসা (আঃ)-কে এই কথাগুলো** ঐসব লোকের সামনে সম্বোধন করে বলবেন যারা **তাঁকে ও তাঁর মাতাকে মা'বূদ** বানিয়ে নিয়েছিল। এ কথাগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ **খ্রীষ্টানদেরকে ধমক** দিয়েছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কাতাদা (রঃ) ও অন্যান্যগণ এরূপই বলেছেন। হযরত কাতাদা (রঃ)-এর উপর আল্লাহ পাকের هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ (অর্থাৎ এটা ঐ দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার পুরস্কার দেয়া হবে) এ উক্তিটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ সম্বোধন ও উত্তর দুনিয়াতেই ছিল। ইবনে জারীর (রঃ) এ কথাকে সমর্থন করে বলেন যে, যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল এটা ঐ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) দু'প্রকারে-এর উপর দলীল গ্রহণ করেছেন।

প্রথম প্রকার এই যে, এ কথাটি مَاضِىْ বা অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা বলা হয়েছে, অর্থাৎ قَالَ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ এবং وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ – এটা হচ্ছে শর্তযুক্ত উক্তি এবং এই উক্তি দুনিয়াতেই করা হয়েছিল। আর শাস্তি প্রদান ও ক্ষমা করণের শর্ত আখিরাতের জন্যে উঠিয়ে রাখা হয়েছে। এ দু'টি দলীলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে। কেননা, অতীতকালের ক্রিয়া আসলো তো কি হলো? কিয়ামতের অধিকাংশ ঘটনাকেই অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ওটা সংঘটিত হওয়ার উপর যথেষ্ট দলীল হতে পারে। এখন বাকী থাকলো وَاِنْ تُعَذِّبْهُمْ শব্দটির কালামে শরতিয়া হওয়ার কথা। এ সম্পর্কে বলা যাবে যে, এর দ্বারা পাপীদের প্রতি হযরত ঈসা (আঃ)-এর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর শর্তের উপর কোন কিছু সম্পর্কিত হওয়া ওটা সংঘটিত হওয়ার দাবিদার হতে পারে না। কুরআন কারীমের আয়াতসমূহে এর বহু নযীর বিদ্যমান রয়েছে। এই ব্যাপারে হযরত কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। তা হচ্ছে এই যে, এটা হবে কিয়ামতের দিনের কথোপকথন, যাতে সেদিন সকলের সামনে খ্রীষ্টানদের সব কিছু খুলে যায় এবং তাদের মনে ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– কিয়ামতের দিন নবীগণ ও তাঁদের উম্মতদেরকে ডাক দেয়া হবে। অতঃপর হযরত **ঈসা** (আঃ)-কে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তিনি তা স্বীকার করে নেবেন। তারপর আল্লাহ পাক তাঁকে জিজ্ঞেস করবেনঃ তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে– তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে

আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ বানিয়ে নাও? তখন তিনি তা অস্বীকার করবেন। অতঃপর নাসারাদেরকে আনয়ন করা হবে এবং তাদেরকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তারা তখন বলবেঃ 'হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে এ আদেশই করেছিলেন।' এই কথা শুনে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাথা ও দেহের লোম ভয়ে খাড়া হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ তখন তাঁর চুলগুলো ধরে রাখবেন। আর এই নাসারাদেরকে আল্লাহর সামনে এক হাজার বছর পর্যন্ত জোড় পায়ে বসিয়ে রাখা হবে। অবশেষে তাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যাবে এবং সত্য তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর তাদের জন্যে ক্রুশ উঠানো হবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।[১]

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ .... لِي بِحَقٍّ এ জবাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে উত্তম ভদ্রতার কতইনা তাওফীক দান করা হয়েছিল এবং তাঁর অন্তরে কতইনা সুন্দর দলীল ভরে দেয়া হয়েছে! তিনি বলেন—হে আল্লাহ! যে কথা বলার আমার কোন অধিকার নেই সে কথা আমি কিরূপে বলতে পারি? যদি আমি এ কথা বলেও থাকি তবে অবশ্যই সেটা আপনি ভাল রূপেই জানেন। কেননা, আপনার কাছে তো কোন কিছুই গোপন থাকে না। আপনি আমার অন্তরের কথা অবগত আছেন, কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে মোটেই অবগত নই। আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি তার একটি অক্ষরও বেশী করিনি। আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম— তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করবে যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যাবলী তদারক করেছি। অতঃপর যখন থেকে আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের কার্যাবলী তদারক করেছেন। আর আপনি প্রত্যেক কাজ সম্বন্ধেই পূর্ণ অবগত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের মধ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেনঃ হে লোক সকল! কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উলঙ্গ মাথা, উলঙ্গ দেহ এবং উলঙ্গ পা অবস্থায় উঠানো হবে, যেমন তোমরা তোমাদের জন্মের দিন ছিলে। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরানো হবে। এরপর আমার উম্মতের মধ্য হতে কতক লোককে আনয়ন করা হবে যাদেরকে জাহান্নামের নিদর্শন হিসেবে বাম দিকে রাখা হবে। তখন আমি বলবো— এরা তো আমারই উম্মত। সেই সময় বলা হবে— তুমি জান না যে, এরা তোমার (ইন্তেকালের) পরে তোমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করেছিল এবং

১. হাফিয ইবনে আসাকির এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীর একে গারীব ও আযীয বলেছেন।

বিদআত চালু করে দিয়েছিল। আমি একজন সৎ বান্দার মত ঐ কথাই বলবো যে কথা হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন।[১] তাহলে اِنْ تُعَذِّبْهُمْ আল্লাহ পাকের এই কালাম তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি যা চাইবেন তাই করবেন। তিনি সবারই কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছে কেউই কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারে না। তা ছাড়া এই কালাম নাসারাদের উপর তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশকারী, যারা হযরত ঈসা (আঃ) -কে তাঁর শরীক ও পুত্র এবং মারইয়াম (আঃ)-কে তাঁর স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) সাব্যস্ত করেছিল। এ আয়াতের বড়ই মাহাত্ম্য রয়েছে। হদীসে আছে যে, নবী (সঃ) এক রাত্রে সকাল পর্যন্ত নামাযে এ আয়াতটিই পড়তে থাকেন।

ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) বলেন, একদা রাত্রে নবী (সঃ) اِنْ تُعَذِّبْهُمْ -এ আয়াতটি নামাযে পাঠ করতে থাকেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি রুকূ' ও সিজদা করেন। আর এভাবেই সকাল হয়ে যায়। সকালে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রাত্রে নামাযে আপনি এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এর মাধ্যমেই রুকূ' ও সিজদা করতে রইলেন, শেষ পর্যন্ত সকাল হয়ে গেল, এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে আমার উম্মতের জন্যে সুপারিশের প্রার্থনা করছিলাম। তখন তিনি তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করেছে এরূপ লোক ছাড়া সকলকেই ক্ষমা করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন।" ইবনে আবি হাতিম (রঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর اِنْ تُعَذِّبْهُمْ -এ উক্তিটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন এবং বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত (অর্থাৎ আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন)।' এ বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। আল্লাহ তা'আলা তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে যা উত্তর দেয়ার ছিল তাই দেন। তখন মহান আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বলেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বল যে, আল্লাহ তাঁকে তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবেন, দুঃখিত করবেন না।" ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট অনুপস্থিত থাকলেন, বের হলেন না, এমনকি

১. এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি কখনই বের হবেন না। অতঃপর তিনি বের হলেন এবং এমনভাবে সিজদায় পড়ে গেলেন যে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে বলে আমাদের ধারণা হলো। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেনঃ আমার প্রতিপালক আমার নিকট আমার উম্মতের ব্যাপারে কি করা যায় সেই পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমি বললাম, হে আমার প্রভু! এরা তো আপনারই মাখলুক ও আপনারই বান্দা! দ্বিতীয় বার তিনি আমার নিকট পরামর্শ চাইলে আমি ঐ কথাই বললাম। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমাকে অপদস্থ করবো না।' আর তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আমার সঙ্গে আমার উম্মতের যে প্রথম দলটি জান্নাতে যাবে তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার এবং এরূপ প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার করে থাকবে। এরা সবাই বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাকে বললেনঃ 'তুমি প্রার্থনা কর, তা কবূল করা হবে এবং চাও, তা দেয়া হবে।' আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে বললাম, আল্লাহ কি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করার ইচ্ছা করেছেন? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ 'হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন।' আল্লাহ আমাকে সব কিছুই প্রদান করেছেন। আমি এ জন্যে অহংকার করছি না। আর আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে এবং আমি ভূ-পৃষ্ঠে সুস্থ শরীরে বিচরণ করছি। আমাকে এই বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে যে, আমার উম্মত দুর্ভিক্ষে মারা যাবে না এবং তারা পরাজিত হবে না। আল্লাহ আমাকে কাওসার দান করেছেন। এটা হচ্ছে জান্নাতের একটি নহরের নাম যা আমার হাওযে বয়ে আসবে। আর আমাকে মর্যাদা, সাহায্য এবং রুউব বা ভক্তি প্রযুক্ত ভীতি প্রদান করা হয়েছে, যা আমার উম্মতের সামনে জনগণের উপর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমি সকল নবীর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবো। আমার উম্মতের জন্যে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে এবং আরও এমন কতক জিনিস আমার উম্মতের জন্যে হালাল করা হয়েছে যেগুলো আমার পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের উপর হালাল ছিল না। আর মাযহাব হিসেবে আমার ধর্মে কোন কাঠিন্য রাখা হয়নি।[১]

১. সনদের দিক দিয়ে এই হাদীসটি দুর্বল হলেও সাফাআতের হাদীসগুলো এর দুর্বলতা দূর করে দিয়েছে।

১১৯। আল্লাহ বলবেন–এটা সেইদিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে; এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।

১১৯- قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১২০। আল্লাহরই জন্যে রয়েছে বাদশাহী নভোমণ্ডলের ও ভূ-মণ্ডলের এবং ঐ সমুদয় বস্তুর যা তাতে বিদ্যমান রয়েছে; আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১২০- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

ঈসা (আঃ) যে বিপথগামী ও মিথ্যাবাদী খ্রীষ্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন সে কথারই জবাব দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ। অর্থাৎ আজকের দিনে একত্ববাদীদের একত্ববাদ এবং সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকার দেবে। তারা প্রবাহিত নহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সেখান থেকে না তাদেরকে বের করা হবে, না তারা মুহূর্তের জন্যে জান্নাত পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ

অর্থাৎ 'আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় কথা।' (৯ঃ ৭২) এ আয়াতের সঙ্গে যে হাদীস সম্পর্কযুক্ত রয়েছে তা সত্বরই আসছে। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– সেই দিন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ উজ্জ্বল

াপ্তিমান অবস্থায় প্রকাশিত হবেন এবং বলবেনঃ 'তোমরা চাও, আমি তোমাদেরকে প্রদান করবো।' তিনি বলেন যে, তখন তারা তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। তিনি তখন কলবেনঃ 'আমার সন্তুষ্টিই তো তোমাদেরকে আমার ঘরে নিয়ে এসেছে।' জনগণ পুনরায় তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। তখন তিনি বল্বেনঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।' আল্লাহ পাক বলেনঃ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ এটাই হচ্ছে বড় সফলতা (৯ঃ ৭২) (এরূপ সফলতা আমি আর কাউকেও প্রদান করি না।) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমলকারীদের এরূপ আমলই করা উচিত।(৩৭ঃ ৬১) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ـ

অর্থাৎ এ কাজেই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩ঃ ২৬)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ তিনিই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুরই উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে। তাঁর সাথে কেউই তুলনীয় নয় এবং তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। তাঁর পিতাও নেই, পুত্রও নেই এবং স্ত্রীও নেই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই।

সূরাঃ 'মায়িদাহ্'র তাফসীর সমাপ্ত

تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن
الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية
جامعة راجشاهى، بنغلاديش